GIFT

নবাবী বাংলার রাজনীতি ও অভিজাত শ্রেণী: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

466266
Dhaka University Library
466266

তত্ত্বাবধায়ক
ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে- ২০১৩

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত **নবাবী বাংলার রাজনীতি ও অভিজাত শ্রেণী: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ অভিসন্দর্ভটি পি-এইচ.ডি ডিগ্রি বা অন্য কোন সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোথাও দাখিল করিনি। আমার জানা মতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কোথাও পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

১৪.৫.২০১৩

(মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান)
পি-এইচ.ডি গবেষক
রেজি. নং ১৪৯, সেসন -২০০৮-২০০৯ (পুনঃ)
ও
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

466266

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬৩৩০

Department of Islamic History & Culture
University of Dhaka
Dhaka 1000
Phone : 9661900-73/6330
E-mail : ishist_du@yahoo.com

নং.................................

তারিখ.................................
১৪-০৫-২০১৩

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান কর্তৃক পি-এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য ***নবাবী বাংলার রাজনীতি ও অভিজাত শ্রেণী: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি আমি সম্পূর্ণ পড়েছি। আমার বিবেচনায় এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এতে ব্যবহৃত তথ্য উৎসসমূহ নির্ভরযোগ্য। আমার জানা মতে এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ গবেষক অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাদানের জন্য গবেষক জনাব মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানকে অনুমতি প্রদান করা হলো।

(প্রফেসর ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান) ১৪/৫/১৩
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

466266

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

প্রাক-কথন

নাবাবী আমল বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ আমলে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনেতিক ও সামাজিক কাঠামোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আর এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ধারায় অন্যতম নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল তদানীন্তন অভিজাত শ্রেণী। কাজেই নবাবী বাংলার ইতিহাস অধ্যয়ন ও সে সময়কার যুগ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য এই অভিজাত শ্রেণীর গঠন ও বিবর্তন এবং নবাবী বাংলার রাজনীতি ও আর্থ-সমাজিক জীবনে তাদের ভূমিকা ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিষয়ে অনুসন্ধানী অধ্যয়ন জরুরি। এরূপ বাস্তবতার কথা মাথায় রেখেই **নবাবী বাংলার রাজনীতি ও অভিজাত শ্রেণী: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন** শীর্ষক পি-এইচ. ডি গবেষণা কর্মে মনোনিবেশ করি।

আমার পি-এইচ. ডি গবেষণা কর্ম তত্ত্বধান করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. মোঃ আখতারুজ্জামান। তাঁর তত্ত্বাবধানে উপর্যুক্ত শিরোনামে এ অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গবেষণার বিষবস্তু নির্বাচন থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভের কাঠামো বিন্যাস এরং বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মুল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা আমার গবেষণা কাজকে বোধগম্য করতে বিশেষভাবে সহায়ক এবং অভিসন্দর্ভ রচনাকে সহজতর করেছে। সামাজিক ইতিহাসে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসু মনোভাব আমাকে বিষয়বস্তুর গভীর যেতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণীত করেছে। অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান অধ্যাপনা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক ও নানা একাডেমিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। এ কারণে তাঁর ব্যস্ততা সীমাহীন। কিন্তু এ ব্যস্ততা সত্ত্বেও অভিসন্দর্ভের অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনে যেভাবে দিক-নির্দেশনা ও সহযোগিতা হাত প্রসারিত রেখেছিলেন, তা ছিল আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। বস্তুত আমার নিজের নানা অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাকে তাঁর সস্নেহ ও সানুগ্রহ প্রশ্রয়দান এবং সর্বোপরি তাঁর অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা ও উপর্যুপরি তাগিদের ফলেই বিলম্বে হলেও আমার গবেষণা কর্মের সমাপ্তি ও অভিসন্দর্ভ রচনা সম্ভব হয়েছে। তাঁর এ সহযোগিতা আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে রেখেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি গবেষণার নীতিমালার শর্তপুরণের জন্য আমাকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে "নবাব সরকার যুগের অমাত্য অভিজাত শ্রেণী: সংগঠন ও বৈশিষ্ট্য" এবং "পলাশী বিপ্লব ও অমাত্য অভিজাত শ্রেণী" শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে হয়েছে। উপস্থাপিত এ দুটি প্রবন্ধের উপর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়েছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক হাবিবা খাতুন, অধ্যাপক এ কে এম ইদ্রিস আলী, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ড. নাজমা খান মজলিশ, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিকুল হায়দার, অধ্যাপক ড. মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, অধ্যাপক মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস, সহকর্মী অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী এবং অধ্যাপক ড. আবদুল বাছিরসহ বিভাগীয় অনেক সহকর্মী শিক্ষকের কাছ থেকে। এই সুযোগে আমি তাদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার গবেষণার ধারণাকে স্পষ্ট করতে যিনি আমাকে সতত নানাভাবে পরামর্শ, উপদেশ ও গবেষণার জন্য নিজ সংগ্রহ থেকে নানা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোহাম্মদ মুসা আনসারী। তিনি শুধু আমার শিক্ষকই নন, আমার জীবনের আদর্শ। ইতিহাস অধ্যয়ন ও গবেষণার আধুনিক প্রথা-পদ্ধতি বিষয়ে আমার হাতেখড়ি বলতে গেলে তাঁর কাছেই হয়েছে। আমার জীবন গঠনেও তাঁর নানামুখী অবদান রয়েছে। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ, ভালবাসা ও মমত্ববোধ পিতৃসম। প্রচারবিমূখ নিভৃতচারী এ জ্ঞান সাধকের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। প্রসঙ্গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং আরবি বিভাগের অধ্যাপক এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী- এর নামও কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করছি। গবেষণা কর্মটি দ্রুত শেষ করার জন্য নিরন্তর তাগিদ দিয়েছেন কলা অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন। এই সুযোগে তাঁকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার সতীর্থ ও সহকর্মী অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির। শুরু থেকে শেষাবধি গবেষণা সহায়ক তাঁর অবারিত পরামর্শ, অনুপ্রেরণা এবং নানা সহযোগিতা আমার জন্য ছিল অতিরিক্ত প্রাপ্তি। তাঁর প্রতিও রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

সুষ্ঠুভাবে গবেষণা সম্পাদনে ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, জাতীয় গণগ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, ইসলামের ইতহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ সেমিনার লাইব্রেরি, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আর্কাইভস, ন্যাশনাল লাইব্রেরি (কলকাতা), কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোসাল সায়েন্সেস লাইব্রেরি (কলকাতা), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, কলকাতাস্থ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অভিলেখাগার (Archives) থেকে সহয়াক গবেষণা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য তাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মকর্তা জনাব কবির আহমেদসহ কর্মকর্তা কর্মচারিদেরকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জনাচ্ছি।

আমার সহধর্মিনী ও বন্ধু আলো আরজুমান বানু। গবেষণা কর্ম সম্পাদনে তিনি শুধু আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই দেন নি, বরং একই ডিসিপ্লিনের ছাত্র হওয়ায় গবেষণা কর্ম সম্পাদনে তাঁর প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার জন্য নিঃসন্দেহে বাড়তি পাওন হয়েছে। তবে তাঁর সাথে আমার সম্পর্কের মাত্রাটা এমন যে, এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সম্পর্কটিকে গতানুগতিক করতে চাই না। তাঁর জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভ কামনা। আমার আত্মজ কে এম সামিন ইয়াসার এবং সাগুফতা শেহরীণ খান। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আমার গবেষণা কর্মে নিয়োজিত থাকাকালীন তারা আমার কাছ থেকে তাদের কাঙ্ক্ষিত অনেক প্রাপ্য থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। তবে তারা নিজেদের অপ্রাপ্তিকে অকপটে ও সানন্দে বরণ করে নিয়েছে। আজকে এই শুভক্ষণে তাদের জন্য রইল আমার অনেক অনেক দোয়া ও শুভ কামনা।

গবেষণার শুরু থেকে এর সফল সমাপ্তির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন আমার পিতা জনাব আবদুল আজিজ খান। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি জমাদানের এই লগ্নে তাঁর কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি আমার নিরন্তর অনুপ্রেরণার উৎস আমার মা বেগম হালিমা আজিজকে। আমার শ্বশুর জনাব মোহাম্মদ আলী ও শাশুড়ি মিসেস মাহমুদা মমতাজ রহমানীসহ আমার ভাই-বোন ও পরিবার- পরিজন সকলের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ-সংক্ষেপণ

আহকাম	:	*আহকাম-ই-আলমগিরী*, শেখ ইনায়েত উল্লাহ্ রচিত, ইন্ডিয়া অফিস লন্ডনে সংরক্ষিত
আখবারাত	:	*আখবারত-ই-দরবার-ই-মুয়াল্লা*, জয়পুর নথি, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহ
খুলাসাত	:	*খুলাসাত-উত-তাওয়ারিখ*, মহারাজা কল্যাণসিং কর্তৃক রচিত এবং খান বাহাদুর সরফরাজ হুসাইন খান কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় অনূদিত। এ অনুবাদটি ১৯৪০ সালে *Journal of Bihar and Orissa Research Society* তে প্রকাশিত।
তারিখ	:	*তারিখ-ই-বাঙ্গালা*, মুনশী সলিমুল্লাহ্ কর্তৃক রচিত। Francies Gladwin *A Narrative of the Transactions in Bengal,* শিরোনামে ইংরেজি অনুবাদ করেন।
নওবাহার	:	*নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলি খানি*, গ্রন্থটির রচয়িতা করম আলী খান
মহাবতজঙ্গী	:	*তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী*, রচয়িতা ইউসুফ আলী খান
রিয়াজ	:	*রিয়াজ-উস-সালাতিন*, গোলাম হোসেন সলিম রচিত
সিয়ার	:	*সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন*, রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি
B D G	:	*Bengal District Gazetteers*
BDR	:	*Bengal District Records*
BM	:	British Museum
BPC	:	The Dairy and Consultations of the English Council in Calcutta, তবে *Bengal Public Consultations* নামে ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডে নথিভূক্ত
BPP	:	*Bengal Past and Present*
BSC	:	Bengal Secret Consultations
C R	:	*The Calcutta Review*
H M S	:	Home Miscellaneous Series
IESHR	:	*The Indian Economic and Social History Review*
IHC	:	*The Indian History Congress*
I.H Q	:	*Indian History Quarterly*
JASB	:	*Journal of Asiatic Society of Bengal*
JASBD	:	*Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*
JBORS	:	*Journal of Bihar and Orissa Research Society*
SAB	:	*A Statistical Account of Bengal*

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রাক-কথন	i-ii
শব্দ-সংক্ষেপন	iii
প্রথম অধ্যায়	
ভূমিকা	১-৩৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
প্রাক-নবাবী যুগে বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা	৩৫-৭২
তৃতীয় অধ্যায়	
মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও বাংলায় নবাব সরকার প্রতিষ্ঠা	৭৩-১০৯
চতুর্থ অধ্যায়	
নবাব সরকার যুগে বাংলার সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণীসমূহ	১১০-১৩৫
পঞ্চম অধ্যায়	
নবাবী যুগে বাংলার অভিজাত শ্রেণী: অভ্যুদয় ও বিকাশ	১৩৬-১৮২
ষষ্ঠ অধ্যায়	
নবাবী বাংলার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিকাশধারা এবং অভিজাত শ্রেণী	১৮৩-২৪৩
সপ্তম অধ্যায়	
নবাবী বাংলার অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি ও অভিজাত শ্রেণী	২৪৪-২৯৮
অষ্টম অধ্যায়	
পলাশি বিপ্লব ও অভিজাত শ্রেণী	২৯৯-৩৫৯
নবম অধ্যায়	
উপসংহার	৩৬০-৩৭০
পরিশিষ্ট	৩৭১-৩৯৩
গ্রন্থপঞ্জি	৩৯৪-৪১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ গবেষণাকর্মের ক্ষেত্র ও পরিসীমা

'নবাবী বাংলার রাজনীতি ও অভিজাত শ্রেণী: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন' শীর্ষক আলোচ্য গবেষণা কর্মের কেন্দ্রবিন্দু নবাবী আমলের বাংলা। আর বাংলা বলতে তখন অবিভক্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে বুঝানো হত। আলোচ্য গবেষণায় নবাবী বাংলা বলতে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যাকেই বুঝানো হয়েছে এবং এ অঞ্চলকে গবেষণার ক্ষেত্রভূমি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ তিনটি অঞ্চল কিন্তু সবসময় নবাবী শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নবাবী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি খানের সময় (১৭১৬-১৭২৭ খ্রি.) তাঁর কর্তৃত্ব কেবল বাংলা ও উড়িষ্যায় সীমাবদ্ধ ছিল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭ খ্রি.) পর বিহারকে বাংলার শাসন কর্তৃত্ব থেকে পৃথক করে মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে একটি স্বতন্ত্র সুবায় পরিণত করা হয়। ১৭৩৩ সালে সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের শাসনামলে বিহার নবাবী শাসনের সাথে যুক্ত হয় এবং নবাবী শাসনের শেষাবধি বিহার বাংলার সাথে যুক্ত ছিল।[১] উড়িষ্যা মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকেই বাংলার সাথে যুক্ত ছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ১৭৫১ সালে উড়িষ্যা কার্যত নবাবী শাসনের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে যায়। মারাঠা বর্গীদের সাথে দশ বছরের অমিমাংসিত যুদ্ধের পর বয়োবৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) মারাঠাদের সহযোগী মীর হাবিবের সাথে ১৭৫১ সালের অক্টোবর মাসে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন।[২] চুক্তি অনুযায়ী আইনত উড়িষ্যা বাংলার সাথে তখনো যুক্ত থাকে বটে, তবে এর রাজস্ব আয়ের স্বত্ব মারাঠাদের দখলে চলে যায়। এমনকি পরবর্তীতে বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং

---

[১] J.N. Sarkar (ed.), *History of Bengal, vol. II,* Fourth Impression, University of Dhaka, Dhaka 2006, p. 223 তবে কীভাবে বিহার নবাবী শাসনের সাথে যুক্ত হলো সে বিষয়ে সমসাময়িক ফারসি গ্রন্থসমূহে প্রাপ্ত তথ্যে কিছু গরমিল পরিলক্ষিত হয়। *মুজাফ্‌ফরনামা*র তথ্যমতে, বাংলার নবাব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সুজাউদ্দিন খান প্রতি বছর দিল্লীতে রাজস্ব হিসেবে এক কোটি করে টাকা প্রেরণ করে সম্রাটের বিশেষ প্রীতিভাজনে পরিণত হন। এ সময় বিহারের (আজিমাবাদ) সুবাদার ছিলেন ফখর-উদ-দৌলা। নবাব সুজাউদ্দিন খান তাঁর প্রভাবশালী অমাত্য হাজী আহমদ ও আলিবর্দী খানের পরামর্শ অনুযায়ী বিহারের সুবাদারির জন্যও সম্রাটের নিকট দরখাস্ত করেন। এ অবস্থায় ফখর-উদ-দৌলাকে বরাখাস্ত এবং সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানকে বিহারের সুবাদার নিয়োগ করে সম্রাটের কাছ থেকে একটি সনদ দেয়া হয়। করম আলী, *মোজাফ্‌ফরনামা,* বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৫। ইউসুফ আলী খানের বক্তব্য মতে, মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহ পদচ্যুত ফখর-উদ-দৌলার স্থলে আমির-উল-উমারা সমস-উদ-দৌলাকে (প্রকৃত নাম খাজা আসম) বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি নবাব সুজাউদ্দিন খানের শুভাকাঙ্ক্ষী ও সম্রাটের দরবারে তাঁর পক্ষে উকিল ছিলেন। তাই সমস-উদ-দৌলা তাঁর পক্ষে সুজাউদ্দিন খানকে বিহারের নায়েব সুবাদার নিযুক্ত করেন। ইউসুফ আলী খান, *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-মহাবতজঙ্গী*, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ.১১। সুজাউদ্দিন খান বিহারের নায়েব সুবাদার পদ লাভ করেছিলেন বলে মুন্‌শী সলিমুল্লাহও উল্লেখ করেছেন। Salimulla, *Tarikh-i-Bangla,* Eng. Trns. by F. Gladwin as *A Narrative of the Transactions in Bengal,* Stuart & Cooper, Calcutta, 1906, p. 137 । তবে তিনি কখন কীভাবে সুবাদার হলেন এ ব্যাপরে ইউসুফ আলী খান বা সলিমুল্লাহ কেউই কিছু বলেন নি। বিহারের সুবাদারি লাভের জন্য সম্রাট সমীপে সুজাউদ্দিন খানের আবেদন বা নায়েব সুবাদার পদে তাঁকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল এমন তথ্য *সিয়ার-উল-মুতায়খ্‌খিরিন* বা *রিয়াজ-উস-সালাতিন* এ নেই। এ উভয় গ্রন্থেই ফখর-উদ-দৌলার পদচ্যুতির পর সুজাউদ্দিন খানকে বিহারের সুবাদার নিয়োগ এবং একে বাংলা ও উড়িষ্যার সাথে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।[১] সৈয়দ গোলাম হেসেন খান তবাতবায়ি, *সিয়ার-উল-মুতায়খ্‌খিরিন*, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ.৬, গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, পৃ. ১৮৭

[২] চুক্তি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য K. K. Datta, *Alivardi Khan and His Time,* University of Calcutta, Calcutta, 1939, p. 114

Dhaka University Institutional Repository

বিশৃঙ্খলার সুযোগে মারাঠারা উড়িষ্যার উপর ক্রমশ তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ জোরালো করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যাকে বাংলার নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে বেরার রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করে নেয়।[৩]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, শুরুর দিকে বিহার এবং শেষ দিকে উড়িষ্যা নবাব সরকারের সাথে যুক্ত ছিল না বটে, তবে আলোচ্য গবেষণা সামগ্রিক আলোচনায় শুরু থেকে শেষাবধি এ দুটো অঞ্চলকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করে দেখার অবকাশ থাকবে না। কাজেই নবাবী বাংলা বলতে আমরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে বুঝব এবং এই নিরিখে এতদাঞ্চলের সরকার, রাজনীতি ও সমাজে অভিজাত শ্রেণীর অবস্থান ও তাদের ভূমিকা নির্ণয়ের প্রচেষ্টা থাকবে।

আলোচ্য গবেষণার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭০৪ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত। অনেকে ১৭১৬/১৭ সালকে বাংলার নবাবী আমলের সূচনা বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করেন। কারণ এ বছর মুর্শিদকুলি খান সুবাহ বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছিলেন।[৪] সন্দেহ নেই এ নিয়োগ লাভ মুর্শিদকুলি খানকে বাংলা ও উড়িষ্যার সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল এবং একইসঙ্গে এর মধ্য দিয়ে নবাবী অভিধায় আখ্যায়িত শাসন যুগের সূচনাও হয়েছিল। তবে নবাবী শাসনের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল আঠারো শতকের একেবারেই সূচনাকালে মুর্শিদকুলি খানের দিউয়ান হিসেবে বাংলায় আগমনের মধ্য দিয়েই। মুর্শিদকুলি খান দিউয়ানের দায়িত্ব নিয়ে বাংলায় আসেন ১৭০০ সালে। তবে তাঁর জীবনে ১৭০৪ সাল নিঃসন্দেহে একটি বাঁক পরিবর্তনকারী ঘটনা। উল্লেখ্য যে বাংলার সুবাদার আজিম উদ্দিনের (আজিম-উস-শান) সাথে দ্বন্দ্বের ফলে জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে মুর্শিদকুলি খান (তখনো করতলব খান নামে পরিচিত) ১৭০৩ সালে জাহাঙ্গীরনগর থেকে দিউয়ানি দপ্তর মখসুদাবাদে স্থানান্তর করেন।[৫] সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) দিউয়ানের এ পদক্ষেপকে শুধু অনুমোদনই দেননি তাঁর পৌত্র সুবাদার আজিম উদ্দিনকেও বাংলা ছেড়ে বিহারে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

প্রদেশের সর্বোচ্চ পদবিধারী দুই অমাত্যের জাহাঙ্গীরনগর ত্যাগের ঘটনায় বাংলার ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। শাহজাদা আজিমউদ্দিন বাংলা ছেড়ে যাওয়ায় সুবাহ বাংলায় সুবাদারের অনুপস্থিতির যুগের সূচনা হয়। আর সুবাদারের অনুপস্থিতির ফলে মুর্শিদকুলি খানের মখসুদাবাদে দিউয়ানি দপ্তর স্থানান্তরের বিষয়টিও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, আজিম-উস-শানের বিহার গমনের সাথে সাথে দিউয়ান মুর্শিদকুলি খান বাংলার অলিখিত সুবাদারে পরিণত হন। এর মধ্য দিয়ে সুবাহ বাংলার শাসনতান্ত্রিক কর্মকেন্দ্রও জাহাঙ্গীরনগর থেকে মখসুদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। মখসুদাবাদে দিউয়ানি দপ্তর স্থানান্তরের কিছুকাল পরে দিউয়ান রাজস্ব ও উপঢৌকন বাবদ বিপুল অঙ্কের টাকা নিয়ে দাক্ষিণাত্যে সম্রাট দরবারে হাজির হন। দাক্ষিণাত্য অভিযানে বিপর্যস্ত এবং চরম আর্থিক সংকটে নিপতিত সম্রাট আওরঙ্গজেব

---

[৩] K. K. Datta, *op. cit.* p. 118

[৪] স্যার যদুনাথ সরকার মনে করেন মুর্শিদকুলি খানকে ১৭১৭ সালে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করা হয়েছিল। J.N. Sarkar (ed.), *op. cit.* p. 407 ইতোপূর্বে তিনি উড়িষ্যার সুবাদারিও লাভ করেছিলেন। তাঁর এ নিয়োগের মধ্য দিয়ে কার্যত তিনি বাংলা ও উড়িষ্যার প্রধান প্রশাসনিক কর্তায় পরিণত হন এবং কেন্দ্রীয় মুঘল সরকারের প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রকাশ করে বাংলায় প্রায় একটি স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তবে আবদুল করিম নানা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদারি লাভ করেছিলেন ১৭১৬ সালে। Abdul Karim, *Morshid Quli Khan and His Time,* Asiatic Society of Bangladesh, Dacca, 1963, মোকাদ্দেসুর রহমান কর্তৃক *মুর্শির্দকুলী খান ও তাঁর যুগ*, নামে বাংলায় অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৭

[৫] আবদুল করিম, *মুর্শির্দকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

দিউয়ানের এ কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'মুর্শিদকুলি খান' খেতাবসহ উচ্চ রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করেন। নতুন উপাধি অনুসারে তাঁর দিউয়ানি দপ্তর মখসুদাবাদকে 'মুর্শিদাবাদে' নামান্তরিত করারও অনুমতি দেয়া হয়। সূত্র মতে, মুর্শিদকুলি খান দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন ১৭০৪ সালের গোঁড়ার দিকে। আর এ বছরই দিউয়ান মখসুদাবাদের নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন বলে সমকালীন অন্যান্য নির্ভরযোগ্য থেকেও এ ধারণা পাওয়া যায়।[৬]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলা থেকে সুবাদার আজিম উদ্দিনের বিহার গমনের ফলে দিউয়ান মুর্শিদকুলি খান বাংলার এক প্রকার অলিখিত সুবাদারে পরিণত হন। ইতোমধ্যে তিনি উড়িষ্যার সুবাদারি পদ লাভ করেছিলেন। ১৭০৪ সালে জানুয়ারি মাসে তাঁকে বিহারেরও দিউয়ান নিযুক্ত করা হয়।[৭] এ নিয়োগের মধ্য দিয়ে মুর্শিদকুলি খান উড়িষ্যা প্রদেশের সুবাদার, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এ তিনটি প্রদেশের দিউয়ান এবং পাঁচটি সরকারের ফৌজদার পদ লাভ করেন। এসব নিযুক্তি থেকে সহজেই তাঁর ক্ষমতার পরিধি এবং তাঁর প্রতি সম্রাটের অনুগ্রহ ও আস্থার বিষয়টি অনুমান করা যায়। বস্তুত ১৭০৪ সাল থেকেই বাংলার রাজনীতিতে মুর্শিদকুলি খানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থান নিশ্চিত হয়। যদিও মাঝখানে তিনি কিছু সময়ের জন্য বাংলা ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু অচিরেই তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলার প্রশাসন ও রাজনীতিতে তাঁর অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাও প্রকাশ পায়। যা'হোক উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলার রাজনীতিতে মুর্শিদকুলি খানের ক্ষমতা বিকাশের একটি মাইলফলক হচ্ছে ১৭০৪ সাল। মুর্শিদাবাদের ক্রমোন্নতিরও সূচনা বিন্দু এটি। প্রথমে দিউয়ানের কর্মস্থল হলেও অচিরেই মুর্শিদাবাদ সুবদারের কর্মস্থলে রূপান্তরিত হয় এবং প্রদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। জাহাঙ্গীরনগর তাঁর গৌরব হারায় আর মুর্শিদাবাদ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার প্রশাসনিক ভরকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলার ইতিহাসে সূত্রপাত হয় অনেক সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক ঘটনারও। কাজেই নবাবী বাংলার ইতিহাসের সাথে ১৭০৪ সালের সম্পর্ক নিবিড়। অনেকে ১৭০৪ সালকে বাংলার নবাবী শাসনের সূচনা হিসেবেও বিবেচনা করেন।[৮] এসব গুরুত্ব বিচেনায় আলোচ্য গবেষণার যাত্রা বিন্দু স্থির করা হয়েছে ১৭০৪ সালকে।

নবাবী বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস অধ্যয়নে ১৭৫৭ সাল নিঃসন্দেহে একটি সুবিধাজনক ছেদ বিন্দু। ১৭৫৭ সালকে আইনত বাংলার নবাবী শাসনের সমাপ্তি বা বঙ্গ-ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার নিরেট সূচনা কাল হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তবে এ সালটি বঙ্গ-ভারতের ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিভাজকরূপে অবশ্যই গণ্য হওয়ার দাবি রাখে। বস্তুত মুর্শিদকুলি খান, সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান এবং আলিবর্দী খানের আমলে বাংলার নবাবী রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারা সূচিত ও বিকশিত হয়েছিল, ১৭৫৭ সালে পলাশির ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর যবনিকাপাত ঘটে। ইতিহাসের কোনো অর্জন কোনো সংক্ষিপ্ত সরলরেখায় অর্জিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। গভীর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ইতিহাসের বক্ররেখার নানা বাঁক-প্রতিবাঁক

---

[৬] ঐ, পৃ.পৃ. ২১, ৫৪

[৭] Jadunath Sarkar, (ed.), *op. cit.* pp. 399, 404, আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ২১

[৮] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ -১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, বাংলা সংস্করণ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, মুখবন্ধ, পৃ. সাত

অতিক্রম করে প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পথ পরিক্রমায় নবাবী আমলে বাংলায় একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় জাতিসত্তা বিকাশের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু পলাশির ঘটনা এ সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর প্রচেষ্টায় বাংলার যে রাষ্ট্রীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়, পলাশির মধ্য দিয়ে তা মুখ থুবড়ে পড়ে। কাজেই ১৭৫৭ সালে নবাবী শাসনের আইনত ইতি না ঘটলেও পলাশি পূর্ব ও পলাশি-উত্তর নবাব সরকারকে একইছাঁচে একই ছকে বিবেচনা করার কোনো অবকাশ নেই। বস্তুত ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত সময়কালকে নবাবী যুগ বলা হয় নিছক ইতিহাসের জের হিসেবে। পলাশির পর মুর্শিদাবাদের নবাবী শাসন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেন্টের আশ্রিতে (Protectorate) পরিণত হয়। ১৭৬৫ সালের পর মুঘল সাম্রাজ্যকেও প্রায় একই রকম ভাগ্য বরণ করতে হয়। এ কারণেই নবাবী শাসন তথা আঠারো শতকের বাংলার ইতিহাসে ১৭৫৭ সালকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজকরূপে আমলে এনে একে আলোচ্য গবেষণার শেষ সীমা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে গবেষণার অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণকে সুদূরগ্রাহী করতে অতীত প্রেক্ষাপটে প্রাক-নবাবী বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশধারাও গবেষণার সহ-উপজীব্য হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা অতীতের নিরিখে বর্তমানের বিচার বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস চর্চা ও অধ্যয়নের দাবি।

১.২ গবেষণার বিষয়বস্তু

নবাবী বাংলার রাজনীতি ও অভিজাত শ্রেণী সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী গভীর অধ্যয়ন আলোচ্য গবেষণাকর্মের বিষয়বস্তু। এ সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে 'নবাব' 'নবাবী আমল' এবং 'অভিজাত শ্রেণী' ইত্যাদি অভিধা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান জরুরি। উল্লেখ্য যে, মুর্শিদকুলি খান (১৭১৬-১৭২৭ খ্রি.) ছিলেন মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তি কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার শেষ সুবাদার। এরপর বাংলার সুবাদারি পদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে এবং সিরাজ-উদ-দৌলাহ পর্যন্ত এ ধারা বজায় থাকে। এ সময় বাংলার সুবাদাররা কেন্দ্র থেকে নিয়োগ লাভের জন্য অপেক্ষা করতেন না। তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে বা বাহুবলে ক্ষমতা দখল করে[৯] পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি আদায় করতেন। আর দুর্বল মুঘল কেন্দ্রীয় সরকার আনুষ্ঠানিক আনুগত্য এবং নিয়মিত বার্ষিক রাজস্ব লাভের বিনিময়ে নামসর্বস্ব সার্বভৌম ক্ষমতার সুখস্মৃতি নিয়ে বাংলায় ক্ষমতাদখলকারী সুবাদার-নাজিমদের ক্ষমতার বৈধতা দিতেন। এভাবে মুর্শিদকুলি খানের সুবাদার পদ লাভের মধ্য দিয়ে আঠারো শতকের বাংলায় এক বিশেষ শাসন যুগের সূচনা হয়-যা বাংলার ইতিহাসে 'নবাবী আমল' বা 'নবাব সরকার যুগ' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, 'নবাব' শব্দটি 'নওয়াব' শব্দ থেকে এসেছে। হিন্দি ভাষায় নওয়াব শব্দটির উচ্চারণ করা হয় নবাব হিসেবে। হিন্দি ভাষারীতির দ্বারা প্রভাবিত এ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা তাই নওয়াব শব্দটিকে নবাব হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। বাঙ্গালি লেখকদের রচনায় 'নওয়াব' এবং 'নবাব' দুটি শব্দেরই ব্যবহার দেখা যায়। নওয়াব শব্দটি আরবি 'নায়েব' শব্দের বহুবচন। আর নায়েব শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিনিধি।

---

[৯] মুর্শিকুলি খানের উত্তরসূরী সুবাদারদের মধ্যে সরফরাজ খান এবং সিরাজ-উদ- দৌলাহ মনোনীত উত্তরাধিকারী হিসেবে ক্ষমতায় আরোহন করেন। অন্যদিকে সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান এবং আলিবর্দী খান ছিলেন বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী।

বস্তুত 'নওয়াব' শব্দটি ছিল মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক পদমর্যাদা এবং ক্ষমতা নির্দেশক একটি পদবি। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নওয়াব নিয়োগ করা হত। কিন্তু পূর্ব ভারতের তিনটি সুবা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় নওয়াব নামে কোনো দাপ্তরিক পদ ছিল না। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এটি খেতাব হিসেবে ব্যবহৃত হত বলে জানা যায়।[১০] মুঘল প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় 'সুবাদার' এবং 'দিউয়ান' পদবিধারী দুজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার উপস্থিতি দেখা যায়। প্রদেশের নিজামত শাসন[১১] পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সুবাদারের উপর এবং দিউয়ান ছিলেন রাজস্ব প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। নিজামত শাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় সুবাদারকে 'নাজিম'ও বলা হতো। দৃশ্যত সুবাদার বা নাজিম ছিলেন প্রদেশের প্রধান কর্মকর্তা। তবে মুঘল প্রাদেশিক শাসনবিধি অনুযায়ী সুবাদার ও দিউয়ান ছিলেন একই পদমর্যাদা সম্পন্ন পরস্পর স্বাধীন দুজন কর্মকর্তা। আর এ কারণেই এখতিয়ারের প্রশ্নে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের ঘটনা মুঘল ইতিহাসে বিরল নয়। সুবাদার আজিম উদ্দিন এবং দিউয়ান মুর্শিদকুলি খানের মধ্যকার বিরোধ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সুবাদার শাহজাদা আজিম-উস-শানের সাথে দিউয়ান মুর্শিদকুলি খানের দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়ায় সুবা প্রশাসনের কেন্দ্রীয় দপ্তর জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) থেকে পাটনায় স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলায় অনুপস্থিত সুবাদারি শাসনের ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল।[১২] এ সময় থেকে বাংলায় অনুপস্থিত সুবাদারের পক্ষে একজন নায়েব সুবাদার বাংলার বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করতেন। মুর্শিদকুলি খানের সুবাদারি লাভের মধ্যদিয়ে অনুপস্থিত সুবাদারি শাসনের ঐতিহ্য শেষ হয়। বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদারি একই লোকের হাতে ন্যস্ত হয়। এ কথা সুবিদিত যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভারতের মুঘলদের গৌরবোজ্জ্বল স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে এবং পরবর্তী সম্রাটদের দুর্বলতা ও প্রশাসনিক অযোগ্যতার কারণে মুঘল সাম্রাজ্য দ্রুত অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হয়। এ পটভূমিতে মুর্শিদকুলি খান প্রকৃত অর্থে বাংলার সুবাদারি শাসনকে মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, মুর্শিদকুলি খান ছিলেন আঠারো শতকের প্রথম এক চতুর্থাংশ জুড়ে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান চরিত্র। তাঁর নিজের এবং পরবর্তী উত্তরসূরী শাসকদের আমলে ভারতের ইতিহাসে বাংলা এক স্বতন্ত্রসত্তায় বিকশিত হয়। বাংলার সুবাদারি শাসন মসনদ বা সিংহাসনে পরিণত হয় এবং এতে পর্যায়ক্রমে সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭-১৭৩৯), সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০), আলিবর্দী খান (১৭৪০-৫৬), সিরাজ-উদ-দৌলাহ (১৭৫৬-৫৭) প্রমুখ অধিষ্ঠিত হন।

আইনগত ও তাত্ত্বিকভাবে মুর্শিদকুলি খান এবং উপরে বর্ণিত তাঁর উত্তরসূরী শাসকদের আমলে বাংলা দিল্লীর মুঘল সম্রাটদের সার্বভোমত্বাধীন ছিল। মুঘল সম্রাটদের এ আইনগত সার্বভৌমত্বকে বাংলার এ শাসককূল অস্বীকার করেন নি

---

[১০] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, (বাংলা সংস্করণ), খণ্ড-৪, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৫৯

[১১] প্রশাসন এবং বিচার ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত শাসন ব্যবস্থাকে একত্রে বলা হতো নিজামত শাসন।

[১২] শুরু থেকে সুবাহ বাংলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর ছিল জাহাঙ্গীরনগর। কিন্তু এখান থেকে তা পাটনায় স্থানান্তরিত হওয়ায় শুধু জাহাঙ্গীরনগর প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা হারায় নি, বাংলা ও সুবাদারের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা এখন থেকে সুবাদার বাংলার পরিবর্তে বিহারের অবস্থান করে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বলেই নিজেদের নামে মুদ্রা অঙ্কন বা খুৎবা পাঠের অধিকার চর্চা না করে বরং সম্রাটের নামেই মুদ্রা অঙ্কন করতেন।[১৩] অধিকন্তু প্রতিবছর দিল্লীতে রাজস্ব পাঠিয়ে মুঘলদের সাথে তাদের সম্পর্কের দিকটি মজবুত রাখতেন। তবে এর সবই ছিল আনুষ্ঠানিকতা। এসব আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্য স্বীকার করে নিলেও মুর্শিদকুলি খান এবং তাঁর উত্তরসূরী শাসকবর্গ প্রায় স্বাধীনভাবেই বাংলায় শাসন করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুর্শিদকুলি খান এবং তার উত্তরসূরী সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময়কাল বাংলার ইতিহাসে নবাবী যুগ নামে পরিচিত। তবে লক্ষণীয় যে, এদের কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে নবাব খেতাব গ্রহণ করেন নি। দরাবরে আগত অমাত্য ও প্রজারাও তাদের নবাব নয়, বরং নাজিম বা সুবাদার হিসেবেই জানতেন এবং সে হিসেবেই সম্মান করতেন। সমকালীন লেখক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনাতেও তাদের সাধারণত নাজিম বা সুবাদার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বস্তুত মুর্শিদকুলি খান ও তার উত্তরসূরী শাসকদের নবাব উপাধির প্রচলন করেন ইউরোপীয় বিশেষ করে, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাগণ। কোম্পানির কর্মকর্তাগণ বরাবরই নাজিমকে বুঝাতে নবাব শব্দের ব্যবহার করতেন। অবশ্য এরূপ উপাধি ব্যবহারের পেছনে তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সম্রাটের কাছ থেকে কোম্পানিসমূহ বাণিজ্যিক অধিকার ও সুবিধা আদায় সংক্রান্ত যে সব ফরমান আদায় করতেন, বাংলার শাসকরা অনেক সময় তাদের শাসিত অঞ্চলে তা প্রয়োগ করতে দিত না। এ অবস্থায় কোম্পানিগুলো আইনগত যুক্তি উপস্থাপন করত যে, বাংলার শাসকেরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়, তাঁরা মুঘল সম্রাটের নায়েব বা প্রতিনিধি। তাই তাঁরা সম্রাটের সনদ ও ফরমান মেনে চলতে বাধ্য।[১৪] পলাশির বিপর্যয়ের পর লর্ড ক্লাইভ মীরজাফরকে সরাসরি নবাব উপাধি দিয়ে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর উত্তরসূরী শাসকরাও নবাব হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন।[১৫] উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন কোম্পানি কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলার শাসকদের জন্য ব্যবহৃত নবাব অভিধাটি শেষ পর্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং মুর্শিদকুলি খান ও তাঁর উত্তরসূরীদের শাসনামল বাংলার ইতিহাসে নবাবী যুগ নামে পরিচিতি অর্জন করে।

প্রসঙ্গত অভিজাত শব্দটি সম্পর্কেও সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক। অভিজাত শব্দের ইংরেজি noble, aristocrat. আর অভিজাততন্ত্র বা অভিজাত শ্রেণী nobility, aristocracy। বস্তুত nobility ও aristocracy শব্দদ্বয় দ্বারা ইউরোপে সমগ্র আঠারো শতকে সাধারণত শাসকগোষ্ঠীর উপরের শ্রেণীকে বুঝাতো। কিন্তু উনিশ শতক থেকে সমাজের অভিজাত শ্রেণী বুঝাতে elite শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। সমাজতত্ত্ববিদ প্যারেটো (১৮৪৮-১৯২৩) ও মস্কারের লেখনীর মাধ্যমে এ অভিধাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্যারেটো ও মস্কার সমাজের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহকে বুঝানোর জন্য elite শব্দটির প্রচলন করেন। প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক যে, ক্ষমতা, প্রতিভা বা সুযোগ সুবিধার কারণে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সমাজের উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠতম বলে বিবেচিত হন। মোঃ হাবিবুর রহমানের

---

[১৩] এম এ রহিম, *Social and Cultural History of Bengal,* vol. II, Karachi (1963), মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি কর্তৃক *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খণ্ড শিরোনামে বাংলায় অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ ৯৮

[১৪] *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৪, পৃ.পৃ. ৪৫৯-৬০

[১৫] *ঐ*, পৃ. ৪৬০

মতে, ধনৈশ্বর্যের সঙ্গতিই হলো আভিজ্যাত্যের প্রধান উপকরণ। তাঁর মতে, ধনৈশ্বর্যের সঙ্গতির সাথে ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তির ও প্রাধান্যের বিষয় যুক্ত হলেই প্রকাশ পায় আভিজাত্যের অন্তর্নিহিত স্বরূপ।[১৬]

বর্তমানকালের অভিজাতন্ত্রের ধরন-ধারণ থেকে আঠারো শতকের অভিজাততন্ত্রের ধরন-ধারণের বিস্তর পার্থক্য ছিল। ক্ষমতা, উচ্চপদ ও তার সুযোগ-সুবিধা, ধনাগম, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং বাণিজ্যিক সাফল্যের মতো উপাদানগুলোর অপরিহার্যতা পূর্বাপর প্রায় অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু ঐসব লাভ করে অভিজাত হওয়ার পন্থা-পদ্ধতির মধ্যে আঠারো শতক এবং বর্তমান সময়ের পার্থক্য অনেক। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং এ থেকে মোটা অঙ্কের মুনাফা অর্জন, ব্যক্তি মালিকানায় ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা বা অন্যবিধ কোনো না কোনো উপায়ে বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হওয়া এবং তার সাথে শিক্ষা-দীক্ষা ও যশ-খ্যাতির সম্মিলন ঘটানো-ইত্যাদি হলো বর্তমান অভিজাততন্ত্রের মূলকথা।[১৭] কিন্তু আঠারো শতকের ভারতবর্ষ তথা বাংলায় অভিজাতন্ত্রের মূলকথা ছিল শাসন ক্ষমতা, শাসককের সহযোগী বা পরিষদরূপে প্রশাসনে বড় বড় পদ লাভ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ বিপুল অর্থবিত্ত ও ঐশ্বর্যের অধিকার অর্জন। এক কথায় আঠারো শতকের অভিজাতন্ত্র হলো ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনৈশ্বর্যের প্রাধান্য এবং অভিজাত শ্রেণী হলো সেই ক্ষমতা, প্রভাব ও ধনৈশ্বর্যের বাহক।

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে নবাবী শাসনামল বাংলার ইতিহাসে একটি চিত্তাকর্ষক ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পটভূমিকায় গোটা ভারতে যখন রাজনৈতিক অরাজকতা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, তার মধ্যেও নবাব শাসিত বাংলা এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেয়। এ সময় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতা বাংলাকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারেনি। অথচ এ সময় বাংলায় নানা বিপরীতমুখী শক্তির তৎপরতা দেখা যায়। পরবর্তীকালে বঙ্গ-ভারতের নিয়তির রূপরেখা দানকারী এবং বিদেশি শাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তিগুলোরও এ সময় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এতদসত্ত্বেও বাংলার নবাবদের গৃহীত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির ফলে বাংলার শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয় এবং আর্থিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। বাংলার এ উন্নতি বিধানে নবাবদের সাথে সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে শাসক শ্রেণীর উপরতলার একটি গোষ্ঠী - যারা অভিজাত শ্রেণী হিসেবে পরিচিত।

মুর্শিদকুলি খানের সুবাদারি ক্ষমতা লাভের মধ্য দিয়ে বাংলার উপর দিল্লীর প্রত্যক্ষ আধিপত্যের ইতি ঘটে এবং বাংলায় কার্যত স্বাধীন শাসন যুগের সুচনা হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু দিল্লী থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। আর এর সাথে সাথে বাংলায় ক্ষমতার বিন্যাস ও সামাজিক শক্তিকাঠামোর চেহারায়ও বেশ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ পরিবর্তন বাংলার রাজনীতি ও ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নবাবী বাংলার ক্ষমতার নতুন বিন্যাস ও রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তনে সমাজকাঠামো ও সামাজিক সংগঠনে যে পরিবর্তন দেখা যায় তার কোনো প্রভাব সমাজের নিচের তলায় অর্থাৎ সাধারণ জনগোষ্ঠীর উপর পড়েছিল বলে মনে হয় না। তাদের জীবনমান বা সামাজিক অবস্থানে কোনো মৌলিক হেরফের ঘটেনি। মৌলিক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা ঘটেছিল

[১৬] মোঃ হাবিবুর রহমান, *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাতন্ত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩

[১৭] মোঃ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

তা সমাজের উপর তলার মানুষের মধ্যে, আর এ উচ্চস্তরের জনগোষ্ঠীই অভিজাত নামে পরিচিত। প্রাক-নবাবী বাংলায় অমাত্য মনসবদাররা ছিলেন সমাজের প্রধান অভিজাত। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অমাত্য মনসবদারদের স্পষ্টত নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল। আর এ আমাত্য মনসবদাররা ছিলেন উত্তর ভারত থেকে আগত। দিল্লীর মুঘল দরবারের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগের কারণে শুধু রাজনীতি বা প্রশাসন নয় সমাজ জীবনেও তাঁরা প্রভাবশালী অভিজাত হিসেবে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন। নবাবী আমলে অমাত্য অভিজাতদের গুরুত্ব ও আধিপত্য কমে যায় নি। এ সময় নতুন ক্ষমতা বিন্যাসের যে কাঠামো তৈরি হয়, তাতে নবাবের স্থান ছিল শীর্ষে। তাকে ঘিরে অভিজাত শ্রেণীতে ছিল শাসন সহযোগী উচ্চপদাধিকারী সামরিক ও বেসামরিক অমাত্যবর্গ। এ অমাত্যবর্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নবাব পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয় পরিজনদের উপস্থিতি বজায় থাকে বটে, তবে দিল্লীর সাথে যোগাযোগ বিছিন্ন হওয়ায় অমাত্য শ্রেণীর সাংগঠনিক কাঠামোতে স্পষ্টত পরিবর্তন দেখা যায়। উত্তর ভারত থেকে মুঘল আমলাদের আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নবাব সরকার স্থানীয় জনতার সাথে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে বাধ্য হয়। সামরিক বেসামরিক আমলা শ্রেণীতে স্থানীয় বাঙ্গালীরা ঠাঁই করে নেয় এবং এ সুবাদে তাঁরাও সমাজ রাষ্ট্রে অভিজাত শ্রেণীর মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়। আর এর মধ্য দিয়ে মুঘল সুবাদারি শাসন যুগে বাধাগ্রস্ত বঙ্গীয় জাতি সত্ত্বার বিকাশক্রম পুনরায় গতি প্রাপ্ত হয়।

ইউরোপে অভিজাত বলতে বুঝাত লর্ড বা বিস্তর ভূমির অধিকারী ভূস্বামী এবং বৃহৎ পুঁজির মালিক বণিকজনকে। কিন্তু মুঘল সুবাদারী যুগে বাংলায় ভূ-স্বামী রাজা-জমিদার বিশেষ করে, শেঠ-সওদাগর শ্রেণী রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। তবে নবাবী বাংলায় নতুন ক্ষমতা বিন্যাসের প্রেক্ষিতে তাঁরা এখন নতুন শাসকগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠে এবং রাষ্ট্র ও সমাজে অভিজাত হিসেবে গণ্য হয়। ভূ-স্বামী জমিদাররা রাজধানী মুর্শিদাবাদের বাইরে নিজেদের জমিদারি এলাকায় থাকতেন। তবে তাদের অনেকের নবাব দরবারে নিয়মিত যাতায়াত ছিল এবং এদের কেউ কেউ দরবার চলাকালীন সেখানে যোগ দিতেন বলেও জানা যায়।[১৮] আঠারো শতকের নবাবী বাংলার রাজনীতি ও সেখানে সংঘটিত রাজনৈতিক পালাবদল ও বিপ্লবে এদের অনেকের সক্রিয় অংশগ্রহণ সমকালীন ইতিহাসবিদদের দৃষ্টি এড়ায়নি। একই কথা বণিক-ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নবাবের কৃপাগুনে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রমপ্রসারের ফলে আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় এ শ্রেণীটি বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয় এবং অভিজাত সামাজিক শক্তি হিসেব সমাজ কাঠামোতে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করে।[১৯] নতুন ক্ষমতা বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে অভিজাতচক্রে উঠে আসা এ শ্রেণীটিও অর্থনৈতিক গণ্ডির বাইরে নবাবী বাংলার রাজনীতি ও প্রশাসনে নিজেদের ক্ষমতা জাহিরের সুযোগ পায়।

দিল্লী থেকে এক রকমে প্রায় বিচ্ছিন্ন নবাবগণ বাংলার শাসন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, আথির্ক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের প্রয়োজনে অমাত্য, ভূ-স্বামী জমিদার ও ব্যাংকার-বণিকদের নিয়ে গড়ে উঠা অভিজাত শ্রেণীকে কাজে লাগান। আর অভিজাত শ্রেণীও নবাবের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কেননা রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাদের দায়বোধ অপেক্ষা নিজেদের ব্যক্তিগত ও ক্ষেত্রবিশেষে শ্রেণীগত স্বার্থ জড়িত ছিল। বস্তুত অভিজাত গোষ্ঠীর ক্ষমতার মূখ্য উৎস

---

[১৮] মোঃ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪

[১৯] এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত* ,পৃ.পৃ. ১২৯-১৩০

ছিলেন স্বয়ং নবাব। নবাবের দাক্ষিণ্য এবং কৃপা লাভ ছিল তাদের ব্যাক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার উপায়। তাই নবাবের আনুকূল্য লাভের জন্য তারা নবাবের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতেন। অবশ্য সব সময় যে তাদের মধ্যে এ সরল নিয়মে সম্পর্ক আবর্তিত হয়েছে তা নয়। গোটা নবাবী শাসনের ইতিহাসে এর অসংখ্য নজির রয়েছে এবং যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাস বিষয়ক রচনাসমূহে শাসিত শ্রেণী বহুলাংশে অবহেলিত হয়েছে। এরূপ বক্তব্যে অবশ্যই সত্যতা আছে। তবে এটিও সমভাবে সত্য যে, সমাজের উপর তলার- যারা অভিজাত নামে পরিচিত তাদের প্রতিও ঐতিহাসিক রচনাদিতে যথেষ্ট মনযোগ দেয়া হয়নি। বাংলার সুলতান এবং নবাবদের বহু হৃদয়গ্রাহী জীবনীগ্রন্থ এবং তাদের বংশ বিবরণী রয়েছে। নিঃসন্দেহে রাজন্যবর্গ ছিলেন শাসনকাঠামোর মূল কেন্দ্রবিন্দু। তবে অভিজাতবর্গও ছিলেন শাসকশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গশক্তি। কাজেই কোনো একটি বিশেষ কালপর্বের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস চর্চার জন্য সে সময়কার অভিজাত শ্রেণীর গঠন, তাদের বৈশিষ্ট্য ও প্রচলিত রীতি প্রবণতা, রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে তাদের ভূমিকা ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণ রাজন্যদের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক নীতির মতোই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে নবাবী আমল নামে খ্যাত বাংলার ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ ও স্বতন্ত্র কালপর্বের সমাজকাঠামো, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণীর গঠন ও বিবর্তন এবং নবাবী বাংলার রাজনীতি ও প্রশাসনে এদের ভূমিকা ও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিষয়ে অনুসন্ধানী বিচার বিশ্লেষণ ও সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মে নবাবী বাংলার সামগ্রিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ ও ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনা দাবি রাখে না এবং এতে সে প্রচেষ্টাও করা হয় নি। বস্তুত নবাবী আমলে অভিজাত শ্রেণীর সামগ্রিক দিক সম্পর্কিত বিষয়বস্তুই আমাদের মূল লক্ষ্যবস্তু। প্রসঙ্গক্রমে আরো উল্লেখ্য যে, কোনো দেশ বা কালপর্বের রাজনীতি বা প্রশাসনকে কোনোভাবেই সে দেশের সমাজ ও অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই। কেননা এগুলো পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই আলোচ্য গবেষণায় নবাবী বাংলার প্রশাসন এবং সরকার ও রাজনীতিতে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা প্রাধান্য পেলেও প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলার অর্থনীতি এবং সমাজ-সংস্কৃতিতে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা নির্ণয়ের জোরালো প্রয়াস থাকবে।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

কোনো ঐতিহাসিক কাল পর্বই আপনা-আপনি সমৃদ্ধ বা স্বয়ম্ভূ হয় না। কালের পরিক্রমায় সমাজের নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের সক্রিয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই এর বিকাশ ঘটে। সুতরাং কোনো দেশের কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক কালপর্বকে জানতে হলে কোনো কোনো সামাজিক শক্তির ক্রিয়ায় এবং প্রতিঘাতের তরঙ্গে এর উদ্ভব এবং বিকাশ, তা জানা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই যে, ইতিহাসের ধারা অবিশ্রান্তভাবে প্রবহমান। ঐতিহাসিক বিবর্তনের কোনো স্তরই স্থির ও নিস্পন্দ নয়। তাই সমাজ বিকাশের সহজ নিয়মেই ইতিহাসের রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরে ইতিহাস কোনো কোনো শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং এর গতিপথের স্বরূপ কী- এ সব নির্ণয় ও উপলব্ধির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশ, সমাজ ও কালের ইতিহাসের বিকাশধারা এবং যুগ-বৈশিষ্ট্য অনুধাবন ও উপলব্ধি

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সমকালীন ভারতের ইতিহাসে বাংলার নবাবী আমল একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক অধ্যায় এবং আঠারো শতকের ভারতের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অরাজক পরিবেশেও বাংলা ছিল এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মুর্শিদকুলি খান, আলিবর্দী খান প্রমুখ নবাবদের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় বাংলার রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনধারা সূচিত হয়েছিল আধুনিক গবেষকদের কেউ কেউ একে সমকালীন যে কোনো ইউরোপীয় দেশের পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[২০] নবাবী বাংলার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ধারায় অন্যতম নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল সামাজিক শক্তি অভিজাত শ্রেণী। কাজেই নবাবী বাংলার ইতিহাস অধ্যয়ন ও সে সময়কার যুগ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য অভিজাত শ্রেণীর গঠন ও বিকাশ এবং নবাবী বাংলার রাজনীতি ও আর্থ-সমাজিক জীবনে তাদের ভূমিকা ও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিষয়ে অনুসন্ধানী অধ্যয়ন জরুরি। আলোচ্য গবেষণার শিরোনামে নবাবী বাংলার রাজনীতি বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও সমকালীন অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি আলোচ্য গবেষণায় সমভাবে গুরুত্ব পাবে। কেননা রাজনীতিকে কোনোভাবেই অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার অবকাশ নেই।

নবাবী বাংলার ইতিহাস অধ্যয়ন ও গবেষণা হয় নি এমন নয়। এ সময়কে উপজীব্য করে বেশ কিছু মূল্যবান গবেষণা কর্ম ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং এসব গবেষেণা কর্মের বেশ কিছু পুস্তকারে প্রকাশিতও হয়েছে। এসব গবেষণা কর্ম ও গ্রন্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–Abdul Karim এর *Murshid Quli Khan and His Times*, (Dacca, 1963), K.K.Dutta এর *Alivardi and His Times*, (Calcutta, 1939), Brijen K. Gupta প্রণীত *Sirajuddaullah and the East India Company 1756-57*, (Lieden, 1966), Atul Chandra Roy রচিত *The Career of Mir Jafar Khan, 1757-65*, (Calcutta,1953), Shirin Akhter, *The Role of The Zamindars in Bengal 1707-1722*, (Dacca, 1982) ও মোঃ হাবিবুর রহমান এর *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র*, (ঢাকা, ২০০৩) ইত্যাদি। তবে এসব গবেষণা কর্ম ও পুস্তকের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এদের কোনোটি নবাবী আমলের কোনো একজন নির্দিষ্ট শাসক, কোনোটি নির্দিষ্ট ঘটনা এবং কোনোটি আবার নিদিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীকে নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত। অধিকন্তু এসব গ্রন্থের আলোচনা বহুলাংশে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই সীমিত। নবাবী বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে একটি সর্বাত্মক সমন্বিত সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন এ সব গবেষণা কর্মে স্থান পায় নি। Jadunath Sarkar সম্পাদিত *History of Bengal*, vol. II, 4th Impression (Dhaka, 2006), Muhammad Mohar Ali রচিত *History of The Muslims of Bengal*, vol. IA &IB, (K.S.A, 1985) এবং কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় রচিত *বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল)*, (কলিকাতা, ১৯০১) ইত্যাদি প্রমিত গ্রন্থও এসব সীমাবদ্ধতা পূরণ করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে এম. এ. রহিম এর *Social and Cultural History of Bengal* vol.II, (Karachi, 1963) গ্রন্থের আলোচনাকেও পর্যালোচনাধীন বিষয়বস্তু সম্পর্কে সন্তোষজনক সূত্র হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। সিরাজুল ইসলামের সম্পাদনায় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

[২০] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ -১৯৭১*, প্রথম খণ্ড,, পৃ. এগারো

থেকে প্রকাশিত *History of Bangladesh*, 3 vols. (1992) গ্রন্থে এ অভাব পুরণের কিছুটা স্বার্থক প্রয়াস রয়েছে। তবে এতে নবাবী বাংলার সামাজিক শক্তি অভিজাত শ্রেণী সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা পর্যালোচনা থাকলেও স্বতন্ত্র কোনো অধ্যয়ন নেই। কাজেই সার্বিক বিবেচনায় বলতে হয় যে, নবাবী বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী অভিজাত শ্রেণীসমূহের পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত আলোচনা এ যাবত উপেক্ষিত ও অবহেলিতই রয়ে গেছে। এরূপ বাস্তবতায় নবাবী বাংলার সামাজিক শক্তি অভিজাত শ্রেণীর গঠন, বিকাশ, অবক্ষয় ও পতন এবং রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী অধ্যয়ন ও গবেষণা সময়ের দাবি।

১.৪ গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণায় কর্মের ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য দুটি গবেষণা পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ এবং অন্যটি তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান (Analytical & Empirical)। তবে এতে বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা প্রাধান্য পেয়েছে এবং বহু জ্ঞাত বিষয়কে নতুন যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছ।

১.৫ গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য-উৎস পর্যালোচনা

'নবাবী আমলের রাজনীতি ও অভিজাত শ্রেণী: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন' শীর্ষক আলোচ্য গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তসমূহকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। (১) প্রাথমিক উৎস (Primary Source) এবং (২) দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source)। প্রাথমিক উৎসসমূহকে আবার কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে- (ক) ফারসি ভাষায় রচিত সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ, (খ) ইংরেজি ভাষায় রচিত ইতিহাস ও ভ্রমণকাহিনী, (গ) বিভিন্ন প্রশাসনিক ও ইউরোপীয় কোম্পানি বিশেষ করে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দলিল-দস্তাবেজ ও নথিপত্র এবং (ঘ) সমকালীন সাহিত্য। দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে আধুনিক ঐতিহাসিক, গবেষক ও পণ্ডিতদের ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি এবং বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি।

১.৫.১ প্রাথমিক উৎস (Primary sources)

(ক) ফারসি ভাষায় রচিত সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থাদি

ভারতে মুসলিম শাসনামলে অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থই ফারসি ভাষায় রচিত। সাধারণ বাঙালি সমাজের না হলেও ফারসি ছিল অভিজাত বাঙালি মুসলমানদের ভাষা। মুসলিম সভ্য সমাজে এ ভাষার অত্যধিক কদর ছিল। তাই সমসাময়িক ইতিহাসবিদগণ ফারসি ভাষায় ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেছেন। ফারসি ভাষায় রচিত নবাবী বাংলার ইতিহাস বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। নবাবী বাংলার ইতিহাস অধ্যয়নের প্রাথমিক উৎস হিসেবে এসব গ্রন্থ পরবর্তী ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত। আলোচ্য গবেষণায় এসব ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো:- ১. আজাদ-আল-হোসাইনি'র *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলীখানি* (১৭২৯), ২. মুনশী সলিমুল্লাহ'র *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ* (১৭৬৩), ৩. ইউসুফ আলী খান-এর *তারিখ-ই-বাঙ্গলাহ্-ই-মহাবতজঙ্গী* (১৭৬৪), ৪. করম আলী'র *মোজাফ্‌ফরনামা* (১৭৭২), ৫. গোলাম হোসেন খান তাবতবায়ি'র *সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিন* (১৭৮০), (৬) গোলাম হোসেন সলিম-এর

Dhaka University Institutional Repository

রিয়াজ-উস-সালাতিন (১৭৮০-৮১), ৭. মহারাজা কল্যাণ সিং–এর *খুলাসাত-উত-তাওয়ারিখ (১৮১২)*, ৮. বিজয় রাম–এর *দস্তুর-উল-ইনশা*, (১০) একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের *তারিখ–ই–মনসুরি* ইত্যাদি।

ইরান থেকে আগত পণ্ডিত আজাদ আল হোসায়নী সম্ভবত ১৭২৯ খ্রি. *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি* গ্রন্থটি রচনা করেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের নামে গ্রন্থের নামকরণ করেন।[২১] যদুনাথ সরকার বোম্বে সরকারের মোহাফেজখানা থেকে বাংলার ইতিহাস সংক্রান্ত অসাধারণ মূল্যবান এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেন এবং তাঁর *'Bengal Nawabs'* গ্রন্থে মাত্র ৮ পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া এটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন, যা ১৯৯৮ সালে বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি* গ্রন্থটিতে কিছু স্থানীয় ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, কিছু মূল্যবান উপদেশ এবং বিশেষভাবে গ্রন্থাকারের পৃষ্ঠপোষকের প্রভুত প্রশংসা স্থান পেয়েছে। তবে এসব বর্ণনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি বর্ণনা হচ্ছে নবাব সুজাউদ্দিন খানের শাসনামলে চট্টগ্রাম ফাঁড়ি পুনরুদ্ধার এবং বিশেষ করে ত্রিপুরা বিজয়। আলোচ্য গ্রন্থের বর্ণনা মতে, এ দুটি উল্লেখযোগ্য বিজয়ই সম্পন্ন হয়েছিল জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের দ্বারা। ত্রিপুরা জয় করে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান এর নতুন নামকরণ করেন 'রওশনাবাদ' (আলোর দেশ)।[২২] ত্রিপুরা রাজ্য বিজয়ের কাহিনীর বিশদ বিবরণী আজাদ আল হোসায়নীর গ্রন্থ ছাড়া সমসাময়িক আর কোনো গ্রন্থে নেই। সলিমুল্লাহর *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ* গ্রন্থে এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।[২৩] গোলাম হোসেন সলিমের *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থে ত্রিপুরা বিজয় সম্পর্কে আজাদ আল হোসায়নী এর বর্ণনা প্রায় হুবহু তুলে ধরেছেন।[২৪] কৈলাস সিংহের সুবিখ্যাত গ্রন্থ *রাজমালাতে* নবাবী বাহিনী কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্য বিজয়কে ১৭৩২ সালের ঘটনা বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু আজাদ আল হোসায়নীর বর্ণনা মতে, ত্রিপুরা বিজয় হয়েছিল ১৭২৯ সাল। আজাদ আল হোসায়নীর উল্লেখিত তারিখই সঠিক। কেননা তাঁর গ্রন্থটির রচনাকাল ১৭২৯ সাল। যদি ত্রিপুরা বিজয় ১৭৩২ সালে হত তাহলে এ গ্রন্থে এ ঘটনার বিবরণ থাকত না। কাজেই কৈলাস সিংহের প্রদত্ত তারিখটি সঠিক নয়।

নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলীখানি গ্রন্থে বর্ণিত অন্যান্য সব ঘটনা বাদ দিলেও নবাবী আমলে ত্রিপুরা বিজয় সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনার জন্যই ক্ষুদ্র এ পুস্তিকাটির তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতে হবে। কেননা এ গ্রন্থটি ত্রিপুরা বিজয়ের একটি প্রাথমিক প্রামাণিক উৎস হিসেবে বোদ্ধা মহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবাবী বাংলার ইতিহাসে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান নামে খ্যাত মীর্জা লুৎফুল্লাহ একজন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। শুধু নবাব

---

[২১] দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের প্রকৃত নাম মীর্জা লুৎফুল্লাহ এবং তাঁর উপাধি 'রুস্তমজঙ'। তিনি ছিলেন নবাব সুজাউদ্দিন খানের জামাতা। ১৭২৮–১৭৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম ছিলেন। যদুনাথ সরকারে বক্তব্য মতে, ১৭২৮ খ্রি. ২৯ এপ্রিল এই নায়েব-নাজিম ঢাকায় আসেন এবং পরের বছর ইরান থেকে আগত আজাদ আল হোসায়নী নামক একজন পণ্ডিত তাঁর রচিত *'নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি'* নামক গ্রন্থটি নায়েব নাজিমকে উপহার দেন। Jadunath Sarkar, (English Translation), *Bengal Nawabs,* Second reprint, The Asiatic Society, Calcutta, 1998, p. 1

[২২] Jadunath Sarkar, (English Trans.), *Bengal Nawabs,* p.9

[২৩] Salimulla, *Tarikh-i-Bangla,* English Translation by Francies Gladwin, Calcutta, 1788, pp. 141-143

[২৪] গোলাম হোসেন সলিম তাঁর গ্রন্থে এর বাইরে বলেছেন যে, ত্রিপুরা রাজাদের বাসস্থান চণ্ডিগর দুর্গ এ যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত হয়েছিল। ত্রিপুরা জয় সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে নবাব সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খাঁন দ্বিতীয় মুর্শিদকুলিকে 'বাহাদুর' এবং সেনাপতি মীর হাবিব কে 'খাঁন' উপধি দিয়েছিলে বলে সলিম উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের জামাতা হিসেবেই নয় একজন প্রভাবশালী অমাত্য অভিজাত হিসেবেও সমকালীন প্রশাসন ও রাজনীতিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তাঁর স্ত্রী দুর্দানা বেগম, জামাতা মীর্জা বাকের ইস্পাহানী এবং বিশ্বস্ত অনুচর সেনাপতি মীর হাবিব প্রমুখও নানা কারণে ইতিহাসে নিজেদের অবস্থান করে নিয়েছেন। নবাবী বাংলার এসব প্রভাবশালী অভিজাতদের ভূমিকা বিচার-বিশ্লেষণে *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলীখানি* গ্রন্থটি একটি মূল্যাবান তথ্য উৎস। ঘটনা বর্ণনায় সীমাবদ্ধতা যা রয়েছে এবং লেখক তাঁর পৃষ্ঠপোষকের যে স্তুতি বর্ণনা করেছেন, তা সমকালীন যুগের ঐতিহ্য।

ফারসি ভাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে মুন্‌শি সলিমুল্লাহ রচিত *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ* অত্যন্ত মূলবান। প্রামাণিক তথ্যাদির অভাবে সলিমুল্লাহর জীবনী সম্পর্কে বিশদ বর্ণনার অবকাশ নেই।[২৫] কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর হেনরি ভ্যান্সিটার্টের[২৬] অনুরোধ ও অনুপ্রেরণায় সলিমুল্লাহ ১৭৬৩ সালে *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ* গ্রন্থটি রচনা করেন বলে গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি ভ্যান্সিটার্টকে 'নওয়াব নাসির-উল-মুলক তাওয়াহিরজঙ, নামে অবহিত করেছেন। ভ্যান্সিটার্টের অনুরোধে রচিত হয়েছিল বলে *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ* গ্রন্থটি 'তাওয়াহির নামা' নামেও পরিচিত। ইতিহাসবিদ এস.এম. ইমামুদ্দিন সম্পাদনায় বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৭৯ খ্রি. *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহর* একটি ফারসি পাঠ প্রকাশ করে। সম্পাদক ইংরেজি ভূমিকায় গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ের অবতারণা করলেও গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপর বলতে গেলে কোনো আলোকপাতই করেন নি। ফান্সিস গ্লাডউইন (মৃঃ ১৮১৩)[২৭] *A Narrative of the Transactions in Bengal* শিরোনামে এর ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং কলিকাতা থেকে ১৭৮৮ সালে তা প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সিসের অনুবাদটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এবং এর গুণগত মান সম্পর্কেও প্রশ্ন রয়েছে। আ.কা.মো. যাকরিয়ার মতে, গ্লাডউইনের অনুবাদ প্রমাদপূর্ণ ও মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়।[২৮] সুবাদার ইব্রাহিম খান (১৬৮৯-৯৭ খ্রি.) থেকে নবাব আলিবর্দী খান (১৭৪০-৫৬ খ্রি.) পর্যন্ত বাংলার ছয় জন শাসকের ৬০ বছরের শাসনামলের ইতিহাস স্থান পেয়েছে *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ* গ্রন্থে। বাংলায় নবাবী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি খানের জীবনী ও শাসনকালের পূর্ণাঙ্গ বিবরণদানকারী গ্রন্থগুলোর মধ্যে *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ* হল প্রাথমিক উৎস।[২৯] সাকী মুস্তাদ খানের রচিত *মাসির-ই-আলমগীরী* (১৮৭১), নিয়ত খানের *বাহাদুরশাহ নামা*, ইরাদত খান

---

[২৫] *Shigarf Namah* গ্রন্থের রচয়িতা ইতিশামউদ্দিন পাঞ্চনুরির তথ্যমতে, সলিমুল্লাহ ১৭৫৭-৬০ ও ১৭৬৩-৬৫ সময়কালে নবাব মীর মোহাম্মদ জাফর খানের দরবারে মুন্‌শি (The ward Munshi means a Clerk, a Teacher or Draftsman. S M Imamuddin, (ed.), *Tarikh i-Banglah* (Persian Text), p. XXVI) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মাঝখানে তিনি কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর হেনরি ভ্যান্সিটার্টের মুন্‌শি হিসেবে কাজ করেন এবং তাঁরই অনুরোধ ও অনুপ্রেরণায় সলিমুল্লাহ ১৭৬৩ সালে *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ* গ্রন্থটি রচনা করেন।

[২৬] হেনরি ভ্যান্সিটার্ট ছিলেন একজন প্রাচ্য ভাষাবিদ। প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ভ্যান্সিটার্টের আরবি ও ফারসি ভাষায়ও যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। ইতিহাস অনুরাগী এ পণ্ডিত হাফতি'র *লায়লা মজনু* এবং মুহাম্মদ সাকী'র *তারিখ-ই-আলমগিরী* গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেন। *A Narrative of the Transactions in Bengal from 1760 to 1764,* 3 Vols. গ্রন্থটি তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

[২৭] প্রখ্যাত সাংবাদিক ফ্রান্সিস গ্লাডউইন ছিলেন *Calcutta Gazette* এর সম্পাদক। তিনি ফোর্টউইলিয়াম কলেজের ফারসি ভাষার প্রথম অধ্যাপকও ছিলেন। গ্লাডউইন আবুল ফজলের বিখ্যাত *আইন-ই- আকবরী* গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ ছাড়াও বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতা।

[২৮] ইউসুফ আলী খান, *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-মহাবতজঙ্গী*, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. চব্বিশ

[২৯] Salimulla, *op. cit.* pp. 30-34

Dhaka University Institutional Repository

মুবারক উল্লাহর *তারিখ-ই-ইরাদত খান*, মীর্জা মুহম্মদের *ইবরতনামা* এবং খাফি খানের *মুন্তাখাব-উল-লুবাব* প্রভৃতি গ্রন্থে মুর্শিদকুলী খান সম্পর্কে খুব অল্প তথ্য পাওয়া যায়। এসব গ্রন্থে মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের ঘটনাবলি আলোচনাকালে প্রাসঙ্গিকভাবে মুর্শিদকুলি খান সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শাহনেওয়াজ খানের *মাসির-উল-উমারা* (১৯১১)। এটি মুর্শিদকুলি খানের প্রাথমিক জীবনী সম্পর্কিত একমাত্র উৎস। অবশ্য এতে তাঁর শাসনকাল সম্পর্কিত বর্ণনা নেই। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি রচিত *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ* সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পরবর্তী মুঘলদের বিষয়ে একটি সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। তবে বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক জায়গায় মুর্শিদকুলি খানের নামোল্লেখ থাকলেও এ গ্রন্থে নবাবী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে কোনো পৃথক আলোচনা নেই। একই অবস্থা করম আলী খানের *মোজাফ্ফরনামা* ও ইউসুফ আলী খানের *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী* গ্রন্থেরও। এ অবস্থায় মুর্শিদকুলি খানের জীবনী ও শাসনকাল সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ আলোচনার বিষয়ে *তারিখ-ই-বাঙ্গালা* একটি প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে।

তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ গ্রন্থে আলিবর্দী খানের রাজত্বকাল পর্যন্ত মুখ্যত বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বাংলার রাজনীতিতে আলিবর্দী খান, হাজী আহম্মদ, জগৎশেঠ প্রমুখের উত্থান, সরফরাজ খান ও আলিবর্দী খানের মধ্যকার সংঘাত সংঘর্ষ, বাংলায় মারাঠা আক্রমণ ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তবে সমকালীন এ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটিতে বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রমোত্থান সম্পর্কিত বিবরণ অনুপস্থিত। পলাশির বিপ্লবসহ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ রাজত্বকালের কোনো ঘটনাই এ গ্রন্থে স্থান পায়নি। যদিও গ্রন্থটি পলাশির আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার ছয় বছর পরে রচিত। পলাশির বিপ্লবের পর ইংরেজ রাজত্বের সূচনা লগ্নে রচিত সমসাময়িক সকল ইতিহাসে এ ঘটনা বিশেষ গুরুত্বসহ বর্ণিত হয়েছে এবং গ্রন্থাকারগণ ইংরেজদের কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের বর্ণনায় সিরাজ চরিত্র হননে যেখানে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন, সেখানে *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ* গ্রন্থে এ ঘটনার বিবরণী একবারেই অনুপস্থিতির বিষয়টি নিঃসন্দেহে কৌতূহলুদ্দীপক। খুব সম্ভবত এই ঐতিহাসিক ফরমায়শি ইতিহাস রচনায় এবং অন্যদের মত ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহ লাভে লালায়িত ছিলেন না বলে ইচ্ছা করেই তিনি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার রাজত্বকালের ইতিহাস রচনার কাজটি বাদ দিয়েছিলেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ* নবাবী বাংলার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান উৎস। মুর্শিদকুলি খানের রাজত্বের পুর্ণাঙ্গ বিবরণসহ আলিবর্দী খান পর্যন্ত নবাবদের শাসনমালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এতে বিধৃত হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহই গ্রন্থটির মূল উপজীব্য হলেও এ গ্রন্থে আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপাদান বিশেষ করে পর্যালোচনাধীন অভিজাত শ্রেণী সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য ইতোবিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যগুলো ব্যবহারে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা গ্রন্থটি রচনায় গ্রন্থাকার সরকারি নথিপত্র ব্যবহার অপেক্ষা তাঁর স্মৃতিশক্তি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং প্রচলিত জনশ্রুতি ও বিবরণের উপরই অধিকতর নির্ভর করেছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। গ্রন্থকার ঘটনা বর্ণনায় সন তারিখের ব্যবহার খুবই কম করেছেন। এ গ্রন্থের ঘটনাবলির সময়ানুক্রমিক বিন্যাসেও ত্রুটি লক্ষণীয়। তাছাড়া তাঁর অনেক বর্ণনায় স্ববিরোধিতার বিষয়টিও স্পষ্ট। যথাস্থানে এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। তবে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও *তারিখ-ই-*

Dhaka University Institutional Repository

বাঙ্গালাহকে নবাবী বাংলার ইতিহাসের মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য, বাস্তব ও নিরপেক্ষ সবচেয়ে মূল্যবান প্রাথমিক উৎস হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

নবাবী বাংলার ইতিহাস অধ্যয়নের আরেকটি প্রাথমিক ফারসি উৎস ইউসুফ আলী খানের (১৭২০-৮০/৮১ সাল) *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী*। সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ ইতিহাসবিদ ইউসুফ আলী খান[৩০] ১৭৬৩-৬৪ সালে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি মূলত নবাব আলিবর্দী খানের রাজত্বের ইতিহাস। আলিবর্দী খানের জীবনের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বর্ণনায় গ্রন্থাকার নবাব সুজাউদ্দিন খান ও নবাব সরফরাজ খানের রাজত্বকালের কিছু বিচ্ছিন্ন ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সম্পর্কেও তাঁর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। আলিবর্দী খানের প্রাথমিক জীবন, তাঁর শাসন ক্ষমতা দখল ইত্যাদি বিষয়ে মোটামোটি বিস্তারিত বর্ণনা আছে আলোচ্য গ্রন্থে। বাংলায় মারাঠা আক্রমণ ও নবাব আলিবর্দী খানের সাথে তাদের সুদীর্ঘ এক দশকের বেশি সময়ের সংঘাত-সংঘর্ষ এবং নবাবের বিরুদ্ধে আফগানদের বিদ্রোহের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন ইউসুফ আলী খান। এ ক্ষেত্রে *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ*, *মোজাফফরনামা* বা *রিয়াজ-উস-সালাতিনের* বর্ণনায় ইউসুফ আলী খানের বর্ণনার অর্ধেক তথ্যও সন্নিবেশিত হয় নি। শুধু ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্যই নয়, নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকেও ইউসুফ আলী খানের বর্ণনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তিনি ছিলেন এসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। কাজেই তাঁর বর্ণনা অভিজ্ঞতাপ্রসুত ও প্রমাণভিত্তিক। এ কারণে *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ* গ্রন্থের রচয়িতা গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি এসব ঘটনার বর্ণনায় ইউসুফ আলী খানের রচনা থেকে বহু উপকরণ গ্রহণ করেছেন। আবদুস সোবাহনের মতে, "on many occasions, Gulam Hussain has copied the work word to word."[৩১] মারাঠা আক্রমণ এবং আফগান বিদ্রোহের ঘটনা বর্ণনায় গোলাম হোসেন খানের ইউসুফ আলী খানকে অনুসরণ বিষয়ে কে.কে. দত্তও প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[৩২]

আলিবর্দী খানের রাজত্বের বিভিন্ন ঘটনার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা উপস্থাপন করলেও অনেক ঘটনার বর্ণনায় বিশেষ করে নবাবের চরিত্র মূল্যায়নে গ্রন্থাকারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন করার অবকাশ রয়েছে। নবাব আলিবর্দী খানের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য তিনি অন্যের চরিত্র হনন বা অলিবর্দী খানের কৃত অপকর্মের দায়ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা স্পষ্ট। নবাব আলিবর্দী খানের ব্যাপারে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ব্যাপারে ইউসুফ আলী খান মোটেই উদারতার পরিচয় দেননি। সিরাজের চরিত্রের ত্রুটি অনুসন্ধান ও বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর উদ্যমের সীমা ছিল না। গ্রন্থাকার সিরাজ-উদ-দৌলাকে কাপুরুষ, উগ্র, অহংকারী এ চরিত্রহীন যুবক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু রাজদ্রোহী মীর জাফরসহ নবাবের উমরাহদের মধ্যে যারা দিনের পর দিন

[৩০] ইউসুফ আলী খান ছিলেন নবাব সরফরাজ খানের জামাতা এবং নবাব আলিবর্দী খানের সভাসদ ও নবাবের কর্মজীবনের প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাঁর পিতার নাম গোলাম আলী খান। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, গোলাম আলী খান ছিলেন নবাব আলিবর্দী খানের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং নবাবের বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন সেনাপতি। *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন* এর তথ্য মতে, গোলাম আলী খান কিছুকাল আজিমাবাদ প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবয়ি, *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন*, প্রথম খণ্ড, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬,পৃ. ৪৬৬)

[৩১] Yusuf Ali Khan, *The Tarikh-i-Bangla-i- Mahabatjangi,* (Persian Text) Edited by Abdus Subhan, The Asiatic Society, Calcutta, 1969, p.4

[৩২] K.K. Datta, *Alivardi and His Times,* University of Calcutta, 1939, p. 278

চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে নিজেদের স্বার্থে বাংলাকে বিদেশিদের হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেন তাদের সম্পর্কে তিনি তেমন কিছু বলেন নি। পলাশির ষড়যন্ত্রে জগৎশেঠের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে একটি বাক্যও দেখা যায় না। পলাশির ষড়যন্ত্রে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকা সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট নয়। সমসাময়িক অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতো তিনিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষেই কথা বলেছেন।[৩৩] গ্রন্থাকার পলাশির যুদ্ধ নামক প্রহসনের মাধ্যমে বাংলার বৈধ নৃপতিকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য কুচক্রী অভিজাতদের নিন্দা না করে বরং উল্টো নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে সব কিছুর জন্য দায়ী করে তাঁরই নিন্দা করেছেন। গ্রন্থাকারের এরূপ পক্ষপাতমূলক মনোভাব এ গ্রন্থের মানকে নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ন করেছে। সিরাজ-উদ-দৌলার রাজত্বকালের ইতিহাস বর্ণনায় গ্রন্থাকার তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক আর কোনো ফারসি গ্রন্থে এ ঘটনার বর্ণনা নেই। একমাত্র আলোচ্য গ্রন্থেই এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত অথচ পরিষ্কার বর্ণনা আছে।[৩৪]

সমকালীন অন্য অন্যান্য গ্রন্থের মতো *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী* গ্রন্থটিও একটি রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থ। তবে সুসংহতভাবে না হলেও আলোচ্য গ্রন্থে বর্তমান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য রয়েছে।

উপরে বর্ণিত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতার কথা বাদ দিলে *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গীর* বর্ণনা মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য বলা যায়। বস্তুত বাংলার ইতিহাসের প্রামাণ্য বিবরণের জন্য আলোচ্য গ্রন্থটি বিশেষভাবে মূল্যবান। এ প্রসঙ্গে কে.কে.দত্তের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "This work stands unique as a store house of valuable historical details, gathered by the auther from personal observation and experience."[৩৫] এ গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকারও অনুকূল মতামত দিয়েছেন।[৩৬] আর এসব কারণেই *মোজাফফরনামা* ও *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন* গ্রন্থের রচয়িতাগণ ইউসুফ আলী খানের বিবরণী নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। বাংলার ইতিহাসের এ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির ইংরেফজ অনুবাদ করেন স্যার যদুনাথ সরকার। ১৯৫২ সালে *Bengal Nawabs* গ্রন্থে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি অনুবাদটি প্রকাশ করে। আব্দুস সোবহান গ্রন্থটির ফার্সি পাঠ সম্পাদনা করেন এবং ১৯৬৯ সালে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক তা প্রকাশিত হয়। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেন এবং ১৯৯৭ খ্রি. বাংলা একাডেমী, ঢাকা তা প্রকাশ করে।

করম আলী খান (জন্ম ১৭৩৬ খ্রি.)[৩৭] রচিত *মোজাফ্ফরনামা* বাংলার ইতিহাসের অন্যতম উৎস। ১৭৫৭ সালে বাংলার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর করম আলী বাংলার নায়েব নাজিম (১৭৬৫-৭২ খ্রি.) সৈয়দ মুহাম্মদ রেজা খান

---

[৩৩] ইউসুফ আলী খান, *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-মহাবতজঙ্গী* (বাংলা অনুবাদ), পৃ. ১৭৩

[৩৪] ইউসুফ আলী খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭

[৩৫] K.K. Datta, *Alivardi and His Times*, p. 278

[৩৬] Jadunath Sarkar, (English Translation.), *Bengal Nawabs*, p. 80

[৩৭] মাতৃকুলের দিক থেকে তিনি ছিলেন নবাব আলিবর্দী খানের আত্মীয়। আলিবর্দী খান যখন বিহারের নায়েব নাজিম তখন তাঁর আমন্ত্রণে গ্রন্থাকারের পিতা (নাম জানা যায় নি) দিল্লী থেকে পাটনায় আসেন এবং হাজী আহমদের সুপারিশক্রমে বর্ধমান চাকলার ওয়াকিয়া নবিশ পদে চাকুরী লাভ করেন। আলিবর্দী খানের ঘনিষ্ট আত্মীয় হিসেবে গ্রন্থকার করম আলী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং মাত্র ১২ বছর বয়সে ঘোড়াঘাটের ফৌজদার নিযুক্ত হন। নবাব আলিবর্দী খানের রাজত্বকালের শেষ পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। একবার তিনি নবাবের অনুমতি

মোজাফফর জঙের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৭২-৭৩ সালে আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করে পৃষ্ঠপোষকের নামানুসারে গ্রন্থটির নামকরণ করেন *মোজাফ্ফরনামা*। করম আলী তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে ১৭২২ খ্রি. থেকে বাংলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সময় বাংলার নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি খান। কিন্তু দু'একবার নামোল্লেখ ছাড়া মুর্শিদকুলি খান এবং তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে করম আলী কোনো বর্ণনাই দেন নি। নবাব সুজাউদ্দিন খান ও নবাব সরফরাজ খান সম্পর্কেও তাঁর আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এ গ্রন্থের প্রায় সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে নবাব আলিবর্দী খানের রাজত্বকালের বর্ণনা। ইউসুফ আলী খানের মত তিনিও আলিবর্দী খান ও তাঁর আত্মীয় পরিজনের গুণগান করেছেন। তবে ব্যতিক্রম হলো তিনি অলিবর্দী খান ও তাঁর পরিজনদের দোষ- ক্রটির কথাও বলেছেন। সরফরাজ খানের সাথে বিরোধের সময় আলিবর্দী খান সৈন্যদের আনুগত্য আদায়ের জন্য নবাব সরফরাজ খানের নামে একটি জাল চিঠি তৈরি করে সৈন্যদের সামনে তা তুলে ধরে যে নীচুতার পরিচয় দেন, করম আলী তা উল্লেখ করেছেন।[৩৮] নিরাপরাধ রিসালাদার রসালসিং এবং ঘসেটি বেগমের দিউয়ান হোসেনকুলি খানের হত্যার ব্যাপারে আলিবর্দী খানের সম্পৃক্ততার কথা স্পষ্ট করে বলতেও গ্রন্থাকার কোনো দ্বিধা করেন নি।[৩৯]

সিরাজ-উদ-দৌলার রাজত্বকালের বর্ণনার ব্যাপারে ঐতিহাসিক হিসেবে করম আলী প্রশংসার দাবিদার। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে মীর জাফর, রায়দুর্লভ প্রমুখ অভিজাত অমাত্যদের ষড়যন্ত্রের কথা তিনি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে বণিক অভিজাত জগৎশেঠের সম্পৃক্ততার কথাও তাঁর বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। পলাশির ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের ভূমিকাও তিনি চিহ্নিত করেছেন।[৪০] দেশীয় চক্রীদের ষড়যন্ত্র ও ইংরেজদের সাথে তাদের যোগসাজশের ফলেই যে ইংরেজরা নবাবকে পরাজিত করে বাংলা দখল করতে পেরেছিল সে কথাও স্পষ্ঠভাবে এ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার চরিত্র চিত্রণে করম আলী তাঁর সততা ও বস্তু নিষ্ঠতা মোটেই রক্ষা করতে পারেনি। সমসাময়িক ইতিহাসবিদদের মত তিনিও সিরাজ চরিত্র অঙ্কনে তাঁর চরিত্রের কদর্য দিকই বেশি করে তুলে ধরেছেন। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, পরিকল্পিতভাবে তিনি সিরাজ-উদ-দৌলাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। তবে এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নবাবী বাংলার ইতিহাসের উৎস হিসেবে *মোজাফ্ফরনামা* বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এ গ্রন্থে সামাজিক ইতিহাসেরও কিছু উপাদান বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। যা নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্যবৃদ্ধি করেছে।

সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন আঠারো শতকে সংকলিত একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ। মুসলিম ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন* একটি সুবিশাল পরিধিবহুল গ্রন্থ। হাকিম আবদুল মজিদ এর ফারসি পাঠ সম্পাদনা করেন এবং ১৮৩৩ সালে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি তিন খণ্ডে তা প্রকাশ করে। তবে তার পূর্বেই বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের আগ্রহে মঁশিয়ে রেমন্ড

ছাড়াই পুর্ণিয়ায় চলে যান এবং সেখানকার শাসনকর্তা সওলাত জঙ্গ তাকে রাঙ্গামাটির ফৌজদার নিযুক্ত করেন। ১৭৫৬ খ্রি. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কর্তৃক তিনি পদচ্যুত হন।

[৩৮] করম আলী, *মোজাফ্ফরনামা*, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃপৃ.৩২-৩৩

[৩৯] করম আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃপৃ ৮৬-৯৩

[৪০] করম আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃপৃ ১১৫-১২৮

Dhaka University Institutional Repository

(M. Raymond) নামক একজন ফরাসি পণ্ডিত 'হাজী মোস্তাফা' ছদ্মনামে গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং ১৭৮৯ সালে কলকাতা থেকে তা প্রকাশিত হয়। অনুবাদক 'নোটা মনাস' (Nota Manus) ছদ্মনামে গ্রন্থটি হেস্টিংসের নামে উৎসর্গ করেন।

সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরিন-এর মুখবন্ধে গ্রন্থাকার দাবী করেছেন যে, এ গ্রন্থে তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন সবই যথাযথভাবে ও সততার সাথে লিপিবদ্ধ এবং কোনো প্রকার বিদ্বেষ, ভীতি, প্রীতি বা অনুগ্রহের বশবর্তী না হয়ে সব কিছু নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন।[৪১] গ্রন্থকারের বক্তব্যে একজন সত্যসন্ধানী, ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রকৃত ইতিহাসবিদের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বস্তুত নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় গ্রন্থাকারের অনেক সুযোগ ছিল। দিল্লী, আজিমাবাদ ও মুর্শিদাবাদ দরবারের সাথে তাঁর পিতা, তাঁর আত্মীয় স্বজন এমন কি তাঁর নিজেরও ঘনিষ্ট সংযোগ থাকায় ইতিহাস রচনার সব রকম উপাদান সংগ্রহ করা তাঁর জন্য ছিল অনেক সহজ।[৪২] তৎকালীন রাজনীতিতে নিয়ামক ভূমিকা পালনকারী অনেক অভিজাত ব্যক্তির সাথে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক এবং কর্মসূত্রে তিনি পুর্ণিয়া, আজিমাবাদ ও মুর্শিদাবাদের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে ভাল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ফলে তিনি তাঁর গ্রন্থে তথ্য সন্নিবেশনে সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি সফল হয়েছেন। তবে তথ্য বিশ্লেষণে তাঁর নিরপেক্ষতা বা ঐতিহাসিক সততা সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে।

ইংরেজি অনুবাদ অনুসারে সিয়ারের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৭০৭-১৭৪৫ সাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এ খণ্ডেই মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রায় স্বাধীন নিযামত প্রতিষ্ঠাকারী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবদের রাজত্বের বিস্তারিত বিবরণ আছে। তবে এ গ্রন্থেও নবাব সরকারের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর ঘটনা বহুল রাজত্বকাল সম্পর্কে । বর্ণনা নিতান্তই অপ্রতুল। গ্রন্থটির এ সীমাবদ্ধতা নিঃসন্দেহে গবেষকদের জন্য পীড়াদায়ক। মুর্শিদকুলী খান ছাড়া অন্যান্য নবাবদের শাসনকাল সম্পর্কে সিয়ারের বর্ণনা সমসাময়িক যে কোনো গ্রন্থের তুলনায় অধিক বিস্তারিত।[৪৩] তবে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণিত ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে। মুখবন্ধে গ্রন্থকার দাবি করেছেন যে, তিনি নিরপেক্ষভাবে ও সততার সঙ্গে ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাঁর এ দাবির সত্যতা মেলে না। আলিবর্দী খান ও তাঁর দুই জামাতা নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান ও সৈয়দ আহমদ খানের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল সুস্পষ্ট। শেষোক্ত দুজনের যে কোনো ত্রুটির কথা যথাসম্ভব ঢেকে রাখতে তিনি সর্বদা চেষ্টা করেছেন। আলিবর্দী খানের প্রতি

---

[৪১] উদ্ধৃতি এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.চব্বিশ

[৪২] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ির পূর্বপুরুষ এবং আত্মীয় স্বজন এমনকি তিনি নিজে ছিলেন শাহী প্রশাসনের একজন অভিজাত অমাত্য। তাঁর পিতা সৈয়দ হেদায়েত আলী খান ছিলেন শাহজাদা আলী গহর (পরে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম, ১৭৫৯-৯৩ খ্রি.) এর প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নানা সৈয়দ জয়নাল আবেদিন ছিলেন নবাব আলিবর্দী খানের মামাতো ভাই। গ্রন্থাকারের ভাই সৈয়দ আলী খান ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর ছোট বোনের স্বামী। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাঁর আপন মামা সেনাপতি সৈয়দ আবদুল আলী খানের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি নিজে বিভিন্ন সময়ে নবাবী প্রশাসনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরী করেন এবং নবাব মীর কাসিমের পতনের পর ইংরেজ পক্ষে যোগ দেন।

[৪৩] গোলাম হোসেন তবাতবয়ির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য জানা যায় না। তিনি নিজের এবং পরিবার পরিজনদের সম্পর্কে সিয়ারে অনেক কথা বললেও নিজের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি। তবে অবস্থা দৃষ্টি একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তিনি অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। আরবী ভাষায় তাঁর পারঙ্গমতা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে না আসা গেলেও ফার্সি ভাষা ও কাব্যে তাঁর যে অসাধারণ দখল ছিল তা বলা বাহুল্য। *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন* এর প্রতি ছত্রেছত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অতিপ্রীতির কারণে তাঁর রাজত্বের ইতিহাস বর্ণনায়ও অনেক ক্ষেত্রে তিনি বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারেননি। পরবর্তী আলোচনায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

আলিবর্দী খানের প্রতি সৈয়দ গোলাম হোসেনের অশেষ প্রীতি থাকলেও তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজ-উদ- দৌলার প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল প্রকট। সমসাময়িক সকল ঐতিহাসিকের মত তিনিও সিরাজ চরিত্র অঙ্কনেন নিরপেক্ষতা, সততা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারেন নি। সিয়ার পাঠে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, গ্রন্থকার সিরাজ চরিত্র রূপায়ণে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই পূর্বাহ্নেকৃত একটি বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁর লেখনি চালিয়ে গেছেন। তাঁর বর্ণনা মতে, সিরাজ ছিল মানব জাতির কলঙ্ক, নররূপী পশু। তাঁর বর্ণনাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য, তিনি শুধু অসত্য তথ্যের আশ্রয় নেননি, অনেক স্ববিরোধী মন্তব্যও করেছেন।[৪৪]

সৈয়দ গোলাম হোসেন খান ব্যক্তি জীবনে সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থান্বেষী ছিলেন। তাঁর মধ্যে যুগের সাথে তাল মেলানোর অভ্যাস ছিল স্পষ্ট। এ কারণে বঙ্গ-ভারতে উদীয়মান রাজশক্তি ইংরেজদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ও আনুগত্য ছিল। বস্তুত নবাব মীর কাসিমের পতনের পর গ্রন্থাকার কপর্দকহীন অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। এ অবস্থা থেকে ইংরেজ প্রভুদের কৃপায় তিনি অশেষ সম্পদ ও সীমাহীন সুখ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। প্রতিদানে ইংরেজদের উদ্দেশ্য সাধনে নিজের বিবেক বিসর্জন দিতে তিনি কুন্ঠাবোধ করেন নি। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান সিয়ার গ্রন্থের বহু স্থানে সত্যভাষণ, ন্যায়নিষ্ঠতা, বস্তুনিষ্ঠতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি সমন্ধে অনেক দার্শনিক তত্ত্ব কথা বলেছেন এবং তিনি নিজে এসব গুণাবলির অনুসারী বলে দাবি করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংরেজদের অনুগ্রহ লাভের আশায় তাদের প্রবল শত্রু সিরাজের প্রতি গ্রন্থাকার মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন। অথচ ইংরেজরা যে অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে একটি স্বাধীন দেশের বৈধশাসন কর্তাকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করলেন সে জন্য তিনি তাদের নিন্দা করেন নি। বরং তিনি নতুন প্রভূ ইংরেজদের স্বাগত জানিয়েছেন। যতই ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অন্যায় হোক না কেন তাদের প্রতিটি কাজ সমর্থন করেছেন এবং তাদের অহেতুক প্রশংসা করেছেন।[৪৫] বস্তুত জাতির স্বার্থ অপেক্ষা গোলাম হোসেনের কাছে তাঁর নিজের স্বার্থ বড় ছিল বলেই তিনি এরূপ ঘৃণ্য কাজ করতে দ্বিধা করেন নি।

সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবাতবায়ির সংকীর্ণতা ও দুর্বলতা এবং এ কারণে তাঁর বর্ণনার বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলেও *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ* নিঃসন্দেহে সমসাময়িকালের ইতিহাসের একটি বিরাট তথ্যভাণ্ডার। শুধু রাজনৈতিক নয় সমসাময়িক বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এ গ্রন্থের বিশেষ মূল্য রয়েছে। নবাবী বাংলার সামাজিক শক্তিসমূহের বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ এবং সমকালীন রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে তাঁদের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে কোনো স্বতন্ত্র বিবরণ এ গ্রন্থে নেই, তবে ঘটনার ক্রমবর্ণনায় প্রাসঙ্গিকভাবে সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি এ সব বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তাঁর বর্ণিত এ সব বিষয়ে মতভিন্নতার অবকাশ রয়েছে, তবে তথ্য হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আর এ কারণেই বর্তমান

---

[৪৪] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন*, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, দিব্য প্রকাশ .ঢাকা, ২০০৬, পৃপৃ.৪৬৫-৬৬

[৪৫] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন* (বাংলা অনুবাদ),পৃ.৪৬৫-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় সমকালীন ফারসি ইতিহাস গ্রন্থসমূহের মধ্যে তথ্য সরবরাহকারী উৎস হিসেবে *সিয়ার-উল-মতাখ্‌খিরিণ* সবচেয়ে আবশ্যক তথ্য সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলার ইতিহাসের এ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি ইংরেজি অনুবাদের প্রথম খণ্ড আবদুল কাদির বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক তা প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি মূল ফার্সি পাঠের প্রথম খণ্ডের মাঝামাঝি থেকে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পর্যন্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ইতিহাস সম্বলিত অংশটুকু আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বাংলায় অনুবাদ করেছেন। ২০০৬ সালে ঢাকার দিব্য প্রকাশ থেকে এ অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলার ইতিহাসের অন্যতম প্রাথমিক উৎস গোলাম হোসেন সালিমের *রিয়াজ-উস-সালাতিন*।[৪৬] গোলাম হোসেন ছিলেন ইংরেজদের মালদাহ কুঠির তত্ত্বাবধায়ক ইতিহাস অনুরাগী সুপণ্ডিত জর্জ উডনী (Gorge Udny) এর ডাক মুন্‌শী। তাঁর অনুরোধে এ গ্রন্থটি রচনা করেন বলে গ্রন্থাকার নিজেই লিখেছেন এবং এটি যে সংকলন গ্রন্থ সে কথাটিও অকপটে স্বীকার করেছেন।[৪৭] বস্তুত গোলাম হোসেন তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ, প্রচলিত জনশ্রুতি ও নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থটি সংকলন করেন। এতে ইখতিয়ার উদ-দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বঙ্গবিজয় থেকে পলাশি পরবর্তী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের প্রথম দিক পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা স্থান পেয়েছে। ইবনে বখতিয়ার খলজী থেকে নবাবী আমলের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের যে ইতিহাস এ গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, তাতে ঘটনা বর্ণনায় লেখক ইতিহাসের মূল কাঠামো রক্ষা করেছেন। তবে বর্ণিত ইতিহাসের নির্ভরযোগ্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা প্রশ্নাতীত নয়। এ অংশে লেখক ঘটনার বর্ণনায় অনেক অবান্তর কথা ও গাল-গল্পের অবতারণা করেছেন। তবে নবাবী আমলের ইতিহাস বর্ণনায় বিশেষ করে নবাব সুজাউদ্দিন খান, নবাব সরফরাজ খান ও নবাব আলিবর্দী খানের রাজত্বের বর্ণনায় বস্তনিষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায়। নবাবী বাংলার আলোচ্য অংশের ইতিহাস বর্ণনায় গোলাম হোসেন সম্ভবত তাঁর পূর্বে রচিত *তারিখ-ই-বাঙ্গালা* গ্রন্থের অনুসরণ করেছিলেন। দুটি গ্রন্থের বর্ণনায় প্রায় ক্ষেত্রে হুবহু মিল দেখেই এ বিষয়টি বোঝা যায়। যদিও গ্রন্থাকার তাঁর লেখার কোথাও ব্যবহৃত সূত্রের উল্লেখ করেন নি। *তারিখ-ই-বাঙ্গলায়* সিরাজ-উদ-দৌলা ও তাঁর পরবর্তী নবাবদের শাসনামলের বর্ণনা নেই। তবে রিয়াজে সে বর্ণনা রয়েছে। সিরাজ-উদ- দৌলার রাজত্বকাল বর্ণনায় গোলাম হোসেন সলিম মূলত *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী* ও *মোজাফ্‌ফরনামা* প্রভৃতি গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। ফলে উক্ত দুটি গ্রন্থের ন্যায় সিরাজ-উদ-দৌলার রাজত্বকাল সম্পর্কে তাঁর বর্ণনাও

---

[৪৬] গোলাম হোসেনের পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। লেখক তাঁর গ্রন্থের সূচনায় যে, আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর নাম গোলাম হোসেন এবং উপাধি সলিম জৈদপুরী। এ সূত্রধরে হেনরী বেভারিজ গোলাম হোসেনকে আযোধ্যবাসী বলে আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এ মত খণ্ডন করেছেন। রিয়াজের বর্ণনার সূত্রধরে মৈত্রেয় উল্লেখ করেছেন যে, জর্জ উডনীর অধীনে নিযুক্তি লাভের দুই বছরের মধ্যে গ্রন্থটি লিখিত হয়েছিল। লেখক অযোধ্যাবাসী হলে এই অল্প সময়ের মধ্যে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানদের আচার-আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। কাজেই তিনি বাঙালি ছিলেন না এমত গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত তিনি মালদাহর অধিবাসী ছিলেন বলে অন্যসূত্র থেকে জানা যায়।

[৪৭] গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত রিয়াজের প্রথম বাংলা অনুবাদ, কলকাতা, ১৩১২ বাং, প্রথম দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ.২৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নাতীত নয়। সিরাজকে তিনিও 'খল' চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।[৪৮] পলাশির যুদ্ধের জন্য তিনি সিরাজকে দায়ী করেন। লেখকের ইংরেজ প্রীতির বিষয়টিও তাঁর আলোচনায় স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে।[৪৯] উল্লেখ্য যে, পলাশির ষড়যন্ত্রে জগৎশেঠের সম্পৃক্ততায় কথাটি তিনি এড়িয়ে গেছেন। তবে সিরাজের হত্যাকাণ্ডে জগৎশেঠের প্ররোচনা দানের বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন।[৫০] যা পলাশির চক্রান্তে জগৎশেঠের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করে। তাছাড়া এ তথ্যটি সমসাময়িক অন্য কোনো গ্রন্থে দেখা যায় না।

রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থ রচনায় গোলাম হোসেন সলিমের মৌলিকত্ব বিশেষ কিছু না থাকলেও বাংলার ইতিহাসের তথ্যভাণ্ডার হিসেবে এর ঐতিহাসিক মূল্য নিতান্ত কম নয়। কেননা এটি ছিল তখন পর্যন্ত লিখিত বাংলার মুসলিম শাসনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ। হেনরী বেভারিজ ও ব্লকম্যান প্রমূখ পণ্ডিত এ গ্রন্থটির যথাযোগ্য প্রশংসা করেছেন।[৫১] বর্তমান গবেষণায় নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণী বিশেষ করে অমাত্য অভিজাতদের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণে *রিয়াজ-উস-সালাতিন* মূল্যবান তথ্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইংরেজ ঐতিহাসিক Charles Stewart এর *History of Bengal* (1813) গ্রন্থটি প্রধানত *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থটি মূল ফারসী ভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন আবদুস সালাম। ১৯০৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয়। এ ইংরেজি অনুবাদ থেকে আকবর-উদ-দীন গ্রন্থটি বাংলা অনুবাদ করেন এবং ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমী, ঢাকা তা প্রকাশ করে। তবে এর আগে শ্রীরামপ্রাণ গুপ্তের সম্পাদনায় বাংলা ১৩১২ সালে টাঙ্গাইল থেকে মূল ফার্সি অবলম্বনে গ্রন্থটির একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ২০০৫ সালে ঢাকার দিব্য প্রকাশ এ অনুবাদ গ্রন্থটির পুণর্মুদ্রণ প্রকাশ করে।

উপর্যুক্ত সুপরিচিত সমসাময়িক ফারসি গ্রন্থসমূহ ছাড়াও আরো কিছু সমসাময়িক ফারসি গ্রন্থ নবাবী বাংলার ইতিহাস অধ্যয়ন ও গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। এ সব গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম *ওয়াকিয়া-ই-ফাতাহ* বাঙ্গালা। এ গ্রন্থটি *ওয়াকিয়া-ই-মহাবতজঙ* নামেও পরিচিত। মুহাম্মদ ওয়াফা রচিত এ গ্রন্থে আলিবর্দী খানের মসনদ অধিকারের সময় থেকে ১৭৪৮ সাল পর্যন্ত নবাবী বাংলার ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। তবে গ্রন্থাকারের বর্ণনা মোটেই বিশ্লেষণাত্মক নয়। এটি একটি সাধারণ বিবরণীমূলক গ্রন্থ। তবে আফগান বিদ্রোহের আলোচনায় গ্রন্থাকার কিছু নতুন তথ্য ও সন-তারিখ পরিবেশন করেছেন, যা এ গ্রন্থের ঐতিহাসিকমূল্য বৃদ্ধি করেছে। পাটনার ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরিতে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

নবাবী আমলের ইতিহাস সম্পর্কিত সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সৈয়দ আলী রচিত *তারিখ-ই-মনসুরি* একটি উল্লেখযোগ্য ও মুল্যবান সংযোজন। তবে দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য যে, গ্রন্থটি পাঠক বা গবেষকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত ও আলোচিত। এর অন্যতম কারণ গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়নি এবং এর সম্পূর্ণ ইংরেজি বা বাংলা অনুবাদ এখনো

---

[৪৮] গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন* (বাংলা অনুবাদ), পৃ.২২২

[৪৯] ঐ, পৃ.১৮৭

[৫০] ঐ, পৃ. ২২৮

[৫১] ঐ, পৃ. ২৩; Blockman, Contribution to the Geography and History of Bengal' *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1873, p. 210

Dhaka University Institutional Repository

হয় নি। ব্লকম্যান এ গ্রন্থের কিছু অংশ সংকলন করেন এবং ১৮৬৭ সালে 'Notes on Sirajuddaulah and the town of Murshidabad, taken from a persian manuscript of the Tarikh-I-Mancuri' শিরোনামে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে তা প্রকাশিত হয়। *তারিখ-ই-মনসুরি* রচনার সময়কাল জানা যায় না। আকা মো যাকারিয়ার মতে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার 'মনসুর-উল-মুলক' উপাধি অনুসারে গ্রন্থটির নামকরণ হয়ে থাকতে পারে।[৫২] তাঁর এ ধারণা সঠিক নয়। গ্রন্থাকারের উদ্বৃতি দিয়ে ব্লকম্যান উল্লেখ করেছেন যে, গ্রন্থটি নবাব সৈয়দ মনসুর আলী খান বাহাদুর নুসরাতজঙের নামে উৎসর্গকৃত।[৫৩] কাজেই মনসুর আলী খানের নামেই গ্রন্থটির নামকরণ হওয়া স্বাভাবিক।

ব্লকম্যানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, *তারিখ-ই-মনসুরি* একটি সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থকার *তারিখ-ই-ফিরিশতা*, *সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিণ* এবং *রিয়াজ-উস-সালাতিন* প্রভৃতি গ্রন্থের ভিত্তিতে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তবে সিরাজ-উদ-দৌলার পরবর্তী কালের ইতিহাস ভ্যান্সিটার্টের রচনাভিত্তিক।[৫৪] তাছাড়া এ গ্রন্থ রচনায় সৈয়দ আলী মুর্শিদাবাদের অধিবাসীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত কিছু মৌলিক উপাদানেরও ব্যবহার করেছেন - যা গ্রন্থটি প্রামাণিক মূল্য বৃদ্ধি করেছে। ব্লকম্যান প্রণীত গ্রন্থের সারাংশ থেকে দেখা যায় যে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সম্পর্কে গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গি সমসাময়িক অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতোই নেতিবাচক ছিল। তবে পলাশির যুদ্ধ যে একটি ষড়যন্ত্র এবং এ ষড়যন্ত্রে মীর জাফর, খোজা ওয়াজিদ ও উমিচাদ প্রমুখ অভিজাতগণ যে প্রধান কুশীলবের ভূমিকা পালন করেছেন গ্রন্থাকার তা স্পষ্ট করেই বলেছেন। চক্রিদলের সাথে লর্ড ক্লাইভের তথা ইংরেজদের একাত্মতা এবং সিরাজকে উৎখাতে তাদের প্রচেষ্টার বিষয়টিও তিনি ঢেকে রাখেন নি। তবে ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা রায় দুর্লভ ও জগৎশেঠ প্রমুখের কথা তিনি এড়িয়ে গেছেন। এ গ্রন্থে সামাজিক সম্প্রীতির বিষয়সহ নবাবী বাংলার সামাজিক ইতিহাসেরও কিছু উপাদান পাওয়া যায়। সিরাজ-উদ-দৌলাহর রাজত্বকালের অভিজাতদের কর্মকাণ্ড, তাদের সিরাজ বিরোধী তৎপরতা, ইংরেজদের সাথে তাদের আঁতাত এবং সর্বোপরি বাংলার স্বাধীন শাসন অবসানে অভিজাত চক্রের ভূমিকা নির্ণয় ও পর্যালোচনার জন্য আলোচ্য গবেষণায় গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য রয়েছে।

নবাবী আমলের ইতিহাসের আরেকটি প্রাথমিক উৎস *খুলাসাত-উত-তাওয়ারিখ*। বিহারের নায়েব নাজিম সিতাব রায়ের (১৭৬৬-৭৩ খ্রি.) পুত্র মহারাজা কল্যাণ সিং গ্রন্থটি রচনা করেন। সম্ভবত ১৮১২ খ্রি. গ্রন্থটি রচনার কাজ সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থাকার নিজেও বিহারের নায়েব নাজিম ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে নবাব মুর্শিদকুলী খান থেকে গ্রন্থ রচনার সময়কাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তবে মুর্শিদকুলী খান থেকে সরফরাজ খানের রাজত্বকালের বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত। নবাব আলিবর্দী খান থেকে মীর কাশিম পর্যন্ত এ গ্রন্থের বর্ণনা মোটামুটি বিস্তারিত। তবে এ গ্রন্থের বিবরণ থেকে ধারণা হয় যে, গ্রন্থাকার সম্ভবত *সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিনের* বর্ণনার ভিত্তিতেই গ্রন্থটি রচনা করেন। খান

---

[৫২] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা*, দিব্য প্রকাশ .ঢাকা, ২০০৬, পৃ. একুশ

[৫৩] Blockman 'Notes on Sirajuddaulah and the town of Murshidabad, taken from a persian Manuseript of the Tarikh-I-Mancuri' *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1867, p. 85

[৫৪] Blockman, op.cit, p.87

বাহাদুর সরফরাজ হোসাইন খান *খুলসাত-উত-তাওয়ারিন* গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন এবং *Journal of Bihar and Orissa Resarch Society*- তে ১৯১৯-২৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়েছে।

উপরে বর্ণিত গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, চরিত্রগত দিক থেকে এসব গ্রন্থের অধিকাংশই দরবারি ইতিহাস। এসব গ্রন্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজপৃষ্ঠপোষকতায়ই রচিত হয়েছে। তাছাড়া রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশায় কেউ কেউ ব্যক্তি উদ্যোগেও এ ধরনের ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর এ কারণেই ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতাগণ প্রায় ক্ষেত্রেই বর্ণিত ইতিহাসের নিরপেক্ষতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করতে পারেন নি। আরেকটি বিষয় হলো এসব গ্রন্থের আলোচনা প্রধানত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ। এ সব গ্রন্থে সামরিক, কূটনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগ সম্পর্কিত ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যায়। তবে সামাজিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপাদান খুব একটা নেই। নবাবী রাজনীতির নিয়ামক শক্তি হিসেবে প্রসঙ্গত অমাত্য ও অভিজাতদের কাজকর্ম ইতো বিক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হলেও যে সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে ইতিহাসের ঘটনার সমগ্রতা গড়ে তোলে সেই শক্তিগুলো সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইতিহাস রচনায় 'তথ্যসংগ্রহ' ও 'সংগৃহীত' তথ্যের' ব্যাখ্যা খুবই জরুরি বিষয়। সমালোচনামূলক চিন্তনের আলোকে প্রাপ্ত তথ্য বা সাক্ষ্য প্রমাণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো ঘটনার সত্যতা যাচাই এবং ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একজন ঐতিহাসিকের একান্ত কর্তব্য। নবাবী বাংলার ইতিহাসবিষয়ক সমসাময়িক ফারসি গ্রন্থের রচনায় ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস রচনার এ নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তাঁরা নিজেরা যা দেখেছেন অথবা যা শুনেছেন তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা নির্ণয় বা ঘটনা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রয়াস তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই বর্ণিত গ্রন্থসমূকে আধুনিক সংজ্ঞায় ইতিহাসগ্রন্থ না বলে ঐতিহাসিক তথ্য ভাণ্ডার বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। এসব গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্য পরবর্তী গবেষক ও ইতিহাসবিদদের রচনার মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণায়ও একই দৃষ্টিকোণ থেকে এসব তথ্য উৎসের ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি

নবাবী বাংলার ইতিহাসের প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইংরেজ পণ্ডিত Robert Orme এর রচিত *History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan.* ওর্মে পলাশির যুদ্ধের সমসাময়িককালে অনেক দিন বাংলা ও মাদ্রাজে অবস্থান করেন। বঙ্গ-ভারতের অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অনেক ঘটনা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য অবলম্বন করে এ পরিধিবহুল গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৮০৩ সালে লন্ডন থেকে তিন খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। পলাশিসহ নবাব সরকার যুগ সম্পর্কে তাঁর বর্ণনাকে মোটামটি বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর বলে পণ্ডিতমহল গ্রহণ করেছেন। এ কারণে পরবর্তীতে ইংরেজ ঐতিহাসিকসহ ভারতীয় ইতিহাসবিদগণও তাদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থে ওর্মের তথ্যাদি ব্যবহার করেছেন। Luke Scrafton ছিলেন একজন ইংরেজ পণ্ডিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মকর্তা। পলাশির অব্যাবহিত পূর্বে ক্লাইভ তাঁকে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। পলাশি ষড়যন্ত্রে দেশীয়

অভিজাত চক্রান্তকারীদলের সাথে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়।[৫৫] ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার সুবাধে তিনি সমকালীন বাংলার ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি পলাশিসহ সমকালীন বহু ঘটনার মূল্যবান তথ্য তাঁর *Reflections on the government of Indostan: with a short sketch of the history of Bengal from the year 1739-1756 and an account of the English affairs to 1758,* (1763) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। এ গ্রন্থটিতে নবাব আলিবর্দী খানের রাজত্বকালে বাংলায় মারাঠা আক্রমণ, বাংলার অভিজাত অমাত্য, জমিদার ও বণিককুলের সাথে নবাব সরকারের সম্পর্ক এবং আফগান বিদ্রোহ, পলাশি বিপ্লব এবং এতে অভিজাতদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়সহ আলোচ্য গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। তবে তথ্যাদি এসব ঘটনা বর্ণনা লেখক সবক্ষেত্রে যে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারেন নি তা প্রমাণিত সত্য। কাজেই এ গ্রন্থে ব্যবহৃত তথ্য উৎস ব্যবহারে ব্যবহারে যথা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

John Zephaniah Holwell ছিলেন পেশায় একজন চিকিৎসক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরির সুবাধে তিনি ভারতে আসেন। সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় তিনি কলকাতা শহরের কোতোয়াল ছিলেন। সিরাজের কলকাতা অভিযানের সময় তিনি অন্যান্যদের সাথে নবাব বাহিনীর হাতে বন্দি হন। ১৭৬০ সাল তিনি বাংলার অস্থায়ী গভর্নর হিসেবেও কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। *India Tracts* (1774) তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এত ১৭৫২-১৭৬০ সাল পর্যন্ত বাংলায় ইস্ট ইন্ডয়া কোম্পানির তৎপরতার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। পলাশির যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পূর্ব সিরাজ-উদ-দৌলাহর কলকাতা অভিযান এবং বিতর্কিত ও তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ড এ গ্রন্থের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থটিতে সমকালের ইংরেজ কর্মকর্তাদের অনেকপত্র সংকলন করা হয়েছে। তবে এ গ্রন্থটিকে কোনভাবে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ বলা যায় না। তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডের বর্ণনাই এর প্রমাণ। *Interesting Historical events reletive to Bengal and the Empire of Indostan* হলওয়েল রচিত আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে নবাবী আমলে ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। তবে এ গ্রন্থের বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে উপরে বর্ণিত গ্রন্থটির মতোই প্রশ্ন রয়েছে।

পলাশি বিপ্লব তথা ১৭৫৬-১৭৫৭ সালের নবাবী বাংলার উপর রচিত আরেকটি সমকালীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ হচ্ছে *Memoirs of the Revolution in Bengal Anno. Dom. 1757,* (1760)। গ্রন্থটির রচয়িতা William Watts. প্রথমে তিনি কাশিমবজারের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ১৭৫৮ সালে তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ওয়াটস নিজে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী দলের সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন।[৫৬] উমিচাঁদ, মীর জাফর এবং ইয়ার লতিফ প্রমুখ দেশীয় চক্রান্তকারীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে তিনি পলাশির ষড়যন্ত্রের পরিপুষ্টি সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই পলাশির বিপ্লব সম্পর্কিত

---

[৫৫] Sushil Chaudhury, *The Prelode to Empire Plassey Revolution of 1757,* The Univesity Press Lmited, Dhaka, 2000, pp. 107-109

[৫৬] sushil Chaudhury, *op.cit.*, pp. 104-106

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর বর্ণনা মোটেই পক্ষপাত মুক্ত নয়। তবে সতর্কতার সাথে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করতে পারলে একে একটি মূল্যবান তথ্য উৎস হিসেবে গণ্য করা যায়। আলোচ্য গবেষণায় এ চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলার ইতিহাসে James Grant একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর *An Enquiry to the nature of Zamindary Tenures in the Landed Property of Bengal,* (1791) গ্রন্থটি বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার উপর প্রণীত একটি মূল্যবান দলিল। এ প্রসঙ্গে James Grant এর রচিত *Analyses of the Finance of Bengal* গ্রন্থেরও নামোল্লেখ করা প্রয়োজন। এটি W.K. Firminger (ed.), *The Fifth Report from the Select Committee to the House of commence of the affairs of the East-India Company,* (1917) এর দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট হিসেবে সংকলন করা হয়েছে। এতে মুর্শিদকুলি খানসহ নবাব সরকার যুগের বাংলার রাজস্ব সংস্কার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। প্রসঙ্গত James Grant তাঁর গ্রন্থে ভূ-স্বামী অভিজাত শ্রেণী সম্পর্কেও কিছু বিক্ষিপ্ত, তবে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন- যা বর্তমান গবেষণার তথ্য উৎস হিসেবে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) প্রশাসনিক ও বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির দলিল-দস্তাবেজ ও নথি-পত্রাদি

যে কোনো ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন ও গবেষণায় অন্যতম প্রাথমিক উৎস হল সমকালীন প্রশাসনিক ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উৎস হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ বিবেচনায় আলোচ্য গবেষণায় সমকালীন নবাব সরকারের প্রশাসনিক দলিল পত্র ও বাংলায় কর্মরত ঐ সময়কার বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির নথিপত্র এবং কোম্পানির কর্মকর্তাদের স্মৃতিচারণ ও ডায়েরির ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নথিবদ্ধ ও প্রকাশিত উপকরণগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যবহৃত এ সব উপকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ K. K. Datta, সম্পাদিত *Fort William-India House Correspondence*, vols I, II. & IV; C.U. Atichison সম্পাদিত *A Collection of Treaties Engagement and Sonads*, vol. II., (1930); S.C Hill এর *Bengal in 1756-57*, 3 vols, (1905); W.K. Firminger সম্পাদিত, *The Fifth Report from the Select Committee to the House of commence of the affairs of the East-India Company*, 1812, 3 vols, (1917-18); J. Long সম্পাদিত *Selections from unpublished Records of Government of Bengal 1748-67*, (1869); James Long সম্পাদিত, *Selection from the unpublished records of Government from 1748-176,* (1869) ইত্যাদি। এর বাইরে কিছু অপ্রকাশিত দলিল-দস্তাবেজের সংকলন রয়েছে- যার অধিকাংশ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে "হেস্টিংস দপ্তর" নামে সংরক্ষিত আছে। ভারতের কলকাতা ও দিল্লি অভিলেখাগারেও (Archives) কিছু দলিল-দস্তাবেজের অপ্রকাশিত সংকলন সংরক্ষিত আছে। এসব সংকলনের মধ্যে Home Public Proceedings. (1717-65); Letters (Public) to the Court (1707-1765); Letters (Public) from the Court এবং Orme's MSS (India) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কলকাতা ও দিল্লী অভিলেখাগারে সংরক্ষিত উপকরণের নির্বাচিত কিছু তথ্য এ গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত উৎসসসমূহে পর্যালোচনাধীন সময়ের বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্য রয়েছে। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ সব তথ্য ব্যবহার অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষ। কেননা এসব

তথ্য বিবরণীতে বিশেষ করে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের নথি-পত্রাদিতে অনেক ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায় না। কোম্পানিসমূহের দলিলাদিতে তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এ দেশীয় শাসককুল এবং জন সাধারণের প্রতি তাদের বিদ্বেষ থাকায় তাদের বর্ণনা বিশ্বস্ত ও নিরপেক্ষ হতে পারে নি। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তাদের বর্ণনা শুধু পক্ষপাতদুষ্টই নয় অনেক ক্ষেত্রে অনুদার মনোভাবেরও পরিচয় বহন করে। কাজেই এসব তথ্য উৎস ব্যহারে সার্বিক সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়েছে। স্মৃতিকথা ও ডায়েরিসমূহের প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। স্মৃতিকথার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে চন্দননগরের ফরাসি কুঠির সেনাপতি ম'শিয়েঁ জ্যা ল (M. J. Law) এর *Memoirs*. এস সি হিল (S.C Hill) এটি ইংরেজিতে অনুবাদ এবং তাঁর পূর্বোক্ত *Bengal in 1756-57* গ্রন্থে তা সংকলিত করেছেন। স্মৃতিকথা ও ডায়েরি লেখকদের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও মন্তব্য মূল্যবান সন্দেহ নেই, তবে তাদের ব্যক্তিত্ব, নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ, এদেশ ও দেশের মানুষের জীবনযাত্রা এবং তাদের রাজনৈতিক ঐতিহ্য ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় এসব বর্ণনা ক্রটি মুক্ত নয়। এসব সীমাবদ্ধতার কারণে উপর্যুক্ত উৎসসমূহ থেকে তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্বিক সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করা হয়েছে।

(ঘ) সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যেও নবাবী বাংলার ইতিহাসের বিশেষ করে সামাজিক ইতিহাসের যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যায়। আলোচ্য গবেষণায় প্রয়োজনসাপেক্ষে বাংলা সাহিত্যের যে সব রচনাবলি থেকে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০) রচনাবলী, রামপ্রসাদ সেন (১৭১৮-১৭৭৫) রচনাবলী, রামেশ্বর-এর *শিবায়ণ* (১৭৫০), গঙ্গারাম-এর *মহারাষ্ট্র পূরাণ* (১৭৫১) রাজীব লোচন-এর *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং* (১৮০৫) ইত্যাদি। এসব রচনার মধ্যে নবাবী বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উৎস হিসেবে কবি ভারতচন্দ্রের রচনাবলি সবচেয়ে মূল্যবান এবং আলোচ্য গবেষণায় এর ব্যবহার হয়েছে সর্বাধিক।

১.৫.২ নবাবী বাংলার ইতিহাসের দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Sources)

নবাবী বাংলাকে কেন্দ্র করে আধুনিক ঐতিহাসিক পণ্ডিত ও গবেষকদের বেশ কিছু মূল্যাবান গবেষণাকর্ম গ্রন্থাকারে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এসব গবেষণাকর্ম ও গ্রন্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-Abdul Karim এর *Murshid Quli Khan and His Times*, (1963). বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আবদুল করিম তাঁর এ গ্রন্থে মূল ফারসি ও ইউরোপীয় কোম্পানি বিশেষ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নথি-পত্রাদি ও দলিল-দস্তাবেজ ব্যবহার করে বাংলায় নবাবী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি খানের রাজত্বকালের (১৭০৪-১৭২৭) বিভিন্ন দিক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। নবাব মুর্শিদকুলি খানের উপর রচিত এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব সংস্কার, তাঁর সময়ে বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর কার্যকলাপ ও নবাবের সাথে তাদের সম্পর্ক, বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর মুর্শিদকুলি খান প্রবর্তিত শাসনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর গঠন কাঠামো সম্পর্কে প্রসঙ্গত কিছু আলোচনা থাকলেও আলোচ্য গ্রন্থে সমাকালিন বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা ও প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে স্বতন্ত্র কোনো পাঠ নেই। অবশ্য এ বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থের ইঙ্গিত অত্যন্ত মূল্যবান। এ গ্রন্থটি মোকাদ্দেসুর রহমান *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ* শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৯৮৯ সালে বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে তা প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি শ্যামপ্রসাদ বসু, *মুর্শিদকুলি খার আমলে বাংলা*, (কলকাতা, ২০০৪) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। লেখকের দাবি তিনি সমসাময়িক তথ্যাবলীর নিরিখে মুর্শিদকুলি খানের আমলে বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামজিক জীবন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত লেখক বাংলায় একটি অসাম্প্রদায়িক শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মুর্শিদকুলি খানের প্রচেষ্টার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

নবাবী বাংলার ইতিহাসে আলিবর্দী খানের রাজত্বকাল (১৭৪০-১৭৫৬) নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এ সময়কালের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্ম হচ্ছে K.K.Dutta এর *Alivardi and His Times,*(1939)। বিদগ্ধ গবেষক কে কে দত্ত এ গ্রন্থে নয়টি অধ্যায়ে নবাব আলিবর্দী খানের রাজত্বকালের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি সমসাময়িক ফারসি তথ্য উৎস ছাড়াও ইউরোপীয় কোম্পানির প্রকাশিত অপ্রকাশিত তথ্যাদি ব্যবহার করে অলিবর্দী খানের রাজত্বকালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। এ গ্রন্থে মারাঠা আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আফগান অভিজাতদের বিদ্রোহ, ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর সাথে নবাব সরকারের সম্পর্ক এবং বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক ও তথ্যনির্ভর। তবে এতে বাংলার সামাজিক অবস্থার বর্ণনা অসম্পূর্ণ ও ভাসাভাসা। সামাজিক শক্তি কাঠামোর গঠন প্রক্রিয়া বা সমাজ জীবনে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এতে বিশেষ কোনো আলোচনা নেই। অবশ্য কে কে দত্ত তাঁর *Studies in The History of Bengal Subah, 1740-1770,* Vol. I, (1936) গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে অনেক বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

Brijen K. Gupta প্রণীত *Sirajuddaullah and the East India Company 1756-57,* (1966) একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ। একে সিরাজ-উদ-দৌলাহর জীবনী নির্ভর গতানুগতিক রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থ বলা যাবে না। এতে বি কে গুপ্তা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইংরেজ কোম্পানির উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নবাব সরকারের বিশেষ করে নবাব সিরাজ–উদ–দৌলাহর সাথে কোম্পানির দ্বন্দ্ব এবং এর প্রতিক্রিয়া বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। নবাবের বিরুদ্ধে বাংলার অভিজাত শাসকচক্রের ষড়যন্ত্র এবং ইংরেজদের সাথে তাদের গোপন আঁতাত ইত্যাদি বিষয়ে বি কে গুপ্তার বর্ণনা তর্কাতীত না হলেও মোটামুটি বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ বলা যায়। প্রসঙ্গত নবাবী আমলের উপর Atul Chandra Roy রচিত *The Career of Mir Jafar khan(1757-65),* (1953) নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থের আলোচনাও প্রধানত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ। অবশ্য বাংলার রাজনীতিতে মীরজাফরের ক্রমোত্থান, পলাশি বিপ্লব এবং এতে মীর জাফর ও তাঁর সহযোগী অভিজাতদের ভূমিকা নির্ণয়ে আলোচ্য গবেষণায় গ্রন্থটির ব্যবহার অপরিহার্য করেছে।

উপরে উল্লেখিত গ্রন্থগুলোর পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, এসব গ্রন্থ নবাবী বাংলার নির্দিষ্ট একেকজন শাসককে নিয়ে রচিত। আর গ্রন্থগুলোর প্রধান উপজীব্য রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস কোনো কোনো গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে স্থান পেলেও এতে আমাদের আলোচ্য গবেষণার সামগ্রিক বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তথ্যে প্রচণ্ড ঘাটতি

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। তাছাড়া এসব গ্রন্থে বাংলার দুজন নবাবের[৫৭] শাসনামল সম্পর্কে কোনো তথ্যই নেই। কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় রচিত *বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল)*, (১৯০১); নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩০৯ বাং); Charles Stewart রচিত *History of Bengal*, (London 1813); J. C. Marshman রচিত *An Outline of the History of the Bengal*, (1844); Jadunath Sarkar সম্পাদিত *History of Bengal, vol. II*, Fourth Imression, (2006) এবং Muhammad Mohar Ali রচিত *History of The Muslims of Bengal, Vol. IA*, (1985) পাঠে অবশ্য এ অভাব পুরণ করা যায়। তবে উপর্যুক্ত ছয়টি গ্রন্থেরই বড় সীমাবদ্ধতা হলো এসব গ্রন্থেও প্রধানত রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, Charles Stewart এর গ্রন্থটি ১৮১৩ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলার ইতিহাসের অনেক মৌলিক তথ্য তখনো অনাবিস্কৃত ছিল, তাই তিনি মূলত সলিমুল্লাহর *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ* এবং গোলাম হোসেন সলীমের *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থ অনুসরণে তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। আবদুল করিম Charles Stewart এর *History of Bengal* কে মোটামুটিভাবে রিয়াজ-উস-সালাতিনের ইংরেজি ভাষ্য বলেই মনে করেন।[৫৮] উল্লেখ্য যে নবাবী বাংলার ইতিহাস বর্ণনায় *রিয়াজ- উস- সালাতিন* গ্রন্থ প্রণেতা যে প্রায় সম্পূর্ণ *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহর* উপর নির্ভর করেছিলেন এ ব্যাপারে পণ্ডিতমহলে বিশেষ কোনো দ্বি-মত নেই। কাজেই এ দুটি গ্রন্থে যে সব ক্রটি-বিচ্যুতি বা সীমাবদ্ধতা দেখা যায় অনুরূপ সীমাবদ্ধতা বা ক্রটি-বিচ্যুতি Charles Stewart এর গ্রন্থেও দৃশ্যমান। সম্ভবত পর্যালোচনাধীন সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে স্টুয়ার্টের বিশেষ কোনো উৎসাহ ছিল না। তাই তিনি এদিকে অগ্রসর হন নি। অথচ সমকালীন ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজ কোম্পানির নথি-পত্রাদি ব্যবহার করে তিনি নবাবী বাংলার বস্তুনিষ্ঠ আর্থ-সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে পারতেন। মার্শম্যান রচিত *An Outline of the History of the Bengal* গ্রন্থটিও স্টুয়ার্টের রচনার মতোই। এটিও প্রধানত রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত। তবে বিচ্ছিন্নভাবে সামাজিক ইতিহাসের কিছু উপাদান এতে স্থান পেয়েছে। যদুনাথ সরকার সম্পদিত উপরে বর্ণিত গ্রন্থটিও সামাজিক ইতিহাসের উপাদানের অভাব পুরণ করতে পারেনি। একই কথা মোহাম্মদ মোহর আলীর গ্রন্থ প্রসঙ্গেও। যোগ্য ঐতিহাসিকের অভাবে যদুনাথ সরকারের গ্রন্থে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংকলন সম্ভব হয় নি বলে প্রবোধচন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেন।[৫৯] মোহাম্মদ মোহর আলী তাঁর *History of The Muslims of Bengal*, vol. IB গ্রন্থকে মুসলিম বাংলার প্রশাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক সমীক্ষা বলে উল্লেখ করেছেন। তবে দুঃখজনক হলো এতে নবাবী বাংলার উপর স্বতন্ত্র কোনো পাঠ নেই। Muhammad Mohar Ali রচিত আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থ হলো *The Fall of Sirajuddulah*, (1975) এতে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর পতন প্রসঙ্গে আলোচনায় বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উত্থান এবং সিরাজ বিরোধী এদেশীয় অমাত্য অভিজাতদের সাথে তাদের সম্পর্কের নানাদিক

---

[৫৭] নবাব সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খান (১৭২৭-১৭৩৯) এবং নবাব সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০)

[৫৮] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, মোগল আমল*, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২

[৫৯] Jadunath Sarkar সম্পাদিত *History of Bengal, vol. II* গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবোধচন্দ্র সেনের মন্তব্য। উদ্ধৃতি সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭)*, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

আলোচিত হয়েছে। নবাবের পতনে দেশীয় অভিজাত চক্রের ভূমিকা প্রসঙ্গেও লেখক আলোকপাত করেছেন। অবশ্য তাঁর অনেক বক্তব্য বিষয়েই দ্বি-মতের অবকাশ রয়েছে। পর্যালোচনাধীন গবেষণার যথাস্থানে সে বিষয়টি লক্ষ করা যাবে।

নবাব সিরাজ–উদ–দৌলাহ এবং পলাশির যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আরো বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে – এর মধ্যে রয়েছে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত *সিরাজদ্দৌলা*, (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৮, দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা ২০০৩)। এ গ্রন্থে লেখক নবাব সিরাজ–উদ–দৌলাহ সম্পর্কে সমকালীন ভারতীয় এবং ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের লিপিবদ্ধ তথ্য ও দলিল-দস্তাবেজকে নিরপেক্ষ ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিরাজের সাথে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। তিনি যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সিরাজ চরিত্রে আরোপিত কলঙ্কমোচন করে তাঁকে একজন সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পলাশি বিপ্লবে দেশীয় অভিজাত চক্রের ভূমিকা সম্পর্কেও তাঁর বর্ণনা নির্মোহ, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এর *রাণী ভবানী*, (ঢাকা, ২০০৬) গ্রন্থ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। সম্প্রতি বিশিষ্ট গবেষক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সমসাময়িক ফারসি ও অন্যান্য তথ্য উপাত্ত অনুসরণে *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা* (২০০৬) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে এ গ্রন্থটিও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ। রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের যেমন কোনো আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ এতে নেই, তেমনি নেই সামাজিক শক্তি বিশেষ করে অভিজাত গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ সর্ম্পকিত স্বতন্ত্র অধ্যয়ন। প্রসঙ্গত আরো কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়– Topan Mohan Chatterjee রচিত *The Road to Plassey*, (1960); Michael Edward এর *The Battle of Plassey and the Conquest of Bengal* (1963) ও *Plassy: The Founding of an Empire* (1969) এবং Sushil Choudhury রচিত *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757*, (2000) ইত্যাদি। এসব কটি গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ, তাঁর রাজত্ব এবং পলাশির যুদ্ধ। অবশ্য চারটি গ্রন্থের আলোচনাতেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রাধান্য পেয়েছে। তবে সুশীল চৌধুরীর শেষোক্ত গ্রন্থটিতে পলাশি যুদ্ধে সামাজিক শ্রেণীসমূহ বিশেষ করে সমকালীন অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা মুল্যায়নের প্রয়াস রয়েছে। একই রকমের প্রচেষ্টা দেখা যায় সুশীল চৌধুরীর *পলাশির অজানা কাহিনী*, (কলিকাতা, ২০০৪) গ্রন্থেও। সুশীল চৌধুরীর দুটি গ্রন্থেই সিরাজ-উদ- দৌলাহ এবং পলাশির মূল্যায়নে গতানুগতিক ধারণাসমূহ খণ্ডনের চেষ্টা রয়েছে। এদিক থেকে গ্রন্থ দুটির মূল্যমান অনেক।

পলাশির ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, (১৯৯৪) রজতকান্ত রায় প্রণীত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এ গ্রন্থে রজকান্ত রায় সমকালীন দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে গ্রন্থকার পলাশির বিপ্লবকে একটি আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। এতে অভিজাত সামাজিক শ্রেণীসমূহের ভূমিকাও নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। তবে তাঁর এ গ্রন্থে কিছু তথ্যগত বিভ্রান্তি রয়েছে। বঙ্গ-ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইংরেজদের প্রাথমিক অভিলাষ সম্পর্কে তাঁর মতামতও গ্রহণযোগ্য নয়। রজতকান্ত রায় বলতে চান যে, ইংরেজরা এদেশে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে সিরাজ বিরোধিতায় নামেনি। মূলত তারা তাদের অবাধ বাণিজ্য অব্যাহত রাখার জন্য সিরাজের স্থলে একজন অনুগত নবাবকে বাংলার মসনদে বসাতে

Dhaka University Institutional Repository

চেয়েছিলেন। অবশ্য পরে সুযোগ এসে গেলে তারা এর সদ্ব্যবহার করে।[৬০] রজতকান্ত রায়ের মত যে যথার্থ নয় তাঁর পূর্বে এবং পরে অনেকেই তা প্রমাণ করেছেন।[৬১] যা'হোক কিছু সীমাবদ্ধতা এবং বিচ্যুতি থাকলেও রজতকান্তের আলোচ্য গ্রন্থটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের সহায়ক উৎস হিসেবে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক P J Marshall এর *Bengal- The British Bridgehead,* (1987) গ্রন্থের কথা বলা যেতে পারে। এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে নবাবী আমলের আলোচনা স্থান পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৭৪০ সাল থেকে নবাবী বাংলায় যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল লেখক সে বিষয়ে পাঠক ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবে এ সংকটের ব্যাখ্যায় তাঁর অনেক অভিমতের সাথেই দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ রয়েছে। প্রাক-পলাশি বাংলার অর্থনৈতিক দৈন্যতা বিষয়ে তাঁর মতামত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রাক-পলাশি বাংলার দ্বিধা বিভক্ত সমাজ এবং সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে এ দ্বিধা বিভক্ত সমাজের প্রভাব প্রতিক্রিয়া বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের বিষয়েও দ্বিমত প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। পলাশি বিপ্লবে ইংরেজদের অংশগ্রহণ বিষয়ে তিনি যে মত প্রকাশ করেছেন তাও তর্কাতীত নয়। এরকম আরো অনেক বিষয়ে পি জে মার্শালের বর্ণনার সাথে মত ভিন্নতা প্রকাশ করা যায়। তারপরেও নবাবী বাংলার ইতিহাস অধ্যয়নে এ গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মুল্য অনস্বীকার্য এবং ইতিহাসের গবেষক ও পাঠকদের কাছে তা সমাদৃতও হয়েছে।

নবাবী বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক লেখা হলেও এখন পর্যন্ত এর পূর্ণাঙ্গ আর্থ-সামাজিক ইতিহাস খুব একটা নজরে পড়ে না। উৎসাহ থাকলেও প্রয়োজনীয় তথ্য উৎসের সীমাবদ্ধতার কারণে এ পথে অনেকের পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। এম. এ. রহিম তাঁর *Social and Cultural History of Bengal Vol.II,* (1963) গ্রন্থে নবাবী বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতি ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তবে তাঁর আলোচনা অনেকটাই গতানুগতিক। এতে সামাজিক শ্রেণীসমূহের পরিচয় থাকলেও সামাজিক শ্রেণী গঠন সংক্রান্ত কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা নেই। নবাবী বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে সামাজিক শ্রেণী বিশেষ করে অভিজাত সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্ণয়েও তিনি বিশেষ নজর দেননি। অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিবরণী একেবারেই ভাসাভাসা। আঠারো শতকের প্রথমার্ধের বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর আলোকপাত করেছেন Sukumar Battacharya তাঁর *The East India Company and the Economy of Bengal 1704-1740,* (1960); Sushil Choudhury তাঁর *Trade and Commercial Organization in Bengal 1650-1720,* (1975) এবং N K Choudhury তাঁর *The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760,* (1978) গ্রন্থে। তবে এসব গ্রন্থে নবাবী বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের পূর্ণ পরিচয় নেই। তাদের বর্ণনা আংশিক এবং তাঁরা মূল জোর দিয়েছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মতৎপরতার উপর। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের *প্রাক-পলাশি বাংলা [সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭,* (১৯৮২)] গ্রন্থটিতেও এ ঘাটতি পূরণ হয়নি। নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণী এবং তাদের সামাজিক ও আর্থিক কর্মকাণ্ডের বিষয় তাঁর এ গ্রন্থে বিশেষভাবে স্থান পায়নি। গোলাম রব্বানী রচিত *উপনিবেশ*

---

[৬০] রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃপৃ. ১৬-২১

[৬১] এ ব্যাপারে অন্যতম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত *সিরাজদ্দৌলা*, প্রথম প্রকাশ ১৮৯৮, দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা (২০০৩) এবং সুশীল চৌধুরীর *পলাশির অজানা কাহিনী*, কলিকাতা (২০০৪) গন্থ।

পূর্ব বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, (২০০১) গ্রন্থটি অনেকাংশেই সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপরে বর্ণিত গ্রন্থের আদলেই লেখা বলে প্রতীয়মান হয়। নিখিলনাথ রায়ের *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, (১৯৯৯) ও *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, (১৩০৯ ১৩১০ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থ দু'টির মূল উপজীব্য রাজনৈতিক ইতিহাস হলেও এ দুটি গ্রন্থে সমকালীন সামাজিক শ্রেণী বিশেষ করে অভিজাতদের করো কারো সম্পর্কে আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ। *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ*, (২০০৪) সুশীল চৌধুরী প্রণীত একটি গ্রন্থ। এতে লেখক নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদের একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক বণিক রাজা শিরোনামে নবাবী বাংলার বণিক অভিজাতদের উপর আলোকপাত করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে পলাশি সম্পর্কেও তাঁর আলোচনা বর্তমান গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

The Role of The Zamindars in Bengal 1707-1722, (1982) শিরিন আখতারের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এতে গ্রন্থকার নবাবী বাংলার একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণী জমিদারদের উত্থানসহ রাজস্ব, সামরিক, বিচার ও পুলিশ প্রশাসনে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তবে নবাবী বাংলার রাজনীতি বিশেষ করে সমকালীন রাজনৈতিক বিপ্লবে এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে এ গ্রন্থে কোনো বর্ণনা নেই। এই ঘাটতি কিছুটা পূরণ করেছেন মোঃ হাবিবুর রহমান তাঁর *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র*, (২০০৩) গ্রন্থে। এতে নবাবী বাংলার ভূমিজ অভিজাতদের উত্থান এবং সমকালীন সমাজও রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার এতে দেখিয়েছেন আঠারো শতকের নবাবী বাংলায় রাজক্ষমতার দুর্বলতার সুযোগে ভূ-অভিজাতরা কীভাবে ক্ষমতাশালী হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগীদার হয়ে ওঠে।

নবাবী বাংলার ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা নিয়ে উনিশ ও বিশ শতকে বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে বেশ কিছু মুল্যবান কাব্যগ্রন্থ, নাটক ও উপন্যাস রচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) ছিলেন পথিকৃত। ১৮৭৫ সালে তাঁর *পলাশি যুদ্ধ* কাব্য প্রকাশিত হয়। একে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি মূল্যবান রচনা হিসেবে গণ্য করা হয়।[৬২] এ কাব্য গ্রন্থে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের আলোকে পলাশির বিপ্লব উপস্থাপিত হয়েছে বা সিরাজ চরিত্রের যথাযথ মূল্যায়ন হয়েছে তা বলা যাবে না, তবে এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, এ কাব্য রচিত হয়েছিল বলেই সিরাজ-উদ- দৌলাহ এবং পলাশি বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপজীব্যে পরিণত হয়। নবীনচন্দ্রের অনুসরণে পরবর্তীকালে সিরাজ-উদ-দৌলাহ, পলাশি ও নবাবী বাংলার উল্লেখযোগ্য শাসক ও অভিজাতদের নিয়ে যে সব সাহিত্যিকর্ম রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য-লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর *নবাব সিরাজদ্দৌলা* (১৮৭৬); গিরিশচন্দ্র ঘোষের *সিরাজদৌল্লা* (১৯০৫); শচীন্দ্রনাথ সেনের *সিরাজদ্দৌলা* (১৯৩৮); হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের *পলাশি* (১৯৪৫); বঙ্কিমচন্দ্র দাসগুপ্তের *সিরাজের স্বপ্ন* (১৯৪২); শীতাংশু মৈত্রের *মোহনলাল* (১৯৫৩) এবং সিকান্দর আবু জাফরের *সিরাজউদ্দৌলা* (১৯৬৫) ইত্যাদি। বর্ণিত সবকটি গ্রন্থই নাটক।

কাব্য ও নাটকের বাইরে সিরাজ-উদ-দৌলাহ ও নবাবী বাংলার অন্যান্য ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু কথা সাহিত্যেরও অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে চণ্ডীচরণ সেনের *মহারাজ নন্দকুমার;*

[৬২] অমৃতলাল বালা ও উষারাণী সরকার, *শচীন্দ্রনাথ সেনের সিরাজদ্দৌলা*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

তারকনাথ বিশ্বাসের *সুহাসিনী* (১৮৮২); হারাণচন্দ্র রক্ষিতের *রাণী ভবানী* (১৩১০ বঙ্গাব্দ); সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের *শক্তিসাধনা* (১৮৮৯); দুর্গাদাস লাহিড়ির *রাণী ভবানী* (১৩১৬ ১৩১০ বঙ্গাব্দ) ও *রাজা রামকৃষ্ণ* (১৩১৭ ১৩১০ বঙ্গাব্দ); শরৎকুমার রায়ের *মোহনলাল* (১৯০৬) এবং ধীরেন্দ্রনাথ পালের *জগৎশেঠের কন্যা* (১২৯১ ১৩১০ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি কথাসাহিত্যের গল্প উপন্যাসে সিরাজ-উদ-দৌলাহ ও তাঁর রাজত্বকালের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এসব রচনার ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে সন্দেহ নেই এবং প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা প্রচলিত জনশ্রুতির প্রাধান্য রয়েছে সত্য, কিন্তু তারপরেও প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের আলোচ্য গবেষণায় সতর্কতার সাথে এসব সাহিত্য উপাদান থেকে তথ্য গ্রহণ করা সঙ্গত বলে মনে হয়েছে।

১.৫.৩ পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

নবাবী আমলে বাংলায় কোনো ধরণের সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো বলে জানা যায় না। তাই সমকালীন সংবাদপত্র বা পত্র-পত্রিকা আলোচ্য গবেষণায় তথ্য উৎস হিসেবে ব্যবহারের প্রশ্ন নেই। অবশ্য আলোচ্য গবেষণায় পরবর্তীকালে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকার বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে সব গবেষণা জার্নাল প্রাধান্য পেয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে- *Bengal Past and Present; Journal of Bihar and Orissa Research Study; The Indian Historical Review, Journal of Indian History; Indian Historical Quarterly; Journal of the Asiatic Society of Bengal; Journal of the Asiatic Society of Pakistan; Journal of Modern Indian and Asian History; Indian Economic and Social History Review বঙ্গদর্শন, সমাজ নিরীক্ষণ* (ঢাকা), *ইতিহাস* (ঢাকা), *এবং ইতিহাস সমিতি পত্রিকা* (ঢাকা) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি। উপরে উল্লেখিত গবেষণা জার্নালসমূহে প্রকাশিত নবাবী বাংলার ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের অনেক প্রবন্ধ আলোচ্য গবেষণার সূত্র হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান। তবে গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণে ব্যবহৃত প্রবন্ধ নিবন্ধাদির সব বক্তব্য ও মতামতের সাথে সহমত পোষণ করা সম্ভব হয়নি।

১.৬ অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস

নবাবী বাংলার রাজনীতি ও অভিজাত শ্রেণী: একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়টি ভূমিকা। এতে আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্র ও পরিধি নির্ধারণসহ গবেষণার বিষয়বস্তু এবং এর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে গবেষণার সহায়ক তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কারণে এতে গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাঠামো বিন্যাসও স্থান পেয়েছে।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়টি বিন্যস্ত **প্রাক-নবাবী যুগে বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা** শিরোনামে। এতে তুর্কি বিজয়ের পর থেকে নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ, দিল্লী-বাংলা সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি, বাংলার সমাজকাঠামো বিশেষ করে মুসলিম সমাজের বিকাশ, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য এবং ভাষা ও সাংস্কৃতির রূপান্তর বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম **মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও বাংলায় নবাব সরকার প্রতিষ্ঠা**। সতেরো শতকের মধ্যভাগেও ভারতের মুঘল সাম্রাজ ছিল সমগ্র পূর্ব গোলার্ধের অন্যতম প্রধান রাজশক্তি। কিন্তু এ শতাব্দীরই শেষ দিক থেকে মুঘল

Dhaka University Institutional Repository

শক্তির অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি শুরু হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের এ অবক্ষয় ও ক্রমাবনতির কারণ ব্যাখ্যায় পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতানৈক্য রয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুঘল সম্রাজ্যের অবক্ষয়ের কার্যকারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। মুঘল শক্তির অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে আঠারো শতকের সূচনায় মুর্শিদকুলি খান বাংলায় নবাব সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গত মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ নবাব সরকারের বৈশিষ্ট্য ও রাষ্ট্রীয় চরিত্র নিরূপনের প্রয়াসও আলোচ্য অধ্যায়ের লক্ষ্য।

অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য **নবাব সরকার যুগে বাংলার সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণীসমূহ**। এ অধ্যায়ে মূখ্যত নবাবী আমলে বাংলার সমাজকাঠামোর গঠন, বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। নবাবী বাংলার পিড়ামিড সাদৃশ্য সমাজকাঠামোর শীর্ষে ছিল নবাব ও নবাব পরিবারের অবস্থান। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে নবাব ও নবাব পরিবারে পরেই অভিজাত শ্রেণী এবং সর্ব নিম্নস্তরে সাধারণ জনতার অবস্থান। তবে এ দুয়ের মধ্যেও একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। কিছু ভিন্নমত থাকলেও অধিকাংশ পণ্ডিতই একে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবেই আখ্যায়িত করেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে সমাজ জীবনে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর অবস্থান এবং তাদের জীবনসাধনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ের অভিধা **নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীঃ অভ্যুদয় ও বিকাশ**। অভিজাত শ্রেণী আলোচ্য গবেষণাকর্মের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্ত। এ দৃষ্টিকোন থেকে অভিসন্দর্ভের এ অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ে নবাবী বাংলার নবতর সামাজিক বিন্যাসের পটভূমিকায় অভিজাত শ্রেণীর সংগঠন, বৈশিষ্ট্য ও বিকাশক্রম আলোচনা করা হয়েছে। প্রাক-নবাবী বাংলা বিশেষকরে মুঘল সুবাদারি যুগে অভিজাত শ্রেণীতে অমাত্যদের প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। সে যুগের অভিজাত শ্রেণীতে ভূ-স্বামী জমিদাররা ঠাঁই করে নিলেও অমাত্যদের দাপটের কাছে তারা ছিলেন অনেকটাই নিস্প্রভ। আর বণিক মহাজনরা তখনো অভিজাত শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত হতে পারেননি। কিন্তু নবাবী যুগের অভিজাত শ্রেণীতে ভূ-স্বামী জমিদার ও পুঁজিপতি বণিকদের অবস্থান সুনিশ্চিত হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে উচ্চ সামাজিকশক্তি হিসেবে ভূস্বামী জমিদার ও বণিক মহাজনদের উত্থানের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল কার্যকারণসমূহ চিহ্নিত করার সবিস্তার প্রয়াস রয়েছ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম **নবাবী বাংলার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিকাশধারা এবং অভিজাত শ্রেণী**। এ অধ্যায়ে নবাবী যুগের সরকার পরিচালনা, প্রশাসনযন্ত্র ও রাজনীতিতে অভিজাত শ্রেণীর অবস্থান ও তাদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, অভিজাত শ্রেণী ছিল রাষ্ট্র কাঠামো ও নবাবের সহযোগী শক্তি। আর এ সহযোগী শক্তি হিসেবে রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনায় এদের নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তবে এ যুগের অভিজাতবর্গ বিশেষ করে অমাত্য ও ভূ-অভিজাতবর্গ কেবল তাদের নির্ধারিত প্রশাসনিক দয়িত্বই পালন করেননি সমকালের রাজনীতিতেও তারা ভূমিকা পালন করেছেন। মসনদকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার লড়াই এবং নবাবদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা ইত্যাদি নানা কারণে অভিজাতবর্গ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সুযোগ লাভ করেছিল। নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময় থেকে সিরাজ-উদ-দৌলাহর রাজত্বকাল পর্যন্ত অভিজাতদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নবাবী রাষ্ট্রের

সার্বিক পরিস্থিতিকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছিল। আলোচ্য অধ্যায়ে রাজনীতিতে অভিজাতদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কার্যকারণসহ সমকালীন রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে এর প্রতিক্রিয়া বিচার-বিশ্লেষণেরও প্রচেষ্টা রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে **নবাবী বাংলার অর্থনীতি, সমাজ -সংস্কৃতি ও অভিজাত শ্রেণী** শিরোনামায় আঠারো শতকের বাংলায় সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা ও অবদান নিরূপণের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে **পলাশি বিপ্লব ও অভিজাত শ্রেণী**। শুধু বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও পলাশি একটি যুগান্তকারী ও তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। যুদ্ধ হিসাবে সামরিক ইতিহাসে এর স্থান নিতান্তই নগন্য হলেও, এর পরবর্তী প্রভাব ও পরিণতি বিবেচনায় পণ্ডিতগণ একে একটি চূড়ান্ত মিমাংসাত্মক ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অনেকের কাছে পলাশি কেবল একটি যুদ্ধ নয়, বরং এটি একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা। আলোচ্য গবেষণাতেও পলাশিকে একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। কেননা এ ব্যাপারে দ্বিমত করার কোনো অবকাশ নেই যে, মুর্শিদকুলি খানের ক্ষমতায় আরোহনের মধ্য দিয়ে প্রায় অর্ধ শতাব্দীর প্রচেষ্টায় বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারা সূচিত ও বিকশিত হয়েছিল, ১৭৫৭ সালে পলাশির ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর যবনিকাপাত ঘটে। ইংরেজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের মুঘল সনাতন সামন্ত শাসনকাঠামোতে সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে। তদুপরি ভারতীয়দের জীবন সাধানাতে সুস্পষ্ট এমনকি একরকমের আমুল পরিবর্তন সূচিত হয়। ইউরোপীয় বাণিজ্যতন্ত্র ও বুর্জোয়া মূল্যবোধ দ্বারা ভারতীয় জনজীবন ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত হয়। দীর্ঘকালের কৃষিভিত্তিক গ্রামনির্ভর সমাজকাঠামোতে বাণিজ্য পুঁজি ও বুর্জোয়া মূল্যবোধের অনুপ্রবেশে বঙ্গ-ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বড় ধরনের রূপান্তত ঘটে । পলাশির যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এসব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল বলে পলাশির যুদ্ধ বৈপ্লবিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা অযৌক্তিক হবে না। আলোচ্য অধ্যায়ে এ বিষয়ে সবিস্তার পর্যালোচনাসহ পলাশির ঘটনায় অভিজাত শ্রেণীর তিনটি অঙ্গশক্তির ভূমিকা এবং বিপ্লব পরবর্তী সময়ে অভিজাতদের ক্রম অবক্ষয় ও পতন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের নবম অধ্যায় হলো **উপসংহার**। অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সার-নির্যাস স্থান পেয়েছে উপসংহারে।

এরপর পরিশিষ্টসমূহ এবং সবেশেষ এ গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত তথ্য উৎস ও গ্রন্থপঞ্জির একটি তালিকা রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক-নবাবী যুগে বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাবী শাসনের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারা এবং এতে অভিজাত শ্রেণীর অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে বুঝতে হলে প্রাক-নবাবী আমলের বাংলার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতাগুলো পর্যলোচনা করা প্রয়োজন।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তের শতকের সূচনাতে।[১] ইখতিয়ার-উদ্-দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নামক এক ভাগ্যান্বেষী তুর্কি বিজয়ী বীর বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বপর্যন্ত বাংলায় এ মুসলিম শাসন বলবৎ থাকে। এ দীর্ঘকাল পরিক্রমায় তুর্কি বিজয় হতে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত শতাধিক বছরকালের বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাস এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অধ্যায়। এ সময়কালে দিল্লি সালতানাতের সাথে বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল খুবই জটিল। এ সময় কখনো কখনো সরাসরি দিল্লি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও বাংলার স্বাধীন বিকাশই ছিল এ সম্পর্কের মূখ্যদিক। ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ'র স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে ১৫৩৮ সালে হোসেন শাহী বংশের বিদায় পর্যন্ত পুরোপুরি দু'শ বছর বাংলা নিরবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা ভোগ করে। এ সময়কাল বাংলার ইতিহাসে শুধু গৌরবময় নয়, বরং নতুন উপাদানে সমৃদ্ধ বঙ্গীয় জাতিসত্তার উন্মেষের কাল। ১৫৩৮ সালে শেরশাহ্ কর্তৃক বাংলায় শূর বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্রাট হুমায়ূনকে পরাজিত করে শেরশাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলে বাংলা তার স্বাধীনতা হারায় এবং দিল্লীর একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ১৫৬৪ সালে শূর শাসনের অবসান ঘটিয়ে তাজ খান কররানী বাংলায় কররানী পাঠান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশ প্রায় এগার বছর স্বাধীনভাবে (১৫৬৪-১৫৭৬খ্রি.) বাংলা শাসন করে। অতপর বাংলা মুঘল আগ্রাসনের শিকার হয়। মুঘলদের এ অধিকারের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীন শাসনের অবসান ঘটে এবং বাংলা মুঘল ভারতের একটি সুবা বা প্রদেশে পরিণত হয়। আঠারো শতকের প্রথমদিকে মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির অবক্ষয়ের সুযোগে সুবাদার মুর্শিদকুলি খান বাংলায় একটি কার্যত স্বাধীন নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই নবাবী শাসন পূর্ববর্তি বাংলার রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যলোচনা প্রয়াস বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

২.১ রাজনৈতিক অবস্থা

২.১.১ প্রাক-মুঘল যুগ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তের শতকের সূচনা লগ্নে তুর্কি বীর ইখতিয়ার-উদ্-দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনকে (১১৭৮-১২০৭ খ্রি.) অতি সহজে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম রাজনৈতিক শাসনের গোড়া পত্তন করেন। বখতিয়ার খলজীর সহজ বঙ্গ বিজয়ের পশ্চাতে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধদের মধ্যকার প্রকাশ্যত তীব্র সামাজিক দ্বন্দ্বের কথা বলা হলেও নীহাররঞ্জন রায় একে সেন শাসিত (১০৭০-১২৩০ খ্রি.) বাংলার

---

[১] অবশ্য বাংলার সাথে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ খ্রিষ্টীয় আট শতক থেকে। তবে এ যোগাযোগ ছিল একান্তই বাণিজ্যিক পর্যায়ে। এর সাথে ইসলাম প্রচারের কোন যোগসূত্র ছিল কি-না, তা কোন অকাট্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণীত নয়। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal (Down toA.D. 1538)*, মোকাদ্দেসুর রহমান কর্তৃক *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত* শিরোনামে বাংলায় অনুদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ.পৃ. ২৯-৪০

রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির এক অনিবার্য পরিণতি বলে মনে করেন।[২] নীহাররঞ্জন রায় এর মতে, এ বিজয় মূলত ইতিহাস ও সমাজ প্রকৃতির নিয়মেই সম্পন্ন হয়। দ্রাবিড়রা যেমন আর্যদের অশ্বশক্তির নিকট পরাভূত হয়েছিল, তেমনি তুর্কি অশ্বশক্তির নিকট ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরা নতি স্বীকার করে।[৩] আবদুল করিম মনে করেন যে, ইখতিয়ার-উদ্-দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বিজয় বাংলায় এক নতুন যুগের সূচনা করে। এ বিজয়ের রাজনৈতিক প্রভাব হলো বাংলায় মুসলিম তুর্কি শাসন এবং সামাজিক তাৎপর্য হলো মুসলিম সমাজের গোড়া পত্তন।[৪]

ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিচারে তুর্কিদের বঙ্গ বিজয় হতে ইলিয়াস শাহের ক্ষমতা আরোহন পর্যন্ত প্রায় দেড়'শ বছর সময়কালকে অনেকেই বাংলার ইতিহাসে যুগসন্ধিকাল বলে মনে করেন। এ সময়কালে মাঝে মধ্যে দিল্লী সালতানাতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও অধিকাংশ সময়ই বাংলা স্বাধীন ছিল। সুলতান ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রি.) এবং গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৪৬-১২৮৭ খ্রি.) বাহুবলে বাংলায় দিল্লীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তবে তা ছিল নিতান্তই সাময়িক। বলবনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দিল্লীর সঙ্গে বাংলার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। দিল্লীর খলজী তুর্কি সালতান যুগে (১২৯০-১৩২০ খ্রি.) বাংলায় ইলবারী তুর্কিরা (১২৮২-১৩০১ খ্রি.) এবং সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ খ্রি.) এবং তাঁর উত্তরসূরিরা বাংলা ও বিহারে তাদের স্বধীনতা বজায় রাখে। এ সময়ই সাতগাঁও, সোনারগাঁও, ময়মনসিংহ ও সিলেটের মতো পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি বাংলার মুসলিম রাজ্যের সাথে যুক্ত হয় এবং দক্ষিণ বাংলার জলাভূমি অঞ্চল ছাড়া গাঙ্গেয়-বদ্বীপ অঞ্চল এক শাসনের অন্তর্ভূক্ত হয়।[৫]

তুঘলক শাসনামলে (১৩২০-১৪১২ খ্রি.) বাংলায় আবার দিল্লীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় বাংলার শাসন ব্যবস্থা পূনর্বিন্যাস করে একে তিনটি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করা হয়।[৬] তবে এ বিভাজন কোন স্থায়ী ফল বয়ে আনেনি। দিল্লী সালতানাতের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ[৭] সোনারগাঁও এ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফখরুদ্দিনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বাংলার অন্যান্য প্রশাসনিক কেন্দ্রও স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং নিজেদের কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই বিশৃঙ্খল যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকেই সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীন সালতান যুগের সূচনা হয়।

১৩৪২ সালে সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫২ খ্রি.)[৮] লাখনৌতিতে স্বাধীন ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন নানা দিক থেকে তাৎপর্যমণ্ডিত। আলোচ্য অঞ্চলের স্থায়ী নামকরণ তথা সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিকসত্ত্বার বিকাশে ইলিয়াস শাহী শাসকদের অনবদ্য অবদান রয়েছে।

---

[২] নীহার রঞ্জন রায়,*বাঙ্গালির ইতিহাস (আদি পর্ব)*, পৃ. ৪২৬

[৩] ঐ, পৃ. ৩৫৩

[৪] আবদুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২

[৫] আবদুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৪৮

[৬] (ক) উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা, প্রশাসনিক কেন্দ্র লাখনৌতি, (খ) দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা, প্রশাসনিক কেন্দ্র সাতগাঁও এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা, প্রশাসনিক কেন্দ্র সোনারগাঁও।

[৭] ফখরউদ্দিন মুবারকশাহ সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের রিসালাদার বা বর্মরক্ষক ছিলেন। বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে সোনারগাঁও এ সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৩৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি সোনারগাঁও এ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন।

[৮] আরব ঐতিহাসিক ইবন-ই- হাজর ও আল সাখাভীর মতে, ইলিয়াস শাহের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন ইরানের সিজিস্তানের অধিবাসী। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিমের বর্ণনা মতে, ইলিয়াস শাহ ছিলেন লাখনৌতির শাসনকর্তা আলী মোবারকের ধাত্রী পুত্র। এই আলী মোবারককে পরাজিত ও হত্যা করে ইলিয়াস শাহ স্বাধীন ইলিযাস শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

বস্তুত সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলাকে একই শাসন কর্তৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। এজন্য তাঁকে যথার্থভাবেই 'শাহ-ই-বাঙ্গালা', 'শাহ-ই-বাঙ্গালীয়ান' এবং 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ্' অভিধায় অভিষিক্ত করা হয়।[৯] সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ এবং তাঁর উত্তরসূরি শাসকরা দিল্লী, উড়িষ্যা, জৌনপুর, অহম, ত্রিপুরার সাথে অবিরাম যুদ্ধ করেই বাংলার ভৌগোলিক সত্তা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটাই কালক্রমে হয়ে ওঠে বঙ্গীয় জাতিসত্তা বিকাশের প্রধান উপাদান। ইলিয়াস শাহীদের সৌজন্যে গড়ে ওঠা মানচিত্রই মূলত বাঙ্গালী জাতিসত্তার মোটামুটি ভৌগোলিক সীমারেখা বলে পরবর্তীকালে বিবেচ্য হয়।[১০]

পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি রাজা গণেশে[১১] নেতৃত্বে বাংলায় একটি রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হয়। রাজা গণেশের কাছে সুলতান আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহের পরাজয়ের ফলে সাময়িকভাবে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের অবসান ঘটেছিল। অবশ্য প্রবল মুসলিম শাসক শ্রেণী বর্তমান থাকতেও একজন অমুসলিমের ক্ষমতা দখলের বিষয়টি মুসলিম অভিজাত ও শাসকগোষ্ঠির অনেকের নিকট অভাবনীয় ও অসহনীয় ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। এ ঘটনাকে তারা ইসলামের পরাজয় এবং হিন্দু কর্তৃক মুসলমানদের ক্ষমতায় অবৈধ অধিকার বলে মনে করেছিলেন। ফলে এরা দরবারে একটি গণেশ বিরোধী গ্রুপ গড়ে তোলেন এবং প্রখ্যাত সুফি শেখ নূর কুতুব-ই-আলম এতে নেতৃত্ব দেন। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কির সহায়তায় এরা গণেশকে পরাভূত করেন। গণেশ পুত্র যদু ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হয়ে 'জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ' নাম ধারণ করে অল্পকাল এবং তাঁর মৃত্যুর পুত্র শামসউদ্দিন আহমদ শাহ আরো কিছুকাল ক্ষমতায় ছিলেন। ১৪৪২ সালে শামসউদ্দিন আহমদ শাহ আততায়ী কর্তৃক নিহত হলে গণেশের বংশধরদের শাসনামলের ইতি ঘটে। বাংলার অভিজাতবর্গ ক্ষমতাচ্যুত ইলিয়াস শাহী বংশের নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ শাহকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে ইলিয়াস শাহী বংশের পূনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। পূনঃস্থাপিত ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকগণ ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করে।

ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ কেবল ভূ-রাজনীতির ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রমাণ দেয়নি, গৌড়ের সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে তারা বিদেশ নীতির ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন। দিল্লী-জৌনপুরের সাথে বাংলার বৈরী রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে ইলিয়াসশাহী শাসকগণ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের স্নায়ুকেন্দ্র মিশরের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এরই ফলশ্রুতি।[১২] শুধু মুসলিম বিশ্বের সাথে নয়, ইলিয়াস শাহী যুগে চীন ও আরাকানের সাথেও বাংলার বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এ দুদেশের সাথে বাংলার কূটনৈতিক সম্পর্কে অর্থনেতিক বিশেষকরে সাংস্কৃতিক দিক থেকেও ছিল বিশেষ তাৎপর্যবহ। বাংলা ভাষা ও

---

[৯] শামস-ই-সিরাজ আফিফ, *তারিখ-ই- ফিরুজশাহী*, কলকাতা, ১৮৯০, পৃ.পৃ. ১১৮-১৮

[১০] জাতীয়তার জন্য একটি আদর্শগত ভিত্তি রচিত হলেও জাতীয়তার জন্য যে নির্দিষ্ট ভূখন্ডের প্রয়োজন পাল–সেন যুগে তা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। সমগ্র বাংলার বঙ্গ নাম নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু-বৌদ্ধ আমলে ঘটেনি ;তখনও বিভিন্ন জনপদ বা প্রশাসনিক এলাকার বিচ্ছিন্নতা এতই প্রকট ছিল যে, বৃহত্তর বঙ্গদেশের ধারণাই তখনকার দিনে দাঁনা বাঁধেনি। কিন্তু তুর্কি-পাঠান শাসনামলে এ কাজটি সম্পন্ন হয়।

[১১] বস্তুত রাজা গণেশ ছিলেন রাজ দরবারের অন্যতম কূটকৌশলী অমাত্য এবং ভাতুড়িয়ার জমিদার। তিনি 'দনুজমর্দনদেব' উপাধি নিয়ে বাংলা শাসন শুরু করেছিলেন। রিচার্ড এম ইটন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৬

[১২] মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল মূখ্যত উত্তর ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা। দ্বিতীয়ত, বাংলার সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ সৃষ্টি করা এবং তৃতীয়ত, বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে বঙ্গীয় জাতিসত্ত্বা গ্রহণযোগ্য করা।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি এবং সেই সাথে বাঙ্গালি জাতিসত্ত্বার সুসন্তান বাঙ্গালি মুসলিমদের শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশের দৃষ্টিকোন থেকে বিচারে আরাকান- বাংলা সম্পর্ক যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা বলা বাহুল্য।

ইলিয়াস শাহী শাসনামলে পরিবর্তিত বাস্তবতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ছিল প্রশাসনে জনগোষ্ঠীতে বহিরাগত মুসলমানদের আগমন। এ ক্ষেত্রে আবিসিনীয়ার হাবশী গোত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময় তাদের সেনাবাহিনী ও রাজপ্রাসাদের রক্ষীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হয়।[১৩] প্রাসাদ রাজনীতি এবং ষড়যন্ত্রের সুযোগে হাবশীরা তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পায় এবং ইলিয়াস শাহী বংশের রক্ষক থেকে নিজেরাই সাম্রাজ্যের প্রভূতে পরিণত হয়।[১৪] হাবশীদের হাতে সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রি.) নিহত হলে বাংলায় ইলিয়াস শাহী শাসনের অবসান ঘটে এবং হাবশী রাজত্বের সূচনা হয়। তবে বাংলায় হাবশী শাসনের স্থিতিকাল ছিল মাত্র ছয় বছর (১৪৮৭-১৪৯৩) এবং এ সময়কালে চারজন সুলতান রাজত্ব করেন। তাদের শাসনামলে বাংলা থেকে জনকল্যাণ ও সুশাসন একরকমের অন্তর্হিত হয়েছিল বলে তাদের শাসনামল বাংলার ইতিহাসে অন্ধকার ও কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে।[১৫]

হাবশী বংশের শেষ সুলতান শামসউদ্দিন মুজাফ্ফর শাহ (১৪৯১-৯৩) নিষ্ঠুর শাসন ও প্রজাপীড়নে বিক্ষুব্ধ অভিজাতগণ রাজদরবারে একটি বিদ্রোহী দল গড়ে তোলে । প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ হোসেন এতে নেতৃত্ব দেন। সৈয়দ হোসেন তাঁর ানুগত সেনাবাহিনী ও অভিজাতদের সহযোগিতায় ১৪৯৩ সালে মুজাফফর শাহকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন। ফলে বাংলায় হাবশী শাসনের কলঙ্কিত অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। বিজয়ী সৈয়দ হোসেন নিজে 'আলাউদ্দিন হোসেন শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহনের মধ্য দিয়ে বাংলায় 'হোসেন শাহী'[১৬] বংশের শাসনের সূচনা করেন। হোসেন শাহী বংশের চার জন সুলতান[১৭] ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করে। তাদের রাজত্বকাল ছিল বাংলার ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল স্বর্ণযুগ।[১৮] শিক্ষা-সংস্কৃতিতে তো বটেই, সবদিক দিয়ে এ সময় স্বাধীন বাংলা গৌরব ও মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছে। হোসেন শাহী সুলতানগণ বাংলার স্বাধীন সালতানাতের সীমা শুধু অক্ষুন্ন রাখেননি, বাংলার বাইরেও তারা রাজ্য সীমা সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে লক্ষণীয় যে, হোসেন শাহী শাসনামলেই সার্বভৌম বাংলার রাজনৈতিক পতন ঘন্টাও বেজে ওঠেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। প্রথমত বিশ্ব পরিসরে ইউরোপে বাণিজ্যতন্ত্র ও বাণিজ্য বিপ্লবের সূচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানির

---

[১৩] *তারিখ-ই- ফিরিস্তা*, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৮০

[১৪] উদ্ধৃতি, J N Sarkar (ed.) *History of Bengal* vol. II, p. 138

[১৫] J N Sarkar (ed.), *op.cit,* p. 142

[১৬] হোসেন শাহীরা ছিল জাতি আরব। *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থে হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নামের সাথে 'শরীফ মক্কী' কথাটি উল্লেখ রয়েছে। বাংলা অনু. পৃ. ১০১; মুহাম্মদ মোহর আলী এ বংশকে হোসেন শাহী না বলে আরব বংশ বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন। *History of the Muslims of Bengal,* Riyad, KSA, p.183

[১৭] সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯), সুলতান নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২), সুলতান ফিরূজ শাহ (১৫৩২-১৫৩৩) ও সুলতান গিয়াসউদ্দিন মহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮)

[১৮] হোসেন শাহী শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় সূচিত হয়েছিল বলে মমতাজুর রহমান তরফদার মন্তব্য করেছেন। মমতাজুর রহমান তরফদার *হোসেন শাহী আমলে বাংলা* (বাংলা অনুঃ মোকাদ্দেসুর রহমান) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্যে আগমন ঘটে। এদের মধ্যে ইউরোপীয় পূনরুত্থানবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিভূ পর্তুগিজরা ছিল পথিকৃত। এরা প্রথমে ভারতে এবং পরবর্তীতে বাংলায় এসে এখানকার উদিয়মান বণিক শক্তিকে ধ্বংস করে। এর ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। রাজনৈতিকভাবেও হোসেন শাহীদের অস্তিত্ত হুমকির সম্মুখিন হয়। দ্বিতীয়ত দিল্লীর লোদীদের হাতে ১৪৯৫ সালে হোসেন শর্কির পরাজয়ের ফলে জৌনপুর রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে এবং এর ফলে বাংলা সরাসরি দিল্লী সালতানাতের পড়শি রাজ্যে পরিণত হয়। এতে উভয় রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর প্রচন্ড চাপ প্রসার লাভ করে। নুসরত শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহন করার দু'বছর পর দিল্লীর লোদী বংশের অবক্ষয় ও পতন আরম্ভ হয়। সুলতান ইব্রাহীম লোদীর দুর্বলতার সুযোগে পাটনা থেকে জৌনপুর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল লোহানী ও ফরমুলী আফগানদের প্রভাব বলয়ে পরিণত হয়।[১৯] লোহানী আফগানরা বিহারে রাজ্য স্থাপন করে। লোদীদের অবক্ষয়ের সুযোগের ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বাবরের নেতৃত্বে মুঘল শক্তির আবির্ভাব ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোগ করে। সম্রাট বাবুরের নেতৃত্বে ১৫২৬-১৫৩০ সালের মধ্যে ঘুঘরা নদী পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হওয়ায় উক্ত নদী বাংলা ও মুঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ সীমারেখায় পরিণত হয়।

মুঘল শক্তির অভ্যুদয়ে বঙ্গীয়-পাঠান-মুঘল জাতিসত্ত্বার মধ্যকার সংযোগ ও সংঘাতে ভারতে এক অভিনব অবস্থার উদ্ভব হয়। এসময় ইব্রাহীম লোদীর ভাই মাহমুদ লোদী বিহার দখল করে উদিয়মান মুঘল শক্তির প্রতিরোধকল্পে তাঁর নেতৃত্বে আফগানদের ঐক্যবদ্ধ করেন। বায়েজিদ, বিবন, ফতেহ খান এবং শেরখান শূরের মত বেশ কিছু নামজাদা আফগান নেতা এ মৈত্রী সংঘে যোগ দেন।[২০] মুঘলদের সাথে মুখোমুখি সংঘাত এড়াতে বাংলার হোসেন শাহী সুলতান মুঘল বিরোধী মৈত্রী সংঘকে সমর্থন না বা সহযোগিতা করেননি। অবশ্য এতেও তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। ১৫৩৮ সালে বিহারে ক্ষমতাসীন শের খান শূরের হাতে সুলতান মাহমুদ শাহের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় হোসেন শাহী যুগের অবসান ঘটে এবং শূর আফগান শাসন (১৫৩৮-১৫৬৪ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক এ পালা বদলের মধ্য দিয়ে কার্যত বাংলার স্বাধীনতা সালতানত যুগের অবসান ঘটে। ১৫৬৪ সালে শূর আফগানদের পতন এবং কররাণী আফগানদের ক্ষমতা দখলের মধ্যদিয়ে বাংলায় পুনরায় স্বাধীন সালতান প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, তবে তার স্থায়িত্বকাল ছিল মাত্র এক যুগ।[২১]

২.১.২ মুঘল সম্প্রসারণবাদের কবলে বাংলা

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫খ্রি.) বাংলার প্রতি মুঘলদের শৈণঃদৃষ্টি পড়ে। অবশ্য রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও গভীর কূটনীতিজ্ঞানের অধিকারী সুলতান সুলায়মান কররাণীর (১৫৬৫-১৫৭২ খ্রি.) কৌশলী ও সতর্ক নীতির কারণে তাঁর সময়ে বাংলা সম্প্রসারণবাদী মুঘলদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরী সুলতান দাউদ খান কররাণীর অপরিণামদর্শী এবং ভ্রান্তনীতি মুঘলদের বাংলা জয়ের সুযোগ করে দেয়। ১৫৭৪ সালে সম্রাট আকবর স্বয়ং

---

[১৯] মমতাজুর রহমান তরফদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০

[২০] ঐ, পৃ. ৬১

[২১] কাররাণী আফগানদের চারজন সুলতান তাজখান কররাণী (১৫৬৪-১৫৬৫খ্রি.), সুলায়মান কররাণী (১৫৬৫- ১৫৭২খ্রি.), বায়জিদ কররাণী (১৫৭২ খ্রি.) এবং দাউদ খান কররাণী (১৫৭২-১৫৭৬ খ্রি.) মাত্র বার বছর স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে পেরেছিলেন।

পাটনা অধিকার করেন। একই বছর মুনিম খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী বাংলার রাজধানী তান্ডা দখল করে।[২২] ১৫৭৫ সালে তুকরাইয়ের যুদ্ধে এবং ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে মুঘলদের হাতে বাংলার আফগান শক্তি বিপর্যস্ত হলে বাংলার স্বাধীন সত্তার বিলুপ্তি ঘটে। তবে এ কথাও সত্য যে, আকবরেরর বিজয় অভিযানে কাররাণীরা ঠিকে থাকতে পারেনি বটে, কিন্তু বাংলার উপর মুঘল স্বার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে মুঘলদের আরও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। ইতোমধ্যে বাংলার অনেক জমিদার (যাদের অনেকেই ছিলেন পাঠান) ঈসা খাঁর নেতৃত্বে মুঘলদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাংলার ইতিহাসে একেই 'বার ভূঞাদের' অভ্যুত্থান বলা হয়।[২৩] বাংলায় আফগান রাজশক্তির পতনের পর এরা মুঘলদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পরবর্তী তিন দশকের ক্রমাগত চেষ্টা সত্বেও সম্রাট আকবরের পক্ষে বার ভূঞাদের প্রতিরোধ নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। ফলে আকবরের জীবদ্দশায় শুধু বাংলার পশ্চিম অংশ অর্থাৎ ঘোড়াঘাট থেকে দক্ষিণে বগুড়ার শেরপুর মোর্চা হয়ে উত্তরবঙ্গে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪] অবশ্য সম্রাট আকবর অধিকৃত অঞ্চলটুকু নিয়েই বাংলা একটি স্বতন্ত্র সুবা বা প্রদেশে পরিণত করেছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর সুবা বাংলার আয়তন বৃদ্ধি এবং এর উপর মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সুবাদার ইসলাম খান চিশতির নেতৃত্বে ১৬১১ সালের মধ্যে বার ভূঞাদের প্রতিরোধ নির্মূল হলে চট্রগ্রাম ব্যতীত সমগ্র বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যভূক্ত হয়। রাজমহলের পরিবর্তে ঢাকায় (জাহাঙ্গীরনগর) সুবা বাংলার রাজধানী স্থাপন করা হয়।[২৫] উল্লেখ্য যে

---

[২২] কররাণী সুলতান সুলায়মান কররাণী গৌড় থেকে তান্ডায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। তান্ডা মালদাহ হতে ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

[২৩] বাংলার ইতিহাসে 'বার ভূঞা' নামটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। আফগানদের পতন এবং বাংলায় পূর্ণ মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার অর্ন্তবর্তী প্রায় তিন যুগ বার ভূঞা নামে পরিচিত সামন্ত জমিদার ও সেনাপতিরা মুঘলদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা স্বাধীন বা আধা-স্বাধীনভাবে নিজ নিজ নিয়ন্ত্রিত এলাকা শাসন করে। আবুল ফজল তাঁর *আকবর নামায়* এবং মীর্যা নাথান তাঁর *বাহারিস্তান-ই-গায়েবী* গ্রন্থে মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এসব ভূ-স্বামীদের 'দাওয়াজদাহ বুমি' বা বার ভূঞা নামে উল্লেখ করেছেন। *রাজমালা*'য় 'দ্বাদশ বাঙ্গালা' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে বার ভূঞাদের পরিচিতি এবং তাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রবল মতানৈক্য রয়েছে। বার ভূঞাদের সম্পর্কে কতগুলো গুরুতর মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে সতীশচন্দ্র মিত্র এবং আবদুল করিম সবিস্তার আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপরে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর -খুলনার ইতিহাস* , দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ.পৃ. ২২-২৪, এবং আবদুল করিম ' বার-ভূঞা পরিচিতি' আবু মহামেদ স্মারক বক্তৃতা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১ মার্চ ১৯৯২, ও *History of Bengal, Mughal period,* vol. I, IBS, University of Rajshahi, 1992, pp. 29-135. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রায় তিন যুগ ধরে মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বাংলার বার ভূঞাদের মূল্যায়নে কোনো ঐতিহাসিক ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমকালীন অধিকাংশ, এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত *History of Bengal,* vol.II গ্রন্থেও বার ভূঞা প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। এতে মুঘল শক্তির প্রতিরোধে বার ভূঞাদের সাহসীকতাপূর্ণ কার্যকলাপ সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। শুধু তাই নয়, এ গ্রন্থে আচার্য যদুনাথ সরকার বার ভূঞাদের স্বাধীনতা প্রীতি এবং স্বদেশ প্রেম সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন। শুধু যদুনাথ সরকার নয় সুধীন্দ্রনাথ ভট্রাচার্যসহ অনেক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক বার ভূঞাদের বাংলার দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাকামীদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে চাননি। কোন সন্দেহ নেই, তারা ছিলেন সে দিনের প্রতাপশালী সামন্তশক্তি এবং সে সময় রাষ্ট্র, জাতি বা স্বাদেশিকতার ধারণাও স্পষ্টভাবে গড়ে ওঠেনি- তাই বলে কি তাদের স্বাধীনতার নেতা বলা যাবে না? দিল্লীর বৃহৎ মুঘল সামন্ততান্ত্রিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলার সব সামন্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি আর কিছুদিন প্রতিরোধ সংগ্রামে ঠিকে থাকতে পারতো, তা হলে তাদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা বড় হয়ে দেখা দিতো এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তার বন্ধন তৈরী হতো। ইউরোপের জাতী রাষ্ট্রের উত্থানের ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেয়।

[২৪] যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য মুঘল আনুগত্য স্বীকার করায় দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাংশেও মুঘলদের কর্তৃত্ব ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। Abdul Karim, *History of Bengal, Mughal period,* vol. I, p. 661.

[২৫] ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের কৃতিত্ব ইসলাম খানের। তবে তিনি কবে এবং কিভাবে ঢাকায় সুবা বাংলার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এ ব্যাপারে সমসাময়িক তথ্যসূত্রগুলোতে মত ভিন্নতা রয়েছে। আবদুল করিম এসব তথ্যসূত্র পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ইসলাম খান ১৬১০ সালে ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানীতে পরিণত করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে এর নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। Abdul Karim, *History of Bengal, Mughal period,* vol. I, pp. 228-234

Dhaka University Institutional Repository

মুঘলরা শক্তি দিয়েই বাংলার স্বাধীনতা হরণ করেছিল। বাংলার মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই প্রথম বাংলার রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ শুরু হয়। বাংলা মুঘল সংস্কৃতিক আগ্রাসনেরও শিকার হয়। এ সময় দুশ বছরের স্বাধীন সালতানাত যুগে গড়ে ওঠা বাংলার মানচিত্র এবং বাংলা ভাষা বিলুপ্ত করা সম্ভব না হলেও উদিয়মান বঙ্গীয় জাতিসত্ত্বার বিকাশ বিপুলভাবে ব্যহত হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.) ছিল বাংলায় মুঘল শাসনের সুপ্রতিষ্ঠা এবং এর গঠনাত্মক যুগ (Formative period)। এসময় বাংলার সীমান্তবর্তী রাজ্য কোচবিহার, কামরূপ এবং কাছারের সাথে মুঘলদের সংঘাত হয়। জাহাঙ্গীরের সময় অল্প সময়ের জন্য ত্রিপুরায় মুঘল অধিকারও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তবে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হলো বিদ্রোহী শাহজাদা খুররম (শাহজাহান)-এর বাংলা অধিকার। ১৬২৪ সালে প্রথমদিকে বিদ্রোহী শাহজাদা বাংলা দখল করে নেন।[২৬] তবে বাংলায় তিনি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন নি। ১৬২৫ সালের জানুয়ারি মাসেই মহাবত খানের নেতৃত্বে মুঘল রাজকীয় বাহিনীর হাতে পরাস্ত হয়ে বিদ্রোহী খুররম বাংলা ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে চলে যেতে বাধ্য হন। ফলে বাংলায় পুনরায় কেন্দ্রীয় মুঘল রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, বিদ্রোহী শাহজাদার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুঘল কেন্দ্রীয় শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় বটে, তবে এ ঘটনার মধ্যদিয়ে মুঘল রাজনীতির যে সীমাহীন দুর্বলতা প্রকাশিত হয় এর ফলে আরাকানী মগরা বাংলা আক্রমণ এবং লুটপাটে সাহাসী হয়।[২৭] ১৬০৭ সালে সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহন থেকে ১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত আশি বছর বাংলায় মুঘল শাসন মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই পরিচালিত হয়। এ সময় বাংলার কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস ছিল না বললে সম্ভবত অত্যোক্তি হয় না। বস্তুত এ সময়কার বাংলার ইতিহাস মুঘল কেন্দ্রীয় শাসনের ইতিহাসে পরিণত হয়েছিল। এ সময়কালে এগারজন সুবাদার বাংলা শাসন করেন।[২৮]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্রাট শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেরে রাজত্বকালে কিছু বিচ্ছিন্ন এবং ছোট-খাট ঘটনা ছাড়া বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত ছিল। শাহজাহানের রাজত্বকালে পর্তুগিজরা হুগলিতে আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী ও নানা রকমের অনৈতিক ও নিপীড়নমূলক তৎপরতা শুরু করলে তাদের পরাস্ত করে হুগলিকে মুঘল শাসনের অধীনে যুক্ত করা হয়।[২৯] সুবা বাংলার সীমান্তবর্তী আসাম রাজ্যের রাজা প্রতাপ সিংহের (১৬০৩-১৬৪১খ্রি.) আগ্রাসন প্রতিহত করে সুবা বাংলার ভৌগোলিক ঐক্য বজায় রাখা হয়। আরাকানী মগদের বিতাড়িত করে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার

---

[২৬] সম্রাট জাহঙ্গীরের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের একচ্ছত্র প্রভাব, তাঁর মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা লিপ্সা ও ষড়যন্ত্র ইত্যাদি শাহজাদা খুররমের মনে ভবিষ্যতে দিল্লীর সিংহাসন হতে বঞ্চিত হওয়ার অশঙ্কা তৈরী করেছিল। এ অবস্থায় তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং দিল্লী আগ্রা দখলে ব্যর্থ হয়ে বাংলা দখল করেন।

[২৭] Abdul Karim. *History of Bengal, Mughal period,* vol. I, pp. 653-654

[২৮] সুবাদার শাহজাদা শাহ সুজা (১৬৩৯-৬০), সুবাদার শাহজাদা আজিমুদ্দিন (আজিম-উস-শান, ১৬৯৭-১৭১২), সুবাদার কাশিম খান জুয়াইনী (১৬২৮-১৬৩২), সুবাদার আজিম খান (১৬৩২-১৬৩৫), সুবাদার মীর জুমলা (১৬৬০-১৬৬৩), সুবাদার শায়েস্তা খান (১৬৬৩-১৬৭৮/১৬৭৯-১৬৮৮), সুবাদার ফিদাই আজিম খান (১৬৭৮), সুবাদার শাহজাদা মুহাম্মদ আযম শাহ (১৬৭৮-১৬৭৯), সুবাদার খান জাহান বাহাদুর (১৬৮৮-৮৯), সুবাদার ইসলাম খান মাশহাদী, সুবাদার ইব্রাহীম খান (১৬৮৯-১৬৯৮)।

[২৯] অবশ্য ১৬৩৩ সালে এক ফরমান দ্বারা সম্রাট পর্তুগিজদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে হুগলিতে বাণিজ্য করার পুনরানুমতি দেন। সকল প্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা বহাল রেখে পর্তুগিজরা বাংলার সুবাদার শাহ সুজার (১৬৩৯-৬০) কাছ থেকে ১৬৪১ সালে একটি নিশানও আদায় করেছিলেন বলে জানা যায়।

জনজীবনেও সস্তি ফিরিয়ে আনা হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবে শাসনামলে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) সুবাদার মীর জুমলা (১৬৬০-১৬৬৩খ্রি.) এবং সুবাদার শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৭৮/১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রি.)-এর প্রচেষ্টায় বাংলায় মুঘল শাসন আরো সুদৃঢ় রূপ লাভ করে। সুবাদার মীর জুমলা কামরূপ পুনরাধিকার করেন এবং কুচবিহার সম্পূর্ণরূপে মুঘল সাম্রাজ্যাধীনে আনেন।[৩০] সম্রাটের নামে কুচবিহারের রাজধানীর নামকরণ করা হয় 'আলমগীরনগর'। মীর জুমলা আসামকেও মুঘলদের করদরাজ্যে পরিণত করেন।[৩১] শুধু রণক্ষেত্রে সাফল্য নয় বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায়ও মীর জুমলা বাংলায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এ মহান সুবাদারের মৃত্যুর পর দাউদ খান ও দিলির খানের স্বল্প সময়ের সুবাদারি শাসনামলে সুবাদার এবং উচ্চ রাজকর্মচারীদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং নিজেদের মধ্যে বিরোধ ও কলহের ফলে বাংলায় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর মামা শায়েস্তা খানকে[৩২] বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। শায়েস্তা খান সুবা বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কুচ রাজাকে কর দিতে বাধ্য করেন।[৩৩] তিনি জয়ন্তিয়া রাজ্যকে মুঘল অধিকারে আনেন এবং মুরংকে (কুচবিহারের পশ্চিমে এবং পূর্ণিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত পার্বত্য রাজ্য।) করদ রাজ্যে পরিণত করেন। তবে তাঁর সময়ের সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ অর্জন হচ্ছে বাংলা থেকে মগ বিতরণ ও পর্তুগিজ ফিরিঙ্গীদের নিকট হতে চট্টগ্রাম বিজয়। পর্তুগিজদের সহায়তায় শায়েস্তা খানে পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান ১৬৬৬ সালে আরাকানীদের পরাজিত করে চট্টগ্রাম জয় করেন। বিজিত চট্টগ্রামের নামকরণ করা হয় 'ইসলামাবাদ'।[৩৪]

১৬৭৮ সালে তিনি পদত্যাগ করে দিল্লী চলে যান। অবশ্য ১৬৭৯ সালে তাঁকে পুনরায় সুবাদার নিয়োগ করা হয়। এ অন্তবর্তী সময়ে ফিদাই আজিম খান এবং শাহজাদা মুহাম্মদ আজম বাংলায় সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুহাম্মদ আজমের সময় অহোমীদের পরাজিত করে গৌহাটি পদানত করা হয়। ১৬৭৯ সালে পুনঃনিয়োগ লাভের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে শায়েস্তা খানের প্রায় এক দশকের সুবাদারি শাসনামলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ইংরেজ ইস্ট

---

[৩০] কুচবিহার ছিল মুঘলদের একটি করদরাজ্য। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেই কুচ রাজা মুঘলদের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এক সময় কামরূপ কুচবিহারেরই অংশ ছিল। পরে ১৫৮১ সালের দিকে এটি কুচবিহার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং কুচ রাজ পরিবারের একটি শাখা দ্বারা শাসিত হতে থাকে। ১৬১২ সালে মুঘলরা কামরূপ অধিকার করে একে সুবা বাংলার সাথে যুক্ত করে নেয়। কিন্তু শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংঘাতের সুযোগে কুচবিহারের রাজা ভীম নারায়ন /প্রাণ নারায়ণ (১৬৩৩- ১৬৬৬) আসাম রাজ জয়ধ্বজের সহায়তায় ১৬৫৯ সালে কামরূপ দখল করে নেন। সম্রাটের নির্দেশে মীর জুমলা ১৬৬১ সালে কুচবিহার অধিকার করে সুবা বাংলার সাথে একে যুক্ত করেন।

[৩১] জয়ধ্বজের উত্তরসূরী রাজা চক্রধ্বজের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত অহোমীরা মুঘল আনুগত্য অস্বীকার করে এবং মুঘল অধিকৃত অঞ্চলসমূহ পূণর্দখল করে নেয়। এমনকি তারা মুঘল নিয়ন্ত্রণ থেকে কামরূপও কেড়ে নিয়েছিল। মুঘলরা অনেক চেষ্টা করেও পরে আর আসাম ও কামরূপের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পতিষ্ঠা করতে পারে নি।

[৩২] শায়েস্তা খান ছিলেন আসফ খানের পুত্র এবং সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের ভাই। বাংলার সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে শায়েস্তা খান বিহার, আগ্রা এবং দাক্ষিণাত্যে সুবদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সুদীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি ৬৩ বছর বয়সে সুবা বাংলায় আসেন এবং মাঝখানে একবছরের বিরতি ছাড়া ১৬৮৮ সাল পর্যন্ত বাংলায় সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

[৩৩] সুবেদার মীর জুমলার শাসনামলের শেষ দিকে কুচ রাজা প্রাণ নারায়ণ মুঘল কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। শায়েস্তা খান রাজা প্রাণ নারায়ণকে মুঘল আধিপত্য মেনে নিয়ে করদ প্রদানে বাধ্য করেন।

[৩৪] এ সময় আরাকান রাজ্যাধীন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার মেঘনা নদী অঞ্চল পর্যন্ত আরাকানী মগ ও পর্তুগিজ ফিরিঙ্গী (হার্মাদ নামে পরিচিত) জলদস্যুরা লুন্ঠন, হত্যাযজ্ঞ, নারী হরণ প্রভৃতি জঘন্য কাজ দ্বারা জনজীবনকে অতিষ্ঠিত করে তুলেছিল। সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর শায়েস্তা খান মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের উপদ্রব থেকে জনগণের জানমাল রক্ষা এবং চট্টগাম দখলের উদ্দেশ্যে প্রথমে সন্দীপ জয় করেন। এ সময় চট্টগ্রামের মগ শাসনকর্তা এবং পর্তুগিজ ফিরিঙ্গীদের মধ্যে বিরোধ বাঁধলে সুযোগ বুঝে শায়েস্তা খান পর্তুগিজ দলপতিকে উৎকোচ এবং তাদের অনেককে মুঘল নৌ বাহিনীতে চাকুরী দিয়ে বশীভূত করে তাদের সহায়তায় চট্টগ্রাম জয় করেন। চট্টগাম বিজয় সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Abdul Karim, *History of Bengal, Mughal period*, vol. II, pp. 549-608

Dhaka University Institutional Repository

ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে তাঁর বিরোধ। উল্লেখ্য যে, পশ্চিম ইউরোপের সমাজ বিকাশে নবযুগ তথা মার্কেন্টাইল যুগের সূচনায় প্রধান চালকের আসনে ছিল ইংল্যান্ড। বিশুদ্ধ মার্কেন্টাইল আদর্শ নিয়ে আগত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সতেরো শতকের গোড়াতে ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী সুরাটে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করলেও বাংলা বাণিজ্যে তাদের পুরোপুরি সম্পৃক্ততার ঘটনা ঘটে ১৬৫১ সালে। ১৬৫০ সালে সম্রাট শাহজাহানের নিকট থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা সম্বলিত একটি ফরমান লাভ করে এবং পরের বছরই কোম্পানি বাংলার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র হুগলিতে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এ বছরই কোম্পানি বাংলার সুবাদার শাহ সুজার কাছ থেকে একটি নিশান[৩৫] আদায় করে। এ নিশান প্রাপ্তিকে বাংলা বাণিজ্যে কোম্পানির একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হয়। একে কোম্পানির মুক্তি সনদ হিসেবেও কেউ কেউ বিবেচনা করেন।[৩৬] এ নিশান অনুযায়ী কোম্পানি বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বিনা শুল্কে ব্যবসার অনুমতি লাভ করে। ১৬৫৭ সালে কোর্ট অব ডাইরেক্টরের নির্দেশে কোম্পানি মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট থেকে বাংলা বাণিজ্য পৃথক এবং বাংলায় স্বাধীন বাণিজ্য এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করে।

১৬৬০ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ বছর স্টুয়ার্ট রেস্টুরেশনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে মার্কেন্টাইল আদর্শের জয় হয়। নতুন পরিস্থিতিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় বাণিজ্য সম্পসারণের নির্দেশ দেয়া হয়। এ জন্য প্রয়োজনে শান্তিবাদী নীতি ত্যাগ এবং বাংলায় দূর্গ নির্মাণে উদ্যোগী এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে ডাইরেক্টর সভা কোম্পানিকে পরামর্শ দেয়। এ পরিস্থিতিতে কোম্পানি একদিকে সম্রাট শাহজাহানের ফরমান এবং অন্যদিকে শাহ সুজার নিশানকে নজির হিসেবে ব্যবহার করে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জোর চেষ্টা চালালে মুঘল সরকার ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে বিবাদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুবাদার শায়েস্তা খানের সাথে কোম্পানির যুদ্ধ এরই ফল।[৩৭] ১৬৮৬ সালে মুঘল বাহিনী হুগলিতে সহজেই ইংরেজদের পরাস্ত করে। তবে নৌ শক্তিতে দুর্বল মুঘল বাহিনী নৌ যুদ্ধে ইংরেজদের চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করতে না পারায় প্রায় চার বছর ধরে যুদ্ধ চলে। ১৬৯০ সালে কোম্পানি মুঘলদের কাছে নতিস্বীকার করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করেন। আওরঙ্গজেবের দুর্বল ও দেউলিয়া সরকার অর্থনৈতিক কারণেই কোম্পানিকে ক্ষমা করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের ক্ষতিপুরণসহ অন্যায়ভাবে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা এবং বার্ষিক তিন হাজার টাকা শুল্ক প্রদানের শর্তে কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করা অনুমতি সম্বলিত একটি শাহী ফরমানও দেয়া হয়। ইংরেজদের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের জন্য বাংলার সুবাদার ইব্রাহীম খান কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নককে সুতানটিতে বাণিজ্য কুঠি নিমার্ণের অনুমতি দেন। কালক্রমে এই সুতানটি প্রাচ্যের বৃহত্তম নগরী কলকাতায় পরিণত হয় এবং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।

শায়েস্তা খানের উত্তরসুরী সুবাদার ইব্রাহিমের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শোভা সিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহের জন্য। বস্তুত সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ফলে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও মুঘল

---

[৩৫] নিশান হলো প্রদেশপাল কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্র। সম্রাট কর্তৃত দেয় অনুমতিপত্রকে ফরমান বলা হয়।

[৩৬] মুসা আনসারী, 'প্রাক-পলাশী যুগে কোম্পানির আর্থ-সামাজিক বিকাশধারা' *ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, পুনর্মুদ্রন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ.১৩২

[৩৭] যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্র. Abdul Karim, *History of Bengal, Mughal period,* vol. II, pp. 645-663

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শক্তির যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল মুঘল বিরোধী শক্তিসমূহ পুরোমাত্রায় এ সুযোগ গ্রহণ করে। যদুনাথ সরকারের মতে, ১৬৮৯ সালের পর দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের এবং উত্তর ভারতে জাঠ এবং রাজপুতদের বিদ্রোহ দমন করতে সম্রাট যখন ব্যর্থ হলেন তখন সে ব্যর্থতা বাংলার জমিদারদেরও খাজনা প্রদানে অস্বীকৃতিতে উৎসাহ যোগাল।[৩৮] বিদ্রোহের পতাকা প্রথম তুলে ধরেন মেদিনীপুরের ঘটাল চন্দ্রকোণা মহকুমার চেতো-বরদার জমিদার শোভা সিংহ। তাঁর সাথে উড়িষ্যার আফগান সরদার রহিম খান যোগ দেয়ায় বিদ্রোহ মারাত্মক রূপ ধারণ করে।[৩৯] শুরুতে সুবাদার এ বিদ্রোহের ব্যাপারে বিশেষ প্রতিক্রিয়া না দেখালেও পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে হুগলির ফৌজদার নূরুল্লাহকে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। তবে তাঁর পক্ষে এ বিদ্রোহ পুরোপুরি দমন করা সম্ভব হয় নি।[৪০] বিদ্রোহ দমনে সুবাদার ইব্রাহিম খানের ব্যর্থতায় সম্রাট আওরঙ্গজেব অসন্তুষ্ট হয় এবং তাঁকে বরখাস্ত করে নিজ পৌত্র যুবরাজ আজিমউদ্দিনকে (পরবর্তীকালে আজিম-উস-শান নামেই অধিক পরিচিত) বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। নতুন সুবাদার দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত সম্রাট ইব্রাহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খানকে আন্তবর্তীকালীন দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। জবরদস্ত খান ছিলেন সুযোগ্য সেনাপতি। তিনি বিদ্রোহীদের কাছ থেকে মখসুদাবাদ, রাজমহল ও মালদাহ ও বর্ধমান পূনরুদ্ধার করেন। রাজকীয় বাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে বিদ্রোহী নেতা রহিম খান তাঁর অনুসারীসহ চন্দ্রকোনার জঙ্গলে আশ্রয় নিলে বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শোভা সিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহ মুঘল বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ বিদ্রোহ মুঘল শাসনের দুর্বলতার এক উজ্জ্বল নির্দশন। তদুপরি এ বিদ্রোহ বঙ্গ-ভারতে ইউরোপীয় কোম্পানি বিশেষ করে ইংরেজদের জন্য ছিল আর্শিবাদস্বরূপ। কেননা বিদ্রোহ দমনে রাজকীয় উদ্যোগের শৈথিল্য দেখে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন বোধ করে। এ ব্যাপারে তারা ইব্রাহিম খানের দৃষ্টি আর্কষণ করলে সুবাদার তাদের নিরাপত্তা দানে অপারগতা প্রকাশ করে তাদেরকে নিজস্ব উদ্যোগ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন। বঙ্গ-ভারতের ইতিহাসে এর পরবর্তী প্রভাব ছিল মারাত্মক। বস্তুত এ সুযোগে নিজস্ব নিরাপত্তার নামে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের সুতানটি কুঠিতে ফোর্ট উইলিয়াম, ওলন্দাজরা চূচঁড়ায় ফোর্ট গুস্তাভাস এবং ফরাসিরা চন্দন নগরে ফোর্ট অরলিয়েন্স প্রতিষ্ঠা করে।[৪১] এসব দূর্গ পরবর্তীতে তাদের নিরাপত্তাই নয়, রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে ফোর্ট উইলিয়াম এদেশে ইংরেজ রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের প্রথম খূঁটি হিসেবে গণ্য হয়।

শোভা সিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহে বিদেশী কোম্পানিগুলোর মুঘল সরকারের প্রতি আনুগত্যের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিল। বিদ্রোহ দমনে মুঘল প্রাদেশিক সরকার কোম্পানিসমূহের সাহায্য প্রত্যাশা করেছিল, তারা এ বিষয়ে

---

[৩৮] বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, *সীতারাম*, যদুনাথ সরকারের ভুমিকা, বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৫২, পৃ.১০

[৩৯] বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Abdul Karim, *History of Bengal, Mughal period,* vol. II, pp. 707-717, J N Sarkar (ed.), *History of Bengal,* vol.II, pp. 391-396

[৪০] পর্তুগিজদের সহায়তা ফৌজদার নুরুল্লাহ হুগলি থেকে বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করেন। এসময় শোভা সিংহ রাজা কৃষ্ণরামের কন্যা কর্তৃক নিহত হলে বিদ্রোহীরা রহিম খানকে তাদের নেতা নির্বাচিত করেন। রহিম খান 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা মখসুদাবাদ, রাজমহল ও মালদাহ অধিকার করে।

[৪১] C. R. Wilson, *Early Annals of the English in Bengal,* Vol. I, Calcutta, 1917, p. 147

যৎসামান্য সাহায্যও করেছিল। তবে তাদের এ সহায়তায় কোন আন্তরিকতা ছিল বলে মনে হয় না। বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে কাতর কোম্পানি কর্তারা মনে করেছিলেন যদি বিদ্রোহীরা জয়যুক্ত হয়, তবে তারা মুঘলদের সাহায্য করার অপরাধে অভিযুক্ত হবে। এর ফলে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে। এ অবস্থায় তারা আইনানুগ মুঘল সরকারকে আন্তরিক সাহায্য না করে অনেকটাই নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। তাদের এ অবস্থান বরং বিদ্রোহীদেরই সাহায্যের নামান্তর ছিল বলা যায়।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতির ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রক্রিয়া শুরু হয়, তার সূত্র ধরে মূঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যে স্বশাসিত উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা ছিল তন্মধ্যে অন্যতম। এখানে মুর্শিদকুলি খানের নেতৃত্বে একটি স্বশাসিত রাজ্য গড়ে ওঠে- ইতিহাসে যা নবাবী রাজ্য নামে পরিচিত। আইনতঃ ও তত্ত্বগতভাবে বাংলার নবাব সরকার ছিল দিল্লীর মুঘল সরকারের সার্বভৌমত্বাধীন। তবে এই সার্বভৌমত্বের দাবি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সম্রাটদের নামে মুদ্রা জারী, খুৎবা পাঠ এবং বার্ষিক রাজস্ব প্রেরণের মাধ্যমে মুর্শিদকুলি খান এবং তাঁর উত্তরসূরী নবাবগণ মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে তাদের সার্বভৌমত্বের আনুষ্ঠানিকতা বজায় রেখে বাংলার নবাবগণ কার্যত স্বাধীন শাসকের মতোই রাজ্য পরিচালনা করতেন। বস্তুত কর্তৃত্বের প্রশ্নে নবাবী যুগে বাংলায় দিল্লীর মুঘল সম্রাটগণ ছিলেন "de-jure sovereign" বা আইনত সার্বভৌম এবং নবাবগণ ছিলেন "de-facto sovereign" বা কার্যত সার্বভৌম শাসক। অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরো সবিস্তার আলোচনা থাকবে।

উপরের আলোচনায় পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সেন শাসনাধীন বাংলা ইতিহাসে একটি বিশেষ সময়ে মুসলমান তুর্কিরা বাংলা জয় করে। অবশ্য তুর্কিরা রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে কোন নতুন আদর্শ বা কর্মসূচি নিয়ে আসে নি, বরং তারা এদেশে প্রচলিত সেনদের সামন্ততান্ত্রিক রাজকীয় স্বৈরচারী শাসন ব্যবস্থাই আত্মস্থ করে এবং প্রতিষ্ঠা করে সামরিক আমলাতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী সুলতানী স্বৈরাচার। তবে তুর্কিরা ছিল বিশ্ব যুগধর্ম সচেতন। আর এ জন্যই ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ না করে নতুন এলাকা জয় করে রাষ্ট্র গঠন এবং উর্বর দেশের ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করে স্বজাতির বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করে। এটি সামন্ততন্ত্রের মর্মকথাও বটে। তুর্কিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের উত্তরসূরী শাসকরা। এসময় দিল্লীর সাথে নিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। ইলিয়াসশাহী শাসকদের বদৌলত বাংলা পায় তার স্থায়ী নাম এবং একটি ভৌগোলিক পরিচয় ও নির্দিষ্ট মানচিত্র। ইলিয়াস শাহীদের সৌজন্যে গড়ে ওঠা মানচিত্রই মূলত বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বার মোটামুটি ভৌগোলিক সীমারেখা বলে পরবর্তীকালে বিবেচ্য হয়। হোসেন শাহী সুলতানদের দক্ষ পরিচালনা বাংলা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলা গৌরব ও মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছায়। তার পর না ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলা ত৭ার স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখলেও এর গৌরব রবি ক্রমশ ম্লান হয়ে পড়ে এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে বাংলা সামাজ্যবাদী মুঘল শক্তি আগ্রাসনের শিকার হয়। আর এমধ্য দিয়েই বাংলা তার স্বাধীনতা হারায়; বাংলা হয়ে পড়ে মহাপ্রতাপশালী মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে। এসময় থেকে নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত শতাধিক বছর বাংলার কোনো সতন্ত্র ইতিহাস নেই। তখন বাংলার ইতিহাস মানেই মুঘল

সাম্রাজ্যের ইতিহাস। বাংলায় নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্রদিয়ে বাংলা পুনরায় কার্যত একটি স্বাধীন ও সতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়।

২.২ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

প্রাক-নবাবী বাংলার রাজনৈতিক বিকাশ ক্রম আলোচনার পর এ পর্যায়ে পর্যালোচনাধীন সময়ের সামজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ধারা সম্পর্কে ালোচনা করা হলো।

২.২.১ সামজিক অবস্থাঃ সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস

ত্রয়োদশ শতকের উষাকালে ইসলাম ধর্মাবলী তুর্কিদের বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলা সেন বংশের শাসনের অধীনে ছিল। নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন সেন শাসন ছিল একান্ত হিন্দু ব্রাহ্মাণ্য আদর্শের শাসন, রাষ্ট্রে ব্রাহ্মাণ প্রধান্য এবং ব্রাহ্মাণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব ছিল নিরঙ্কুশ।[৪২] সেন যুগে বাংলায় স্বল্প সংখ্যক বৌদ্ধদের অস্তিত্ব থাকলেও রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জীবনে তাদের কোন প্রভাব ছিলনা। হিন্দু সমাজ গঠনের ভিত্তি ছিল বর্ণ প্রথা। বর্ণ ব্যবস্থার আদর্শগত ভিত্তি ছিল কুলবৃত্তি বা কর্মবাদ। বস্তুত বর্ণবাদ ছিল জাতি- সমাজ ও রাষ্ট্রে নিরেট অচলায়তন গড়ে তোলার এক নিয়ম ব্যবস্থা। স্বাভাবিকভাবে হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এ চার বর্ণে বিভক্ত ছিল। বৃত্তিতে ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল ধর্মীয় পৌরহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ চর্চা, ক্ষত্রিয়ের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এবং বৈশ্যদের কাজ ছিল ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা। এ তিন বর্ণের বাইরের সকল লোকই ছিল শূদ্র বর্ণভূক্ত এবং তাদের পেশা ছিল সেবা ও সহায়তামূলক কাজ।[৪৩] বর্ণপ্রথায় আন্তবর্ণের মধ্যে কঠোর সামাজিক বাধাবন্ধন অনুসরণ করার কারণে হিন্দু সমাজে নানা সামাজিক স্তর বিন্যাস ঘটে এবং সামজিক বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রবল হয়।

সামাজিক জীবনের উপর্যুক্ত পটভূমিকায় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বাংলায় তুর্কিদের আগমন। আগেই বলা হয়েছে যে, নবাগত বিজয়ী শক্তি যুগসচেতন ছিল বলে ধর্ম প্রচারকে তাঁর মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহার করেনি।[৪৪] অবশ্য তাদের মধ্যে ধর্ম চিন্তা যে একেবারে ছিল না এমন কথা হলফ করে বলার কোন সুযোগ নেই। বস্তুত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রভাব ছিল মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য। এমনকি মানবীয় কর্মকাণ্ড প্রকাশের ভাষাও ছিল ধর্ম। কাজেই তুর্কি বিজয়ের ফলে তাদের আচরিত ধর্ম বাংলায় দ্রুত বিস্তার লাভ করে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবদুল করিম মনে করেন তুর্কি বিজয়ের ফলে বাংলায় সামাজিকভাবে মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয়। বাংলার সাথে আরবদের প্রাথমিক যোগাযোগ অষ্টম শতক থেকে শুরু হলেও বাংলায় ইসলাম প্রচার এবং মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি বিজয়ের সময় থেকে নিধারিত হওয়া উচিত বলে আবদুল করিম মনে করেন।[৪৫]

বাংলার মুসলিম সমাজের গঠন প্রক্রিয়ার সূচনা ত্রয়োদশ শতকে হলেও এ অঞ্চলে ইসলামিকরণ ও মুসলিম সমাজের বিকাশ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক খুব বেশি দিনের নয়। উনিশ শতকের সত্তরের দশকের সূচনা পর্বে আদম শুমারীর ফলে এ

---

[৪২] নীহার রঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২০

[৪৩] আনিসুজ্জমান (সাম্পাঃ), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪০

[৪৪] ধর্ম প্রেরণায় তাড়িত না হওয়ায় কারণেই স্ব ধর্মীয় দিল্লীর শাসকদের সাথে বিরোধে জড়াতে তারা মোটেই কুণ্ঠাবোধ করেনি। বস্তুত বাংলায় আগত তুর্কিদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল নতুন এলাকা জয় করে রাষ্ট্র গঠন ও উর্বর দেশের ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করে তার মাধ্যমে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে অনুগত লোক তৈরির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা।

[৪৫] Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal (Down toA.D. 1538),* বাংলা অনুবাদ, পৃপৃ. ৩৮, ৪২

অঞ্চলে বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিটি সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তখন থেকেই ইসলামের গতি-প্রকৃতি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করেন যে, বাংলার বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে অভিবাসী মুসলমানদের বংশধর। তাদের মতে, তুর্কি বিজয়ের ফলে বহিরাগত মুসলমানদের জন্য বাংলায় আগমনের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভাগ্যন্বেষণে অনেক তুর্কি, পারসিক, আরব এবং আফগান বাংলায় আসেন এবং তাদের অনেকেই এখানে বসতি স্থাপন করেন। মধ্যএশিয়ায় মোঙ্গল আক্রমণ এবং সেখানকার ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রগুলো ধ্বংস বঙ্গ-ভারতে বহিরাগত মুসলিম অভিবাসনকে তরান্বিত করে। বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পর অনেক মুসলমান রাজকর্মচারী বাংলায় আসেন। এভাবে কয়েকটি মিশ্র গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে বাংলার বহিরাগত মুসলিম সমাজ। ফজলে রাব্বি বাংলার মুসলমানদের এ বহিগারত গোষ্ঠীর বংশধর বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৪৬] পরবর্তীতে এম এ রহিম, মুহাম্মদ মোহর আলী প্রমুখের বক্তব্যেও এ সুর শোনা যায়। এম এ রহিম এর তথ্য মতে, বাংলায় বহিরাগত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা প্রায় ত্রিশভাগ।[৪৭] অবশ্য হেনরি বেভারলি ও জেমস ওয়াইজ প্রমুখ এ অভিবাসন তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৪৮] কিছু প্রতিকূল মতামত থাকলেও স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্মান্তরণই বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রধান কারণ বলে ঐতিহাসিকমহলে সাধারণভাবে স্বীকৃত। আবদুল করিম বলেন, 'স্পষ্টতই এ অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল বহুলাংশে ধর্মান্তরণের ফল।'[৪৯] হেনরী বেভারলি ও জেমস ওয়াইজ প্রমুখ ইসলামে ধর্মান্তরণে বলপ্রয়োগ তত্ত্বের উপর জোর দেন।[৫০] আধুনিক বাঙ্গালি ঐতিহাসিকদের মধ্যে আর সি মজুমদারও এমত সমর্থন করেন।[৫১] এ তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে মুসলমান শাসকেরা বল প্রয়োগে তরবারির জোরে স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলাম ধর্মগ্রহণে বাধ্য করেন। কিন্তু বাংলায় ইসলামীকরণ সম্পর্কে তরবারি তত্ত্বের বাস্তব সমর্থন পাওয়া যায় না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ ছিল পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাবে। অথচ ইন্দো-তুর্কি শাসনের প্রান্তসীমায় অবস্থিত এ দুটি অঞ্চলে তরবারির প্রয়োগ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। অন্যদিকে দিল্লী, আগ্রা–যেখানে মুসলিম শাসন ছিল দীর্ঘস্থায়ী সেখানকার মুসলিম জনসংখ্যা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ।[৫২] কাজেই একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, রাজশক্তি বা তাদের তরবারি এদেশে ইসলাম প্রচারে সহায়ক হয় নি। ইসলাম প্রচারে কোনো কোনো রাজশক্তির সহানুভূতি থাকতে পারে, কিন্তু সহযোগিতা যে ছিল না তা প্রমাণীত সত্য।

---

[৪৬] এ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য খোন্দকার মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, *হাকিকত-ই- মুলমান-ই-বাঙ্গালাহ,* এই গ্রন্থটি *The Origin of the Musalmans of Bengal* (1895) নামে ইংরেজী অনুবাদ হয়।

[৪৭] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩-৫৪

[৪৮] হনরী বেভারলি ছিলেন ১৮৭২ সালের আদমশুমারির সংকলক। *Report on the Census of Bengal* শিরোনামে করা তাঁর সংকলনটি ১৮৭২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। জেমস ওয়াইজ ছিলেন ঢাকার সিভিল সার্জন। তিনি ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত 'The Muhammadans of Eastern Bengal' শীর্ষক রচনায় বাংলায় ইসলামীকরণ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যাখ্যা করেন।

[৪৯] Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal (Down to A.D. 1538),* বাংলা অনুবাদ, পৃ.১৯৮

[৫০] হেনরী বেভারলি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩২, জেমস ওয়াইজ *পূর্বোক্ত*,

[৫১] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, পুণমুদ্রণ, কলিকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৬৬

[৫২] রিচার্ড এম ইটন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৯

আবু এ গজনভী ও ফজলে রাব্বি প্রমুখ বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমানদের উচ্চবর্ণের হিন্দু-বৌদ্ধদের বংশধর বলে মত প্রকাশ করলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ ধর্মান্তরিত মুসলমানদের নিম্নবর্ণ হিন্দু-বৌদ্ধ হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।[৫৩] অনেকেই মনে করেন শাসক শ্রেণীর নিকট থেকে ধর্ম-বহির্ভূত কিছু পার্থিব সুবিধা লাভের আশায় অমুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে।[৫৪] তবে রিচার্ড এম ইটন এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। মুসলিম শাসনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বাংলার মুসলিম ধ্র্যুষিত অঞ্চলের দূরত্ব অনেক । ইটন মনে করেন পৃষ্ঠপোষকদের কেন্দ্র থেকে যতদূর যাওয়া হবে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার পরিমাণও তত হ্রাস পাবে।[৫৫] কাজেই বাংলার গ্রামীণ সমাজে সাধারণ মানুষের ইসলাম ধর্মান্তরণে এই লাভালাভের বিষয়টি খুব বেশি ভূমিকা রেখেছিল বলে মনে হয় না।

নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর প্রসঙ্গে সামাজিক মুক্তিতত্ত্বটি এ যাবত সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে।[৫৬] এ তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে বর্ণ ও জাতিভেদ বিভক্ত হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণ বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের নিপীড়ন নির্যাতনের যাঁতাকলে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা পিষ্ট হচ্ছিল। এ অবস্থায় সামাজিক সাম্যের মুক্তির বার্তা নিয়ে ইসলামের আগমন ঘটলে, নির্যাতিত নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণিক নিস্পেষণ ও তাদের প্রতি সামাজিক সাম্য প্রদর্শনে অস্বীকৃতির বেড়াজাল থেকে মুক্তির জন্য গণহারে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। এদের ধর্মান্তকরণে সুফী-সাধকগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন বলে বলা হয়ে থাকে।[৫৭] সুফিদের আদর্শ নৈতিক চরিত্র, অনাড়ম্বর জীবনযাপন, দুঃস্থ-পীড়িত মানবতার জন্য তাদের গভীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ বাংলার সাধারণ অমুসলিম জনতাকে তাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাদের প্রচারিত ইসলাম ছিল উদার এবং ধর্মাচারও ছিল সহজ। কাজেই তাদের ধর্মমত অমুসলিম হিন্দু বৌদ্ধদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। সমাজের নির্যাতিত বৈষম্যের শিকার মানুষ সামজিক নিরাপত্তা ও মুক্তির প্রত্যাশায় ইসলামের স্নিগ্ধ ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বাংলায় ইসলামের গণধর্মান্তরণে উপরে আলোচিত হিন্দু বর্ণ-জাতিভেদ ও সামাজিক মুক্তিতত্ত্ব সম্পর্কেও পণ্ডিতমহলে দ্বিমত রয়েছে। রিচার্ড এম ইটন মনে করেন ইসলামের সামাজিক সাম্যের ধারণার বিকাশ সাম্প্রতিককালের চিন্তা প্রসূত। তাঁর মতে, প্রাক-আধুনিককালে মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ হিন্দুদের অসাম্য ব্যবস্থার বিপক্ষে তাদের ধর্মের

---

[৫৩] হেনরী বেভারলি, জেমস ওয়াইজ ছাড়াও অনেক ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক এমত পোষণ করেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে ডি এন মজুমদার, সি আর রাও (*Races Elements in Bengal, Calcutta,* 1960), বি কে চ্যাটার্জি, এ কে মিত্র (' Blood -Group Distributions of the Bengalis and Their Comparison with other Indian Races and Casts' *Indian Culture-8,*1941-42) নীহাররঞ্জন রায় (*Medieval Bengali Cultue*) প্রমুখও এ মত সমর্থন করেন।

[৫৪] রাজনৈতিক উচ্চ পদলাভ, পদোন্নতি, কর মওকুফ ইত্যাদি তাৎক্ষণিক পার্থিব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের আশা ইসলামের নিম্নবর্ণের লোকদের গণ ধর্মান্তরণের অন্যতম কারণ বলে তারা মনে করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৬, নীহাররঞ্জন রায় , *Medieval Bengali Cultue*, Calcutta, 1945, p.49, মমতাজুর রহমান তরফদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১। ডুয়ার্টে বারবোসার বর্ণনাতেও একই সুর অনুরণিত হয়েছে। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন শাসকশ্রেণীর কাছ আনুকূল্য পাবার আশায় প্রতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল। উদ্ধৃতি Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal* বাংলা অনুবাদ, পৃ.১৯৮

[৫৫] রিচার্ড এম ইটন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫১

[৫৬] ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক, পাকিস্তানী এমনকি বাংলাদেশী পণ্ডিতদের বেশির ভাগই সামজিক মুক্তি তত্ত্ব সমর্থন করেন। এম এ রহিম, আবদুল করিম এবং মুহাম্মদ মোহর আলীর বর্ণনায় এ মতের স্বপক্ষে জোর সমর্থন পাওয়া যায়। মমতাজুর রহমান তরফদারও মনে করেন ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণপ্রথার বিপরীতে বাঙ্গালিদের কাছে ইসলামের উদারনীতি একটা স্বাভাবিক সামাজিক আকর্ষণ ছিল। ইসলাম ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় সাম্যের সুবিদিত আদর্শ। মমতাজুর রহমান তরফদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১। অবশ্য নীহাররঞ্জন রায় ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন হিন্দু পণ্ডিত এ তত্ত্বটি সমর্থন করেন না। কেননা এ মত মেনে নেয়ার অর্থ হলো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিপীড়নকারী ধিকৃত হিসেবে সায় দেয়া।

[৫৭] Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal),* বাংলা অনুবাদ, পৃ.১৯৯; এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক সাম্য নীতির উপর জোর দেননি, বরং হিন্দুদের বহু-ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে তাদের ধর্মের একেশ্বরবাদী আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মান্তরিত স্থানীয় মুসলমানদের ইসলাম গ্রহণপূর্বক সামাজিক পদবিগুলো ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ইটন বলেন ইসলাম যদি তাদের কাছে সামাজিক সাম্যের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত হতো, তবে এমনটি হতো না।[৫৮] অসীম রায় মনে করেন ধর্মান্তরণ প্রসঙ্গে হিন্দু জাতি ব্যবস্থার ভূমিকা মূল্যায়নে বিশেষ সতকর্তা অবলম্বন করা উচিত। তিনি ব্রাহ্মণ-নিপীড়িত বৌদ্ধদের ইসলাম ধর্মগ্রহণ সম্পর্কিত মতামতে আংশিক সত্যতা আছে বলে মনে করেন। তবে ইসলাম পূর্ব ও মুসলিম বাংলায় হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির যে সমন্বয় ও সমঝোতার চিত্র পাওয়া যায়, তার পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বড় অংশের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন না। অসীম রায় মনে করেন, জাতিভেদ ব্যবস্থাজনিত নির্যাতনের যুক্তি একটি জটিল সমস্যার সহজ সরলীকরণ প্রচেষ্টা। তাঁর মতে, জাতিভেদ ব্যবস্থা কেবল বাংলায় সীমিত ছিল না, বরং দক্ষিণ ভারতে জাতিভেদ ব্যবস্থা ছিল বাংলার তুলনায় অধিকতর সংগঠিত। জাতিভেদ ব্যবস্থার নির্যাতন যদি ইসলামের ধর্মান্তরণের বিশেষ কারণ হয়ে থাকে, তাহলে দক্ষিণ ভারতে ইসলামে ধর্মান্তরণের ঘটনা বেশি হওয়া যৌক্তিক ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তাই জাতিভেদ ব্যবস্থার বিষয়টি সর্তকতার সাথে পর্যালোচনা করা উচিত বলে অসীম রায় মনে করেন।[৫৯]

বাংলায় গণ ইসলামীকরণের স্বপক্ষে এর ভু-প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ঐ যুগে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক বাস্তবতার বিষয়টি অসীম রায় বিশেষভাবে বিবেচনায় এনেছেন। এ প্রসঙ্গে রিচার্ড এম ইটনের অবস্থানও অসীম রায়ের প্রায় কাছাকাছি। লক্ষণীয় যে, একদিকে যমুনা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা-সুরমা বিধৌত অঞ্চল, অন্যদিকে গঙ্গার মধ্য ও নিম্ন অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যার ঘনত্ব স্পষ্ট। এ মুসলিম জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ ছিল কৃষিজীবী 'শেখ' এবং বস্ত্রশিল্পী 'জোলা', অন্যদিকে হিন্দু জনসংখ্যার মধ্যে নিম্নবর্ণের নমঃশুদ্র, পোদ ও মাহিষ্যদের আধিক্য দেখা যায়। অসীম রায় মনে করেন বাংলার নদী ব্যবস্থার গতি পরিবর্তনের সাথে এ জনসংখ্যার একটি সংযোগ রয়েছে।[৬০] নদীর গতিপথ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব ও দক্ষিণে উর্বর ভূমির স্থানান্তরের ফলে উত্তর ও পশ্চিমের পথিকৃত কৃষকেরা পূর্বাঞ্চলের নতুন উর্বর এলাকার দিকে অভিবাসন করে। তাদের অনুসরণ করে উচ্চবর্ণীয় প্রতিনিধিদের এ অঞ্চলে আগমন ঘটে। পূবাঞ্চলের বদ্বীপ এলাকার লৌকিক দেব-দেবীকে হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের গ্রহণের ঘটনায় এর প্রমাণ মেলে। অসীম রায় মনে করেন, উচ্চ হিন্দু সমাজের আগমন সত্বেও ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক কারণে এ অঞ্চলে শাস্ত্রভিত্তিক হিন্দু ধর্ম অবাধ প্রসার লাভ করতে পারেনি। ফলে এ অঞ্চলের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিণতি ও শিথিলতার কারণেই ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ সহজতর হয় বলে অসীম রায়ের মত।[৬১] দ্বিতীয় আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো আলোচ্য অঞ্চলটি ছিল দুর্যোগ প্রবণ এলাকা। উপযুক্ত শাসনযন্ত্রের অভাবে এখানে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ছিল কঠিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাকে লৌকিক দেব-দেবীর কাছে এখানকার লোক মানসিক শক্তি ও সাহসের সন্ধান করতো, কিন্তু কলহময় এ অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, বিপদে শক্তি ও পরমর্শদাতা এবং পতিত কৃষি জমি

---

[৫৮] রিচার্ড এম ইটন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫১

[৫৯] অসীম রায়, 'বাংলায় সমন্বয়ধর্মী ইসলামী ঐতিহ্য' *উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৬১

[৬০] ঐ, পৃ. ৬২

[৬১] অসীম রায়, 'বাংলায় সমন্বয়ধর্মী ইসলামী ঐতিহ্য' *উত্তরাধিকার*, পৃ. ৬২

উদ্ধারে সাহায্য করার মত নেতৃত্বের প্রচণ্ড অভাব ছিল। এই অঞ্চলে আগত মুসলিম ব্যক্তিত্বগণ এ বিশেষ অভাব পুরণ করেন । আসীম রায়ের মতে, এদের মধ্যে ধর্মীয় ও ঐহিক নেতৃত্বসম্পন্ন দুশ্রেণীর মুসলিম ছিলেন। পরে অবশ্য এরা সকলেই পির আখ্যায়িত হয়ে ধর্মীয় স্তরে উন্নীত হন।[৬২] বাংলায় গণইসলামীকরণে পির-সুফিদের ভূমিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। তাদের খানখাহ ও দরগাহ্ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য যে অবারিত ছিল তাও সুবিদিত। অসীম রায়ের মতে, যাদের মন্দিরে প্রবেশের এবং পুজারীর পবিত্র দেহের ধারে কাছে যাবার অধিকার ছিল না, তাদের জন্য খানকাহ ও দরগার অবারিত দ্বার খুব স্বাভাবিক কারণেই এর প্রতি তাদের আকৃষ্ট করেছিল। তাছাড়া খানকাহ ও দরগায় দরিদ্রদের প্রয়োজন মেটাবার কিছু ব্যবস্থা থাকায় এর আকর্ষণ স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৬৩]

সুফি-দরবেশদের আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের বাইরে জনজীবনের জন্য উপযোগী গঠনমূলক কাজ ইসলামের গণধর্মান্তরণের একটি বড় উপাদান। ইটনের মতে, আবাদি ভূমি সম্প্রসারণে মুঘল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা, ধান উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা দান ইত্যাদি এখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে এবং এ কাজে পীর-সুফিদের সম্পৃক্ততা গ্রাম্য মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টিয়ার -এর উপর ভূমি সংক্রান্ত ফ্রন্টিয়ার -এর কার্যকলাপ খুবই কার্যকরভাবে ইসলামের প্রসার ঘটায়। এখানে পির সুফি সাধকসহ ধর্মীয় ব্যক্তিরা মুঘল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় কেবল মসজিদ, মাযার ও খানকাহ্ নির্মাণ ও সংরক্ষণ নয়, জঙ্গল পরিস্কার ও বসতি নির্মাণেও নেতৃত্ব দেন। এভাবে তারা এলাকায় সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন।[৬৪] এই পির-সুফিরা তাদের কিছু অলৌকিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতাবলে স্থানীয় অধিবাসীদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। আর এদের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলাম সভ্যতা বিনির্মাণকারী আদর্শ হিসেবে সহজেই প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়।[৬৫]

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, এক দীর্ঘ ক্রমস্বেয়িক বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে বহিরাগত অভিবাসী ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত হিন্দু-বৌদ্ধ জনতাকে নিয়ে। তত্বগতভাবে ইসলামে বর্ণ প্রথা বা কৌলিন্য নীতিতে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু বাংলার মুসলিম সমাজ গড়নে একরকমের বর্ণবাদী সামাজিক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বহিরাগত অভিবাসী মুসলমানগণ মুসলিম সমাজের 'আশরাফ' এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ 'আতরফ', 'আজলফ', 'আরজল' হিসেবে পরিচিত।[৬৬] আশরাফ শ্রেণীর অবস্থান ছিল সমাজের পুরোভাগে এবং তারা ছিলেন সমাজের সর্বোচ্চ সম্মান ও সুবিধাভোগী। এই আশরাফ শ্রেণীতে ছিল আরব বা আজম (ইরান- তুরান হতে আগত) উদ্ভূত মুসলমানগণ। এমনকি অনেক সময় উত্তর ভারত থেকে আগত মুসলমানগণও

---

[৬২] অসীম রায়, 'বাংলায় সমন্বয়ধর্মী ইসলামী ঐতিহ্য' *উত্তরাধিকার*, পৃ. ৬৩

[৬৩] ঐ, পৃ.পৃ. ৬৩-৬৪

[৬৪] ইটন যশোর, খুলনা, সিলেট মেদিনী পুর ও কুমিল্লায় বসতি স্থাপনকারী বেশ কয়েকজন পীর বা সুফির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। রিচার্ড এম ইটন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ২৫০-২৫৫। এ প্রসঙ্গে অসীম রায় খুলনার খানজাহান আলী, নোয়াখালীর ওমর শাহ্, চব্বিশ পরগণায় মোবারক গাজী এবং সিলেটের শাহ জালাল এবং তাঁর ৩১৩ জন অনুগামীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। অসীম রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩

[৬৫] রিচার্ড এম ইটন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৮

[৬৬] আনিসুজ্জমান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড* , পৃপৃ.৪২

বাংলায় উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানের দাবি করেছেন। এভাবে ইসলামের সাম্যবাণী প্রচার সত্ত্বেও[৬৭] বাংলায় পরোক্ষ সামাজিক সম্মানের নতুন উপাদান সৃষ্টি হয়। জাতি ও জন্মলব্ধ সামাজিক সম্মানের অঙ্কুর শতাব্দীর পর শতাব্দী সযত্ন লালনে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়।

মুসলমান সমাজে শাসক এবং রাজপরিবারের সদস্যগণ ছিলেন সর্বোচ্চ সম্মান এবং সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। শাসকগণ সামাজিক জীবনের প্রধান ব্যক্তি বা অভিভাবক হিসেবে গণ্য হতেন। এম এ রহিম এর বর্ণনা মতে, শাসকগণ চিন্তা ও কর্মে মুসলমানদের সামাজিক জীবনেরও নেতা ছিলেন। মুসলমানদের ঐক্য বজায় রাখা এবং তাদের ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করা তাঁর অবশ্য কর্তব্য ছিল। *তারিখ-ই-মুবারক শাহী* ও *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* গ্রন্থের বরাতে তিনি সুলতানদের ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের কিছু রূপরেখাও তুলে ধরেছেন। তাঁর বর্ণনায় সুলতান ও শাসকদের রাজকীয় জাঁকালো জীবনযাপনের তথ্যচিত্রও রয়েছে।[৬৮] সংখ্যায় কম হলেও রাজপরিবারের সদস্যদের উচ্চ রাজকাজে অংশগ্রহণ এবং রাজ্যশাসনে প্রভাবশালী ভূমিকা পালনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁরাও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতেন।

সুলতান ও রাজপরিবারের সদস্যদের পরেই সামাজিক সোপানে 'আহল-ই-কলম' বা 'আহল- ই-সাদাত' হিসেবে পরিচিত সৈয়দ, উলমা ও মাশায়েখদের স্থান ছিল। চর্তুদশ শতকের মধ্যভাগে সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮খ্রি.) এর একটি রাজকীয় ঘোষণা[৬৯] থেকে জানা যায় যে, সামাজিক পদমর্যাদায় আহল-ই-কলম-এর পরই ছিল 'আহল-ই তেগ' বা 'আহল-ই দৌলত' নামে পরিচিত খান, মালিক, সদর, আকাবের এবং মারিফ ও তাদের অনুচরবর্গ প্রমুখ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক আমলা শ্রেণী। উচ্চশ্রেণীর তৃতীয় পর্যায়ে জমিদার, মুকাদ্দম, মাফরুজমান এবং সদকান প্রমুখ ভূ-অভিজাতদের স্থান ছিল। এর পরেই ছিল সন্নাসী, সিদ্ধপুরুষ এবং গাবরদের স্থান। এদের বেশিরভাগই ছিলেন হিন্দু যোগী, পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরু। সুলতানী আমলে সামাজিক বিন্যাস মোটামুটি এরূপ থাকলেও মুঘল সুবাদারি যুগে অমাত্য শ্রেণী পদমর্যাদয় আহল-ই-কলম বা শেখ, সৈয়দ ও উলেমা সম্প্রদায়ের উর্ধে উন্নীত হন।[৭০] সুলতানী শাসনামল বা মুঘল সুবাদারি যুগে ব্রভসা বাণিজ্যের প্রসার ও সম্পন্ন বণিকদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হলেও বণিকরা রাজকীয় ও সামাজিক অভিজাতচক্রে স্থান করে নিতে পারেননি। নিম্নশ্রেণীর সরকারী কর্মচারী, চিকিৎসক, শিক্ষক, কবি, গায়ক, শিল্পী ইত্যাদি পেশাজীবীদের নিয়ে যে মধ্যশ্রেণী গড়ে ওঠেছিল, তাতে বণিক ব্যবসায়ীরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন বলে জানা যায়।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ 'আতরফ', 'আজলফ', 'আরজল' হিসেবে পরিচিত। এরা মুসলিম সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক হিসেবেই পরিগণিত হতেন। উপরে বর্ণিত সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলকের

---

[৬৭] ইসলামের অপরিবর্তনীয় নিয়মানুসারে একজন মুসলমানের সাথে অপর একজন মুসলমানের কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। আল কোরআনে বলা হয়েছে, " হে মানব জাতি --- তোমাদের জাতিও গোত্ররূপে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে জানতে পার।" *আল কোরআন, ৪৯:১৩*।

[৬৮] এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ. ২২০-২২৬

[৬৯] 'ইনশা-ই- মাহরু' তে এ রাজকীয় ঘোষণাপত্রটি লিপিবদ্ধ আছে। *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Calcutta, 1923, p. 280 তে উদ্বৃতি। এ ঘোষণাটি দেয়া হয়েছিল বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে অভিযানে সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

[৭০] Abdul Karim, 'The Sadat, Ulama, and Mashaikh in the Pre-Mughal Muslim Society of Bengal' in Rafiuddin Ahmed (ed.), *Islam in Bangladesh,* Dacca, 1963, pp. 31-52

ঘোষণাপত্র বা কবি বিপ্রদাস পিপলাই[৭১] এর কবিতায় এই শ্রেণী স্থান পায়নি। তবে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে[৭২] এদের সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ যেসব পেশায় নিয়োজিত ছিল বলে কবি মুকুন্দরামের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সেগুলো হলো- 'জোলা' (বয়ন শিল্পী বা তাঁতী), 'গোয়ালা' (দুধ ওয়ালা), 'মুকেরী' (গরু ব্যবসায়ী বা রাখাল), 'পিঠারী' (পিঠা বা রুটি প্রস্তুতকারক), 'কবরী' (মাছ ব্যবসায়ী), 'সানকার' (তাঁত প্রস্তুতকারক), 'তীরকার' (তীর ধনুক প্রস্তুতকারী), 'কাগচা' (কাগজ প্রস্তুতকারক), 'হাজ্জম' (খৎনাকারী), 'দর্জি' (কাপড় সেলাইকারী), 'রংরেজ' (কাপড় রঞ্জনকারী) 'পটকার' (চিত্রকর) এবং 'কসাই' (মাংস বিক্রেতা) ইত্যাদি। তিনি 'কালান্দর' বা ভবঘুরে দরবেশ নামেও এক শ্রেণীর মুসলমানের কথা বলেছেন।[৭৩] তবে তারা নিম্নশ্রেণীভূক্ত ছিল কী-না এ ব্যাপারে মতান্তর রয়েছে। মুকুন্দরামের বর্ণনায় বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমানদের 'গোরসাল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এম এ রহিম এর অর্থ করেছেন মিশ্রিত।[৭৪] অবশ্য তিনি এর দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। জেমস ওয়াইজের তথ্যসূত্রে আবদুল করিম এর অর্থ করেছেন বাজি প্রস্তুতকারক।[৭৫]

মুকুন্দরামের বর্ণনায় ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের যে পেশাগত পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে সরাসরি কৃষি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলমানের উল্লেখ নেই। এম এ রহিম এর মতে, হিন্দুদের বেশিরভাগ লোকই ছিল কৃষিজীবী। মুসলমানরা সেনাবাহিনী বা সরকারের অধীনে ছোটখাট চাকুরী করতো। পদস্থ সরকারি কর্মচারীদের পাইক পেয়াদা বা সমুদ্রগামী বাণিজ্যবহরের নাবিক হিসেবেও তারা কাজ করতেন বলে এম এ রহিম উল্লেখ করেছেন।[৭৬] তাঁর এ বক্তব্য মেনে নিলে প্রশ্ন দাঁড়ায় পূর্ব বাংলার যে বিপুল সংখ্যক কৃষিজীবী মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলে তারা কি রাতারাতি কৃষিকাজ ত্যাগ করেছিলেন? বিশাল সংখ্যক কৃষিজীবী লোককে সরকারি চাকুরিতে আত্মীকরণ করার ক্ষমতা কি তদানিন্তন রাষ্ট্রযন্ত্রের ছিল? এসব গ্রামীণ অশিক্ষিত লোকদের চাকুরী গ্রহণের জন্য প্রয়োজনী যোগ্যতা ছিল কী? এক কথায় এসব প্রশ্নে উত্তর হলো 'না'। অতএব ধারণা করা অমূলক হবে না যে, ধর্মান্তরিত মুসলমানদের একটা অংশ কৃষিজীবী ছিলেন।

আশরাফ বা অভিজাত মুসলমানদের বেশিরভাগই ছিলেন বেতন বা ভাতাভোগী। সুলতান বা সম্রাটের অনুকরণে অভিজাত মুসলমানগণ আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। তাদের সুশোভিত প্রাসাদ, ক্ষুদ্রাকৃতির দরবার এবং জেনানা মহলের সংবাদ সমকালীন বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দানের কথাও জানা যায়।

---

[৭১] কবি বিপ্রদাস সম্ভবত ১৪৯৫ সালের দিকে কিছু পুঁথি ধরণের কবিতা লিখেন। সুকুমার সেন ১৯৪৫ সালে *মনসাবিজয়* নামে তাঁর কাব্যগুলো সম্পাদনা করেন।

[৭২] কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে প্রথম বাংলার মুসলমান বিশেষকরে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান সমাজ সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ও তথ্যবহুল চিত্র পাওয়া যায়।

[৭৩] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে, উদ্ধৃতি Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal (Down toA.D. 1538),* বাংলা অনুবাদ, পৃপৃ.২২১, ২২৭, এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ. ২৩৮-২৩৯

[৭৪] এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২৩৯

[৭৫] জেমস ওয়াইজ বলেন " বাজী প্রস্তুতকারকগণ সবসময় মুসলমান হতো এবং মাঝেমাঝে তার "গোলাপসাজ" নামে অভহিত হতো" *Notes on the Races Casts and Trades of Eastern Bengal,* উদ্ধৃতি Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal (Down toA.D. 1538),* বাংলা অনুবাদ, পৃ.২২২

[৭৬] এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ. ২৩৬-২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে বাংলার আশরাফ-আতরাফ মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধানের কথা বলা হয়ে থাকে। এ দুশ্রেণীর মাঝে সামাজিক যোগসূত্রও খুব একটা ছিল না বলে মনে করা হয়। জগদীশ নারায়ণ সরকার বাংলার আশরাফ-আতরাফদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধানকে বর্ণপ্রথার সাথে তুলনা করেছেন। তাদের মধ্যে আন্তবিবাহ ও একসঙ্গে খাদ্য গ্রহণও নিষিদ্ধ ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৭৭] আন্তবিবাহ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একসঙ্গে খাদ্যগ্রহণ নিষিদ্ধকরণ নিঃসন্দেহে বর্ণ প্রথার একটি পূর্ব শর্ত। তবে প্রশ্ন হচ্ছে বাংলার আশরাফ-আতরাফ মুসলমানদের মধ্যে এ পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল কী–না? সুলতানী আমলে যারা আশরাফ বলে বিবেচিত হতেন, তাদের মধ্যকার সাদাত, উলামা, মাশায়েখদের মধ্যে এ ধরণের মনোবৃত্তি যে কাজ করতনা, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ শ্রেণীর লোকেরা প্রায় সকলেই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন এবং তাদের খানকাহগুলো সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। অসীম রায় বলেছেন, বিদেশী জন্মের পরিপুরক হিসেবে বাংলার আশরাফ মুসলমানদের সংস্কৃতি চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পশ্চিমমুখী। আশরাফ কৌলিন্যের অভিলাসী বাংলার মুসলমান পশ্চিমে তাঁর বংশপরিচয় খুজেছেন।[৭৮] বালা বাহুল্য উনিশ-বিশ শতকেও বাঙ্গালি অভিজাত মুসলমানদের অনেকেই এ মনোভাব পোষণ করতেন। মুঘল আমলে উত্তর ভারত থেকে আসা কারো কারো মধ্যে এ মনোভাব থেকে থাকতে পারে। তবে সুলতানী আমলে দিল্লী থেকে বাংলার বিচ্ছিন্নতা, মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সংযোগহীনতা আশরাফ মুসলমানদের বাংলামুখী করেছিল সন্দেহ নেই। কাজেই তাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে আভিজাত্যবোধ থেকে থাকলেও তা কোনক্রমেই বর্ণব্যবস্থার সাথে তুলনীয় হওয়ার মতো ছিল না।

ইসলামের শরিয়তকেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান যেমন–নামাজ, রোজা, যাকাত আদায় ও হজ্ব পালন এবং কোরআনসহ ধর্মীয় গ্রন্থাদি পাঠ বাংলার মুসলমান সমাজে সাধারণ আচরিত রীতি হিসেবে প্রচলিত ছিল। কবি মুকুন্দরামের *চণ্ডিকাব্যে* মুসলিম সমাজের ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলার মুসলমান সমাজ যে পোষক-পরিচ্ছদ ও আচার আচরণেও ইসলামের ঐতিহ্য অনুসরণ করতেন মুকুন্দরাম ও কবি ষষ্ঠীবরের *মনসামঙ্গল* কাব্যে তার বিবরণ রয়েছে। চৈনিক পর্যটক মাহুয়ানের বিবরণীতেও এর সাক্ষ্য মেলে।[৭৯] তবে বাংলার সকল মুসলমান সুন্নি ইসলামের বিধান অনুসারে নৈষ্ঠিক জীবনযাপন করতেন কী-না সে বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আবদুল করিম ও এম এ রহিম প্রমুখ বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে উল্লেখ করেছেন ইসলামী বিদ্যায় পণ্ডিত সাদাত, উলেমা ও মাশায়েখগণ বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় নীতি ও আচার অনূষ্ঠান পালনের নিয়ম কানুন শিক্ষা দিতেন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্যক্তিউদ্যোগে এ সময় বাংলায় বহুসংখ্যক মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কৃতির স্নায়ূকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।[৮০] মমতাজুর রহমান তরফদারের মতে, এসব প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মসজিদগুলো ছিল বেশিরভাগই নগরকেন্দ্রিক এবং এসব মসজিদে যারা নামাজ পড়তেন তারা ছিলেন নগরবাসী রাজরাজড়া, বিদেশাগত উলামা, সামন্তশ্রেণীর লোকজন ও তাদের বংশধরগণ।[৮১] কবি বিপ্রদাস এবং ষষ্ঠীবর

---

[৭৭] Jagdish Narayan Sarkar, *Islam in Bengal*, p. 48

[৭৮] অসীম রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ. ৬৪-৬৫

[৭৯] এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ. ২৪০-২৪১

[৮০] Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal (Down toA.D. 1538)*, বাংলা অনুবাদ, পৃ. ২২৯

[৮১] আনিসুজ্জমান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ.১৬৪

মনসামঙ্গলে যে নিষ্ঠাবান ধার্মিক মুসলমানদের কথা বলেছেন তারা স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান নন, তারা বিদেশাগত উচ্চশ্রেণীর আশারফ মুসলমান। বাংলার গ্রামাঞ্চলের ধর্মান্তরিত মুসলমানরা ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষার তেমন সুযোগ পায়নি। কোথাও কোথাও সে ধরণের সুযোগ থাকলেও তা ছিল ব্যতিক্রম। অশিক্ষার কারণে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ইসলামী শরিয়তকেন্দ্রিক বিধি-বিধানের সাথে খুব বেশি সংযোগ ঘটেছিল বলে মনে হয় না। ইসলামের মূলনীতি অনুসরণ করলেও ধর্মান্তরিত মুসলমানরা তাদের পূর্বপুরুষদের সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কার যে সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেন নি এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। শুধু প্রাক-নবাবী বাংলায় নয় উনিশ ও বিশ শতকেও গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সর্ম্পকিত জ্ঞানের অভাব ও লৌকিক সংস্কারের প্রধান্য লক্ষ্য করা গেছে। ধর্মান্তরিত গ্রামীণ মুসলিম সমাজ যে তাদের আচার-আচরণ, ক্রিয়া-কলাপ, ভাষা ও সর্বোপরি সংস্কার ও চিন্তায় সম্পূর্ণ বাঙ্গালিই ছিলেন মুহাম্মদ এনামুল হক তা স্পষ্ট করেই বলেছেন।[৮২] বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব এবং দেশীয় মুসলমানদের স্থানীয় বিভিন্ন কৌমের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক সম্পর্কের কারণে সুন্নি মুসলিম সমাজে ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন এবং অনেকাংশে শরিয়ত বিরোধী কিছু বিশ্বাস ও রেওয়াজ চালু হয়েছিল। মমতাজুর রহমান তরফদার মনে করেন, পিরবাদ, অশরিরী শক্তিতে বিশ্বাস, যাদুটোনার উপকারিতায় আস্থা, জড়োপসনা ও প্রতীকবাদ কৌম সমাজ ও হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজ থেকে দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই চলে এসেছিল।[৮৩] ষোল শতকে বাংলার মুসলমান সমাজে সত্যপিরের ধারণার উদ্ভব ঘটে। সত্যপিরকে কেন্দ্র করে বাংলায় এক বিশাল সাহিত্যভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়। শুধু সত্যপীর নয় পরবর্তীকালে বহু কাল্পনিক পির সরল বিশ্বাসী জনসাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করে। এই ধরণের পিরবাদী ও প্রতীকবাদী জড়োপাসনাপ্রবণ গ্রামীণ ইসলামকে মমতাজুর রহমান তরফদার লৌকিক ইসলামরূপে আখ্যা দিয়েছেন।[৮৪]

বাংলায় মুসলিম সমাজে সুফি সুফিবাদ বহু তরিকা বা শ্রেণী মতে বিভক্ত এবং তাদের মধ্যে অনেকেই চিশতিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া শ্রেণীভূক্ত ছিলেন। বাংলায় মাদারিয়া সুফিদের ইতিহাস একেবারেই অস্পষ্ট। তবে সাত্তারিয় সুফিদের উপস্থিতি সুপ্রমাণিত। আর কলন্দরিয়া সুফিদের কথাতো কবি মুকুন্দরামের *চণ্ডিকাব্যে*ও পাওয়া যায়।[৮৫] সুফিরা ছিলেন ইসলাম ধর্মের অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতিনিধিত্বকারী। বাংলায় ইসলাম ও ব্রাহ্মাণ্যবাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও সুফিগণ মনে হয় দেশীয় স্থানীয় সংস্কৃতির অদ্ভুত প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতকে রচিত শেখ জাহিদের *আদ্যপরিচয়* এবং ষোড়শ শতাব্দীর মুসলিম কবি সৈয়দ সুলতানের *জ্ঞান চৌতীশা* এবং *জ্ঞান-প্রদীপসহ* সব রচনায় এ সমন্বয়ের প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। ইসলামের অতীন্দ্রিয়বাদের সাথে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা ও সাধন প্রণালীর সমন্বয়ের প্রভাব বাংলার সুফি দর্শনে লক্ষ করা যায়।[৮৬] আর একারণেই মুজাদ্দিদ-ই-আলফি সানী নামে খ্যাত পণ্ডিত শেখ আহমদ সরহিন্দ (১৫৬৪-

---

[৮২] মুহাম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, পৃপৃ.১৬৩-১৬৪

[৮৩] আনিসুজ্জমান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ.১৬৬

[৮৪] ঐ

[৮৫] কলন্দরিয়া সুফিরা বিশেষ কোন তরিকার অনুসরণ করতেন বলে মনে হয় না। এরা ছিলেন মূলত ভ্রাম্যমান ফকির-দরবেশ। আর ভ্রাম্যমান ফকিরগণ সাধারণত জনগণের কাছে কলন্দর হিসেবে বিবেচিত হতেন।

[৮৬] এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

১৬২৪) ভারতের সুফি সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হিন্দু-বৌদ্ধ তথা অনৈসলামিক রীতি-নীতি দুর করে বিশুদ্ধ ধর্মমত ও সুফিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছেলেন।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়কালে ইসলাম বাংলার প্রধান ধর্ম। তবে শহুরে শিক্ষিত উচ্চবর্গের মুসলিমদের জীবনাচারের সাথে গ্রামীণ মুসলিম সমাজের জীবনচারের পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। শহুরে মুসলমানদের আদৃত ইসলাম ছিল আরবি, ফারসি ভাষায় লালিত শাস্ত্রানুরাগ শরীয়তভিত্তিক বিশুদ্ধ ও নৈষ্ঠিক ইসলাম, অপরদিকে গ্রামীণ জীবনে অশিক্ষিত ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনতা অনুসৃত হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রভাবিত লৌকিক ইসলাম।

প্রাক-নবাবী যুগের বাংলার হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শুদ্র এ চর্তুবর্ণে বিভক্ত ছিল। এ চারটি বর্ণের আবার বহু উপ বর্ণ ছিল। কবি মুকন্দরামের চণ্ডিকাব্যে এসম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণ এমনকি উপবর্ণের মধ্যেও সামাজিক বাধানিষেধ কঠোরভাবে মেনে চলা হতো। ব্রাহ্মণরা ছিল সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী। হিন্দু শাসনামলে তাদের সামনে রাষ্ট্রীয় সামাজিক সুবিধার অগ্রাধিকার ছিল। তবে মুসলিম শাসনামলে তাদের একক প্রাধান্য কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। মুসলিম শাসকরা চাকুরি ও রাষ্ট্রীয় সুবিধার ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করায় কায়স্থরা চাকরি ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থানের উন্নতি ঘটায়। অবস্থার চাপে পরে ব্রাহ্মণরাও বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে। কৃষি ও বিভিন্ন পণ্যের বেসাতি ছিল বৈশ্যদের পেশা। তবে কৃষি ছিল তাদের উপজীবিকা। শুদ্ররা যারা ছিল সমাজের তারাও বিভিন্ন উপশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তারা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ছিল এবং নিজ নিজ পেশা অনুযায়ী সমাজে তাদের স্থান নির্ধারিত হতো।

বর্ণ ও উপবর্ণের বিভক্তি ছাড়াও হিন্দু সমাজ অসংখ্য ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত ছিল। বিশেষ দেবতা বা দেবীর আরাধণার প্রতি গুরুত্ব দানের ভিত্তিতে যেমন এই ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে ওঠেছিল, তেমনি স্রষ্টাকে প্রাপ্তিএবং আত্মার মুক্তি লাভের আর্দশ ও পন্থার ভিত্তিতেও। সাধারণভাবে হিন্দু সমাজ বহু দেবতায় বিশ্বাসী হলেও হিন্দুদের কেউ কেউ একজন বিশেষ দেবতা বা দেবীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। যেমন শিবকে যারা প্রধান দেবতা মনে করে তারা গড়ে তোলে শৈব সম্প্রদায়। শাক্ত সমাজের প্রধান পুজ্য ছিল চণ্ডি শীতলা, ষষ্ঠী প্রমুখ স্ত্রী দেবতা। পনের ও ষোল শতকে বাংলায় শাক্তদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু সমাজে স্ত্রী দেবতার প্রাধান্যের ফলে মনসা পুজা ও কালি পুজার বিস্তার ঘটে। এমনকি ষোল শতকেই দুগৃ পুজা বাঙ্গালি হিন্দু সমাজের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়।

ষোল শতকে বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ আরেকটি ধর্মমতের সংস্পর্শে আসে, আর এটি হল বৈষ্ণব ধর্ম। এ ধর্মমতের ইতিহাসের সাথে শ্রী চৈতন্য দেবের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।[৮৭] যদিও অনেকেই বলেন যে, চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের

---

[৮৭] শ্রী চৈতন্য ১৪৮৬ সালে নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ২২ বছর বয়সে হিন্দু তীর্থস্থান গয়া ভ্রমণের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে সুপ্ত প্রবল ধর্মীয় চেতনা জেগে ওঠে এবং কৃষ্ণপ্রেমে সিক্ত হয়ে শ্রী চৈতন্য অতীন্দ্রিয় ভাববিহ্বল এক নতুন জীবন শুরু করেন। তিনি কীর্তন নামে আবেগপূর্ণ সঙ্গীত নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ্য ধর্মীয় উৎসব পালন শুর করলে অচিরেই নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রমূখ একদল্য শিষ্য তাঁর চারপাশে জড়ো হয় এবং তাঁকে ভগবদ্ভক্তির মূর্ত প্রতীক হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে। ১৫১০ সালে কাটওয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্যাসব্রতে দীক্ষা গ্রহণের পর চৈতন্য ধর্মযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বহু অঞ্চল ভ্রমন করে পুরীতে আশ্রয় নেন। এখানে তিনি জীবনে বাকী ১৮ বছরঅতিবাহিত করেন। বৈষ্ণববাদ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য আনিসুজ্জমান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃপৃ. ১২৪-১৫২

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠাতা নন। তিনি একে সুসংগঠিত ও বাস্তব রূপদান করেন।[৮৮] সাধারণভাবে বলা হয় যে, বৈষ্ণব ধর্ম ছিল একটি প্রতিরোধমূলক আন্দোলন। ইসলামের ক্রমপ্রসারমাণ প্রভাবের ফলে হিন্দু সমাজের বিপর্যয় অশঙ্কায় ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্য একটি সমন্বয়ধর্মী আন্দোলন হিসেবে বৈষ্ণববাদ প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেম ও ভক্তিবাদ ছিল চৈতন্য ধর্মের মূলনীতি।[৮৯] এনামুল হক, আহমদ শরীফ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম এ রহিম ও আবদুল করিম প্রমুখ গবেষকগণ মনে করেন বৈষ্ণবাদের আবেগপ্রবণ ভক্তি দর্শনের উপর সুফিবাদের প্রবল প্রভাব রয়েছে। সুফিদের,'হাল' (ভাবাবেশকর অবস্থা), 'জিকর'(আল্লাহর নাম জপ) ও 'সমা' (ভক্তি সঙ্গীত) বৈষ্ণবদের 'দসা', 'কৃষ্ণনাম' ও 'কীর্তন' এর প্রতিরূপ।[৯০] কিন্তু মমতাজুর রহমান তরফদার এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বেশকিছু জোরালো যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণ উল্লেখ করে বলেন দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আপাতগ্রাহ্য যে সাদৃশ্যগুলো রয়েছে তাঁর মূলে ছিল খুব সম্ভব 'মানবমনের ভাবরসের ঐক্য'। তবে তিনি মনে করেন সুফিবাদের একটি শক্তিশালী উপাদান ভক্তি বৈষ্ণবতত্ত্বের ভক্তিপ্রবণতাকে বোধহয় পরোক্ষভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল।[৯১]

হিন্দু ধর্মের মধ্যকার বর্ণ উপবর্ণ ও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও সাংঘাত সংঘর্ষেরও তথ্য পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র রায়গুনাকরের কাব্যে শৈব ও শাক্তদের মধ্যকার সংঘর্ষ ও কলহের কথা বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত এক বর্ণের লোকেরা অন্য বর্ণ ও উপবর্ণ বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকদের ঘৃণার চোখে খেতো। বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রতি ব্রাহ্মণ ও শাক্তদের শত্রুতার কথা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। পর্যালোচনাধীন সময়ে হিন্দু সমাজে বহু বিবাহ, বরপণ, সতীদাহ বা সহমরণের মতো অনভিপ্রেত সমাজিক সংস্কারের প্রচলন ঘটেছিল।

২.২.২ সাংস্কৃতিক অবস্থাঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

জাতি গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা। অভিবাসী মুসলমানরা অবস্থানুযায়ী তাদের মাতৃভাষা আরবি, ফারসি এবং তুর্কি ভাষা সাথে নিয়ে এসেছিল। অবশ্য ধর্মীয় সব ব্যাপারে তারা আরবি ব্যবহার করতেন। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে বাংলার দরবারী ও শাসনতান্ত্রিক ভাষা ছিল সংস্কৃত। সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর শাসনতান্ত্রিক ভাষাতে ক্রমশ সংস্কৃত বর্জন করা হয়। দরবারের ভাষা হিসেবে ফারসি ভাষা সংস্কৃতের স্থান দখল করে নেয়। তবে স্থানীয় এলাকাতে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং শাসনতান্ত্রিক ভাষা ফারসি ও মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবি সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে বাংলা ভাষা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

---

[৮৮] শ্রী চৈতন্যদেব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য কোন ধর্মতাত্ত্বিক বা দার্শনিক তত্ত্ব তৈরী করেছিলেন কী-না এ ব্যাপারেও পণ্ডিত মহলে সংশয় রয়েছে। মমতাজুর রহমান তরফদার এর মতে, চৈতন্যের পূর্বে বহু শতাব্দী ধরে এটি বাংলার হিন্দু সমাজের ধর্মীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। বস্তুত রাধা-কৃষ্ণ ভক্তিকে তাদের অন্যতম ধর্মীয় অনুপ্রেরণারূপে বিবেচনা করে। চণ্ডিদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও মিথিলার বিদ্যাপতির পদাবলীতে বাংলার লোকপ্রিয় বৈষ্ণববাদের ধারা প্রকাশ পায়। মমতাজুর রহমান তরফদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৪৪

[৮৯] শ্রী চৈতন্য রচিত আটটি ভক্তিমূলক শ্লোক *শিক্ষাষ্টকের* ভাষ্য অনুযায়ী বিষ্ণু বা হরির প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা, সরল জীবনযাপন ও মানবিক বিনয় চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণববাদের তাত্ত্বিক সারৎসার।

[৯০] মুহাম্মদ এনামূল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ২৭৯-২৮০, আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য*, পৃ. ১৬২, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,' Islmic Mysticism , Iran and India' in *Indo-Iranica,* Vol.I No.2, এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ. ২৮৯-৯০, Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal (Down toA.D. 1538),* বাংলা অনুবাদ, পৃপৃ.২৫০-২৫১

[৯১] আনিসুজ্জমান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃপৃ. ১২৯-১৩০, মমতাজুর রহমান তরফদার, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ. ১৮১-৮২

Dhaka University Institutional Repository

চর্যাপদকে[৫২] বাংলা ভাষার আদিরূপ মেনে নিলে বলতে হয় বাংলা ভাষার জন্ম আনুমানিক দশম শতকে। কাজেই পাল আমলে তো নয়ই এমনকি সেন আমলেও যোগাযোগের বাহন হিসেবে বাংলা পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। তাই এপর্বে ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতি গঠনের সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে ধ্যাণ-ধারণা আবেগ এবং ভাষার মাধ্যমে গড়ে ওঠা যে সব সাহিত্যিক ঐতিহ্য শিল্পরূপ, বাঙ্গালি জাতি সম্পর্কিত ধারণাটি তারই একটি সমন্বিতরূপ। যার একটি সামগ্রিক রূপ পায় ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী সালতানাত যুগে। এ প্রসঙ্গে মমতাজুর রহমান তরফদারের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি যথার্থই বলেছেন, দিল্লী ও মধ্যএশিয়ার প্রভাববলয় হতে ইলিয়াস শাহী শাসকদের বিচ্ছন্নতা তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র চিন্তন এবং স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে।[৫৩] হুসেন শাহী যুগে তার গতি তরান্বিত হয়। শুধু স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ নয় অভিবাসী মুসলমান বিশেষকরে তাদের এদেশে জন্মগ্রহণকারী পরবর্তী প্রজন্ম বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু করেন। গোপাল হালদার-এর মতে, নবাগত মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর উদার বাস্তব অভ্যন্তরীণ শাসননীতির ফলে যেহেতু রাজস্ব বিভাগের মূল কাজটি দেশজ কর্মচারীদের হাতে ছিল, তাই শাসক গোষ্ঠীর সাথে এদেশীয় লোকের একটি সামাজিক যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হয়। বাংলার ভৌগলিক অবস্থানের কারণে এবং দিল্লী সালতানাতের সাথে বৈরী সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় শাসক শ্রেণীর অনেকে এদেশ হতে পত্নী সংগ্রহ করে। অচিরেই তাদের সন্তান-সন্ততি প্রায় রক্তে ও জীবনযাত্রায় বারো আনা বাঙ্গালি হয়ে পড়ে। তারা একমাত্র দরবারে ফারসি চর্চা এবং ধর্ম বিষয়ে আরবির শবক নিলেও সাধারণ দশজনের সঙ্গে তারা আদান-প্রদান চালাতে অভ্যস্ত হলো বাংলায়।[৫৪]

শুধু ভাষা নয়, বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও মুসলিম শাসকদের অনবদ্য অবদান রয়েছে। ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কে বাংলা সাহিত্যের এক যুগসন্ধিকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এ সময়কালে বাংলা সাহিত্যের কোন নির্দশন পাওয়া যায় না। গোপাল হালদার, সুকুমার সেন প্রমুখ মনে করেন এ সময়কালে বাংলার তুর্কি শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনে বাঙ্গালিদের এমন ত্রাস ও শঙ্কার মধ্যে জীবন কেটেছে যে, সাহিত্য সৃষ্টির মতো মানস-স্বস্তি তাদের ছিলনা। কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে পূর্বোক্ত পণ্ডিতদের বক্তব্যের স্বীকৃত নেই, বরং বিপরীত তথ্যই পাওয়া যায়।[৫৫] আহমদ শরীফের মতে, তুর্কি নির্যাতন বা তাদের সৃষ্ট কোন প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যাত্ব বা সাহিত্যের ইতিহাসের তথাকথিত অন্ধকার যুগের পেছনে অন্য কারণ রয়েছে। তাঁর মতে, ধর্মপ্রচার বা রাজশাসনের বাহন না হলে সে সময় কোন ভাষারই লেখ্য সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হওয়া সম্ভব ছিল না। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।[৫৬] তবে চৌদ্দশতকেই তুর্কি রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাংলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহন হল।

---

[৫২] চর্যাপদ হলো রহস্যমূলক বা হেঁয়ালি গান। কিছুসংখ্যক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য 'গৌড়ীয় প্রাকৃত' (আর্যদের কথ্য ভাষার সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষায় সংমিশ্রণের ফলে এ ভাষার জন্ম হয় বলে ধারণা করা হয়) ভাষায় চর্যাপদ রচনা করেন।

[৫৩] মমতাজুর রহমান তরফদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

[৫৪] গোপাল হালদার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ.পৃ. ৪৫, ৪৬

[৫৫] Abdul Karim, 'Early Muslim rule in Bengal and their non-Muslims subjects (Down to A.D. 1538)', *Journal of asiatic Society of Pakistan,* Dacca, 1957. J.N. Sarkar (ed.), *History of Bengal,* Vol. II দ্রষ্টব্য।

[৫৬] প্রাক তুর্কি যুগে সংস্কৃত ছিল ধর্মমত প্রচার ও রাজ্য শাসনের ভাষা। আর তুর্কি আমলে দরবারী ভাষা হয় ফারসি।

পঞ্চদশ শতাব্দী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের দিক থেকে একটি গৌরবময় শতাব্দীতে পরিণত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাক-মুসলিম এমনকি তুর্কি বিজয়ের শুরুর দিকেও সংস্কৃতি চর্চা ছিল উচ্চবর্ণের জন্য। পল্লী বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে তাদের লোকধর্মভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছিল। লৌকিক দেব-দেবী ও তাদের কাহিনী নির্ভর সংস্কৃতি নিম্নবর্ণের বিষয় বলে এসব ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে অবজ্ঞেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিল; তাদের নিকট শ্রদ্ধেয় ছিল সংস্কৃত শাস্ত্র, পুরাণ ও কাব্য ইত্যাদি। কিন্তু তুর্কি আগমনে উচ্চবর্গ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নিম্নবর্ণের কাছাকাছি এসে গেল এবং ধীরে ধীরে নিচের তলার মানুষের মনসা, বনচণ্ডী, চাষীদেবতা, শিব ও প্রণয়বিলাসী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাদের মাহাত্ম্যকেও স্বীকার করার প্রয়োজন দেখা দিল। এভাবে উভয়বর্গের মধ্যে একটা আপোষ মিমাংসার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এরূপ একটি আপোষ রফার প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। এরই বাস্তব ফল হলো বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যের বিকাশ– যাতে বাঙ্গালীর নিজস্ব লৌকিক ধর্ম আখ্যানগুলো কাব্যরূপে অত্মপ্রকাশ করে। এসময় বাংলা ভাষা আরও সমৃদ্ধ হতে থাকে এবং রামায়ন- মহাভারতের অমর আখ্যায়িকা বাংলায় অনুবাদের সূচনা হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবময় যুগে চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, কৃত্তিবাসের *রামায়ন*, মালাধার বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* এবং বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাইয়ের *মনসামঙ্গল কাব্য* রচিত হয়। এসময় সাহিত্য চর্চায় রাজপৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়। কবি বৃহস্পতি মিশ্রকে থেকে 'পণ্ডিত সার্বভৌম' ও 'রায়মুকুট' এবং মালাধার বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদান রাজপৃষ্ঠপোষকতার নজির।[৯৭]

বাংলার নিজস্ব বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত সাহিত্য কর্মের মধ্যে মনসামঙ্গল অন্যতম। মনসামঙ্গল পাঁচালী পালা এবং এ ধারার শতাধিক কবির কথা জানা যায়। তবে এ ধারার জনপ্রিয় ও প্রাচীন কবিদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাই ছিলেন অন্যতম। বিজয়গুপ্ত *মনসামঙ্গল* রচনা করেন সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ এবং বিপ্রদাস সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে। মনসামঙ্গলের আরেকজন বিখ্যাত কবি দ্বিজ বংশীদাস। তাঁর কন্যা চন্দ্রাবতীও বাংলা সাহিত্যের এক খ্যাতিমান কবি ছিলেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য হোসেন শাহী আমল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মমতাজুর রহমান তরফদার বলেছেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে যে সাক্ষ্যই সংগ্রহ করা যাক না কেন এটা যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে যে, হোসেন শাহী শাসকরা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে জনগণের সংস্কৃতিকে সুস্পষ্ট রূপ নিতে সাহায্য করেছিলেন।[৯৮] উল্লেখ্য যে, ষোল শতকে বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ আরেকটি ধর্মমতের সংস্পর্শে আসে, আর এটি হল বৈষ্ণব ধর্ম। সমকালীন হিন্দু সমাজে বৈষ্ণব সাহিত্যের এর বিপুল প্রভাব ছিল। বস্তুত ব্রাহ্মাণ্য পৌরহিত্যকেন্দ্রিক বর্ণ ব্যবস্থা স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি-বিধানের প্রভাব নব্যন্যায়ের শুস্ক পাণ্ডিত্য, ব্রাহ্মাণ্য ধর্মের আওতায় তন্ত্রধর্মের বিধিসম্মত অনাচার এবং অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত লৌকিক দেব-দেবীর জগৎ-এ সব মিলেই তৈরী হয়েছিল তখনকার হিন্দু সমাজ। এই সমাজের পাশে সহজ সরল ভক্তিধর্ম ও বিনয়ের এক নতুন মূল্যবোধ নিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব। এ ধর্মকে সুসংহত করে শ্রী চৈতন্য দেব। সাহিত্য গবেষকদের মতে, চৈতন্য পর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নয়া প্লাবন

[৯৭] *গীতগোবিন্দটীকা, রঘুবংশটীকা, অমরকোষটীকা 'পদচন্দ্রিকা'* বৃহস্পতি মিশ্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ.

[৯৮] মমতাজুর রহমান তরফদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

আসে। বাংলা কাব্য ও সাহিত্যে মানবিকতার সুরঝংকার বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাব বলে কারো কারো মত।[৯৯] বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাচুর্যময় অংশ হলো পদাবলি সাহিত্য এবং এটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সবচাইতে রসোত্তীর্ণ ও স্বার্থক সাহিত্যকর্ম। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরম পবিত্র গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভাগবত অনুকরণে তাদের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপ ও বীর্যময় ক্রিয়াকলাপ অবলম্বন করে পদাবলী সাহিত্য নতুন ব্যঞ্জনায় রূপ লাভ করে। এসময়কার পদাবলী সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে যশোরাজ খান, রামচন্দ্র রায়, মুরারীগুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, পরমানন্দ গুপ্ত, বংশীবদন, বলরামদাস, লোচনদাস, কানুরামদাস, আফজাল, শেখ ফয়জুল্লাহ ও শেখ কবীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১০০] চরিতকাব্য বা জীবনীসাহিত্যও বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শ্রী চৈতন্যের জীবনীলীলাকে কেন্দ্র করে চরিতকাব্য রচিত হয়। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম চৈতন্যচরিত গ্রন্থ হলো বৃন্দাবনদাস রচিত *চৈতন্যভাগবত*। কবি জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* এ ধারা উল্লেখযোগ্য দুটি রচনা। শেষোক্ত গ্রন্থটি যখন রচিত হয় তখন বাংলা মুঘল সম্প্রসারণবাদী শক্তির করতলগত। কেউ কেউ মনে করেন বাংলায় প্রাক-মুঘল যুগ ছিল বাংলা সাহিত্যের গঠনপর্ব। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবি ও ফারসি সাহিত্যের সম্পদ ও মুসলিম মানবীয় রম্য উপাদনগুলো সার্বজনীন আবেদন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নবজীবন দান করে। মুঘল শাসন এ ধারাকে বিচ্যুত করতে পারেনি, বরং এ সময় বাংলা ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে নতুনতর উৎসাহ সঞ্চারিত হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।[১০১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলমানরা বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুরু করেন প্রায় হিন্দুদের সমকালেই। এ ক্ষেত্রে হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের মতো তারাও যে রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, তা বলাবাহুল্য। মুসলিম কবি সাহিত্যিকরা বাংলা ভাষার আসরে যোগ্য আসন গ্রহণ করে বাংলা সংস্কৃতিতে তৎকালীন সভ্য বিশ্বের বিশেষ করে পারস্য সংস্কৃতির রস আমদানি করে একে পরিপুষ্ট করেছেন। আহমদ শরীফ মনে করেন, আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য এসেছে মুসলমানদের হাত ধরেই। কাব্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যদানের ও গৌরবও তাদেরই।[১০২] তবে হিন্দুদের মত মুসলিম কবি সাহিত্যিকদেরও মৌলিক রচনা কম। তাদের সাহিত্যকর্ম মূলত অনুবাদ বা অনুকৃতি। তবে মুসলমান রচিত সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিকতা। ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলেই মুসলমানদের দ্বারা মানব-রাসাশ্রিত সাহিত্য ধারা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ এর মত হচ্ছে, দরবারী ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার হিন্দু মুসলমানের পরিচয় একই সূত্রে ও একইকালে হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বজাত্যবোধ ইরানী সংস্কৃতি দ্রুত গ্রহণে ও স্বীয়করণে তাদের সহায়তা করেছে প্রচুর। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে ছয়'শ বছরেও তা পুরো সম্ভব হয়নি। তাই মুসলমান কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য 'প্রণয়োপখ্যান' রচনা করছিলেন, হিন্দু লেখকগণ তখনও দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহমুক্ত হতে পারেননি।[১০৩]

---

[৯৯] মমতাজুর রহমান তরফদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৯৯

[১০০]বিস্তারিত দ্রষ্টব্য আহমদ কবীর, 'পদাবলী ও জীবনীসাহিত্য', আনিসুজ্জমান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃপৃ.৪৯৮-৫৪৯

[১০১] এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ২৬৩

[১০২] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য*, পৃ. ১৮৫

[১০৩] ঐ, পৃ. ১৮৫

দেবভাষা সংস্কৃত থেকে বাংলায় হিন্দু শাস্ত্রের অনুবাদ বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজ পাপকর্ম বলে মনে করতেন। বাংলার মুসলিম সমাজও এরূপ মনোভাবের একেবারে উর্ধে ছিল না। শাস্ত্রকথা বাংলায় লেখা বৈধ কী-না সতেরো শতক অবধি এ ব্যাপরে মুসলিম সমাজেও বিতর্ক ছিল। মুসলিম সাহিত্যজীবী শাহ মুহাম্মদ সগীর, আমীর হমজা, সৈয়দ সুলতান ও আবদুল হাকিমের রচনায় যে কৈফিয়তের সুরধ্বনি দেখা যায়, তাতে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়।[১০৪] ভাষান্তরিত হলে কোরআনের আয়াতের মহিমা ও পবিত্রতা নষ্ট হবে- এ ধারণা মুসলিম সমাজের বিদেশাগত আশরাফদের কারো কারো মধ্যে ছিল। এর বিপরীত ধারায় বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ উপলব্ধি করেন এদেশের মুসলমানদের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে বাংলায় ইসলাম সংক্রান্ত রচনার অভাব। সুতরাং তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় বাংলায় ইসলামী গ্রন্থ রচনা। এদের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা ইসলামী শাস্ত্রগ্রন্থের বাহক হিসেবে স্থান করে নেয়। বাঙ্গালী মুসলমানের কাছে ইসলাম ধর্মকে সুবোধ্য ও জনপ্রিয়করার জন্য তাদের নিজস্ব ভাষায় ও রূপে ইসলামের ঐতিহ্যধারাকে নতুন ছাঁছে ঢেলে লেখার এক কঠিন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন বাঙ্গালি মুসলিম লেখকগোষ্ঠী। ইসলামের নিত্যকর্ম ছাড়া তাদের রচিত আখ্যান-উপখ্যানমূলক ও মরমিয়া রচনার মধ্যে ইসলামী ও স্থানীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও সমন্বয় মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। মুসলিম লেখকদের ঐতিহাসিক ও কল্পিত আখ্যান-উপাখ্যানগুলো ছিল স্পষ্টতই বাংলা সাহিত্যের 'মঙ্গলকাব্য', 'পাঁচালী' নামে সুপরিচিত আখ্যায়িকা কাব্যের সাথে গভীর সাদৃশ্যপূর্ণ।[১০৫] আরবি, ফারসি বা ভারতীয় প্রভাবপুষ্ট প্রণয় উপাখ্যান ও মরমিয়াধর্মী বৈষ্ণবধারার কাব্য রচনায়ও মুসলিম লেখকদের অবদান অপরিসীম। বাঙ্গালী মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের রচনায় লোকায়ত বিশ্বাস ও লোক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল ব্যাপক ও গভীর। তাই নিরক্ষর গ্রামবাসী এর শ্রোতা এবং সাক্ষর গ্রামবাসী ছিল এর পাঠক।

ষোল শতকে যে কয়জন মুসলিম লেখকের লেখনীর সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন *ইউসুফ-জুলেখা* প্রণয়োপখ্যানের রচয়িতা শাহ মুহাম্মদ সগীর।[১০৬] চর্যাগীত যেমন ভারতীয় ভাষাজগতে সন্ধিযুগের স্মারক স্তম্ভ, তেমনি *ইউসুফ-জুলেখা*ও রোমান্টিক সাহিত্যের গৌরব মিনার হিসেবে বিবেচিত হয়। এই শতাব্দীর আরেকজন খ্যাতিমান মুসলিম কবি শাবিরিদ খান। *বিদ্যাসুন্দর, হানিফা কায়রাপরী ও রসুলবিজয়* কবি শাহ বারিদের অন্যতম রচনা।[১০৭] *রসুলবিজয়* নামে আরেকটি কাব্যের রচয়িতা জৈনুদ্দিন। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালি মুসলিম কবিদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান চট্টগ্রামের সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮)। *নবী বংশ* তাঁর শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম কাব্যগ্রন্থ। যুদ্ধকাব্য *রসুলবিজয়* ছাড়াও তিনি *ইবলিসনামা* ও *ওফাতে রাসুল* নামে কাব্য রচনা করেন। *জ্ঞান-চৌতিশা* ও *জ্ঞান-প্রদীপ* সৈয়দ

---

[১০৪] বিস্তরিত দ্রষ্টব্য আহমদ শরীফ, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ.১৮৬-১৮৯

[১০৫] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য অসীম রায়, 'মুসলিম বাংলার ইতিহাসে সমন্বয়ধর্মী ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা' *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ*, সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৬৯

[১০৬] শাহ মোহাম্মদ সগীরকে বাংলার মুসলিম কবিদের মধ্যে আদিতম বলে কেউ কেউ মনে করেন। এনামুল হক, আহমদ শরীফ, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও ওয়াকিল আহমদ প্রমুখ তাঁকে পনের শতকের কবি বললেও সুখোময় মুখোপাধ্যায় ও আবদুলকরিম সাহিত্যবিশারদ তাঁকে ষোড়শ শতকের বলে উল্লেখ করেছেন। আনিসুজ্জমান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃপৃ. ৫৮৮, ৫৮৯, ৬৩২-৩৩

[১০৭] এসব বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধকাহিনীর নির্দশণ । গোলাম সাকলায়েন এর মতে, হিন্দুকবিদের পাঁচালী ঢঙ্গে রচিত মঙ্গলকাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এবং *শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীচৈতন্যবিজয়, রামায়ন-মহাভারত* প্রভৃতির অনুসরণ ও অনুকরণে মুসলিম কবিগণ রচনা করেন ইসলামের নবী-রসুলদের কাহিনী, বীরপুরুষদের শৌর্যবীর্য গাঁথা এবং মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ কলহ ও গৃহবিবাদের বর্ণাঢ্য কথকতা। এসব 'যুদ্ধকাব্য' নামে পরিচিত। গোলাম সাকলায়েন, 'যুদ্ধকাহিনি ও অন্যান্যকাব্য', আনিসুজ্জমান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৬০৭

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান রচিত বিখ্যাত সুফিকাব্য।[১০৮] এ শতকের আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি দৌলত উজির বাহরাম খান। *লায়লী-মজনু* প্রণয়োপাখ্যান তাঁর বিখ্যাত রচনা। এটি ফারসি কবি আবদুর রহমান জামির কাব্যের ভাবানুবাদ।[১০৯] দৌলত উজির বাহরাম খান কারবালার করুণ ঘটনাকে উপজীব্য করে *ইমাম বিজয়* নামে একটি যুদ্ধ ও শোককাব্য রচনা করেন।

আরবি-ফারসি ভাষায় রচিত বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে বাঙ্গালি মুসলিম কবিগণ ইসলামের নীতিকথা ও শরা-শরিয়ত বিষয়ক কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এসব রচনার মধ্যে কবি মুজাম্মিল রচিত *নীতিশাস্ত্রবার্তা*, *সায়াৎনামা ও কঞ্জন-চরিত*, কবি ফয়জুল্লাহর *সুলতান জমজমা*, শেখ পরাণের (১৫৫০-১৬১৫) *নসিহতনামা*, নসরুল্লাহ খানের *মুসার সওয়াল*, *হেদায়েতুল ইসলাম* ও *শরীয়ৎনামা*, শেখ মুত্তলিবের (১৫৯৫-১৬৬৩) *কিফায়েতুল মুসলিমুন* উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলার স্বাধীনসত্ত্বার অবসান ঘটে এবং সুলতানী যুগে সূচিত বঙ্গীয় জাতিসত্ত্বার বিকাশক্রম বাধাগ্রস্থ হয়। মহাপ্রতাপশালী মুঘলদের আগমনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর কী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হয়েছিল- সে সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। এ কথা সত্য যে, স্বাধীন সুলতানী যুগের মত মুঘল সুবাদারি শাসনামলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রাজপৃষ্ঠপোষকতা পায় নি। এতদসত্ত্বেও বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশ যে খুব বেশি বাধাগ্রস্থ হয়নি তার প্রমাণ মেলে সে সময় রচিত বাংলা সাহিত্য নির্দশনে। বস্তুত মুঘল যুগে সুস্থ ও শান্তি পূর্ণ পরিবেশ এবং উত্তর ভারতীয় ও মধ্য এশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রভাবে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন নানাভাবে প্রভাবিত হয়। এ সময় বাংলা সাহিত্যের দিগন্তের পরিধি ব্যাপ্ত হয়। বাংলা সাহিত্যের মানবিক ও রম্য উপাদানগুলোর উন্নতি হয় এবং ধর্ম, অতীন্দ্রিয়বাদ ও ঐতিহাসিক বিষয়ে অনেক সাহিত্য রচিত হয়। অতীন্দ্রীয়বাদের উপর সৈয়দ সুলতানের রচিত *জ্ঞান চৈতিষা ও জ্ঞান প্রদীপ* গ্রন্থের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধারার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে ছিল হাজী মুহম্মদের (১৫৫০-১৬২০) *নুরজামাল*, শেখ মনসুরের *সিররনামা*, অজ্ঞাতনামা লেখকের[১১০] *যোগকলন্দর*, আবদুল হাকিমের (১৬২০-১৬৯০) *চারি মোকাম-ভেদ*, শেখ চাঁদের (১৫৬০-১৬২৫) *হরগৌরী সম্বাদ*, মুহাম্মদ শফীর *নুরনামা* এবং আলী রেজার *জ্ঞান সাগর* ইত্যাদি। এসব গ্রন্থে সে যুগের মুসলমান সমাজে প্রচলিত মিশ্র অতীন্দ্রিয়বাদের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। পদাবলী[১১১] সাহিত্যেও মুসলিম কবিগণ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। একে বাংলায় মরমি সাহিত্যের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ পদাবলী সাহিত্যের সুপরিচিত রচয়িতাদের মধ্যেও সৈয়দ সুলতান ছিলেন অন্যতম। এ ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ মুর্ত্তজা (১৫৯০-১৬৬২), ফতেহ খান, শাহ্ আকবর, সালিহ্ বেগ, কবীর ও করম আলী প্রমুখ।[১১২]

---

[১০৮] মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পুনর্মুদ্রণ, হাশি প্রকাশনালয়, ঢাকা, ২০০২, পৃপৃ. ১৫০-১৬১

[১০৯] লায়লী মজনু প্রাক-ইসলামী যুগের আরবের একটি লোককাহিনীভিত্তিক প্রেমকাব্য। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এ নামে প্রথম কাব্য রচনা করেন ফারসি কবি নিযামী। পরে পণের শতকে অপর ইরানী কবি আবদুর রহমান জামীও এ নামে কাব্য রচনা করেন।।

[১১০] আহমদ শরীফ তাঁর বাংলার সুফী সাহিত্য গ্রন্থে যোগকলন্দরের লেখক অজ্ঞাত নামা বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এম এ রহিম যোগ কলন্দরের লেখক হিসেবে সৈয়দ মুর্ত্তজার নাম উল্লেখ করেছেন। এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ২৬৫

[১১১] পদাবলী ছিল এক প্রকার মরমি সঙ্গীত যা সুফি সঙ্গীত বা গজল থেকে প্রেরণা ও ভাব আহরণ করে রচিত হয়েছিল।

[১১২] এনামুল হক, *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃপৃ.১৬২, ২২৭

ইতিহাসাশ্রয়ী সাহিত্য রচনায়ও বাঙ্গালী মুসলমান সাহিত্যিকদের বিশেষ অবদান রয়েছে। আঠারো শতকের প্রথমপাদে নাওয়াজিস খানের *পাঠান প্রশংসা* ও *জোরওয়ার সিংহ কীর্তি* এ ধরার রচনা। এ প্রসঙ্গে উজীর আলীর *শাহনামা*'র কথাও উল্লেখ করতে হয়। তবে এর আগে কারবালার বিয়োগান্তক ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্রকরে বেশ কিছু ইতিহাসাশ্রয়ী সাহিত্য রচিত হয়েছিল। তন্মধ্যে কবি মুহম্মদ খানের (১৫৮০-১৬৫০) *মকতুল হোসেন*[১১৩], গরীবুল্লাহ ও ইয়াকুব আলীর *জঙ্গনামা*, কবি আবদুল হাকিমের *কারবালা*। উল্লেখ্য যে, সন্দীপের অধিবাসী কবি আবদুল হাকিম *কারবালা* গ্রন্থ ছাড়াও ধর্ম এবং ধর্মীয় ও রম্য বিষয়বস্তুর উপর বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন- যার মধ্যে ছিল *নসীহৎনামা*, *ইউসুফ- জোলেখা*, *লালমতি*, *সয়ফুল মুলক* এবং *নূরনামা* ইত্যাদি।

পর্যালোচনাধীন সময়ে আরাকান ও ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। আরকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি দৌলত কাজী *সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী* নামক রম্যকাব্য রচনা করেন। শিল্প নৈপুন্য এবং সৌন্দর্যবোধের দিক থেকে একে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দশন বলে গণ্য করা হয়।। আলোচ্য যুগে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন সৈয়দ আলাওল। কেউ কেউ তাঁকে মুসলমানদের জাতীয় কবি বলেও মনে করেন।[১১৪] গোপাল হালদারের মতে, তাঁর কবিকৃতি ও বাণী রচনা অকৃত্রিম। হালদার মনে করেন আলাওলই একমাত্র কবি যিনি মধ্যযুগের হয়েও তাঁর উদার মানবিকতায় কতকাংশে স্মরণ করিয়ে দেন এ যুগের রবীন্দ্রনাথকে।[১১৫] কবি আলাওল আরাকান রাজ থদোমিন্তার সাদ উমাদারের (১৬৪৫-৫২) মূখ্যমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সীর *পদুমাবৎ* কাব্যকে *পদ্মাবতী* নামে বাংলা মহাকাব্যে রূপদান করেন। এ ছাড়াও তিনি *সয়ফল-মুলক বদিউজ্জামান* ও *সপ্তপয়কর* কাব্য রচনা করেন। তিনি কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত *সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী* কাব্যগ্রন্থের শেষাংশও রচনা করেন।

ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্যসেবীদের মধ্যে কবি শেখ চাঁদ ছিলেন প্রধান। তাঁর যোগতান্ত্রিক অতীন্দ্রিয়বাদী কাব্যগ্রন্থ *হরগৌরী সম্বাদের* কথা আগেই বলা হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও মরমি সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে *রসুল বিজয়*, *শাহদৌলা*, *কিয়ামৎনামা* এবং *তালিবনামা* ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। তালিবনামা গ্রন্থটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়।[১১৬] ত্রিপুরার অন্যান্য খ্যাতিধর কবিদের মধ্যে রম্য প্রেমকাব্য *জেবালমুলক শামরুখ* রচয়িতা সৈয়দ মুহাম্মদ আকবর (১৬৫৭-১৭২০) এবং *ময়নামতির গান* (ত্রিপুরা রাজা গোপীচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী ময়নামতিকে কেন্দ্র করে রচিত) কাব্যের রচয়িতা শুকুর মাহমুদের (১৬৮০-১৭৫০) নাম স্মরণ করা যেতে পারে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা এখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বস্তুত তুর্কি বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে মুসলমান সমাজের মত একটি নতুন উপাদানের প্রবর্তন ও ক্রমবিকাশ ঘটে। উল্লেখ্য যে, বখতিয়ার খলজি যখন লাক্ষ্মৌতি

---

[১১৩] কবি মুহম্মদ খানের অন্যান্য রচনার মধ্যে *আসহাবনামা*, *কিয়ামতনামা*, *দাজ্জালনামা*, *হানিফার লড়াই*, এবং *সত্যকলি সম্বাদ* উল্লেখযোগ্য।

[১১৪] মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৪

[১১৫] গোপল হালদার, *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃ. ১৬৬

[১১৬] এনামুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫০

রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তখন মুসলমান সমাজ গঠিত হয়েছিল মাত্র কয়েক হাজার অভিবাসী নিয়ে। শাসকগোষ্ঠী ধর্ম প্রচারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করলেও পরবর্তী পর্যায়ে নবতর অভিবাসন ও ধমান্তরণ -এ দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বাংলার মুসলিম সমাজ পুষ্ট হয়। সেন যুগের কঠোর হিন্দু ব্রাহ্মাণ্যবাদের স্থান দখল করে নেয় ইসলামের সহজ সরল ও অনড়াম্বর আচার অনুষ্ঠান এবং সামাজিক সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ। ইসলামের সামাজিক সাম্যের আদর্শ হিন্দু সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ফলে যুগ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে হিন্দু সমাজও সংস্কার আন্দোলনে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল। হিন্দুদের বর্ণপ্রথা-পীড়িত অনুদার সামাজিক জীবনে বৈষ্ণবাদের প্রচার ওপ্রসার এ সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের ফসল। মুসলিম শাসন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছে। মুসলিম শাসকগোষ্ঠী ছিল বিদেশী-বিভাষী। তবে এখানকার অধিবাসীদের জন্য সাধারণ ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার প্রচলন, বাংলা ভাষাকে লেখ্য শালীন সাহিত্য ভাষায় উন্নয়ন, রাজপৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধন ও বিকাশ বাঙ্গালিদের জন্য মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী অবদান হিসেবে গণ্য করতে হবে।

২.৩ অর্থনৈতিক অবস্থা

মুঘল সুবাদারি শাসন আমল এমনকি তার পূর্বে প্রায় চার শতাব্দীর মুসলিম শাসনামলে বাংলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল। সমকালীন বাংলা ও ফারসি সাহিত্য এবং পর্যটকদের বিবরণীতে এ তথ্যই বিধৃত হয়েছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ধনৈশ্বর্যের কারণে বাংলা 'জান্নাত-আবাদ' বা 'স্বর্গরাজ্য' বলে অভিহিত হয়েছিল। ষোল শতকের মধ্যভাগে স্বয়ং মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বাংলাকে এ আখ্যা দিয়েছিলেন।[১১৭] অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিশেষ করে এর শিল্পপণ্য বাংলাকে বর্হির্বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি এনে দেয় বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, পাল সেন, তুর্কি-পাঠান জাতি-গোষ্ঠীর শাসক শ্রেণী বা সমরনায়কদের দ্বারা নয়, বহির্বিশ্বে বাংলার পরিচয় ঘটেছিল এর শিল্পপণ্য দ্বারা। সাধারণ কারিগরদের উৎপাদিত শিল্পপণ্যই ছিল বহির্বিশ্বে বাংলার দুত।[১১৮] বাংলা যে সমৃদ্ধ ও সভ্য দেশ ছিল এ বর্ণনা আমরা সমকালীন চৈনিক পর্যটকদের বিবরণীতেও পাই। আলোচ্য যুগে বাংলার অর্থনীতির প্রধান খাত ছিল -কৃষি। তবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থানও ছিল উল্লেখ করার মতো।[১১৯]

২.৩.১ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য

বাংলা ছিল একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এদেশের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ ছিল কৃষিজীবী।[১২০] জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসত কৃষি থেকে। প্রাকৃতিক কারণে ভুমির উর্বরতা এবং তুলনামুলকভাবে কৃষিকাজ ও কৃষি উৎপাদন সহজসাধ্য হওয়ায় বাংলার জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিলেন। তবে লক্ষ করার বিষয় হলো কৃষকদের মধ্যেও প্রভূত মাত্রায় স্তর বিভাজন ছিল। *শূণ্য*

---

[১১৭] Abul Fazal, *Ain-i-Akbari,* Eng. Trans. by Jerret, Vol. II, pp. 122-123

[১১৮] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ২য় খণ্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩, পৃ. ১

[১১৯] মমতাজুর রহমান তরফদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৩

[১২০] এম মোফাখখারুল ইসলাম মনে করেন অলোচ্য সময়ে কৃষিজীবীর সংখ্যা ছিল সম্ভবত শতকরা ৮০ ভাগ। বাংলার 'অর্থনৈতিক জীবন' আনিসুজ্জমান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ.। তাঁর বর্ণিত এ সংখ্যাটি অনুমানভিত্তিক। সন্দেহ নেই বাংলার জনগোষ্ঠীর গরিষ্ঠ অংশ কৃষিজীবী ছিলেন। তবে তা শতকরা ৮০ ভাগ ছিল কি-না তা নিঃশংষয়ে বলা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

পুরাণের একটি তথ্য নির্দেশ করে মমতাজুর রহমান তরফদার বলেছেন, কৃষি কেবল সাধারণ মানুষের পেশা ছিল তা নয়, সম্ভবত সম্ভ্রান্তবংশীয়গণও পেশা হিসেবে কৃষিকে অপছন্দ করতো না। পশ্চিম বাংলার কৃষকদের সম্পর্কে কবি বিপ্রদাসের বর্ণনায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১২১] তথ্য প্রমাণে দেখা যায় যে, এখানকার অধিকাংশই ছিলেন ক্ষুদে কৃষক। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়। সে যুগে অনেক ধনী এবং বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক কৃষকও ছিলেন-যারা নিজেদের ভূমিতে প্রচুর কৃষি-শ্রমিক নিয়োগ করতো। কৃষি-শ্রমিকরা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপেই ভূমিহীন ছিলেন। তারা জীবিকার প্রয়োজনে ধনী কৃষকদের শ্রমের যোগান দিতো। বৃহৎ ভু-স্বামী এবং কৃষি শ্রমিকদের মাঝখানে আরেক শ্রেণীর কৃষিজীবীর অস্তিত্ব ছিল-যারা এসব কৃষি শ্রমিকদের তদারকি করতেন এবং সমাজে তারা যথেষ্ট ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ছিলেন।[১২২]

অসংখ্য নদ-নদীর কল্যাণে এবং ঋতুমাফিক বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক সেচ সুবিধার কারণে ব-দ্বীপীয় বাংলার জমি ছিল উর্বর এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। বাংলার উর্বর মাটিতে বছরে দুই বা তিনটি ফসল হতো বলে জানা যায়। মধ্যযুগে বাংলায় আগত চৈনিক ও ইউরোপীয় পর্যটকগণ বাংলায় উৎপন্ন কৃষি দ্রব্যের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান ছিল প্রধান কৃষিজাত পণ্য এবং নানা জাতের ধান এখানে উৎপন্ন হতো। মোফাখ্খারুল ইসলাম বাংলায় উৎপন্ন ছত্রিশ রকমের চালের নাম উল্লেখ করেছেন।[১২৩] উল্লেখ্য যে, চাল ছিল সে সময় বাংলার অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। ধান ছাড়াও নানা রকমারি ফসল উৎপন্ন হতো।

কৃষি বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলেও কৃষিকাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি এবং উৎপাদন কৌশল ছিল সেকেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষককে প্রাকৃতিক সেচের উপর নির্ভর করতে হতো। অবশ্য আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে চালের উৎপাদন বৃদ্ধিকে তরান্বিত করার জন্য সেচকাজ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যান্য পর্যায়ে কিছু কিছু প্রযুক্তির প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সেচ ব্যবস্থায় জলচক্রের (Water wheel) ব্যবহার এর প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে চাপযন্ত্র বা লিভারের কথাও বলা যেতে পারে। অধিক সংখ্যায় জলচক্র এবং লিভার যন্ত্র ব্যবহারের ফলে বাংলায় কৃষিজ পণ্যের, বিশেষ করে ধান-চালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১২৪] ০

প্রসঙ্গত সমকালীন বাংলার ভূমিব্যবস্থা ও ভূমি রাজস্ব বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, নীতিগতভাবে ভুমির মালিকানা স্বত্ব (মিলকিয়াত) ছিল সুলতান বা সম্রাটের। জমিতে কৃষকের ব্যক্তিগত বা যৌথ মালিকানা ছিল না, তবে জমিচাষ ও ভোগ দখলের অধিকার ছিল। যতদিন কৃষক ভূমি রাজস্ব ঠিকমতো আদায় করে কৃষিকাজ অব্যাহত রাখতো ততদিন সরকার তাকে জমি থেকে উচ্ছেদের অধিকার প্রয়োগ করতো না। সরকার প্রধানত চারটি উপায়ে রাজস্ব আদায় করত: (ক) রাজস্ব বিভাগীয় নিজস্ব কর্মচারী (খ) মধ্যস্বত্বভোগী, (গ) জায়গিরদার এবং (ঘ) জমিদারদের সাহায্যে। মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে স্থানীয় এবং বিদেশী

---

[১২১] কবি বিপ্রদাস , *মনসা বিজয়*, মমতাজুর রহমান তরফদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০

[১২২] মমতাজুর রহমান তরফদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২১

[১২৩] এম মোফাখ্খারুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৬৭

[১২৪] মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

(পর্তুগিজ) উভয়েই ছিল। স্থানীয়রা 'মজমাদার' নামে পরিচিত ছিল। মধস্বত্বভোগীরা সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে বিশেষ এলাকার রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেতো। মুঘল আমলে তো বটেই প্রাক- মুঘল বাংলায়ও জায়গিরদারি ব্যবস্থা চালু ছিল বলে ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। জায়গিরদারি ব্যবস্থায় সরকার কোনো কর্মচারীকে নগদ বেতনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট এলকায় রাজস্ব আদায় ও ভোগ দখলের অধিকার দিতো। এর বাইরে ছিল একশ্রেণীর ভূস্বামী, নিজ এলাকায় যাদের কর্তৃত্ব ছিল স্থায়ী এবং বংশগত। আবুল ফজল এদের জমিদার হিসেবে আখ্যায়িত করেন। প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং নিয়মিত করদানের মাধ্যমে তারা বংশপরম্পরায় নিজ নিজ অঞ্চলে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারতো।

সমকালীন তথ্য উৎসসমূহে বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে, দেশের সর্বত্র খাজনার হার অভিন্ন বা একরকম ছিল না। জমির উর্বরতা ও অঞ্চল বিশেষে রাজস্ব হারে ভিন্নতা ছিল। প্রাক-মুঘল যুগে রাজস্বের পরিমাণ ছিলে সর্বোচ্চ অর্ধাংশ থেকে সর্বনিম্ন এক- পঞ্চমাংশ পর্যন্ত । মুঘল যুগে রাজস্বের হার পরিবর্তিত হয়েছিল কী-না তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে এসময় উৎপন্ন ফসলের গড়পরতা এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব আদায় করা হতো বলে কোন কোনো সূত্রে পাওয়া যায়।[১২৫] উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক হিসাব ছিল রাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তি। জমি জরিপ পদ্ধতি সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠী সচেতন ছিলেন এবং তাদের কাছে তা অপরিচিত ছিল না সত্য, তবে সবসময় যথাযথভাবে জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো বলে মনে হয় না। নগদ টাকায় বা উৎপন্ন ফসলে রাজস্ব পরিশোধের সুযোগ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ ছিল কৃষক এবং তারা ছিল জাতীয় আয়ের সিংহভাগের জোগানদাতা। তবে সরকারিও বেসরকারি রাজস্ব আদায়কারীদের সাথে দর কষাকষিতে তারা খুব সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল বলে মনে হয় না। প্রাকৃতি দুর্যোগ দুর্বিপার্কে রাজস্ব আদায় এবং রাজস্ব কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দাবি মেটাতে না পেরে কৃষকদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা সমকালীন ইতিহাসে পাওয়া যায়।

২.৩.২ শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্য

প্রাক-নবাবী বাংলায় শিল্পোৎপাদন ছিল অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। বস্তুত বস্ত্র, চিনি, ধাতব শিল্প, কাগজ, কার্পেট, জাহাজ নির্মাণ, কামান ও বন্দুক তৈরীর মতো শিল্পে বাংলা প্রভূত উন্নতি করেছিল। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বস্ত্র শিল্প। পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলায় তৈরী বস্ত্রসম্ভার বৈচিত্র ও প্রাচুর্যের কারণে বিদেশী পর্যটকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তারা বাংলায় উৎপাদিত বিভিন্ন মানের রঙ ও আকারের সুতি বস্ত্রের কথা বিশেষভাবে বলেছেন।[১২৬] বাংলার সুতি বস্ত্র অভন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর ভারতের অন্যান্য অঞ্চল এমনকি, তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব উপদ্বীপ ও ইথিওপিয়াতে রপ্তানি করা হতো বলে জানা যায়।

---

[১২৫] Irfan Habib, *Eassays in Indian History,* কাবেরী বসু কর্তৃক *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ* শিরোনামে বাংলায় অনুদিত, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ২০০২, পৃ. ৮০

[১২৬] বাংলায় উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের সুতি বস্ত্র এদের পরিমাপ ও রঞ্জন প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ.পৃ ৩৪৯-৩৫৩, Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal, IB,* KSA, 1985, pp. 937-939

Dhaka University Institutional Repository

মসলিন নামে যে উন্নত মানের সুক্ষ্ম সুতি বস্ত্র বাংলায় তৈরি হতো তার সুখ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। শুধু ভারতীয় নয় অনেক ইউরোপীয় বণিক ও পর্যটকের লেখনীতেও মসলিন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। মসলিন খুব দামী ছিল। মীর্জা নাথান মালদাহ থেকে চার হাজার টাকায় একখণ্ড মসলিন ক্রয় করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৭] কাজেই মসলিন কাপড় যে সাধারণ মানুষের ক্রয় সাধ্যের মধ্যে ছিলনা, তা বলা বাহুল্য। সুলতান ও অভিজাত আমীর-ওমরাহগণ ছিলেন এর মূল ক্রেতা এবং তাদেরই পৃষ্টপোষকতাধীনে মসলিন শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটে। ইউরোপেও এ কাপড়ের ব্যাপক চাহিদা ছিল। ধারণা করা হয় যে, পাটের সুতা থেকেও এক ধরণের বস্ত্র সামগ্রী তৈরী হতো। পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলায় রেশম শিল্পের যে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল মাহুয়ান প্রমুখের বর্ণনা থেকে তা জানা যায়। ভার্থেমার বর্ণনায় রেশমি বস্ত্র বাংলার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে।[১২৮] রেশমি বস্ত্র তৈরীর কাঁচামাল অপরিমার্জিত রেশম দিয়ে ক্যাম্বে, আহমদনগর ও সুরাটে রেশমি বস্ত্র তৈরী হতো।[১২৯]

চৌদ্দ শতক থেকে সতের শতকের মধ্যে বস্ত্র উৎপাদনে যে পরিমাণগত পরিবর্তন এসেছিল তা সমকালীন ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বিবরণীতে স্পষ্ট। দেশী ও ইউরোপীয় বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজার থেকে বাংলার সুতি বস্ত্রের বিনিময়ে মশলা ক্রয় করার কারণে এর উৎপাদন চাহিদা বেড়ে যায়। এ জন্য উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নতি বিধান জরুরি হয়ে পড়ে। চরকা ও তাঁতের পাশাপাশি বস্ত্রশিল্পে টাকু (বাঁশের তৈরী সুচের মতো একটি যন্ত্র) বা তকলি এবং ধুনন-যন্ত্র (তুলা পেঁজার যন্ত্র) সংযুক্ত হওয়ায় বাংলায় সুতি বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তাঁতীরাও একটি পেশাজীবী শ্রেণী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাংলায় উৎপাদিত শিল্পজাত পণ্যগুলোর মধ্যে বস্ত্রের পরেই ছিল চিনির স্থান।[১৩০] অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত চিনি ভারতের অন্যত্র এবং বিদেশে রপ্তানি করা হতো। বাংলায় উৎপাদিত রপ্তানি পণ্যের তালিকায় চিনির পরই লবণের স্থান ছিল। লবণ শিল্প ছিল প্রাক-নবাবী বাংলার প্রধান শিল্পগুলোর অন্যতম। চট্টগ্রাম থেকে কটক পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র উপকুলীয় অঞ্চলে 'কুরকুচ' ও 'পুঙ্গাহ' নামে দু'রকমের লবণ উৎপন্ন হতো।[১৩১] লবন উৎপাদনের সাথে পুরুষানুক্রমে জড়িত ব্যক্তিদের মালাঙ্গী বলা হতো। পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলায় ধাতব শিল্পেরও বিকাশ ঘটেছিল এবং কর্মকার ও স্বর্ণকাররা একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক শ্রেণী গঠন করেছিল বলে জানা যায়।[১৩২] কাগজের ব্যবহার বাংলায় কখন শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে পনের ও ষোল শতকে গাছের বাকল থেকে সাদা মসৃন কাগজ তৈরির কথা জানা যায়। মধ্যযুগের ধর্মীয় সাহিত্য এবং পরবর্তীকালের আদম শুমারির প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, বাংলায় গতানুগতিক পেশাজীবী কারিগরদের সংখ্যা অনেক। এসব পেশাজীবী কারিগরদের মধ্যে উপরে বর্ণিতদের বাইরে শঙ্খকার, কুম্ভকার, কংসকার, তৈলকার প্রভৃতি উৎপাদক শ্রেণীও অন্তর্ভূক্ত ছিল।

---

[১২৭] এম মোফাখ্খারুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০

[১২৮] মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেনশাহী আমলে বাংলা*, পৃ.১২৭

[১২৯] মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, পৃ.৩১

[১৩০] ঐ, পৃ. ২২

[১৩১] সূর্যতাপের সাহায্যে সমুদ্রের লোনা জলের বাস্পীভবন করে তৈরি লবণকে কুরকুচ লবণ এবং সমুদ্রের ঘণীভূত লোনা জল সিদ্ধ করে তৈরি লবণকে পুঙ্গাহ লবণ বলা হতো।

[১৩২] কৃষিকাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি তৈরির জন্য কামারদের যে বেশ চাহিদা ছিল তা অনুমেয়। উন্মুক্ত ধাতব গোলাকার জলপাত্র, ইস্পাতের বন্দুক, বাটি, চুরি এবং কাঁচির মত জিনিস বাংলার খোলা বাজারে বিক্রি হতে মা হুয়ান দেখেছেন। মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেনশাহী আমলে বাংলা*, পৃ.১২৭

Dhaka University Institutional Repository

নদীমাতৃক বাংলায় জাহাজ ও নৌকা নির্মাণ শিল্পের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা সমকালীন ঐতিহাসিক সূত্রে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। বস্তুত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং ক্রমবর্ধমান নৌ-যুদ্ধের প্রয়োজনেই সুলতানী এবং মুঘল আমলে বাংলায় নৌ শিল্পের বিকাশ তরান্বিত হয়েছিল।[১৩৩] টাভার্নিয়ারের বর্ণনায় ঢাকা নগরীর এক বিস্তৃত অংশে (সম্ভবত বর্তমান সূত্রাপুরে) নৌকা ও জাহাজ নির্মাণকারী সুত্রধরদের বসবাসের কথা উল্লেখ রয়েছে।[১৩৪]

উপরের আলোচনায় বাংলার শিল্পেৎপাদনের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে এ কথা বলতেই হবে যে, তখনো বাংলার শিল্প-কারখানায় উৎপাদন কৌশল ছিল অনুন্নত, গতানুগতিক ও অনেকটাই সেকেলে। সমকালে শিল্প প্রযুক্তিতে চীন ও ইউরোপের অগ্রগতির তুলনায় বাংলা-ভারত অনেক পশ্চাদপদ ছিল। বস্ত্র বয়নশিল্পে বাংলার অভূতপূর্ব অগ্রগতি হলেও এ ক্ষেত্রে ইতালি বা চীনের মত প্রযুক্তি উদ্ভাবন বাংলায় হয়নি। বস্ত্রশিল্প ছিল অনেকটাই গ্রামীণ কুটির শিল্পের পর্যায়ে। নৌ-বিদ্যা সম্পর্কিত আধুনিক যন্ত্রপাতিও ছিল বাঙ্গালিদের নাগালের বাইরে। বস্তত জ্বালানী সম্পদ, ধাতুবিদ্যা এবং রাসায়নিক শিল্পে অনগ্রসরতা ইত্যাদি পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলার শিল্প প্রযুক্তির পশ্চাদপদতার অন্যতম কারণ ছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে।

২.৩.৩ ব্যবসা-বাণিজ্য

তুর্কি–পাঠান ও মুঘল আমলে বাংলার বাণিজ্য বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়। আলোচ্য সময়ে বাংলা অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য দুক্ষেত্রেই বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য রয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্পর্কিত বিবরণ খুবই সীমিত। তবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যে বিকাশ লাভ করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সমকালীন দেশীয় সাহিত্যে বণিক, মহাজন এবং হাট-বাজারের বর্ণনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রামীণ হাট-বাজারে সাধারণ মানুষ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতেন।[১৩৫] এসব বাজারের উপর বিদেশী বণিকদের কোনো প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না। সার্বিক বিচারে সামুদ্রিক বাণিজ্য তথা বহির্বাণিজ্যের তুলনায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল নিস্প্রভ।

বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলার সমৃদ্ধি তর্কাতীত। প্রাচীন বাংলার বহির্বাণিজ্যের যেটুকু অবদান ছিল রোমানদের ভূমধ্যসাগরীয় সাম্রাজ্যের পতনে এবং অষ্টম–নবম–দশম শতাব্দীতে ভারত মহাসাগরে আরব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় তার পতন ঘটে। সেনরা বাংলায় পুরোপুরি কৃষি অর্থনীতির উপর ব্রাহ্মাণ্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। ফলে দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ইতালীর উঠতি নগরসমূহে এবং স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশের নাগরিক অর্থনীতির কোন সুফল বঙ্গীয় উপকূলে পড়েনি। কিন্তু তুর্কি-আফগান ও মুঘল যুগে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ দেশে কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটে। কৃষিজ এবং শিল্পজাত পণ্যের প্রচুর উদ্বৃত্তি এবং সমুদ্রযাত্রায় মুসলমানদের নতুন উদ্দীপনার ফলে বাংলার বহির্বাণিজ্য বহুল

---

[১৩৩] এসময় বাংলায় তিন প্রকারের জাহাজ নির্মিত হতো- (ক) অগভীর পানিতে চলাচল উপযোগী চ্যাপ্টা তলা বিশিষ্ট জাহাজ, (খ) সামনে ও পেছনে প্রসারিত গলুই বিশিষ্ট জাহাজ এবং (গ) প্রায় একহাজার পিপার পরিমাণ মাল পরিবহনে সক্ষম 'গিউঙ্কী' নামক এক ধরণের বৃহৎ জাহাজ। বারবোসা 'জুঙ্গোস' (জাংক) নামে বিস্তর মাল পরিবহণে সক্ষম বৃহৎ জাহাজের কথাও উল্লেখ করেছেন। উদ্ধৃতি এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৪৯-৫০

[১৩৪] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলাদেশ বিদেশী পর্যটক*, পৃ.৮৫

[১৩৫] মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেনশাহী আমলে বাংলা*, পৃ.১২২

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়।[১৩৬] তথ্য সূত্র অনুযায়ি সে সময়কার বাংলার রপ্তানি পণ্যের তালিকায় চাল, গম, সুতি বস্ত্র, রেশমি বস্ত্র এবং চিনি ছিল উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে আমদানি পণ্যের তালিকায় ছিল, চীনা মাটির তৈজস পত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, পান্না, মুক্তা, আকিকসহ বিভিন্ন মূল্যবান পাথর।

বাংলা বাণিজ্যে ইউরোপীয় বণিকদের অংশ গ্রহণের বিষয়টিও আলোচনার দাবি রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যে স্থানীয় বণিকদের কোন ভূমিকা ছিল না। এর অন্যতম কারণ সামাজিক মর্যাদায় স্থানীয় বণিকরা তখনো উপরের শ্রেণীতে ঠাঁই পায়নি, তাদের অবস্থান ছিল নিম্নশ্রেণীতে। সম্ভবত তারা স্থানীয় উৎপাদক শ্রেণী এবং বিদেশী বণিকদের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতো। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে আরব ও পারস্যদেশীয় বণিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এসব বণিকরা বাংলা ও পারস্যোপসাগরীয় উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে সামুদ্রিক যোগাযোগ রক্ষা করেছিল এবং তারা এ দেশের পণ্য পূর্বদিকে চীন পর্যন্ত এবং পশ্চিমে আরবদেশ ও আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় নিয়ে যেতো। পরবর্তীকালে আরব ও পারসিক বণিকরা ইউরোপীয় বণিকদের দ্বারা পরাভূত হয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগিজরাই প্রথম বাংলায় বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপন করেছিল। সাতগাঁও, হুগলি এবং চট্টগ্রাম ছাড়াও তারা বঙ্গোপসাগর ও অন্যান্য জলপথে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো। তারা বার্মা, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে বাংলা থেকে পণ্য সামগ্রী রপ্তানি এবং এসব দেশ থেকে বাংলায় পণ্য আমদানি করতো। তবে নানা কারণে বাংলায় পর্তুগিজ বাণিজ্যিক প্রাধান্য স্থায়িত্ব লাভ করেনি। সতেরো শতকের প্রথমার্ধেই তাদের পতন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় পর্তুগিজরা ইউরোপ থেকে আগত ওলন্দাজ এবং ইংরেজ বণিক গোষ্ঠীর তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে। ইঙ্গ-ওলন্দাজ মিলিত প্রয়াসে বাংলা বাণিজ্যে পর্তুগিজ যুগের যবনিকাপাত ঘটে।

বাংলা বাণিজ্যে পর্তুগিজদের স্থান দখল করে নেয় ওলন্দাজরা। হল্যান্ডবাসী ওলন্দাজদের প্রাচ্য বাণিজ্যের মূল লক্ষ্যস্থল ছিল মসলা রাজ্য মালয়জগত। তবে বঙ্গ-ভারতের বাণিজ্যিক গুরুত্ব তাদের নজর এড়ায়নি। একারণেই সতেরো শতকের বিশের দশক থেকে তারা বাংলা বাণিজ্যে অংশগ্রহণে তৎপর এবং ১৬৪৫-১৬৫১ সালের মধ্যে হুগলি, পাটনা ও কাশিমবাজারে বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠায় সফল হয়।[১৩৭] ওলন্দাজরা মুঘল সরকারের কাছ থেকে নগদ টাকায় চিনসুরা, বরানগর ও বাজার মির্জাপুরের পত্তনি গ্রহণ করে এবং চিনসুরায় কোম্পানির প্রধান দপ্তর স্থাপন করা হয়। ১৬৬০ সালে ঢাকায় এবং পরের বছর উদয়গঞ্জে ওলন্দাজ কোম্পানির ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়। ১৬৬২ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের একটি উদার ফরমানবলে ওলন্দাজ কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা বাণিজ্যে রাহাদারি ও বিভিন্ন আবগারি শুল্ক থেকে রেহাই পাওয়ায় তাদের বাণিজ্য ক্রমোন্নতির পথে ধাবিত হয়। শোভা সিংহ ও রহিম খানের

---

[১৩৬] সে সময় দু'টি প্রধান সমুদ্র পথে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হতো। এর একটি ব্রহ্মদেশ, আরাকান, পেগু, আভা, শ্যাম, মালাক্কা, সুমাত্রা, সুন্দা, মসলা দ্বীপপুঞ্জ, সেলিবিস, বোর্ণিও এবং চম্পা হয়ে দক্ষিণ পূর্বদিকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্য পথটি ছিল দক্ষিণ পশ্চিমমুখী- যা উড়িষ্যা, করমণ্ডল, শ্রীলঙ্কা ও মালাবার উপকূল অতিক্রম করে পারস্যোপসাগর, আরব সাগর হয়ে আরব দেশ ও আফ্রিকার আবিসিনিয়া।মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেনশাহী আমলে বাংলা*, পৃ.১২৪

[১৩৭] মুসা আনসারী, 'ইউরোপীয় বাণিজ্যতন্ত্রের আবর্তে সোনার বাংলা' *স্মরনিকা*, ৯৭, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রাক্তন ছাত্র সমিতির বার্ষিক প্রকাশনা, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহ দমনে বাংলার মুঘল প্রাদেশিক সরকারকে সহযোগিতা করায় ওলন্দাজরা চুঁচড়ায় গুস্তাভাস দুর্গ নির্মাণের অনুমতি লাভ করে।[১৩৮] অবশ্য এত সাফল্য সত্ত্বেও আঠারো শতকের প্রথমার্ধেই বাংলা বাণিজ্যে তাদের পতন ঘটে।

পশ্চিম ইউরোপের সমাজ বিকাশে নবযুগ তথা মার্কেন্টাইল যুগের সূচনায় প্রধান চালকের আসনে ছিল ইংল্যান্ড। প্রাচ্য বাণিজ্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৫৯৯ সালে তারা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বণিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করে। ১৬১৩ সালে ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী সুরাটে কোম্পানি প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। বাংলায় ইংরেজদের তৎপরতা সম্পর্কে আলোচ্য অধ্যায়ের অন্যত্র ইতোমধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে।

ভারতীয় বাণিজ্যে ফরাসীদের অংশগ্রহণ সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনা। সুবাদার ইব্রাহিম খান তাদের চন্দন নগরে গৃহায়ণ ও বাণিজ্যকুঠি নিমার্ণের অনুমতি দেন ১৬৯০ সালে। ১৬৯৩ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবতাদের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বাণিজ্য সুবিধা সম্বলিত একটি ফরমান দান করে। ফলে বাংলা বাণিজ্য লক্ষ্মীর দুয়ার তাদের জন্যও উন্মুক্ত হয়।

লক্ষণীয় যে, বাংলা বাণিজ্যে ইউরোপীয়দের অংশগ্রহণের ফলে ইউরোপ ও দুর প্রাচ্যের বাজারে বাংলা পণ্যের বাজার বহুল পরিমাণে বিস্তার লাভ করে। বাংলার বহুমুখী রপ্তানি বাণিজ্যের ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

২.৩.৪ মুদ্রা ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

মুদ্রা ব্যবস্থা এবং মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ সভ্যতার অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। মুদ্রা কেবল একটি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক নয়, বরং ব্যবসা-বাণিজ্য ও সার্বিক অর্থনৈতিক লেন-দেনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাধ্যম। সেন শাসনামলে বাংলায় কোন ধাতব মুদ্রা ছিল না। বিনিময় মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার পরিবর্তে কড়ির বহুল প্রচলন ছিল।[১৩৯] কিন্তু মুসলিম শাসনের প্রথম যুগেই শুধু শাসকের সার্বভৌমত্বের চিহ্নরূপেই নয়, বিনিময় মাধ্যম রূপেও মুদ্রার প্রচলন ঘটে। পরবর্তীতে বৈদেশিক বাণিজ্য চালু রাখা এবং নগরায়ণের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার প্রয়োজনে একটি সক্রিয় প্রযুক্তি হিসেবে মুদ্রা ব্যবস্থার বিকাশ সাধন করা হয়।[১৪০] আলোচ্য সময়ে বাংলায় অনেক টাকাশাল শহর (Minting Town) গড়ে ওঠে। অবশ্য শহর ও গ্রামের বা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সমানভাবে মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসেনি এবং পণ্য-বিনিময়ও প্রচলিত ছিল সত্য, তবে সর্বত্রই মুদ্রার ব্যবহার কম বেশি প্রচলিত ছিল। মমতাজুর রহমান তরফদারের মতে, স্থায়ী মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দরুন পাল-সেন আমলের দ্রব্য বিনিময়ভিত্তিক অর্থনীতির (natural economy) স্থলে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি (money economy) প্রাধান্য পেল। প্রায় সবগুলো পেশাভিত্তিক শ্রেণীকে বিশেষকরে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যকে নগদ টাকার লেন-দেনের একটি সম্পর্ক (cash nexus) অন্তত আংশিকভাবে একত্রে গ্রথিত করল। পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মুদ্রা ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিচালিত বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে নগরকেন্দ্রের উদ্ভব ও বণিক শ্রেণীর গঠন অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত ছিল বলেও তরফদার উল্লেখ করেছেন।[১৪১] পর্যালোচনাধীন সময়ে ধাতব মুদ্রার মধ্যে তঙ্কা নামে রৌপ্য মুদ্রা ছিল প্রধান। পরিমাণে কম হলেও স্বর্ণ মুদ্রারও প্রচলন

---

[১৩৮] Om Prakash, *The Dutch East India Company in Bengal,* --, p.221

[১৩৯] মিনহাজ-উস-সিরাজ, *তবাকাত-ই-নাসিরী*, মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেনশাহী আমলে বাংলা*, পৃ.৩০

[১৪০] মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, পৃ. ২৪

[১৪১] ঐ, পৃ. ২৫

ছিল। তবে মুঘল যুগের পূর্বে এ দেশে তাম্র মুদ্রা জনপ্রিয় হয়নি। অধিক পণ্যের লেন-দেনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে তঙ্কার ব্যবহার হতো। অবশ্য আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন মূল্যের মুদ্রার প্রতীক ছিল কড়ি। ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে ধাতুর বিশুদ্ধতা বিষয়ে মুসলিম শাসকগণ সবিশেষ মনযোগী ছিলেন বলে মনে হয়। মুদ্রা তৈরীর কাজে ধাতুবিদ্যা, মুদ্রাতত্ত্ব, ও চাঁচ ব্যবহারের কৌশলসহ বিভিন্ন সুক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী করিগরদের নিয়োগ দেয়া হতো।

প্রাক-নব্যাবী বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থাকে কেউ কেউ মুদ্রা অর্থনীতির ভ্রূণ বলে মনে করেন। মুদ্রা অর্থনীতির এ ভ্রূণ এবং কুটির শিল্পের বিকাশ বাংলার অনঢ় সমাজ ব্যবস্থায় কিছু কিছু হলেও রূপান্তর ঘটায়। সামন্ত ব্যবস্থার অধিকতর অগ্রগতি সাধিত হয় এবং শহর ও গ্রামে বৃত্তিমূলক নব নব শাখাসমূহের বিকাশ ঘটে। আলোচ্য সময়ে বাংলায় ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। শেঠ, সাহা, মহাজন ও সাররাফ নামে ব্যাংকারদের টাকা ঋণদান, জমারাখা বা 'হুণ্ডি' বা চেক প্রদান ইত্যাদির ব্যবসা করতে দেখা যায়।

রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলায় বেশ কিছু নগর ও বন্দর গড়ে ওঠে। অনেক পুরণো নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বস্তুত বাংলায় আগত তুর্কি-পাঠানরা সামন্ত ব্যবস্থার প্রতিনিধি হলেও তারা বেশ খানিকটা নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত ছিল এবং তাদের আগমনের ফলে বিজিত দেশে স্বাভাবিকভাবে নগরায়নের জাগরণ দেখা দেয়। নবাগত শাসকগোষ্ঠীর সেনা ছাউনিকে কেন্দ্র করে তার আশেপাশে হাট-বাজার মেলা গড়ে ওঠে; সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য এ সময় নগর প্রতিষ্ঠা হয়। অনেক স্থানে শিল্প কারখানা স্থাপন করা হয় এবং এতে বিভিন্ন অঞ্চল হতে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী পেশাদারের ভিড় হতে থাকে। এরূপ নগরায়নের প্রক্রিয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য চর্চা হয় এবং বহির্বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়। চীনা, পর্তুগিজ ও ইংরেজ বিবরণীতে চট্টগ্রামকে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসিদ্ধ বন্দর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'পোর্টো গ্র্যাণ্ডি' বা বড় বন্দর নামে খ্যাত এ বন্দরের অধিকার নিয়ে বাংলা, ত্রিপুরা ও আরকান রাজের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব লেগে থাকত, সে কথা ইংরেজ বণিক র‍্যালফ ফিচ উল্লেখ করেছেন।[১৪২] বৈদেশিক বাণিজ্যের আরেকটি বড় কেন্দ্র ছিল নদী বন্দর সাঁতগাও। এটি বাংলার প্রাচীন তাম্রলিপ্তি বন্দরের স্থান দখল করেছিল। সোনার গাঁ বন্দর থেকে চীন ও জাভার ব্যবসায়ীরা সুতি বস্ত্র ও চাল সহ বিভিন্ন পণ্য নিয়ে সমগ্র ভারত, সিংহল, মালাক্কা, পেগু, সুমাত্রা ও অন্যান্য স্থানে যেতো।[১৪৩] সতেরো শতকের শেষ দিকে কলকাতা বন্দরের পত্তনের ফলে চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক প্রাধান্য ম্লান হয়ে যায়। ভাগিরথী নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও নদীগর্ভ শুকিয়ে যাওয়ায় সপ্তগ্রামের গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পায় এবং হুগলি বন্দর এর স্থান দখল করে নেয়। পর্তুগিজরা হুগলিকে আখ্যা দেয় 'পোর্টো পিকানো' রূপে।

উপরের বর্ণনায় বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দর ও শহরের বাণিজ্যিক তৎপরতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্য আছে। কিন্তু এসব শহর ও বন্দরের নাগরিক জীবন সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। তবে একথা বলা যায় যে, এসব নগর বন্দরে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল। আর এ কারণেই সমকালীন ইউরোপের নগর বন্দরসমূহ সংশ্লিষ্ট

---

[১৪২] উদ্বৃতি এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫১

[১৪৩] এম মোফাখ্খারুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭০

দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন মানের বিবর্তনে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল বাংলার ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নি।

পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলার জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কারণেই কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। ইবনে বতুতা, মা হুয়ান, বারবোসা, ভার্থেমা, র‍্যালফ ফিচ প্রমুখ মধ্যযুগীয় পর্যটকদের বিবরণীতে বাংলার জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে উজ্জ্বল বর্ণনা রয়েছে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপ্রত্রের প্রাচুর্য এবং এর সস্তা ও সুলভ মূল্যের প্রশংসা রয়েছে। সমকালীন তথ্য উৎসে বাংলার সুলতান-সুবাদার ও অভিজাত লোকদের বিলাসবহুল জীবন চর্চার কথাও জানা যায়। উল্লেখ্য যে, অর্থনৈতিক সঙ্গতি বা বিত্তের নিরিখে বাংলার সামাজিক জীবনে একটি অবাধ শ্রেণী বিভাজন ছিল। এতে উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এবং ভূ-স্বামী শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন উচ্চশ্রেণীভূক্ত। আর কৃষক, তাঁতি এবং অন্যান্য অনুল্লেখ্য অর্থনৈতিক শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষরা ছিলেন নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। বাংলায় তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল কী-না, এ বিষয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে। পর্যটক বারবোসার বর্ণনায় বাংলার উচ্চবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণী স্থান পেয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে তাঁর নিরবতা দেখে কেউ কেউ মনে করেন বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখনো উল্লেখ করার মতো পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। কিন্তু আলোচ্য আমলে বাংলায় একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্তের উপস্থিতির কথা মমতাজুর রহমান তরফদারসহ অনেক পণ্ডিতের বিবরণীতে স্থান পেয়েছে। বস্তুত বণিক, ব্রাহ্মণ ও শিক্ষকদের নিয়ে গড়ে ওঠেছিল এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী।[১৪৪] অর্থনৈতিক মানদণ্ডে তাদের অবস্থা কোন রকমেই দুর্দশাগ্রস্থ ছিল বলে মনে হয় না।

নিম্নশ্রেণী বা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণের মতো পর্যাপ্ত তথ্য উপকরণের অভাব সত্ত্বেও বলা যায় যে, জীবনের মৌলিক চাহিদা পুরণের সঙ্গতি তাদের ছিল। তবে উন্নততর জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তাদের নাগালের বাইরে ছিল। তাদের ঘর-বাড়ি ও পরিধেয় সবই ছিল সাধারণ মানের। কেউ কেউ মনে করেন দারিদ্রের কারণে নয়, বরং জীবনযাত্রা সম্পর্কে রুচিবোধের কারণে এমনটি হয়েছিল।[১৪৫] এ বক্তব্যে হয়তো আংশিক সত্য, কিন্তু পূর্ণ নয়। পণ্য মূল্য সস্তা ছিল সত্য, কিন্তু এর সাথে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার প্রশ্নটিও নিবিড়ভাবে জড়িত। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার ক্রয়ক্ষমতা সাধারণ মানুষের ছিল কী-না, এ বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে।[১৪৬] কৃষিজ দ্রব্যের সহজলভ্যতা ও সস্তামুল্য সত্ত্বেও কৃষক বা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান যে কোনো ঈর্ষণীয় অবস্থায় ছিল না, তা বলা বাহুল্য। যদি তাই হতো তবে সমকালীন বাংলার দারিদ্রের চিত্র সম্পর্কিত বর্ণনা পাওয়া যেতো না। কবি কঙ্কনের বর্ণিত ফুল্লরা দারিদ্র-পীড়িত জীবন, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ বল্লভাচার্যের মেয়ের বিয়েতে মেয়েকে কেবল পাঁচটি

---

[১৪৪] মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেনশাহী আমলে বাংলা*, পৃ.১৩৩

[১৪৫] Tapan Raychaudhuri and Irfan Habib (ed.), *Cambridge Economic History of India, Vol. I. (1200-1750)*, London, 1978, p. 262

[১৪৬] এ প্রসঙ্গে এম এ রহিমের মত ইতিবাচক। তিনি বিভিন্ন পেশাজীবীদের আয়ের তথ্য তুলে ধরে তার সাথে পন্যমূল্যের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা এবং তাদের স্বাচ্ছন্দময় জীবন যাপনের কথা বলেছেন। এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃপৃ. ৩৬১-৩৬২। তবে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে অনেক ফাঁক-ফোকর রয়েছে। সমসাময়িক অনেক তথ্যসূত্রে দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষ সে সময়ও পণ্য মূল্য অধিক ছিল বলে প্রায়ই অভিযোগ করতেন। এটি তাদের ক্রয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতারই ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ ভোগ্য পণ্য সস্তা হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধে ছিল। তাছাড়া উন্নত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনসপত্রের মূল্য তুলনামুলকভাবে বেশী হওয়ায় তা সংগ্রহ করা সাধারণ মানুষের জন্য ছিল প্রায় অসম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

হরিতকি উপহার দিতে পারার ঘটনা দাস ব্যবসার প্রচলন এবং কিছু মানুষের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ইত্যাদি দারিদ্রের অবস্থিতিরই ইঙ্গিত বহন করে। দুর্ভিক্ষের চিত্রও আমাদের সামনে রয়েছে। অভাবের তাড়নায় দারিদ্র-পীড়িত পিতা-মাতার সন্তান বিক্রির ঘটনা বারবোসা জানিয়েছেন।[১৪৭]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, সমসাময়িক বর্ণনাসমূহে বাংলার ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। এসব বর্ণনার আলোকে আধুনিক ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের প্রায় সকলেই কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলার সমৃদ্ধির কথা বলছেন। তাদের মতে, খাদ্য দ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সুলভতার কারণে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা ছিল সহজ ও স্বাচ্ছন্দময়। এসব বক্তব্য মেনে নিয়েও কিছু কথা বলার অবকাশ থাকে। আর সে কথা গুলো হচ্ছে সমসাময়িক সাহিত্য ও পর্যটক বিবরণীতে এক শ্রেণীর মানুষের প্রাচুর্যময় বিলাসী জীবনযাত্রার কথা বলা হয়েছে, বিপরীতে চরম দারিদ্র পীড়িত এক শ্রেণীর মানুষের কথাও তারা বলেছেন। মোট জনসংখ্যার তুলনায় বর্ণিত এ দু' শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। খাজনার উচ্চহার ও অন্যান্য কারণে ক্রয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ উন্নততর জীবন যাপন করতে পারেনি, তবে মৌলিক চাহিদা পুরণের মত সঙ্গতি তাদের ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রা অর্থনীতির প্রসার এবং নগরায়নে নবজাগরণ নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিচায়ক। তবে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন-কৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রয়োগ না হওয়ায় এ অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌছায় নি। তাছাড়া সরকারের উদাসীনতা, ব্যবস্থাপনার ক্রটি-বিচ্যুতি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় স্বাধীন বণিক পুঁজির বিকাশ ঘটেনি। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে কেবল রাজনৈতিক নয়, সামাজিক অগ্রগতিও ব্যহত হয়।

উপরের আলোচনার সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায় যে, বাংলার ইতিহাসের এক বিশেষ কালপর্বে সেন শাসনের ধবংস্তুপের উপর বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিতিষ্ঠত হয়। বাংলায় নবাব সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে পাঁচ'শ বছর মুসলিম শাসনের প্রথম আড়াই শ বছরের ইতিহাস বলতে গেলে বাংলার স্বাধীনতা সত্ত্বার ইতিহাস। এ সময় মাঝে মাঝে বাংলা দিল্লীর আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। তবে তা নিতান্তই সাময়িক সময়ের জন্য। বাংলার স্বাধীন সালতান যুগে বাংলা পেয়েছিল একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক মানচিত্র। এসময় রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধিত হয়। মুসলিম সমাজে গঠন প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয় এসময়। এক কথায় বাঙ্গালি জাতি সত্ত্বার বিকাশ ক্রম স্বাধীন সালতান যুগের বেশিষ্ট্য। তবে বাঙ্গালি জাতিসত্ত্বা একটি শক্ত শক্তি ভিত্তি লাভের পূর্বেই বাংলা মুঘল আগ্রাসনের শিকার হয়। এত বাংলার স্বাধীন সত্ত্বা বিকাশের অগ্রগতী ব্যহত হয়। মুঘল সুবাদারি যুগে বলতে গেলে বাংলার কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই । এ সময় বাংলা ছিল মুঘলদের আর দশটা সুবাহর মতোই। তবে আঠারো শতকের সূচনা লগ্নে মহামহিম মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পটভূমি বাংলায় নবাব সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে মুঘল সুবাদারি যুগে বাধাগ্রস্থ বঙ্গীয় জাতি সত্ত্বার পুনর্বিকাশ স্বাধিত হয়। নবাবদের শাসনাধীনে বাংলা ভারতের ইতিহাসে নিজস্ব এক গৌরবোজ্জ্বল সত্ত্বায় বিকশিত হয়।

---

[১৪৭] মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেনশাহী আমলে বাংলা*, পৃ.১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও বাংলায় নবাব সরকার প্রতিষ্ঠা

আঠারো শতকের সূচনা পর্বে সম্রাট আওরঙ্গজেবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভারতে মুঘল রাজত্বের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি শুরু হয়। এই সুযোগে মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। মুঘল সম্রাটের প্রতি কেবল আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রকাশ করে অনেক আঞ্চলিক রাষ্ট্র কার্যত স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করে। নবাব শাসিত বাংলা ছিল এ ধরনের একটি রাষ্ট্র। ১৭১৭ সালে মুর্দিশকুলি খানের সুবাদারি লাভের মধ্য দিয়ে বাংলায় নবাব সরকার যুগের সূচনা হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমঅবক্ষয়ের পটভূমি বাংলায় নবাব সরকার প্রতিষ্ঠা এবং এ সরকারের বৈশিষ্ট নিরূপন আলোচ্য অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

৩.১ মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি

১৫২৬ সালে সম্রাট বাবুর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.) কর্তৃক ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যকে তাঁর উত্তরাধিকারীর মহামতি আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) সুদৃঢ় ভিত্তি উপর দাঁড় করান। সতেরো শতকের মধ্যভাগেও এ সাম্রাজ্যের দ্যুতি সারা ভারতবর্ষকে আলোকিত করেছিল এবং এর আলোকচ্ছটা ইউরোপের লোভলোলুপ বণিকদের ভারতে আকর্ষণ করে এনেছিল। এসময় মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী ছিল সমগ্র পূর্ব গোলার্ধের অন্যতম প্রধান শক্তিকেন্দ্র। কিন্তু আঠারো শতকের প্রারম্ভেই মুঘলদের গৌরবরবি অস্তাচলমুখে ধাবিত হতে শুরু করে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) মৃত্যুর পর পরই সুসংগঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের দ্রুত অবক্ষয় ও পতন প্রক্রিয়া শুরু হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের এ অবক্ষয় ও পতনের ঘটনা ভারতীয় ইতিহাসে একটি বহুল চর্চিত বিষয়। বহু বিদগ্ধ ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিত, ইতিহাসবিদ তাদের শ্রমসাধ্য মূল্যবান গবেষণা ও লেখনীর মাধ্যমে ভারতে মুঘল রাজশক্তির অবক্ষয় ও পতনের কারণ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন।[১] তাদের লেখনীতে মতানৈক্য অনেক। তবে প্রায় সকল ঐতিহাসিকই একমত যে, মুঘল সাম্রাজ্যের পতন প্রক্রিয়ার শুরু সম্রাট আওঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিক থেকে।[২] এ সময় মুঘল সাম্রাজ্য এক গভীর সংকটে নিপতিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। আর এ সংকট মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় এবং পতন ঘটিয়েছিল বলে যদুনাথ সরকার (Jadunath Sarkar) উল্লেখ করেছেন। তবে লক্ষণীয় যে, যদুনাথ সরকার ও উইলিয়াম আরভিন (William Irvin) প্রমুখ মুঘল রাজপুরুষদের ব্যক্তিবিশেষের ব্যর্থতা অর্থাৎ সম্রাট ও আমীরদের বিলাসিতা, ব্যক্তিগত চরিত্রাবনতি, তাদের হেরেম চর্চা ইত্যাদির নিরিখে মুঘল সাম্রাজ্যের এ সংকট এবং এবং এর

---

[১] H.G. Keene, *Fall of the Moghul Empire* (1872), Sydney J.Owen, *Fall of the Mogal Empire,* (1912); J N Sarkar, *Fall of the Mughal Empire,* Stanely Lane-poole, *Aurangzib and the Decay of the Mughal Empire,* reprint, (LPP, New Delhi, 2008); Muzaffar Alam, *The Crisis of Empire in Mughal India* (New Delhi, 1986); William Irvine, *Later Mughal,* vols. I&II, edited by J. N. Sarkar, (1922); M N Pearson, 'Sivaji and the Decline of the Mughal Empire' *Journal of Asian Studies* vol. XXXV, no.2, 1976; Satish Chandra, *Parties and Politics at the Mughal Court,* (Bombey, 1973), *Medieval India, vol. 2,* Delhi, 1999

[২] দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের পরাজয়, মারাঠাদের শক্তিবৃদ্ধি, সাম্রাজ্যে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও পরস্পর বিরোধী কার্যকলাপ মুঘলদের অবক্ষয় ও ধ্বংসের ইঙ্গিত দিয়েছিল-যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্রুততর হয়।

অবক্ষয় ও পতনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।[৩] অবশ্য আধুনিক ইতিহাসবিদগণ উপরে বর্ণিত কারণসমূহকে মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতি ও ধ্বংসের কোন উল্লেখযোগ্য কারণ বলে মনে করেন না। কেননা এই তথ্য এখনও প্রমাণিত হয়নি যে, ষোল ও সতেরো শতকের মুঘল রাজপুরুষ ও অভিজাতদের তুলনায় আঠারো শতকের রাজপুরুষ ও অভিজাতরা কম বিলাসী ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।[৪] যদুনাথ সরকার এবং তাঁর উত্তরসূরী অনেক ইতিহাসবিদ শাসন ব্যাপারে আওরঙ্গজেবের গৃহীতি বিভিন্ন ভ্রান্ত নীতিকেও সম্রাজ্যে সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে মনে করেন। যদুনাথ সরকার তাঁর *History of Aurangzeb*, vol. III গ্রন্থে আওরঙ্গজেবের সময় হিন্দু–মুসলিম বিভেদের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি ভারতে হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীলতাকে উস্কে দিয়েছিল এবং এর ফলে সাম্রাজ্যের সংহতি বিনষ্ট হয়।[৫] Sydney J.Owen মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি প্রসঙ্গে সম্রাট আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত দোষ-ক্রটিকে বড় করে দেখেননি বটে, তবে তিনিও আওরঙ্গজেবের ভ্রান্ত বিশেষকরে তাঁর ধর্মীয় নীতিকে সম্রাজ্যের সংহতি এবং সমরশক্তি ধ্বংসের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন।[৬] শ্রীরাম শর্মা, শ্রী বাস্তব ও ভিনসেন্ট স্মীথ প্রমুখ ইতিহাসবিদগনও আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতিকে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও সংহতি বিনষ্টের কারণ বলে মনে করেন।[৭] তবে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনের জন্য আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতিকে দায়ী করা ইতিহাস সম্মত নয়। সতীশচন্দ্র মনে করেন:

> ধর্মনিরপেক্ষতার বাতাবরণপুষ্ঠ আধুনিক মানসিকতার কাছে আওরঙ্গজীবের ধর্মনীতির কোনও কোনও অংশ যতোই অবাঞ্ছনীয় ও প্রগতি বিরোধী মনে হউক না কেন, ইতিহাসের বাস্তব দৃষ্টিকোন হইতে বিচার করিলে কার্য্যাকারণের ব্যবধানকে আচ্ছন্ন হইতে দেওয়া উচিত হইবে না। আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর ছয় বৎসর যাইতে না যাইতেই জিজিয়া ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রভেদমূলক ব্যবস্থা --- পরিত্যাক্ত হইয়াছিল। যোধপুর হইতে মোগল সৈন্য অপসারিত হইয়াছিল এবং রাজপুত রাজাদের পুনরায় উচ্চ মনসব ও জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল। --- জয়সিংহ ও অজিতসিংহ উভয়েই মোগল দরবারের রাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মারাঠাদের ক্ষেত্রে শাহুকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করা হয়েছিল ও তাঁহাকে শিবাজীর স্বরাজ্যভূমির শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। --- এই সময় মন্দির ধ্বংস বা বলপূর্বক ধর্মান্তকরণেরও কোন ঘটনা ঘটে নাই।[৮]

কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে, আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে শিয়া রাষ্ট্র বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এবং হিন্দু মারাঠাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ করে সাম্রাজ্যের সম্পদ নিঃশেষ করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের আর্থিক সংকটের কারণে পরবর্তীকালে অনেক সমস্যা তৈরী হয়– যা সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনকে তরান্বিত করে। মুঘল সাম্রাজ্যের

---

[৩] William Irvine, *Later Mughal,* vol.II, edited by J. N. Sarkar, J N Sarkar, *Fall of the Mughal Empire,* vol. 4. 2nd Orient Longman ed. New Delhi, 1992, pp.289-90; ইরফান হাবিব (সম্পা.), *মধ্যকালীন ভারত*, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৮, পৃ. ১১৯

[৪] তেসলিম চৌধূরী, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ১৫২৬-১৮১৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৪৫১

[৫] J.N. Sarkar, *History of Aurangzeb,* vol. III, Calcutta, 1916, pp.283-364

[৬] Sydney J.Owen, *Fall of the Mogal Empire,* (1912), pp. iii-iv

[৭] দ্রষ্টব্য, S R Sharma, *Religious Policy of the Mughal Emperor;* A L Srivastava, *The Mughal Empire;* Vincent Smith, *Oxford History of India.*

[৮] সতীশ চন্দ্র, *মোগল দরবারে দল ও রাজনীতি ১৭০৭-১৭৪০*, (বাংলা অনুবাদ), কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৬৫

Dhaka University Institutional Repository

অবক্ষয় ও পতনে অর্থনৈতিক সংকট দায়ী ছিল সন্দেহ নেই, তবে এ সংকটের জন্য আওরঙ্গজেবকে এককভাবে দায়ী করা যায় কী? আধুনিক ইতিহাসবিদগণ মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে দায়ী করার চেয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উপরই অধিক গুরুত্বারোপ করেন। সতীশচন্দ্র যথার্থই বলেছেন যে, আওরঙ্গজেবের নীতিসমূহের সামগ্রিক পরিবর্জনও মুঘল সাম্রাজ্যকে অবক্ষয় ও ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করতে পারতো না। কেননা তাঁর মতে, এ সমাজ্যের অবক্ষয় ও পতনের জন্য তখন বহুমুখী বিচিত্র ও জটিল কারণ তৈরি হয়েছিল।[৯] আর মুঘল সাম্রাজ্যের আর্থ–সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই এসব কারণ অনুসন্ধান যৌক্তিক বলে এম আতহার আলি, মোজাফ্ফর আলম ও পার্সিভ্যাল স্পীয়ার প্রমুখ ইতিহাসবিদগণও মনে করেন।[১০] সতীশচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চারিত্রিক দুর্বলতার ভূমিকা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সেগুলোকে অবশ্যই উপরে উল্লেখিত সুদূরপ্রসারী ও নৈর্ব্যক্তিক ঘটনাক্রমের পটভূমিতে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।[১১]

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যে সংকটের প্রকৃত কারণগুলো খুঁজে বের করতে হলে সাম্রাজ্যের সামগ্রিক সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান ও শক্তিসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। এম আতহার আলির মতে, মুঘল সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক কাঠামোর এক বিশিষ্ট স্থানে ছিল মুঘল শাসকশ্রেণী। শাসক শ্রেণী দ্বারা সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদের বুঝায় যারা যুগপৎ রাজ কর্মচারী আবার মুঘল রাজনীতিতে উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি।[১২] এ শাসক শ্রেণী বুঝাতে আতহার আলি 'অভিজাত' অভিধা ব্যবহার করেছেন। কতগুলো অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সত্বেও সাধারণভাবে মুঘল অভিজাত শাসক শ্রেণী একটি অনন্য সাধারণ সংস্থা ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ এবং সংহতি বিধানে এ অভিজাত শাসক শ্রেণী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। প্রশাসনিক ব্যবস্থার রূপায়ন, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তব্য সম্পাদন, সামাজিক মান ও মাপকাঠির লালন-পোষণ এমনকি, সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব এ শ্রেণীর ভূমিকার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।[১৩] কিন্তু দেখা যায় যে, আঠারো শতকে এসে এ অভিজাত শাসকশ্রেণী তাদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। প্রশ্ন হতে পারে আঠারো শতকে কী মুঘল শাসক বা অভিজাত শ্রেণীতে যোগ্য ও প্রতিভাবান লোকের অভাব ঘটেছিল? যদুনাথ সরকার এবং কোনো কোনো ঐতিহাসিক এরকমই মনে করেন।[১৪] তবে এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইতিহাসের এমন কোন পর্ব নেই যখন দক্ষ ও চরিত্রবান লোকের একান্ত অভাব ছিল। টি জি স্পীয়ারের বক্তব্যে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর মতে, আঠারো শতকের ইতিহাস দুর্বল ব্যক্তিদের ইতিহাস নয়। এ সময় মুঘল রাজনীতির প্রধান প্রধান কুশীলব সৈয়দ আবদুল্লাহ ও সৈয়দ হোসেন আলী খান (সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নামে বিশেষভাবে পরিচিত), নিজাম-উল-মুলক, আবদুস সামাদ খান, জাকারিয়া খান, সাদাত খান, সফদর জঙ, মুর্শিদকুলি খান এবং

---

[৯] সতীশ চন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬

[১০] এ ব্যাপারে দ্রষ্টব্য Muzaffar Alam, *The Crisis of Empire in Mughal India*, New Delhi, 1986; M. Athar Ali, *The Mughal Nobility under Aurangzeb*, বাংলা অনু: অরুণ কুমার দে, *ঔরঙ্গজেবের সময় মুঘল অভিজাত শ্রেণী*, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৭৮

[১১] সতীশ চন্দ্র, *পূর্বোক্ত* ,পৃ. ৩৬৮

[১২] এম আতহার আলি, *পূর্বোক্ত*, (বাং অনু.), পৃ. xii

[১৩] সতীশ চন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১

[১৪] J N Sarkar, *Fall of the Mughal Empire,* vol. 4. 2nd Orient Longman (ed.), New Delhi, 1992, pp.289-90.

Dhaka University Institutional Repository

জয় সিং সওয়ার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকেই ছিলেন যোগ্য রাষ্ট্রনীতিবিদ ও সমরনেতা।[১৫] তবে সাম্রাজ্যের দুর্দিনে তারা কেউ সাম্রাজ্য রক্ষায় শক্ত হাতে হাল ধরতে পারেননি। তারা মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট নিরসনে ভূমিকা না রেখে নিজেরাই এ সংকটকে আরো ঘনীভূত করে তোলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমনটি হল এবং এ সকল ব্যক্তি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলেন কেন?

উপরে উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর খোজার পূর্বে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে মুঘল অভিজাত শ্রেণীর সংগঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত প্রয়োজন। তথ্য–প্রমাণ অনুযায়ী দেখা যায় যে, মুঘল শাসক শ্রেণীর সংগঠন ছিল সম্পূর্ণ সামরিক ধাঁচের এবং এর ভিত্তি ছিল মনসবদারি প্রথা।[১৬] মনসবদারির আওতায় 'জাত' (ব্যক্তিগত পদমর্যাদার সূচক) এবং 'সওয়ার' (সৈন্য সংখ্যা সংরক্ষণের সূচক) নামক দু'টি পদের সূচকের ভিত্তিতে মনসবদারদের সরকারী বেতন-ভাতাদি পাওনা নির্ধারিত হতো।[১৭] নির্ধারিত পাওনা নগদ অর্থে অথবা মঞ্জুরীকৃত নির্দিষ্ট ভূখণ্ড তথা 'জায়গিরে' পরিশোধ করা হতো। ইরফান হাবিবের মতে, মুঘল অভিজাত শাসকশ্রেণী কেন্দ্রীভূত রাজকীয় স্বেচ্ছাচারের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত একটি উচ্চমার্গীয় শৃঙ্খলাবদ্ধ শ্রেণী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো।[১৮] সম্রাটের সাথে এদের সম্পর্ক ছিল পৃষ্ঠপোষক ও পৃষ্ঠপোষিতের সম্পর্ক (patron-client relationship)।[১৯] এ সম্পর্কের স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করতো সম্রাটের সামরিক যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং সাম্রাজ্যের সম্পদের সতত বিস্তার ও সম্প্রসারণের উপর। সম্রাট আকবর থেকে শাহজাহান পর্যন্ত সকল সম্রাটই তাদের সামরিক যোগ্যতা ব্যক্তিগত গুণাবলী দ্বারা অভিজাত মনসবদারদের আনুগত্য জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথমদিকে আওরঙ্গজেব এতে সফল হলেও দাক্ষিণাত্যে তাঁর চরম ব্যর্থতার ফলে তাঁর অবস্থান কিছুটা হলেও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের উত্তরসূরী সম্রাটদের প্রায় সকলেই অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে যোগ্যতার প্রশ্নের মুখোমুখী হয়েছিলেন। তদুপরি দাক্ষিণাত্যে ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে সম্রাজ্যের ব্যয় যে হারে বেড়েছিল, সে হারে সম্পদ বাড়েনি। সাম্রাজ্যের সম্পদের এ সংকোচনের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যে যে অর্থনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে সম্রাট এবং অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর মধ্যকার পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্কে চির ধরেছিল। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে অভিজাত শাসকশ্রেণীর অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক দুর্বলতাগুলো ক্রমেই প্রকট হতে থাকে।[২০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুঘল অভিজাত শাসকশ্রেণী গড়ে ওঠেছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির সমন্বয়ে। স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম না হলেও এ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত বংশ মর্যাদাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। বংশ গৌরবহীন প্রতিভাবান ও দক্ষ ব্যক্তিদের উচুপদে নিয়োগের রীতি মুঘল সাম্রাজ্যে একেবারে অপ্রচলিত না থাকলেও মনসবদার পদে নিয়োগের

---

[১৫] T.G.P. Spear, *Twilight of the Mughals*, Oxford, 1973, শেখর বন্দোপাধ্যায়, *অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা*, কলিকাতা, ১৯৯৪,পৃ. ১০

[১৬] এম. আতহার আলি, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ. xiii, ১

[১৭] এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, এম আতহার আলি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ.৪৫-১৩০

[১৮] ইরাফান হাবিব, 'মুঘল ভারতবর্ষের অর্থনীতিতেপুঁজিবাদী বিকাশের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাসমূহ', কাবেরী বসু (অনূদিত), *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, ন্যাশনাল বুক এজন্সি প্রাইঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০২, পৃ.১৭৫

[১৯] M. N. Pearson, ' Sivaji and the Decline of the Mughal Empire' *Journal of Asian Studies*, Vol. XXXV, no.2, 1976

[২০] শেখর বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

জন্য 'খানাজাদা' বা মনসবদারদের পুত্র ও আত্মীয় স্বজনদের দাবি ছিল অগ্রগণ্য। স্থানীয় জমিদার ও দেশীয় রাজন্যবর্গকেও মনসবদার পদে নিয়োগ দেয়া হতো। বলা প্রয়োজন যে, ভূমির উপর জন্মগত অধিকার এবং স্থানীয় প্রভাবের ফলে জমিদার শ্রেণী অনেক সময় রাষ্ট্রীয় সংহতির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাড়াতেন। এ প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সম্রাট আকবরই প্রথম তাদের মনসবদার পদে নিয়োগ দানের রীতি প্রবর্তন করেন। এসব ভূস্বামী মনসবদারগণ তাদের বংশানুক্রমিক জমিদারী এলাকাকে 'ওয়াতন জায়গির' হিসেবে ভোগ দখলের অধিকার পেতেন। অবশ্য সরকারি কর্মচারী হিসেবে সাম্রাজ্যের অন্যত্রও তাদের সাধারণ জায়গির দেয়া হতো।[২১] মুঘল শাসকশ্রেণীতে বহিরাগত অভিজাতদের প্রাধান্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। *আইন-ই আকবরীর*'র তথ্য মতে, সম্রাট আকবরের সময় অভিজাত শ্রেণীর শতকরা ৭০ভাগ ছিলেন বহিরাগত। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে নানা কারণে ভারতে বহিরাগতদের আগমণ হ্রাস পেলেও তখন পর্যন্ত অভিজাত শ্রেণীতে এদের সংখ্যা নেহায়েত কম ছিল না। এ সব বহিরাগত অভিজাতদের মধ্যে ইরানী, তুরানী এবং আফগানরা ছিল প্রধান।[২২]

মুঘল মনসবদার শ্রেণীতে 'শেখজাদা' বা ভারতীয় মুসলমানগও বিশিষ্ট অবস্থানে ছিল। তারা বারহার, সৈয়দ, কাম্বু ইত্যাদি উপজাতির অর্ন্তভূক্ত ছিলেন। আওরঙ্গজেবের সময় দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলীয় হাবশি ও কাশ্মিরী মুসলমানগণ নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেন। মুঘল মনসবদার শ্রেণীতে ভারতীয় রাজপুত এবং মারাঠারাও জোরালো স্থান করে নিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় সংকীর্ণতার কারণে মুঘল শাসক শ্রেণীতে রাজপুতদের অবস্থান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল অনেকে মনে করেন । তবে এ মত সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। বস্তুত তাঁর দাক্ষিণাত্য রাজ্যগ্রাস নীতির ফলে মুঘল শাসক শ্রেণীতে দক্ষিণী মুসলমান (বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজকর্মচারিগণ এবং এদের মধ্যে আফগানরা ছিল প্রধান) এবং মারাঠা নিয়োগে প্রাধান্য পাওয়ায় কেবল রাজপুত নয় পুরনো ভারতীয় শেখজাদা এমন কি ইরাণী ও তুরাণী অভিজাতদের মর্যাদা এবং অবস্থানও ক্ষুন্ন হয়েছিল।[২৩]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, আওরঙ্গজেবের শাসনামল থেকেই মুঘল অভিজাত শাসকশ্রেণীর সংগঠনে পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এ পরিবর্তনের ফলে এর অন্তনিহিত সংকট, দুর্বলতা ও দ্বন্দ্বও প্রকাশ হতে শুরু করে এবং মুঘল অভিজাত শ্রেণী উপদলীয় কোন্দল ও রেষারেষিতে মত্ত হয়ে পড়ে। ফলে সাম্রাজ্য রক্ষা বা শক্তিশালী করার পরিবর্তে নিজেরাই সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন মুঘল অভিজাত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত অভিজাত সমাজের জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠী বিন্যাসের ফল। আগেই বলা হয়েছে যে, মুঘল অভিজাততন্ত্র বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছিল। ধর্মের দিক থেকে তারা ছিলেন প্রধানত হিন্দু ও মুসলিম। মুসলমানগণ আবার শিয়া ও সুন্নি এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক এ মতভেদ মুঘল অভিজাতদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সতীশচন্দ্রের মতে, অভিজাতদের ধর্মীয় ও জাতিগত বিরোধ প্রমাণ স্বাপেক্ষ নয়। তাঁর মতে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিকে

---

[২১] এম. আতহার আলি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯

[২২] এম. আতহার আলি, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ. ১৪-২২; সতীশ চন্দ্র অবশ্য এদেরকে বহিরাগত হিসেবে বিবেচনার ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। তাঁর মতে, এ সব অভিজাতরা দেশান্তরী এবং স্বদেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কয়েক পুরুষ ধরে ভারতে বসবাস করায় এদেরকে বহিরাগত বলা সঙ্গত নয়। সতীশ চন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১৮-২১

[২৩] এম আতহার আলি,*পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ২২-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

দরবারে অভিজাতদের মধ্যে যে সমস্ত গোষ্ঠী গড়ে ওঠেছিল সেগুলোর ভিত্তি ছিল কৌম, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসম্বন্ধ।[২৪] আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে এবং আঠারো শতকের প্রারম্ভে মুঘল দরবারের পুরোভাগে দুটি দল ছিল–যারা পরবর্তী চার দশক মুঘল দরবার ও রাজনীতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ দল দু'টির প্রথম দলের[২৫] প্রধান নায়ক ছিলেন ওয়াজির-উল-মামালিক আসাদ খাঁ এবং তাঁর পুত্র মীর বকসী জুলফিকার খাঁ। এরা ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভুত। তবে দরবারে জুলফিকার খাঁর সমর্থক প্রভাবশালী অমাত্য আবদুস সামাদ এবং দাউদ খাঁ পন্নি ছিলেন যথাক্রমে তুরানী ও আফগান। তাছাড়া রাও রামসিং হাড়া এবং দলপৎ বুন্দোলা ছিলেন ভারতীয় হিন্দু। মুঘল দরবার ও রাজনীতির অন্যতম প্রধান দুই অমাত্য রাজপুরুষ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়[২৬] ছিলেন ভারতীয় স্বার্থের রক্ষক। তবে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা নিজাম-উল-মুলক, মুহম্মদ আমিন খাঁ ও আবদুস সামাদের মত খ্যাতিমান তুরানী অমাত্যদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় যে, নিজাম-উল-মুলক ক্ষমতার লড়াইয়ে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে ধর্ম ও জাতিগত ঐক্যের কথা বলেছিলেন। নিজাম-উল-মুলক সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে ইসলাম বিপন্নকারী ও ভারতীয় হিন্দু স্বার্থের প্রতিভূ হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে ইরানী, তুরানী তথা সমস্ত মুঘল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনীত এসব অভিযোগ সর্বাংশে সত্য ছিল না। সৈয়দদের সাথে মারাঠা হিন্দুদের সম্পর্ক ছিল সত্য, তবে তদানীন্তন রাজপুত শক্তির অন্যতম প্রধান জয়সিংহ ছিলেন সৈয়দদের চিরশত্রু। সৈয়দদের বিরুদ্ধে ছাবেলা রামনাগর, ও দয়া বাহাদুর প্রমুখ হিন্দু প্রধানদের সশস্ত্র প্রতিরোধের কথাও অজানা নয়। অন্যদিকে গোঁড়া মুসলমান নিজাম-উল-মুলক সৈয়দদের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রীতির অভিযোগ আনলেও তিনি নিজেও কিন্তু প্রয়োজন মত মারাঠাদের সাথে মৈত্রী স্থাপনে কুণ্ঠাবোধ করেননি। উজির কামরুদ্দিন ও খান-ই-দৌরানের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সাদাত খাঁ বুরহান-উল-মুলক, মুহাম্মদ খাঁ বঙ্গাশ (আফগান) ও যোধপুরের রাজপুত নেতা অভয় সিং প্রমূখ ছিলেন প্রথমোক্তের দলে। আর রাজা জয়সিংহ ও অন্যান্য অনেক আফগান অমাত্য খান-ই-দৌরানের পক্ষে ছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনো কখনো জাতি ও ধর্মের দোহাই দেয়া হলেও মুঘল অভিজাত শাসকগোষ্ঠির মধ্যকার কোন্দল ও স্বার্থ সংঘাতে জাতিগত ও ধর্মীয় স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থসম্পর্কের বিষয়টিই প্রধান ছিল।

'উজিরাতের সমস্যা' মুঘল অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও গোষ্ঠি রাজনীতির অন্যতম কারণ ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। উজির মধ্যযুগীয় ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি হলেও এই পদাধিকারীদের সাথে রাজা বা সম্রাটদের প্রায়শই সমস্যা লেগে থাকতো। সম্রাট আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল সম্রাটগণ নিজ নিজ বুদ্ধি কৌশল ও বিচক্ষণতার দ্বারা উজিরাতের এ সমস্যা মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী শাসকগণ

---

[২৪] সতীশ চন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ. ৫২, ৩৫৫

[২৫] দ্বিতীয় গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন গাজী উদ্দিন ফিরোজ জং, তাঁর দুই পুত্র চিনকুল খাঁ- যিনি পড়ে নিজাম-উল-মুলক নামে খ্যাত হন ও হামিদ খাঁ বাহাদুর এবং তাদের জ্ঞাতি ভাই মুহম্মদ আমিন খাঁ। এরা ছিলেন তুরানী। আর এ গোষ্ঠীতে তুরানীদের প্রাধান্য ছিল।

[২৬] সৈয়দ আবদুল্লাহ খাঁ ও সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ ছিলেন। এরা ছিলেন বারহার সৈয়দ। এদের আদি আবাস মেসোপটেমিয়ার ওয়াসাইতে বলে দাবি করা হয়। তবে মুঘলদের ভারত আগমনের বহুপূর্বে তারা ভারতে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং আদি আবাসভূমির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে । তারা আচার আচরণে সম্পূর্ণ ভারতীয়ত্ব গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

এ সমস্যা মোকাবিলায় ব্যর্থ হন। ফলে উজিরাতকে কেন্দ্র করে দরবারে অভিজাতদের মধ্যে দলাদলি ও স্বার্থকেন্দ্রিক গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কারণ উজির পদে নিয়োগের সাথে জড়িত ছিল সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থ উপার্জনের অবারিত সুযোগ। সম্রাট এবং উজিরের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং বুঝাপড়া হলে সাম্রাজ্যের অবক্ষয়রোধ এবং একে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতো। এতে সাম্রাজ্যের সংকটের অবসান হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হয়নি। অদূরদর্শী ও দুর্বলচিত্ত সম্রাটগণ সাম্রাজ্যের স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচণায় আশঙ্কা করেন যে, উজির সুদক্ষ ও শক্তিমান হলে তাদের ক্ষমতা হ্রাস পাবে। এমনকি সম্রাটকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারা নিজেরাই নতুন রাজবংশ স্থাপন করতে পারেন। এমতাবস্থায় সম্রাট প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে নিজেরাই বিরোধে জড়িয়ে পড়তেন। আর উজিররাও প্রতিপক্ষকে দমন এবং সম্রাটকে নিজবশে আনার জন্য নিজ দল এবং সমর্থক গোষ্ঠী শক্তিশালী করার চেষ্টা করতেন। এভাবে দরবার ও রাজনীতিতে কোন্দল ও দলাদলি বেড়েই চলে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র সেবার মাধ্যমে যখন মুঘল অভিজাত শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হন এবং অভিজাত সমাজ ও সম্রাটের মধ্যকার পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার সম্পর্কে চিড় ধরে, তখনই মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং সাম্রাজ্যের সংহতি হুমকীর সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্র সেবার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ উচ্চাভিলাসী অভিজাত ওমরাহদের অনেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে আত্মনিয়োগ করেন। নিজাম-উল-মূলক, মুর্শিদকুলি খান এবং সাদাত খাঁন প্রমুখ এর প্রমাণ।[২৭]

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন মুঘল অভিজাত শাসক শ্রেণীর মধ্যকার সংকট ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রধান কারণ মুঘল সাম্রজ্যের তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। শেখর বন্দোপধ্যায়ের মতে, রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি গভীর অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শাসক শ্রেণীর গঠনে পরিবর্তন ও সাংগঠনিক কাঠামো আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়তে লাগল। তাদের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলো প্রকাশ পেল এবং নিজেদের মধ্যে দলাদলি বাড়ল।[২৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুঘল সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের শতকরা ৮০ ভাগের দাবিদার ছিলেন শাসক মনসবদার শ্রেণী। তবে মনসবদারদের মধ্যে এ ধন বন্টনে বৈষম্য ছিল প্রকট। অধ্যাপক এ জ্যাঁ ক্যায়সর এবং ইরফান হাবিব এ বন্টন বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৯] সৈন্য সামন্ত রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহের পর মনসবদারদের আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই তাদের ব্যক্তিগত আয় হিসেবে পরিগণিত হতো। মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজপুরুষের হাতে সম্পদের

---

[২৭] নিজাম-উল-মুলক দাক্ষিণাত্যে হায়দারাবাদ রাজ্য, মুর্শিদকুলি খান বাংলায় এবং সাদাত খান অযোধ্যায় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

[২৮] শেখর বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯

[২৯] ক্যায়সর পরিবেশিত তথ্য মতে, ১৬৪৭ সালে মুঘল সাম্রাজ্যে মোট মনসবদারের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার। এদের মধ্যে ৭,৫৫৫ জনের পদ ছিল ৫০০ 'জাত' এর কম। তবে ভূমি রাজস্বের খুব বেশী হলে মাত্র ৩০ শতাংশ ছিল এদের নিয়ন্ত্রণে। আর এদের উপরে ছিলেন বিভিন্ন পদ মর্যাদার ৪৪৫ জন মনসবদার–যারা ভোগ করতেন সাম্রাজ্যের সামগ্রিক রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬১ শতাংশেরও কিছু বেশী এবং জায়গির হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করতেন সাম্রাজ্যের ভূ-সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক। উচ্চ পদাভিষিক্ত ৪৪৫ জন মনসবদারের মধ্যে ৭৩ জন শীর্ষস্থানীয় আমলা ছিলেন শাহজাদা এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আমির। মনসবদারদের মোট সংখ্যার শতকরা ০.৯ ভাগ হলেও তারাই ভোগ করতেন মোট রাজস্ব জমার ৩৭.৬ শতাংশ অর্থাৎ মোট রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ। A. Jan Qaisar, 'Distribution of the Revenue Resources of the Mughal Empire among the Nobilty' in *The Mughal State, 1526-1750,* ed. by Muzaffar Alam & S. Subrahmanyam, New Delhi, 2000, pp. 252-258

Dhaka University Institutional Repository

এ কেন্দ্রীভবন (centralization) মনসবদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-রেষারেষিকে আরো তীব্রতর করেছিলো- যা আঠারো শতকের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে খোলামেলাভাবে উন্মোচিত হয়।

সতেরো শতকের শেষ এবং বিশেষ করে আঠারো শতকে মুঘল শাসকগোষ্ঠিকে যে দুরূহ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সতীশচন্দ্র একে 'জায়গিরদারি সমস্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি এ সমস্যার মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেছেন। সতীশচন্দ্রের মতে, জায়গিরদারি সঙ্কট রাজনৈতিক সঙ্কটকে তীব্রতর করে তুলেছিল এবং অপরদিকে রাজনৈতিক সঙ্কট এই সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল।[৩০] মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থায় জায়গিরদারি ব্যবস্থার বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং এর সুদক্ষ কার্যকারিতার উপরই কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ জায়গির ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে সঠিক পথে চললেও সতেরো শতকের শেষ দিকে এসে পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও ভূমি ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে তা অক্ষম হয়ে পড়ে এবং এ ব্যবস্থা এক গভীর সংকটে নিপতিত হয়। জায়গির ব্যবস্থার এ সংকটের কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন তরান্বিত হয়েছিল বলে ইরফান হাবিবও মনে করেন।[৩১] সতীশচন্দ্র মনে করেন জায়গির সংকটের উৎপত্তি হয়েছিল মুঘল সাম্রাজ্যে কৃষি ও শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের অপ্রাচুর্য হতে- যার ফলে শাসক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা আর মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। আতহার আলি (১৯৭৫) অবশ্য মনে করেন, যে সমস্যা জায়গির ব্যবস্থার মূলভিত্তিকে নাড়া দিয়েছিল তা হলো 'বে জায়গিরি' অবস্থা। এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে মনসবদারদের পদমর্যাদা ও সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে বন্টন করার মতো প্রয়োজনীয় জায়গির ভূমির স্বল্পতা। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে সাম্রাজ্যে আর্থিক সংকট তীব্রতর হয়। বিভিন্ন নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করেও তিনি অর্থনৈতিক সমস্যা এড়াতে পারেননি। এ অবস্থায় মনসবদারের সংখ্যা হ্রাস করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের কারণে আওরঙ্গজেব তা করতে পারেননি। আওরঙ্গজেবের উত্তরসূরী সম্রাটদের সময় মনসবদার নিয়োগে আরো অব্যবস্থাপনা দেখা দেয়। ফলে মনসবদারি ব্যবস্থা অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। অনুগ্রহভাজন লোকদের মধ্যে ব্যাপক হারে পুরস্কার, পদোন্নতি এবং বেপরোয়া জায়গির বিতরণ করে সমস্যাটি আরো ঘোরতর করে তোলা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ দিক হতে মনসবদারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তবে তাদের মধ্যে বন্টনযোগ্য 'পায়বকি'[৩২] ভূমির পরিমাণ বাড়েনি। পায়বকি জমির স্বল্পতা জায়গিরদারি ব্যবস্থাকে জটিল ও সংকটময় করে তুলেছিল। আওরঙ্গজেবের সময়ই অবস্থা এরূপ দাড়িয়েছিল যে, সম্রাট নিজে শাহজাদা আজমকে লিখেছিলেন যে, "সাম্রাজ্যে পায়বকি স্বল্পতা ও বেতন গ্রহীতার প্রাচুর্য রয়েছে।" বেতন প্রার্থী

---

[৩০] জায়গিরদারি সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য, Satish Chandra ,'Review of the Crisis of the Jagirdari System' *The Mughal State, 1526-1750,* ed. by Muzaffar Alam & S. Subrahmanyam, New Delhi, 2000, pp. 347-360.

[৩১] Irfan Habib, *Agrarian System of Mughal India, 1556-1707,* Bombey, 1963, p.p. 317-51

[৩২] মুঘল আমলে ভূ-সম্পত্তি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যে সকল জমির আয় সরাসরি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হতো, সেই জমিকে বলা হত 'খালিসা' ভূমি। আর মনসবদারদের বেতন হিসেবে বন্টন করার জন্য সংরক্ষিত ভূমিকে বলা হতো 'পায়বকি' ভূমি। পায়বকি ভূমি অভিজাতদের মধ্যে বন্টনের পর তা জায়গির ভূমিতে রূপান্তরিত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

মনসবদারদের হিসাব বইয়ে সম্রাট প্রায়ই লিখতেন, "একশত রোগীর জন্য মাত্র একটি দাড়িম্ব (বেদানা) আছে।"[৩৩] এসব তথ্য প্রমাণ থেকে আওরঙ্গজেবের সময় থেকে জায়গির সংকটের অবস্থা বুঝা যায়। জায়গির বন্টনের ক্ষেত্রে অর্থ ও প্রভাবের বিষয়টিও জড়িত ছিল বলে জানা যায়। দরবারে মুরব্বি ছাড়া জায়গির পাওয়া ছিল এক রকম দুঃসাধ্য। এভাবে নানা অসুবিধা ও দীর্ঘ অপেক্ষার পর একজন মনসবদার জায়গির লাভ করলেও অনেক সময় তা তার প্রত্যাশা এবং ন্যায্য প্রাপ্য অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতো না। ফলে জায়গিরদারদের মধ্যে সবসময় একরকম অনিশ্চয়তা কাজ করতো। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, মারাঠা আক্রমণ এবং উত্তর ভারতে আওরঙ্গজেবের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে সমভাবেই শাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল। ফলে অধিকাংশ মনসবদারই তাদের জায়গির থেকে তাদের প্রাপ্য অনুমোদিত অর্থের পুরোপুরি আদায় করতে পারতেন না। বিশেষ করে আগ্রার চারদিক, রাজপুতনার সীমানা এবং দাক্ষিণাত্যের প্রান্তস্থিত কিছু এলাকার (যেখানে কৃষি থেকে সচরাচর তেমন কোন উদ্বৃত্ত পাওয়া যেতনা) জায়গিরদারদের অবস্থা ছিল বেশি খারাপ। তাই এসব অঞ্চলে যারা জায়গির পেয়েছিলেন তারা বিক্ষুব্ধ ছিলেন। কাজেই তারা দেশের সুনিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে জায়গির লাভের জন্য প্রতিযোগিতা ও তদবির করা শুরু করলে সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে।

জে এফ রিচার্ড মনে করেন মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জায়গির ঘাটতি সম্পূর্ণভাবে সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভ্রান্ত নীতির ফল। তিনি মনে করেন দাক্ষিণাত্যের অধিকৃত অঞ্চলে প্রশাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করে এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার ভূসম্পত্তিকে কাজে লাগিয়ে আওরঙ্গজেব এ সমস্যা এড়াতে পাড়তেন। কিন্তু তিনি তা না করে সর্বোৎকৃষ্ট এবং উর্বর অঞ্চলগুলোকে খালিসায় পরিণত করেন অথবা কেবল দাক্ষিণাত্যে কর্মরত মনসবদারদের জায়গির এবং যুদ্ধরত সৈন্যদের বেতন দানের কাজে ব্যবহার করেন। ফলে জায়গির হিসেবে বন্টনের জন্য যে পায়বকি ভূমি অবশিষ্ট ছিল তা অত্যন্ত অনুর্বর ও অশান্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায়, সেসব অঞ্চলে রাজস্ব আদায় ছিল দুরূহ ও অনিশ্চিত। কাজেই এ অঞ্চলে জায়গির লাভে কেউ আগ্রহী হতেন না। আর যাদেরকে দেয়া হত তাদের মধ্যেও ক্ষোভ বিরাজ করত।[৩৪] অবশ্য দাক্ষিণাত্য বিশেষ করে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সম্পদ দিয়ে জায়গির সংকটের সমাধান করা যেত কী-না এ ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় রয়েছে। সতীশচন্দ্র উল্লেখ করেছেন যে, দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল এমনিতেই ঘাটতি অঞ্চল। তাছাড়া অপশাসন এবং বিভিন্ন উপদল ও গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ এখানে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে সেখানে দ্রুত উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির আশা ছিল খুব কম।[৩৫] কাজেই দাক্ষিণাত্যের সম্পদ ও ভূ সম্পত্তি কাজে লাগিয়ে আওরঙ্গজেব সমস্যার সমাধান করতে পারতেন বলে রিচার্ড যে মতামত দিয়েছেন তা তর্কাতীত নয়।

জায়গিরদারি সংকটের প্রকৃত কারণ যাই হোক না কেন এ সত্য অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই যে, মুঘল সাম্রাজ্যে জায়গিরদারি সংকট এক ভয়াবহরূপ ধারণ করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে মনসবদাররা জায়গির পেলেও সে জায়গির হতে তারা তাদের সারা বছরের প্রাপ্য বেতন আদায় করতে পারতেন না। তাদের আয় অভিহিত মূল্যের খণ্ডাংশও ছিল না

---

[৩৩] উদ্ধৃতি, এম. আতহার আলি, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ. ১২৭-১২৮

[৩৪] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য J F Richards, *Mughal Administration in Golconda, 1687-1727,* Oxford, 1975.

[৩৫] সতীশ চন্দ্র, *মোগল দরবারের দল ও রাজনীতি*, পৃ.৩৮

এবং বছর বছর তা আবার প্রচুর ওঠানামা করত। এতে নিচু পদের মনসবদারদের পক্ষে জায়গির লব্ধ আয় হতে জীবন ধারণ করা দুরূহ হয়ে পড়ল।

মুঘল শাসকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যের উপর জায়গির সংকটের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ছিল মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। জায়গিরদারি ব্যবস্থার সংকট মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শুধু পঙ্গু করে দেয়নি, বরং সমগ্র মনসবদারি ব্যবস্থাটিই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। জায়গির হতে আহরিত আয়ের অনিশ্চয়তার কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকতাগণ তাদের উপর অর্পিত প্রশাসনিক ও সামরিক দায়িত্ব পালনে অনিহা ও উদাসীনতা প্রকাশ করতেন। অর্থ সংকটের কারণে অনেক মনসবদার তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক সৈন্য পোষণ করতেন না। এ সময় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ায় এ ব্যাপারে মনসবদারদের বাধ্য করারও কোন উপায় ছিল না। এর নীটফল হল মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির অবক্ষয়। অথচ প্রকৃতিগত দিক থেকে মুঘল সাম্রাজ্য ছিল একটি 'সমর রাষ্ট্র' (war-stae)।[৩৬] জনসমর্থনের উপর ভিত্তি করে নয় বরং এটি গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণরূপের সামরিক শক্তির কাঁধে ভর করে। কাজেই সামরিক শক্তি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষার অন্যতম প্রধান নিয়ামক। সূত্র মতে, মুঘল সাম্রাজ্যের অগ্রগতির যুগে সেনাবাহিনীর প্রশংসনীয় ভুমিকা ও কৃতিত্ব ছিল। বাবুর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল সম্রাটদের কেউই যুদ্ধবিদ্যায় হীণ ছিলেন না। সে সময় সেনাবাহিনীর সাহস, শৃঙ্খলা ও সংগঠন ছিল চমৎকার। কিন্তু সাম্রাজ্যের অবক্ষয় অধোগতি যখন আরম্ভ হলো, তখন তা সেনাবাহিনীকেও স্পর্শ করল। বিশৃঙ্খলা, অকর্মণ্যতা, সংগঠন ও সংহতির অভাবে সেনাবহিনীর রণদক্ষতা ও জীবনী শক্তি ক্ষয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আবশ্যক ছিল। ইউরোপ থেকে আগত বিদেশী হানাদারদের মোকাবেলা এবং সাম্রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য নৌবাহিনী সংগঠনে উদ্যোগী হওয়া ছিল সময়ের দাবি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুঘলরা এ কাজগুলো করতে পারেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ষোল শতকেই ইউরোপে ভারী কামান নির্মাণ ও গোলন্দাজ শক্তির ব্যাপক উন্নতি এবং সেই সাথে নৌ শক্তি দ্রুত বিকাশ হলেও মুঘল ভারতে তেমন কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। মুঘল সেনাবাহিনীর সংগঠন ও সমরসজ্জায় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির কোনো পরশ লাগেনি।[৩৭] উপরন্তু জায়গির সংকটের কারণে সেনাবাহিনী প্রতিপালন ও সংরক্ষণে মনসবদারদের অনীহা ও অবহেলায় মুঘল সাম্রজ্য নিদারুণ সামরিক দুরবস্থায় নিপতিত হয়। মারাঠাসহ আঞ্চলিক শক্তির উত্থান প্রতিরোধ এবং নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালীসহ বিদেশাগত শক্তিসমূহের আগ্রাসন মোকাবেলায় মুঘল বাহিনীর চরম ব্যর্থতা এরই ফল। জায়গির ব্যবস্থার সংকটের ফলে কেবল সামরিক শক্তির বিপর্যয় ঘটেনি, মুঘল শাসকশ্রেণীর মধ্যে সুপ্ত বিভাজক শক্তিগুলোও জেগে ওঠেছিল। সতীশচন্দ্রের মতে, জায়গির ও দরবারে নিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতার ফলে মুঘল প্রশাসনে যৌথ শাসকশ্রেণী প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার পরাভব ঘটে এবং বিভেদপন্থী শক্তিগুলো প্রবল হয়ে ওঠে। জাতি ও

---

[৩৬] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *মোগল সাম্রাজ্য থেকে ব্রিটিশরাজ (১৫৫৬-১৮১৮)*, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৩২৪

[৩৭] এম আতহার আলি, 'সাম্রাজ্যের অবসানঃ মুঘল প্রসঙ্গ' *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, ইরফান হাবিব (সম্পাঃ), (বাংলা অনুঃ) রাজা মূখার্জী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা , কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৯৯৮, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মের সুপ্ত বিরোধের মনোভাব পুনর্জাগ্রত হয়ে ওঠে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ষণশীলতা ও পূণরুত্থান মনোভাব সঞ্চারিত হয়।[৩৮]

পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জায়গির সংকটের কারণে উত্তম ও সহজে পরিচালনযোগ্য জায়গিরের জন্য প্রতিযোগিতার ফলে অভিজাত শাসকশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দলাদলি বেড়েছিল। কেননা সবচেয় প্রভাবশালী অভিজাত গোষ্ঠীই ভাল জায়গিরগুলো নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাদের মাধম্যে তাদের অনুগ্রহভাজন মনসবদারগণ ভাল জায়গিরগুলো লাভ করতেন। তাই সকল মনসবদারই রাজসভায় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সাথে সখ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতো। ফলে উজির, মীর বখশি ইত্যাদি উচ্চপদাধিকারী কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন শুধু নয়, সম্রাটের উপরও প্রাধান্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। প্রভাব ও ক্ষমতা লাভের জন্য অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যকার এ দ্বন্দ্ব ও দলাদলি রাজসভার গণ্ডিতে খুব একটা সহিংস সংঘর্ষের রূপ নেয়নি সত্য; তবে এ দ্বন্দ্ব রেষারেষি মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক দক্ষতাকে মারাত্মকভাবে ব্যহত করেছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের নানাবিদ দুর্বলতার মধ্যে একটি বড় দুর্বলতা ছিল উত্তরাধিকার সংগ্রাম। উত্তরাধিকার সম্পর্কে সুনিদিষ্ট নীতিমালা না থাকায় না সিংহাসনকে কেন্দ্র করে গৃহবিবাদ ছিল অনেকটাই অবধারিত। সিংহাসনকে কেন্দ্র করে গৃহবিবাদ মুঘল সাম্রাজ্যকে চরম সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিয়ে গিয়েছিল বলে প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত। রাজকুমাররা নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সাম্রাজ্যের চরম শক্তি বা গোষ্ঠীগুলোর সাথেও হাত মেলাতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আর এভাবেই দরবারে অভিজাতগণ অশুভ রাজনীতির খেলায় মেতে ওঠার সুযোগ পান। আর এ খেলা মুঘল সাম্রাজ্যের চরম সর্বনাশ ঘটায়। মুঘল শাসনের শেষপর্বে যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব চলেছিল তার পেছনেও উত্তম ও ভাল জায়গির অধিকারের প্রতিযোগিতা কাজ করেছিল বলে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন।[৩৯]

পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুঘল সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল অভিজাত শ্রেণীর সংগঠন। উপরের পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, সতেরো শতকের শেষ এবং অঠারো শতকের প্রথম দিকে মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপে অভিজাত শাসক শ্রেণীর সংগঠনে পরিবর্তন আসে। নানামূখী সংকটে শাসক শ্রেণীর সাংগঠনিক কাঠামো আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলো প্রকাশ পায় এবং নিজেদের মধ্যে দলাদলি, স্বার্থ সংঘাত ও কোন্দল বাড়ে। এক সময় যে শাসকশ্রেণীর মনসবদারগণ সাম্রাজের প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও সংহতিবিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন পরিবর্তিত অবস্থায় তাদের অধিকাংশই সাম্রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলে নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভার অনেকাংশই তারা ব্যয় করেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ফলে সাম্রাজ্যের দুর্দিনে তারা শক্ত হাতে এর হাল ধরতে পারেননি। সাম্রাজ্যকে পূনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করে তোলার পরিবর্তে তারা নিজেরাই এর ধ্বংস সাধনের নিমিত্ত বা কারণ হয়ে দাঁড়ান।

---

[৩৮] সতীশ চন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ. ৩৭, ৩৯

[৩৯] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩২৭

সতেরো-আঠারো শতকে মুঘল শাসকশ্রেণীর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও দ্বন্দ্বের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি যখন নড়বড়ে হয়ে ওঠেছিল সে সময় মুঘল সাম্রাজ্য আরেকটি বিরাট সমস্যার মুখোমুখী হয়। আর তা হলো মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে উপর্যুপরি বিদ্রোহ। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এসব বিদ্রোহের অধিকাংশই ছিল কৃষি বিদ্রোহ। এ সব বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যায় পণ্ডিত মহলে নানামুখী প্রচেষ্টা দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন এ সব বিদ্রোহ ছিল ভারতের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও সম্প্রদায়গত ঐক্য চেতনার ফল এবং কেবল রাজনৈতিক কারণে এ সব বিদ্রোহ হয়েছিল। আবার কেউ কেউ মনে করেন মুঘলদের কারো করো বিশেষ করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে এসব বিদ্রোহের উদ্ভব। তবে এসব বক্তব্যের মধ্যে সমস্যার সরলীকরণের প্রয়াস নিতান্তই স্পষ্ট। প্রকৃত অর্থে এ বিদ্রোহগুলোর মূল নিহিত ছিল আর্থ- সামাজিক বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব এবং সম্পত্তির সম্পর্কের মধ্যে। উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া মুঘল রাষ্ট্র এবং এর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দাবিকে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ, বিশেষ করে কৃষিজীবী সমাজ শুরু থেকেই সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। এছাড়া কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আঞ্চলিক শক্তির (স্থানীয় রাজা, জমিদার) প্রভাব তো ছিলই। এসব কারণে শুরু থেকে মুঘলদের বিরুদ্ধে স্থানীয় শক্তিসমূহের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ দেখা যায়। অবশ্য মুঘল বাহিনীর রণদক্ষতা ও শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে প্রথম দিকে একরকমের ভীতি থাকায় এসব প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। কিন্তু আঠারো শতকে মুঘল সামরিক শক্তির দুর্বলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি এবং সেই সাথে স্থানীয় কৃষক-জনতার উপর রাজপ্রতিনিধিদের ক্রমবর্ধমান শোষণের প্রতিক্রিয়ায় মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। এ প্রসঙ্গে জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী, শিখ ও মারাঠা কৃষকদের বিদ্রোহের কথা স্মরণযোগ্য। মুঘল শাসনে অসন্তুষ্ট স্থানীয় ভূস্বামী রাজা জমিদারগণ পরিস্থিতির সুযোগ নেয়; তারা নিপীড়িত বিদ্রোহী কৃষকদের দলে যোগ দেয় এবং কোথাও কোথাও বিদ্রোহে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। জনসমর্থনপুষ্ঠ আঞ্চলিক শক্তিসমূহের বিদ্রোহ দমন দুর্বল কেন্দ্রীয় মুঘল শক্তির পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে এবং উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মুঘল সাম্রাজ্যে সম্পত্তির মালিকানা (মিলকিয়াত) বা সম্পত্তি সম্পর্ক একটি জটিল ও বিতর্কিত বিষয়। অধিকাংশ পণ্ডিতের বর্ণনা থেকে ধারণা হয় যে, সম্রাট স্বয়ং মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন। কার্ল মার্কস মুঘল শাসনামলে জমির মালিকানা, কৃষক-জমিদার ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের স্বরূপ, উদ্বৃত্ত বন্টনের প্রক্রিয়া এবং গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি নির্ধারণে তাঁর 'Asiatic Mode of Production' এর আদর্শ (model) নির্মাণ করেছেন। এ আদর্শের অন্যতম প্রতিপাদ্য হলো ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি।[৪০] এ ব্যাপারে পাশ্চত্য এবং ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমতও দেখা যায়। অনেকেই মনে করেন এব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সহজ নয়। কারণ মুঘল সরকারি দলিল-দস্তাবেজে এ মতের পক্ষে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। এমনকি ভারতীয় মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ এমত সুস্পষ্টভাবে নাকচ করে দিয়েছেন। ইরফান হাবিব মার্কসের ব্যক্তব্যের জোরালো দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, প্রাক-বৃটিশ ভারতে জমির মালিকানা ছিল রাজার- এ বক্তব্যের মূল উদ্গাতা ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও পর্যটকরা। তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষে সত্যিকার অর্থে কৃষকই ছিল জমির

[৪০] Karl Marx, *Pre-Capitalist Economic Formation,* Eng. Trns. by J cohn, New York, 1969, p. 79

মালিক। তার মতে, এ কথা প্রমাণিত যে ঠিকমতো রাজস্ব পরিশোধ করে চাষাবাদ করলে কোন কৃষককে তার জমি থেকে উৎখাত করা যেত না। আবার এ প্রমাণও আছে যে, সম্রাট নিজ প্রয়োজনে কখনো কখনো অন্যের কাছ থেকেও জমি কিনতেন।[৪১] তাই সমস্ত জমির মালিকানা সম্রাটের ছিল এ কথা নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয়। ইরফান হাবিব ছাড়াও আরো অনেকেই এমত সমর্থন করেন। তবে তাদের এ বক্তব্য নির্বিচারে গ্রহণ করার অবকাশ নেই। মার্কসবাদীরা ইরাফন হাবিবের বক্তব্যকে তথ্য সমৃদ্ধ বলে মনে করেন না। তাদের মতে, ব্যক্তি মালিকানার পক্ষে হাবিবের উপস্থাপিত যুক্তিতর্কের মধ্যেই পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। তৎকালে রাষ্ট্র কর্তৃক রায়তদের চাষের অধিকারকে হাবিব 'ব্যক্তি মালিকানা' বলে আখ্যায়িত করে ব্যক্তি মালিকানার এক বিভ্যান্তিকর তত্ত্ব হাজির করেছেন।[৪২] নিরপেক্ষ বিচারে মনে হয় উভয় মতের মধ্যেই কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই জমির মালিকান প্রসঙ্গটি সহজ মিমাংসার বিষয় নয়। এ কথা সত্য যে, আধুনিক ইউরোপীয় আইনের সংজ্ঞানুযায়ি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে যা বুঝায় তা বাংলা- ভারতের কোথাও ছিল না। মালিকানার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো মালিকের ইচ্ছামতো হস্তান্তরের অধিকার। মুঘল রাষ্ট্রীয় নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের অনুমোদন ছাড়া এক ইঞ্চি জমিও হস্তান্তর বা বিক্রির অধিকার সাধারণভাবে ভারতীয় কৃষক বা জমিদারদের ছিল না। তবে জমির উপর কৃষকদের ব্যক্তিগত ও যৌথ ভোগ দখলের অধিকার ছিল। মার্কসও তা স্বীকার করেছেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, জমির উৎপাদনের উপর সম্রাটের দাবি ছিল এবং তা সংগৃহীত হতো ভূমি রাজস্ব আকারে। আদায়কৃত এ ভূমি রাজস্বের কিছুটা যেতো সরাসরি কেন্দ্রীয় রাজকোষে সম্রাটের নিজস্ব আয় হিসেবে, আর বাকি অংশ বন্টন করা হতো সম্রাটের শাসন সহযোগী রাজকর্মকর্তা-আধিকারিক জায়গিরদারদের মধ্যে। মুঘল যুগে কৃষিজীবীদের উৎপাদিত সামাজিক উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে জীবিকা নির্বাহকারী আর একটি গোষ্ঠী ছিল জমিদার শ্রেণী।[৪৩] এস নুরুল হাসানের মতে "কৃষকদের হাত থেকে কৃষজ উৎপাদনের উদ্বৃত্ত নিয়ে নেওয়া হত, এবং তা ভাগাভাগি হত সম্রাট তাঁর আমিরবর্গ ও জমিন্দারদের মধ্যে; ----- শাহী সরকার ও জমিন্দারদের মধ্যে উৎপাদনের বৃহত্তর অংশ আত্মসাৎ করার লড়াই অনবরত চলতে থাকলেও, অর্থনৈতিক শোষণ প্রক্রিয়াটিতে উভয়েই ছিল একে অপরের সহযোগী।"[৪৪]

তত্ত্বগতভাবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে জমিদার শ্রেণী ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের সহযোগী শক্তি। কিন্তু বাস্তবে এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বেশ জটিল। মুঘল জমিদারির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত জমিদারই জাতি (caste) গোষ্ঠীকে (clan) কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছিল এবং প্রত্যেক জমিদারই ছিলেন কোন না কোন বিশেষ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী জাতি বা গোষ্ঠীর নেতা। স্থানীয় কৃষকদের সাথে জাতি ও গোষ্ঠীগত যোগাযোগ

---

[৪১] ইরফান হাবিব, 'প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে ভূ-সম্পত্তির সামাজিক বন্টন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮০;

[৪২] গোলাম রব্বানী, *উপনিবেশ পূর্ব বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১

[৪৩] অধ্যাপক নুরুল হাসান মুঘল আমলের জমিদারদের প্রধান তিনটি বর্গের কথা বলেছেন। তাঁর মতে এ তিনটি বর্গের প্রথম স্তরে ছিল স্বরাট জমিদার নামক প্রায় স্বাধীণ ভূস্বামী শ্রেণী। এদের নিচে ছিল অন্তবর্তী বা মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণী এবং সর্বনিম্নস্তরে ছিল প্রাথমিক বা উপক্রমী জমিদার শ্রেণী। এ শ্রেণী বিভাজন সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য S. Nurul Hasan, 'Zamindars under the Mughals' in *The Mughal State, 1526-1750,* ed. by Muzaffar Alam & S. Subrahmanyam, New Delhi, 2000, pp.285-298

[৪৪] S. Nurul Hasan, *op.cit* p.284

এবং নিজস্ব সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর[৪৫] বলে এই জমিদার শ্রেণী স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসন সুদৃঢ় হলে তাদের ক্ষমতার ভিত দুর্বল হয়ে পড়বে, এ আশংকা জমিদারদের সবসময় ছিল। তাই সর্বদাই তারা কেন্দ্রীয় শাসন সুদৃঢ় হওয়ার বিরোধিতা করেছেন। স্থানীয় পর্যায়ে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এতদস্বত্বেও মুঘল সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থেই জমিদার শ্রেণীর সহযোগিতা আদায়ে নিরন্তর চেষ্টা করেছে। সম্রাট আকবরের সময় থেকেই এ গ্রামীণ সামন্ত অভিজাত শ্রেণীকে আধা সরকারি সহযোগী শ্রেণীতে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ এ প্রচেষ্টারই বহিঃপ্রকাশ। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, আওরঙ্গজেবের শাসনকালে এ চেষ্টায় ত্রুটি দেখা দেয়। যার ফলে তাঁর মৃত্যুর পর, বিশেষত ১৭০৭-১৭০৮ সালের গৃহযুদ্ধের পরই মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে এই সব জমিদারদের, প্রধানত মধ্যবর্তী জমিদারদের আনুগত্য হ্রাস পেতে থাকে।[৪৬] অবশ্য মুজাফফর আলম এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, জমিদারদের সাথে বিশেষ করে মধ্যবর্তী জমিদারদের সাথে মুঘল রাষ্ট্রশক্তির সম্পর্কে চিড় ধরতে শুরু করেছিল আরো পরে, বাহাদুর শাহের রাজত্বকালের শেষদিকে। অবশ্য প্রাথমিক স্তরের জমিদাররা আগা গোড়াই ছিলেন মুঘল বিরৌধী মারাঠাদের পক্ষে। তাছাড়া পুরো মুঘল শাসন জুড়েই জমিদারদের বিদ্রোহী আচরণের অসংখ্য নজির আছে। কাজেই এর জন্য আওরঙ্গজেব বা তাঁর উত্তরসূরীদের বিশেষভাবে দায়ী করা সঙ্গত নয়।[৪৭] বিশেষজ্ঞদের মতে, এ অসন্তোষের প্রধান কারণ সম্ভবত জায়গিরদারদের শোষণ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থায় জায়গিরদারগণ ছিলেন পুরোপুরি একটি রাজকর্মচারি শ্রেণী। অবশ্য সরকারী কর্মচারী হলেও কার্যত তারা জাত্যাভিমান বিশিষ্ট অভিজাত শ্রেণী বলে পরিগণিত হতো। আর জমিদারদের মতো তারাও ভূমিকে নিজেদের সম্পদ ও শক্তির উৎস বলে মনে করতেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের মাঝামাঝি পর্যন্ত জায়গিরদারি ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলেও এর পর এ ব্যবস্থা এক গভীর সংকটে পড়ে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষদিক থেকে চাহিদার তুলনায় জায়গিরের অভাব এবং 'জমা' (ধার্যকৃত নির্ধারিত রাজস্ব) অপেক্ষা 'হাসিলের' (আদায়কৃত রাজস্ব) পরিমাণ কমতে থাকায় জায়গিরদারদের মধ্যে প্রজাপীড়ন ও কৃষক শোষণের প্রবণতা বাড়তে থাকে। মুজাফ্ফর আলম দেখিয়েছেন যে, সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজত্বকালের শেষদিকে দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ জায়গির অঞ্চলেই শোষণের মাত্রা ছাড়িয়েছিল। জায়গিরদাররা প্রায়ই মারাঠাদের সাথে বে-আইনি বুঝাপড়া করতেন অথবা বড় বড় জমিদারদের কৃষকদের কাছ থেকে ইচ্ছেমত কর আদায় করার সুযোগ দিতেন। আবার অনেক সময় তারা আমিলদের কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়ে নিতেন বলে আমিলরা সেই টাকা উসুল করতে প্রজাদের উপর অবাধ শোষণ চালাতেন।

---

[৪৫] তারা প্রধানত জাতি ও গোষ্ঠীগত ভিত্তিতে এ সৈন্যবাহিনী জোগাড় করতেন। অনেক সময় 'পাইকান' ও 'চাকরান' ইত্যাদি করমুক্ত ভূমি দ্বারা অন্যান্য জাতি বা গোষ্ঠী থেকেও সৈন্য সংগ্রহ করা হত। অনেক জমিদারের নিজস্ব দুর্গ পর্যন্ত ছিল।

[৪৬] J. F Richards এবং V Narayana Rao প্রধানত এ মত প্রকাশ করেন। J. F Richards, V Narayana Rao 'Banditry in Mughal India' in *The Mughal State, 1526-1750,* ed. by Muzaffar Alam & S. Subrahmanyam, New Delhi, 2000, pp.491-519

[৪৭] এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Muzaffar Alam, 'The Zamindars and Mughal Power in Deccan, 1645-1712', *Indian Economic and Social History Review,* March, 1974 এবং 'Aspects of Agrarian Uprisings in North India in The Early Eighteenth Century' in *The Mughal State, 1526-1750,* ed. by Muzaffar Alam & S. Subrahmanyam, New Delhi, 2000, pp.459-473

সতেরো শতকের শেষ এবং আঠারো শতকের শুরুতে মুঘল সাম্রাজ্যে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য কৃষক শোষণের আরেকটি হাতিয়ার ছিল 'ইজারাদারি ব্যবস্থার' প্রচলন। নানা কারণে জায়গিরদাররা প্রায়ই তাদের জায়গির হতে নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে পারতো না বলে তারা বার্ষিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে রাজস্ব আদায়ের ভার অন্য আর একদল লোকের হাতে ছেড়ে দিত–যাদের বলা হতো ইজারাদার।[৪৮] জায়গির ইজারা নেয়ার জন্য একটি কৃত্রিম প্রতিযোগিতা থাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জমার পরিমাণ বেড়ে যেতো। ইজারাদাররা মুনাফা সমেত লগ্নি টাকা আদায়ে যথেচ্ছ হারে রাজস্ব আদায় করতে শুরু করায় কৃষকরা চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। ইজারাদার কর্তৃক অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় কখনো কখনো কৃষকদের চাষ ছেড়ে পলায়নের নজিরও রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাহদুর শাহের শাসনামল থেকে খালিসা ভূমিও ক্রমশ ইজারাদারদের হাতে চলে যাওয়ায় অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গৌরবের যুগে কৃষি ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা মুঘল রাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। বিপদের দিনে কৃষকদের সর্বোতভাবে সাহায্য করা এবং নিজ নিজ এলাকার কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য জায়গিরদারদেরও উৎসাহিত করা হতো। কৃষকরা যাতে ন্যায় বিচার পায় এবং তারা যেন অত্যাচার ও শোষণের শিকার না হয় সেদিকেও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিশেষ নজর ছিল বলে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায়। কিন্তু আওরঙ্গজেবের শাসনামলের শেষদিক, বিশেষত তাঁর মৃত্যুর পর এ নীতি মুখ থুবড়ে পড়ে। জায়গিরদার ও ইজারাদারদের শোষণ কৃষকের গ্রাসাচ্ছাদনে হাত দেয়। আর এর ফলে কৃষক সমাজ মুঘল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ইরফান হাবিব ও গৌতম ভদ্রের আলোচনায় মুঘল যুগে বেশ কিছু কৃষক বিদ্রোহের পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি আওরঙ্গজেবের সময়ে সাধারণভাবে ধর্মীয় প্রতিরোধ আন্দোলন বলে পরিচিত আন্দোলনের[৪৯] পেছনেও কৃষি সংকট জনিত অর্থনৈতিক সংকট কাজ করেছিল বলে ইরফান হাবিব ও গৌতম ভদ্র মনে করেন।[৫০]

মুঘল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কৃষিজাত উদ্বৃত্তের প্রধান ভাগিদার ছিল শাসকশ্রেণী (সম্রাট ও জায়গিরদার) ও জমিদারগণ। এ সময় কৃষকের উদ্বৃত্ত সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে জায়গিরদার ও জমিদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আদায়কৃত সম্পদের সিংহভাগ (প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ) জায়গিরদাররা নিয়ে নেবার ফলে জমিদারদের ভাগে টান পড়তে শুরু করে। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে জমিদাররা কৃষকদের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করে। ইরফান হাবিবও বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৫১] পুনশ্চ স্মরণীয় যে, কৃষকদের সাথে জমিদারদের

---

[৪৮] এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Muzaffar Alam, 'The Zamindars and Mughal Power in Deccan, 1645-1712', *Indian Economic and Social History Review,* March, 1974, এবং 'Aspects of Agrarian Uprisings in North India in The Early Eighteenth Century' in *The Mughal State, 1526-1750,* ed. by Muzaffar Alam & S. Subrahmanyam, New Delhi, 2000, pp.459-473

[৪৮] Muzaffar Alam, 'The Zamindars and Mughal Power in Deccan, 1645-1712', *Indian Economic and Social History Review,* March, 1974

[৪৯] গুজরাটের মাতিয়া বিদ্রোহ (১৬৮০-৮৫), সৎনামি বিদ্রোহ , এবং শিখ বিদ্রোহ ইত্যাদি। মারাঠা বিদ্রোহের পিছনেও ধর্মীয় প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল। এগুলো ছাড়াও আওরঙ্গজেবের সময় উল্লেখযোগ্য কৃষক ও আঞ্চলিক সামন্ত বিদ্রোহের মধ্যে ছিল গুজরাটের কোলি কৃষক বিদ্রোহ, উত্তর ভারতের বর্তমান আমেথি অঞ্চলের কুর্মি কৃষক বিদ্রোহ, দিল্লী ও মথুরা অঞ্চলের জাঠ বিদ্রোহ, মেবার ও মাড়ওয়ারের রাজপুত বিদ্রোহ ইত্যাদি।

[৫০] Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India (1556-1707),* গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ।*

[৫১] Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India (1556-1707),* শেখর বন্দোপধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫

তুলনামূলকভাবে একধরণের নিবিড় সামাজিক সম্পর্ক ছিল। জায়গিরদারদের তুলনায় জমিদাররা ছিলেন কৃষকদের কাছের লোক। তদুপরি জমিদারদের সাথে ছিল কৃষকদের জাতিগত বা গোষ্ঠীগত যোগসূত্র। এসব কারণে বহুক্ষেত্রে জমিদারদের বিদ্রোহে তাদের পক্ষ হয়ে কৃষকরাও লড়াই করে। দিল্লী ও মথুরার জাঠ বিদ্রোহ ছিল এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। যা'হোক মুঘল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জমিদার ও কৃষকদের যৌথ বিদ্রোহ ক্রমে সমগ্র সাম্রাজ্যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে মুঘল রাজপুরুষদের পক্ষে এ বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যর্থতা মুঘলদের বিপর্যয় ডেকে আনে। জমিদার ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় একদিকে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা ও অন্যদিকে জনসমর্থনপুষ্ট আঞ্চলিক শক্তির উত্থান-জমিদার ও কৃষক শ্রেণীর বিদ্রোহের চাপে মুঘল সাম্রাজ্য আর বেশি দিন ঠিকে থাকতে পারেনি। ইরফান হাবিব বলেছেন, "যে কৃষি সঙ্কট সমগ্র সামাজ্যকে গ্রাস করেছিল, যার পরিণতি হলো কৃষক অভ্যুত্থানের সাফল্য ও ব্যর্থতার বৈচিত্রময় কাহিনী, নিজের ধ্বংসের জন্য মুঘল সাম্রাজ্য বহুলাংশে তারই কাছে ঋণী।"[৫২]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, সতেরো শতকের শেষ এবং আঠারো শতকের গোড়ার দিকে মুঘল সাম্রাজ্যে সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থদ্বন্দ্ব, কেন্দ্রের সাথে সুবার বিরোধ এবং জায়গিরদারি ও কৃষি ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান সংকটের ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ-বিপ্লব দেখা দেয়। বস্তুত এ সবই ছিল মুঘল রাষ্ট্রশক্তির অন্তঃসারশূন্যতার বহিঃপ্রকাশ। এ ধরণের পরিস্থিতি মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও অধোগতিকে যে তরান্বিত করেছিল এ কথা ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। একান্ত প্রাসঙ্গিক বিধায় এ পর্যায়ে আরো একটি গুরুতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। আর তা হলো, মুঘল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বণিক, বাণিজ্য এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সংকট। বস্তুত মুঘল সাম্রাজ্যে জায়গির ও কৃষি সংকটের ফলে কৃষিখাত থেকে রাষ্ট্রের আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কোন উপায় ছিল কী-না এবং সরকারী নীতি পরিবর্তন বা কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে সম্পদের ঘাটতি যে দুরূহ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, তা মোকাবেলা করা যেত কী-না, এ প্রশ্নের উত্তর জটিল। তবে মুঘল সাম্রাজ্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং তৎকালীন বিশ্বপরিস্থিতি বিবেচনায় আনলে বলা যায়, কেবল সরকারী নীতি পরিবর্তন বা কৃষি সম্প্রসারণের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যের বিচিত্র সমস্যা বিশেষ করে আর্থিক সংকট সমাধান করা সম্ভব ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং নতুন প্রযুক্তি ও কারিগরিবিদ্যা প্রয়োগ করে শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে, তবেই সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। আর এর জন্য প্রয়োজন ছিল সামাজিক পরিবর্তন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কৃষিজ উদ্বৃত্ত সম্পদের সিংহভাগ মালিকানা যাদের হাতে কুক্ষিগত ছিল, সেই শাসক শ্রেণী প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাপরে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পনের থেকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে এক নাগাড়ে বৈষয়িক ও মানসিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলে। এ সময় সেখানে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় দেখা দেয় এবং সামন্ততন্ত্রের গর্ভে জন্ম নেয় বণিকতন্ত্র (marcentalism)। ইতালীর স্বাধীন নগররাষ্ট্রসমূহে বণিকতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে তা

---

[৫২] ইরফান হাবিব, 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে কৃষককুল' *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, ইরফান হাবিব (সম্পাঃ), পৃ.১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপর অন্যত্র বিস্তার লাভ করে। ইউরোপীয় মূলভূখণ্ডে বণিক পুজির সঞ্চালন হয় হ্যানসিয়াটিক লীগে (The Hanseatic League)[৫৩] শিল্পী ও বণিকদের গিল্ড প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।[৫৪] সামন্ত মূল্যবোধ ইউরোপের নতুন অগ্রগামী বণিকতন্ত্র ও বণিক শ্রেণীর অধিকতর বিকাশে বাধা হয়ে দাড়ালে তা অপসারণের জন্য ইউরোপীয় মানস পরিমণ্ডলে বিপ্লব ঘটানো হয়। রেনেসাঁস আন্দোলন (Renaissance Movement), ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন (Reformation Movement) ও ভৌগলিক আবিষ্ক্রিয়ার আন্দোলন (Geographical Discovery Movement) এর নজির। এসব ঘটনার মধ্যদিয়ে ইউরোপে বিশেষত, ইংল্যান্ডে মার্কেন্টালিজম (mercantilism) আদর্শের জয় হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইউরোপের উদীয়মান কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র[৫৫] পুরনো শাসকশ্রেণীর সামন্ত পরিবারগুলোকে শক্তি না জুগিয়ে বরং উদীয়মান শহুরে বার্গার-বণিক-বুর্জোয়া ও তাদের সহযোগী গ্রাম্য ধনী কৃষক এবং নতুন বণিকতান্ত্রিক জমিদার শ্রেণীর উত্থানের অনুকূলে নানাবিধ সংস্কার সাধন করে। এসব কারণে ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সংকট বৃদ্ধি পায়। ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণীর সাথে উদীয়মান বণিকদের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যদিয়ে ইউরোপীয় মানস পরিমন্ডলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে এবং নতুন রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে।

বিশ্ব পরিসরে নতুন বাণিজ্যতন্ত্রের উদ্ভবকালে পর্যালোচনাধীন সামন্ততান্ত্রিক মুঘল সাম্রাজ্যের বাস্তব অবস্থা কেমন ছিল? বস্তুত মুঘল সরকার ছিল বিশাল কৃষি সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষক। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নে মুঘল ভারতে ইউরোপের ন্যায় অগ্রগতি হয়নি। স্থানীয় সামন্ত শক্তির প্রভাব এবং ইউরোপীয় বণিক পুঁজির চাপে (এ দেশে আগত বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির মাধ্যমে) আঠারো শতকেও মুঘল ভারতে স্বাধীন বণিক পুঁজি বিকাশে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়নি। সাধারণভাবে বলা হয় যে, মুঘল ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও যাতায়ত সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর কার্যকলাপ বাদ দিয়ে পণ্ডিতগণ মুঘল ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং (খ) বহির্বাণিজ্য। বাজার চরিত্র অনুযায়ী[৫৬] অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়– দুরপাল্লার আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক ও স্থানীয় বাণিজ্য। এ দুশ্রেণীর বাণিজ্যেই নিয়োজিত ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর বণিক। দুরপাল্লার আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য পরিচালনা করতেন প্রধানত প্রভূত সঙ্গতিসম্পন্ন বড় বণিকরা। এরা বহির্বাণিজ্যেও অংশ গ্রহণ করতেন।[৫৭] দুরপাল্লার আন্তর্দেশীয় বিশেষ করে বহির্বাণিজ্যের সমুদ্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী বড় বড় বণিক ব্যবসায়ীদের বেশিরভাগ ছিলেন

---

[৫৩] The Hanseatic League was an economic alliance of trading cities and their merchant guilds that dominated trade along the coast of Northern Europe. It stretched from the Baltic to the North Sea and inland during the Late Middle Ages and early modern period. http://en.wikipedia.org/wiki/Hanseatic_League

[৫৪] মুসা আনসারী, *ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার ঐতিহাসিক বিকাশক্রম*, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ছয়

[৫৫] রেনেসাঁস, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ও ভৌগলিক আবিষ্ক্রিয়ার পাশাপাশি ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দেখা যায়। ইংল্যান্ডে টিউডর এবং ফ্রান্সে বুঁর্ব রাজবংশ প্রতিষ্ঠা এর নজির।

[৫৬] এ ব্যাপরে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য শেখর বন্দোপধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৫৭-৫৮

[৫৭] মুঘল যুগে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থলপথে বাণিজ্য চলত এশিয়াটিক রাশিয়া, চীন, তিব্বত এবং পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে। তবে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল সমুদ্র বাণিজ্য। গুজরাটের সুরাট, কেরল উপকূলের কালিকট, করমণ্ডলের মসুলিপত্তম এবং নিম্ন গঙ্গার হুগলি বন্দর ছিল মুঘল যুগের সমুদ্র বাণিজ্যের প্রধান প্রধান কেন্দ্র। এসব বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে ভারতীয় জাহাজ পূর্বে মালাক্কাসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন মশলা দ্বীপে, পশ্চিমে লোহিত সাগর হয়ে কায়রো ও আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দরে এবং পারস্যোপসাগরের হরমুজ, মাসকাট বন্দর হয়ে বসরা ও বাগদাদের দিকে যাতায়ত করত। কিছু কিছু গুজরাটি বাণিজ্য জাহাজ আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বিশেষত, মোম্বাসা, মালিন্দি, পেট ইত্যাদি বন্দরগুলোতেও যেত বলে জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান। তবে বেশ কয়েকজন হিন্দু, জৈন ও পারসি বণিকও ছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়াও সরকারের মহাজন এবং রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে এদের কারো কারো কিছু পরিমাণ রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল। এদের নিচের স্তরে ছিল ছোট ছোট স্বাধীন বণিক দল। এরা অল্প পুঁজি নিয়ে দুরপাল্লার অভ্যন্তরীণ অথবা সমুদ্র বাণিজ্যে অংশ নিতেন। এদের পরবর্তী স্তরে ছিল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের আঞ্চলিক ও স্থানীয় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসায়ী ও আড়তদারেরা। সবচেয়ে নিচের স্তরে ছিল যথাক্রমে স্থানীয় মহাজন, ব্যবসায়ী পণ্যসংগ্রহকারী দালাল ও পাইকার শ্রেণী এবং গ্রামাঞ্চলের ব্যাপারিরা। এসব বণিক ব্যবসায়ীদের বাইরে মুঘল যুগে আর এক শ্রেণীর ব্যাংক ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটেছিল-যারা সাধারণত 'সররাফ' বা মুদ্রা ব্যবসায়ী, 'পোদ্দার', 'মহাজন' নামে পরিচিত ছিলেন।[৫৮] একদিকে বিপুল বিত্ত অন্যদিকে তাদের উপর রাজপুরুষদের প্রয়োজনে আর্থিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদির ফলে অন্যান্য বণিক ব্যবসায়ীদের তুলনায় মুঘল দরবার ও রাজনীতিতে তাদের বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত মুঘল যুগের বিভিন্ন স্তরের বণিক ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে জানা গেল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আঠারো শতকে প্রবল অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত মুঘল ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধিতে এদর অবদান কী? সার্বিক অর্থনীতির উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের কী কোন প্রভাব পড়েছিল? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আঠারো শতকের মুঘল ভারতে কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে সম্পদের ঘাটতি যে দুরূহ অথনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে ছিল তা পুষিয়ে নেয়া যেতো যদি মুঘল রাষ্ট্রশক্তি কৃষিখাতের বিকল্প হিসাবে শিল্প ও বাণিজ্য খাতকে শক্তিশালী করতে পারতো। সমসাময়িক ইউরোপের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাদের সামনে ছিল। কিন্তু ভারতের মুঘল শক্তি সে সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারেনি। বিশ্ব পরিসরে বাণিজ্যতন্ত্রের উদ্ভবকালে বাণিজ্যের প্রতি মুঘল সামন্তশাসকদের উপেক্ষা, উদাসীনতা এবং দূরদৃষ্টির অভাব লক্ষণীয়। এমনিতেই মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃষি এবং ভূমি রাজস্ব ছিল অধিকগুরুত্বপূর্ণ। তাই মুঘল ভারতে ব্যবসা–বাণিজ্য শাসক শ্রেণীর বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। বাণিজ্যিক উন্নয়ন বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নীতিমালা মুঘল সম্রাটগণ কখনো গ্রহণ করেছিলেন এমন নজির পাওয়া যায় না। মুঘল রাষ্ট্র বণিক স্বার্থ নিয়েও খুব একটা মাথা ঘামায় নি। ফলে মুঘল রাষ্ট্রে বণিক শ্রেণী ছিল দুর্বল এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজপুরুষদের উপর নির্ভরশীল। মুসা আনসারীর মতে, মুঘল ভারতে বণিক সমাজের স্বাধীন ও স্বকীয় বিকাশ ঘটেনি বলে রাজপুরুষ সামন্ত ব্যারণদের 'সওদা-ই-খাস' ও বিভিন্ন নিপীড়নে বণিক মহাজনরা ছিল আড়ষ্ট।[৫৯] তদুপরি আঠারো শতকে মুঘল সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বণিক মহাজনদের উপর নতুন চাপ সৃষ্টি করে।

পুণশ্চ উল্লেখ্য যে, মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং পরিবর্তিত বিশ্ব বাস্তবতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং বণিক সম্প্রদায়কে শক্তিশালীকরণ ছিল সময়ের দাবি। কিন্তু মুঘল ভারতে তা হয়নি। এখানে বাণিজ্যিক উৎপাদন, বাণিজ্যিক মুলধন সৃষ্টি বা বণিক সংগঠনে কোন মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মুঘল ভারতে এক ধরণের শিল্প ঐতিহ্য ছিল। সময়ের তালে তালে এ শিল্প ঐতিহ্যের কিছুটা বিকাশও ঘটেছিল সত্য, কিন্তু এ শিল্প ছিল নিতান্তই সরল এবং তা কখনো ইংল্যান্ডের মত কারখানা শিল্প স্তরে উন্নীত হয়নি।

---

[৫৮] কে এম মহসীন, 'মুঘল আমলে ব্যাঙ্কিং' *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৪৭*, প্রথম খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২০৭

[৫৯] মুসা আনসারী, 'ভারতীয় সামন্তযুগ নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সন্ধানে' *ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, বাংলা একাঃ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমসাময়িককালে ইউরোপের উন্নয়ন ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধিবেগের মূলে ছিল বিজ্ঞান ও নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার। কিন্তু ইউরোপীয় উদ্দীপনার সাথে তুলনীয় হতে পারে এমন কোন কারিগরি ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সচেতন প্রয়াস মুঘল ভারতে দেখা যায় না। ফলে তা ভারতের প্রচলিত সনাতন উৎপাদন কাঠামোতে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা এক সরল ক্ষুদ্রায়তন ব্যবস্থার মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে। শেখর বন্দোপাধ্যায় বলেছেন,

> স্বাধীন হস্তশিল্পীর ক্ষুদ্রায়ত কুটীরশিল্পই ছিল মুঘলযুগের উৎপাদন ব্যবস্থার মূলভিত্তি। --- উৎপাদনের ক্ষেত্রে ছোট ছোট ইউনিট (unit) গুলিকে একত্রিত করে কোন মৌলিক সাংগঠনিক অথবা প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। ---- ফলে, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়লেও ক্ষুদ্রায়ত উৎপাদন ব্যবস্থা ও অপরিবর্তিত কারিগরি কৌশলের জন্য উৎপাদন ও যোগান বাড়ানো সম্ভব হয় নি।[৬০]

মুঘল ভারতে শিল্পোৎপাদনে প্রযুক্তিক উন্নয়ন ও অভিযোজন এবং মৌলিক পরিবর্তনে প্রতিবন্ধকতার কারণ সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বাধীন হস্তশিল্পীর ক্ষুদ্রায়ত কুটীর শিল্পই ছিল মুঘল যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার মূলভিত্তি। এর উৎপাদকদের পুঁজির পরিমাণ ছিল খুব কম। স্বল্প পুঁজির মালিক এই উৎপাদকদের উৎপাদন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন বা প্রযুক্তি প্রয়োগের কোন ক্ষমতা ছিল না। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বাজারের সীমিত চাহিদা এবং বাজারজাতকরণের অনিশ্চয়তার কারণে তারা অধিক পণ্য উৎপাদনে ঝুঁকি নিতেও তারা আগ্রহী ছিল না। তদুপরি যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে তাদের বেকার হয়ে যাওয়ার আশংকাও ছিল। এসব কারণে প্রাথমিক উৎপাদক শ্রেণী দেশের সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনে আগ্রহ দেখায়নি। গৌতম ভদ্র মনে করেন কেন্দ্রীভূত মূলধনের অভাব উৎপাদন ব্যবস্থায় চরিত্রগত পরিবর্তনের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক ছিল। তাঁর মতে, মুঘল বাণিজ্যে 'দাদনি ব্যবস্থা' এবং প্রাথমিক উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর উপস্থিতির ফলে মূলধন বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে এ মূলধন প্রাথমিক উৎপাদক শ্রেণীকে সংহত করতে না পারায় ক্ষুদ্রায়ত উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন চরিত্রগত পরিবর্তন আসে নি এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়নি। বাণিজ্যে লগ্নিকৃত মূলধন শুধুমাত্র কেনাবেচার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে।[৬১]

ভারতে প্রচলিত বর্ণ ব্যবস্থার (cast system) মধ্যে অনেকে উৎপাদন ক্ষেত্রে মুঘল ভারতের অপরিবর্তনশীল অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। এ মতের প্রধান প্রবক্তা ও জোরালো প্রচারক হলেন বেভর। তপন রায় চৌধুরী ও অরুণকুমার দাশগুপ্ত প্রমুখও এ মত সমর্থন করেন। এরা মনে করেন ভারতীয় বণিক সমাজ ছিল বর্ণ সংস্কারে আচ্ছন্ন। বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে ভারতে সমস্ত কারিগরি কর্মকুশলতা আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এদের মতে, নৈপুণ্যকে শিক্ষা থেকে বিযুক্ত করে, দক্ষতাকে পৃথক করে, হস্তশিল্পের অন্তর্গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করে এবং শিল্পী কারিগরদের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষকে নিয়ন্ত্রণ করে অথবা হত্যা করে এই বর্ণ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নে মারাত্মক বাধার সৃষ্টি করেছিল।[৬২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মানুষের 'বৃত্তি' ছিল ভারতে জাতি ও বর্ণ ব্যবস্থার মূল। বৃত্তি অনুযায়ী জাতি বা বর্ণ

[৬০] শেখর বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৬৬, ৭৭-৭৮

[৬১] গৌতম ভদ্র, 'মুঘল যুগে ভারতীয় বণিক' *এক্ষণ*, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৭

[৬২] ইরফান হাবিব, 'মুঘল ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাসমূহ', পৃ. ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

নিধারিত হতো এবং এর মধ্যে প্রত্যেকেরই একধরণের একচেটিয়া অধিকার ছিল। তাই ইচ্ছা করলেই কারো পক্ষে এ সামাজিক নিগড় পাল্টানো সহজ ছিল না। প্রভূত অর্থ উপার্জন করলেও একজন নিম্নবর্ণের লোকের পক্ষে তার সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদা পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। আর এ কারণেই উন্নতি করার বিশেষ তাগিদ কেউ অনুভব করত না। তাই পুরনো ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে থেকেছে। উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়নে বর্ণ প্রথার প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে হিতেশ রঞ্জন স্যান্নালসহ কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। স্যান্নালের মতে, বাংলায় বিভিন্ন সময় নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনের সাথে সাথে সেই বৃত্তিতে নিয়োজিত লোকেরা নতুন জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং জাত ব্যবস্থার চলতি কাঠামোর মধ্যেই তাদের স্থান হয়েছে। এ বক্তব্য ধর্তব্যের মধ্যে নিলে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনে বর্ণ প্রথার অন্তরায়ের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধই থাকে।

মুঘল যুগে ক্ষুদ্রায়ত উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল বিস্তৃত ও ব্যাপক। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনের জন্য উৎপাদন সম্পর্ক এবং সেই সাথে সামগ্রিক সামাজিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। সমকালীন ইউরোপে তা হলেও মুঘল ভারতে হয়নি। কারণ এখানে বণিক সমাজ ছিল দুর্বল; রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোতে প্রায় অস্তিত্বহীন। তদুপরি নানা কারণে রাজপুরুষদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় স্বাধীনভাবে কোনকিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় বণিক সমাজ উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নয়ন বা সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা না করে চলতি ব্যবস্থাতেই যতদুর সম্ভব মুনাফা অর্জনে তারা আগ্রহী ছিল।

উপরের আলোচনায় দেখা যা যে, মুঘল ভারতের বণিক শ্রেণী সমসাময়িক ইউরোপের বণিক শ্রেণীর মত উৎপাদন শক্তির প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে নি। এ সময় মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ ঘটে এবং নগরায়ণ তরান্বিত হয় সত্য, তবে বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য এবং নগরকেন্দ্রগুলোতে সামন্তীকরণ ছিল স্পষ্ট। এজন্য ইউরোপের মতো বণিক গিল্ড মুঘল ভারতে গড়ে ওঠেনি। বণিক সমাজের স্বাধীন ও স্বকীয় বিকাশ ঘটেনি বলে তারা উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন বা পণ্য উৎপাদনে গতি সঞ্চারে কোন ভূমিকা রাখত পারেনি।

উপর্যুক্ত পটভূমিকায় ব্যবসা–বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও সাংগঠনিক পরিবর্তনে সরকারের ভূমিকা আবশ্যক ছিল। কিন্তু সামন্তান্ত্রিক মুঘল সরকার সে ভূমিকা পালন করেনি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে মুঘল রাষ্ট্র সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল তা একেবারে সত্য নয়। মুঘল সম্রাট, রাজপুরুষ এবং অমাত্য মনসবদারদের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা–বাণিজ্যে টাকা লগ্নি করতেন। আমদানি- রপ্তানি বাণিজ্যে বেশ কিছু ছোট বড় অমাত্য রাজপুরুষের অংশগ্রহণেরও প্রমাণ রয়েছে। সুবাদার মিরজুমলা, সুবাদার শায়েস্তা খান ও আজিম-উস-শান প্রমুখের সওদা-ই খাস নামে একচেটিয়া ব্যক্তিগত ব্যবসার বিষয়টি কম-বেশি জানা। তবে মুঘল রাজপুরুষদের এই ব্যক্তিগত বাণিজ্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ না করে বরং সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছিল। কেননা একচেটিয়া ব্যবসা করতে যেয়ে অমাত্য রাজপুরুষরা বণিক–ব্যবসায়ীদের সাথে অনেক সময় যা করতেন, তা নিপীড়ন–নির্যাতনের পর্যায়ে চলে যেতো। এতে শুধু সাধারণ ব্যবসা–বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা নয়, তা দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাও প্রভাবিত হয়। বণিক পীড়নের মাধ্যমে সহজে মুনাফা লুটপাটের রাস্তা খোলা ছিল বলে শাসকগোষ্ঠী আর উৎপাদন সংগঠন অথবা কারিগরি ও প্রযুক্তিগত উন্নতির দিকে নজর দেয় নি এবং ইউরোপ থেকেও নতুন প্রযুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

আমদানি করারও কোনো গরজ বোধ করেনি। উৎপাদন শক্তির উদ্বোধনে দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশক্তির কাছে কোন ইতিবাচক ভূমিকা অবশ্য প্রত্যাশাও করা যায় না।

পুনশ্চ স্মরণীয় যে, মুঘল বাংলায় হস্তশিল্পেরও একরকেমর ঐতিহ্য ছিল। তবে তা সমকালীন ইউরোপের বিশেষত ইংল্যান্ডের মত কারখানা শিল্পস্তরে উন্নীত হয়নি। এ অবস্থার উন্নয়নে মুঘল সরকার যে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি সে বিষয়েও ইতোমধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে এ সময় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কিছু হস্তশিল্প কারখানা গড়ে তোলা হয়েছিল। স্বাধীন উৎপাদক শ্রেণীর হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আকার আয়তনে রাজকীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বৃহদায়তনের ছিল সত্য, তবে এসব প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য উৎপাদন করতো না। বাজারের সঙ্গে এসব কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থার কোন সংযোগ ছিল না। কর্মদক্ষ কিছু মজুরি শ্রমিক (যারা এক সময় স্বাধীন কারিগর অথবা ঠিকা-উৎপাদক ছিলেন) নিয়োগ করে এসব কারখানায় মূলত বিপুল সংখ্যক সেনাবহিনীর প্রত্যক্ষ ব্যবহার উপযোগী সামগ্রী এবং রাজপুরুষ ও সামন্ত শ্রেণীর সর্বস্তরের লোকদের চাহিদা পুরণে রুচিসম্মত শৌখিন ও বিলাস সামগ্রী প্রস্তুত করা হতো। আর এভাবেই এসব প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক তাৎপর্য একটি সীমারেখায় বাধা পড়ে যায়।[৬৩] রাষ্ট্রীয় কারখানার বাইরে অভিজাত শাসককুলের কেউ কেউ তাদের গৃহ সংলগ্ন কিছু কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। সকল রকমের সামগ্রীই তৈরি হতো এসব কারখানায়। তবে এগুলো তৈরী হতো ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এবং রাজন্যবর্গ বা তাদের সমগোত্রীয়দের উপহার হিসেবে প্রদানের জন্য। বস্তুত এগুলো অবাণিজ্যিক উদ্দেশে স্থাপন করা হয়েছিল। ইরাফান হাবিবের মতে, সামগ্রিকভাবে মনে হয় যে, অ-বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে শিল্প-কারখানা বিকশিত হলেও উন্নত পণ্য উৎপাদনের চরিত্রগত গঠনটি টাকা-খাটানো ব্যবস্থার উর্ধে একদমও এগোতে পারেনি।[৬৪] ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।

466266

বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের অভাব মুঘল যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কারখানা বিকাশের একটি বড় অন্তরায় ছিল। নানা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সাধারণভাবে মুঘল ভারতে বণিকগণ যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করতে পারতেন না।[৬৫] ফলে এমনিতেই বাণিজ্যে বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ তৈরী হয়নি। কৃষিজ উদ্বৃত্তের সিংভাগ যেতো শাসক শ্রেণীর রাজপুরুষদের হাতে। এ সম্পদ পূনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটানো যেতো। কিন্তু সম্রাট ও আমির-ওমরাহদের সীমাহীন ভোগ বিলাস এবং সঞ্চয়ের ব্যাপক প্রবণতার ফলে সাম্রাজ্যের বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের এক বিরাট অংশ অপচয় হয়ে যেতো অথবা সিন্ধুক বন্ধী হয়ে অলস টাকা হিসেবে পড়ে থাকতো। এ অর্থ পুনর্বিনিয়োগ হয়ে বাণিজ্য বিকাশ বা পণ্য উৎপাদনে কোন কাজে লাগেনি।

আলোচ্য সময়ে ইউরোপে অর্থনীতির সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধির ফলে সেখানকার শহরগলোর লক্ষণীয় শ্রীবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটেছিল। সন্দেহ নেই মুঘল ভারতে আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, আহমেদাবাদ, সুরাট. বুরহানপুর, ক্যাম্বে, হুগলী, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের মত বেশ কিছু বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল। এমনকি সতেরো শতকের প্রথমদিকেও লাহোর ও আগ্রার

---

৬৩ ইরফান হাবিব, 'মুঘল ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাসমূহ' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮

৬৪ ঐ, পৃ. ১৯৯

৬৫ বাণিজ্য পথের নিরাপত্তাহীনতা, বণিকদের সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব, সম্রাট ও রাজপুরুষদের সীমাহীন অর্থ লিপ্সা, উচ্চহারে করারোপ, সওদা-ই-খাস এ সম্পৃক্ত প্রাদেশিক ও স্থানীয় অমাত্যদের স্বাধীন বণিক ব্যবসায়ীদের কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি ছিল অন্যতম কারণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মত শহরের তুলনায় ইউরোপের বেশিরভাগ শহরই ছিল নিতান্তই অনুল্লেখ্য ও গুরুত্বহীন। কিন্তু এ শতাব্দীর শেষদিকে এসেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এ সময় ইউরোপের শহরগুলোর মত মুঘল ভারতে শহরগুলোকে আধুনিক শহরের পর্যায়ে ফেলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা ইতোমধ্যে ইউরোপের শহরগুলো নাগরিক অর্থনীতির উৎস বণিক শহরে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু মুঘল ভারতে তা হয় নি। উল্লেখ্য যে, মুঘল ভারতের বেশির ভাগ শহরই গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্রনৈতিক কারণে শাসনযন্ত্রের প্রয়োজনে। শেখর বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায়, "ইউরোপীয় শহরগুলোর মত এদের কোন অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল না। কোন শহরই বিশেষ কোন শিল্প বা craft production-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়নি। গ্রাম সমাজকে শোষণ করে এবং কৃষিজ উদ্বৃত্ত সম্পদের উপর নির্ভর করেই এগুলি টিকে ছিল।"[৬৬] বস্তুত ভারতীয় শহরবাসীরা ছিল অবিমিশ্র ভোক্তা পরজীবী, কৃষিজ উদ্বৃত্ত আত্নসাৎ করেই এরা জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন। আর এ পরজীবীরা দেশের অর্থনীতির চেহারা বদলে দিতে পারবে এমন প্রত্যাশা অলীক স্বপ্ন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখা যায় সতেরো শতকের শেষ এবং আঠারো শতকে মুঘল ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থায়ও বিপর্যয় ঘটে। তবে ব্যতিক্রম চিত্র যে ছিল না, তা নয়। আঠারো শতকে মুরাদাবাদ, বেরলি, অযোধ্যা, বেনারস ও বাংলার অর্থিক সমৃদ্ধিকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে এসব ব্যতিক্রম দিয়ে মুঘল ভারতের সার্বিক অবস্থার মূল্যায়ন করা উচিত হবে না। কাজেই মুঘল ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সাধারণ পরিস্থিতি যে সুখকর ছিল না, তাতে দ্বিমত করার কোনো কারণ নেই। আঠারো শতকের বিদ্রোহ বিপ্লবের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের আরো অবনতি ঘটে। এ সময় কৃষি সংকটের কারণে ভূমি রাজস্ব থেকে আয় কমে যাওয়ায় সামন্ত শাসকগোষ্ঠী বণিকদের শোষণ করে ঠিকে থাকার চেষ্টা করেন। ফলে দুর্বল বণিক শ্রেণী আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে উৎপাদন ও পরিবহন ব্যবস্থায় সংকট এবং বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো থেকে সরবরাহ কেন্দ্রের বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি কারণের সাথে পারস্যের রাজনৈতিক গোলযোগ এবং ইয়ামেনের গৃহযুদ্ধাবস্থা যুক্ত হওয়ায় আঠারো শতকের শেষদিকে সমুদ্র বাণিজ্যেও ভারতীয় বণিকদের অবক্ষয় দেখা দেয়। এই সুযোগে সমুদ্র বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের স্থান ক্রমশ নৌশক্তিতে বলিয়ান ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বণিক শ্রেণী সমাজ প্রগতির নিয়ামক শক্তির ভূমিকা পালন করেছিল। বাণিজ্য বিপ্লবের যুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিক সমাজ বিভিন্ন রাজবংশকে ঘিরে তাদের বিকাশ পথে এগিয়ে যায়। তাদের সহযোগিতায় ইউরোপে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং একধরণের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। কিন্তু মুঘল ভারতে তা হয়নি। ইউরোপের আধুনিক রাষ্ট বার্গার[৬৭] বণিকদের কাছ থেকে যে ধরণের বলিষ্ঠ সমর্থন পেয়েছিল, ভারতের মুঘল সরকার তা পায়নি। বণিক শ্রেণীর কাছ থেকে সহযোগিতা লাভের বিশেষ কোন তাগাদাও মুঘল রাষ্ট্রের ছিল বলে প্রতীয়মান হয় না। অবশ্য ভারতীয় বণিকদের সে সক্ষমতাও ছিল না। রাজনৈতিক তো নয়ই, কোনো

---

[৬৬] শেখর বন্দোপধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭

[৬৭] বার্গার হচ্ছে ইউরোপের উদীয়মান বণিক শ্রেণী। ধনতন্ত্রের উন্মেষপর্বে ইউরোপীয় ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের গর্ভে একটি নতুন গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এতে শহরের উদীয়মান বণিক শ্রেণী নেতৃত্ব দেয়। এদেরকে বলা হতো বার্গার। কালক্রমে এরা বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে পরিচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রকমের সামাজিক নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতাও মুঘল ভারতীয় বণিকদের ছিল না। ফলে আঠারো শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের দিনে বণিক শ্রেণী কোন কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে মুঘল রাজ শক্তির পাশে দাড়াতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে মুসা আনসারীর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: "বস্তুত স্বাধীন সামন্তবাদী দেশে স্বউদ্যোগে স্বাধীন বণিক শ্রেণীর বিকাশ না হলে দেশে প্রকৃত সমাজ বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না। এরূপ সমাজবিপ্লব ব্যতীত উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কে রূপান্তর হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সমাজে মৌলিক পরিবর্তনের আশা অলীক স্বপ্ন মাত্র।"[৬৮] মুঘল ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি ছিল তাই। ক্রমবর্ধিষ্ণু ও বহুমুখী সংকট মোকাবিলা করে মুঘল সম্রাটদের পক্ষে সাম্রাজ্যের সংহতি বেশী দিন টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশদের ভারত দখলের পূর্বেই মুঘল রাষ্ট্র কাঠামো নিজের অভ্যন্তরীণ চাপে নিজের থেকে ভেঙ্গে পড়ে।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মূলে মননের দৈন্যতা, পরিবর্তন-বিমুখতা বা উদ্ভাবনী চিন্তার অভাব এবং সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতার বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। মুঘল ভারতে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার হতো না এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই। তবে গৌরবের যুগেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চার প্রতি ভারতীয়দের অদ্ভুত রকমের অনীহা রীতিমতো বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অথচ এ সময় ইউরোপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার দ্বারা ক্রমশ উন্নতির পথে ধাবিত হচ্ছিল। কিন্তু মুঘল ভারত সে তুলনায় ছিল অনেক পশ্চাদপদ। এ সময় ভারতীয়দের চিন্তার জগতে কিছু প্রগতিশীলতার লক্ষণ হয়তো ছিল, তবে আতহার আলি ঠিকই বলেছেন এর আলোড়ন ছিল শুধুই ঢেউ তোলা। আর এ ঢেউ সমাজের সর্বস্তরকে স্পর্শ করতে পারেনি। বস্তুত মানুষের মনন পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ছিল বাঁধভাঙ্গা প্লাবনের। কিন্তু এরূপ প্লাবন সৃষ্টির মতো পরিবেশ মুঘল ভারতে হয়নি। প্রগতিমনস্ক বুদ্ধিবৃত্তি এবং যুক্তিবাদী বিজ্ঞান চর্চার ব্যর্থতার কারণে সময়ের সাথে তাল রেখে মুঘলরা তাদের রাষ্ট্র কাঠামো এবং সমাজ ও অর্থনীতিতে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারেনি। সমাজ ও বাস্তব অবস্থার মধ্যে এ সামঞ্জস্যহীণতা মুঘল রাষ্ট্র কাঠামোকে আস্তে আস্তে অবক্ষয়ের পথে ধাবিত করে।[৬৯] মুঘল সাম্রাজ্যের এরূপ অবক্ষয় ও ক্রমাবণতির পটভূমিতেই বাংলায় নবাব সরকারের প্রতিষ্ঠা।

৩.২ বাংলায় নবাব সরকার প্রতিষ্ঠা

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতির ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রক্রিয়া শুরু হয় তার সূত্র ধরে ভারতে তিন ধরণের আঞ্চলিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। (ক) স্বশাসিত উত্তরাধিকৃত রাজ্য: অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ এবং পর্যালোচনাধীন বাংলা ছিল এই শ্রেণীভুক্ত। কেন্দ্রীয় মুঘল শক্তি ক্ষীয়মান এবং শাসন বা সহায়তাদানে অক্ষম হয়ে যাওয়ার পর এ রাজ্যগুলো নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে এসব রাজ্যে মুঘল প্রশাসনযন্ত্র বহাল ছিল এবং আইনগত দিক থেকে এসব রাজ্য মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির আনুগত্য মেনে চলত। তবে প্রকৃত অর্থে এরা ছিল কার্যত স্বাধীন। (খ) সমরবাদী রাষ্ট্র (war state): এ ধরণের রাষ্ট্র শক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ মারাঠা মৈত্রীসঙ্ঘ এবং শিখ রাজ্য।

---

[৬৮] মুসা আনসারী, 'প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার আর্থ-সামাজিক বিকাশধারা' *ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, পৃ. ১৩৮

[৬৯] লক্ষণীয় যে,এ অবস্থা কেবল মুঘল ভারতেই ছিল না, বরং পূর্ব গোলার্ধের সমগ্র ইসলামী দুনিয়া জুড়েই ছিল এ বাস্তবতা। এ সময় পারস্যে সাফাভী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, মধ্য এশিয়ায় উজবেক সম্রাজ্য খন্ড- বিখন্ড হয়ে পড়ে এবং অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যেরও অবক্ষয় প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃত অর্থে এরা সামরিক ও রাজস্ব কাঠামোর ভিত্তির উপর রাষ্ট্রশক্তি নিয়োজিত করেছিল। শাসন ব্যবস্থা হিসেবে এদের উদ্ভব মুঘল সাম্রাজ্যের মুখাপেক্ষী ছিল না। অবশ্য প্রয়োজনে কখনো কখনো এরা মুঘলদের সাথে সাময়িক কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতো।[৭০] এসব রাজ্য মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থার কোনো কোনো ঐতিহ্য অনুসরণ করলেও রাজ্যগুলোর শাসন পদ্ধতি ছিল নিজস্ব ঐতিহ্য পুষ্ট। এবং (গ) সুবিন্যস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য। রোহিলা এবং জাঠ প্রভৃতি ছিল এ শ্রেণীর রাজ্যভুক্ত। হায়দার আলী এবং টিপু সুলতানের মহীশূর রাজ্য ছিল বর্ণিত তিনটি রাষ্ট্র ধারার বাইরে। এ রাজ্যটি নামেমাত্র মুঘল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল। তবে এতে মুঘল প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সংরক্ষণের একটি সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, এটি ছিল প্রথম ভারতীয় রাজ্য যেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুসরণে সেনাবাহিনী, অস্ত্র ও গোলাবারুদ নির্মাণসহ ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের প্রয়াস নেয়া হয়েছিল।[৭১]

উপরে বর্ণিত রাজ্যসমূহের মধ্যে কেবল বাংলা রাজ্যই একানে প্রাসঙ্গিক বিধায় কেবল বাংলার মধ্যেই আলোচনা নির্দিষ্ট রাখা হচ্ছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুঘলদের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতির সুযোগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কার্যত যেসব স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল, এর মধ্যে বাংলা ছিল অন্যতম। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫) রাজমহলের যুদ্ধে সুলতান দাউদ খান কাররানীর পরাজয়ের মধ্যদিয়ে ১৫৭৬ সালে বাংলা কাগজে কলমে মুঘল সম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।[৭২] প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় আকবরের সময় বাংলা বিধিবদ্ধ এবং সমন্বিত হলেও সুবাহ হিসেবে বাংলা পুর্ণতা লাভ করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.)। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিযুক্ত সুবাদার ইসলাম খান চিশতী (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.) রাজমহল থেকে ঢাকায় বাংলার রাজধানী পরিবর্তন করেন (সম্রাটের নামানুসারে নতুন রাজধানীর নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরনগর)।[৭৩] ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের চার বছরের মধ্যে ইসলাম খান বার ভুঁইয়া ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের পরাজিত করে ভাটি অঞ্চলসহ মেঘনা নদী পর্যন্ত বাংলার এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ মুঘল অধিকারে আনেন। সম্রাট শাহজাহানের আমলে হুগলি বিজিত এবং আসাম সীমান্ত পর্যন্ত বাংলার সীমা সম্প্রসারিত হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে চট্টগ্রামে মুঘল কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হলে সুবা বাংলার সীমা দাঁড়ায় উত্তরে পর্বতমালা, উত্তর পূর্বে আসামের হাজো, পূর্বে ত্রিপুরা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান, দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে বিহার।[৭৪]

---

[৭০] এম আতহার আলি, 'সাম্রাজ্যের অবসান: মুঘল প্রসঙ্গ', *মধ্যকালীন ভারত*, ইরফান হাবিব (সম্পাঃ), পৃ. ১২৫

[৭১] Muhibbul Hassan khan, *History of Tipu Sultan,* Calcutta, 1951, p.p. 344-47

[৭২] আকবরের রাজত্বকালের ২৪ বর্ষে ১৫৭৯-৮০ সালে মুঘল সাম্রাজ্যকে যে বারটি সুবা বা প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল তন্মধ্যে বাংলা ছিল অন্যতম। তবে লক্ষণীয় যে, আকবরের সময় সুবা বাংলার আয়তন এবং সীমা অত্যন্ত সীমিত ছিল। দাউদ খান পরাজিত হলেও 'বার ভুঁইয়া' নামে পরিচিত বাংলার স্বাধীনচেতা ভূমাধ্যিকারী শ্রেণী, পরাজিত আফগান সেনানায়ক এবং এমন কি বাংলায় মুঘল সৈন্যদের বিদ্রোহ ইত্যাদি কারণে আকবর সম্পূর্ণ বাংলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন। এ সময় মুঘল বাংলার সীমা ছিল মোটামুটিভাবে উত্তরে ঘোড়াঘাট, দক্ষিণ-পশ্চিমে সাতগাঁও, বর্ধমান, পূর্বে করতোয়া নদী এবং বগুড়া জেলার শেরপুর মুর্চার বরাবর একটি সমান্তরাল এলাকা এবং পশ্চিমে রাজমহল। এসময় উড়িষ্যা একটি পৃথক সুবা ছিল বটে, তবে প্রশাসনিকভাবে এটি বাংলার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল এবং এ দু'টি সুবাহ একজন সুবেদারের অধীনেই শাসিত হতো।

[৭৩] রাজধানী রাজমহল ছিল বাংলার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে। এখান থেকে সুদূর ভাটি অঞ্চলের বিদ্রোহী ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে ইপ্সিত ফল লাভ করা ছিল প্রায় অসম্ভব। তাই ইসলাম খান চিশতী রাজমহলের পরিবর্তে সুবা বাংলার মধ্যবর্তী ঢাকাকে নতুন রাজধানী হিসেবে নির্বাচন করেন।

[৭৪] আবদুল করিম, 'প্রাদেশিক শাসন কাঠামোয় সুবা বাংলা', *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ.৪০

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলে মাঝে মাঝে মগ-ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের কিছু উৎপাত ধ্বংসলীলা এবং লুঠপাটের ঘটনা ছাড়া এখানে মোটামুটিভাবে শান্তি বিরাজমান থাকায় সুবা বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব সুদৃঢ় ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে সম্রাটের দাক্ষিণাত্যে অবস্থান এবং মারঠাদের সাথে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে সম্রাটের প্রত্যক্ষ নজরদারীর অভাবে বাংলাসহ সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বাংলার সুবাদার ইব্রহিম খানের দুর্বল শাসনামলে (১৬৮৯-১৬৯৭ খ্রি.) মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহ করেন এবং উড়িষ্যার বিদ্রোহী আফগান পাঠান নেতা রহিম খানের সহায়তায় দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তার প্রভুত্ব স্থাপন করে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। অবশ্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে এ বিদ্রোহের অবসান ঘটে। শোভা সিংহের পতনের মধ্য দিয়ে পুনরায় বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয়।

সতেরো শতকের শেষ এবং বিশেষ করে আঠারো শতকের শুরুর সময়টি বাংলার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এ সময়টি ছিল ভারতে মুঘল শাসনের স্বর্ণযুগ এবং অবক্ষয় তথা পতন যুগের সন্ধিক্ষণ। এসময় বাংলার রাজনীতিতে লক্ষণীয় কিছু পরিবর্তন ঘটে। আর এসব পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলায় নবাব সরকার প্রতিষ্ঠা। বাংলায় নবাব সরকারের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি খান। ১৭১৬ সালে মতান্তরে ১৭১৭ সালে[৭৫] মুর্শিদকুলি খানের সুবেদারি পদ লাভের মধ্য দিয়ে মূলত বাংলায় নবাব সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য বাংলার রাজনীতিতে মুর্শিদকুলি খানের উত্থান আঠারো শতকের সূচনাবর্ষে অর্থাৎ ১৭০০ সালে। এ বছর তিনি বাংলায় দিউয়ান পদে নিযুক্তি লাভ করেন। এসময় বাংলার সুবাদার ছিলেন শাহজাদা আজিমউদ্দিন।[৭৬] আজিমউদ্দিন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন; তবে তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রচণ্ড অভাব ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রচণ্ড রকমের অর্থলোভী একজন মানুষ।[৭৭] সুবাদার হিসেবে তিনি এমন কতগুলো পদক্ষেপ নেন, যার ফলে বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যুগান্তকারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।[৭৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দিল্লী থেকে বাংলার

---

[৭৫] যদুনাথ সরকারের তথ্য মতে, মুর্শিদকুলি খান ১৭১৭ সালে বাংলার সুবাদর পদে নিয়োগ লাভ করেছিলেন। Jadunath Sarkar, (ed.), *History of Bengal,* vol. II, p. 407 তবে মীর্জা মোহাম্মদের *ইবারত নামা'র* বরাত দিয়ে আবদুল করিম উল্লেখ করেন যে, সুবাদার হিসেবে মুর্শিদকুলি খানের নিয়োগ হয়েছিল ১৭১৬ সালে। আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ৪৭

[৭৬] তবে তিনি আজিম-উস-শান নামেই অধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র। তাঁর পিতার নাম শাহজাদা মুহাম্মদ মুয়াজ্জম -যিনি পরবর্তীকালে শাহ আলম বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করে মুঘল সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন।

[৭৭] তাঁর অর্থ লোলুপতা সম্পর্কে সলিমুল্লাহ এবং গোলাম হোসেন সলিম উভয়ে উল্লেখ করেছেন। Salimulla, *Tarikh-i-Bangla,* EnglishTrnslation by Francies Gladwin, Calcutta,1788, p.18; গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত রিয়াজের প্রথম বাংলা অনুবাদ, কলকাতা, ১৩১২ বাং, প্রথম দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৫, পৃপৃ. ১৫৯, ১৬১

[৭৮] উদাহরণ স্বরূপ ১৬৯৮ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তাঁর প্রদত্ত নিশান বা অনুমতি পত্রের কথা বলা যায়। উক্ত নিশানে সুবেদার আজিম-উস-শান ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ষোল হাজার টাকা পেশকাশ পেয়ে ১১৯৪ টাকা ১৪ আনা ৪ পয়সা সরকারী রাজস্ব দানের শর্তে কোম্পানিকে সুতানটি, গোবিন্দপুর এবং দিহি কলকাতা নামক তিনটি গ্রামের মালিকানা সনদ দেন। এর ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় জমিদার শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত হয়। জমিদারি সত্ত্ব অর্জন করায় কোম্পানি বণিক প্রতিষ্ঠান থেকে মুঘল শাসনের অংশিদারে পরিণত হয় এবং তার সামনে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে অনুপ্রবেশের সুযোগ অবারিত হয়। প্রাদেশিক সরকারের সাথে কোম্পানির দীর্ঘস্থায়ী বিরোধেরও সূচনা হয় এখান থেকেই। C. R. Wilson, *Old Fort William in Bengal,* Vol. I , Calcutta, 1906, p. 39; W.K Firminger, *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report,* Indian Studies Series, 1962, pp. 79-81; সুবাদার হিসেবে তাঁর প্রজাপীড়নের সংবাদ ফরাসি কোম্পানির কর্মকর্তাদের লিখিত পত্রাবলীতেও উল্লেখ রয়েছে। P. Kaeppelin, *Les Origines de L' Inde Francaise;* p. 340

Dhaka University Institutional Repository

দূরত্ব এবং এখানকার আবহাওয়া মুঘল রাজপুরুষদের কাছে মোটেই পছন্দের ছিল না। তাই নিতান্ত বাধ্য না হলে কেউ বাংলায় আসতে চাইত না। রাজ পরিবারের সদস্য হয়েও আজিমউদ্দিন বাংলায় এসেছিলেন অত্যাসন্ন উত্তরাধিকার সংঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বী পিতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। তাছাড়া অর্থ-সম্পদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত মোহ ও লালসার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থায় সুবাদার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেই আজিমউদ্দিন বাংলা থেকে অর্থ উপার্জনে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। সুযোগ-সুবিধা দানের বিনিময়ে বণিকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা ছাড়াও সুবাদার তাঁর অনুগত ব্যক্তিদের মাধ্যমে জীবনধারণের অত্যাশ্যকীয় পণ্যের 'সওদা-ই-খাস' নামক একচেটিয়া (Monopoly) ব্যবসা আরম্ভ করেন।[৭৯] এর ফলে শুধু বণিক-ব্যবসায়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হননি, বরং পণ্য মূল্যবৃদ্ধির ফলে জনদূর্ভোগও বৃদ্ধি পায়। জনদূর্ভোগ লাঘবে সম্রাট আওরঙ্গজেব সুবাদার আজিমউদ্দিনকে সওদা-ই-খাস বন্ধ করার নির্দেশ দিলেও তিনি তা বন্ধ করেননি। উপরন্তু তিনি প্রাদেশিক রাজস্ব আত্মসাতের মতো গর্হিত কাজও শুরু করেছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ সম্রাট আওরঙ্গজেব বাধ্য হলেন বাংলায় এমন একজন দিউয়ান নিয়োগ করতে, যিনি শুধু সুবার প্রধান রাজস্বকর্তাই হবেন না, তিনি সম্রাটের স্বার্থ সুনিশ্চিত করার জন্য সুবাদারের উপরও তীক্ষ্ণ নজর রাখার মতো সক্ষমতার অধিকারী হবেন। অনেক বিচার বিবেচনা করে সম্রাট ১৭০০ সালের নভেম্বর মাসে এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন মুহাম্মদ হাদীকে (পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলি খান) বাংলার দিউয়ান পদে নিয়োগ দেন। তিনি দিওয়ান খয়রাত খাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

মুহাম্মদ হাদীর পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্য রয়েছে।[৮০] তবে জন্ম পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও তাঁর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত নেই। ঐতিহাসিক সলিমুল্লাহ এবং গোলাম হোসেন সলিম উভয়েই মুহাম্মদ হাদীকে একজন বিজ্ঞ, সৎ ও ন্যায়বান কর্মচারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে গোলাম হোসেন সলিমের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন:

---

[৭৯] সাওদা-ই- খাস ছিল সুবাদারের ব্যক্তিগত একচেটিয়া ব্যবসা। সুবাদার শাহ সুজা, এমনকি মীর জুমলা এবং শায়েস্তা খানও এ ধরণের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই ব্যবসার বৈশিষ্ট্য ছিল উৎপাদন স্থান অথবা আমদানির পর বন্দরেই সুবাদার নিজে পণ্য ক্রয় করতেন এবং পরে চড়া দামে দেশীয় বণিকদের নিকট তা বিক্রয় করা হতো।

[৮০] নবাবী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি খানের প্রকৃত নাম মুহাম্মদ হাদী । *মাসির-উল-উমারার* বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। হাজী শফি ইস্ফাহানি নামক এক পারস্য দেশীয় মুঘল রাজস্ব কর্মকর্তা (দাক্ষিণাত্যের প্রাদেশিক দিউয়ান) শৈশবে তাঁকে ক্রয় করে আপাত্য স্নেহে লালন পালন করেন এবং তাঁর নাম দেন মুহাম্মদ হাদী। Shah Newaz Khan, *The Maathir-ul-Umara*, Vol. I, Englis Trans. by H Beveridge, Riprint, Asiatic Society of Kolkata, Kolkata, 2003, pp. 719-720) । এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য অন্য কোন তথ্য না থাকায় যদুনাথ সরকারসহ পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ *মাসির-উল-উমারার* বর্ণনা অনুসরণ করেন। যদুনাথ সরকার অবশ্য তাঁকে দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত বলে মনে করেন। J N Sarkar (ed.) *History of Bengal* vol. II, p. 400। কিন্তু মুহাম্মদ হাদীকে নিশ্চিত করে দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান বলার মত কোন প্রমাণ নেই বলে আবদুল করিমের মত । আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ১৫। মোহাম্মদ মোহর আলীর মতে, মুহাম্মদ হাদীর পরিচয় সম্পর্কে *মাসির-উল-উমারা* এবং এর অনুকরণে পরবর্তী লেখকদের বর্ণনা নিঃসংকোচিত্তে গ্রহণ করার অবকাশ নেই। তিনি হাজী শফি ইস্ফাহানির মুঘলদের চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ, বাংলায় দিউয়ান হিসেবে মুহাম্মদ হাদীর নিয়োগের সময় তাঁর বয়স ও পারিবারিক জীবন ইত্যাদি বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁর হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম বিষয়ে প্রচলিত তথ্যের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, মুর্শিদকুলি খানের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণের বিষয়টি কোনক্রমেই সন্দেহাতীত নয়। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, দিউয়ান হিসেবে তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কারণেই সম্ভবত তাঁকে হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা মুঘল রাজস্ব প্রশাসনের ইতিহাস সবসময়ই হিন্দুদের প্রাধান্য এবং সাফল্যের খতিয়ানে ভরপুর। তবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মোহাম্মদ মোহর আলী নিজে কিন্তু এব্যাপারে স্পষ্ট করে কোন মতামত দেন নি। Muhammad Mohar Ali, *Hisory of the Muslims of Bengal,* Vol. I A, KSA, 1985, pp. 533-534. কাজেই মুর্শিদকুলি খানের আদি ও প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

> তিনি একান্ত কর্ম্মঠ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; কার্য্যশৃঙ্খলা তাহার অঙ্গ ভূষণস্বরূপ ছিল; তাহার ন্যায় কৃতজ্ঞ ও সুসভ্য রাজপুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় নাই; ... দাক্ষিণাপথের যুদ্ধ ও অবরোধের সময় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া তিনি সম্রাটের একান্ত প্রিয়পাত্র হয়েন। সম্রাট এ মিরজা মোহাম্মদ হাদিকে করতলব খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া বাঙ্গালার দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করিলেন।[৮১]

সলিমুল্লাহ এবং গোলাম হোসেন সলিমের বর্ণনা অনুযায়ী বাংলায় দিউয়ান হিসেবে নিয়োগ লাভের পূর্বে তিনি উড়িষ্যার দিউয়ান পদে কর্মরত ছিলেন।[৮২] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন একজন সুনিপুন কর্মকর্তা। রাজস্ব শাসন বিষয়ে তাঁর কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে পদোন্নতি, মনসব এবং করতলব খান উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন।[৮৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুবা বাংলা ছিল সুজলা সুফলা এবং এর প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য ছিল কিংবদন্তী তুল্য।[৮৪] তবে রাজস্ব প্রশাসনে অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি কারণে এখান থেকে রাজকোষে কাঙ্ক্ষিত অর্থাগম হতো না। এমনকি সুবা বাংলার প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অন্য সুবাহ হতে অর্থ আনতে হতো। এ অবস্থায় দিউয়ান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে করতলব খাঁন বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার আমুল সংস্কারের মাধ্যমে সুবাহ বাংলাকে একটি ঘাটতি প্রদেশ থেকে লাভ জনক প্রদেশে রূপান্তরিত করেন।[৮৫] দিউয়ান কর্তৃক গৃহীত নানা বিধি-ব্যবস্থার ফলে প্রথম বছরেই দাক্ষিণাত্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট এক কোটি টাকা রাজস্ব প্রেরণ সম্ভব হয়। তীব্র আর্থিক সংকটে নিপতিত সম্রাট দিউয়ানের কার্যকুশলতায় অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং এর ফলে তাঁর প্রতি সম্রাটের সানুগ্রহ কৃপাদৃষ্টি বৃদ্ধি পায়। বাংলার দিউয়ান হিসেবে করতলব খাঁনের নিয়োগ এবং সম্রাটের কাছে তাঁর বিশেষ গুরুত্বের বিষয়টি শুরু থেকে সুবাদার আজিমউদ্দিনের মনোপুত হয়নি। কেননা সুবাদার হিসেবে এতদিন তিনি ছিলেন বাংলার একচ্ছত্র অধিপতি। রাজপরিবারে সদস্য হওয়ায় দিউয়ানি শাসনের উপরও তিনি পুরোমাত্রায় খবরদারি করতেন। কিন্তু নতুন দিউয়ান সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ঠ এবং বিশেষ ক্ষমতাধারী হওয়ায় রাজস্ব প্রশাসনে সুবদারের অযাচিত হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় সুবাদার শাহজাদা আজিমের আশঙ্কা হয় যে, দিল্লীর বাদশাহি মসনদের জন্য আসন্ন গৃহযুদ্ধের

---

[৮১] গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, পৃ. ১৬২

[৮২] Salimulla, *Tarikh-i-Bangla,* Eng.Trns. p. 30; গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, পৃ. ১৬২; অবশ্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ৪৪তম বছরে ১৬ জামাদি-উস-সানি'র একটি *আখবারাতে উল্লেখিত তথ্য মতে*, বাংলায় নিয়োগের পূর্বে তিনি হায়দ্রাবাদের দিউয়ান এবং ইয়ালকোন্ডের ফৌজদার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

[৮৩] কোনো কোনো সূত্রে বলা হয়েছে যে, হায়দ্রবাদে কর্মরত অবস্থায় তিনি করতলব খান উপাধি পেয়েছিলেন। তবে সলিমুল্লাহ ও গোলাম হোসেন সলিমের মতে, বাংলায় দিউয়ান পদে নিযুক্তির সময় মুহাম্মদ হাদীকে করতলব খাঁন উপাধি দেয়া হয়েছিল। Salimulla, *Tarikh-i-Bangla,* Eng.Trns. p. 30; গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, পৃ. ১৬২। আবদুল করিম মনে করেন এ ব্যাপারে প্রথমোক্ত তথ্যটিই সঠিক। কেননা বাংলায় দিউয়ান পদে নিয়োগ লাভের পূর্বেই আখবারাতে তাঁকে হায়দ্রাবাদের দিউয়ান হিসেবে করতলব খাঁন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৮৪] *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থে বাংলাকে 'জান্নাত-আল-বিলাদ' বা প্রদেশসমূহের স্বর্গ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব বাংলাকে বলতেন 'জাতির স্বর্গ'। সুশীল চৌধুরী, *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৫

[৮৫] দিউয়ান করতলব খাঁন তাঁর অধীনস্থ বিশ্বস্ত কর্মচারীদের সহায়তায় 'খালিসা' ও 'জায়গির' ভূমির উৎপাদিকাশক্তি, রাজস্বের নিরিখ এবং বাণিজ্য শুল্কের একটি সম্পূর্ণ বিবরণী প্রস্তুত করেন। রাজকীয় রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্রাটের অনুমতি নিয়ে নিজামত, দিউয়ান ও প্রধান সেনাপতির জায়গির ছাড়া অন্যান্য জায়গির স্বত্ব উর্বর বাংলা থেকে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর উড়িষ্যায় স্থানান্তর করেন। এছাড়াও তিনি সুবা বাংলার জায়গিরদার ও জমিদারদের আয় শোষণ এবং নানাভাবে সরকারি ব্যয় হ্রাস করে প্রদেশের আয় বৃদ্ধি করেন।। দিউয়ান করতলব খান কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক রাজস্ব সংস্কারদি সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ.পৃ ১৮-১৯; Muhammad Mohar Ali, *Hisory of the Muslims of Bengal,* Vol. I A, pp. 526-527, গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, পৃপৃ. ১৬২-১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

জন্য বাংলা থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের যে স্বপ্ন তিনি দেখছিলেন দিউয়ান করতলব খাঁনের কারণে তা সম্ভব হবে না। তাই প্রথম থেকেই তিনি করতলব খাঁনের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। এ অবস্থায় এক কোটি টাকা রাজস্ব প্রেরণ করে দিউয়ান সম্রাটের অনুগ্রহে তাঁর কর্তব্য গণ্ডির মধ্যে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠলে শাহজাদা আজিমউদ্দিন তাঁর নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এমনকি তাঁর নিজের সুবাদারি পদ হারানোরও আশঙ্কা করেন।[৮৬] এ অবস্থায় পথের কাঁটা দিউয়ান করতলব খানকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার জন্য ঢাকার নগদী[৮৭] সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ আবদুল ওয়াহিদের সহায়তায় তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেন। তবে তাঁর এ ষড়যন্ত্রটি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় দিউয়ান প্রাণে রক্ষা পান। দিউয়ান করতলব খান সমস্ত ঘটনা সম্রাটকে অবহিত করলে সম্রাট ক্ষুব্ধ হয়ে এই হীন কাজের শাস্তি স্বরূপ সুবাদার আজিমউদ্দিনকে বাংলা ছেড়ে বিহারে চলে যাবার আদেশ দেন।[৮৮] সম্রাটের নির্দেশে সুবাদার শাহজাদা আজিমউদ্দিন সরবুলন্দ খানের তত্ত্বাবধানে তাঁর পুত্র ফররুখসিয়ারকে জাহাঙ্গীরনগরে তাঁর নায়েব হিসেবে রেখে ১৭০৩ সালে সপরিবারে বিহারে পাড়ি জমান। সম্রাটের অনুমতি নিয়ে সুবাদার তাঁর নিজের নামানুসারে পাটনার নতুন নামকরণ করেন আজিমাবাদ।[৮৯]

হত্যা প্রচেষ্টার ঘটনার পর দিউয়ান করতলব খান নিজের নিরাপত্তার জন্য জাহাঙ্গীরনগর ত্যাগ করে অন্যত্র দিউয়ানি দপ্তর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত 'মখসুদাবাদ' কে উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়।[৯০] মখসুদাবাদকে নির্বাচনের পেছনে কতগুলো বিবেচনা কাজ করেছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। প্রথমত: মখসুদাবাদ সুবাহ বাংলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং বিহার ও উড়িষ্যা থেকেও খুব দুরে নয়। সুতারাং এ স্থান থেকে সুবা বাংলাসহ আশপাশের এলাকায় নজরদারী করা সহজ ছিল। দ্বিতীয়ত: মখসুদাবাদ তুলনামূলকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও অধিক উপযোগী ছিল। তাছাড়া কাশিমবাজারে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় কোম্পানির বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হওয়ায় তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্যও মখসুদাবাদ ছিল অধিক উপযুক্ত স্থান। তৃতীয়ত: করতলব খাঁন ছিলেন প্রচণ্ড আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। দিউয়ান হিসেবে জাহাঙ্গীরনগরে তাঁর অবস্থান ছিল প্রশাসনে সুবাদারের নিচে। কিন্তু মখসুদাবাদে দিউয়ানি দপ্তর স্থানান্তরিত হলে তিনি হবেন সেখানকার প্রধান অমাত্য ও কর্ণধার। উপরন্তু

---

[৮৬] শ্যামাপ্রসাদ বসু, *মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বাংলা*, পৃ. ২৫

[৮৭] নগদ বেতন প্রাপ্ত সদবংশীয় সেনাবাহিনী। জায়গিরের পরিবর্তে এদেরকে রাজকোষ হতে নগদ অর্থে বেতন প্রদান করা হত।

[৮৮] গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, পৃ ১৬৪, Salimulla, *Tarikh-i-Bangla*, Eng.Trns. p. 36

[৮৯] আজিমউদ্দিন প্রথমে মুঙ্গের বা রাজমহলে যান এবং সেখানে কিছুদিন শাহ সুজা নির্মিত একটি প্রসাদে বসবাস করেন। তবে রাজমহল তাঁর কাছে অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হওয়ায় তিনি এ স্থান ত্যাগ করে গঙ্গাতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান পাটনায় বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। Salimulla, *Tarikh-i-Bangla*, p. 39, গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, পৃ ১৬৪

[৯০] মখসুদাবাদ চূনখালি পরগনায় গঙ্গা (ভাগিরথী) নদের তীরবর্তী হুগলি বন্দরের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে প্রচলিত সাধারণ জনশ্রুতি মতে, মুখসুদন দাস নামে এক নানকপন্থী সন্নাসী সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে অসুখ থেকে সুস্থ্য করে তোলায় সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এ স্থানটি লাখেরাজরূপে দান করেন। পরে এ সন্নাসীর নামানুযায়ী স্থানটি নামকরণ হয় 'মখসুদাবাদ'। নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কমল চৌধুরী সম্পাদিত, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, প্রথম পর্ব গ্রন্থে সংকলিত, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৫৩৪। তবে এ বিষয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, মখসুস শাহ'র নাম হতে মখসুদাবাদ নামের উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গে গোলাম হোসেন সলিমের মত হলো মখসুস খাঁ নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর নাম থেকে মখসুদাবাদের নামকরণ হয়েছে। *আইন-ই-আকবরী'র* বিবরণ অনুযায়ী বাংলার শাসনকর্তা সৈয়দ খাঁর ভ্রাতা ছিলেন মখসুস খাঁন। তিনি বাঙ্গলা বিহারে কর্মরত একজন রাজকর্মচারী ছিলেন। তবে তিনি গোলাম হোসেন সলিম বর্ণিত মখসুস খাঁ কী-না তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। টফেনথেলার মনে করেন মখসুদাবাদ সম্রাট আকবরের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বর্ণনা সঠিক হলে *আইন-ই-আকবরীতে* উল্লিখিত মখসুস খাঁ এবং গোলাম হোসেন সলিম বর্ণিত মখসুস খাঁ একই ব্যক্তি হতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

মখসুদাবাদের ফৌজদারি শাসনভারও ছিল তাঁর উপর। আর এজন্যই সম্ভবত তিনি জাহাঙ্গীরনগরের পরিবর্তে মখসুদাবাদে নিজের কর্মকেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করে সেখানে দিউয়ানি দপ্তর স্থানান্তর করেন।[৯১]

প্রদেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারী সুবাদার ও দিউয়ানের বিবাদ এবং তাদের দুজনেরই জাহাঙ্গীরনগর ত্যাগের ঘটনা বাংলার ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। শাহজাদা আজিমউদ্দিন বাংলা ছেড়ে যাওয়ায় বাংলায় সুবাদারের অনুপস্থিতির যুগের সূচনা হয়। এ অবস্থায় মখসুদাবাদে দিউয়ানি দপ্তর স্থানান্তরের বিষয়টিও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, আজিমউদ্দিনের বিহার গমনের সাথে সাথে দিউয়ান করতলব খাঁ বাংলার অলিখিত সুবাদারে পরিণত হন এবং সুবাহ বাংলার শাসনতান্ত্রিক কর্মকেন্দ্রও জাহাঙ্গীরনগর থেকে মখসুদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। জাহাঙ্গীরনগর তাঁর গৌরব হারায় এবং মখসুদাবাদ (পরবর্তিতে মুর্শিদাবাদ) বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার প্রশাসনিক ভরকেন্দ্রে পরিণত হয়।

এদিকে মখসুদাবাদে দিউয়ানি দপ্তর স্থাপন করে করতলব খান দাক্ষিণাত্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শিবিরে উপস্থিত হয়ে রাজকীয় রাজস্ব দপ্তরে বাংলার রাজস্ব হিসাব পেশ ও সম্রাটের সমীপে বর্ধিত রাজকর, জায়গিরের উপসত্ব হতে আদায়কৃত উদ্বৃত্ত টাকা এবং পেশকাস বাবদ বিরাট অংকের অর্থ পেশ করেন।[৯২] কেন্দ্রীয় দিউয়ান এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাদেরও নগদ অর্থ এবং বাংলার দুর্লভ সামগ্রী উপহার দেয়া হয়। দিউয়ান করতলব খানের এ কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট তাঁকে সম্মানজনক খেলাত, রজকীয় নিশান ও নাখড়া উপহারসহ 'মুর্শিদকুলি খাঁন' উপাধি প্রদান করেন। তাঁর মনসবও বৃদ্ধি করা হয়।[৯৩] রাজকীয় সম্মান ও উপাধিতে ভূষিত হয়ে করতলব খাঁন (এখন থেকে মুর্শিদকুলি খাঁন) নতুন উৎসাহ ও কর্মশক্তি নিয়ে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করে দিউয়ানি দপ্তর মখসুদাবাদকে 'মুর্শিদাবাদে' নামান্তরিত করেন।[৯৪] একটি টাকশাল, চেহেলচাতুন নামক একটি প্রাসাদ ও অন্যান্য কার্যালয় নির্মাণ করে মুর্শিদাবাদকে বাংলার ভবিষ্যত রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়।

---

[৯১] Jadunath Sarkar, (ed.), *History of Bengal,* vol. II, p. 404, আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃপৃ. ১৯-২০, কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল*, দেজ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ.৩২

[৯২] করতলব খান রাজস্ব বাবদ কত টাকা জমা দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে সমকালীন ঐতিহাসিক সূত্রে কোনো তথ্য নেই।

[৯৩] গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, পৃ ১৬৫

[৯৪] যদুন্যাথ সরকারের তথ্যমতে, করতলব খাঁনকে 'মুর্শিদকুলি খাঁন' উপাধি দেয়া হয়েছিল ১৭০২ সালে। Jadunath Sarkar, (ed.), *History of Bengal,* vol. II, p. 399. এ সূত্রে অনেকে মনে করেন ১৭০৩ সালে মখসুদাবাদের নামকরণ করা হয়েছিল মুর্শিদাবাদ। তবে লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো যদুনাথ সরকার মুর্শিদাবাদ নামকরণের কোন নির্দিষ্ট সন উল্লেখ করেন নি। পূর্বোক্ত গ্রন্থের অন্যত্র (p. 404) বলেছেন মুর্শিদকুলি খাঁনের উপাধি প্রাপ্তির অনেক পরে মখসুদাবাদের মুর্শিদাবাদ নামকরণ করা হয়েছিল। যদুনাথ সরকারের উপর্যুক্ত দু'টি তথ্যের মধ্যেই বিভ্রান্তি রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমত করতলব খান মকসুদাবাদে দিউয়ানি দপ্তর স্থাপন করেছিলেন সম্ভবত ১৭০৩ সালের প্রথমদিকে। এরপর তিনি দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের কাছে দেখা করতে গেলে তাঁকে মুর্শিদকুলি খাঁন উপাধি দেয়া হয়। কাজেই তাঁর এ উপাধি প্রাপ্তি ১৭০২ সালে হতে পারে না। দ্বিতীয়ত করতলব খাঁন দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসেই যে মখসুদাবাদের নামকরণ করেন মুর্শিদাবাদ অন্য অনেক সূত্র দ্বারাই তা প্রমাণিত। কাজেই এ ব্যাপারে যদুনাথ সরকারের মত সঠিক বলে মেনে নেয়া যায় না। *তারিখ -ই- বাঙ্গালা* ও *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থে মুর্শিদাবাদ নামকরণের কোন নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ নেই। তবে উভয় সূত্রে দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে মখসুদাবাদের মুর্শিদাবাদ নামকরণ এবং তথায় একটি টাকশাল নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। উক্ত টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ ১৭০৪ সালের তারিখ সম্বলিত মুদ্রা পাওয়া যায়। তাছাড়া দিউয়ান করতলব খাঁন (বর্তমানে মুর্শিদকুলি খাঁন) দাক্ষিণাত্য থেকে যখন ফিরে আসেন তখন একজন ১৭০৪ সালের গোড়ার দিকে একজনইংরেজ ভকিল তাঁর সাথে কটকে দেখা করেন বলে ইংরেজ সূত্র থেকে জানা যায়। এসব তথ্য উৎস বিবেচনায় ১৭০৪ সালেই মুর্শিদাবাদের নামকরণ করা হয়েছিল বলে। আবদুল করিমও তাই মনে করেন। আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃপৃ. ২১, ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

মুর্শিদকলি খানের প্রতি সম্রাটের অব্যাহত অনুগ্রহ বর্ষিত হওয়ায় তাঁর দায়িত্বের পরিধিও উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ১৭০৪ সালের মধ্যে মুর্শিদকুলি খাঁন উড়িষ্যা প্রদেশের সুবাদার, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের দিউয়ান এবং মখসুদাবাদ, সিলেট, মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং কটকের ফৌজদার পদ লাভ করেন। বস্তুত এসময় মুর্শিদকুলি খান বাংলায় উপস্থিত সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তায় পরিণত হন।[৯৫] সুবা বাংলায় অধস্তন কর্মচারি নিয়োগ, পদন্নোতি এবং পদচ্যুতির ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ প্রভাব ও ক্ষমতা অর্জিত হয়।[৯৬] মুর্শিদকুলি খানের উন্নতি এবং রাজানুগ্রহে ইর্ষান্বিত হয়ে রাজচক্রের অনেককেই সম্রাটের কাছে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার অনেক চেষ্টা করেন। তবে এসব অপচেষ্টা সফল হয়নি, বরং সম্রাট নতুন দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে সম্মানিত ও আরো বেশি ক্ষমতাধর করেন। সম্রাটের নির্দেশে সুবাদার আজিমউদ্দিন দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের কাছে চলে গেলে সুবাদারের অনুপস্থিতিতে মুর্শিদকুলি খান সুবাদারের কাজকর্ম দেখাশুনার দায়িত্ব পাওয়ায় কার্যত প্রশাসনে তাঁর অবস্থান আরো জোরদার হয়। তিনি সুবা বাংলার প্রশাসনিক এবং রাজস্ব ও অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন।

১৭০৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যু বরণ করলে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ভাইকে পরাজিত করে শাহজাদা মুহাম্মদ মুয়াজ্জম 'শাহ আলম বাহাদুর শাহ' উপাধি নিয়ে মুঘল সিংহাসনে আরোহন করেন।[৯৭] নতুন সম্রাটের তাঁর চার পুত্রের প্রত্যেককেই নতুন উপাধি, পদ ও উপযুক্ত জায়গির দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সম্রাট তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা আজিমউদ্দিনকে 'আজিম-উস-শান' উপাধি প্রদানসহ বাংলা ও বিহারের সুবাদার নিয়োগ করেন। তবে আজিম-উস-শান বাংলায় না এসে তাঁর পুত্র ফররুখসিয়ারকে নায়েব সুবাদার নিয়োগ দেন এবং কেন্দ্রীয় দরবারের রাজনীতির গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য স্বয়ং নিজে রাজধানীতেই অবস্থান করতে থাকেন। এক পর্যায়ে নায়েব সুবাদার ফররুখসিয়ারকেও দিল্লী দরবারে ডেকে নেয়া হলে বাংলার নায়েব সুবাদারের দায়িত্ব কার্যত মুর্শিদকুলি খানের উপর বর্তায়।[৯৮] তবে বাংলা প্রশাসনে মুর্শিদকুলি খানের এ অবস্থান ছিল নিতান্তই সাময়িক। পূর্ব শত্রুতার জের হিসেবে প্রতিশোধ পরায়ন সুবাদার আজিম-উস-শান মুর্শিদকুলি খানের কাছ থেকে একটার পর একটা রাজকীয় দপ্তর কেড়ে নেন। তবে মুর্শিদকুলি খাঁনের কর্মকুশলতা সম্পর্কে সম্রাট শাহ আলম বাহদুর শাহ যথেষ্ট অবগত ছিলেন বিধায় আজিম-উস-শান তাঁকে মুঘল প্রশাসন থেকে একেবারে বিতাড়িত করতে পারেননি। ১৭০৮ সালের ২৫ জানুয়ারি সম্রাট প্রবীণ ও বিজ্ঞ রাজকর্মকর্তা মুর্শিদকুলি খানকে বাংলা থেকে প্রত্যাহার করে দাক্ষিণাত্যের দিউয়ান পদে নিয়োগ দেন।

---

[৯৫] ঢাকায় সুবেদারের প্রতিনিধি হিসেবে ফররুখশিয়ারের উপস্থিতি মুর্শিদকুলি খাঁনের মর্যাদাকে প্রভাবিত করেনি, কারণ তাঁর এ নিয়োগ সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত ছিলনা। এটি ছিল সুবেদার আজিম-উস-শানের নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যবস্থা।

[৯৬] তাঁর সুপারিশেই সৈয়দ আকরাম খান ও সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খাঁনকে যথাক্রমে বাংলা ও উড়িষ্যায় তাঁর সহকারী হিসেবে সম্রাট নিয়োগ দেন। শুধু এ দুজনই নয়, মুর্শিদকুলি খানের সুপারিশে সম্রাট ১৭০৪ সালে তাঁর ১৪ জন আত্মীয় পরিজনকেও বাংলায় বিভিন্ন রাজপদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। বিহারে তাঁর সহকারী নির্বাচন এবং নিয়োগের অনুমতিও সম্রাট তাঁকে দিয়েছিলেন। Salimulla, *Tarikh-i-Bangla*, Eng.Trns. p. 42; গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, পৃ ১৬৫, Jadunath Sarkar, (ed.), *History of Bengal*, vol. II, p. 402 ; আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃপৃ. ২১-২২

[৯৭] জানা যায় যে, সম্ভাব্য উত্তরাধিকার সংগ্রাম এড়াতে সম্রাট তাঁর সম্রাজ্যকে পুত্রদের (তিন পুত্র শাহজাদা মুয়াজ্জম, শাহজাদা আজম এবং শাহজাদা কামবক্স) মধ্যে ভাগ করে দিয়ে একটি বিভাগপত্র প্রস্তুত করে এটি তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী হামিদউদ্দিনের এর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উত্তরাধিকার সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয় নি। কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, পৃ. ৩৪।

[৯৮] আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ২৫ , Jadunath Sarkar, (ed.), *History of Bengal*, Vol. II, p. 399

Dhaka University Institutional Repository

মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার রাজনীতি থেকে দুরে সরিয়ে দেয়ার আজিম-উস-শানের চেষ্টা সফল হয়। কিন্তু বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যায় আজিম-উস-শানের নতুন প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা ফলপ্রসু হয়নি। তাঁর নিযুক্ত রাজকর্মকর্তাদের[৯৯] মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও রেষারেষির ফলে প্রশাসনিক অরাজকতা দেখা দেয়। এ অবস্থায় আজিম-উস-শান অভিজ্ঞ মুর্শিদকুলি খানকে দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরিয়ে আনতে এবং ১৭১০ সালে বাংলার দিউয়ান হিসেবে তাঁকে পুনর্নিয়োগ দিতে বাধ্য হন। বাংলার দিউয়ান হিসেবে মুর্শিদকুলি খানকে এ পুনর্নিয়োগ দানের পিছনে তাঁর কর্মদক্ষতার বিষয়টি ছাড়াও দিল্লীর মুঘল দরবারে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও ভূমিকা ছিল বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সম্রাট বাহাদুর শাহ ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। তাঁর শারিরীক অবস্থাও ভাল ছিল না। কাজেই তাঁর আসন্ন মৃত্যু এবং এরপর সিংহাসনকে কেন্দ্র করে অনিবার্য উত্তারাধিকার সংগ্রাম সম্পর্কেও সকলে নিশ্চিত ছিল। এ অবস্থায় সিংহাসন প্রত্যাশী শাহজাদারা ক্ষমতার লড়াইয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য রাজ্যের প্রভাবশালী অমাত্য অভিজাতদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তৎপর হয়ে ওঠেন। এ পরিস্থিতিতে সিংহাসন প্রত্যাশী শাহাজাদা আজিম-উস-শান মুর্শিদকুলি খানের মত একজন রাজনীতি নিপুন অভিজ্ঞ কর্মকর্তার সহযোগিতা প্রত্যাশী হবেন তাই স্বাভাবিক। আর এজন্য বাংলায় দিউয়ান হিসেবে পুণর্নিয়োগ দানের পূর্বেই যে মুর্শিদকুলি খানের সাথে তাঁর বিরোধ মিমাংসা হয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। মুর্শিদকুলি খানের পরবর্তী কর্মকাণ্ডে তা প্রমাণিত হয়।

১৭১২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সম্রাট বাহাদুর শাহ মৃত্যুবরণ করলে আজিম-উস-শানসহ তাঁর জীবিত চার পুত্র উত্তরাধিকার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন। সিংহাসন সংক্রান্ত এ বিরোধের চূড়ান্ত নিস্পত্তির আগেই মুর্শিদকুলি খান বাংলায় আজিম-উস-শানকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে তাঁর নামে মুদ্রা জারি এবং খুৎবা পাঠ করেন।[১০০] কিন্তু আজিম-উস-শান উত্তরাধিকার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন এবং শাহজাদা মুইজউদ্দিন বিজয়ী হয়ে 'জাহান্দর শাহ' উপাধি নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। বিচক্ষণ মুর্শিদকুলি খাঁন যুদ্ধের ফলাফল মেনে নেন এবং নতুন সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁর কাছে বাংলার রাজস্ব পাঠিয়ে প্রশাসনে নিজের অবস্থান বহাল রাখেন।

জাহান্দর শাহের ক্ষমতা দখলেও সাম্রাজ্যে শান্তি আসেনি; অবসান ঘটেনি উত্তরাধিকার যুদ্ধের। নিহত আজিম-উস-শানের পুত্র ফররুখসিয়ার পাটনায় নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেয়ার ফলে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে পুনরায় গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। উল্লেখ্য যে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ইতোপূর্বে সংঘটিত দুটি গৃহযুদ্ধে সুবে বাংলা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না। কিন্তু এবার বাংলাও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বস্তুত উত্তরাধিকার লড়াইয়ে জয় লাভের জন্য ফররুখসিয়ারের জনবল ও অর্থবল দুয়েরই খুব প্রয়োজন ছিল। অনেক কষ্টে তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের[১০১] মত প্রভাবশালী অমাত্যদের নিজপক্ষভুক্ত করতে সক্ষম হন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের প্রশ্নটি তখন বড় হয়ে দেখা দেয়। এ

---

[৯৯] মুর্শির্দকুলিখানের অপসারনের পর সৈয়দ হোসেন আলী খানকে বিহারে, খান জাহান বাহাদুরকে উড়িষ্যায় এবং সরবুলন্দ খানকে বাংলায় তাঁর সহকারী হিসেবে নায়েব সুবাদার এবং জিয়াউল্লাহ খাঁন ও শমশির খাঁনকে যথাক্রমে বাংলা ও বিহারের দিউয়ান পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। জিয়াউল্লা খান মুর্শিদাবাদে এবং সরবুলন্দ খান রাজমহল ও বর্ধমানে ফৌজদারের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন।। আবদুল করিম, *মুর্শির্দকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ.পৃ.২৫-২৬, Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Vol. I A, p. 536

[১০০] The Dairy and Cosultations of the English Council in Calcutta, 25 March, 1712, আবদুল করিম, 'নবাবি আমলে রাজনীতির ধারা' *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪- ১৯৪৭*, প্রথম খণ্ড, পৃ.৭০

[১০১] সৈয়দ হোসেন আলী খান ও সৈয়দ আবদুল্লাহ খান। প্রথমজন ছিলেন বিহারের নায়েব সুবাদার আর দ্বিতীয় জন এলাহাবাদের নায়েব সুবাদার।

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় ফর্‌রুখসিয়ার মুর্শিদকুলি খানের কাছে সুবা বাংলা ও উড়িষ্যার শাহী রাজস্ব দাবি করেন। কিন্তু সম্রাট জাহান্দর শাহের প্রতি অনুগত দিউয়ান মুর্শিদকুলি খান ফর্‌রুখসিয়ারের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করলে ফর্‌রুখশিয়ারের সাথে তাঁর সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ ফর্‌রুখসিয়ার মুর্শিদকুলি খানকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে রশীদ খান কে নিয়োগ দিলে মুর্শিদকুলি খান এ নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। ফলে ফররুখসিয়ারের সাথে তাঁর যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে ফররুখশিয়ারের বাহিনী এবং তাঁর নিযুক্ত রশীদ খান নিহত হন।[১০২] তবে উত্তরাধিকার সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত ফর্‌রুখশিয়ারই জয় লাভ করেন এবং ১৭১৩ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি দিল্লীর মসনদে আরোহন করেন।

ফররুখশিয়ারের সিংহাসনে আরোহন সংবাদ শুনে মুর্শিদকুলি খান তাৎক্ষনিক তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং দ্রুত তাঁর কাছে রাজস্ব প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। এতে খুশি হয়ে সম্রাট ফর্‌রুখসিয়ার মুর্শিদকুলি খানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তাঁকে 'জাফর খান নাসিরী' উপাধি প্রদানসহ বাংলার দিউয়ান এবং উড়িষ্যার সুবাদার ও দিউয়ান পদে বহাল রাখেন। সম্রাটের শিশুপুত্র ফরখুন্দাশিয়রকে নামেমাত্র বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে মুর্শিদকুলি খানকে তাঁর নায়েব নিযুক্ত করা হয়। অল্পদিনের মধ্যে ফরখুন্দাশিয়র মারা গেলে মীরজুমলাকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করা হয়। উল্লেখ্য যে, উত্তরাধিকার যুদ্ধে মীর জুমলা ফর্‌রুখসিয়ারের বিশেষ সহযোগী ছিলেন এবং তিনি সম্রাটের সাথে দিল্লীতেই অবস্থান করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে মুর্শিদকুলি খান নায়েব সুবাদার হিসেবে সুবা বাংলার প্রশাসন পরিচালনা করেন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উত্তরাধিকার সংঘাতের সময় মুর্শিদকুলি খান ছিলেন ফর্‌রুখসিয়ারের বিরুদ্ধে এবং সম্রাট জাহান্দর শাহের সমর্থক। বাংলার রাজস্ব প্রদানের দাবিকে কেন্দ্র করে ফররুখশিয়ারের সাথে তাঁর যুদ্ধও হয়েছিল। তারপরেও সম্রাট হিসেবে ফর্‌রুখসিয়ার মুর্শিদকুলি খানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে তাঁকে স্বপদে বহাল, এমনকি সম্মানজনক উপাধি দিয়ে পদোন্নতি দেন। সলিমুল্লাহ এবং গোলাম হোসেন সলিমের বিবরণ পাঠে মনে হয় যে, সম্রাটের দরবারে মুর্শিদকুলি খানের নিয়মিতভাবে রাজস্ব প্রেরণ তাঁর স্বপদে বহাল থাকার অন্যতম কারণ। তাছাড়া সম্রাট তাঁকে একজন সৎ, নিরপেক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী হিসেবে জানতেন। বেসামরিক কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর শাসন দক্ষতার প্রমাণ ইতোমধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন। তাই সাম্রাজ্যের বিশেষ এক পরিস্থিতিতে সম্রাট ফররুখশিয়ার তাঁকে স্বপদে বহাল রাখবেন, এমনকি পদোন্নতিসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে চাইবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ফর্‌রুখসিয়ার সিংহাসনে আরোহনের পর দিল্লী দরবারের রাজনীতি নতুন মোড় নেয়। সম্রাটকে ক্ষমতা দখলে সাহায্যকারী কর্মকর্তাগণ নতুন প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। নিজ নিজ স্বার্থে তারা দরবারে দলাদলি শুরু করেন। এ সময় দরবারে প্রধান প্রধান দলগুলোর মধ্যে ছিল সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে একটি দল। তাদের প্রতিপক্ষ অন্য একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন খাজা আসেম (খান দৌরাণ) এবং কাজি ইবাদুল্লাহ। এদের বাইরে ছিল নিজাম-উল-মুলক মুহাম্মদ আজিম খানের নেতৃত্বে তুরাণী দল। এদের প্রত্যেকের প্রচুর সৈন্য ও লোকবল ছিল। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে এদের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং দলাদলির ফলে

---

[১০২] ফররুখশিয়ারের ধারণা ছিল মুর্শিদকুলি খান পরাজিত হবেন। এ অবস্থায় তিনি যেন বাংলার কোথাও আশ্রয় নিতে না পারেন ফররুখশিয়ার সে ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৩; ফররুখশিয়ার-মুর্শিদকুলি খানের মধ্যকার যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ.পৃ.৩৯-৪১

Dhaka University Institutional Repository

দিল্লীতে এক গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়।[১০৩] উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সম্রাটের জন্য প্রয়োজন ছিল দল নিরপেক্ষ ব্যক্তির সহায়তা। আর মুর্শিদকুলি খান ছিলেন এমনি একজন ব্যক্তি যিনি কেন্দ্রে ক্ষমতার রাজনীতিতে লড়াইরত কোন দলের সাথে ছিলেন না। বস্তুত তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ এবং দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশনকারী তৈমুরীয় বংশের শাসকদের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ বেসামরিক প্রশাসক। বাংলায় অবস্থান এবং কিছুদিন মুর্শিদকুলি খানের তত্ত্বাবধানে কাজ করার সুবাধে সম্রাট ফর্‌রুখসিয়ার তাঁর সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানতেন। কাজেই সাম্রাজ্যের এক বিশেষ সংকটজনক পরিস্থিতিতে নিজের প্রয়োজনেই ফররুখশিয়ার মুর্শিদকুলি খানের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন এবং তাঁকে পদোন্নতি দেন।

মুঘল ভারতের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে অভিজাত অমাত্যদের ক্ষমতার লড়াইয়ের আরেকটি বিশেষ পর্বে বাংলায় মুর্শিদকুলি খানের ভাগ্য আরো সুপ্রসন্ন হয়। কেন্দ্রীয় রাজনীতির ক্ষমতার লড়াইয়ে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন মীর জুমলা। তাই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষমতার ভরকেন্দ্র রাজধানী থেকে মীর জুমলাকে বাইরে প্রেরণের জন্য সম্রাটের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পীড়াপীড়িতে সম্রাট মীরজুমলাকে বিহারের সুবাদারের দায়িত্ব দিয়ে পাটনায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। মীরজুমলা রাজধানী ছেড়ে বাইরে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আগেই বলা হয়েছে যে, মীরজুমলাকে সম্রাট বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি রাজধানী ছেড়ে বাংলায় না এসে তাঁর প্রতিনিধি নায়েব সুবাদার মুর্শিদকুলি খানের মাধ্যমে শাসন কাজ নির্বাহ করছিলেন। তবে এবার সম্রাটের নির্দেশে তিনি রাজধানী ত্যাগে বাধ্য হন। ১৭১৫ সালে তিনি পাটনায় আসেন বটে, তবে অল্প কিছু দিন পরেই গোপনে পাটনা ছেড়ে দিল্লী চলে যান। পথিমধ্যে তিনি সুবাহ বাংলা থেকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় রাজকোষের উদ্দেশ্যে প্রেরিত রাজস্ব ছিনিয়ে নেন এবং এর একটি বিরাট অংশ তাঁর সৈন্য এবং অনুগত ব্যক্তিদের মাঝে বন্টন করে দেন। সম্রাটের নিদেশ উপেক্ষা করে পাটনা ত্যাগ এবং বিধি বহির্ভূতভাবে বাংলার রাজস্ব আত্মসাতের কথা জানতে পেরে সম্রাট ফর্‌রুখসিয়ার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং বাংলার সুবাদারি পদ থেকে মীরজুমলাকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে মুর্শিদকুলি খানকে নিয়োগ দেন। তাঁকে 'মুতামিন-উল-মূলক আলা উদ-দৌলাহ জাফর খান বাহাদুর নাসির জঙ' উপাধিতে ভূষিত এবং তাঁর মনসব সাত হাজারে উন্নীত করে তাঁকে সাম্রাজ্যের প্রধান আমিরদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই নিয়োগ লাভের ফলে মুর্শির্দকুলি খান সুবা বাংলা এবং সুবা উড়িষ্যার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদাধিকারী হন। যদুনাথ সরকারের তথ্য অনুযায়ী বাংলার সুবাদার হিসেবে মুর্শিদকুলি খানের এ নিয়োগ হয়েছিল ১৭১৭ সালে।[১০৪] তবে আবদুল করিম মনে করেন তাঁর এ নিয়োগ ১৭১৬ সালে হয়েছিল।[১০৫] যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন ১৭১৫-১৬ সালে মীরজুমলা কে পদচ্যুত করা হয়। তার মানে এই যে, যদি মুর্শিদকুলি খানকে ১৭১৭ সালে সুবাদার নিয়োগ করা হয়ে থাকে তবে নিশ্চিতভাবে এক বছর বাংলার সুবাদারি পদ শূন্য ছিল। তিনি মনে করেন তাও হওয়া অসম্ভব ছিল না, কিন্তু মীর জুমলার পদচ্যুতির পরপরই যে মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছিলেন এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় মির্জা মুহাম্মদের *ইবারতনামায়*। তাছাড়া আবদুল করিম মনে করেন, ১৭১৭ সালে সম্রাট ফর্‌রুখসিয়ার যখন ইংরেজ কোম্পানিকে সনদ

---

[১০৩] দিল্লী দরবারের সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য সতীশচন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১৪৭-২১৬

[১০৪] Jadunath Sarkar (ed.), *History of Bengal*. vol. II, p. 407

[১০৫] আবদুল করিম, *মুর্শির্দকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ৪৭

দান করেন, তখন নিশ্চিতভাবে মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদার ছিলেন। এ সব তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আবদুল করিম ১৭১৬ সালে মুর্শিদকুলি খান সুবা বাংলার নাজিম বা সুবাদার পদে নিয়োগ লাভ করেছিলেন বলে মনে করেন।

১৭১৯ সালে প্রভাবশালী অমাত্য সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে সম্রাট ফররুখসিয়ার নিহত হন। এরপর স্বল্প সময়ের জন্য রাফি -উদ-দারজাৎ (১৭১৯) এবং রাফি-উদ-দৌলাহ (১৭১৯) মুঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জুন মাসে রাফি-উদ-দৌলাহর মৃত্যর পর মুহাম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের এ দ্রুত পরিবর্তনের কোন প্রভাব বাংলায় পড়েনি। এসময় মুর্শিদকুলি খান স্বপদে বহাল থাকেন। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানীতে বিপ্লবজনিত বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সময় মুর্শিদকুলিখান তাঁর শাসিত প্রদেশগুলোতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হন। এ সাফল্যকে ঐতিহাসিকগণ মুর্শিদকুলি খানের অসাধারণ কৃতিত্ব হিসেবে দেখছেন।

মুর্শিদকুলি খান ছিলেন মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তি কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার শেষ সুবাদার। এরপর বাংলার সুবাদারি পদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। আর এ সুবাদাররা কেন্দ্র থেকে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করতেন না। তাঁর উত্তরাধিকার ভিত্তিতে বা বাহুবলে ক্ষমতা দখল করে পরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি আদায় করতেন। দুর্বল মুঘল কেন্দ্রীয় সরকার আনুষ্ঠানিক আনুগত্য এবং নিয়মিত বার্ষিক রাজস্ব লাভের বিনিময়ে নামসর্বস্ব সার্বভৌম ক্ষমতার সুখস্মৃতি নিয়ে বাংলায় ক্ষমতাদখলকারী সুবাদার-নাজিমদের ক্ষমতার বৈধতা দিতেন। এভাবে মুর্শিদকুলি খানের সুবাদার পদ লাভের মধ্য দিয়ে আঠারো শতকের বাংলায় এক বিশেষ শাসন যুগের সূচনা হয়-যা বাংলার ইতিহাসে 'নবাবী আমল' বা 'নবাব সরকার যুগ' নামে পরিচিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাহজাদা আজিম-উস-শানের সুবাদারি শাসনামলে সুবা প্রশাসনের কেন্দ্রীয় দপ্তর ঢাকা থেকে পাটনায় স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলায় অনুপস্থিত সুবাদারি শাসনের ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল। এ সময় থেকে বাংলায় অনুপস্থিত সুবাদারের পক্ষে একজন নায়েব সুবাদার বাংলার বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করতেন। মুর্শিদকুলি খানের সুবাদারি লাভের মধ্যদিয়ে অনুপস্থিত সুবাদারের ঐতিহ্য শেষ হয়। বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদারি একই লোকের হাতে ন্যস্ত হয়। মুর্শিদকুলি খান প্রকৃত অর্থে এ সুবাদারি শাসনকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করেন। তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের সময় থেকে এ সুবাদারি শাসন মসনদ বা সিংহাসনে পরিণত হয় এবং এতে পর্যায়ক্রমে সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.), সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০ খ্রি.), আলিবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) এবং সিরাজ -উদ-দৌলাহ (১৭৫৬-১৭৫৭) প্রমুখ অধিষ্ঠিত হন। ১৭৫৭ সালে পলাশী বিপ্লবে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার ইতিহাসের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নবাবী শাসনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের ইতি ঘটে।।

৩.৩ নবাব সরকারের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য

ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইনতঃ ও তত্ত্বগতভাবে বাংলার নবাব সরকার ছিল দিল্লীর মুঘল সরকারের সার্বভৌমত্বাধীন। তবে এই সার্বভৌমত্বের দাবি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সম্রাটদের নামে মুদ্রা জারী, খুৎবা পাঠ এবং বার্ষিক রাজস্ব প্রেরণের মাধ্যমে মুর্শিদকুলি খান এবং তাঁর উত্তরসূরী নবাবগণ মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে তাদের সার্বভৌমত্বের আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখতেন। তবে সার্বভৌমত্ব স্বীকারের পূর্বোক্ত প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্য অনুসরণ করলেও বাংলার নবাবগণ কার্যত স্বাধীন শাসকের মতোই শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। নিজস্ব

Dhaka University Institutional Repository

পরিসীমার মধ্যে শাসন ব্যাপারে বাংলার নবাবগণ ছিলেন সর্বেসর্বা। মুঘল সম্রাটের আদেশ-নির্দেশ বাস্তবায়নে তাদের মধ্যে বাধ্যবাধকতার বহিপ্রকাশ দেখা যায় না।[১০৬] বস্তুত কর্তৃত্বের প্রশ্নে নবাবী যুগে বাংলায় দিল্লীর মুঘল সম্রাটগণ ছিলেন "de-jure sovereign" বা আইনত সার্বভৌম এবং নবাবগণ ছিলেন "de-facto sovereign" বা কার্যত সার্বভৌম শাসক।

মুঘলদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌম শাসন যুগে অন্যান্য সুবার মতো বাংলা প্রশাসনের শীর্ষ বেসামরিক কর্মকর্তা সুবাদার বা নাজিম নিয়োগ হতো দিল্লী থেকে। বাংলায় নবাব সরকারের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি খান ছিলেন দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত শেষ নাজিম-সুবাদার। মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদারি শাসনকে মসনদ বা সিংহাসনে রূপান্তরিত করেন এবং এর পর থেকে নাজিম বা নবাব পদ লাভ উত্তরাধিকার সূত্র বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জনের রীতি-ঐতিহ্য চালু হয়। অবশ্য ক্ষমতা লাভের পর বাংলার নবাবগণ আইনগত সার্বভৌম কর্তৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কেন্দ্রীয় মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক সনদ লাভের বিষয়টি উপেক্ষা করতেন না। সম্রাটের কাছ থেকে স্বীকৃতি সনদ আদায়ের পিছনে সম্ভবত নবাবদের ভারতীয় জনগনের একটি মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার প্রতি সম্মান জানানোর বিষয়টি বিবেচনায় ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুঘলরা তখন ভারতীয় রাজনীতিতে একটি অবক্ষয়ী শক্তি হলেও ভারতীয় জনমানসে তখনও মুঘল সম্রাট বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন।[১০৭] কাজেই মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে সনদ লাভের মাধ্যমে নবাবগণ জনসমক্ষে নিজের সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। তাছাড়া নবাবী যুগে মসনদকে কেন্দ্র করে রাজপুরুষদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ঘটনাও ঘটে। এ অবস্থায় সম্রাটের কাছ থেকে স্বীকৃতি সনদ আদায়ের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন নবাবগণ নিজের ক্ষমতাকে বৈধ ও আইন সম্মত করার চেষ্টা করতেন। শুধু স্বীকৃতি সনদ নয় জনসমক্ষে সম্মান বৃদ্ধির জন্য বাংলার নবাবগণ দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে নিজেদের জন্য বড় বড় খেতাব এবং 'নওবত' বা বাধ্য বাজার অধিকারও আদায় করতেন। স্বীকৃতি সনদ, খেতাব বা নওবতের অধিকার প্রদানের বিষয়গুলো নাম সর্বস্ব বা কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও এসব প্রদানের মাধ্যমে সম্রাটগণ নবাবদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ ও মূল্যবান উপঢৌকন আদায় করতেন। আর অর্থের লোভে সম্রাট কর্তৃক একই সময়ে একাধিক ব্যক্তিকে স্বীকৃতি সনদ প্রদানের নজিরও রয়েছে।[১০৮]

কার্যত স্বাধীন হলেও নবাবী যুগে বাংলায় মুঘল প্রশাসনিক রীতি-ঐতিহ্য বহাল ছিল। পিড়ামিডের মতো নিটোল ও সুবিন্যস্ত প্রশাসনের শীর্ষে ছিল নবাবের অবস্থান। তবে শাসন ব্যাপারে নবাব সর্বেসর্বা হলেও একটি সামরিক-বেসামরিক আমলা বাহিনী নবাবের শাসন সহযোগী হিসাবে কাজ করতেন। মুঘল সরকারের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ যুগে বাংলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়োগস্থল ছিল দিল্লীর দরবার। কিন্তু নবাবী যুগে প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের

---

[১০৬] দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, মুঘল সম্রাট কর্তৃক সমকালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানিকে প্রদত্ত ফরমানের কথা বলা যেতে পারে। কোম্পানিসমূহ বাংলার নবাবদের মুঘল সম্রাটের সার্বভৌমত্বাধীন শাসক হিসেবে ফরমান বাস্তবায়নের দাবি জানালেও নিজেদের স্বার্থানুকূল না হলে বাংলার নবাবগণ যে সম্রাটের ফরমান বাস্তবায়নে সম্মত হতেন না অনেক নজীর রয়েছে।

[১০৭] আঠারো শতক নয়এমনকি উনিশ শতকের মধ্যভাগে সিপাহী বিদ্রোহের সময় মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে (১৮৩৭-১৮৫৭ খ্রি.) হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতীয় জনতার ঐক্যের প্রতীক হিসেবে গ্রহণের মধ্যেও এ সত্য প্রতিভাত হয়।

[১০৮] মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-১৭৫৯ খ্রি.) কর্তৃক নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর প্রতিদ্বন্দ্বী পুর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙকে স্বীকৃতি সনদ দান এর অন্যতম দৃষ্টান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগ কর্তৃত্ব নবাবদের হাতে বর্তায়। এ সময় উত্তর ভারত হতে কর্মকর্তাদের আগমন প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলা প্রশাসনে বহিরাগতদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের অবসান ঘটে এবং প্রশাসনে স্থানীয় বাঙ্গালিরা প্রবেশের সুযোগ পায়। মুঘল সুবাদারি যুগে যা ছিল অকল্পনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলার নবাবদের কেউ বাঙ্গালী ছিলেন না। মুর্শিদকুলি খান ছাড়া নবাবদের কারো পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ভারতেও ছিল না। তারা ছিলেন পারসিক-আরব বংশোদ্ভুত। নবাবী পূর্ব যুগে বাংলায় নিয়োগ লাভকারী সব সুবাদারই বহিরাগত ছিলেন। তবে এদের সাথে বাংলার নবাবদের একটি পার্থক্য ছিল। সুবাদারগণ দায়িত্ব পালন শেষে দিল্লী চলে যেতেন, নবাবী যুগে বাংলার মসনদ বংশগত হয়ে যাওয়ায় নবাবগণ বাংলার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়। ফলে বাংলার সাথে তাদের নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বাংলার নবাব সরকার ছিল সমরতান্ত্রিক সামন্ত স্বৈরাচারী সরকার। জন সমর্থন এ সরকারের শক্তিভিত্তি ছিল না। নবাবদের ক্ষমতা লাভ বা ক্ষমতাচ্যুতির সাথে জনতার কোনো সম্পৃক্ততা দেখা যায় না। তবে এটিও পরিলক্ষিত যে, শুধু বাংলা নয়, আলোচ্য যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের কোথাও সাধারণ জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বা সরকার সংশ্লিষ্টতা ছিল না। তখনকার দিনে রাজনীতি ছিল রাজা-রাজড়া বা সমাজের উপর তলার মানুষের ব্যাপার। বাংলার ক্ষেত্রেও এ বাস্তবতা দেখা যায়। ভারতীয় মুঘল ঐতিহ্য অনুসরণে বাংলার নবাবদের মধ্যেও সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীলতা পরিলক্ষিত হয়। প্রশাসনের উপরিকাঠামোর অমাত্য এবং সামরিক শক্তির উপর বিশেষ নির্ভরতার কারণে নবাবী যুগে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে জনমতের বিশেষ তোয়াক্কা করা হতো না।

ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও প্রসাদ-ষড়যন্ত্র নবাব সরকার যুগের একটি বৈশিষ্ট্য। নবাবী মসনদ লাভের জন্য সুজাউদ্দিন খানের সাথে পুত্র সরফরাজ খানের দ্বন্দ্ব, নবাব সরফরাজ খানের সাথে আলিবর্দী খানের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আলিবর্দী খানের মসনদ অধিকার এবং সিরাজ-উদ-দৌলাহর সাথে দেশী-বিদেশী শক্তির সংঘাত এবং পরিণামে পলাশীর বিপ্লব সংঘটন- এ সবই ছিল প্রসাদ-ষড়যন্ত্রের ফসল। তবে এসব ষড়যন্ত্র এবং এর ফলে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে এতে বাংলার সাধারণ জনতা কোনো সংশ্লিষ্টা দেখা যায় না। রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে সাধারণ জনগোষ্ঠী সবসময় ছিল নির্মোহ-নির্লিপ্ত ।

পূনশ্চ উল্লেখ্য যে, নবাব সরকার যুগে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু দিল্লী থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে বাংলায় ক্ষমতার বিন্যাস ও সামাজিক শক্তিকাঠামোতেও বেশ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আর এ পরিবর্তন বাংলার রাজনীতি ও ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরবর্তী আলোচনায় এসব বিষয় স্পষ্ট হবে।

আলোচ্য অধ্যায়ের সার্বিক আলোচনা শেষে এক থা বলা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে যে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় সতোরো শতকের আশির দশক পর্যন্ত এ সাম্রাজ্যে গৌরবোজ্জ্বল প্রভা সারা ভারতবর্ষকে আলোকিত করে রেখেছিল। তবে এর পর থেকেই উপরে বর্ণিত নানা জটিল ও ঐতিহাসিক কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ভাঙ্গন দেখা দেয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল রাষ্ট্রশক্তির অন্তঃসারশূন্যতার ফলে আঠারো শতকের গোড়ার দিকে মুঘল সাম্রাজ্যে সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থদ্বন্দ্ব, কেন্দ্রের সাথে সুবার বিরোধ এবং জায়গিরদারি ও কৃষি ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান সংকটের ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ-বিপ্লব দেখা দেয়ায় মুঘল সাম্রাজ দ্রুত অবক্ষয় ও

ক্রমাবনতির দিকে ধাবিত হয়। ফল স্বরূপ মুঘল ভারতের রাজনীতিতে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রক্রিয়া শুরু হয় তার সূত্র ধরে মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যে সব আঞ্চলিক রাষ্ট্র শক্তির অভ্যুদয় ঘটে পর্যালোচনাধীন বাংলা ছিল এর অন্যতম। কেন্দ্রীয় মুঘল শক্তি ক্ষীয়মান এবং শাসন বা সহায়তাদানে অক্ষম হয়ে যাওয়ার পর সুবাদার মুর্শিদকুলি খান বাংলা প্রশাসনে নিরকুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলার সুবাদারি শাসনকে মসনদে রূপান্তর ও নিজামত পদকে বংশগত ও উত্তরাধিকারে পরিণত করেন। এর ফলে বাংলায় যে শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা 'নবাবী শাসন' নামে পরিচিত। প্রকৃতিগত দিক থেকে অযোধ্যা ও নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদের মতো নবাব শাসিত বাংলাও ছিল একটি স্বশাসিত উত্তরাধিকৃত রাজ্য। বাংলার নবাব সরকার দিল্লির মুঘল সম্রাটের আইনগত সার্বভৌমত্ব (“de-jure sovereignty) মেনে চলত বটে, তবে প্রকৃত অর্থে তারা ছিল কার্যত স্বাধীন এবং নবাবগণ নিজেদের কার্যত সার্বভৌম শাসক (de-facto sovereign) হিসেবেই গণ্য করতেন। নবাবী আমলে উত্তরাধিকার সূত্রে মুঘল প্রশাসনিক রীতি ঐতিহ্য বহাল ছিল সত্য, তবে কার্যকারিতার দিক থেকে এতে অনেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছিল। আর এখানেই নবাবী যুগে বাংলার বিশেষত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

নবাব সরকার যুগে বাংলার সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণীসমূহ

মানব সভ্যতার বিকাশক্রম অনুধাবণ করার জন্য এখন ইতিহাসে সামাজিক শ্রেণীসমূহের অধ্যয়ন নানাবিধ কারণে গুরুত্ববহ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সভ্যতার বিবর্তনে সামাজিক শ্রেণীসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানব সমাজের গঠন ও সামাজিক বিকাশ জানতে পারলেই সভ্যতার বিবর্তনে সামাজিক শ্রেণীসমূহের ভূমিকা অনুভব ও তাদের মূল্যায়ন করা সম্ভব। বস্তুত এরূপ ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করতে পারলেই ইতিহাসের অভিমুখ, এর ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং এই অর্থেই ইতিহাস হয়ে উঠে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নবাবী বাংলার সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণীসমূহের সামগ্রিক অধ্যয়ন ও গবেষণা এখনো বিশেষ হয়নি। নবাবী বাংলার ইতিহাস নিয়ে এ যাবত যত গবেষণা হয়েছে, তার প্রায় সবই রাজনীতি, প্রশাসন ও কৃষি- অর্থনীতি নিয়ে। উপাদান-উপকরণের অভাব ও সীমাবদ্ধতা যে নবাবী বাংলার সামাজিক ইতিহাস বিষয়ে স্বল্প গবেষণা ও লেখালেখির কারণ, সে বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করার কোনো কারণ নেই। অবশ্য পর্যাপ্ত না হলেও ঐ সময়কার বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির নথি-পত্র, কোম্পানির কর্মকর্তাদের স্মৃতিচারণ, ডায়রি ও ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদিতে নবাবী বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ সমস্ত উপকরণের বেশিরভাগই এখন নথিবদ্ধ এবং গবেষকদের ব্যবহার উপযোগী।[১] অপ্রতুল হলেও বাংলা সাহিত্যেও তৎকালীন কিছু সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়। এসব উপাদান ব্যবহার করে কেউ কেউ আঠারো শতকের প্রথমার্ধের বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের উপর আংশিক আলোকপাত করেছেন।[২] তদুপরি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের অবকাঠামোর মধ্যেও এ যুগের সামজিক ইতিহাসের উপাদান অনুসন্ধানের অবকাশ রয়েছে। নবাবী বাংলার সমাজকাঠামো ও সামাজিকশক্তিসমূহের পার্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষেণে আলোচ্য অধ্যায়ে উপরে বর্ণিত তথ্য-উৎসগুলোর যথার্থ ব্যবহারের প্রচেষ্টা থাকবে।

৪.১ নবাবী বাংলার সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস

নবাবী বাংলার সমাজকাঠামো ও সামজিক শ্রেণীসমূহ গঠনকাঠামোর স্বরূপ সন্ধানের পূর্বে সমাজ, সমাজকাঠামো ও সামাজিক স্তর বা শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা প্রাসঙ্গিক। সমাজ (society), সমাজকাঠামো (social structure) এবং সামাজিক স্তর বা শ্রেণীর (social stratification or class) সর্বজন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা

---

[১] এসব উপরকরণের উল্লেখযোগ্য কিছু বিবরণ আলোচ্য অভিসন্দর্ভের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

[২] Sukumar Bhattachrya, *The East India Company and the Economy of Bengal, 1704-1740*, Caltutta, 1960; N. K. Singh, *The Economic History of Bengal*, 3 vols. Calutta; K. N. Chawdhury, *The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660-1760*, Cambridge, 1978; Sushil Chaudhury, *Trade and Commercial Organization in Bengal, 1650-1720*, Calcutta, 1975; *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757*, New Delhi, 2000; সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭)*, কলকাতা, ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারণ একটি জটিল ও দুরূহ ব্যাপার। কেননা আজ পর্যন্ত এসব বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীগণ সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য (universally acceptable) সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারেননি। সমাজ, সমাজকাঠামো ও সামাজিক স্তর বা শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতদের বিতর্কের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এখানে মূখ্য বিষয় নয়, তাই এ বিষয়ে মোটা দাগে কিছু সাধারণ আলোচনা করা হবে। সমাজবিজ্ঞানীদের কারো কারো মতে, 'সমাজ' অর্থ কতক অনুভূতিক্ষম ও পারস্পরিক মানসিক সূত্রে আবদ্ধ একই জাতীয় জীবের সমষ্টি।[৩] এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজ বলতে কেবল মানুষের সমাজকে নয় সমগ্র জীবজগতের অনভূতিক্ষম প্রাণীর সমাজকে বুঝানো হয়েছে। তবে সমাজবিজ্ঞানে প্রধানত মানব সমাজের উপরই বেশি জোর দেয়া হয় এবং আমাদের বিবেচ্য বিষয়ও তাই। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কাজের মাধ্যমে কতক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই মানুষ সমাজ গড়ে তোলে। সমাজবিজ্ঞানী বুশী (Bushee) কতক উদ্দেশ্য চরিতার্থে সংগঠিত ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিকে 'সমাজ' বলে মনে করেন।[৪] ম্যাকাইভার মনে করেন, মানুষ যে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে জীবনধারণ করে, তাদের সংগঠিতরূপই হলো 'সমাজ'।[৫] বর্ণিত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায় যে, 'সমাজ' হচ্ছে একটি জনসমষ্টি, যে জনসমষ্টি অন্তর্নিহিত মানসিক বন্ধনে আবদ্ধ। Oxford Dictionaries Online (World English) এ বলা হয়েছে- Society is " the community of people living in a particular country or region and having shared customs, laws, and organizations."[৬] অন্য কথায়:

> A society is a group of people related to each other through persistent relations, or a large social grouping sharing the same geographical or virtual territory, subject to the same political authority and dominant cultural expectations. [৭]

উপরের প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ থেকে সমাজ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। এ পর্যায়ে সমাজকাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। কেননা সমাজের গড়ন ও প্রকৃতি সম্পর্কে জনার জন্য সমাজকাঠামো সম্পর্কেও ধারণা থাকা আবশ্যক। শুধু তাই নয় কোনো দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পুর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবনের জন্যও সে দেশের সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে অধ্যয়ন জরুরি। কেননা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রপঞ্চ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক কাঠামো বলতে কী বুঝায়, এক কথায় তার উত্তর দেয়া অসম্ভব। কেননা এ ব্যাপারে সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী মরিস গিনস্‌বার্গর (Morris Ginsberg)- এর ভাষ্যমতে, সামাজিককাঠামো হলো প্রধান প্রধান জনগোষ্ঠী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌগিক বিন্যাস- "the complex of principal groups and institutions."[৮] মার্কসবাদীরা সামাজিককাঠামো বলতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের সম্পর্ককে বুঝায়।[৯] ব্রিটিশ

---

[৩] নাজমুল করিম, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*, নবম প্রকাশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৩

[৪] ঐ, পৃ. ১৬

[৫] ঐ, পৃ. ১৫

[৬] *Oxford Dictionaries Online (World English,* http://oxforddictionaries.com/definition/society

[৭] *Wikipedia*, the free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Society

[৮] Morris Ginsberg, *Studies in Sociology*, London, 1932; উদ্ধৃতি নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৬

[৯] নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

নৃবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (Radcliff Brown)-এর মতে, সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কই (-- all social relations of person to person) হচ্ছে সামাজিককাঠামো।[১০] কেউ কেউ মনে করেন সামাজিককাঠামো হচ্ছে মূলত একটি সমাজ বাস্তবতা যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে। সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ সামাজিককাঠামোর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন:

> Social structure is a term applied to the particular arrangement of the inter-related institutions, agencies and social patterns as well as the statuses and roles which each person assumes in the groups[১১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সামাজিককাঠামোর সংজ্ঞায়নে সমাজবিজ্ঞানীদের বর্ণিত মতামতসমূহের কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ এবং তর্কাতীত নয়। কাজেই কোনো একজন বা কোনো মতাদর্শে বিশ্বাসী সমাজবিজ্ঞানীদের একটি মতামতকে গ্রহণ করে সামাজিককাঠামোর কোনো বোধগম্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। নজরুল ইসলাম প্রচলিত মতামতসমূহের সমন্বয়ে সামজিককাঠামো সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন এ প্রসঙ্গে তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে:

> সমাজে জনগণের পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠান, তাদের ক্রিয়াকর্ম অথবা পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা (inter-related acts of peoples or interaction system) দ্বারা যে সুসংঘবদ্ধ, জটিল ও নিবিড় সমন্বজাল সৃষ্টি হয়, সংক্ষেপে তাকেই সামাজিককাঠামো বলা হয়।[১২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একটি সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোর সাথে কতগুলো বিষয় জড়িত থাকে, যথা: (ক) সমাজের বিভিন্ন উপ-গোষ্ঠীসমূহ (Sub-groups); এরা সমন্বমূলক নিয়মাচার দ্বারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত; (খ) বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা (Roles of various types); এরাও উপরিউক্তভাবে সম্পর্কযুক্ত; (গ) উপ-গোষ্ঠী ও ভূমিকাসমূহকে নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক 'নিয়মাচার'(Regulative norms); এবং (ঘ) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ (Cultural values) ।

সামাজিক স্তর বা শ্রেণীবিন্যাস সমাজকাঠামোর একটি সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য, তাই এ পর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলো। উল্লেখ্য যে সামাজিক স্তর বা শ্রেণীবিন্যাসও একটি জটিল সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়। এর সাথে আপেক্ষিকভাবে সামাজিক সাম্য ও অসাম্য, ন্যায় ও অন্যায়ের মতো কতগুলো সামাজিক প্রশ্ন ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এজন্য এ প্রত্যয়টি সামাজিক আদর্শগত ও নৈতিক বিতর্কে এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে সমাজ বিবর্তনের কোন পর্বেই স্তর বিন্যাস শূন্য কোন সমাজের অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ কোন সমাজই 'শ্রেণীবিহীন' বা 'স্তর-শূন্য' নয় (no society is 'classless' or 'unstratified.')।[১৩] সমাজবিজ্ঞানী সরোকিনের মতে, 'প্রকৃত সমতাসম্পন্ন স্তর বিন্যাসবিহীন সমাজ একটি অতিকথন মাত্র।'[১৪] নাজমুল করিম উল্লেখ করেছেন, সামাজিক জীবনের অতি আদি পর্যায়েও যখন মানুষের ভেতর কেবল যূথ (horde) জীবন আরম্ভ হয়েছে,

---

[১০] মোঃ নজরুল ইসলাম, *রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, পুথিঘর লিমিটেড, ১৯৮৭, পৃ. ২৪

[১১] 'Social Structure and Social System', http://nos.org/331courseE/L7%20SOCIAL%20STRUCTURE%20AND%20SOCIAL%20SYSTEM.pdf

[১২] মোঃ নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

[১৩] নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৪; মোঃ নজরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪

[১৪] উদ্ধৃতি রঙ্গলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

দলপতির আবির্ভাব হয়নি, তখনো কোনো না কোনো প্রকারের স্তর বিভাগ দেখা যায়।[১৫] এসব বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, অতীতে যেমন স্তর-বিন্যাস বা শ্রেণীহীন সমাজ ছিল না, বর্তমানেও নেই, তেমনি ভবিষ্যতেও স্তর বা শ্রেণীবিন্যাসহীন সমাজের কথা কল্পলোকে সম্ভব হলেও, বাস্তবে সম্ভব নয়। তবে এ কথা সত্য যে, ইতিহাসের সকল পর্বে সকল সমাজের শ্রেণীবিন্যাস অভিন্ন ছিল না। আদিম সমাজের স্তর বিন্যাস যেমন সহজ ও সরল ছিল, মধ্যযুগে তা ছিল না। আর আধুনিক যুগে এ সামাজিক শ্রেণী বিভাজন আরো জটিলরূপ ধারণ করেছে। দেশ ভেদে এমন কি একটি দেশেই শহর ও গ্রাম সমাজের স্তর-বিন্যাসের মধ্যেও রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। উল্লেখিত বিশ্লেষণ পর্যালোচনাধীন নবাবী বাংলার সামাজিক স্তর বা শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বস্তুত সামাজিক স্তর বা শ্রেণীবিন্যাস বলতে সমাজস্থ লোকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃতভাবে দীর্ঘস্থায়ী বিভাজন বা শ্রেণী বিভাগকে বুঝায়। সামজিক শ্রেণীর চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভি আই লেনিন বলেছেন, 'শ্রেণী হলো কতগুলো বৃহৎ সামাজিক গোষ্ঠী, ইতিহাস নিদৃষ্ট উৎপাদনে যারা বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে, উৎপাদনের উপকরণের সাথে যাদের সম্পর্ক ভিন্ন, সামাজিক শ্রম সংগঠনে যারা আলাদা, সম্পদ আহরণ এবং সম্পদ ভোগে যারা স্বতন্ত্র। সামাজিক আর্থিক চিত্রে ভিন্ন অবস্থানের জন্য যারা একে অন্যের শ্রমার্জিত ফল ভোগ করতে পারে।'[১৬] লেনিনের এ বক্তব্যের মূল কথা হচ্ছে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন গোষ্ঠীই শ্রেণী। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, লেনিন মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণী সম্পর্কিত তাঁর এ ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন। বস্তুত সামাজিক শ্রেণী বা স্তর-বিন্যাসের উৎপত্তি এবং এর পিছনের নিয়ামক শক্তি প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত বেশ কিছু তত্ত্ব রয়েছে। আর এসব তত্ত্বের মধ্যে প্রধান একটি তত্ত্ব হচ্ছে 'মার্কসবাদী তত্ত্ব' (Marxist Theory)। এ বিষয়ে অপর গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি হচ্ছে 'ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব' (Functionalist Theory)।[১৭] সমাজের শ্রেণী ধারণা যাঁর লেখায় অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করেছে, তিনি হলেন জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস (Karl Marx, ১৭১৮-১৮৮৩ খ্রি.)। শ্রেণী সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও অভিমতের সুসংহতরূপই সামাজিক শ্রেণী বা স্তর বিন্যাস সম্পর্কিত মার্কসবাদী তত্ত্ব নামে পরিচিত। মার্কসের মতে, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস সমাজের কোন স্বাভাবিক (Natural) প্রবণতা নয়, বরং এটি কৃত্রিম এবং মানুষের সৃষ্টি। তিনি বলেন, আদিম সাম্যবাদী সমাজে কোন শ্রেণী ছিল না। সে সমাজে ভূ-সম্পত্তিসহ সকল সম্পদ যৌথ মালিকানাভুক্ত ছিল এবং উৎপাদন উপকরণের উপরও সমাজস্থ সকলের সমান অধিকার ছিল। উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীও সমবণ্টন হতো।[১৮] মার্কসের মতে, সমাজ বিকাশের যে পর্বে সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানার উৎপত্তি, ঠিক সেই পর্বেই সামাজিক শ্রেণীর আবির্ভাব। শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলেই সমাজে 'অসমতা' (inequality) দেখা দেয় এবং মানব সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্তর বিন্যাসের সূত্রপাত হয়। তাঁর মতে, সামাজিক শ্রেণী বিভাজনের মানদণ্ড হচ্ছে অর্থনীতি। তিনি সামাজিক

---

[১৫] নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪

[১৬] V. I. Lenin, *Collected Works*, vols. 29, Moscow, 1969, p. 421

[১৭] সমাজবিজ্ঞানী C. Owen তাঁর *Social Stratification* গ্রন্থে এ দু'টো তত্ত্বের বাইরে আরো কয়েকটি তত্ত্বের কথা বলেছেন, কিন্তু T. B. Bottomore আলোচ্য দু'টো তত্ত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। T. B. Bottomore, *Sociology: A Guide to Problems and Literature*, Unwin Books, London; মোঃ নজরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮০

[১৮] দ্রষ্টব্য মোঃ নজরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮০

শ্রেণী নির্ধারণে দুটি নিয়ামক উপকরণের উপর জোর দিয়েছেন। এর একটি হল সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অপরটি উৎপাদন ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত সম্পর্ক। মার্কসের মতে, পুঁজিবাদী সমাজ প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা- বুর্জোয়া (Bourgeoisie) ও প্রলেতারিয়েত (Proletariat)। এ প্রধান দু'টি শ্রেণীর বাইরে মধ্যবর্তী শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও মার্কস সচেতন ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত *Capital: Critique of Political Economy* (১৮৬৭) গ্রন্থে[১৯] 'ত্রিবিধ শ্রেণী পদ্ধতি' (Three Class System) সম্পর্কে তিনি অলোচনাও করেছেন, তবে সে বিষয়ে খুব বেশি গুরুত্ব দেননি। কার্ল মার্কসের মতে, সমাজে যারা উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণের মালিক তারাই বুর্জোয়া শ্রেণী এবং তারই সমাজের শাসক ও শোষক। অন্যদিকে যারা উৎপাদনের উপকরণের মালিক নয় বরং শুধু শ্রমের যোগানদাতা, মার্কসের মতে, তারাই প্রলেতারিয়েত এবং সমাজে শাসিত এবং শোষিত। মার্কসের মতে, সমাজে এ শ্রেণী দুটির স্বার্থ পরস্পর বিরোধী এবং এদের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব অনিবার্য।[২০] আর এ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজ গতিশীল হয়।

সামাজিক শ্রেণী বা স্তর বিন্যাসের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি হচ্ছে ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব। সমাজবিজ্ঞানী কিংসলী ডেভিস (Kingsly Davis) ও উইলবার্ট-ঈ-মুর (Wilbert E. Moore) এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা। এই তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের মূলে রয়েছে ব্যক্তির কর্ম। অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন কাজ এবং বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িতদের সম্মান, ক্ষমতা ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা সমাজস্থ জনগণের মধ্যে অসমতা ও শ্রেণী বৈষম্য তৈরি করে। ক্রিয়াবাদীদের মতে, এরূপ শ্রেণী বিভাজন সার্বজনীন ও অপরিহার্য। এরূপ সামাজিক স্তর-বিন্যাস পরিহার করা সম্ভব নয়।[২১]

সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে উপর্যুক্ত দুটি তত্ত্ব পর্যালোচনা করে একথা বলা যায় যে, এই দুটি তত্ত্বের কোন তত্ত্বই পর্যাপ্ত, নির্ভুল ও সার্বজনীন নয়। বস্তত দুটি তত্ত্বেরই অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কেবল অর্থনৈতিক মানদণ্ডের নিরিখে যেমন সকল সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ব্যাখ্যা করা যায় না, তেমনি কেবল কর্মের ভিত্তিতেই সকল সমাজে স্তর বিন্যাসের উদ্ভব হয়নি। এজন্যই কেবল এই দুটি তত্ত্বের ভিত্তিতেই সকল সমাজের শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে একথাও মনে রাখতে হবে যে, দুটি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পটভূমিকায় মার্কসবাদী ও ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের সৃষ্টি। বস্তুত মার্কসীয় তত্ত্বটি উনিশ শতকের ইউরোপীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের পটভূমিতে এবং ক্রিয়াবাদী তত্ত্বটি বিশ শতকের শুরুর দিককার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ বাস্তবতার নিরিখে উদ্ভূত। এই অবস্থায় মার্কসবাদী বা ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের আলোকে পর্যালোচনাধীন নবাবী বাংলার সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস ও এর বিশ্লেষণ দুরূহ। এ দুটি তত্ত্বের আলোকে আঠারো শতকের ক্ষয়িষ্ণু ধ্বংসোন্মুখ সামন্ততান্ত্রিক নবাবী বাংলার সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

---

[১৯] জার্মান ভাষায় লিখিত গ্রন্থটির মুল শিরোনাম *Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie,* Verlag von Otto Meisner, 1867

[২০] মোঃ নজরুল ইসলাম,*পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৭৩, ৮০, ৮১

[২১] উদ্ধৃতি মোঃ নজরুল ইসলাম,*পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৮৪-৮৬

Dhaka University Institutional Repository

অনেক ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী বর্ণভিত্তিক (Cast based) সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের কথা বলেন। তারা মার্কসীয় দর্শনের শ্রেণী ও ভারতীয় বর্ণ প্রথাকে সমার্থক বলে মনে করেন।[২২] এদের মতে ভারতীয় বর্ণ ব্যবস্থা সামাজিক শ্রেণী ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বর্ণ শ্রেণীরই প্রকারভেদ মাত্র। তাদের মতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা সমাজের সুবিধাভোগী উচ্চ শ্রেণী এবং বৈশ্য ও শুদ্ররা হলে সুবিধাবঞ্চিত নিম্ন শ্রেণী। এ মতের জোরালো বিরোধিতা করারও অবকাশ রয়েছে। কেননা। মার্কসবাদীদের মতে, সমাজে সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী এবং এ কারণে এদের মধ্যে শ্রেণী দ্বন্দ্ব বা সংঘাত অনিবার্য। কিন্তু বর্ণভিত্তিক সমাজে কোনো শ্রেণী দ্বন্দ্ব থাকেনা। কাজেই মার্কসবাদীদের সামাজিক শ্রেণী বিভাজনের সাথে ভারতীয় বর্ণভিত্তিক সমাজের তুলনা চলে না।[২৩]

সমাজ গঠনে ধর্ম ও ধর্মীয় জীবনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ধর্ম ও ধর্মীয় জীবন এবং ধর্মীয় দর্শন ও অনুশাসন একটি সমাজের কাঠামো গঠনে অনেকখানি ভূমিকা রাখে বলে পণ্ডিতদের কেউ কেউ মনে করেন।[২৪] আমাদের আলোচ্য কালপর্বে বাংলা সমাজকাঠামো ছিল বহুমাত্রিক। বহু জাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাংলার সমাজ গড়ে ওঠেছিল। তবে হিন্দু ও মুসলমান ছিল সমাজের প্রধান দুই সম্প্রদায়। সংখ্যায় অল্প হলেও ইউরোপীয় ও আর্মেনিয় খ্রিস্টান সমাজের লোকেও ছিল। জাতিগত দিক দিয়ে এখানে বাঙ্গলির বাইরে রাজপুত, মাড়োয়ারি, কাশ্মিরী, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, আরব, ইরানি, তুর্কি ও পাঠানদের বাস ছিল।

হিন্দু সমাজের চারটি বর্ণের কথা আমরা জানি। তবে এই চার বর্ণের মধ্যকার মাঝের দুটি বর্ণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাংলার হিন্দু সমাজে ছিল না।[২৫] *বৃহদ্ধর্ম পুরাণ* এবং *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে*র সাক্ষ্য অনুযায়ি বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ ও শুদ্র এ দুই বর্ণের উপস্থিতি দেখা যায়। তবে এ দুই বর্ণকে ঘনসন্নিবিষ্ট স্তরহীন সামাজিক গোষ্ঠী বলা যাবে না। কেননা প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই বহু উপগোষ্ঠী ছিল। এই দুই বর্ণের মধ্যে সব মিলিয়ে উপগোষ্ঠী বা জাতির সংখ্যা ছত্রিশ ছিল বলে জানা যায়। ব্রাহ্মণরা ছিল হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত। তবে ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যেও শ্রেণী বিভক্ত ছিল, যথা রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী ও কন্যাকুব্জ। কৌলিন্যের নিরিখেও বাহ্মণরা পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল- কুলীন, শোত্রীয়, গৌণকুলীন, বংশজ ও সপ্তশতী।[২৬] এদের মধ্যে ওঠা বসা, খাওয়া-দাওয়া এবং বিবাহ শাদিতে বিধি-নিষেধ ছিল। বাংলার হিন্দু সমাজে শুদ্ররাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুদ্ররা প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত ছিল - (ক) উত্তম সঙ্কর বা জলচল

---

২২ বি এন দত্ত, এম এন শ্রীনিবাস, নর্মদেশ্বর প্রসাদ প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতবর্গ এমতের সমর্থক। Nirmal Kumar Bose, *Culture and Society of India*, p. 239

২৩ বর্ণের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণী বিভক্তির সমর্থকরা বলে থাকেন যে, সুবিধাভোগী উচ্চ শ্রেণী সুপরিকল্পিতভাবে মিথ (Myth) তৈরির মাধ্যমে সমাজ জীবনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা ও অমোঘতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করে রাখায় এবং কর্মফল, ভাগ্যনির্ভরতা ও জন্মান্তরবাদের প্রচার প্রসারের মাধ্যমে শ্রেণী সংঘাতের সম্ভাবনা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্ণ প্রথার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সুবিধার কথাও উল্লেখ করা হয়। উল্লেখ্য যে, বৃত্তি বা পেশা দিয়ে হিন্দু সমাজের বর্ণ বা সামাজিক স্তর নির্দিষ্ট হতো। বর্ণ সেই গোষ্ঠীর জন্য জীবিকা নিরাপদ ও নিশ্চিত রাখতো। আর এ কারণেই বর্ণ ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় বলেও অনেকে মনে করেন। ধনের অসম বন্টনে সামাজিক অসন্তোষ দুর করার জন্য উচ্চ শ্রেণী বিভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক পালা পার্বনে প্রচুর দান-ধ্যানের ব্যবস্থা করতেন। এতে ধন বৈষম্য কিছুটা দুর হতো বলে উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ হতো না বলে তারা মনে করেন। Nirmal Kumar Bose, *op. cit.*, p. 240; সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫

২৪ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২

২৫ W W Hunter, *The Annals of rural Bengal*, Vol. I, London, 1883, p. 111-112; Amitav Mukharjee, *The Transformation of Cast: Modern Bengal*, p. 67

২৬ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

শূদ্র; বৈদ্য ও কায়স্থরা ছিল এ শ্রেণীভুক্ত, (খ) মধ্যম সঙ্কর শুদ্র বা জলঅচল শুদ্র এবং (গ) অধম সঙ্কর বা অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য শুদ্র। বৈদ্যরা পাঁচ এবং কায়স্থরা আবার ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল।[২৭]

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিন্দু সমাজের বর্ণ বা স্তর বিন্যাসের মূল ছিল বৃত্তি বা পেশা। কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও কবি গঙ্গারামের রচনাবলি থেকে তখনকার বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণ ও জাতিসমূহের বৃত্তি বা পেশা সম্পর্কে জানা যায়। প্রধান বর্ণ ব্রাহ্মণদের পেশা ছিল প্রধানত অধ্যয়ন, বেদ, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায় ও দর্শন চর্চা এবং পুজা-অর্চনায় পৌরহিত্য করা। বৈদ্যরা প্রধানত চিকিৎসা এবং ক্ষেত্র বিশেষে কাব্য ও ব্যাকরণ চর্চাও করতেন। কায়স্থরা সাধারণত প্রশাসনিক কাজ কর্মের সাথে যুক্ত হতেন। নবাবী যুগে বাংলার রাজস্ব প্রশাসনে তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল। শুদ্ররা শ্রেণী ভেদে নানা পেশায় যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে হিন্দু সমাজে বর্ণ পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তবে তাদের মধ্যে বৃত্তি বা পেশা পরিবর্তন অসম্ভব ছিল না। অবশ্য বৃত্তি পরিবর্তনের সুযোগ তুলনামূলকভাবে উচ্চবর্ণের মধ্যেই বেশি ছিল। অপেক্ষাকৃত কম হলেও অন্য বর্ণের লোকদের মধ্যেও বৃত্তি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। বৃত্তি পরিবর্তনের এ সংবাদ ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যে পাওয়া যায়। তবে পুনশ্চ বলা প্রয়োজন যে, বৃত্তি পরিবর্তন কোনোক্রমেই হিন্দু সমাজের বর্ণ পরিবর্তনের নির্দেশক বলে গণ্য হতো না। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় হিন্দু সমাজের বর্ণ প্রথা খুব কঠোর ছিল না। এ কারণেই হিন্দু সমাজের মধ্যমণি হয়েও ব্রাহ্মণরা সামাজিক সম্মান, গৌরব ও প্রতিপত্তি একচেটিয়াভাবে ভোগ করতে পারতেন না। নিম্নবর্ণের হওয়া সত্ত্বেও বৈদ্য ও কায়স্থরা সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তিতে ব্রাহ্মণদের সাথে ভাগ বসাতে পেরেছিল।

নবাবী আমলে বাংলার জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ ছিল মুসলমান। কাঠামোগতভাবে বাংলার মুসলমান সমাজ ছিল হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা। প্রাথমিক মুসলিম শাসনামলে বাংলার মুসলিম সমাজে শ্রেণী বিদ্বেষ ছিল না। সমাজতত্ত্ববিদ নাজমুল করিম মনে করেন বাংলার মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এখানকার মুসলিম সমাজকাঠামোতে এক মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁর মতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা শুধু স্বাধীনতা হারায় নি, তার স্বকীয়তাও হারিয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী বাংলার মাটি ও মানুষের সাথে একাত্ম হতে না পারায় সামাজিক বিভেদ ও বৈষম্যহীন বাঙ্গালি মুসলিম সমাজে প্রকট শ্রেণী বিভেদের বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। মুঘল শাসকগোষ্ঠী বাংলার সামাজিক কাঠামোর অঙ্গীভুত হতে পারেনি বলেই স্বধর্মীয় হওয়া সত্ত্বেও বাংলার স্থানীয় মুসলমানদের তারা আপন করে নিতে পারেন নি।[২৮] আর এভাবেই মুসলিম সমাজও সামাজিক শ্রেণী বিদ্বেষ দ্বারা কলুষিত হলো। বিদেশাগত মুসলমানরা নিজেদের 'আশরাফ' বা 'শরীফ' বলে প্রচার করে স্থানীয় বাঙ্গালি মুসলমানদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা বাংলার কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য সাধারণ বৃত্তিধারী মুসলমানদের 'আতরাফ' এবং একবারেই

---

[২৭] বৈদ্যরা পঞ্চকোটী, রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও পূর্বকূল এবং কায়স্থরা উত্তর রাঢ়অ, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র, শ্রীহট্টী ও দায়স কায়স্থী উপ-বিভাগে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণদের মতো তাদের মধ্যেও কুলীন ও অকুলীন বিভাজন ছিল। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১৬-১৭

[২৮] নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১৫৬, ১৫৭, ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নবৃত্তির লোকদের 'আরজল' বা পতিত অভিধা দিয়ে মুসলিম সমাজকেও বর্ণভেদের কাঠমোবদ্ধ করে ফেলে।[২৯] উল্লেখ্য যে, আশরাফ শ্রেণী গঠিত হয়ে ছিল আরব, পারস্য, মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তান থেকে আগত শেখ, সৈয়দ, তুর্কি, পাঠান ও মুঘলদের নিয়ে। অসি ও মসী ছিল তাদের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন। কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্যের সাথে তাদের খুব একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আতরাফ মুসলমানদের মধ্যে একটি অংশ ছিল মিশ্র শ্রেণীর। বিদেশাগত মুসলমান এবং এদেশীয়দের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্কের ফসল ছিল এ মিশ্র শ্রেণী। আতরাফদের মধ্যে এদেরকে অভিজাত হিসেবে গণ্য করা হতো। এ শ্রেণীর মুসলমানেরা বৃত্তি হিসেবে ব্যবসা ও শিল্প বাণিজ্যকে বেছে নিয়েছিল। আতরাফদের বৃহত্তর অংশ ছিল স্থানীয় ধর্মন্তরিত মুসলমান। এরা ধমান্তরণের আগে যে পেশায় নিয়োজিত ছিলেন ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও সে বৃত্তিকেই অবলম্বন করেছিলেন।

জন্ম, বৃত্তি বা পেশাভিত্তিক বিভেদ বিভাজনের বাইরে নবাবী আমলে বাংলার মুসলমান সমাজ ধর্মমতের দিক থেকে শিয়া ও সুন্নি- এ প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। মুর্শিদকুলি খান ছাড়া নবাবদের সকলেই ছিলেন শিয়া। নবাবী আমলে পারস্য এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলায় বহুসংখ্যক শিয়া মুসলমানের অভিবাসন সত্ত্বেও তারা ছিল সংখ্যা লঘিষ্ট। মুসলমানদের মাত্র এক ষষ্টাংশ ছিল শিয়া মতাবলম্বী।[৩০] তবে এদের মধ্যে কোনো ধর্মীয় বিরোধ ছিল বলে তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবত এ জন্যই সমকালীন বাংলার প্রসিদ্ধ দুই কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ও রাম প্রসাদের বাংলার সামাজিক গঠন সংক্রান্ত আলোচনায় শিয়াদের বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই।

হিন্দুদের বর্ণ প্রথার মতো কঠিন না হলেও আমাদের আলোচ্য কালপর্বে বাঙ্গালি মুসলিম সমাজের আশরাফ, আতরাফ ও আরজলদের মধ্যকার ভেদাভেদ চোখে পড়ার মতো ছিল। তাদের মধ্যে স্বাভাবিক সামাজিক মেলামেশা পর্যন্ত বলতে গেলে ছিল না। তাদের মধ্যকার পাস্পরিক সম্পর্ক ছিল অনেকটাই প্রভূ-ভৃত্যের এবং দেনা-পাওনার সম্পর্ক। একারণেই তাদের মধ্যে প্রকৃত মানবিক ও সহজ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। মুসলিম সমাজে এর নেতীবাচক ও বিষময় অনিষ্টকর প্রভাবের কথা আবু জাফর শামসুদ্দিন স্পষ্ট করেই বলেছেন।[৩১]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণ হলো অনুভূমিক কতগুলো সামাজিক গোষ্ঠী, যারা কখনো একে অন্যের স্থান গ্রহণ করে না। এ ব্যবস্থায় সমাজের এক শ্রেণীর লোকের দুয়ার অন্য শ্রেণীর জন্য বরাবরই রুদ্ধ থাকে। জন্ম ও বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণের দুর্গ প্রায় দূর্ভেদ্য হয় বলে বর্ণভিত্তিক সমাজে কোনো গতিশীলতা (social mobility) থাকে না। কাজেই বর্ণের নিরিখে নবাবী বাংলার সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস বিচার-বিশ্লেষণও ও যথাযথ হবে না। কেননা নবাবী বাংলার সমাজ গতিহীন নিশ্চল ছিল তা বলার কোনো অবকাশ নেই।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে নবাবী বাংলার সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের সঠিক চিত্র অনুসরণে আমাদের ভিন্ন পদ্ধতি ও মতবাদের অনুসন্ধান করতে হবে। সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ সমাজের ধন বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজকে উলম্ব রেখায় ভাগ করতে প্রয়াসী। এ মতানুযায়ী উলম্বরেখায় বিভক্ত সামাজিক শ্রেণীগুলো একে অন্যের ওপর

---

[২৯] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২২

[৩০] সৈয়দ গোলাম হেসেন খান তবাতবায়ি, *সিয়ার-উল-মুতখ্খিরিন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩; সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২৬

[৩১] নওয়াব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর, *মুসলিম বাঙ্গলা আমার যুগে*, বাংলা অনুঃ আবু জাফর শামসুদ্দিন, দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৮, ভূমিকা, পৃ. আট

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়িয়ে থাকে। এরূপ সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে সমাজস্থ লোকদের শ্রেণী গণ্ডী অতিক্রম করা সহজ হয়। ফলে সামাজিক কাঠামোতে গতিশীলতা (mobility) বজায় থাকে। নবাবী বাংলার সমাজকাঠামো অনুধাবন ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে ধন বৈষম্য ভিত্তিক এরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে। তবে এ দিক থেকেও নবাবী বাংলার শ্রেণী বিন্যাসে পণ্ডিতমহলের নানা মত রয়েছে। ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি মধ্য আঠারো শতকের বাংলার ধন বৈষম্য ও সামাজিক মর্যাদার দিকে লক্ষ রেখে সমাজকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। এ শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী অভিজাত শ্রেণী প্রথম, গ্রামীণ সম্পন্ন ভূস্বামীরা দ্বিতীয় এবং আপামর জনসাধারণ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত।[৩২] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, আঠারো শতকের বাংলার বহুমাত্রিক (Plural Society) সমাজ বিন্যাসের বিষয়টি বিবেচনায় রাখলে সৈয়দ গোলাম হোসেনের এ শ্রেণী বিভাজনকে বাংলার সমাজ ও শ্রেণীবিন্যাসের একটি অতিসরলীকরণ বলে মনে হয়।[৩৩] কোন কোন ঐতিহাসিক মুসলিম বাংলার জনগোষ্ঠীকে প্রধান দুটি সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন (ক) সুবিধভোগী অভিজাত শ্রেণী এবং (খ) সাধারণ শ্রেণী।[৩৪] নবাবী বাংলার ক্ষেত্রে এ শ্রেণী বিন্যাসও সন্তোষজনক নয়। কেননা এতে সামাজিক বিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। তাছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্বও এখানে স্থান পায়নি।

সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ আঠারো শতকের প্রথমার্ধের বাংলার সমাজকাঠামো আলোচনা প্রসঙ্গে একটি পিরামিডাকৃতির সমাজের কথা বলেছেন।[৩৫] এ সমাজ কাঠামোর শীর্ষদেশে নবাব এবং সর্বনিম্নে সাধারণ মানুষের অবস্থান। নবাবের নীচে বাংলার প্রভাবশালী অভিজাত সম্প্রদায়। আর এ অভিজাত সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক রাজকর্মচারী, সেনাধ্যক্ষ এবং প্রভাবশালী জমিদারগোষ্ঠী নিয়ে। অভিজাত সম্প্রদায়ের নিচে ছিল গ্রামীণ সম্পন্ন ভূ-স্বামী, মহাজন-ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী-বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী প্রভৃতি কর্মচারী। আর শেষ স্তরে বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠী -যাদের মধ্যে আছে কৃষক, কারিগরসহ বিভিন্ন অনুল্লেখ্য বৃত্তির কর্মজীবী মানুষ। আঠারো শতকের নবাবী বাংলার সমাজ-বাস্তবতায় উপর্যুক্ত শ্রেণী বিন্যাস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তবে এক্ষেত্রেও কিছুটা সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ে। উপরের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে মহাজন ব্যবসায়ীদের অভিজাত সম্প্রদায়ের নিচের অবস্থানে দেখানো হয়েছে। মুঘল সুবাদারি শাসন পর্যন্ত এ বিন্যাস অনেকাংশ গ্রহণযোগ্য। কেননা সুবাদারি যুগের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত সামাজিক মর্যাদায় বণিক ব্যবসায়ীরা অভিজাত উচ্চ শ্রেণীতে নিজেদের ঠাঁই করে নিতে পারেনি। সামাজিক দুর্বলতার কারণে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেনি।[৩৬] মধ্য এশিয়া থেকে আগত মুঘল শাসকদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে বিশেষ কোন ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা না থাকায় এ ব্যাপারে তদের কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতেও দেখা যায়নি। ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে তাদের বিশেষ কোনো আগ্রহও ছিল না, এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যকে তারা কোন

---

[৩২] সৈয়দ গোলাম হেসেন খান তবাতবায়ি, *সিয়ার-উল-মুতখ্খিরিন*, ৩য় খণ্ড, পৃ.১৯৯

[৩৩] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

[৩৪] W H Moreland, *India at the death of Akbar*, reprint, Delhi, 1962, p.25

[৩৫] 'মুঘল বাংলার জমিদার' শীর্ষক নিমাই সাধন বসুর বেতার বক্তৃতা; উদ্ধৃতি গোলাম রব্বানী, *উপনিবেশ পূর্ব বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৩

[৩৬] Kumkum chatterjee, *Merchants, Politics, and Society in Early Modern India: Bihar, 1733-1820*, E J Brill, 1996. p.65

Dhaka University Institutional Repository

সম্মানজনক পেশা বলেও মনে করতেন না। অবশ্য আস্তে আস্তে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। তবে (সুবাদারি যুগে) মীরজমুলা, শায়স্তা খানের মতো রাজপুরুষদের 'সওদা-ই-খাস' নামে একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রভাবে সে সময় পেশাধারী বণিক সওদাগরা ছিলেন অনেকটাই নিস্প্রভ। ফলে রাষ্ট্র ও সমাজ বিন্যাসে তাদের উচু স্থান লাভ সম্ভব হয় নি। নবাবী আমলে রাজপুরুষদের সওদা-ই-খাস লক্ষণীয়ভাবে কমে যায়। পেশাধার বণিকদের 'সওদা-ই-আমে'র বিকাশ ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে এ বণিকরা অভিজাততন্ত্রের অর্ন্তভুক্ত হয় এবং নবাবী রাষ্ট্রের অর্ন্তদেশ পর্যন্ত তাদের গভীর প্রভাব সঞ্চারে সক্ষম হয়।[৩৭]

নবাবী বাংলার সমাজ ছিল সামন্ত সমাজ।[৩৮] সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজা সমাজের চূড়াবিন্দুতে অবস্থান করেন। তিনি পদমর্যাদা ও ক্ষমতার দিক থেকে এক অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। উপরের বর্ণনায় নবাবী বাংলার যে সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস দেখা গেল তাতে অন্যান্য সামন্তসমাজের মতো নবাবই ছিলেন সমাজের শীর্ষ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু। নবাবের পরেই সমাজে অভিজাত শ্রেণীর স্থান। আর এ অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠেছিল রাষ্ট্রের পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ অমাত্য, প্রভাবশালী ভূ-স্বামী জমিদার গোষ্ঠী ও প্রতিপত্তিশালী ধনকুবের বণিক, ব্যাঙ্কার ও মহাজনদের নিয়ে। অভিজাত শ্রেণীর নিচে ছিল একটি মধ্যমবর্গ, অনেকেই একে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করেন। যদিও আধুনিক যুগের প্রারম্ভে ইউরোপে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠেছিল নবাবী বাংলার কথিত এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে তার বিস্তর পার্থক্য ছিল। সামাজিক স্তরের সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল বিশাল সাধারণ জনতা, যাদের মধ্যে ছিল সাধারণ কৃষক কারিগরসহ বিভিন্ন অনুল্লেখ্য বৃত্তির কর্মজীবী মানুষ। বর্ণিত এ তিনটি শ্রেণীর সমন্বয়েই গড়ে ওঠেছিল নবাবী যুগে বাংলার সমাজ।

নবাবী বাংলার প্রভাবশালী সামাজিক শক্তি অভিজাত শ্রেণী আলোচ্য গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। তাই এ শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা-পর্যালোচনা প্রয়াস থাকবে। এ কারণেই বর্তমান অধ্যায়ে নবাবী বাংলার সামাজিক শ্রেণীর মধ্যমবর্গ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সাধারণ জনতার বিষয়েই পরবর্তী আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রাসঙ্গিক কারণেই সমাজে নবাবের অবস্থান বিষয়ক আলোচনাটিও পরবর্তী অধ্যায়ে স্থান পাবে।

৪.২ মধ্যবিত্ত শ্রেণী

সাধারণভাবে প্রতিটি স্তর বিন্যস্ত বা শ্রেণী বিভক্ত সমাজকাঠামোতেই উচ্চ বা অভিজাত শ্রেণী ও নিম্ন বা সাধারণ শ্রেণীর মাঝখানে একটি সামাজিক শ্রেণীর অবস্থান থাকে। ব্রিটিশপূর্ব নবাবী বাংলার স্তর বিন্যাসেও এরূপ একটি সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। অনেকেই একে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৩৯] ডব্লিউ এইচ মুরল্যান্ড

---

[৩৭] সুশীল চৌধুরী, *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩৬

[৩৮] তবে ইউরোপীয় সামন্ত সমাজ ও বাংলার সামন্ত সমাজের মধ্যে বিস্তর পফারক ছিল। বাংলার সামন্ত সমাজে ভূমির ব্যক্তি মালিকানার বিষয়টি অনুপস্থিত ছিল।

[৩৯] নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০; গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৬; রঙ্গলাল সেন, *পূর্বোক্ত*, ৪৭; কে এম করিম, 'নবাবি আমলে বাংলার সমাজ কাঠামো', *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৭০৪-১৯৭১, ৩য় খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা:), পৃ. ৬১. সুশীল চৌধুরী, *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩৬

[৩৯] তবে ইউরোপীয় সামন্ত সমাজ ও বাংলার সামন্ত সমাজের মধ্যে বিস্তর পফারক ছিল। বাংলার সামন্ত সমাজে ভূমির ব্যক্তি মালিকানার বিষয়টি অনুপস্থিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

(William Harrison Moreland) এর মতে, ভারতীয় সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ব্রিটিশ যুগেই হয়েছে; তবে তাঁর মতে বাংলার কথা স্বতন্ত্র, এখানে ব্রিটিশ যুগের পূর্বেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল।[৪০] কাদের নিয়ে এ শ্রেণীটি গড়ে ওঠেছিল এবং বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের এ শ্রেণীর ভূমিকা কী- এসব বিষয়ে আলোচনার পূর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা নেয়া প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সামাজিক শক্তি হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধারণা এবং এদের বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্য সমাজ থেকে নেয়া হয়েছে। ইংরেজিতে এই শ্রেণীকে 'middle class' বলা হয়। ফরাসী ভাষার 'bourgeoisie' (বুর্জোয়া) এবং ইংরেজি 'middle class' শব্দ দুটি সমার্থক।[৪১] বাংলা ভাষায় এ শ্রেণী নিদের্শে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী' শব্দটি অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সমাজ বিকাশের ইতিহাসে শ্রেণীসমূহের বিবর্তন ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইউরোপে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ধনতন্ত্রের বিকাশ ধারার একটি বিশেষ পর্যায়ে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের গর্ভে একটি নতুন গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পটভূমিকায়। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঠিক সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ কঠিন। কেননা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণী এ কথাটি নানভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং স্থান কাল পাত্র ভেদে এর বিভিন্ন অর্থ আরোপ করা হয়েছে। উপার্জনের ভিত্তিতে সমাজের মধ্যম আয়ের লোকদের (middle income group) কে যেমন মধ্যত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করার নজির রয়েছ, তেমনি সামাজিক মর্যাদা (social status) এর নিরিখে সমাজের মধ্যম বর্গকেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আবার শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে অগ্রসর না হলে ধন গৌরবের অধিকারীদেরও মধ্যবিত্ত হিসেবে গণ্য করা হয় না। কাজেই এক কথায় মধ্যবিত্তের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করা কেবল কঠিন নয়, অসম্ভবও বটে। *A Dictionary of Social Science* – এ উল্লেখিত সংজ্ঞানুসারে সমাজের উচ্চবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর মাঝামাঝি স্তরে অবস্থানকারী জনসমাজই হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণী তবে এতে এও বলা হয়েছে যে, এ বিভাজন কোনো সুনির্দিষ্ট রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।[৪২] *Colombia Encyclopedia*- তে মধ্যবিত্ত বলতে জমিদার ও কৃষকদের মাঝামাঝি শ্রেণীকে নির্দেশ করা হয়েছে।[৪৩] মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্ধারণে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী রিচার্ড হেনরী গ্রেটন (R. H. Gretton) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, সমাজের সেই শ্রেণীকেই আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী

---

[৩৯] নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০; গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৬; রঙ্গলাল সেন, *পূর্বোক্ত*, ৪৭; কে এম করিম, 'নবাবি আমলে বাংলার সমাজ কাঠামো', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ৩য় খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা:), পৃ. ৬১

[৪০] W H Moreland, *From Akbar to Aurangzeb: a study in Indian economic history;* নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০

[৪১] ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে 'বুর্জোয়ারা'ই মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত হতো। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কল্যাণে তাদের ধনাগম এবং সমাজে স্বাধীন অবস্থানের কারণে তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে গণ্য হয়।। অবশ্য পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড বা ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে এমনকি ভারতেও বুর্জোয়ারা সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সুবিধাভোগী প্রভাবশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়। ফলে এসব দেশে এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে 'পাতি বুর্জোয়াদের'কে বুঝায়। B. B. Misra, *The Indian Middle Class:Their Growth in Modern Times,* Oxford University Press, London, 1961, p. 6; A K M Nazmul karim, *The Dynamics of Bangladesh Society,* Vikas, New Delhi, 1980, p. 178; গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

[৪২] Julius Gould and William L. Kolt (ed.), *A Dictionary of Social Science,* Tavistock Publication, London, 1964, p. 302

[৪৩] *The New Illustrated Colombia Encyclopedia,* Vol. 3, Colombia University Press, New York, 1978, p. 207

Dhaka University Institutional Repository

বলতে পারি, মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রধান নিয়ামক এবং মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রাথমিক উপাদান। তাঁর মতে, ধনিক শিল্পপতি, বণিক, শিক্ষিত চাকুরিজীবী প্রমুখ যাদের জীবনের সঙ্গে মুদ্রার ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে, মুদ্রাই যাদের জীবনের মূলমন্ত্র, যাদের কাছে ন্যায়-অন্যায়, প্রভাব-প্রতিপত্তি বিচারের একমাত্র মানদণ্ড মুদ্রা, মুদ্রা যাদের জীবন সর্বস্ব, তারাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[৪৪] মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আলোচনা প্রসঙ্গে টমাস হজস্কিন (Thomas Hodgeskin) তাদের চরিত্রে পুঁজিপতি শ্রেণী ও মজুর শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের এক অদ্ভুত মিশ্রণ দেখা যায় বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এমনই এক শ্রেণী যারা অল্প শ্রমে এবং যন্ত্রযুগের তালে তালে যারা সমাজে এমনই একটি স্থান দখল করে নেয়, যেখানে তাদের ধণিক ও মজুর দুই-ই মনে হয়।[৪৫]

পূনশ্চ উল্লেখ্য যে, কার্ল মার্কস সমাজকাঠামোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বারোপ না করলেও এ শ্রেণীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সামাজিক শক্তির উপর নির্ভরশীল থেকে উচ্চবিত্তদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে।[৪৬] মাকর্সবাদীরা মনে করেন যে, কায়িক শ্রম পরিহার করে এই শ্রেণীটি অপরের শ্রম থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। নিজেদের স্বার্থে এ শ্রেণীটি উচ্চবিত্তদের বিরুদ্ধে সংগঠিত যে কোনো আন্দোলনকে নিস্ক্রিয় করে দিতে পারে। বি বি মিশ্র (B. B. Misra) এর মতে, সম্পদের দিক দিয়ে শীর্ষস্থানে অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গকে বাদ দিয়ে যারা ব্যবসায়ী শ্রেণী ও তাদের সহায়ক শক্তি চাকুরিজীবী শ্রেণী, তাদেরকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলা যায়।[৪৭]

সমাজত্ত্ববিদদের উপরে বর্ণিত মতামতসমূহে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তার নিরিখে পর্যালোচনাধীন নবাবী বাংলার সমাজকাঠামোর মধ্যম বর্গ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরোপুরি বিচার সম্ভব নয়। উপরের বর্ণনায় যে মধ্যবিত্ত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে তা ধনতান্ত্রিক পঁজিবাদী সমাজের আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। তার সাথে সামন্ততান্ত্রিক নবাবী বাংলার মধ্যম বর্গের খুব বেশি সাদৃশ্য নেই। প্রাক-ব্রিটিশ বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর থেকে আলাদা ছিল এ কথা সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিম স্পষ্ট করেই বলেছেন।[৪৮] মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে গ্রেটন প্রদত্ত উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ি ভূস্বামী ও কৃষকদের ঐ শ্রেণীভুক্ত বলা যায় না। কারণ মুদ্রা বা টাকা নয়, ভূ-সম্পত্তি বা জমি-জমাই এ শ্রেণীর প্রধান অবলম্বন।[৪৯] কিন্তু নবাবী বাংলার সমাজ জীবনে মধ্যবিত্ত নামে খ্যাত সমাজিক শ্রেণীতে গ্রামীণ সম্পন্ন ভূ-স্বামীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এর বাইরেও যারা ছিলেন তাদের সকলের জীবনেরই মূলমন্ত্র মুদ্রা বা টাকা ছিল না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে নবাবী বাংলায় লক্ষণীয় মাত্রায় মুদ্রার সঞ্চালন দেখা যায়। কিন্তু একদল মানুষের শ্রেণী মর্যাদা, পদমর্যাদা তাদের সফলতা-বিফলতা এবং মনুষ্যত্ববোধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার

---

[৪৪] R. H. Gretton, *The English Middle Class*, G. Bell & Sons Ltd. London, 1917, Introduction, pp. 9-12

[৪৫] Cited in Werner Stark, *The Ideal Foundations of Economic Thought: Three Essays on the Philosophy of Economics*, Trubner & Co. Ltd., USA, 1943, p. 99

[৪৬] T. B. Bottomore, M. Rubel, *Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy*, Watts, 1956, p. 98

[৪৭] B. B. Misra, *op. cit.*, 91

[৪৮] নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০

[৪৯] R. H. Gretton, *op. cit.*, p. 11

মতো গতিশীল মুদ্রা ব্যবস্থা নবাবী যুগের বাংলার সামন্ত সমাজে তখনো ছিল না। অথচ গ্রেটন মনে করেন গতিশীল মুদ্রা সমাজস্থ যেসব ব্যক্তির জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে তারাই হলো সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী।[৫০] অবশ্য মুদ্রার মাপকাঠিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিচার করার গ্রেটনের অভিমত সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যেও দ্বিমত আছে। বিনয় ঘোষ পুঁজিবাদী সমাজেও মুদ্রার মাপকাঠিতে স্বতন্ত্রভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিচারকে অর্থহীন বলে মনে করেন। কেননা মুদ্রার প্রাধান্য এ যুগের বৈশিষ্ট্য। মুদ্রাই এ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী এমনকি মজুর বা ক্ষেতমজুর শ্রেণীরও জীবনের প্রধান অবলম্বন।[৫১] ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মুদ্রা থাকলেও যেমন মজুর শ্রেণীকে মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনার অবকাশ নেই, তেমনি নবাবী যুগের সামন্তসমাজে একমাত্র মুদ্রার মাপকাঠিতে সমাজস্থ বিশেষ গোষ্ঠীকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ নেই।

আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াও শিক্ষাগত যোগ্যতা, সাংস্কৃতিক রুচিবোধ ও রাজনীতি সচেতনতার উপর জোর দেয়া হয়।[৫২] এগুলো আধুনিক মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য। কাজেই এরূপ গুণাপনার আলোকে বিবেচনা করলে শুধু নবাবী বাংলায় নয় সমকালীন ভারতবর্ষের অন্য কোথাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলায় উপরে বর্ণিত প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল উনিশ শতকে। সুতরাং ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বিবেচনা না করে সমকালীন সামন্ত ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থেকেই নবাবী বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুসন্ধান এবং তাদের চরিত্র ও ভূমিকা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। বস্তুত প্রাক-ব্রিটিশ বাংলার নবাবী শাসনামলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নানা উপাদানে গড়ে ওঠেছিল। বি বি মিশ্র (B.B. Misra) উনিশ শতকের ভারতীয় তথা বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে চার ভাগে ভাগ করেছে। এরা হলো- (ক) ভূমি বা কৃষিনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণী; (খ) শিক্ষিত পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী; (গ) বাণিজ্যনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং (ঘ) শিল্প নির্ভরনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণী।[৫৩] বি বি মিশ্র বর্ণিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে আঠারো শতকের নবাবী বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না সত্য, তবে আলোচ্য সময়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও এসব গুণপনা বা বৈশিষ্ট্য কম বেশি পাওয়া যাবে। পূনশ্চ স্মরণীয় যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই কৃষি নির্ভর ছিল। নবাবী যুগে কৃষিনির্ভর এ জনগোষ্ঠীর একটি অংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তই ছিল না, বরং এরা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রধান অঙ্গ। বি বি মিশ্র (B.B. Misra) ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে তালুকদার, মুকাররারিদের প্রাধান্য ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৪] সমকালের ইউরোপ বা উনিশ শতকের বঙ্গ-ভারতের মতো সুশিক্ষিত না হলেও নবাব সরকার যুগেও বাংলায় এক শ্রেণীর শিক্ষিত পেশাজীবী শ্রেণীর উপস্থিতি ছিল। বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা ছিল তাদের জীবিকা

---

[৫০] R. H. Gretton, *op. cit.*, p. 11

[৫১] বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান লি., কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ৬৩

[৫২] A K Nazmul karim, *The Changing Society of India and Pakistan*, Ideal Publication, Dhaka, 1961, p. 98; আবদুল্লাহ ফারুক, 'প্রাসঙ্গিক ভাবনা', *সুন্দরম*, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৯৬, পৃ. ৭৯

[৫৩] B.B. Misra. *op. cit.*, pp. 12-17

[৫৪] B.B. Misra. *op. cit.*, p.75

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জনের প্রধান মাধ্যম। শুধু বুদ্ধিবৃত্তি ও পেশার ভিত্তিতে নয়, আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকেও এরা ছিলেন কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী সাধারণ লোকদের থেকে স্বতন্ত্র। এই শ্রেণীর লোকেরা সেকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান ছিল সামরিক বেসামরিক ও রাজস্ব প্রশাসনের অধঃস্তন কর্মকর্তা (উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন) ও কর্মচারিগণ। এদের সাথে যুক্ত ছিলেন শিক্ষক, লেখক, কবি, চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞ, আইনবিদ, ধর্মপ্রচারক ইত্যাদি নানা শ্রেণী পেশার লোকজন।[৫৫] বণিক ব্যবসায়ীদের মধ্যেও একটি শ্রেণীকে মধ্যবিত্ত বলে গণ্য করা হয়। বৃহৎ বণিক ব্যবসায়ীরা যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না তা বলাই বাহুল্য। বি বি মিশ্র মনে করে 'পাইকার' ও 'দালাল' গোছের বণিক ব্যবসায়ীরাই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[৫৬]

ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে মুঘল যুগে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থা থেকে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা ভিন্নতরভাবে গড়ে ওঠেছিল। ভূমি ব্যবস্থাপনার এ ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলার সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসেও কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। এ কারণেই প্রাক-ব্রিটিশ বাংলার সমাজকাঠামোতে একটি ভূমিজ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। নবাবী যুগে বাংলার সামন্ত সমাজে ভূমি রাজস্ব ছিল রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস। সরকারি খাজাঞ্চীখানার জন্য যারা সরাসরি ভূমি রাজস্ব আদায় করতো- তারা ছিল জমিদার। জমিদারির আকার আয়তন এবং জমিদারদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের নিরিখে শিরিন আখতার নবাবী বাংলার জমিদারদের স্বরাট (autonomus), প্রান্তীয় (frontier), বৃহৎ (big) ও ছোট (petty) এ চারটি বর্গে বিভক্ত করেছেন।[৫৭] জমিদারকূলের মধ্যে শেষোক্ত ক্ষুদে জমিদার শ্রেণীর সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। *তরফ, তপ্পা* বা একটি গ্রামের ভূম্যাধিকারী এমনকি নিজের জমি চাষকারী বড় ও সম্পন্ন কৃষকও এ শ্রেণীর ক্ষুদে জমিদার পর্যায়ভুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। শিরিন আখতারের মতে, ইজারাদারদের হাতে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত, পতিত জমিতে চাষাবাদের বন্দোবস্ত এবং ধর্ম ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনুদান হিসেবে *মদদ-ই-মাশ* নামক জমি বন্টনের ফলে বাংলায় এরূপ অসংখ্য ক্ষুদে জমিদারির উদ্ভব হয়। উত্তরাধিকারের কারণে জমিদারির ভাঙনেও কিছু ক্ষুদ্র জমিদারির সৃষ্টি হয়েছিল। এসব ক্ষুদে জমিদারদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা এবং শাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় এদের অবস্থান ও ভূমিকা ছিল সীমিত।[৫৮] উপরে বর্ণিত নবাবী আমলের চার শ্রেণীর জমিদারদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন শ্রেণী ছিল অভিজাত শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। তারা ছিলেন ভূ-অভিজাতন্ত্রের সুবিধাপুষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম শক্তিবিশেষ। আর ক্ষুদ্র জমিদার ও তালুকদারদের মতো ভূম্যাধিকারীগণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তালুকদাররা ছিলেন বৃহত্তর জমিদারির পাশাপাশি বা তার অধীনে তালুক এস্টেটের (ছোটজাতের ভূমি এলাকা) স্বত্বভোগী। তালুকদারগণ জমিদারদের মতোই বংশপরম্পরায় রাজস্ব শাসনের পাশাপাশি সমাজ-শাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করলেও সামাজিক মর্যাদায় জমিদারদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিচু স্তরে ছিলেন। তবে আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে তারা সাধারণ

---

[৫৫] এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১৫৭৬-১৭৫৭*, (বাংলা অনুবাদ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৩

[৫৬] B.B. Misra. *op. cit.*, 93

[৫৭] বিস্তারিত দ্র. Shirin Akhter, *Role of the Zamindars in Bengal 1707-1772*. Dhaka. Asiatic Society of Bangladesh, 1982. p p. 4-17

[৫৮] শিরিন আখতার, 'মুঘল আমলের জমিদারদের ইতিবৃত্ত' *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ১৮-১৯ সংখ্যা, ঢাকা ১৯৮৯, পৃ.পৃ. ১০৪-১০৫

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশি স্বচ্ছল ছিলেন। শুধু বিত্ত নয় শিক্ষা ও সুরুচির দিক থেকেও ভূমি নির্ভর এ ক্ষুদে জমিদার ও তালুকদার শ্রেণীটির সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল বলে জানা যায়। আঠারো শতকের বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত ও অন্যতম প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূম্যাধিকারী পরিবারের লোক ছিলেন। শুধু ভারতচন্দ্র নিজে নন, তাঁর অন্যান্য ভাইয়েরাও সংস্কৃত, বাংলা ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত হিসেবে সমকালীন সমাজে খ্যাতিমান ছিলেন। সেকালের আরেকজন বিখ্যাত বাঙ্গালি কবি ছিলেন রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পরিবারও ছিল মধ্যম শ্রেণীর ভূ-স্বামী শ্রেণীভুক্ত। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হিসেবেও এ পরিবারের বিশেষ খ্যাতি ছিল।[২৯] আর এসব গুণাবলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই বৈশিষ্ট্য।

নবাবী যুগে জমিদাররা সরকারি খাজাঞ্চীখানায় ভূমি রাজস্ব আদায় করে দিতেন। তবে তারা যেন রাজস্ব আদায় করে তা নিয়মিতভাবে সরকারের কাছে জমা দেয়-তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার রাজস্ব প্রশাসনে আমিল, আমিন, আমল গুজার, সাজোয়াল, কানুনগো ইত্যাদি পদবিধারী অধস্তন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করা হতো। এসব পেশাজীবীরা সে সময়কার সমাজিক স্তর বিন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে পরিগণিত হন। শুধু রাজস্ব বিভাগীয় নয়, বরং সামরিক, বেসামরিক ও বিচার বিভাগীয় অধস্তন কর্মকর্তা কর্মচারিগণও এ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী পর্যায়ভুক্ত যে সব রাজকর্মচারিদের পদ-পদবি জানা যায় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- কতোয়াল (পুলিশ কর্মকর্তা), শিকদার (নিম্নতম প্রশাসনিক ইউনিট পরগনার প্রশাসনিক প্রধান), খাজানাদার (প্রশাসনিক ইউনিট সরকার-এর রাজস্ব গ্রহণকারী কর্মকর্তা), ফৌতদার (পরগনার খাজাঞ্চীখানার তত্ত্বধায়ক), মুহতাসিব (জনসাধারণের নৈতিক জীবনমান উন্নয়ন কর্মকর্তা), জমাদার (পদাতিক বাহিনীর নিম্নপদস্থ সেনানায়ক), মুস্তাফি (দিউয়ানি দপ্তরের সেরেস্তাদার), মুসরেফ (সেরেস্তার ইনস্পেক্টর), দারোগা-ই-সায়ের (শুল্ক কর্মকর্তা), আমিন চৌকিয়াত (শুল্ক চৌকির প্রধান কর্মচারি), দারোগা-ই-আদালত (নিজামত ও দিউয়ানি আদালতের রেজিস্ট্রার), ওয়াকেয়া নভীস (দৈনন্দিন সংবাদ বৃত্তান্ত লেখক), সওয়ারে নেগার (সরকারি সংবাদদাতা)সহ বিভিন্ন দপ্তরের মুন্সি ও মোহরার শ্রেণীর কর্মচারিবৃন্দ।

নবাবী যুগে শিক্ষিত ব্যক্তি - যারা শিক্ষাদান ও জ্ঞান চর্চার মতো মহৎ পেশায় জড়িত ছিলেন, সমাজে তারা বিশেষ মর্যাদা সম্মান ও সম্ভ্রমের অধিকারী ছিলেন। জানা যায় যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে সেখান থেকে বহু বিদ্বান ও ধর্মতত্ত্ববিদ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি বাংলায় এসে বসতি গড়েন। তাছাড়া নবাবী যুগে বিশেষ করে পারস্যের সাফাভী বংশের (১৫০১- ১৭৩৬ খ্রি.) পতনের পর সেখানকার বহু শিয়া বিদ্বান, শিক্ষক, চিকিৎসক, বণিক-ব্যবসায়ী বাংলায় অভিবাসন গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সূত্রে নবাবী যুগের বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্বান, জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তির কথা জানা যায়। এদের মধ্যে বিজ্ঞান বিশারদ আকা আবদুল্লাহ, পণ্ডিত সৈয়দ মোহাম্মদ তারবেতি, মৌলভী নাসির (জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত বিশেষকরে এলজেব্রা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী), আধ্যাত্মজ্ঞান বিশারদ দাউদ আলী খান (যায়ের হোসেন খান নামে সমাধিক পরিচিত), ধর্মতত্ত্ববিদ মৌলভী মোহাম্মদ আরিফ, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ববিদ মীর রুস্তম আলী, বিজ্ঞান বিশারদ সৈয়দ মোহাম্মদ সাজ্জাদ, সৈয়দ আলিম

---

[২৯] এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১৫৭৬-১৭৫৭*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

উল্লাহ তবাতবায়ি (ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ির পিতা), শিয়া ধর্মতত্ত্ববিদ শাহ হায়দারি, আইনবিদ ও কবি কাজী গোলাম মোজাফ্‌ফর, পাটনার বিখ্যাত পণ্ডিত ও শিক্ষক জ্যোতির্বিদ্যা বিশারদ মোহাম্মদ হাজিন (ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ির শিক্ষক), আরবি ভাষা বিশেষজ্ঞ ইসলামি আইন বিশারদ ও কোরাআনের ভাষ্যকার শেখ মোহাম্মদ হাসান এবং ইসলাম ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও আইন বিষয়ে সুপণ্ডিত মীর মোহাম্মদ আলী আল ফাজিল প্রমুখ।[৬০] হিন্দু পণ্ডিত ও ধর্মশাস্ত্রবেত্তাদের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্র পণ্ডিত হরিরাম তর্ক সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রাম গোপাল সার্বভৌম এবং প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, ধর্মশাস্ত্রবিদ গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি এবং বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার ও কান্ত বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ ছিলেন দর্শনশাস্ত্রবিদ এবং জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন রামরুদ্র বিদ্যানিধি।[৬১] এসব জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মবেত্তাগণ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে উচ্চপদাধিকারী ছিলেন না এবং তাদের অর্থ সম্পদ ও বিত্তেরও প্রাচুর্য ছিল না। তবে তাদের জ্ঞান-গরিমা, ধর্মানুরাগ ও মহিমামণ্ডিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য জনগণ তাদের বিশেষ শ্রদ্ধা, সম্মান ও সমাদর করতেন। বাংলার নবাব ও অভিজাত শ্রেণীর কাছেও তারা বিশেষ সম্মান ও সমাদার লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। আর এ সূত্রে তারা সমাজে বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেন। উপরের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে, এসব ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা করতেন এবং কেউ কেউ শিক্ষা দানের মতো মহান পেশায় জড়িত ছিলেন।

নবাবী যুগে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আজকের দিনের মতো কোনো সুশৃঙ্খল, সুগঠিত শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না সত্য, তবে সরকারি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগে বাংলায় একরকমের মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল। এ শিক্ষা ব্যবস্থা তিনভাগে বিভক্ত ছিল- যথা (ক) পাঠশালা ও তোলাবা খানা, (খ) মাদ্রাসা ও মক্তব এবং (গ) চতুস্পাঠী ও টোল।[৬২] পাঠশালা ও তোলাবাখানা ছিল হিন্দু মুসলিম ছাত্রদের জন্য মিশ্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রায় শতকরা আশিভাগেরও বেশি ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হতো এসব প্রতিষ্ঠানে। এসব প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত,আরবি, ফারসি এবং প্রাথমিক অঙ্ক শিক্ষা দেয়া হতো। মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল মুসলিম ছাত্রদের জন্য। মুসলিম ধর্মীয় শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, মৌলভী ও বিদ্বানগণ এসব মক্তব মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। চতুস্পাঠী ও টোল ছিল হিন্দু ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র শিক্ষার উচ্চ প্রতিষ্ঠান। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ও শাস্ত্রকারগণ এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সামাজিক মর্যাদায় এসব বুদ্ধিবৃত্তিজীবী শিক্ষক সমাজ মধ্যবিত্ত শ্রেণী পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। শিক্ষক এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও সমাজে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হতো।

সামন্তসমাজে ধর্মীয় পুরোহিত বা যাজক শ্রেণীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সমান্তসমাজে তাদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বিত্ত- বৈভবের জোর না থাকায় এরা সমাজে অভিজাত শ্রেণী হিসেবে স্বীকৃতি পেতেন না। না। নবাবী বাংলায়ও একই অবস্থা দেখা যায়। এ সময় হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে এক শ্রেণীর ধর্মবেত্তা-

[৬০] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৩৯৫, ৪১২-৪২৪

[৬১] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৩

[৬২] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১০৬-১০৭

সাধকদের উপস্থিতি দেখা যায়। এদের মধ্যে সুফি, দরবেশ, ফকির, ব্রাহ্মণ, ঠাকুর, বৈষ্ণব সহজিয়া প্রমুখ ছিলেন প্রধান। তারা পেশাধারী শিক্ষকদের বাইরে সে সময় সমাজে ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে মানুষকে ধর্ম, নৈতিকতা এবং ইহ ও পরকাল সম্পর্কে নানা রকমের জ্ঞান ও পরামর্শ দিতেন। সমাজে তাদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। রাজপুরুষ ও অভিজাত ব্যক্তিরাও এদের সম্মানের চোখে দেখতেন। পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্ম জ্ঞান সাধনার জন্য রাজন্য এবং অভিজাত শ্রেণীর উপর তাদের এক রকমের প্রভাবও ছিল। সমাজিক মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিবেচনায় এরাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতেন।[৬৩]

নবাবী আমলে মধ্যবিত্ত হিসেবে পরিগণিত অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের মধ্যে ছিলেন চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, স্থপতি, শিল্পী ও কারিগর প্রভৃতি। ব্যক্তিগত প্রতিভা, নৈপুণ্য ও মানব সেবার কারণে আইনজ্ঞ ও চিকিৎসাবিদগণ সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। চিকিৎসার ক্ষেত্রে হিন্দুরা হিন্দু বৈদ্য চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হতেন। হিন্দু বৈদ্যরা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা দিতেন। অন্যদিকে মুসলমান রোগীদের ভরসা ছিল মুসলিম হাকিমের উপর। এরা ইউনানি পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেবা দিতেন। উল্লেখ্য যে, নবাবী যুগে বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুসলিম চিকিৎসকের কথা জানা যায়। এসব চিকিৎসাবিদদের মধ্যে হাকিম তাজউদ্দিন ও হাকিম হাদি আলী খান, মোহাম্মদ হোসেন খান, নাকি আলী খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাকিম হাদি আলী খান নবাব সুজাউদ্দিন খান এবং নবাব আলিবর্দী খান উভয়ের দরবারে চিকিৎসক হিসেবে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষতার জন্য তিনি সে যুগের গ্যালেন ও প্লেটো নামে অভিহিত হতেন।[৬৪] নবাব এবং অভিজাত বা উচ্চশ্রেণীর লোকদের অল্পসংখ্যক আধুনিক ইউরোপীয় চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ নিতেন।

নবাবী আমলে রাজদরবার ও সমাজে কবি প্রতিভার বেশ সমাদর ছিল। সেকালে কবি হায়াত মাহমুদ, শেখ মনহর, ফকিররাম, ঘনরাম, কবি বানেশ্বরসহ বহু পল্লীকবি বাংলার মানুষের কাব্য পিপাসা মিটিয়েছেন। তবে নবাবী যুগের প্রধান কবি ছিলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর ও রামপ্রসাদ সেন।[৬৫] এদের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও রামপ্রসাদ সেন ছিলেন ভূমিজ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। কাব্য ছাড়াও সে যুগে বাংলার সমাজজীবনে সঙ্গীতের বেশ সমাদর ছিল এবং সেই সূত্রে সঙ্গীতচর্চাও সমাজে একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচিত হতো। এ কারণেই নবাবী যুগে বাংলায় বহু সঙ্গীত শিল্পীরও সমাবেশ ঘটেছিল। শুধু রাজদরবার নয় অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও সঙ্গীত শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সঙ্গীত বা গান বাজনা সেকালের সামাজিক উৎসবাদির অপরিহার্য অঙ্গ ছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থপতি, শিল্পী, কারিগর ও উৎপাদক শ্রেণী মধ্যবিত্ত সমাজের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। বয়ন প্রতিভা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার বলে তাঁতীরা সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে নিজেদের স্থান করে নিতে পেরেছিল। কেবল মহিলা নয় রাজপুরুষ এবং অভিজাত উচ্চশ্রেণীর পুরুষদের মধ্যেও হীরা, জহরৎ ও স্বর্ণ ইত্যাদি মূল্যবান অলঙ্কারাদি

---

[৬৩] এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* , ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩

[৬৪] কে এম করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২

[৬৫] অনিল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী*, কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

পরিধানের প্রচলন ছিল বিধায় সেকালে স্বর্ণকার ও জহুরিদের ব্যবসা ভাল ছিল। তারাও নিজেদের পেশাগত নৈপুন্য ও আর্থিক সমৃদ্ধিবলে সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

নবাবী যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গশক্তি ছিল বণিকগণ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ যুগে বৃহৎ বণিক, ব্যাঙ্কার-মহাজনরা ছিলেন উচ্চ অভিজাত শ্রেণীভুক্ত। মাঝারিমানের বণিক-ব্যবসায়ী এবং পাইকার ও দালালদের নিয়ে গড়ে ওঠেছিল বণিকদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মাঝারি ব্যবসায়ীদের পুঁজি কম ছিল এবং এদের ব্যবসার ধরণও আলাদা ছিল। এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো বিশেষ দ্রব্যের এবং বিশেষ কোনো অঞ্চলে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করতো। বড় ব্যবসায়ীদের কমিশন এজেন্ট হিসেবে এরা দাদন নিয়েও পণ্য সরবরাহ করতো। এদের নিচে ছিল পাইকাররা। এরা উৎপন্ন দ্রব্যের কাঁচামাল সরবরাহ করতো এবং প্রাথমিক উৎপাদকের হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল সরবরাহের চুক্তি করতো।[৬৬] নবাবী যুগে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের বিশেষ করে বাংলা বাণিজ্যে সবচেয়ে সুবিধাভোগী ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দালাল (broker) বণিকরাও আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং ইউরোপীয়দের সাথে ঘনিষ্টতা ইত্যাদি নানা কারণে জনসমাজের নিকট বিশেষগুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। এসময় বালেশ্বরের ধনাঢ্য দালাল বণিক ক্ষেমচাঁদ ও চিন্তামন, হুগলির মথুরাদাস, কাশিমবাজারের সুকানন্দ শাহ্ এবং চতুরমল শাহ্ প্রমুখ প্রভাবশালী দালাল বণিকের কথা জানা যায়।[৬৭] সুকুমার ভট্টাচার্য ১৭৩৬-১৭৪০ সাল পর্যন্ত কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের সাথে সংশ্লিষ্ট ৫০ জনেরও বেশি, ১৭৩৮-১৭৩৯ সালের মধ্যে কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ কাশিমবাজারে ২৫ জন এবং ১৭৩৯ সালে ঢাকার ১২ জনেরও বেশি দালাল বণিকের নাম উল্লেখ করেছেন।[৬৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নথিপত্রে প্রাপ্ত দালাল বণিকদের নামের যে তালিকা পাওয়া যাচ্ছে তাতে জানা যায় যে, এ সব দালাল বণিকদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু এবং তাদের বেশির ভাগই ছিলেন গুজরাটি-রাজস্থানী। দালাল বণিকদের মধ্যে মুসলমান যেমন ছিল না, তেমনি খাঁটি বাঙ্গালির সংখ্যাও ছিল একেবারেই নগণ্য। সুবোধকুমার বন্দোপাধ্যায় মনে করেন দালাল বণিকদের মধ্যে মুসলমানদের উপস্থিতি না থাকার কারণ ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো সম্ভবত মুসলমান রাজশক্তির সাথে তিক্ততা এড়ানোর জন্য মুসলমান বণিকদের সযত্নে এড়িয়ে চলতো। তাছাড়া এ যুগে বাংলায় মুসলমান বণিকের সংখ্যাও কম ছিল।[৬৯]

উপরের বর্ণনায় নবাবী যুগে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধরণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। সহজ করে বলতে গেলে আঠারো শতকের নবাবী বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী হলো তারা যাদের বিত্ত বা সম্পদ প্রচুর নয় এবং একেবারেই কমও নয়। তারা শিক্ষা ও সুরুচিবোধেরও অধিকারী ছিল। তবে নানা উপাদানে গড়ে ওঠা এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী তদানীন্তন বাংলার গোটা জনসংখ্যার একটি সামান্য অংশ মাত্র ছিল। আর এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে তুলনামূলকভাবে

---

[৬৬] গোলাম রব্বানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮; সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪

[৬৭] Sushil Chaudhury, *Trade and commercial organization in Bengal, 1650-1720, with special reference to the English East India Company*, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1975, p. 98

[৬৮] Sukumar Bhattacharya , *The East India Company and the economy of Bengal from 1704 to 1740*, Luzac & Co., London, 1954, p. 180

[৬৯] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫

হিন্দু প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলার ক্ষুদে জমিদার ও তালুকদাররা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসময় বাংলায় শত শত ক্ষুদে জমিদারি ছিল বলে জানা যায়। তবে লক্ষণীয় যে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান ক্ষুদে জমিদারের উপস্থিতি দেখা গেলেও এসব জমিদারির বেশিরভাগই ছিল হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণাধীন।[৭০] বিভিন্ন দপ্তর বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগের মধ্যমপদাধিকারী চাকুরিজীবীদের মধ্যেও হিন্দু প্রাধান্য ছিল। উল্লেখ্য যে নবাবী আমলে রাজভাষা ছিল ফারসি। চাকুরি লাভের জন্য হিন্দুরা রাজভাষা ফারসি ভাষা রপ্ত করেন। তাদের অনেকেই ফারসি ভাষায় এমন দক্ষতা অর্জন করেন যে, তাদের অনেককে এ ভাষার শিক্ষকরূপে কাজ করতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত রামচন্দ্র মুনশী এবং নবকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করা যায়। এদের প্রথমোক্তজন ছিলেন আঠরো শতকের প্রধান বাঙ্গালি কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের শিক্ষক এবং দ্বিতীয় জন ছিলেন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের শিক্ষক।[৭১]

উপরের বর্ণনায় আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, নবাবী আমলের যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তা গড়ন ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনাধীনে বঙ্গ-ভারতে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আলাদা ছিল। এমনকি পাশ্চাত্যের শ্রমশিল্প বিপ্লবের আগে সেখানে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল, তার সাথেও নবাবী বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এক করে দেখার অবকাশ নেই। পশ্চিম ইউরোপে আধুনিক যুগের প্রারম্ভে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়, তা ছিল নগর কেন্দ্রিক ও সামন্তবাদ বিরোধী। বণিক ব্যবসায়ীরা ছিল এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রধান অঙ্গশক্তি। সমাজরূপায়নে তারা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু নবাবী বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পুর্ণরূপে নগরকেন্দ্রিক ছিল বলা যায় না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে রাজকর্মচারি ও ব্যবসায়ীদের অংশবিশেষ নগরবাসী হলেও এ শ্রেণীর সিংহভাগই ছিল গ্রামীন।[৭২] মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বণিক ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রক বা চালকের আসনেও দেখা যায় না। সমাজরূপায়নেও এ শ্রেণী ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। রাজনৈতিক সচেতনতা আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট। নবাবী বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক চেতনাবোধ বর্জিত ছিল না সত্য, এ শ্রেণীর শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা দেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি সম্পর্কে অনেক সময় স্পষ্টতই সচেতন মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তবে তা কোনক্রমেই সমকালীন ইউরোপীয় বা পরবর্তী ব্রিটিশ শাসনামলের বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতার সাথে তুলনীয় নয়। ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণী কৃষির উন্নয়ন ও বিকাশে কিছু ভূমিকা রেখেছিল সত্য, তবে কৃষিতে যান্ত্রিক ও কলা-কৌশলিক উৎপাদন উপকরণ সংযোজনে তাদের ভূমিকা ছিলনা বললেই চলে। শিক্ষিত পেশাজীবী মধ্যবিত্তরা সরকার ও প্রশাসন পরিচালনায় প্রথাগত দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে এর বাইরে প্রশাসনিক নীতি ও কৌশল নির্ধারণে তাদের কোনো ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিল না। বস্তুত নবাবী আমলের সামাজকাঠামোর ধরণ ও দুর্বলতার কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশিদার হতে পারেনি এবং একারণেই ইউরোপীয় বা পরবর্তীকালে ব্রিটিশযুগের বঙ্গ-ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা যায় না।

---

[৭০] নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৫

[৭১] এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮

[৭২] বাংলায় নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটেছিল মূল কলকতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ শাসণামলে।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনযাত্রা বা জীবনমানের দিক থেকে নবাবী বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল বলে মনে হয় না। সুরুচি ও সংস্কৃতিবান হওয়ায় তাদের মধ্যেও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের মতো আড়ম্বরপূর্ণ, বিলাস-ব্যাসন ও আমোদ আহ্লাদের জীবনযাপনের সাধ ছিল। তবে সে সাধ পুরণের মতো আর্থিক সঙ্গতি তাদের ছিল না। ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপাদক, যাদের কিছু আর্থিক সঙ্গতি ছিল তারাও অনেক সময় তাদের সঙ্গতির কথা প্রকাশ পাক সেটা চাইতো না। কেননা তাদের ভয় ছিল এতে রাজকর্মচারিরা তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিবে বা তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে নেবে। এজন্য তারা শুধু তাদের সম্পদ গোপনই রাখতো না, আড়ম্বর পরিহার করে মিতচারী জীবন যাপন করতো।

৪.৩ সাধারণ জনগোষ্ঠী

নবাবী যুগে বাংলার সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে বৃহত্তম অংশ ছিল বিশাল সাধারণ জনগোষ্ঠী। সাধারণ কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, সাধারণ সৈনিক, অদক্ষ কারিগর এবং কৃষি ও শিল্পসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সাধারণ কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ এবং দাসদের নিয়ে গড়ে ওঠেছিল এ বিশাল সাধারণ জনগোষ্ঠী।

সামন্ততান্ত্রিক নবাবী বাংলার সামাজিক স্তর বিন্যাসে কৃষকদের কথা প্রথমেই বিবেচনা করতে হয়। বাংলা একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং পর্যালোচনাধীন সময়ে কৃষিই ছিল বাংলার জাতীয় সম্পদ। পলিমাটি দিয়ে গড়া বাংলার বিশাল উর্বর সমতল ভূমি কৃষি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। আলেকজেন্ডার ডাও লিখেছেন, 'প্রকৃতি যেন বাংলাকে নিজ হাতে কৃষি ও কৃষি কাজের জন্য প্রস্তুত করেছেন। কৃষির উপযোগী সবকিছু বাংলায় আছে।'[৭৩] ভূমি উর্বর হওয়ায় এবং কৃত্রিম জলসেচের খুব বেশি প্রয়োজন না হওয়ায় এদেশের কৃষককুল অল্প আয়েসেই শস্য উৎপাদন করতে পারতো। বলা বাহুল্য কৃষির জন্য এরূপ একটি অনুকূল পরিবেশে এদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ ছিলেন কৃষিকাজের সাথে জড়িত এবং সেই অর্থে কৃষক। পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলার সামন্তসমাজে কৃষকরা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল না, বরং তারা অর্থনীতিরও এক গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি ছিল। কৃষক কারা- এ বিষয়ে নিখুত সংজ্ঞা প্রদান কঠিন কাজ। তবে এ প্রসঙ্গে ইরফান হাবিবের মত হচ্ছে 'কৃষক হলেন এমন একজন মানুষ যিনি তাঁর পরিবারের শ্রম ব্যবহার করে, নিজস্ব যন্ত্রানুসঙ্গে, নিজের জমিতে কৃষিকাজ করেন।' ইরফান হাবিব আরো উল্লেখ করেছেন যে, মার্কসবাদী এবং সেই সঙ্গে চায়ানভ- এর কাছেও এ সংজ্ঞাটি ততদুর পর্যন্ত গ্রহণীয়, যতক্ষণ ভাড়াটিয়া শ্রমিক এবং জমি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রটি এর বিবেচনায় উহ্য থাকে। মার্কসবাদীরা কৃষকদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা- ক. ধনী কৃষক (যারা কৃষিতে ব্যাপকভাবে ঠিকা শ্রম ব্যবহার করে), খ. মধ্যম কৃষক (কৃষিতে প্রধানত পারিবারিক শ্রম ব্যবহারকারী) এবং গ. গরিব কৃষক (যাদের কৃষিতে পরিবারের সমগ্র শ্রম ব্যবহারের মতো পর্যাপ্ত জমি নেই) ।[৭৪] ব্রিটিশ পণ্ডিত হলিংবেরি (R. H. Hollingbery) প্রাক-ব্রিটিশ বাংলার কৃষকদের- ক. খুদখাস্ত (স্থায়ী) এবং খ. পাইকাস্ত (অস্থায়ী) এই দুই শ্রেণীতে

---

[৭৩] Alexander Dow, *The History of Hindostan,* Volume I, English Trns. of Abul Qasim Muhammad Firishta. T. Becket and P.A. De Hondt, London, 1770, p.136

[৭৪] ইরফান হাবিব, 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে কৃষককুল', *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ: মার্কসীয় চেতনার আলোকে*, ইরফান হাবিবের প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ, ভাষান্তর কাবেরী বসু, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাই. লি., কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১০২

ভাগ করেছেন।[৭৫] খুদখাস্তরা ছিল জমির উপর প্রত্যক্ষ সত্ত্বাধিকারী চাষী বা জোতদার। হলিংবেরির মতে, খুদখাস্ত কৃষকরা ছিল উত্তর ভারতের 'ভায়াচারা'র প্রতিরূপ।[৭৬] জমির এসব প্রত্যক্ষ স্বত্তাধিকারীরাই কালক্রমে মধ্যস্বত্বভোগী মালিক বা গ্রাম্য জমিদারে পরিণত হয়। রংগলাল সেন বাংলার এ খুদকাস্ত কৃষকদের বিশেষ আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্তও সামাজিক পদমর্যাদায় বিশিষ্ট শ্রেণী বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৭] আলোচ্য অধ্যায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বাংলার যে সম্পন্ন কৃষক বা গ্রাম্য জমিদারদের কথা বলা হয়েছে তারা এ খুদখাস্ত শ্রেণীরই কৃষক।

হলিংবেরি নির্দেশিত পাইকাস্তরা ছিলেন জমির উপর স্বত্ত্ববিহীন চাষী। রংগলাল সেন এদের ভবঘুরে কৃষক বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, এদের কেউ কেউ 'গ্রাম সম্প্রদায়ের' (village community) কাছ থেকে লাঙ্গল ও হালের বলদ ভাড়া নিয়ে জমিদারের জমিতে রায়ত হিসেবে কাজ করতো। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ নিজেদের লাঙ্গল এবং হালের গরু নিয়ে এসে অনাবাদী জমিকে আবাদ করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ জমির উপর ভোগ-দখল স্বত্ত লাভ করতো। তবে জমির উপর কালক্রমে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে পাইকাস্ত রায়তদের অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়ে পড়ে তারা এক ধরণের ভূমিদাসে পরিণত হয়।[৭৮] ইরফান হাবিব মুঘল ভারতে একধরণের মৌসুমী ভাগ চাষীর কথা বলেছেন। সম্ভবত বাংলায়ও এ ধরণের মৌসুমী ভাগ চাষী ছিল। তাছাড়া ভূমিহীন কৃষক যারা কৃষক না হয়েও কৃষি এবং কৃষকদের সাথে যুক্ত থাকায় কৃষিজীবী জনসমষ্টির সাথে নিজেদের একাত্ম করে নিয়েছিল ইরফান হাবিব তাদেরকেও কৃষক সমাজের অংশ বলে মনে করেন।[৭৯] বলা বাহুল্য যে কৃষককুলের নিম্নস্তরস্থ এসব কৃষকই নবাবী বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ ছিল।

নবাবী বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষ। এজন্য আঠারো শতকের বাংলার সাধারণ সমাজকে শ্রমজীবী সমাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময়কার বাংলার শ্রমজীবীরা প্রধানত চারভাগে বিভক্ত ছিল, যথা- কৃষি শ্রমিক, শিল্প শ্রমিক, ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত শ্রমিক ও গৃহভৃত্য।[৮০] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিজেদের কোনো জমি না থাকলেও সমাজের এক শ্রেণীর লোকেরা কৃষিকাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। এরা ছিলেন পাইকাস্ত কৃষক। এরা সম্পন্ন কৃষকদের জমিতে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো। ফসল কাটার মতো জরুরি কৃষিকাজ সম্পন্ন করতে বড় কৃষকদের অনেক লোকবলের প্রয়োজন হতো। এ লোকবলের ঘাটতি পূরণে তখন তাদেরকে বেশি করে ঠিকে শ্রমিক নিয়োগ করতে হতো। ঠিকে শ্রমিক পাওয়া যেতো গ্রামের ভূমিহীন লোক এবং ক্ষেত্র বিশেষে অকৃষক শ্রেণী থেকে। উদাহরণ স্বরূপ চামার ও ধানুকরদের কথা বলা যেতে পারে। সামাজিক কাঠামোতে চামার বা ধানুকররা ছিল একান্তই নিচু জাতের মানুষ। চামারদের প্রধান পেশা চামড়ার কাজ হলেও প্রয়োজন মতো

---

[৭৫] R. H. Hollingbery, *The Zemindary Settlement of Bengal,* Oxford, London, 1879, p. 7; নাজমুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০

[৭৬] উত্তর ভারতে গ্রাম পঞ্চায়েত মালিক শ্রেণীই 'ভায়াচারা' নামে খ্যাত। গ্রামের অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ এ শ্রেণীটি দ্বারা পরিচালিত ও রক্ষিত হতো।

[৭৭] রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫৩

[৭৮] রংগলাল সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪

[৭৯] ইরফান হাবিব, 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে কৃষককুল', *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১০২-১০৩

[৮০] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

তারা মজুরির জন্য বড় কৃষক ও জমিদারদের জমিতে ঠিকে কৃষি শ্রমিক হিসেবেও কাজ করতো। একই কথা ধানুকরদের প্রসঙ্গেও। ধানভানার কাজ করতো বলে এদের বলা হতো ধানুকর। তবে তারা কৃষকদের ফসল কাটা এবং ফসল বহনেরও কাজ করতো।[৮১] ভূমিহীন ও অকৃষক শ্রেণীর লোকেরা কৃষি শ্রমিক হিসেবে কৃষকদের কাছ থেকে দৈনিক মজুরি লাভ করতো এবং এ মজুরিই ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। কৃষিকাজে শ্রমিকের চাহিদা ছিল অনেকটা মৌসুমী। তাই কৃষিকাজের উপার্জন থেকে কৃষি শ্রমিকদের সারা বছরের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন ছিল। আর এ জন্যই সম্ভবত কৃষি শ্রমিকরা অবসর সময়ে শিল্প শ্রমিক হিসেবেও কাজ করতো। বাংলার লবণ শিল্পের সাথে যুক্ত ছিল মালঙ্গি শ্রমিকরা । বর্ষাকালে এরা কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

নবাবী আমলে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যাও নেহায়েৎ কম ছিল না। উল্লেখ্য যে সে যুগে বস্ত্র বয়ন ছিল প্রধান শিল্পখাত। এ ছাড়াও সিল্ক, লবণ, চিনি, পাটজাত দ্রব্য ও কাগজ শিল্পেও বাংলায় বিশেষ অগ্রগতি হয়েছিল। এসব শিল্পের সাথে বাংলার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের একটি বিশাল অংশ যুক্ত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাও ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় এ খাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা দুই থেকে তিন লক্ষ ছিল বলে মনে করেন।[৮২] বস্তুত আলোচ্য সময়ে বাংলা অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ফলে বাণিজ্য পণ্য আদান-প্রদান, গুদামজাতকরণ, পণ্য পরিবহণ ইত্যাদি কাজে প্রচুর কুলি মজুরের প্রয়োজন হতো। বাংলার সাধারণ বিত্তহীন লোকেরা এসব কাজ করতেন। তাছাড়া নৌপরিবহনে মাঝি মাল্লা ও অন্যান্য অনেক কাজে সাধারণ দরিদ্র লোকেরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে জীবিকার সংস্থান করতো। শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে গৃহর্ভত্য ছিল অন্যতম। নবাবী যুগে বহুসংখ্যক দরিদ্র সাধারণ লোক গৃহভৃত্যের কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো। এদের কর্ম ক্ষেত্র ছিল প্রধানত অভিজাত পরিবার এবং জমিদার বাড়ি। গ্রামীন সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারেও গৃহভৃত্য রাখা হতো। ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির দপ্তর এবং সাহেবদের বাড়ীতেও চাকর-ভৃত্য রাখা হতো। কোম্পানির কাগজপত্রে দোভাষী, সহকারী, ভৃত্য, ছত্রধারী, পাল্কিবাহক, দারোয়ান, খানসামা, চোপদার, বাবুর্চি, কোচম্যান, ঘাসুড়ে ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচারক ও গৃহভৃত্যের উল্লেখ রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সাধারণ দরিদ্র মানুষেরাই এসব কাজে নিয়োজিত হতেন।

সমাজকাঠামোর নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে দাসরা ছিল অন্যতম। দাস প্রথা ভারতের একটি প্রাচীন রীতি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ক্রীতদাস, ঋণদাস ও যুদ্ধদাস ইত্যাদির অস্তিত্ব ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলেও ভারতে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইবনে বতুতা ও বারবোসা প্রমুখ পর্যটকদের বিবরণী এবং সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বাংলার দাস প্রথা উল্লেখ রয়েছে। ঐতিহাসিক আবুল ফজল মুঘল ভারত ও বাংলায় দাস প্রথা প্রচলিত ছিল বলে

---

[৮১] গোলাম রব্বানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪

[৮২] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করেছেন।[৮৩] নবাবী যুগেও বাংলায় যে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ভৃত্য ও দাস রাখা সেকালের বাংলার অভিজাতদের সামাজিক মর্যাদার অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। শুধু দেশীয় অভিজাত নয়, কলকাতা, চন্দন নগর ও চুঁচুড়াতে ইংরেজ, ফরাসি, ও ওলন্দাজরা প্রচুর পরিমাণে ক্রীতদাস রাখতো। উল্লেখ্য যে কয়েকটি উপায়ে দাস সংগ্রহ করা হতো। এর মধ্যে একটি ছিল যুদ্ধ বন্দিদের দাসে পরিণত করার রীতি। সম্রাট আকবর তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে যুদ্ধ বন্দিদের দাসে পরিণত করার রীতি নিষিদ্ধ করেন। তবে এ নিষেধাজ্ঞা যে তার পরবর্তী উত্তরসূরি সম্রাটদের আমলে অনুসরণ করা হয়নি, ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে। দাসত্বের দ্বিতীয় উৎস ছিল চরম আর্থিক সংকটময় পরিস্থিতিতে পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তান বিক্রি। সরকারি প্রাপ্য রাজস্ব মেটাতে ব্যর্থ হয়ে কৃষক কর্তৃক সন্তান বিক্রির নজিরও রয়েছে। খাদ্য সংস্থান করতে না পারায় গরিব লোকদের ধনীদের কাছে নিজেদেরকেই বিক্রি করার কথাও জানা যায়।[৮৪] তাছাড়া পারস্য, আবিসিনিয়া, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া অঞ্চল থেকেও দাস আমদানি করা হতো। পণ্ডিত মহলে এ বিষয়ে বিশেষ কোনো দ্বিমত নেই যে, বঙ্গ-ভারতে প্রচলিত দাস প্রথাকে গ্রিস ও রোমের দাস প্রথার মতো ছিল না। কেননা গ্রিস ও রোমের দাসরা উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হতো এবং তারা ছিল হস্তান্তর যোগ্য। গ্রিস ও রোমের কৃষি ও শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল দাস শ্রমের উপর। কিন্তু বাংলার দাস ব্যবস্থা এরূপ ছিল না। পাশ্চাত্যের সামন্ততন্ত্রের মতো বাংলায় সার্ফ বা ভূমিদাসের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয় না। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার (W. W. Hunter) বাংলার দাস প্রথাকে 'চুক্তিবদ্ধ দাসপ্রথা' (Bonded Labour) বলে অভিহিত করেছেন।[৮৫] বাংলার দাসরা ছিল প্রধানত গৃহদাস। কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের কাজে দাসদের কখনো কখনো ব্যবহার করা হলেও এখানকার দাসরা কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের প্রধান অবলম্বন ছিল না। বাংলার দাসরা নিত্য গৃহকর্ম, দারোয়ান, মালী, বেহারা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত হতো এবং এই সূত্রে দাসরা তাদের মালিকের পরিবারের সাথেই অবস্থান করতো। বাংলার দাসদের ইউরোপের সামন্ত সমাজের দাসদের মতো বংশপরম্পরায় দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হতো না। চুক্তি মোতাবেক মালিককে টাকা ফিরিয়ে দিতে পারলে বাংলার দাসদের মুক্তি পাওয়ার সুযোগ ছিল। তাছাড়া দাসদের বিয়ে করা, সন্তান লাভ করা এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার ছিল। নিজ যোগ্যতাবলে দাসদের উচ্চপদাধিকারী হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

উপরে বর্ণিত কৃষক ও নানা শ্রমজীবী মানুষ ছাড়াও নবাবী যুগে বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে একান্তই নিম্ন বৃত্তিজীবী কিছু মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়। তাদের মধ্যে ছিল জেলে, নাপিত, ধোপা, চামার, ছুতার, জোলা, হাজ্জম, গোয়ালা, মুকেরি (গরুর রাখাল ও গরুর ব্যবসায়ী), তেলী, কাঁসারী, কুমার, কামার ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বারুই (পান উৎপাদনকারী), মুদক, সঙ্কবানিয়া (সঙ্খচূড়ি ও অন্যান্য গহনা নির্মাতা), গন্ধবণিক (মশলা ও অন্যান্য সুগন্ধি বিক্রেতা), পাটানী (খেয়া মাঝি) এবং চণ্ডাল ইত্যাদি। এসব কাজের সাথে সংশ্লিষ্টরা শুধু হতদরিদ্রই ছিল না তারা

---

[৮৩] আবুল ফজল তাঁর *আকবর নামা* ও *আইন-ই-আকবরী* উভয় গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। Della Valle এবং Linschoten এর বর্ণনায় গোয়া অঞ্চলে ক্রীতদারদের আধিক্যের কথা বলা হয়েছে। এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭

[৮৪] এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯

[৮৫] W.W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, Vol. I, Smith Elder and Co. London, 1868, pp. 332-333

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে নীচু জাতের মানুষ বলেও পরিচিত ছিল। সম্ভবত এসব কাজের জন্য এসব মানুষকে জাতিভেদ প্রথার নির্মম শিকারে পরিণত করা হয়েছিল। এদের জীবনচক্র বর্ণিত এসব ঘৃণ্য ও নীচু মানের কাজের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। ফলে নিজেদের হাতে জমি পেয়ে বা চাষ করে তারা যেমন কখনো চাষী হওয়ার আশা করতে পারতো না, তেমনি মর্যাদাপূর্ণ অন্য কোনো পেশা গ্রহণেরও সুযোগ এসব অন্তজ শ্রেণীর লোকদের জন্য ছিল না।

নবাবী যুগে রাজকার্যে নিযুক্ত নিম্ন শ্রেণীর কিছু কর্মজীবী ছিল যারা তাদের আর্থিক সঙ্গতি এবং পদমর্যাদার কারণে সমাজজীবনে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত ছিল। এসব বৃত্তিজীবীদের মধ্যে সাধারণ সৈনিক, বেসামরিক সরকারি দপ্তরে পিয়ন, পেয়াদা গোছের নিম্নপদস্থ কর্মচারী, রাজকীয় গৃহস্থালীতে নিযুক্ত বিভিন্ন পদে নিযুক্ত কর্মচারী ইত্যাদি। এসব কর্মচারীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। তবে সামরিক দপ্তরের সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ছিল বেশি। শুধু নবাবী বাহিনী নয়, জমিদারদের ব্যক্তিগত বাহিনীতেও অনেক মুসলমান সাধারণ সৈনিক হিসেব চাকরি গ্রহণ করেছিল।

নবাবী আমলে বাংলার সাধারণ কৃষিজীবী, কারিগর, বিভিন্ন শ্রমজীবী ও সাধারণ বৃত্তিধারী মানুষের জীবনচর্চা ছিল নিতান্তই সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর। সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত। তবে এ ভাত রান্নার জন্য চাউল উৎপাদন করতো যে কৃষক, তার ভাগ্যে জোটতো উৎপন্ন চাউলের সবচেয়ে নিচুমানের চাউলটি। মাংস তাদের কাদ্য তালিকা থাকতো না বলেই চলে। এর পিছনে যেমন ধর্মীয় সংস্কারের বিষয় ছিল, তেমনি ছিল মাংস জোগাড় করতে পারার মতো আর্থিক সঙ্গতির অভাব। মাছ মাঝে মধ্যে খেতে পারলেও নিয়মিত খাদ্য তালিকায় ছিল ভাতের সাথে সামান্য সব্জি। সে সময়কার পণ্য মুল্যের যে তথ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা থেকে এ কথা বলা যায় যে, মুল্যকাঠামো অনুযায়ী যাদের সাপ্তাহিক আয় গড়ে এক টাকা ছিল, তারা মোটামুটিভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে পারিবারিক ব্যয় মেটাতে পারতো। তবে প্রশ্ন হচ্ছে তদানিন্তন বাংলার সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা কী সপ্তাহে গড়ে এক টাকা আয় করতে পারতো? পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে এই প্রশ্নের সহজ জবাব দেয়া সম্ভব নয়। তবে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন তথ্য উৎস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সেদিনকার একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে মাসে গড়ে ৪/৫ টাকা আয় করা ছিল রীতিমতো একটি বিরল ব্যাপার।[৮৬] অতএব সাধারণ মানুষের জীবন মান যে খুব ভাল ছিল না এতে কেনো সন্দেহ নেই। শুধু খাদ্য তালিকা নয়, পরিধেয় বস্ত্রের দিকে তাকালেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার দৈন্য-দশা পরিলক্ষিত হয়। তাদের বস্ত্রাভাবের কথা বিদেশি পর্যটকদের বিবরণীতে স্থান পেয়েছে। শীতে সাধারণ মানুষের বস্ত্রাভাবে কষ্টের কথা আলেকজেন্ডার ডাও উল্লেখ করেছেন।[৮৭] তথ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, সেকালে সাধারণ বাঙ্গালিরা বিলাস-ব্যাসন নয় কেবল লজ্জা নিবারণের জন্যই বস্ত্র পরিধান করতো। এক্ষেত্রে পুরুষদের পরিধেয় ছিল লেংটি বা খাটো ধুতি। তারা সাধারণত গায়ে কোনো জামা পরতো না। আর মহিলারা একটি মাত্র শাড়ি দ্বারাই তাদের সারা শরীর আবৃত করে রাখতো। সাধারণ মহিলাদের মধ্যে ঘোমটা বা অন্যকোনো কাপড় দ্বারা মাথা আবৃত করে চলার কোনো

---

[৮৬] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, ভূমিকা পৃ. ৫

[৮৭] Alexander Dow, *op. cit.*, p. 119

Dhaka University Institutional Repository

রেওয়াজ ছিল না। সাধারণ পুরুষ বা নারী কেউই জোতা-মোজা পড়তো না । বস্তুত জোতা-মোজা পড়া ছিল একান্তই উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর রেওয়াজ।

সাধারণ বাঙ্গালিদের বাসস্থান ও আসবাব পত্রও ছিল অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর। সাধারণ গ্রামীণ বাঙ্গালির বাসস্থান বাঁশ ও খড় দ্বারা নির্মাণ করা হতো। তাদের ব্যবহৃত তৈজস ও আসবাবপত্রও ছিল খুবই সাদাসিধে। তৈজসপত্রের মধ্যে মাটির তৈরি বাসনপত্র, মাটির কলসি এবং মাটির হাড়ির বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আসবাবের মধ্যে ছিল নানা ধরণের পাটি ও মাদুর প্রভৃতি। সাধারণ মানুষের মধ্যে পান তামাক সেবনের প্রচলন ছিল। তামাক সেবন বাঙ্গালির এক প্রিয় নেশা ছিল। গ্রামীণ সাধারণ মানুষ হুক্কায় তামাক সেবন করতো। সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষেরা মাঝে মাঝে বিশেষ করে সামাজিক উৎসব আয়োজনাদিতে তাল ও খেজুর রসের দ্বারা প্রস্তুত তাড়ি পান করতো। সাধারণ মানুষেরা বিনোদনের জন্য নানা রকম খেলা ধুলা করতো। সমকালীন কবি রামপ্রসাদ সেনের কবিতায় গ্রাম বাংলায় জনপ্রিয় ডাভাগুলি ও ঘুড়ি উড়ানোর কথা বলা হয়েছে।[৮৮] তাছাড়া একটি জনপ্রিয় খেলা ছিল হা-ডুডু। গল্প, কথকতা, যাত্রাপালা, পুঁথিপাঠ এবং পালাগান শোনা ছিল সাধারণ বাঙ্গালি সমাজের প্রিয় অবসর বিনোদনের উপায়। সমকালীন কবি ভারতচন্দ্র রায়ের *অন্নদামঙ্গল* যাত্রাপালা করে অভিনীত হতো। কবি আলাউলের *পদ্মাবতী* পালা আকারে গাওয়া হতো এবং গ্রামীণ সাধারণ জনসমাজে এসব ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন সাধারণ বাঙ্গালি জনসমাজের ঐতিহ্য ছিল এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। বস্তুত উন্নত জীবন যাপনের স্বপ্ন সাধ সব মানুষের মধ্যেই থাকে। বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যেও হয়ত উন্নত জমকালো জীবন ধারনের আশা-আকাঙ্খা ছিল। তবে সে উন্নত জীবন যাপন করার মতো অর্থনৈতিক সামর্থ তাদের ছিল না। বস্তুত অনাড়ম্বর নিম্ন জীবন সাধনা যেন দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত সাধারণ মানুষের নিয়তিতে পরিণত হয়েছিল।

উপরের সার্বিক আলোচনার উপসংহারে একথা বলা যায় যে, আঠারো শতকের নবাবী বাংলার সমাজকাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক। তবে ইউরোপের সামন্ত সমাজের মতো এখানকার সমাজকাঠামো একই রকম ছিল তা বলা যাবে না। এমনকি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাথেও বাংলার সমাজকাঠামোর হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আর একারণেই এখানকার সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসেও অন্যান্য সামন্ত সমাজের সাথে তুলনা করলে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। তবে এটা ইতিহাসের ব্যতিক্রম কোনো দৃষ্টান্ত নয়। ইতিহাসে দেখা যায় যে, যুগ ভেদে যেমন সমাজের গড়ন বদলায়, তেমনি দেশ ও অঞ্চল ভেদেও। প্রত্যেক সমাজেই সামাজিক স্তর (stratum) ও সামাজিক শ্রেণী (class) থাকে। প্রধানত সমাজে উৎপাদন পদ্ধতির (mode of production) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরণের কাজকর্ম এবং এর ভোগ অধিকারের উপর ভিত্তি করে সামাজিক শ্রেণীবদ্ধতা (social stratification) ও শ্রেণী সম্পর্ক (class relation) গড়ে ওঠে। দীর্ঘস্থায়ী শ্রেণীবদ্ধতা থেকে সমাজস্থ প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে একধরণের বিশেষ শ্রেণীগত মনোভাবও গড়ে ওঠে। এই শ্রেণীগত মনোভাবের সঙ্গে ক্রমে একটি স্বতন্ত্র সামাজিক মর্যাদাবোধের বিকাশ ঘটে। সমাজের লোকদের

[৮৮] উদ্ধৃতি সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

অর্থসামর্থের সঙ্গে মর্যাদাও (status) শ্রেণী বিচারের বেশ গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সামাজিক শ্রেণী বিভাজনে অর্থসঙ্গতি, ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রভৃতি অনেক কিছু অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, নবাবী বাংলার সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসেও সামাজিক শ্রেণী বিভাজনের পূর্বোক্ত অনুসঙ্গগুলো যুক্ত রয়েছে। আলোচ্য সময়ে সমাজকাঠামোর উপরতলায় একটি অভিজাত শ্রেণী, তাদের নীচে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সর্বনিম্নস্তরে একটি নিম্নবিত্ত শ্রেণীর যে উপস্থিতি দেখা যায় তা অর্থসঙ্গতি, ক্ষমতা ও মর্যাদার নিরিখেই গড়ে ওঠেছিল ।

পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলার মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীভূক্ত। জনসংখ্যার বিশাল অংশ ছিল সাধারণ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর। সমকালে ইউরোপে রাষ্ট্র ও প্রশাসনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সমাজ রূপায়নেও তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজনবিদিত। তবে আলোচ্য সময়ে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইউরোপের সাথে তুলনীয় হতে পারে এরূপ রাজনৈতিক ও সাম্যজিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এর জন্য যতটুকু না মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা দায়ি ছিল, তার চেয়ে বেশি দায়ি বাংলার সমাজকাঠামোর ধরণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা। নবাবী যুগের প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো কোনো ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিল না। আর নিম্নবিত্ত সাধারণ মারুষের কথাতো বল বাহুল্য। আগেই বলা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের সিংহভাগই ছিল কৃষিজীবী। কিছু সংখ্যক শিল্প শ্রমিকের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। সন্দেহ নেই এরা কৃষি ও শিল্প পণ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তবে তাদের মোটেও উৎপাদনের সুফলভোগী বলা যায় না। আর প্রশাসন ও রাজনীতিতে তাদের কোনো ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিল না। এসময় রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক সাধারণ জনতাকে রাজনীতি বিমুখ করে রাখার সচেতন প্রয়াসও এ সময় লক্ষ করা যায়। সাধারণ মানুষের জীবনদর্শনে পারলৌকিকতাকে অধিক গুরুত্বারোপ করায় তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরজাগতিক হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই রাজনীতি, জীবনমান, মানবিক অধিকার ইত্যাদি প্রশ্নে সাধারণ মানুষের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। পলাশির ঘটনায় সাধারণ মানুষের উদাসীনতা এর একটি বড় প্রমাণ। বস্তুত ধর্ম-বর্ণ ও সনাতন প্রথা প্রতিষ্ঠানের উপর হস্তক্ষেপ ও আঘাত না আসলে তৎকালীন সমাজের সাধারণ মানুষ সাধারণ রাজনৈতিক তৎপরতাই শুধু নয়, রাজনীতি ও রাষ্ট্র ক্ষমতার পালাবদলেও মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন বোধ করতো না।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নবাবী যুগে বাংলার অভিজাত শ্রেণী: অভ্যুদয় ও বিকাশ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নবাবী বাংলার সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস এবং প্রসঙ্গত মধ্যবিত্ত ও সাধারণ জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সামাজিক শক্তি অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুদয় ও বিকাশ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা-পর্যালোচনা একান্তই আবশ্যক। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবাবী আমলে পরিবর্তিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রশাসন, ভূমিরাজস্ব বিভাগ ও সমাজ ব্যবস্থায় নতুন বিন্যাসের ফলে বাংলায় নতুন শক্তি কাঠামোর প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক শ্রেণী বা সামাজিক শক্তি ক্রিয়াশীল হওয়ায় অভিজাত শ্রেণীর সংগঠন ও বৈশিষ্ট্যেও পরিবর্তন ঘটেছিল। আলোচ্য অধ্যায়ে এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হলো। তবে এ সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে প্রসঙ্গত অভিজাত শ্রেণী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সাধারণ ধারণা প্রদান জরুরি। অভিজাত শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ noble, aristocrat. আর অভিজাততন্ত্র বা অভিজাত শ্রেণী হলো nobility, aristocracy। বস্তুত nobility ও aristocracy শব্দদ্বয় দ্বারা ইউরোপে সমগ্র আঠারো শতকে সাধারণভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীকে বুঝাতো। এর মধ্যে শাসক-গোষ্ঠীর উপরের শ্রেণীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। nobility এর সংজ্ঞার্থ নির্ধারণে বলা হয় যে,

> The term originally referred to those who were "known" or "notable" and was applied to the highest social class in pre-modern societies. In the feudal system (in Europe and elsewhere), the nobility were generally those who held a fief, often land or office, under vassalage, i.e., in exchange for allegiance and various, mainly military, services to the Monarch and at lower levels to another nobleman.[১]

সমাজতত্ত্ববিদদের মতে ধনৈশ্বর্যের সঙ্গতিই হলো আভিজাত্যের প্রধান উপকরণ। ধনৈশ্বর্যের সঙ্গতির সাথে ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রাধান্যের বিষয় যুক্ত হলেই আভিজাত্যের অন্তর্নিহিত স্বরূপ প্রকাশ পায়।[২] তবে বর্তমানকালের অভিজাতন্ত্রের ধরন-ধারণ থেকে আঠারো শতকের অভিজাততন্ত্রের ধরন-ধারণের বিস্তর পার্থক্য ছিল। ক্ষমতা, উচ্চপদ ও তার সুযোগ-সুবিধা, ধনাগম, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং বাণিজ্যিক সাফল্যের মতো উপাদানগুলোর অপরিহার্যতা পূর্বাপর প্রায় অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু ঐসব লাভ করে অভিজাত হওয়ার পন্থা-পদ্ধতির মধ্যে আঠারো শতক এবং বর্তমান সময়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং এ থেকে মোটা অঙ্কের মুনাফা অর্জন, ব্যক্তি মালিকানায় ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা বা অন্যবিধ কোনো না কোনো উপায়ে বিপুল অর্থবিত্তের

---

[১] **http://www.nobility-association.com/definitionofnobility.htm**

[২] মোঃ হাবিবুর রহমান, *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাতন্ত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

মালিক হওয়া এবং তার সাথে শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও যশ-খ্যাতির সম্মিলন ঘটানো- ইত্যাদি হলো বর্তমান অভিজাততন্ত্রের মূলকথা।[৩] কিন্তু আঠারো শতকের অভিজাতন্ত্রের মূলকথা ছিল শাসন ক্ষমতা, শাসককের সহযোগী বা পরিষদরূপে প্রশাসনে বড় বড় পদ লাভ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ বিপুল অর্থবিত্ত ও ঐশ্বর্যের অধিকার অর্জন। এক কথায় আঠারো শতকের অভিজাতন্ত্র হলো ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনৈশ্বর্যের প্রাধান্য এবং অভিজাত শ্রেণী হলো সেই ক্ষমতা, প্রভাব ও ধনৈশ্বর্যের বাহক।[৪] মধ্যযুগে ইউরোপে অভিজাত বলতে বুঝাতো লর্ড বা বিস্তর ভূমির মালিক বা বড় সড় বণিক ব্যবসায়ীদেরকে। ব্রিটেনে dukes, duchesses, marquises, marchionesses, earls, countesses, viscounts, viscountesses, barons এবং baronesses উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।[৫]

ব্রিটেন বা সমগ্র ইউরোপের সামন্তসমাজের অভিজাত শ্রেণী এবং ভারতবর্ষ তথা নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে গঠনকাঠামো ও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে কিছু পার্থক্য রয়েছে। নবাবী বাংলায় নবাব ছিলেন রাষ্ট্র ও সমাজকাঠামোর শীর্ষ ব্যক্তি। সামন্ত সমাজে রাজা বা সম্রাটের পরই অভিজাতবর্গের স্থান নির্ধারিত থাকে। সামন্ততান্ত্রিক নবাবী বাংলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এ যুগে নবাবের নিচেই ছিল প্রভাবশালী অভিজাত শ্রেণী। আর এ অভিজাত শ্রেণী গঠিত হয়েছিল নবাব পরিবারের সদস্যবৃন্দ, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক রাজকর্মচারী, সেনাধ্যক্ষ, প্রভাবশালী ভূস্বামী-রাজা-জমিদারগোষ্ঠী এবং হাতেগোনা কতিপয় ধণিক বণিক-মহাজনদের নিয়ে। নবাবী বাংলার এ অভিজাত শ্রেণী সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনার পূর্বে প্রাসঙ্গিক কারণেই সমাজ ব্যবস্থায় নবাব ও নবাব পরিবারের অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো। কেননা সমাজ কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়নের স্বার্থেই রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যমণি হিসেবে নবাব এবং সমাজকাঠামোতে বিশেষ মর্যাদা ও সুবিধাভোগী হিসেবে নবাব পরিবারের সম্পর্কে আলোচনা করা অত্যাবশ্যক।

৫.১ নবাব ও নবাব পরিবার

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে সামন্ততান্ত্রিক নবাবী বাংলার পিরামিড আকৃতির যে সমাজ কাঠামোর কথা বলা হয়েছে তার একেবারে শীর্ষদেশে ছিলেন নবাব এবং তারপরই নবাব পরিবার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ২৪তম বছরে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। মুঘলদের অতিকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে সুবার শাসন পরিচালনার জন্য একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রাদেশিক শাসনের এই শীর্ষ কর্মকর্তাকে সম্রাট আকবরের সময় 'সিপাহসালার' সতের শতকে 'সুবাদার' এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের

---

[৩] মোঃ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪; ইনিশ শতক থেকে এই শ্রেণী নির্দেশে elite শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। সমাজতত্ত্ববিদ প্যারেটো (১৮৪৮-১৯২৩) ও মস্কারের লেখনীর মাধ্যমে এ অভিধাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্যারেটো ও মস্কার সমাজের প্রতিভা, ক্ষমতা ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির সমাজস্থ শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহকে বুঝানোর জন্য elite শব্দটির প্রচলন করেন।

[৪] মোঃ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪

[৫] Winston S. Churchill, "The old English nobility of office made way for the Norman nobility of faith and landed wealth" available at **http://www.thefreedictionary.com/nobility**

Dhaka University Institutional Repository

রাজত্বের শেষদিকে 'নাজিম' বলা হতো।[৬] সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় মুঘল শক্তির অবক্ষয় ও দুর্বলতার সুযোগে সুবা শাসনে শৈথিল্য দেখা দেয় এবং কোনো কোনো সুবাহ কেন্দ্রীয় সরকারের আনুষ্ঠানিক আনুগত্য মেনে নিয়ে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করতে থাকে। বাংলা ছিল এরকমই একটি সুবাহ। এখানে মুর্শিদকুলি খান সাফল্যজনকভাবে মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় থেকে বাংলার সুবাদারি বংশগত হয়ে যায়।

মুর্শিদকুলি খান (১৭১৭-১৭২৭ খ্রি.) থেকে শুরু করে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পযর্ন্ত সময়কাল বাংলার ইতিহাসে 'নবাবী' বা 'নওয়াবী' যুগ নামে পরিচিত। এ সময় বাংলার শাসকগণও 'নবাব' বা 'নওয়াব' নামে পরিচিতি লাভ করে।[৭] রাষ্ট্র ও শাসন ব্যাপারে বাংলার নবাবগণ ছিলেন সর্বময়কর্তা। বছরে নির্দিষ্ট সময়ে একবার কর ও কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করে নবাবগণ নামে মাত্র মুঘল সম্রাটের আইনগত কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এ সময় নবাবদের নিয়োগ পদ্ধতিতে ও পরিবর্তন দেখা যায়। ইতোপূর্বে সুবাদার বা নাজিম সম্রাট কর্তৃক নিয়োগ লাভ করতেন। নবাবী আমলে এ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্রাটের ক্ষমতা 'সনদ' বা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ সময় উত্তারাধিকারসূত্রে বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার পর রাজকর্মচারী, জমিদার তথা সামগ্রিকভাবে জনগণের কাছে নিজ ক্ষমতাকে আইনসঙ্গত করার জন্য নবাবগণ সম্রাটের কাছ থেকে সনদ ও খিলাত আনয়ন করতেন। সম্রাটের আইনগত কর্তৃত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ নবাবগণ সম্রাটের নামে মুদ্রাজারি এবং খুৎবায় নামোচ্চারণ করতেন।[৮] ক্ষমতাহীন দুর্বলচিত্ত সম্রাটগণ বার্ষিক রাজস্ব প্রাপ্তি, মুদ্রায় নামোল্লেখ এবং খুৎবায় নাম উচ্চারণেই সন্তুষ্ট হয়ে নবাবদের সনদ দানের মধ্য দিয়ে তাদের উপর নিজের সার্বভৌমত্বের কর্তৃত্ব জাহির করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।

বাংলার নবাবগণ কেবল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সর্বময়কর্তা ছিলেন না, তারা গোটা সমাজেরও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে তাদের মর্যাদা ছিল প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকৃত। প্রাচুর্যময় সুদৃশ্য ও সুরম্য রাজপ্রাসাদ, বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জীবনযাত্রা প্রণালী ও রাজকীয় রীতি-নীতি নবাবদের জনবিচ্ছিন্ন রাখলেও তারা জনগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। জনসমক্ষে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নবাবগণ সম্রাটের কাছ থেকে জমকালো উপাধি, বিশেষ অধিকার ও মনসব লাভের ব্যবস্থা করতেন। মুর্শিদকুলি খান 'মুতামিনুল মুলক নাসির উদ্-দৌলাহ নাসিরী নাসিরজঙ্গ' সুজাউদ্দিন খান 'মুতা'মিনুল মুলক সুজা উদ্দিন মুহাম্মদ খান বাহাদুর আসাদজঙ্গ' উপাধি লাভ করেন। আলিবর্দী খানের উপাধি ছিল 'মহাবতজঙ্গ সুজা উল মুলক' আর সিরাজ-উদ-দৌলার 'শাহকুলি খান বাহাদুর' ও 'মনসুর উল মুলক'। শুধু

---

[৬] আবুল করিম, 'প্রাদেশিক শাসন কাঠামোয় সুবা বাংলা', *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৪৭*, প্রথম খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), বাংলা সংস্করণ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.২০৭

[৭] মুর্শিদকুলি খান এবং তাঁর উত্তরসূরী শাসকগণ কীভাবে নবাব এবং তাদের শাসনামল নবাবী আমল নামে পরিচিতি লাভ করেছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

[৮] এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (বাংলঅ অনু:) প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬), পৃপৃ.৩৮-৩৯

Dhaka University Institutional Repository

নবাব নিজের জন্য নয় তাঁর পরিবারের সদস্য ও অনুগ্রহভাজনদের জন্যও এরূপ উপাধি নিশ্চিত করতেন।[৯] রাজকীয় মর্যাদার দ্যোতক হিসেবে নবাব এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের 'নওবত' বা রাজকীয় বাদ্য বাজাবার অধিকার দেয়া হতো। মোজাফ্‌ফর নামার তথ্য মতে, মুর্শিদাবাদের বারোজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সকাল-সন্ধ্যা নওবত বাজানোর অধিকার ছিল।[১০] তাছাড়া নবাবদের রাজকীয় পতাকা বহন করার অধিকার দেয়া হতো। আলীবর্দী খান ও তার পরিবারের সদস্যদের 'মাহী' বা মৎ্যখচিত পতাকা বহনের অধিকার দেয়া হয়েছিল। এসব উপাধি, খিলাত, নওবত ও পতাকা জনসাধারণের কাছে নবাবের সম্মান, মর্যাদা ও দরবারের শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করত।

মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থায় সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের 'মনসব' প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। মনসব (পদ, মর্যাদা, শ্রেণী) শব্দটি উক্ত পদাধিকারীর (মনসবাদার) সামাজিক মর্যাদার দ্যোতক হিসেবে বিবেচিত হতো। মনসব দানের ক্ষমতা ছিল সম্রাটের এখতিয়ারে। সমসাময়িক তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, বাংলার নবাবগণ সকলেই ছিলেন সাতহাজারী মনসব পদাধিকারী। সাতহাজারী মনসবদার হিসেবে নবাবগণ বাদশাহী দরবারের প্রধান ওমরাহ বা অমাত্য অভিজাতদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[১১] নবাবগণ তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্যও মনসব লাভের ব্যবস্থা করতেন।

রাষ্ট্র ও সমাজিক মর্যাদায় নবাবের পরই ছিল নবাব পরিবারের সদস্যদের স্থান। নবাব পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সমকালীন প্রশাসনে উচ্চপদে আসীন হতে দেখা যায়। অমাত্য অভিজাত শ্রেণীর প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হবে। তবে এ পর্যায়ে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী নবাব পরিবারের কয়েকজন মহীয়সী নারীর বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে। নবাব পরিবারের নারীদের রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ লাভের কোন তথ্য জানা যায় না। তবে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে শাসক পরিবারের নারীদের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে মুর্শিদকুলি খানের স্ত্রী নাসিরা বেগম, মুর্শিদকুলি খানের কন্যা নবাব সুজাউদ্দিন খানের স্ত্রী যেবুন্নেসা (কোন কোন সূত্রে তার নাম জিন্নাতুন্নেসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে), আলীবর্দী খানের স্ত্রী শরফুন নেসা, আলীবর্দী খানের কন্যা ঘসেটি বেগম, সিরাজ-উদ-দৌলার মাতা আমেনা বেগম, স্ত্রী লুৎফুন্নেসা, সরফরাজ খানের কন্যা দুর্দানা বেগম এবং মীর জাফরের স্ত্রী মুন্নী বেগম প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। সিরাজ-উদ-দৌলার প্রভাবশালী অমাত্য মোহনলালের বোন আলেয়া বেগমের কথাও কোন কোন সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পদ-পদবিধারী না হলেও উল্লেখিত এসব মহীয়সী নারী নিজ বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভাবলে সমকালীন বাংলার সরকার ও রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে নিজেদের ইতিহাসের আলোচিত চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একবিংশ শতকে নারীর ক্ষমতায়নের এ যুগে আধুনিক নারী সমাজের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় হতে পারে।

---

[৯] উদাহরণ স্বরূপ নবাব আলিবর্দী খানের জামাতা নওয়াজিশ মুহামদ খান, সৈয়দ আহমদ ও জৈনুদ্দিন এর কথা বলা যেতে পারে। নবাব তাদের তিনজনের জন্য যথাক্রমে 'সাহামত জঙ্গ', 'সওলাত জঙ্গ' এবং 'হয়বত জঙ্গ' উপাধি আনয়ন করেন। এর আগে নবাবব সুজাউদ্দিন খানের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের 'রুস্তম জঙ্গ' উপাধি প্রাপ্তির কথা জানা যায়।

[১০] করম আলী, *মোজাফ্‌ফরনামা*, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ ৪১

[১১] রজকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাই. লিঃ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ অভিজাত শ্রেণী

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নবাবী বাংলার পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে অভিজাত শ্রেণীর গঠনকাঠামো ও বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন দেখা যায়। এসময় প্রধান তিনটি অঙ্গশক্তি নিয়ে অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল- (ক) অমাত্য অভিজাত। রাষ্ট্রের পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক পদস্থ অমাত্যদের নিয়ে গড়ে ওঠেছিল অমাত্য অভিজাত শ্রেণী। (খ) ভূস্বামী-জমিদার অভিজাত এবং (গ) বণিক অভিজাত। এ পর্যায়ে এ অভিজাত শ্রেণী সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হলো।

৫.২.১ অমাত্য অভিজাত শ্রেণী

নবাবী আমলে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা- যাদের যুগপৎ প্রশাসনিক, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, আর্থিক সঙ্গতি এবং সামাজিক মর্যাদা ছিল প্রধানত তাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল একটি অমাত্য অভিজাত শ্রেণী। সামাজিক কাঠামোতে অভিজাত হিসেবে নবাব ও নবাব পরিবারের সদস্যবর্গের পরেই ছিল তাদের স্থান। অমাত্য অভিজাত শ্রেণীর শীর্ষে ছিলেন দিউয়ান পদবির কর্মকর্তা। সুবাদারি যুগে সুবার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী কর্মকর্তা ছিলেন দিউয়ান। মুর্শিদকুলি খানের রাজত্বকালের পূর্ব পর্যন্ত মুঘল সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত দিউয়ানগণ বাংলার রাজস্ব সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। আইনত সুবায় দিউয়ানের অবস্থান সুবাদারের নিচে হলেও তিনি সুবাদারের অধীনে ছিলেন না। প্রদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত কাজে দিউয়ান ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এ দপ্তরের কার্যনির্বাহ করে তিনি কেন্দ্রীয় দিউয়ানের কাছে তার হিসাব দাখিল করতেন। সরকারী কার্যনির্বাহের জন্য সুবাদারকে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য দিউয়ানের মুখাপেক্ষী থাকতে হতো। বাংলায় মুর্শিদকুলি খান ছিলেন মুঘল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শেষ বাদশাহী দিউয়ান। মুর্শিদকুলি খানের শাসনামল থেকেই এরূপ স্বতন্ত্র দিউয়ান নিয়োগের প্রথা রহিত হয়ে যায়। পরে অবশ্য তিনি দিউয়ানি দপ্তরে 'দিউয়ান-ই-খাল্সা' নামে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে এর নামকরণ করা হয় 'দিউয়ান-ই-খাল্সা শরিফা'। খালসা বিভাগের দায়িত্ব প্রথমে মুর্শিদকুলি খান স্বয়ং নিজে পালন করতেন এবং তখন তাঁর অধীনে 'পেশকার' পদবিধারী একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এ বিভাগে সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। পরবর্তীকালে নবাব খালসা বিভাগে স্বতন্ত্র দিউয়ান নিয়োগ করেন।[১২] তবে সহকারী হিসেবে পেশকার নিয়োগ বিধান অব্যাহত রাখা হয়। দিউয়ানের মৃত্যুর পর সাধারণত পেশকারকে উক্ত পদে নিয়োগ করা হতো। উল্লেখ্য যে, নবাবী শাসনামলে দিউয়ান-ই-খালসা পদে অধিকাংশ সময় হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হতো এবং নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তা 'রায় রায়ান' উপাধি লাভ করতেন। মুর্শিদকুলি খানের শাসনামলে পরে বাদশাহী দিউয়ানের স্থানে 'দিউয়ান-ই-আলা' নামে একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এই কর্মকর্তা ছিলেন মূলত রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী।[১৩] মুর্শিদকুলি খানের সময় তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খান নামেমাত্র এ পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। সুজাউদ্দিন খানের সময় হাজী আহমদ প্রকৃতপক্ষে এ পদ অলঙ্কৃত করেন। এ সময় রাজস্ব প্রশাসনে

---

[১২] কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল*, প্রথম প্রকাশ, ১৯০১, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ.পৃ ৩০৪-৩০৫

[১৩] ঐ, পৃ.৩০১

Dhaka University Institutional Repository

'দিউয়ান-ই-তান' পদবির একজন কর্মকর্তা ছিলেন। প্রদেশের সেনাবাহিনীর বেতন ও ভাতা প্রদানের কাজ তদারক করা ছিল তার কর্তব্য।

নবাবী প্রশাসনে দিউয়ানের পর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন বখশি। সেনাবাহিনীর বেতন প্রদানসহ সৈন্যদের সংগঠন, প্রশিক্ষণ এবং সজ্জিতকরণের দায়িত্ব ছিল বখশির। তাছাড়া মনসবদারদের কার্যাবলি তদারকির দায়িত্বও ছিল বখশির হাতে। নবাব সরকারে বখশির দুটি পদ ছিল বলে জানা যায়। এদের মধ্যে প্রধান বখশির পদবি ছিল 'মীর বখশি কুল' এবং দ্বিতীয় বখশির 'বখশিয়ে দুয়ম'।[১৪] তাছাড়া গোলন্দাজ বাহিনীর জন্যও একজন বখশি নিয়োগ করা হতো। রাজকীয় নৌবাহিনী বা নাওয়ারার প্রধানের পদবি ছিল মীরবহর। এটিও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদ ছিল আলিবর্দী খানের সময় তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌল্লাহকে এ পদে নিয়োগ তার প্রমাণ।[১৫] মুঘল সুবাদারি শাসন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বখশি কেন্দ্রীয় বখশি বা মীর বখশির সুপারিশক্রমে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। নবাবী শাসন ব্যবস্থায় বখশিসহ উপর্যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ কর্তৃত্ব নবাবদের হাতে চলে আসে। তবে এসব নিয়োগ কেন্দ্রীয় মুঘল সম্রাটের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল।

নবাবী বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন নায়েব নাজিম ও নায়েব দিউয়ান। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে নাজিমের সুপারিশক্রমে নায়েব নাজিম এবং প্রাদেশিক দিউয়ানের সুপারিশক্রমে নায়েব দিউয়ান সম্রাট কর্তক নিযুক্ত হতো। মুর্শিদাবাদ নিযামত আমলে এ নিয়ম অব্যাহত থাকে।[১৬] নবাবী আমলে উড়িষ্যা, বিহার এবং জাহাঙ্গীরনগর ছিল নায়েব নাজিমের শাসনাধীন। নায়েব নাজিম পদে সাধারণত নবাবের নিকটাত্মীয় বা তাঁর ঘনিষ্ট কাউকে নিয়োগ দেয়া হতো। নায়েব নাজিমের অনুপস্থিতিতে দিউয়ান তার পক্ষে শাসন কাজ পরিচালনা করতেন।

নবাবী বাংলার শাসন কাঠামোতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল ফৌজদার। মুঘল প্রশাসনে ফৌজদার ছিলেন প্রশাসনিক ইউনিট 'সরকার' এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। উল্লেখ্য যে, মুঘল শাসনামলে সুবাহ বাংলা মোট ৩৪টি 'সরকার' এ বিভক্ত ছিল।[১৭] কিন্তু মুর্শিদকুলি খান তাঁর প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সরকারগুলো তুলে দিয়ে সমগ্র বাংলাকে ১৩টি বৃহৎ দিউয়ানি 'চাকলা'য় বিভক্ত করেন। তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জমিদারি ও তালুকদারি স্বত্ব একত্রে সমন্বয় করে ২৫টি বড় 'ইহতমাম'[১৮] সৃষ্টি করা হয়। নিজামতের সামরিক কর্তৃত্বাধীনে বাংলায় মাত্র ১০টি ফৌজদারী এলাকা বহাল রাখা হয়

---

[১৪] কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০২

[১৫] এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯

[১৬] Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* vol.IB, Riyad, KSA, 1985, p.743

[১৭] মোহাম্মদ মহর আলী প্রশাসনিক ইউনিট সরকারকে আধুনিক জেলার সাথে তুলনীয় মনে করেন। Muhammad Mohar Ali, *op. cit.* p. 744

[১৮] একজন বড় জমিদারের নিয়ন্ত্রিত জমিদারী এলাকাকে 'ইহতমাম' বলা হয়। একটি ইহতমামে একাধিক ক্ষুদ্র জমিদারি ও তালুকদারি থাকা সম্ভব ছিল। একাধিক ইহতমাম নিয়ে একটি দিউয়ানি চকলা গঠিত হয়েছিল। এভাবে ২৫টি ইহতমাম সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয় ১৩ টি চাকলা।

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে ফৌজদারদের সরাসরি শাসন বজায় থাকে।[১৯] সুবাদারি যুগে সম্রাট ছিলেন ফৌজদারের নিয়োগকর্তা। সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের তিনি এ পদে নিয়োগ করতেন। নবাবী আমলে ফৌজদার নিয়োগের ভারও নবাবগণ স্বহস্তে গ্রহণ করেন।
উপরে বর্ণিত বেসামরিক, রাজস্ব ও সামরিক বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও নবাবী বাংলায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল সদর কাননগো, সদর কাজী, ওয়াকিয়ানবিশ ও সদর আমিল ইত্যাদি। সুবাদারি শাসন ব্যবস্থায় এসব কর্মকর্তা বাদশাহী দরবার থেকে নিয়োগ পেতেন। শাসন ব্যবস্থায় তাদের উল্লেখযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল। নবাবী আমলে তাদের নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তিত হলেও প্রশাসনিক গুরুত্ব এবং সম্মান অক্ষুণ্ন থাকে। পূর্বে বর্ণিত দিউয়ান-ই-আলাসহ রাজস্ব বিভাগীয় পদস্থ কর্মকর্তা, নায়েব নাজিম, বখশি, মীরবহর, ফৌজদার, সদর কানুনগো, সদর কাজী ও সদর আমিল ইত্যাদি পদাধিকারী কর্মকর্তা এবং এর সাথে সামরিক বাহিনীর পদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে নাবাবী বাংলার অমাত্য অভিজাত শ্রেণী। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুঘল ঐতিহ্য অনুসারে নবাবী আমলেও সামরিক বেসামরিক অমাত্যদের মনসব প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। নবাবী বাংলায় কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ সাত হাজারী মনসব পদাধিকারী হতে দেখা যায়। সর্বনিম্ন মনসব কত ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে এ ব্যাপারে পণ্ডিত মহলে কোনো দ্বিমত নেই যে, সামরিক, বেসামরিক অমাত্যদের মধ্যে যারা সর্বনিম্ন এক হাজারী মনসব পদাধিকারী ছিলেন তাদের থেকে শুরু করে তদুর্ধ্ব মনসব পদাধিকারী কর্মকর্তাদের নিয়েই গড়ে ওঠেছিল নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গশক্তি অমাত্য অভিজাত শ্রেণী।
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুঘল সুবাদারি শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োজিত অমাত্যরাই ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের প্রধান অভিজাত। এম.এ. রহিমের বর্ণনা মতে, এ আভিজাত্যের মানদণ্ড ছিল প্রতিভা ও যোগ্যতা; এটি কোন জন্মগত কৌলিন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। প্রতিভা ও রাজকার্যে কৃতিত্ব প্রদর্শনের সাহায্যে নিম্নশ্রেণীর লোকও অমাত্য অভিজাত শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত হতে পারতেন।[২০] ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের বক্তব্যেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। বার্নিয়ারের বর্ণনা মতে, ফরাসীদের মত মুঘল আমলা অভিজাততন্ত্র বংশানুক্রমিক ছিল না। সভাসদদের মধ্যে কদাচিৎ আমিরদের বংশধরদের দেখা যায়। চাকরীর নিয়ম অনুযায়ী অভিজাতদের পুত্র সন্তানদেরকেও সামান্য বেতন ও পদ নিয়ে চাকরী শুরু করতে হতো এবং পরে তারা ক্রমান্বয়ে উচ্চপদ ও দায়িত্বপূর্ণ মর্যাদায় উন্নীত হতেন বলে বার্নিয়ার উল্লেখ করেছেন।[২১] এছাড়া সমসাময়িক কিছু রচনাতেও স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভা বলে নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকের মুঘল প্রশাসনে উচ্চপদে আসীন হওয়ার উদাহারণ পাওয়া যায়। এসব বক্তব্যের মোদ্দা কথা হচ্ছে, বংশ বা রক্তধারা নয়, বরং প্রতিভাই ছিল মুঘল অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে প্রবেশের একমাত্র সিঁড়ি। মুঘল সুবাদারি যুগে উচ্চ রাজকর্মচারী নিয়োগে মেধা ও যোগ্যতার গুরুত্ব ছিল সন্দেহ নেই, তবে এ আভিজাত্যে জন্মগত ও বংশগত কৌলিন্যের বিবেচনা কাজ করতো না- এমত

[১৯] এদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম শাসিত নিয়াবত। অন্য নয়টি ছিল চট্রগ্রাম, মেদিনীপুর, পুর্ণিয়া, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, রাঙ্গামাটি, কটোয়া, ও হুগলী এলাকা। রজকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৪৫
[২০] এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ ১১২-১১৩
[২১] উদ্ধৃতি বিনয় ঘোষ , *বাদশাহী আমল*, পৃ. ৯০

সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। নিয়োগরীতিতে বংশধারা ও জন্মসূত্রের নীতিতে গভীর মনযোগ দেয়া হতো বলে ইরফান হাবিব উল্লেখ করেছেন।[২২] এম. আতহার আলী দেখিয়েছেন যে, অভিজাতগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে বংশগত গুণাবলির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো।[২৩] শেখর বন্দোপাধ্যায়ও এরূপ মত প্রকাশ করেছন। তাঁর ভাষায়:

> মুঘল রাজপুরুষদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বংশ মর্যাদাকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো। বংশ গৌরবহীন প্রতিভাবান এবং দক্ষ ব্যক্তিদের উচু পদে নিয়োগের রীতি একেবারে অপ্রচলিত না থাকলেও মনসবদারি পদের জন্য সবচেয়ে বড় দাবীদার ছিলেন অন্যান্য মনসবদারের পুত্র এবং বংশধরেরা, যাদের বলা হতো খানাজাদ।[২৪]

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ১৬৫৮-১৬৭৮ এবং ১৬৭৯-১৭০৭ খ্রি. বর্ষসীমায় উচ্চ মনসব অধিকারী (১০০০ হাজার মনসব থেকে তদুর্ধ্ব) অভিজাত অমাত্যদের মধ্যে খানাজাদদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে শতকরা ৪৪ ও ৪৭ ভাগ।[২৫]

উপরের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, কেবল প্রতিভা ও যোগ্যতা নয়, বংশ মর্যাদা বা কৌলিন্যও মুঘল কর্মচারী অভিজাত্যের নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল থেকে সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহের মৃত্যু পর্যন্ত (১৬০৫-১৭১২ সাল) একশত সাত বছরকালে বাংলায় নিয়োগপ্রাপ্ত সুবাদারদের পরিচয় থেকেও এর সত্যতা পাওয়া যায়। উল্লেখিত সময়কালে ৭৭ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন সম্রাটের পরিবারের সদস্য বা তাঁর ঘনিষ্ট আত্নীয়স্বজন।[২৬] অবশিষ্ট ৩০ বছর যারা সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তাদেরও কেউ কেউ কোনো না কোনোভাবে সম্রাটের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এ সকল সুবাদার তাদের সাথে নিজ পরিবার-পরিজন ও আত্নীয় ঘনিষ্টজনদের বাংলায় নিয়ে আসতেন এবং তাদের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতেন।[২৭] এসব সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সুবাদারি শাসনামলে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে অর্ন্তভুক্তির জন্য প্রতিভা ও যোগ্যতা বিশেষভাবে প্রয়োজন হলেও প্রার্থীর বংশ পরিচয়, কৌলিন্য ইত্যাদিও বিশেষভাবে বিবেচনা করা হতো। তাছাড়া রাজপরিবারের সাথে আত্নীয়তা ও ঘনিষ্টতার বিষয়টিও উপেক্ষা করা হতো না। আর এর ফলে অনেক সময় অযোগ্য

---

[২২] ইরফান হাবিব, 'প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে ভূ-সম্পত্তির সামাজিক বন্টন: একটি ঐতিহাসিক নিরীক্ষা' *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, ইরফান হাবিব (সম্পাঃ), বাংলা অনুবাদ, কাবেরী বসু, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাই. লিঃ, ২০০২, পৃ. ৮০

[২৩] M . Athar Ali, *The Mughal Nobility under Aurangzeb*, অরুণ কুমার দে কর্তৃক *ঔরঙ্গজেবের সময় মুঘল অভিজাত শ্রেণী*, শিরোনামে বাংলায় অনুদিত, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৭

[২৪] শেখর বন্দোপাধ্যায়, *অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা*, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৪

[২৫] এম আতহার আলী, *ঔরঙ্গজেবের সময় মুঘল অভিজাত শ্রেণী*, পৃ. ৮

[২৬] এ সময় দায়িত্ব পালনকারী সুবাদারদের মধ্যে যুবরাজেরা (শাহজাদা মুহাম্মদ সুজা ১৬৩৯-১৬৬০ সাল এবং শাহাজাদা আজিম উশ-শান ১৬৯৭-১৭১২ সাল পর্যন্ত) প্রায় ছত্রিশ বছর, সম্রাটের মামা (শায়েস্তা খান ১৬৬৪,৬৮,১৬৬৯-১৬৮৮ সাল) প্রায় ২৪ বছর, সম্রাটের শ্যালক (ইব্রাহিম খান ফতেহজঙ্গ ১৬১৭-১৬২৪) সাত বছর এবং সম্রাট পরিবারের সাথে ঘনিষ্ট শায়খ সেলিম চিশতির উত্তরাধিকারীগণ (ইসলাম খান চিশতি ও কাসিম খান চিশতি) প্রায় দশ বছর বাংলা শাসন করেন।

[২৭] উদাহরণ স্বরূপ চিশতি পরিবারের কথা বলা যেতে পারে। ইসলাম খান চিশতি ও কাসিম খান চিশতির আত্নীয়রা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পায়। ফলে বাংলার রাজনীতিতে এ পরিবারের প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। আবার ইব্রাহীম ফতেহজঙ্গ ও কাসিম মিনহাজের সময় সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের আত্নীয় স্বজনরা বাংলার প্রশাসনযন্ত্রে আধিপত্য বিস্তার করে। সুবাদার শায়েস্তা খানের শাসনামলে তাঁর পুত্রদের উচ্চপদে নিয়োগ লাভের বিষয়টিও আমাদের অজানা নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিও উচ্চ পদ লাভ করে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে নিজের ঠাঁই করে নিতেন। প্রসঙ্গত পুনশ্চ উল্লেখ্য করা আবশ্যক যে, মুঘল সুবাদারি যুগে বাংলায় অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল নিরঙ্কুশ। যোগ্যতা থাকা সত্বেও এ অভিজাত্যে হিন্দুদের প্রবেশধিকার ছিল নিতান্তই সীমিত।

নবাবী আমলে বাংলায় অমাত্য অভিজাত শ্রেণীর সংগঠন ও নিয়োগে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এসময় পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদোন্নতির নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র বাদশাহী দরবার থেকে নবাব দরবারে স্থানান্তরিত হয়। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, সুবাদারি যুগে অত্মীয়তা, বংশধারা অমাত্য হিসেবে নিয়োগ লাভে বিবেচনা করা হলেও মেধা ও যোগ্যতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। নবাবী আমলে এর ব্যত্যয় ঘটে। আত্মীয়তা বা রক্ত সম্পর্ক, উত্তরাধিকার ও স্বজনপ্রীতি ধীরে ধীরে আভিজাত্যের মানদণ্ড হয়ে দাড়ায়। এ যুগের অমাত্য অভিজাত শ্রেণীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে স্থানীয়দের অন্তর্ভুক্তি। নবাবী যুগে দিল্লীর সাথে বাংলার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উত্তর ভারত থেকে বাংলায় প্রভিভাবান ব্যক্তিদের আগমন প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে সুবা বাংলার সর্বভারতীয় ক্ষমতা একটি আঞ্চলিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মুর্শিদকুলি খান ও তাঁর উত্তরাধিকারী নবাবদেরকে অনেকটা বাধ্য হয়েই নতুন ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে স্থানীয় আঞ্চলিক শক্তিগুলোকেও জায়গা করে দিতে হয়। এর ফলে প্রশাসনে স্থানীয়দের নিয়োগ লাভের সুযোগ অবারিত হয়। তবে এক্ষেত্রেও নবাবী প্রশাসনে একটি ব্যতিক্রমি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুবাদারি যুগে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে মুসলমানদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল। মুনিম খানের (১৫৭৪-৭৫) সুবাদারি থেকে মুর্শিদকুলী খানের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় নিযুক্ত ২৮ জন সুবাদারের মধ্যে একমাত্র রাজ মানসিংহ (১৫৯৪-১৬০৬) ছিলেন হিন্দু। দিউয়ান পদে নিয়োগ লাভকারীদের দীর্ঘ তালিকায় একমাত্র জওহরমল দাস নামক একজন হিন্দুর নাম দেখা যায়। অবশ্য সুবাদার, দিউয়ান, বখশি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সংস্থাপনায় নিম্নপদে হিন্দুদের নিয়োগ করা হতো। তবে এসব হিন্দু কর্মকর্তাগণও স্থানীয় ছিলেন না। মুসলিম কর্মকর্তাদের মত তারাও উত্তর ভারত থেকে আসতেন এবং কাজ শেষে আবার ফিরে যেতেন।[২৮] কিন্তু নবাবী আমলে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। অমাত্য নিয়োগে বিশেষ করে স্থানীয়দের নিয়োগের ক্ষেত্রে নবাবগণ জাতি ও ধর্মের বিচার না করায় অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে হিন্দুদের প্রবেশের সুযোগ ঘটে এবং কালক্রমে তারা শক্তিশালী অবস্থানে উন্নীত হয়। নবাব সরকার কর্তৃক স্থানীয় প্রতিভাবান হিন্দুদের প্রশাসনের উচ্চপদে নিয়োগ দানের নীতি গ্রহণের পিছনে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কারণও ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। এ নীতি অনুসরণ করে তারা সম্ভবত বাংলায় সব শ্রেণীর লোকের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। যা হোক, নবাবদের এ নীতির ফলে আমত্য অভিজাত শ্রেণীতে স্থানীয় হিন্দুদের অবস্থান নিশ্চিত হয়। মুঘল সুবাদারি শাসনামলে যা ছিল অকল্পনীয়।

নবাবী বাংলার আমাত্য অভিজাতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা বা কোন বিবরণ সমসাময়িক বা পরবর্তী কোন তথ্য উৎস থেকে জানা যায় না। তবে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন বিবরণসমূহ বিচার বিশ্লেষণ করে অমাত্য অভিজাতদের সম্পর্কে একটি ধারণা নেয়া

[২৮] J.N. Sarkar (ed.), *History of Bengal, vol. II*, Fourth Impression, Dhaka, University of Dhaka, 2006,p. 223

Dhaka University Institutional Repository

যায়। উল্লেখ্য যে, মুঘল কেন্দ্রীয় শাসনের পতন যুগে কেন্দ্র থেকে বাংলায় কর্মকর্তা নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেলে গোটা প্রাদেশিক শাসন মুর্শিদকুলি খানের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। এ সুযোগে তিনি বাংলার প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ প্রশাসনিক পদে তার নিকটাত্মীয়দের অথবা তাঁর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজনদের নিয়োগ দেন। মুর্শিদকুলি খান তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খানকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করেন। দিউয়ান-ই-আলা বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান নবাবের দৌহিত্র সরফরাজ খান। মুর্শিদকুলি খানের সময় খান মওন্দী আলী খান, ইতিসাম খান এবং ইতিসাম খানের পুত্র (নাম জানা যায় না) যথাক্রমে জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। ঢাকা থেকে কোলকাতা কাউন্সিলকে লিখিত একটি চিঠির সূত্র ধরে আবদুল করিম ইতিসাম খান ও তার পুত্রকে নবাবের আত্মীয় বলে উল্লেখ করেছেন।[২৯] সলিমুল্লাহর বর্ণনানুযায়ী মুর্শিদকুলি খান তার দৌহিত্রী নাফিসা বেগমের জামাতা মির্জা লুৎফুল্লাহকে ঢাকার নায়েব নাজিম নিয়োগ এবং 'মুর্শিদকুলি খান' উপাধি দেন।[৩০]

মুর্শিদকুলি খান বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দিউয়ান থাকা অবস্থাতেই সম্রাটের অনুমতিক্রমে তিন প্রদেশেই তিনি তাঁর সহকারী নিয়োগ করেছিলেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি তাঁর অনুগ্রহভাজন সৈয়দ আকরাম খানকে পূর্ণমর্যাদার দিউয়ান পদে উন্নীত করেন। ১৭১৭ সালে সৈয়দ আকরাম খান মৃত্যুবরণ করলে নবাব তাঁর নবাবের দৌহিত্রী জামাতা সৈয়দ রাজী খানকে দিউয়ান নিযুক্ত করেন।[৩১] সৈয়দ রাজী খানের মৃত্যুর পর নবাবের সুপারিশে তাঁর দৌহিত্র মির্জা আসাদুল্লাহকে সম্রাট 'সরফরাজ খান' উপাধিসহ দিউয়ান নিযুক্ত করেন।[৩২] মুর্শিদকুলি খানের সময় নিয়োগপ্রাপ্ত ফৌজদারদের তালিকাতেও তাঁর আত্মীয় ও অনুগ্রহভাজনদের অবস্থান দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বালাসোরের ফৌজদার তকী খান এবং ভূষণার ফৌজদার বখশ আলী খানের কথা বলা যায়।[৩৩] পূর্ণিয়ার ফৌজদার সায়েফ খান এবং হুগলির ফৌজদার আহসান উল্লাহ খান নবাবের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। মুর্শিদকুলি খানের সময় চট্টগ্রাম ও সিলেটে ফৌজদার হিসেবে দয়িত্বপালনকারী বেশ কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ছিলে চট্টগ্রামের রহমতউল্লাহ খান (১৭০০-১৭০৬), বাশারাত খান (১৭০৬-১৭০৮), সরবুলন্দ খান (১৭০৯-১৭১০), সোহরাওয়ার্দী খান (১৭১০-১৭১২), মীর হাদী (১৭১৩), ওয়ালী বেগ খান

---

[২৯] Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Time*, মোকাদ্দেসুর রহমান কর্তৃক *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, শিরোনামে বাংলায় অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৬৫

[৩০] Salimulla, *Tarikh-i-Bangla,* Eng. Trns. o. 101; *রিয়াজ-উস-সালাতিনে*ও অনুরূপ বর্ণনা আছে।গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, পৃ. ১৭৭ । কিন্তু আবদুল করিম এ তথ্যকে ভুল বলেছেন। তাঁর মতে, মির্জা লুৎফুল্লাহ নবাব মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যুর আট মাস পর জাহাঙ্গীরনগরে পৌছেছিলেন।[৩০] তবে সলিমুল্লাহর তথ্যকে যে যুক্তিতে আবদুল করিম ভুল বলেছেন তা যথাযথ নয়। মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যুর পর সিংহাসনকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নবাব পরিবারের একজন সদস্যের রাজধানীতে অবস্থান অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, পরবর্তী নবাবদের সময়ও জাহাঙ্গীরনগরে নিযুক্ত নায়েব নাজিমগণ প্রায় সকলেই ছিলেন নবাবদের আত্মীয়। তারা কর্মস্থলে কদাচিৎ উপস্থিত থাকতেন। অধিকাংশ সময়ই তারা রাজধানীতেই বসবাস করতেন। তাদের পক্ষে তাদের দিউয়ানগণ রাজকার্য পরিচালনা করতেন। মির্জা লুৎফুল্লাহর ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা হওয়া বিচিত্র নয়।

[৩১] Salimulla. *op. cit.* p. 99

[৩২] *Ibid*

[৩৩] প্রথমোক্তজন ছিলেন মুর্শিদকুলি খানের জামাতা সুজাউদ্দিন খানের পুত্র এবং সরফরাজ খানের বৈমাত্রেয় ভাই এবং দ্বিতীয়জন নবাবের শ্যালক। আবদুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৬৫

Dhaka University Institutional Repository

(১৭১৩-১৭২৩), ও ইয়াসীন খান (১৭২৩-১৭২৭) এবং সিলেটে নিযুক্ত কারগুজার খান (১৭০৩-১৭০৭), মতিউল্লাহ খান (১৭০৭-১৭০৯), রহমত খান (১৭০৯), তানিব আলী খান, কাকতালাব খান বিজাপুরী, সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান (১৭১৯), শুকুর উল্লাহ (১৭২০), হরকিশান দাস (১৭২১-১৭২৩) ও শুকুর উল্লাহ (১৭২৪-১৭২৮) প্রমুখ।[৩৪]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় মুঘল শক্তির ক্রমাবনতির সুযোগে মুর্শিদকুলি খান প্রশাসনযন্ত্রের উপর তাঁর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এ সময় বাংলার প্রশাসন ছিল মূলত মুর্শিদকুলি খান কেন্দ্রিক। এ সুযোগে তিনি নিজেকে এমন এক অমাত্য শ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন, যারা তাঁর সাথে রক্তের বা বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্র অথবা নবাব কর্তৃক প্রাপ্ত অনুগ্রহের কারণে সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকারে নবাবের প্রতি বিনীত ও অনুগত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অমাত্য শ্রেণীর আনুগত্য নিশ্চিতকরণে মুর্শিদকুলি খানের উর্পযুক্ত নীতি কেবল তাঁর নিজের জন্য নয়, নিঃসন্দেহে তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্যও অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আর তাই তাঁর উত্তরাধিকারীগণও এ নীতি সযত্নে লালন ও অনুসরণ করেন।

নবাব সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের রাজত্বকালে (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.)আত্মীয় ও অনুগ্রহভাজনদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চপদ বিতরণ প্রক্রিয়াটি আরো ব্যাপকতা লাভ করে। সুজাউদ্দিন খান উদারভাবে তাঁর স্বদেশি ইরানি বহিরাগতদের বাংলায় স্থান দেন এবং তাদের উচ্চপদে নিয়োগ ও মনসব দানের ব্যবস্থা করেন। নবাবের জ্যেষ্ঠপুত্র সরফরাজ খানকে বাংলার দিউয়ান এবং দ্বিতীয়পুত্র মুহাম্মদ তকী খানকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে নিয়োগ দেয়া হয়। নবাবের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানকে জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম পদে বহাল রাখা হয়।[৩৫] *তারিখ-ই-বাঙ্গলাহ্* ও *রিয়াজ-উস-সালাতিনে*র তথ্য মতে, নবাবের প্রিয়পাত্র আলিবর্দী খানকে প্রথমে রাজমহলের (আকবরনগর) ফৌজদার এবং পরে আজিমাবাদের (বিহার) নায়েব নাজিম পদে নিয়োগ করা হয়।[৩৬] উল্লেখ্য যে, আলিবর্দী খান সুজাউদ্দিন খানের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কেও জড়িত ছিলেন। মোজাফ্ফরনামার তথ্য মতে, নবাব সুজাউদ্দিন খান এবং আলিবর্দী খান একই পূর্বপুরুষদের বংশধর ছিলেন।[৩৭] আলিবর্দী খানের ভাই হাজী আহমদকে নবাবের তিন সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কাউন্সিলের

---

৩৪ Syed Murtaza Ali, 'Book Review of Abdul Karim's Murshid Quli khan and His Times', *Journal of Asiatic Society of Pakistan,* Vol.IX, No. I, 1964, p. 195

৩৫ সৈয়দ গোলাম হেসেন খান তবাতবায়ি, *সিয়ার-উল-মুতায়খ্খিরিন*, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া , দিব্য প্রকাশ , ঢাকা, ২০০৬, পৃ.৬

৩৬ Salimulla. *op. cit.* p.136; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৭ । *সিয়ার-উল-মুতায়াখ্খিরনে* অবশ্য ভিন্ন তথ্য দেয়া হয়েছে। এ সূত্র অনুযায়ী, আলিবর্দী খানের কনিষ্ঠ জামাতা জৈনউদ্দিন আহমদ খানকে আকবরনগরের ফৌজদার পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। আলিবর্দী খানকে প্রথমে রাজ্যের সার্বিক প্রশাসনিক ও রাজস্ব ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের জন্য গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য নিয়োগ করা হয়। এ ব্যবস্থা আলিবর্দী খানের আজিমাবাদের নায়েব সুবাদার নিয়োগ লাভের পূর্বপযর্ন্ত বলবৎ ছিল। (সৈয়দ গোলাম হেসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬) এ বক্তব্যই সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। কেননা *তারিখ-ই বাঙ্গালাহ্* ও *রিয়াজ-উস-সালাতিনে* আলিবর্দী খানের কনিষ্ঠ এ জামাতা জৈনুদ্দিন কে কেবল 'হাশিম আলী খান' উপাধি দেয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। সুজাউদ্দিন খানকে সিংহাসনে বসানোর মূলনায়ক ছিলেন আলিবর্দী খান ও তাঁর ভাই হাজী আহমদ। জৈনুদ্দিন খান ছিলেন যথাক্রমে তাদের জামাতা ও পুত্র। অতএব তাঁকে কোন রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ না দিয়ে কেবল উপাধি দেয়া হয়েছিল এ মত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, আলিবর্দী খান আজিমাবাদে যাওয়ার সময় জৈনউদ্দিন খানকে তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়ায় আকবরনগরের ফৌজদারের পদটি শূন্য হয়। তখন এ পদে নিয়োগ লাভ করেন হাজী আহমদের জামাতা আতাউল্লাহ খান।

৩৭ করম আলী, *মোজাফ্ফরনামা*, বাংলা অনুবাদ আ. কা. মো. জাকারিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম সদস্য নিয়োগ করা হয়। হাজী আহমদের তিন পুত্রকে উচ্চ রাজপদ ও উপাধি প্রদান করা হয়।[৩৮] জ্যেষ্ঠ নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানকে সামরিক বাহিনীর বখশি, দ্বিতীয় সাঈদ আহমদ খানকে রংপুরের ফৌজদার এবং কনিষ্ঠ জৈনউদ্দিন আহমদ খানকে আকবরনগরের ফৌজদার নিয়োগ করা হয়েছিল। রিয়াজের বর্ণনা মতে, নবাব তাঁর আশ্রিত ও ঘনিষ্ট সহচর সুজাকুলী খানকে হুগলির ফৌজদার পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন।[৩৯]

সুজাউদ্দিন খানের মনোনীত উত্তরসূরী হিসেবে পুত্র সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০ খ্রি.) নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন। নবাব হিসেবে তিনিও আত্মীয়-স্বজন ও অনুগ্রহভাজনদের উচ্চপদে নিয়োগ দানের পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্য অনুসরণ করেন। তাঁর পিতার সময়ে যেসব আত্মীয় স্বজন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি তাদের স্ব স্ব পদে বহাল রাখেন। উপরন্তু তিনি আত্মীয় পরিজনদের নতুনভাবে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। গিরিয়ার যুদ্ধে যাত্রার প্রাক্কালে নবাব মুর্শিদাবাদের ভার তাঁর পুত্র হাফিজুল্লাহ খানের (মীর্জা সামানী নামে সমাধিক পরিচিত) হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। গিরিয়ার সামরিক অভিযানে সেনাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল নাববের দুই জামাতা হাসান মুহাম্মদ খান ও গজনফর আলী খানকে।[৪০] নবাবের জামাতা মুরাদ আলী খানও উচ্চরাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। তবে তাঁর পদবি কী ছিল তা কোন সূত্র থেকেই জনা যায় না।

নবাব আলিবর্দী খানও (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) তাঁর পরিবার ও অনুগ্রহভাজন এবং আত্মীয় স্বজনদের উচ্চপদে উন্নীত করার নীতি অনুসরণ করেন বলে সমসাময়িক তথ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায়। তাঁর এ নীতি অনুসরণের ফলে মেধা অপেক্ষা আত্মীয়তা ও পারিবারিক সম্পর্কের কারণে অনেকেই অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে ঠাঁই করে নিতে সক্ষম হয়েছিলন। প্রসঙ্গত মীর জাফর আলী খানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জাফর আলী খান ছিলেন আলিবর্দী খানের বৈমাত্রেয় বোন শাহ খানমের স্বামী। ইউসুফ আলী খানের বর্ণনা মতে, মীর জাফর আলী খান ছিলেন অমনযোগী ও অলস প্রকৃতির।[৪১] এতদসত্ত্বেও শুধু আত্মীয়তার বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়ে আলিবর্দী খান তাঁকে সমর বিভাগের বখশির মতো উচ্চপদে নিয়োগ দেন। একই কথা প্রযোজ্য সিরাজ-উদ-দৌলাহ এবং তাঁর ভাই একরাম-উদ-দৌলাহ প্রসঙ্গেও। নবাব তাঁর এ দৌহিত্রদ্বয়কে অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও যথাক্রমে ঢাকার নাওয়ারা বিভাগের প্রধান এবং ঢাকার সেনাপ্রধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ রাজপদে নিয়োগ দিয়েছিলেন।[৪২] তাদের দুজনের জন্যই সাত হাজারী মনসব পদও নিশ্চিত করা হয়েছিল। নবাব তাঁর আরেক দৌহিত্র শওকত জঙ্গকে পুর্ণিয়ার ফৌজদার নিয়োগ করেছিলেন। নবাবের জামাতা নওয়াজিস মুহাম্মদ খান ঢাকার নায়েব নাজিম, সাঈদ আহমদ খান উড়িষ্যার নায়েব নাজিম এবং জৈনুদ্দিন আহমদ খান বিহারের নায়েব নাজিম পদে নিয়োগ লাভ করেছিলেন। ত্রিহুতের ফৌজদার আবদুল আলী খান ছিলেন নবাবের চাচাতো ভাই এবং রংপুরের ফৌজদার

---

[৩৮] অপুত্রক আলিবর্দী খান তাঁর তিন কন্যাকে তাঁর তিন ভ্রাতুস্পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। পিতা ও পিতৃব্য-শ্বশুরের প্রভাবে হাজী আহমদের তিন পুত্রই নবাব সুজাউদ্দিন খানের আমলে উচ্চপদ লাভ করেছিলেন।

[৩৯] Salimulla. *op. cit.* p.136, গোলাম হোসেন সলিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭

[৪০] ইতোপূর্বে তিনি জামাতা হাসান মুহাম্মদ খানকে আকবরনগরের ফৌজদার নিয়োগের চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাঁর এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পাদটীকা, পৃ. ১৯

[৪১] ঐ, পৃ.পৃ. ৮৩, ৯৬

[৪২] K. K. Datta, *Alivardi Khan and His Time,* University of Calcutta, Calcutta, 1939, p. 39

Dhaka University Institutional Repository

কাসেম আলী খান ছিলেন শ্যালক। অমাত্য অভিজাত আল্লাইয়ার খান ছিলেন নবাবের বৈমাত্রেয় ভাই। রাজমহল ও ভাগলপুরের ফৌজদার আতাউল্লাহ খান ছিলেন নবাবের ভাতুস্পুত্রী জামাতা। হুসেনকুলি খানও তাঁরচাচাতো ভাই হায়দর আলী খান ছিলেন নবাবের অন্যতম অনুগ্রহভাজন। এদের প্রথমোক্তজন জাহাঙ্গীনগরের নায়েব নাযিমের সহকারী ও দ্বিতীয় জন নবাবের গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভ করেছিলেন।[৪৩]

আলিবর্দী খানের সিরাজ-উদ-দৌলাহ (১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রি.) মাত্র এক বছরের কিছু বেশি সময় ক্ষমতায় ছিলেন। এ অল্প সময়ে নানা অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও সংকট মোকাবেলায় ব্যতিব্যস্ত থাকায় তাঁর পক্ষে শাসনযন্ত্রে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি মোহন লাল, মীর মদন, খাজা আবদুল হাদীসহ তার বিশ্বস্ত ও অনুগ্রহভাজন কয়েকজনকে উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন।[৪৪] প্রশাসনে আত্মীয়করণ ও অনুগ্রহভাজনদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় উচ্চপদ বন্টনের রীতি নবাব মীর জাফর আলী খান এবং নবাব মীর কাসেম আলী খানের সময়ও অব্যাহত ছিল বলে জানা যায়।

উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, নবাবী বাংলায় প্রশাসনের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাদের নিয়ে যে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীর গড়ে ওঠেছিল সেখানে নবাবদের আত্মীয় পরিজনদের ব্যাপক প্রাধান্য ছিল। এতে নবাবগণ ব্যক্তিগতভাবে অমাত্যদের আনুগত্য লাভ করেন বটে, তবে সার্বিকভাবে এর দ্বারা রাষ্ট্র ও প্রশাসনযন্ত্র বড় রকমের ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কেননা প্রশাসনে আত্মীয়করণ করার ফলে অনেক সময় অযোগ্য লোকও রাষ্ট্রে অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদাভিসিক্ত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মীর জাফর আলী খানসহ কয়েকজনের কথা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পদে এরূপ অযোগ্য লোকের নিয়োগ লাভের ফল কী হয়েছিল- তা কারো অজনা নয়। তবে একথাও সত্য যে, নবাবী প্রশাসনে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা ও প্রতিভা সবক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়েছে, তা কিন্তু নয়। এ সময় সামান্য অবস্থা থেকে নিজ যোগ্যতা বলে প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন হওয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে। তবে এ ধরনের দৃষ্টান্ত খুব বেশি পাওয়া যায় না।

বাংলার নবাবগণ কেউই স্থানীয় বাঙ্গালি ছিলেন না। তবে সুবাদারি শাসন যুগের পদস্থ কর্মকর্তাদের মতো তারা কেউই উত্তরমুখী ছিলেন না। তাদের মধ্যে একটি অধিবাসী মনোভাব লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের নবাবগণসহ তাদের আত্মীয় পরিজন ও পদস্থ অভিজাত কর্মকর্তাগণ যারা বাংলায় এসেছিলেন তারা এখানেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে একটি ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এ সময় রাষ্ট্র ও প্রশাসনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে স্থানীয় প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কাজ করা সুযোগ তৈরি হয়েছিল। ফলে স্বাধীন সুলতানী শাসনামলের ন্যায় পুনরায় বঙ্গীয় জাতিসত্ত্বা বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। উল্লেখ্য যে, সুলতানী আমলে নবাগত শাসকগোষ্ঠীর উদার ও বাস্তবধর্মী নীতির ফলে স্থানীয় জনতা বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা দ্রুত সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভের সুযোগ লাভ করে এবং তাদের একটি অংশ ভূমিজ অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হয়। এ শ্রেণীটি বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে বিরাট অবদান রাখে। কিন্তু মুঘল সুবাদারি আমলে উত্তর ভারত থেকে প্রশাসনিক

---

[৪৩] K. K. Datta, *Alivardi Khan and His Time*, p.p. 38-39

[৪৪] সুশীল চৌধুরী, ' পলাশী যুদ্ধ ও সিরাজউদ্দৌলা, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৬

কর্মকর্তা আমদানি এবং স্থানীয় জনতাকে শাসন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ না দেয়ায় সুলতানী আমলে সূচিত বঙ্গীয় জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা বাধাগ্রস্ত হয়। নবাবী শাসনামলে নবতর পরিস্থিতিতে এ বাধা অপসারিত হয়; প্রশাসনে স্থানীয়দের নিয়োগ লাভের মাধ্যমে বঙ্গীয় জাতীয়সত্ত্বা বিকাশের পথ পুনরায় উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হয়।

প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ পদে স্থানীয়দের বিশেষ করে স্থানীয় হিন্দুদের নিয়োগ প্রক্রিয়া মুর্শিদকুলি খানের সময়ই শুরু হয় এবং এ প্রক্রিয়া তাঁর উত্তরাধিকারী নবাবদের সময় অব্যাহত থাকে। এসময় রাজস্ব প্রশাসনের শীর্ষ পদগুলোতে স্থানীয় হিন্দুদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক রাজস্ব বিভাগে হিন্দুদের নিয়োগের যৌক্তিকতা বর্ণনা করতে যেয়ে সলিমুল্লাহ উল্লেখ করেছেন:

> রাজস্ব সংগ্রহ কার্যে তিনি হিন্দু ব্যতীত অন্য কাউকে নিয়োগ করতেন না, তার কারণ ভীতি প্রদর্শন বা শাস্তির দ্বারা তাদেরকে সহজেই তাদের নিজেদের এবং সহকারীদের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ প্রকাশে বাধ্য করা যায় এবং তাদের বাধ্যতার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোন সম্ভাবনা ছিল না।[৪৫]

রাজস্ব প্রশাসনে হিন্দুদের একচেটিয়া নিয়োগদানের পিছনে মুর্শিদকুলি খানের যে উদ্দেশ্য ছিল তা তাঁর উত্তরসূরী নবাবদের মধ্যেও ছিল বলে ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না।

নবাবী প্রশাসনে উচ্চপদে শুরুর দিকে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে নবাব মুর্শিদকুলি খানের পরার্মশদাতা ও খালাসা বিভাগের দিউয়ান ভূপত রায়, নবাববের ব্যক্তিগত সচিব কিষেন রায়, দিউয়ান দর্পনারায়ণ, বিহারের দিউয়ান আলমচাঁদ, সেনাধ্যক্ষ লাহরিমল ও দিলপত সিং হাজারী, দিউয়ান রঘুনন্দ (তিনি প্রথমে টাকশালের দারোগা ছিলেন)[৪৬] প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। নবাব সুজাউদ্দিন খানের শাসনামলে আলমচাঁদ বাংলার দিউয়ানি পদসহ 'রায় রায়ন' উপাধি লাভ করেছিলেন। বাংলার দিউয়ানি বা নিজামতি কাজে নিয়োজিত কার্যধ্যক্ষদের মধ্যে 'রায় রায়ান' উপাধি লাভের এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত।[৪৭] গোলাম হোসেন তবাতবায়ি-এর তথ্য মতে, শাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে নবাবের গঠিত তিন সদস্যের মন্ত্রণা পরিষদে রায় রায়ান আলমচাঁদ ও বণিক প্রবর জগৎশেঠ ফতেহচাঁদ ছিলেন অন্যতম সদস্য। নবাবের খুব বিশ্বাস ও আস্থাশীল হওয়ায় শাসন কাজ পরিচালনার সকল প্রকার ক্ষমতা এদেরকে অর্পণ করা হয়েছিল।[৪৮] ইউসুফ আলী খান আলমচাঁদ ও জগৎশেঠকে সুজাউদ্দিন খানের রাজত্বের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪৯] নবাব সরফরাজ খানের রাজত্বকালেও তারা নবাবের মন্ত্রণা পারিষদে বহাল ছিলেন। সুজাউদ্দিন খান শিবনারায়ণকে কানুনগো পদে নিয়োগ করেন। এ সময় যশোবন্ত রায় নামক জনৈক হিন্দু জাহাঙ্গীরনগরের দিউয়ান এবং বৈদ্য রাজবল্লভ নাওয়ারা বিভাগের

---

[৪৫] উদ্বৃতি M A Rahim, ' The Rise of Hindu Aristocracy Under the Bengal Nawabs' *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. VI, 1961, p. 110

[৪৬] নবাব মুর্শিকুলি খানের উপর রঘুনন্দের এত বেশি প্রভাব ছিল যে, তাঁর প্রচেষ্টায় তাঁর ভাই রামজীবন রাজশাহী ও ভুষণাতে বড় বড় জমিদারী লাভ করেছিলেন। M A Rahim, ' The Rise of Hindu Aristocracy', p. 111

[৪৭] গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬

[৪৮] সৈয়দ গোলাম হেসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫। মন্ত্রণা পরিষদের অপর সদস্য ছিলেন নবাব আলিবর্দী খানের ভাই হাজী আহমদ।

[৪৯] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

পেশকার বা সহকারী দিউয়ান হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। চিন্তামন দাস আজিমাবাদের দিউয়ান এবং নন্দলাল সেনাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান।[৫০] নবাব আলীবর্দী খান ও নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর শাসনামলে অমাত্য আভিজাত্যে হিন্দুরা উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে। রবার্ট ওর্ম মন্তব্য করেছেন:

> তাঁর (আলীবর্দী খানের) রাজত্বকালে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল অপরিসীম। শাসনযন্ত্রের প্রতিটি বিভাগেই এটা লক্ষ করা যায়। তারা এত যত্নও দক্ষতার সঙ্গে সব বিভাগের কাজকর্ম পরিচালনা করত যে তাদের অজান্তে বা তাদের হাত দিয়ে ছাড়া কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই হত না।[৫১]

লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডসে ওর্ম সংগ্রহের (Orme Collection) তালিকায় এবং হল্যান্ডের রাজকীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত বাংলার ওলন্দাজ কোম্পানির প্রধান ইয়ান কারসেবুমের তালিকাতেও আলিবর্দী খানের রাজত্বকালে প্রশাসনযন্ত্রে হিন্দু প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।[৫২] *তারিখ-ই-বাঙ্গলা-ই-মহাবতজঙ্গী* গ্রন্থে আলিবর্দী খানের রাজত্বকালে দিউয়ান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত রায় রায়ান চিনরায়, বীরুদত্ত, রায় রায়ান কিরাতরায় (রায় রায়ান আলমচাঁদের পুত্র এবং ফারসি ভাষাভিজ্ঞ সুদক্ষ অর্থনীতিবিদ) ও রায় রায়ান উমিদরায়ের নাম পাওয়া যায়।[৫৩] দিউয়ান হিসেবে সততা ও কর্মদক্ষতা গুণে এরা সকলেই নবাবের বিশেষ সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন বলে সমসাময়িক তথ্যসূত্রে উল্লেখ রয়েছে।[৫৪] নবাব আলিবর্দী খান রাজা জানকীরামকে বিহার প্রদেশ নায়েব নাজিম নিয়োগ করেছিলেন। জানকীরামের মৃত্যুর পর রামনারায়ণ এ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ করেন। রাজা জানকীরামের পুত্র রাজা দুর্লভরাম ছিলেন নবাবের বিশ্বস্ত আমীরদের অন্যতম। তিনি নবাবের ফৌজি দপ্তরের দিউয়ানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি কিছুকাল উড়িষ্যায় নায়েব নাজিম হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। *তারিখ-ই-বাঙ্গলা-ই-মহাবতজঙ্গী*'র সূত্র মতে, রাজা দুর্লভরাম নবাবের দরবারে বিহারের নায়েব নাজিম রামনারায়ণের প্রতিনিধি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[৫৫] আলিবর্দী খান শিবনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণকে সদর কানুনগো পদে নিয়োগ করেছিলেন। এসময় মহেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন দ্বিতীয় কানুনগো। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময়ও যে তারা এপদে বহাল ছিলেন এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী সিরাজ-উদ-দৌলাহর সাথে ইংরেজদের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে। এই চুক্তিতে অন্যান্যদের সাথে এ দুজনেরও স্বাক্ষর দেখা যায়। এ সময় বাংলার প্রশাসনযন্ত্রের উচ্চপদে নিযুক্ত হিসেবে আর যে সব হিন্দুর নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে রাজবল্লভ, রাজারাম ও জগৎশেঠ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। রাজবল্লভ নাওয়ারা বিভাগের পরিদর্শক এবং পরে জাহাঙ্গীরনগরের দিউয়ান ও নায়েব সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন

---

[৫০] M A Rahim, 'The Rise of Hindu Aristocracy', p. 112

[৫১] Robert Orme, *Military Transaction in Indostan,* Vol. II, Sec. I, pp.52-53, উদ্ধৃতি সুশীল চৌধুরী, *পলাশির অজানা কাহিনী*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪, পৃ. ৬২

[৫২] সুশীল চৌধুরী, 'পলাশী যুদ্ধ ও সিরাজউদ্দৌলা', *বাংলাদেশের ইতিহাস* , প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩২

[৫৩] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ২৯, ১২১, ১২১, ১৫৫; বীরুদত্ত রায় রায়ান উপাধি পেয়েছিলেন কীনা তা নিশ্চিত জানা যায় না।

[৫৪] ঐ, পৃ ১৫৫

[৫৫] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.. ১১৫

করেন। রাজারাম ছিলেন মেদিনীপুরের ফৌজদার। জগৎশেঠ নবাবের খুব বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং নবাবের উপদেষ্টা পরিষদে তাঁর বিশেষ প্রভাবের কথা সমকালিন সকল সূত্রেই উল্লেখ রয়েছে।[৫৬]

রবার্ট ওর্মের বর্ণনা মতে, প্রশাসনের উচ্চপদে হিন্দুদের নিয়োগ দানের নীতি অনুসরণের জন্য নবাব আলিবর্দী খান তাঁর দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাহকে উপদেশ দিয়েছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ মতামহের এ উপদেশ অনুসরণ করেছিলেন বলে সমসাময়িক সূত্রসমূহ থেকে জানা যায়। এস. সি. হিল (S. C. Hill) উল্লেখ করেছেন, সিরাজ-উদ-দৌলাহ তাঁর অনুচরদের বিশেষ করে হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর পূর্বসুরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন।[৫৭] ফলে তাঁর সময় সর্বক্ষেত্রে হিন্দু প্রাধান্য আরো বেড়ে যায়। সমসাময়িক তথ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় মোহনলাল নামক কাশ্মিরী হিন্দু অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করেন। মোহনলাল প্রথমে সিরাজের ব্যক্তিগত দিউয়ান ছিলেন। পরে নবাব তাঁকে প্রত্যেক বিভাগের উপর পূর্ণক্ষমতাসহ প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তাঁকে পাঁচ হাজারী মনসব এবং 'মহারাজ' উপাধি প্রদান করা হয়েছিল।[৫৮] মোহনলালের পিতৃব্য জানকী রায়কে খালাসা দিউয়ান পদে নিয়োগ ও 'রায় রায়ান' উপাধি এবং মীর মদনকে বখশি পদে নিয়োগ দেয়া হয়। রাজা দুর্লভরামের ভাই রাজবিহারী একজন সেনাপতি ও ফৌজদার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। মানিকচাঁদ কলকাতা এবং নন্দকুমার হুগলির ভারপ্রাপ্ত ফৌজদার পদে নিয়োগ লাভ করেন। তাছাড়াও রামনারায়ণ, রাজা দুর্লভরাম প্রমুখ হিন্দু কর্মকর্তাগণ উচ্চপদাধিকারী অভিজাত অমাত্য হিসাবে রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থায় প্রভূত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবাবী যুগে অভিজাত অমাত্য শ্রেণীতে ঠাঁই পাওয়া হিন্দুদের প্রায় সকলেই ছিলেন স্থানীয় বাঙ্গালি। সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদ লাভ এবং শাসকগোষ্ঠীর উদার পৃষ্ঠপোষকতার লাভের ফলে এ বাঙ্গালি হিন্দুরা একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে তারা সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে মুসলমানদের অতিক্রম করে যায় বলে তথ্যসূত্রে জানা যায়। উল্লেখ্য নবাবী বাংলার শাসনকাঠামোতে স্থানীয় হিন্দুরা স্থান পেলেও স্থানীয় মুসলমানদের জায়গা হয় নি। অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে স্থানীয় বাঙ্গালি মুসলমানদের এ অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আর এ জন্য সঙ্গত কারণেই বাংলার মুসলিম সমাজের গঠনকাঠামোর প্রতি সামান্য নজর দেয়া প্রয়োজন।[৬০] গঠন কাঠামোর দিক থেকে আঠারো শতকের বাংলার মুসলমান সমাজ প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল– (ক) আশরাফ এবং (খ) আতরাফ বা আজলাফ। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় আরজল নামে আরেকটি শ্রেণীর কথাও বলেছেন।[৬১] আশরাফ বা উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান সমাজ গঠিত হয়েছিল আরব, মধ্য এশিয়া, ইরান ও আফগানিস্তান থেকে আগত সৈয়দ, শেখ, মুঘল ও পাঠান প্রমুখ বিদেশাগতদের সমন্বয়ে। বিভিন্ন উপলক্ষে বাংলায় এসব বিদেশি মুসলমানদের প্রবজন

---

[৫৬] M A Rahim, ' The Rise of Hindu Aristocracy', pp. 114-115

[৫৭] S. C. Hill, *Bengal in 1756-1757,* p. c 11

[৫৮] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৪৩৪

[৫৯] কে এম করিম, ' নবাবী আমলের সমাজ কাঠামো' *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৪০

[৬০] বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে একান্তই প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় পুনরুল্লেখ করা হলো।

[৬১] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

ঘটেছিল।[৬২] এ সব বিদেশাগত মুসলমানরাই ছিলেন সমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্ত আশরাফ মুসলামন। সংখ্যায় তারা সমাজের শতকরা ২০ ভাগের বেশী ছিলেন না। বাংলার মুসলিম সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণী আতরাফরা ছিল সমাজের তিন চতুর্থাংশ। স্থানীয় কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের নিয়ে এ শ্রেণী গঠিত হয়েছিল। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় আতরাফ মুসলমানদের দুটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। (১) স্থানীয় জনগন-যারা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম সমাজের অর্ন্তভুক্ত হন এবং (২) বিদেশাগত মুসলমান ও স্থানীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত মিশ্রশ্রেণী। স্থানীয় জনতার ধর্মান্তকরণ সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিদেশাগত মুসলমানদের স্থানীয় রমনীদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের বহু দৃষ্টান্ত সমকালীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। এ জাতীয় বিবাহজাত সন্তানরা সমাজে তাদের পিতার অবস্থান অনুযায়ী সামাজিক মর্যাদা লাভ করতো বলে আবদুল করিম উল্লেখ করেছেন।[৬৩] তবে প্রাক পলাশী বাংলার সমাজ জীবনের মিশ্র বিবাহজাত সন্তানরাও আতরাফ শ্রেণীভুক্ত ছিল বলে সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এ ধরনের বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উদ্ভুত মিশ্রশ্রেণীটি ছিল আতরাফদের মধ্য অভিজাত।[৬৪] বাংলার মুসলিম সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল আরজল বা পতিত শ্রেণী। চামার, বেদে ও বাজিকর প্রভৃতি বৃত্তিধারী লোকেরা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলিম সমাজে এদের সংখ্যা সম্ভবত শতকরা ৫ ভাগের বেশি ছিল না।[৬৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ইসলামের মৌল নীতি অনুসারে মুসলিম সমাজে বর্ণ বা শ্রেণী পার্থক্য থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে মুসলিম সমাজেও যে শ্রেণী পার্থক্য ছিল তা অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। বাংলার মুসলিম সমাজে আশরাফরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও তারাই ছিলেন সমাজের শাসকগোষ্ঠী ও সুবিধাভোগী শ্রেণী। সমকালীন সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, বাংলায় আশরাফ ও আতরাফদের মধ্যে প্রকৃত মানবিক বা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। মুসলমান সমাজের এ সামাজিক মনস্তত্ব নবাবী বাংলার অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে স্থানীয় আতরাফ মুসলমানদের নিয়োগ না পাওয়ার কারণ হতে পারে। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার-তাহলো অমাত্য শ্রেণীতে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার জন্য শিক্ষা-দীক্ষাসহ কিছু অত্যবশ্যকীয় যোগ্যতার প্রয়োজন হতো। প্রয়োজনীয় সুযোগের অভাবে স্থানীয় মুসলমানগণের পক্ষে এসব যোগ্যতা অর্জন করাও ছিল দুরূহ। এ জন্য সম্ভবত তাদের পক্ষে উচ্চ রাজপদ লাভ করে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে অর্ন্তভুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। তদুপরি এ প্রসঙ্গে আরেকটি কারণও উল্লেখের দাবি রাখে। মুর্শিদকুলি খান ছাড়া বাংলার নবাবগণ সকলেই ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। নবাব পরিবার ও তাদের আত্মীয়-অনুগ্রহভাজনদের মধ্যে যারা বাংলার

---

[৬২] মুসলিম বিজেতা ও শাসকদের অনুগামী হয়েছিল তাদের পরিবার ও আশ্রিতজনরা। ধর্ম প্রচার ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে এসেছিল সা'দাত, উলামা ও মাশায়েখগণ। বাণিজ্য মৃগয়ায় সন্ধানে এসেছিলেন বণিকরা। আর উন্নততর জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের আগমন ঘটেছিল। তাছাড়া মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গলদের প্রবল আক্রমণ বাংলায় বিদেশি মুসলিম প্রবজনকে তরান্বিত করেছিল বলে আবদুল করিম উল্লেখ করেছেন। Abdul Karim, *Social History of the Muslims of Bengal*, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* নামে আসাদুজ্জামান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.২০৬

[৬৩] আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ২০৮

[৬৪] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪

[৬৫] ঐ, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

শাসকগোষ্ঠীতে স্থান পেয়েছিলেন, তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন শিয়া। অন্যদিকে তুর্কী ও পাঠান প্রভাবের দরুন বাংলার স্থানীয় মুসলমানগণ ছিলেন সুন্নি মতাবলম্বী। শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় রীতি-নীতি ও প্রশাসনিক ধ্যান-ধারণায় বৈসাদৃশ্য সুস্পষ্ট। তাছাড়া সংখ্যালঘু শিয়া শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সুন্নিদের ব্যাপারে রাজনৈতিক ভয় বা আংশকা থাকাও অস্বাভাবিক নয়। ফলে নবাবী শাসনের শুরু থেকেই প্রশাসনে সুন্নিদের পাশ কাটানোর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এমনকি শিয়া হিসেবে সুন্নি উলামাদের প্রতি নবাবদের ক্ষেত্র বিশেষে অবহেলা প্রদর্শনের বিষয়টিও পণ্ডিতদের দৃষ্টি এড়ায় নি।[৬৬] এমতাস্থায় শিয়া প্রাধান্য বিশিষ্ট নবাবী প্রশাসনে বাঙ্গালি সুন্নি মুসলমানদেন স্থান হবেন না - এটাও ধরে নেয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুঘল অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে বহিরাগতদের প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। এম. আতহার আলীর মতে, ভাগ্যন্বেষণকারী পারসিক, চাগতাই, এবং উজবেক অমাত্যদের নিকট ভারতবর্ষ চিরদিনই স্বর্গ রাজ্য বলে পরিচিত ছিল। মুঘল শাসনামলে তারা দলে দলে ভারতবর্ষে এসে উচ্চপদে নিয়োগ লাভ করেন।[৬৭] *আইন-ই-আকবরী*'র তথ্য অনুযায়ী আকবরের আমলে যে সব মনসবদারের আদি বাসস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে তাদের ৭০ শতাংশই ছিল বহিরাগত। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে ১৬৫৮-১৬৭৮ বর্ষসীমায় এক হাজার জাত পদাভিষিক্ত ৪১৭ জন মনসবদারের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছিলেন বহিরাগত।[৬৮] যাদের মধ্যে তুরানী, ইরানী, আরব এবং আফগানরাই ছিল প্রধান। অবশ্য সংখ্যায় কম হলেও এতে 'শেখজাদা' নামীয় ভারতীয় মুসলমানদের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবাবী বাংলার মুসলিম অমাত্য অভিজাতদের মধ্যেস্থানীয় বাঙ্গালি মুসলমানদের স্থান **ছিল** না। এ সময়কার মুসলিম অমাত্য অভিজাতদের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, এতে সুবাদারি যুগের মতো বহিরাগত ইরানী, আফগান ও আরব মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। এতে কিছু শেখজাদাদের নামও দেখা যায়। তবে মুসলিম অভজাত অমাত্যদের মধ্যে ইরানী বিশেষ করে শিয়াদের প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। বস্তুত মুঘল পূর্বযুগ থেকেই বাংলার সাথে ইরানীদের যোগাযোগ থাকলেও মুঘল যুগে বাংলায় ইরানীদের আগমন অনেক বৃদ্ধি পায়। *তারিখ-ই-শাহ সুজার* বিবরণ মতে, সুবাদার শাহসুজা জাহাঙ্গীরনগরে পারস্যদেশীয় অভিজাতদের এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, বাংলার রাজধানী একটি শিয়া নগরীতে পরিণত হয়।[৬৯] এ বিবরণে অতিরঞ্জন রয়েছে সত্য, তবে এ থেকে ঐ সময় বাংলায় ইরানী প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। বার্নিয়ারের বিবরণ মতে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলায় নিযুক্ত সুবেদার শায়েস্তা খান ও মীর জুমলা ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভূত। বাংলার শাসনকর্তা পদে তাদের উত্তরাধিকারীগণ এবং দিউয়ান, বখশি ও অন্যান্য পদস্থ অমাত্যদের অধিকাংশই ছিল ইরানীয়। অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে ইরানী প্রাধান্যের এ ধারা নবাবী বাংলায় ও অব্যাহত থাকে। মুর্শিদকুলি খান ও মীর জাফর আলী খান ব্যতীত বাংলার নবাবদের আদি নিবাস

[৬৬] মুঈনুদ্দিন আহমেদ খান, 'মুসলিম ধর্ম সংস্কার আন্দোলন', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩,পৃ. ২৩৮

[৬৭] এম আতহার আলী, *পুর্বোক্ত*, পৃ. ১৪ । অবশ্য আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের অবশিষ্ট সময়ে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক অবক্ষয় ও অস্থিরতা এবং তদুপরি মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশার কারণে এর প্রতি বিদেশিদের আকর্ষণ হ্রাস পাওয়ায় বহিরাগতদের আগমন কিছুটা কমে আসে।

[৬৮] এম আতহার আলী, *পুর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

[৬৯] মুহাম্মদ মাসুম, *তারখি-ই- শাহ সুজা*; M Yasin, *A Social History of Islamic India*, p.8

Dhaka University Institutional Repository

ছিল পারস্য। তাছাড়া ধর্মমতের দিক থেকে ও নবাবগণ ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। একারণেই নবাবগণ পারস্যদেশীয় শিয়াদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। ফলে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে ইরানী শিয়াদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

নবাবী বাংলায় ইরানী বংশোদ্ভূত অমাত্য অভিজাতদের মধ্যে প্রথমেই সুজাউদ্দিন খানের নামোল্লেখ করতে হয়। তিনি ছিলেন পারস্যের তুর্কী আফসার গোত্রীয় লোক। তিনি অমাত্য হিসেবে নবাব মুর্শিদকুলি খানের প্রশাসনে যোগ দেন এবং একসময় তিনি নিজেই বাংলার মসনদ দখল করেন। তাঁর রাজত্বকালে পারস্য থেকে আগত শিয়াদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। তিনি তাদের উচ্চপদে নিয়োগ দেন। উল্লেখ্য যে, আলিবর্দী খান ও সুজাউদ্দিন খান ছিলেন ইরানের একই গোত্রের লোক। সেই সূত্রে আলিবর্দী খান তাঁর ভাই হাজী আহম্মদ ও হাজী আহম্মদের তিনপুত্র উচ্চরাজপদে অভিসিক্ত হন। সুজাউদ্দিন খান এবং তাঁর উত্তরসুরী নবাবদের সময় বাংলা অভিজাত অমাত্য শ্রেণীতে স্থান পাওয়া অন্য যে সব ইরানী বংশোদ্ভূত অমাত্যের নাম পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে দিউয়ান মীর হাবিব, ফৌজদার আতউল্লাহ খান, নায়েব নাজিম তকী খান, নায়েব নাজিম গালিব আলী খান, দিউয়ান মীর্জা বাকের ইস্পাহানী, ফৌজদার সাইফ খান, বখশি ফরাজ আলী খান খোরাসানী, ফৌজদার মুহাম্মদ ইয়ার খান, নায়েব নাজিম তোরাব আলী খান, সেনাপতি ও বখশি সৈয়দ আবদুল আলী খান, ফৌজদার শওকতজঙ্গ, সেনাপতি সৈয়দ নকী আলী খান, ঘোড়াঘাটের ফৌজদার ও মোজাফ্‌ফর নামা গ্রন্থের লেখক করম আলী খান, বখশি খাজা আবদুল হাদী, নায়েব নাজিম শাহ আবদুস সোবহান এবং বখশি মেহদী নিসার খান উল্লেখযোগ্য ছিলেন।[৭০]

নবাবী যুগে বাংলায় মুসলমান অভিজাত অমাত্যদের মধ্যে ইরানীদের পরই ছিল আফগানদের স্থান। মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই বাংলার সাথে আফগানদের যোগাযোগ। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.) অমাত্য শ্রেণীতে কয়েকজন আফগান অমাত্যের প্রভাবশালী ভূমিকার কথা তথ্য সূত্র থেকে জানা যায়।[৭১] লোদী বংশের (১৪৫১-১৫২৬ খ্রি.) অধীনে আফগানরা শাসক শ্রেণীর মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং কররাণী শাসনামলে (১৫৩৮-১৫৭৬ খ্রি.) বাংলায় আফগানদের ব্যাপক প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। অবশ্য শেরশাহের নেতৃত্বে আফগানদের হাতে মুঘলদের পরাজয় এবং সাময়িক ক্ষমতা হারানো ফলে আফগানদের প্রতি মুঘলদের যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মে তাতে মুঘল শাসনামলে উচ্চপদে আফগানদের নিয়োগ লাভ দুরূহ হয়ে পড়ে। শুধু নতুন নিয়োগ নয়, আফগানরা যাতে বেশি পদোন্নতি লাভ করতে না পারে সে জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রথম দিকে কঠোর দৃষ্টি রেখেছিলেন।[৭২] কাররাণী আফগানদের কাছ থেকে মুঘলরা ক্ষমতা দখল করায় বাংলায় মুঘল-আফগান সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মুঘলদের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বহু আফগান বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের কেউ কেউ বারো ভূঁইয়াদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেয়।[৭৩] ফলে সুবাদারি যুগে বাংলার উচ্চ অমাত্য পদে আফগানদের নিয়োগ লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে। নবাবী আমলের প্রথম দিকে এ অবস্থা বহাল থাকলেও পরবর্তীকালে বিশেষকরে নবাব আলিবর্দী খানের রাজত্বকালে অমাত্য

---

[৭০] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. পৃ. ১৫, ৩২, ১৬৬; Salimulla. *op. cit.* p.148, গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬

[৭১] এম আতহার আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

[৭২] ঐ, পৃ.২১

[৭৩] এ প্রসঙ্গে উসমান লোহানী ও বায়েজিদ কররাণীর নেতৃত্বে আফগান প্রতিরোধের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাত শ্রেণীতে আফগানরা বিশেষ স্থান করে নেয়। অবশ্য পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে নবাবী বাংলার আফগান অমাত্য অভিজাতদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে যে সকল আফগান অমাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উড়িষ্যার নায়েব নাজিম আবদুল নবী খান, শাহবাদের ফৌজদার এবং তোজপুর এলাকার শাসনকর্তা রওশন খান তেহারী। মুস্তাফা খান ছিলেন নবাব আলিবর্দী খানের প্রধান সেনাপতি। সমকালীন বাংলার রাজনীতিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাছাড়াও আলীবর্দী খানের শাসনামলে আর যে সকল আফগান অমাত্য ও সেনাপতির নাম পাওয়া যায় তারা হলেন- শমসের খান, সর্দার খান, উমর খা, দিলীর খা, আসলত খা, আবদুর রশিদ খাঁন, মুরাদ শির খাঁ, আবিদ খান উরফে ফরহাদ আলী খাঁন, আবদুল আলী খান প্রমুখ।[৭৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আফগানরা জাতিগতভাবে রুক্ষ মেজাজের ও ঔদ্ধত্য প্রকৃতির এবং তাদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনাও প্রবল। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, মুঘল যুগে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে তাদের অর্ন্তভুক্তি অমাত্যদের অভ্যন্তরীণ সংহতিকে ব্যাহত করেছিল। এমনকি, মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে তারা স্বীয় স্বার্থে সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনেও তৎপর হয়ে ওঠেছিল। নবাবী বাংলায়ও তাদের একই ভূমিকায় দেখা যায়। আলিবর্দী খানের সময় মুস্তফা খানের নেতৃত্বে আফগান বিদ্রোহ এর প্রমাণ। গোলাম হোসেন তবাতবায়ি আফগানদের সাহসিকতাও রণ নিপুনতার বিশেষ প্রশংসার পাশাপাশি তাদের অমার্জিত ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার নিন্দা করেছেন। আলিবর্দী খানের উদার পৃষ্ঠপোষকতা সত্বেও মারাঠা আক্রমণের সংকটময় মূহর্তে আফগানদের বিদ্রোহ নবাবী শাসনের ভিত্তিমূলে বড় ধরনের কাঁপন তুলেছিল। অবশ্য নবাব সাফল্যের সাথে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন। এর ফলে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে আফগানদের প্রভাবহ্রাস পায়।

নবাবী আমলে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে আরব বংশোদ্ভূত কিছু কর্মকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত বাংলার সাথে আরবের যোগাযোগ বহু পুরনো। বাংলায় আরবদের আগমন ব্যবসায়ী ও ধর্ম প্রচারকরূপে। বারবোসা, সিজার ফ্রেডারিক, র‍্যালফ ফিচ্ ও পর্তুগিজ সূত্রে উল্লেখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বাংলার উপকূলীয় সমুদ্র বন্দরসমূহ এবং সোনারগাঁও ও হুগলিতে বসবাসরত প্রতিপত্তিশালী মুসলিম বণিকদের অধিকাংশই ছিল আরবদেশীয়। ইসলামের আদি ভূমির অধিবাসী এবং রাসুল (সাঃ)-এর বংশধর হিসেবে আরবরা মুসলমানদের নিকট বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। সাধারণ মুসলমানদের কাছে শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা আরবদের একটি প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায়ের পরিণত করে। এর ফলে বাংলায় তারা হোসেন শাহী (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) নামে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এ বংশের শাসনামলে বাংলায় আরব প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। অবশ্য আফগান ও মুঘল শাসনামলে উচ্চরাজপদে আরবদের নিয়োগ হ্রাস পায়। সংখ্যায় কম হলেও নবাবী প্রশাসনে পদস্থ অমাত্য হিসেবে আরব বংশীয় মুসলমানদের উল্লেখ দেখা যায়। আরবদের মধ্যে সৈয়দ রিজা খান ও মীর জাফর আলী খানের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত জন ছিলেন নবাব মুর্শিদকুলি খানের দৌহিত্রী জামাতা এবং তাঁর সময়ে বাংলার দিউয়ান। মীর জাফরের জন্ম ইরাকের নাজাফ প্রদেশের সম্ভ্রান্ত

[৭৪] এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮, ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৯৫

সৈয়দ পরিবারে। নবাবী প্রশাসনে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও নবাব পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রে তাঁর দ্রুত পদোন্নতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত হন। মীর জাফরের সূত্রে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর ভাই আল্লাইয়ার খান, মীর দাউদ খান, মীর কাজেম আলী খান, তাঁর চাচাত ভাই (মতান্তরে মামাতো ভাই) মীর ইসমাইল খান, মীর জাফরের পুত্র মীর সাদাকাত মুহাম্মদ খান উরফে মীরণ নবাবী প্রশাসনে অভিজাত অমাত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

নবাবী যুগে সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে 'শেখজাদা' নামে পরিচিত ভারতীয় (বাংলার বাইরের) মুসলমানরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুঘল যুগেও অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে ভারতীয় মুসলমাদের সংখ্যা স্বল্পতা লক্ষণীয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৫৮-৭৮ এবং ১৬৭৯-১৭০৭ বর্ষসীমায় ১০০০-৫০০০ পদাধিকার মনসবদারদের মধ্যে শেখজাদাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩.৪ ও ১২ শতাংশ। আবার উক্ত দুইবর্ষ পর্যায়ে ৫০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী শেখজাদাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪ ও ১০ জন। তথ্যের অভাবে নবাবী আমলে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে ভারতীয় মুসলমান শেখজাদাদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন সূত্রে যে কয়েজন ভারতীয় মুসলিম অমাত্যের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নবাব সুজাউদ্দিন খানের কন্যা দুর্দানা বেগমের স্বামী দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান (প্রকৃত নাম মীর্জা লুৎফউল্লাহ)। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তিনি ছিলেন সুরাটের এক সম্ভ্রান্ত বণিকের পুত্র। সিয়ারের বর্ণনা মতে, উড়িষ্যার নায়েব নাজিম শাহ মোহাম্মদ মাসুমের আদি নিবাস ছিল পানিপথে।[৭৫] এই তথ্য অনুযায়ী মোহাম্মদ মাসুমের চাচাত ভাই উড়িষ্যার নায়েব নাজিম আবদুর রসুল খানও ছিলেন শেখজাদা। তাছাড়া আলিবর্দী খানের সময় উচ্চপদে নিয়োজিত নুরুল্লাহ বেগ ও ফকরুল্লাহ বেগও ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলমান। ইউসুফ আলী খানের বর্ণনা মতে, এদের উভয়ের আদি নিবাস ছিল দিল্লী।[৭৬]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, নবাবী আমলে অভিজাত অমাত্য শ্রেণীভুক্ত সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। তবে হিন্দু অমাত্যদের মধ্যে বাঙ্গালিদের প্রাধান্য ছিল নিরঙ্কুশ। তবে এ সময় অভিজাত শ্রেণীতে কোনো বাঙ্গালি মুসলিম অমাত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। মুসলিম অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে ইরানীদের প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। তাছাড়া আফগান এবং আরব অভিজাত অমাত্যদেরও লক্ষণীয় উপস্থিতি দেখা যায়। উত্তর ভারত থেকে অমাত্যদের আগমণ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলেও নবাবী প্রশাসনে স্বল্পসংখ্যক শেখজাদা নামীয় ভারতীয় মুসলিম অমাত্যেরও সন্ধান মিলে।

প্রসঙ্গত আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। সূত্রমতে, মুঘল সুবাদারি যুগের মতো নবাবী আমলেও প্রশাসনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সামরিক-বেসামরিক অমাত্যদের 'মনসব' প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। মনসব (পদ, শ্রেণী, মর্যাদা) ছিল উক্ত পদাধিকারীর (মনসবদার) সামরিক মর্যাদার দ্যোতক। মনসব লাভ অমাত্যদের সামাজিক মর্যাদার

---

[৭৫] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৬

[৭৬] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৩২, ১১০

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশক হিসেবেও বিবেচিত হতো। মনসব প্রদানের একমাত্র অধিকর্তা ছিলেন স্বয়ং মুঘল সম্রাট। নবাবের সুপারিশক্রমে সম্রাট প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য মনসব মঞ্জুর করতেন। পদমর্যাদা ও যোগ্যতা অনুসারে এ মনসব প্রদান করা হতো। তবে এ সময় অভিজাত শ্রেণীভূক্ত অমাত্যদের 'মনসব' সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সমসাময়িক উৎসসমূহে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন উৎসে এ সম্পর্কে কিছু বিক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। এ সব বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, বাংলার নবাবগণ সকলেই ছিলেন সাতহাজারী মনসবদার শ্রেণীভুক্ত। নবাবগণ ছাড়াও এসময় আরো কিছু অমাত্যের সাত হাজারী মনসব লাভের কথা জানা যায়। তবে সাত হাজারী মনসব যারা পেয়েছিলেন তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন নবাব পরিবারের সদস্য। দুএকজন ব্যতিক্রম হলেও তারাও ছিলেন উচ্চবংশীয় এবং কারো কারো দিল্লীর দরবারের সাথেও ঘনিষ্ট সংযোগ ছিল। অমাত্যদের মনসব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সব সময় যে সুষম নীতি অনুসৃত হয়নি প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে তা জানা যায়। প্রশাসনিক কাঠামোতে দিউয়ান ছিলেন অমাত্য অভিজাত শ্রেণীর শীর্ষ কর্মকর্তা। সাধারণভাবে দিউয়ানগণ চারহাজারী মনসবদার হতেন।[৭৭] কিন্তু পদমর্যাদায় দিউয়ানের নিচে হলেও এ সময় কোন কোন ফৌজদার বা অন্যান্য কর্মকর্তা যে দিউয়ানের চেয়ে বেশি মনসবের অধিকারী ছিলেন সে তথ্যও পাওয়া যায়। মনসব প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপ অনিয়মের কারণ কর্মকর্তাদের যোগ্যতা অপেক্ষা তাদের ব্যক্তিগত আনুগত্যের প্রতি নবাবদের দুর্বলতা। নবাবগণ সাধারণত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও অনুগ্রহপুষ্টদের জন্য সম্রাটের কাছ থেকে উচ্চ মনসব আদায়ের ব্যবস্থা করতেন। কেননা এসব মনসব প্রাপ্তির সাথে কেবল রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বা সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন নয়, আর্থিক সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিও একান্তভাবে জড়িত ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মনসবদারদের উচ্চ বেতন-ভাতা প্রদান করা হতো।[৭৮] মনসবদারগণ নগদ অর্থে অথবা মঞ্জুরিকৃত নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা জায়গির হতে সংগৃহীত রাজস্ব ও নবাবদের আরোপিত শুল্ক হতে বেতন গ্রহণ করতেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মুঘল রীতি-রেওয়াজ অনুযায়ী অমাত্য অভিজাতদের মধ্যে পদমর্যাদা অনুযায়ী জায়গির বণ্টনের নমুনা প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। নবাব দরবারের আমলা অভিজাতদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তার দেখাশুনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে 'জায়গির-ই-উমরাহ'[৭৯] নামক দপ্তরের বিদ্যমানতাও উপর্যুক্ত বক্তব্যের প্রমাণ। তাছাড়া জায়গির লাভের উদ্দেশ্যে শীর্ষ আমলাদের মধ্যকার প্রতিযোগিতার বিষয়টিও প্রমাণ করে যে, তাদের আর্থিক বুনিয়াদ ও প্রতিপত্তির মূলউৎস জায়গির এর রাজস্ব আয়ের মধ্যেই নিহীত ছিল। হাবিবুর রহমান মনে করেন, জায়গির ভোগ করার কারণে নবাবী বাংলার অভিজাত অমাত্যগণ প্রকারান্তরে হলেও ভূ-অভিজাতের পর্যায়ে পড়েন। কেননা তাঁর মতে, জমিদার যেমন স্ব-প্রতাপে জমিদারি পরিচালনার সুবাধে প্রচুর বিত্ত, প্রভাব ও প্রাধান্যের অধিকারী হিসেবে ভূ-অভিজাত হিসেবে পরিগণিত, অনুরূপভাবে জায়গির ভোগকারী

---

[৭৭] রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮

[৭৮] এম এ রহিম সে যুগের মনসবদারদের বেতন-ভাতা সম্পর্কে বিররণ দিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী সে সময় একজন সাত হাজারী মনসবদারের মাসিক বেতন ছিল ৪৫,০০০ টাকা এবং এক হাজারী মনসবদার পেতেন ৮,০০০ থেকে ৮,২০০ টাকা। এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮

[৭৯] এর অধীনে নবাবী বাংলায় যে সব জায়গির ছিল বলে জানা যায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, 'সরকার আলী' (নাজিম বা সুবাদারের জন্য নির্দিষ্ট জায়গির), 'বন্দেওয়ালা বর্গাহ্' (দিউয়ানের জন্য নির্ধারিত জায়গির), 'জায়গিরে আমীর উল উমারা' (বখশির জন্য নির্ধারিত), এবং 'জায়গিরে ফৌজদারান' (ফৌজদারদের জন্য নির্ধারিত)

অমাত্যগণও তাদের অধীনস্থ জায়গিরের ভোগস্বত্বের বদৌলতে লব্ধ রাজস্ব আয় দ্বারা ধন ও যশোগৌরবের পারাকাষ্ঠা অর্জন করেন বিধায় তারাও একরকমের ভূ-অভিজাত।[৮০]

প্রশাসনের কার্যদক্ষতা, রাষ্ট্রের ভাগ্য ও নবাবের সফলতা যেহেতু বলতে গেলে অমাত্য অভিজাতদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল, কাজেই নবাবগণও এদের সুযোগ সুবিধা ও তুষ্টি সাধনের বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাদের উচ্চ বেতন ও জায়গির প্রদানের পিছনে সম্ভবত এই বিবেচনা কাজ করেছে। উল্লেখ্য যে, বেতনের এ টাকা থেকে মনসবদারদের তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের বেতন পরিশোধ করতে হতো না। সৈন্যরা বেতন পেতো রাজকীয় কোষাগার থেকে। মনসবদারগণ কেবল প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করতেন। আর এ জন্য একজন মনসবদারকে তাঁর বেতনের অর্ধেকের বেশি এ খাতে ব্যয় করতে হতো না। ফলে একজন এক হাজারি মনসবদারের হাতেও বেতন বাবদ যে টাকা অবশিষ্ট থাকতো, তাতে সমকালিন মুদ্রা মান এবং পণ্যমূল্য বিবেচনায় আনলে এক হাজারি মনসবদারগণ যে উচ্চ বেতনভোগী রাজকর্মকর্তা ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ কারণে নবাবী যুগে এক হাজারি বা তদুর্ধ্ব মনসবপদাধিকারী কর্মকর্তাগণ বাংলার অমাত্য অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে এম এ রহিম প্রমুখ যে মত প্রকাশ করেছেন,তা যথার্থ বলেই মনে হয়।

৫.২.২ ভূস্বামী-জমিদার অভিজাত শ্রেণী

সমাজ কাঠমোতে রাজকর্মচারী অভিজাত শ্রেণীর পরই বাংলার ভূ-স্বামী জমিদাররা ছিলেন সমাজের প্রতিপত্তিশালী উচ্চ অভিজাত। বাংলা চিরকালই একটি কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় এখানকার সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস এবং রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃষি ও ভূমি রাজস্বের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কাজেই দেখা যায় যে, পর্যালোচনাধীন সময়ে কৃষি ও ভূমি রাজস্বের ভিত্তিতে বিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল ও সামাজিক শক্তিকাঠমোতে ভূ-অভিজাত শ্রেণী ছিল কর্তৃত্বকারী একটি শক্তিবিশেষ। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ভূমিজ অর্থনীতি তাদের করায়াত্ত্ব ছিল বলে তারা শুধু সমকালের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ সংস্কৃতিকে প্রভাবিতই করেননি, তাদের সমকালীন ভূমিকা পরবর্তী ইতিহাসের গতিধারাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

মুঘল ভারতে কৃষিজীবীদের উৎপাদিত সামাজিক উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে জীবিকা নির্বাহকারী একটি শ্রেণীকে বলা হতো 'জমিন্দার'। 'জমিন্দার' একটি ফারসি শব্দ এবং আক্ষরিকভাবে এই ফরসি যৌগিক শব্দটির অর্থ 'যার জমি আছে'। ঐতিহাসিক আবুল ফজল 'বুমী' বলে জমিন্দারের সামর্থক আরেকটি শব্দের ব্যবহার করেছেন। আক্ষরিক অর্থে বুমী বলতে বুঝায় 'জমির মালিক' এবং এদিক থেকে শব্দটি জমিন্দার শব্দের সমার্থক।[৮১] তবে এ দুটো শব্দের মধ্যে জমিন্দার শব্দটিই অধিক পরিচিত ও প্রচলিত এবং বাংলা ভাষায় জমিন্দার শব্দটির প্রতিরূপ হলো 'জমিদার'। ভূমিতে বহুধরণের উচ্চতর স্বার্থের সমন্বিতরূপ হলো জমিদার। ক্ষমতাশালী স্বাধীন স্বরাট সর্দার থেকে শুরু করে গ্রামান্তরে ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্বভোগী পর্যন্ত

---

[৮০] মোঃ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০

[৮১] ইসা মোহাম্মদ, *এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের সামন্তবাদ সন্ধান ও বিচার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭৫

বিভিন্ন ধরনের ভূমি স্বার্থশ্রেণী বুঝাতে একক বর্গ নাম হিসেবে 'জমিন্দার' বা 'জমিদার' শব্দটির প্রচলন করা হয়েছিল বলে এস নূরুল হাসান উল্লেখ করেন।[৮২] ইতোপূর্বে ভূমিজ স্বরাট সর্দারগণ রাজা, রায় এবং ঠাকুর ইত্যাদি নামে এবং ক্ষুদ্র মধ্যসত্ত্বভোগীরা চৌধুরী, মুকাদ্দম ও খোৎ ইত্যাদি অভিধায় পরিচিত ছিলেন। ইরফান হাবিব বলেন, বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশকারী পুরোনো শব্দগুলো এখন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তাদের স্থলে এলো এক স্বতন্ত্র নাম জমিন্দার।[৮৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুঘলরা ভারতে বিশেষত বাংলায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর রাজস্ব আদায়ের একটি অব্যাহত ধারা সুনিশ্চিত করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। অধীনস্থ বিভিন্ন অঞ্চলের উপর কর বা রাজস্ব হিসেবে ধার্য অর্থের প্রাপ্তিকে কেন্দ্রাভিমুখী করার মাধ্যমে একে তারা ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করে। এ কাজটি করার জন্য প্রয়োজন ছিল রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রশাসনিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা ও এসব দপ্তর পরিচালনার জন্য আবার একটি বিশেষভাবে অনুকূল শাসন কাঠামো নির্মাণ। এ দুয়ের সমন্বয় করতেই মুঘলরা রাজ্যের স্থানীয় প্রধানদের হাতে রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন আদায়কৃত রাজস্বের একটি হিস্যা তাদের কাছে ছাড় দিয়ে। কিন্তু তাতেও যখন রাজ্যের রাজস্ব ব্যবস্থার উপর স্বাধীন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলো না, তখন তারা নজর দেন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের 'জমিদার' নামীয় স্থানীয় রাজস্ব প্রতিনিধিবর্গকে একটি আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় অনুগত্যাধীনে সংস্থাপন করার দিকে। যাতে করে কর আদায় প্রক্রিয়া বা ভূমি খামার ও জমিদারিসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজটি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। আর এভাবেই রাষ্ট্রযন্ত্রে জমিদাররা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গশক্তিতে পরিণত হয়।

মুঘল আমলে জমিদারদের অবস্থান ছিল কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্তরে। এস নূরুল হাসান সে সময়কার জমিদারদের প্রধান তিনটি বর্গের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৮৪] এ তিনটি স্তরের প্রথম স্তরে ছিল স্বরাট সর্দার। নিজ জমিদারি এলাকায় এরা ছিলেন কার্যত সাবভৌম শাসনকর্তা। জমির উপর জন্মগত অধিকার ও স্থানীয় প্রভাবের ফলে উপর থেকে কোন শক্তির সাধ্য ছিল না এ স্থানীয় ও আঞ্চলিক শক্তিকে উপেক্ষা করা। এ সত্য বুঝতে পেরেছিলেন বলেই সম্রাট আকবরের আমল থেকেই এ শ্রেণীর জমিদারদের মনসবদার পদে নিয়োগ দিয়ে তাদের মুঘল শাসনব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার নীতি গ্রহণ করা হয়।[৮৫] এ ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ভূ-সম্পত্তিকে 'ওয়াতন জায়গির' হিসেবে গণ্য করা হতো এবং রাজকর্মচারি হিসেবে অন্যত্র তাদের জায়গির প্রদান করা হতো। বিনিময়ে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের নির্দশন স্বরূপ তারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব বা 'পেশকাশ' রাজকোষে জমা দিতেন। নিয়মিত পেশকাশ প্রদান করলে নিজস্ব ওয়াতন জায়গিরের উদ্বৃত্ত সম্পদের উপর এদের নিরঙ্কুশ অধিকারে রাষ্ট্র সাধারণত হস্তক্ষেপ করতো না।

---

[৮২] এস নুরুল হাসান, 'মুঘল সাম্রাজ্যে জমিন্দারের অবস্থান', *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, ইরফান হাবিব (সম্পা.), (বাংলা অনু:) রাজা মুখার্জী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৮, পৃ. ১২৪; Irfan Habib, *Medieval India*, New Delhi, 2008, pp. 153-154

[৮৩] ইরফান হাবিব, 'প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে ভূ-সম্পত্তির সামাজিক বন্টন: একটি ঐতিহাসিক নিরীক্ষা', *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ* পৃ. ৮৬

[৮৪] এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য এস নুরুল হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৪২-৫২

[৮৫] আতহার আলী দেখিয়েছেন যে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমার্ধে ৭৮৬ জন উর্ধ্বতন মনসবদারের মধ্যে ৬৮ জন এবং ১৬৭৯-১৭০৭ বর্ষসীমায় ৫৭৫ জন মনসবদারের মধ্যে ৮১ জন ছিলেন জমিদার। এম. আতহার আলি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯

স্বরাট জমিদারদের তলায় ছিলেন অন্তবর্তী বা মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণী। মধ্যস্বত্বভোগী জমিদাররা ছিলেন মুঘল ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মেরুদণ্ড স্বরূপ।[৮৬] সাধারণত রাষ্ট্রের নিরীক্ষার জন্য রাজস্ব নির্ধারণের তফসিল তৈরি, নিজের জমিদারি এবং উপক্রমী জমিদারদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করে রাজকোষ বা জায়গিরদার কিংবা স্বরাট জমিদারদের নিকট জমা প্রদান এবং কৃষি সম্প্রসারণে সাহায্য করা ইত্যাদি ছিল এ শ্রেণীর জমিদারদের দায়িত্ব। শুধু নিজ নিজ এলাকার শান্তি -শৃঙ্খলা রক্ষায় শাহী কার্যাধিকারীদের সাহায্য এবং রাজকীয় বাহিনীতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য প্রেরণের ভারও ছিল এদের কাঁধে। এ সব পরিসেবার বিনিময়ে তারা দালালি, রেয়াত, লাখেরাজ ভূমি ও উপকর ইত্যাদি দস্তুরি লাভ করতেন। তাছাড়া আদায়কৃত ভূমি রাজস্বের বখরা হিসেবে তারা ২.৫ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত পেতেন।

জমিদারদের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে ছিলেন প্রাথমিক জমিদারগণ। এরা 'মালগুজারি' (রাজস্ব নির্ধারক) বা 'মাল ওয়াজিব' জমিদার নামেও অভিহিত হতেন।[৮৭] সরকারের পক্ষে কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় এবং নিজ নিজ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও উর্ধ্বতনের নির্দেশ মাফিক সৈন্য সরবরাহ করাও তাদের অন্যতম কর্তব্য ছিল। বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে তারা পেতেন 'নানকার'– যা ছিল কখনো ভূমি রাজস্বের হিস্যা এবং কখনো বা 'লা-খেরাজ' ভূমি।[৮৮]

মুঘলদের ভূমি প্রশাসন কাঠামোর সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভূমি প্রশাসনের সর্বস্তরে সুচারু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উপরিউক্ত প্রয়াস সুবা বাংলায় যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। উল্লেখ্য যে, ১৫৭৬ সালে মুঘল শক্তি কর্তৃক বাংলা বিজয় শুরু হলেও সম্পূর্ণ বাংলার উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে তাদের দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভূমি রাজস্ব সংস্কারে রাজা টোডারমল যে সব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন দূরবর্তী বাংলা সুবাতে তার প্রয়োগ আশানুরূপ হয়নি। তথাপি সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলেও বাংলায় টোডারমলের রাজস্ব আদর্শই অনুসৃত হয়। ১৬৫৮ সালে সুবাদার শাহ সুজা কৃত একটি রাজস্ব বন্দোবস্তের কথা জানা যায়। জেমস গ্রান্টের বরাত দিয়ে আবদুল করিম তাঁর গ্রন্থে এ রাজস্ব চিত্রটি প্রদর্শন করেছেন।[৮৯] এতে দেখা যায় যে, শাহ সুজার বন্দোবস্ত বাংলার ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের উন্নতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ অনেক খুঁটিনাটি বিষয় সংস্কারে তিনি হাত দেননি। ফলে পূর্ব থেকে বিদ্যমান ভূমি রাজস্বের সুবিধাভোগী বিভিন্ন সম্প্রদায়র বিশেষত ভূম্যধিকারী, প্রাচীন ভৌমিক, রাজা বা জমিদার প্রমুখের উপর মুঘলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু তা গভীর অন্তর্দেশ পর্যন্ত পৌছতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। অবস্থার উন্নয়নে মুঘলদের প্রয়াস অব্যাহত থাকলেও মুর্শিদকুলি খানের পূর্বে কোন প্রচেষ্টারই সার্থক প্রয়োগ সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক মুর্শিদকুলি খানকে বাংলায় দিউয়ান হিসেবে

---

[৮৬] চৌধুরি, দেশমুখ, দেশাই, দেশপাণ্ডে, মুকাদ্দম, কানুনগো ও ইজারাদাররা ছিলেন মধ্যসত্ত্বভোগী জমিদারবর্গের অন্তর্ভুক্ত। এস নুরুল হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮

[৮৭] শেখর বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩

[৮৮] ঐ

[৮৯] আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলার রাজস্ব প্রশাসনের উন্নতি বিধান ও সংস্কার সাধন।[৯০] দিউয়ান হিসেবে তিনি ভূমি রাজস্ব সংস্কারে টোডারমলের রাজস্ব সংস্কারকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী সংস্কার কাজে ব্রতী হন এবং রাজস্ব প্রশাসনে এক রকম শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এর ফলে সুবা বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং সম্রাটের দরবারে বর্ধিত রাজস্ব প্রেরণ করে মুর্শিদকুলি খান সম্রাটের আরো প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রম অবক্ষয় ও অধোগতির পরিপ্রেক্ষিতে মুর্শিদকুলি খানের নেতৃত্বে বাংলায় নবাবী শাসনের প্রতিষ্ঠা ও সুস্থিতি দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। এমতাবস্থায় বাংলার ভূমি ও ভূমি রাজস্বের উপর অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব স্থাপনে নবাব মুর্শিদকুলি খান নতুন উদ্যম ও আঙ্গিকে প্রয়াস শুরু করেন। কেননা সামন্ততান্ত্রিক নবাবী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নবাবের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি অর্জন বা প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান প্রধানত নির্ভর করছিল ভূমি রাজস্বের উপর। সামাজিক উদ্বৃত্তের প্রধান খাত এবং নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক ক্ষেত্র হওয়ায় বাংলার ভূমি ব্যবস্থার সর্বস্তরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি জোর তাগিদ মুর্শিদকুলি খান অনুভব করেন। তদুপরি স্থানীয়দের জন্য বাংলায় একটি প্রতিকূল বাণিজ্যিক পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকায় ভূমি সংস্কার ছিল অনিবার্য। এমতাবস্থায় মুর্শিদকুলি খান একটি ব্যাপকভিত্তিক ভূমিরাজস্ব সংস্কারে ব্রতী হন। মুর্শিদকুলি খানের কৃত ভূমি রাজস্ব সংস্কার বাংলার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তাঁর সংস্কারের ফলে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাপনা বা রাজস্বের ক্ষেত্রেই শুধু পরিবর্তনের সূচনা হলো না, উক্ত সংস্কারের সূত্র ধরে ভূমির স্বত্বভোগ বা বিবিধ প্রক্রিয়ায় ভূমি রাজস্বের লাভালাভের অংশীদার হওয়ায় যে নতুন ব্যবস্থা চালু হয়, তাকে ভিত্তি করে নবাবী বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজকাঠামোতে জামিদার নামীয় ভূ-অভিজাত শ্রেণীর অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৯১]

বাংলার ইতিহাসে মুর্শিদকুলি খানের যথার্থ আসনটি তাঁর সুবিখ্যাত তবে বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত ভূমি রাজস্ব পদ্ধতির সাথে জড়িত বলে অনেকেই মনে করেন। তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থাটি ব্যাপক এবং এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে অনেক বিতর্কও রয়েছে। এসব বিতর্কের চুলচেঁরা বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা আলোচ্য ক্ষেত্রে সম্ভব নয় এবং খুব বেশি প্রাসঙ্গিকও নয়। কাজেই এ ব্যাপারে মোটাদাগে কিছু আলোচনার প্রয়াস থাকছে। প্রাপ্ত তথ্য-উৎসসমূহ বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মুর্শিদকুলি খান প্রচলিত রাজস্ব-ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করেন নি। তাঁর কৃত রাজস্ব সংস্কার ছিল পুরাতন ও নতুনের সংমিশ্রণ। কিছু কিছু সাহসী ও যুগোপযুগী পদক্ষেপ ছাড়া তাঁর অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ব্যাপক অংশই ছিল তাঁর পূর্বসূরীদের সময় প্রচলিত ব্যবস্থার একধরনের সম্প্রসারণ ও ব্যাপকায়ন।[৯২] ভূমির উর্বরতা ও কৃষকদের খাজনা প্রদানের ক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে যথাসম্ভব একটি নির্ভুল রাজস্ব তালিকা প্রস্তুত ও তা আদায়ের ব্যবস্থা করা তাঁর ভূমি বন্দোবস্তের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল। এ লক্ষ্যে ব্যাপকভিত্তিক ভূমি জরিপ, জমির শ্রেণী ও উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে রাজস্ব পুনর্নির্ধারণ, রাজস্বক্রম (হস্তবুদ) তৈরি, চুক্তি বা ইজারার আওতায় জমিদারদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রদেয় রাজস্বের যথাযথ পরিশোধ

---

[৯০] মোঃ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭

[৯১] মোঃ হাবিবুর রহমান, *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র*, পৃ. ৮

[৯২] Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* Vol. IA , Riyad, KSA, 1985, p. 547

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিতকরণ, জমিদারদের পরিপোষণ বাবদ আদায়কৃত রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট হিস্যা প্রদানের পরিবর্তে 'নানকর' বা 'জলকর' বা বৃহত্তর জমিদারদের ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহদান[৯৩] ইত্যাদি নতুনত্বের ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু পাশাপাশি প্রাকৃতিকভাবে বিরান অনাবাদী অঞ্চলের ভূমিকে জরিপের আওতায় না এনে এসব ক্ষেত্রে পূর্বের রাজস্ব হার অব্যাহত রাখা এবং পূর্বতন রেওয়াজ অনুযায়ী জমিদার পরিবারসমূহের জমিদারি পরিচালনার বংশ পরম্পরাগত অধিকারের স্বীকৃতি দান ইত্যাদি টোডারমলীয় বন্দোবস্তের আর্দশেরই অনুসরণ।

মুর্শিদকুলি খানের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব বন্দোবস্তকে ঘিরে পণ্ডিত মহলে একাধিক প্রশ্নের অবতারণা লক্ষ করা যায়। কোন কোনো মহলের ধারণা মুর্শিদকুলি খানের নতুন ভূমি বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় কিছু পুরাতন জমিদারির পতন ঘটে এবং ঐ সব শূন্যস্থল জুড়ে নতুন জমিদারির উদ্ভব হয়। আবার কারো কারো মতে, তাঁর ভূমি সংক্রান্ত সংস্কার প্রয়াসের ফলে বাংলায় একটি নব্য ভূ-অভিজাততন্ত্রের উদ্ভব হয়। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে, মুর্শিদকুলি খান বাংলার প্রচীন ভূম্যধিকারীদের অধিকারচ্যুত করে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ইজারাদার (জোতদার বা ঠিকাদার) নামে এক শ্রেণীর লোককে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্থ দিয়েছিলেন। তিনি এ ব্যবস্থাকে 'মাল জামিনী'[৯৪] প্রথা নামে অভিহিত করেন। যদুনাথ সরকারের অভিমত হলো ইজারাদাররা কালক্রমে নিজেদের জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে সনাতন ভূস্বামী অভিজাতরা (Territorial Aristrocracy) ধ্বংস হয়ে যায় এবং ইজারাদার জমিদারদের নিয়ে একটি নতুন ভূম্যধিকারী অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠে, যাদের শেষ পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে লর্ড কর্নওয়ালিশ বহাল রেখেছিলেন বলে যদুনাথ সরকারের মত।[৯৫] যদুনাথ সরকারের উপর্যুক্ত বক্তব্যে আংশিক সত্যতা বিধৃত হয়েছে। তবে এতে মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব বন্দোবস্তের পরিণতির প্রকৃত অবস্থার সামগ্রিক রূপটি প্রতিফলিত হয়নি। মুর্শিদকুলি খানের বন্দোবস্তের ফলে বাংলার ঐতিহাসিক জমিদারিসমূহ ধ্বংস হয়ে যায় -এরূপ ঢালাও মন্তব্য ঐতিহাসিক বাস্তবতার পরিপন্থি। মুর্শিদকুলি খানের আমলে দেবীনগর, বেংগাছি, ভাতুড়িয়া, সুলতানপুর, স্বরূপপুর ইত্যাদি কতগুলো জমিদারির পতন ঘটে সত্য। আর এগুলো ছিল মাঝারি ও ক্ষুদ্র জমিদারি। তবে এ সময় মোমেনশাহী, আলপশাহী, ও দীঘাপাতিয়াসহ কিছু নতুন জমিদারি প্রতিষ্ঠা হয়।[৯৬] একটু ভিন্ন প্রকৃতির এবং বার্ষিক পেশকাশের আওতাধীন বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বীরভূম জমিদারি, জঙ্গলমহলের জমিদারিসমূহ, পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পাচেটের জমিদারি এবং উত্তরে বেঙ্গলভূমের জমিদারি ও পরগণাসমূহ মুর্শিদকুলি খানের সময় যথাবিহীত সংরক্ষণ করা হয়। দিনাজপুর, নদীয়া এবং বর্ধমানের রাজপরিবার শাসিত ঐতিহ্যবাহী বৃহদায়তন পুরাতন জমিদারিগুলোকেও অক্ষুণ্ন রাখা হয়। সীমান্তবর্তী কোচবিহার, কামরূপ-আসাম ও ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ মুর্শিদকুলি খানের আনুগত্য স্বীকার করায় তাদের বেলায় চিরাচরিত 'ট্রিবিউট' পদ্ধতি বজায় থাকে। সুতরাং সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়

[৯৩] আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ.পৃ. ৭৩-৮১

[৯৪] নতুন ব্যবস্থায় ইজারাপ্রাপ্তরা যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতো, তার জন্য তাদের কে আগেই জামিনস্বরূপ সেই পরিমাণ টাকার চুক্তি পত্রে সই করতে হতো। এই ব্যবস্থাটিই 'মাল জামিনী' নামে পরিচিত।

[৯৫] J.N. Sarkar (ed.), *History of Bengal, vol. II*, pp. 408-410

[৯৬] ঐ, পৃ.পৃ ৪১৪-৪১৫

যে, মুর্শিদকুলি খানের ভূমি রাজস্ব সংস্কারমূলক বন্দোবস্তের ফলে বাংলার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং জমিদারি কাঠমোতে খুব বেশি ওলটপালট হয়নি। অবশ্য তাঁর বন্দোবস্তের একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট হলো এই সময় রাজস্ব প্রশাসনে স্থানীয় হিন্দুদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবাব হিসেবে মুর্শিদকুলি খান ১৭২২ সালে তাঁর রাজস্ব বন্দোবস্ত সমাপ্ত করেন।[৯৭] তাঁর এই নতুন ভূমি শাসনব্যবস্থা ১৭২৮ সালে নবাব সুজাউদ্দিন খানের হাতে কিঞ্চিত সংশোধিত আকার নিয়ে পলাশীর বিপ্লব অবধি বজায় থাকে।

১৭২২ সালে মুর্শিদকুলি খান যে ভূমি বন্দোবস্ত দেন, সে বন্দোবস্ত অনুসারে সমগ্র বাংলাকে ১৬৬০ টি পরগণা এবং ১৩ টি চাকলায় ভাগ করা হয়।[৯৮] প্রতিটি চাকলার অধীনে এক বা একাধিক ইহ্তিমাম (একজন বড় জমিদার শাসিত এলাকা) ছিল। নবাবী আমলে ১৫টি বড় ইহতিমাম এবং ক্ষুদ্র জমিদারি শাসিত ১০টি ইহতিমাম নিয়ে গড়ে ওঠেছিল জমিদারি ব্যবস্থা। এসব জমিদারির মধ্যে প্রথমেই আসে বর্ধমানের জমিদারির কথা। আয়তনে না হলেও রাজস্ব জমার দিক থেকে বর্ধমান ছিল তৎকালীন বাংলার বৃহত্তম জমিদারি। নবাব দরবার এবং সমকালীন রাষ্ট্র ও সমাজে বর্ধমান জমিদারের অপরিসীম প্রভাব ছিল। পাঞ্জাবি ক্ষত্রিয় ব্যবসায়ী আবু রায় ছিলেন বর্ধমান জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা। তবে এ জমিদারির বিকাশ শুরু হয় কীর্তিচন্দ্রের (১৭০২-১৭৪০ খ্রি.) সময়ে । কীর্তিচন্দ্র কখনো বকেয়া খাজনার দায়ে পড়া জমিদারদের জমিন সেজে, কখনো নবাব সরকারের হুকুমে এবং কখনো বা বল প্রয়োগে সৈন্য পাঠিয়ে একে একে দক্ষিণ রাঢ়ের প্রাচীনতম জমিদারিসমূহ গ্রাস করে নিয়ে তাঁর জমিদারির কলেবর বৃদ্ধি করেন।[৯৯] লক্ষণীয় যে, অন্যান্য জমিদারদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের সময় নবাব সরকারের পক্ষ থেকে কীর্তিচন্দ্রকে কোন বাধা দেয়া হয়নি, বরং উল্টো ১৭৩৬ সালে একটি বাদশাহী ফরমান দ্বারা চন্দ্রকোণা অভিযানে বিজিত পরগণাগুলোর উপর কীর্তিচন্দ্র রায়ের অধিকার কায়েমি করে দেয়া হয়।[১০০] এ থেকে নবাবী দরবারের সাথে বর্ধমান রাজের ঘনিষ্ট সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এ ঘনিষ্টতার কারণেই আনুষ্ঠানিকভাবে 'রাজা' উপাধি না পেলেও জমিদারি এলাকায় তিনি জনগণের কাছে রাজার ন্যায় সম্মান লাভ ও রাজা হিসেবেই সম্বোধিত হতেন।[১০১] ১৭৪০ সালে কীর্তিচন্দ্রের উত্তরাধিকারী চিত্রসেনের (১৭৪০-১৭৪৪ খ্রি.) সময়ে বর্ধমান জমিদারি আরো সম্প্রসারিত হয়। চিত্রসেনের উত্তরসূরি তিলকচন্দ্রের সাথে নবাব আলিবর্দী খানের খুবই সুসম্পর্ক ছিল। পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত নবাবী রাষ্ট্রের একজন প্রভাবশালী ভূ-অভিজাত হিসেবে তাঁর প্রতিপত্তি বজায় থাকে।

নবাবী আমলের আরেকটি বিখ্যাত জমিদারি ছিল দিনাজপুর জমিদারি। হরিরাম ঘোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলার এ প্রাচীন জমিদারিটি মুর্শিদকুলি খানের আমলে সম্প্রসারিত হয়ে বিখ্যাত দিনাজপুর রাজ্যের আকার ধারণ করে। প্রাণনাথ (১৬৮২-১৭২৩ খ্রি.) দিনাজপুরকে বাংলার অন্যতম জমিদারিতে পরিণত করেন। মুর্শিদকুলি খানের আনুকূল্যে প্রাণনাথ সম্রাট

[৯৭] আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ৮০

[৯৮] চাকলাগুলো ছিল: ১. বন্দর বালাসোর ২. হিজলী ৩. মুর্শিদাবাদ ৪. বর্ধমান ৫. হুগলী ৬.ভূষণা ৭. যশোহর ৮. আকবর নগর (রাজমহল) ৯. ঘোড়াঘাট ১০. কুরিবাড়ি (কোচ বিহার ও আসাম) ১১. জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) ১২. সিলেট ১৩. ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)। গোলাম রববানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

[৯৯] Shirin Akhter, *Role of the Zamindars in Bengal 1707-1772*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1982, p. 45

[১০০] রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮

[১০১] রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৯, ১৯

Dhaka University Institutional Repository

ফর্‌রুখসিয়ারের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি লাভে সক্ষম হন। প্রাণনাথের উত্তরসূরি রামনাথকে (১৭২৩-১৭৬০ খ্রি.) 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি দেয়া হয়েছিল। নবাব সরকারের দিউয়ানি সনদ বলে রামনাথ তিনটি আলাদা আলাদা জমিদারি লাভ করায় দিনাজপুর জমিদারি পূর্ণ আকার ধারণ করে।[১০২] নবাব দরবারে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ও খাতির ছিল বলে জানা যায়। এ প্রভাবের কারণেই তিনি কোন রকম 'হস্ত ও বুদ' অনুসন্ধান বা আমিলের (সরকারি রাজস্ব সংগ্রাহক) শাসনমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে জমিদারি পরিচালনা করতে পারতেন।[১০৩]

বাংলার জমিদারিসমূহের মধ্যে নদীয়া জমিদারি পূর্বাপর প্রসিদ্ধ ছিল। স্বনামখ্যাত বন্দ্য বংশীয় ভবানন্দ মজুমদার[১০৪] এ বিখ্যাত জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা। ভবানন্দের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রঘুরাম রাজশাহীর বিদ্রোহী জমিদার উদয়নারায়ণকে দমনে মুর্শিদকুলি খানকে সাহায্য করায় নবাব দরবারে তাঁর খাতির বাড়ে। নবাব দরবারের আনুকূল্যে রঘুরামের সময় নদীয়া জমিদারির আয়তন বৃদ্ধি পায়। ১৭২৮ সালে রঘুরামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র (১৭২৮-১৭৮২ খ্রি.) নদীয়ার জমিদারির ভারপ্রাপ্ত হন। এবং নদীয়ার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্বনামধন্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হন। তাঁর সময়ে নদীয়া জমিদারির কলেবর আরো সম্প্রসারিত হয়। তিনি শুধু একজন রাজা-জমিদার নন, সামাজিক বিবর্তনের প্রতিফলকরূপেও তিনি গোটা আঠারো শতকব্যাপী বাঙ্গালি সমাজ মানসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। নবাব আলিবর্দী খান তাঁকে তাঁকে 'ধর্মচন্দ্র' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।[১০৫] নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে সমকালীন নবাবী বাংলার রাজনীতির অন্দর মহলের একজন প্রভাবশালী লোক ছিলেন পলাশী বিপ্লবে চক্রীদলের সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকে এর প্রমাণ মেলে।

নাটোর জমিদারির প্রতিষ্ঠা নবাব মুর্শিদকুলি খানের আমলের অন্যতম বিখ্যাত ঘটনা। নবাবী প্রশাসনের প্রভাশালী অমাত্য রঘুনন্দের ভাই রামজীবন এ জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা। নবাব দরবারে রঘুনন্দের প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে নাটোর জমিদারি প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে। সুত্রে উল্লেখ রঘুনন্দ তাঁর প্রভাব এবং বুদ্ধি ও কৌশলবলে ভাই রামজীবন ও তাঁর ছেলে কালু কোঁয়ার (কালিকা প্রসাদ) নামে পরগণা বানগাছি, ভাতুরিয়া ও রাজশাহী জমিদারি বন্দোবস্ত করে নেন।[১০৬] রাজশাহী জমিদারি প্রাপ্তির ফলে বাংলার ইতিহাসে নাটোর জমিদারিরও যশ খ্যাতি ও গৌরব বৃদ্ধি পায় এবং রামজীবন 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন। এরপর পরগণা নলদী, রাজা সীতারমের হস্তচ্যুত[১০৭] ভূষণা জমিদারি, অবাধ্য জমিদার সুজাৎ খাঁ ও নিজাবৎ খাঁর বাজেয়াপ্ত সরকার মহাম্মদাবাদের তুঙ্গী স্বরূপপুর জমিদারি এবং এনায়েতুল্লাহ খানের অধীন জামালপুর জমিদারিসহ আরো কয়েকটি জমিদারি নাটোর রাজ রামজীবনের হস্তগত হওয়ায় এক পুরুষেই নাটোর জমিদারি

---

[১০২] Shirin Akhter, *op. cit.* p. 37

[১০৩] *ঐ*, পৃ. ৬৫

[১০৪] তিনি সাতগাঁও সরকারের অধীন রাজস্ব বিভাগের মহুরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫

[১০৫] রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬

[১০৬] কখন এ ঘটনা ঘটেছিল তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে স্টুয়ার্টের বরাতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এ ঘটনার কাল ১৭০৮ বলে উল্লেখ করেছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *রাণী ভবানী*, প্রথম দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৬

[১০৭] রাজা সীতারামের জমিদারিচ্যুতি ও তাঁর নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ.২৭-২৯, কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৫৪-৫৭; আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ.পৃ. ৮০

বাংলার বৃহত্তম জমিদারিতে পরিণত হয়। আর্থিক প্রতিপত্তি এবং রঘুনন্দের প্রভাব ও কৌশলে রামজীবন বাংলার সর্বপ্রধান সামন্ত অভিজাত এবং নবাব দরবারে গ্রহণযোগ্য এক প্রভূত প্রভাবশালী ভূস্বামী অভিজাতে পরিণত হন। রামজীবন মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র রামকান্ত নবাব সুজাউদ্দিনের কাছ থেকে নাটোর জমিদারির বন্দোবস্ত লাভ করেন।[১০৮] তাঁর সময়ে নাটোর জমিদারির কলেবর এবং প্রভাব প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পায়। ১৭৪৮ সালে অপুত্রক অবস্থায় তাঁর অকাল মৃত্যু হলে বিধবা স্ত্রী রাণী ভবাণী নবাব আলিবর্দী খানের কাছ থেকে নাটোরের জমিদারি বন্দোবস্ত নেন।[১০৯] এ অধিশ্বরীর অধীনে রাজশাহী-নাটোর জমিদারির গৌরব রবি আরো প্রসারিত হয়। শুধু জমিদারি পরিচালনায় দক্ষতা নয়, সমাজসেবা ও রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে রাণী ভবাণী সমকালের বাংলার ইতিহাসে নিজের বিশেষ স্থান নিশ্চিত করে নেন।

নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় পূর্ব বাংলায়ও একাধিক মাঝারি ধরনের জমিদারির প্রতিষ্ঠা লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে মোমেনশাহী ও মুক্তাগাছা (আলপশাহী) জমিদারি অন্যতম। মোমেনশাহী জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ হালদার। যদুনাথ সরকারের তথ্য মতে, শ্রীকৃষ্ণ হালদার নবাবী প্রশাসনের কানুনগো হিসেবে বিদ্রোহী জমিদার দমনে সহায়তা এবং সরকারি রাজস্ব আদায়ে কর্মনিষ্ঠতার পুরস্কার হিসেবে মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক চৌধুরী উপাধি এবং মোমেনশাহী জমিদারি প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান। সে সময় মোমেনশাহী খুবই দুর্গম ও পশ্চাৎপদ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ হালদার উক্ত অঞ্চলে চাষাবাদের বিস্তার ঘটান এবং শিক্ষার প্রসারসহ নানা জনহিতকর কাজ সাধন করে উদীয়মান ভূ-অভিজাত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব আলিবর্দী খানের সময় তাঁর পুত্র চাঁদরায় খালাসা দপ্তরের প্রধান নিযুক্ত হন এবং এ সুবাদে জাফরশাহী পরগণাকে তাঁর পিতার জমিদারির সাথে যুক্ত করে দেন।[১১০] মুর্শিদকুলি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী মুক্তগাছায় (আলপশাহী পরগনায়) একটি জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। এ ভূ অভিজাত 'মোমেনশাহীর মহারাজা' হিসেবে সমকালীন বাংলার ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।[১১১]

মুর্শিদকুলি খানের সময় যেসব প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জমিদারি সংরক্ষণ করা হয়, তন্মধ্যে বীরভূম, বিষ্ণুপুর ও পচেট জমিদারি অন্যতম। মুর্শিদকুলি খান ভূমি রাজস্ব সংস্কারকালে এসব জমিদারি তাঁর জরিপ কাজের আওতায় আনেন নি বা নতুন করে রাজস্ব নির্ধারণ করেন নি। সম্ভবত ভৌগলিকভাবে দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ মনযোগ দেননি। যা হোক বীরভূম ছিল সেসময়কার বাংলার প্রধান মুসলিম জমিদারি। সেনভূম, ভুরকুণ্ড সমেত এ জমিদারি ২২ টি পরগণায় বিস্তৃত ছিল। বীরভূমের জমিদার আসাদুল্লাহ খান (১৬৯৭-১৭১৮ খ্রি.) ইতিহাসে খ্যাতিমান ব্যক্তি। ধার্মিকতা ও জনহিতৈষণা তাঁর এ খ্যাতির অন্যতম কারণ। ১৭১৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বদি-আল-জামান খান (১৭১৮-১৭৫১ খ্রি.) মুর্শিদাবাদ নবাবের তরফ থেকে বীরভূম জমিদারি বন্দোবস্ত লাভ করেন। পুত্র আলী নকি খানের

---

[১০৮] রাম জীবনের পুত্র কালু কোঁয়ার পিতার জীবদ্দশাতেই মারা যান। তাঁরও কোন পুত্র সন্তান না থাকায় রামজীবন রামকান্ত কে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

[১০৯] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৬২

[১১০] J.N. Sarkar (ed.), *op. cit.* pp. 414-415; Shirin Akhter, *op. cit.* p. 36

[১১১] J.N. Sarkar (ed.), *op. cit.* pp. 414-415,

সহায়তায় তাঁর সময়ে বীরভুম জমিদারি আরো সম্প্রসারিত হয়। ১৭৫২ সালে পিতার জীবদ্দশাতেই বদি-আল-জামানের তৃতীয় পুত্র আসাদ আল জামান খান (১৭৫২-১৭৭৭ খ্রি.) জমিদারি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই বংশে তিনিই প্রথম 'রাজা' উপাধি লাভ করেছিলেন।[১১২]

বিষ্ণুপুর একটি সুপ্রাচীন জমিদারি। কথিত আছে যে, অষ্টম শতাব্দীতে আদিমল্ল রঘুনাথ এ জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। মুর্শিদকুলি খান ঐতিহ্যবাহী এ জমিদার পরিবারটিকে ধ্বংস না করলেও স্বাধীন ও বিদ্রোহপ্রবণ এ জমিদারিটির আংশিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে এর প্রতিপত্তি হ্রাস করেন। মুর্শিদকুলি খান জমিদার গোপাল সিংহের[১১৩] (১৭১২-১৭৪৮ খ্রি.) সাথে পেশকাশের পরিবর্তে বার্ষিক খাজনার আওতায় জামদারি বন্দোবস্ত করেন। ১৭৪৮ সালে চৈতন্য সিংহ বিষ্ণুপুরের জমিদারি লাভ করেন। তাঁর সময় জমিদার পরিবারের উত্তরাধিকার সংঘাত এবং বর্ধমান জমিদারি ক্রমবর্ধমান প্রভাবে বিষ্ণুপুর ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। বাংলার সীমান্তভাগের অর্ধ স্বাধীন পচেট বা পঞ্চকোট ছিল রাজপুত শাসিত পেশকাশী জমিদারি। নবাব মুর্শিদকুলি খান ঐতিহ্য অনুযায়ী পেশকাশ প্রাপ্তির শর্তেই পচেটের সাথে নতুন বন্দোবস্ত করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী নবাবগণও এ ধারা অনুসরণ করেন।

কোচ বিহার, কামরূপ-আসাম ও ত্রিপুরা ছিল সীমান্তবর্তী স্বরাটরাজ্য। প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থান ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বিবেচনা করে এদের ব্যাপারে মুর্শিদকুলি খান আনুগত্য ও বার্ষিক 'ট্রিবিউট' প্রাপ্তির বিনিময়ে তুষ্ট থাকার পূর্বসূরিদের রীতি অনুসরণ করেন। সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন্দোবস্ত বিষয়েও মুর্শিদকুলি খান সম্ভবত একই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

১৭২২ সালে নবাব মুর্শিদকুলি খান উত্তর রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ রামকৃষ্ণ রায়কে (১৭০৫-১৭২৯) সৈয়দপুর পরগণাসহ ইউসুফপুরের (যশোহর) জমিদারি বন্দোবস্ত দেন। কৃষ্ণরামের পর তাঁর পুত্র শুকদেব (১৭২৯-১৭৪৫ খ্রি.) জমিদার হন। তাঁর সময়ে ইউসুফপুর জমিদারি দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। তাঁর চাচা শ্যামসুন্দর (১৭৩১-১৭৫০) অলাদাভাবে সৈয়দপুর জমিদারি লাভ করেন। শুকদেবের পর তাঁর ছেলে নীলকণ্ঠ (১৭৪৫-১৭৬৪ খ্রি.) জমিদারি লাভ করেন। অন্যদিকে সৈয়দপুর জমিদারির উত্তরাধিকারী হন রাম গোপাল রায় (১৭৫১-১৭৫৭ খ্রি.)। তিনি অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে হুগলির ফৌজদার মীর্জা সালাহউদ্দিনের নামে এ জমিদারি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। নবাবী বাংলার উল্লেখযোগ্য অন্যসব জমিদারির মধ্যে রোকনপুর জমিদারি অন্যতম। এটি কোন বিশেষ অঞ্চলের জমিদারি ছিল না। বংশানুক্রমিক[১১৪] দিউয়ানি দপ্তরের পদস্থ কানুনগো পদে অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে মুর্শিদাবাদ দরবারে বিশেষ প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে নবাব সুজাউদ্দিন খানের আমলে শিবনারায়ণ বিভিন্ন চাকলায় ছড়ানো বাছা বাছা কিছু মহাল নিয়ে রোকনপুর জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[১১২] রজকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৩

[১১৩] বিষ্ণুপুর বংশাবলী'র তথ্য অনুযায়ী এ বংশের ৫১ তম পুরুষ রঘুনাথ (১৬২৬-১৬৫৬ খ্রি.) প্রথম 'সিংহ' উপাধি ধারণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ সকলেরই উপাধি ছিল মল্ল।

[১১৪] শিবানারায়ণ ছিলেন মিত্রবংশীয় উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ পরিবারের সদস্য। কটোয়ার নিকটবর্তী খাজুরডিহি গ্রামের এ পরিবারের ভগবান রায় এবং বঙ্গবিনোদ রায় নামে দুই ভাই পরপর বাংলার প্রধান কাননগো ছিলেন। বিশেষ দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করায় এ পদটি তাদের বংশানুক্রমিক অধিকারে চলে আসে এবং তাদের উত্তরসূরি হরিনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ 'বঙ্গাধিকারী' উপাধি নিয়ে প্রদান কানুনগো হিসেবে মুর্শিদাবাদ নিযামতের দিউয়ানি দপ্তরে নিয়োজিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিবনারায়ণের পর তাঁর ছেলে লক্ষ্মী নারায়ণ রোকনপুরের জমিদারি লাভ করেন। জানা যায় নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী দলে তিনিও অর্ন্তভুক্ত ছিলেন।[১১৫] মাহমুদশাহী জমিদারি একসময় রাজা সীতারাম রায়ের জমিদারির অন্তর্ভূক্ত ছিল। রাজা সীতারাম রায় নিহত হওয়ার পর তাঁর জমিদারির অধিকাংশ অঞ্চল নাটোর জমিদরির সাথে যুক্ত করা হয়। কিন্তু মুর্শিদকুলি খান মাহমুদশাহী জমিদারি নলভাঙ্গার ব্রাহ্মণ জমিদার রামদেবের (১৬৯৮-১৭২২ খ্রি.) সাথে বন্দোবস্ত করেন। পরবর্তীতে তাঁর বংশধরেরা এ জমিদারি পরিচালনা করেন। ফতেহসিং ছিল বর্ধমান ও বীরভূমের সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি মধ্যমাকৃতির জমিদারি। মুর্শিদকুলি খান হরিপ্রসাদ নামক এক ব্রাহ্মণের নিকট এ জমিদারি বন্দোবস্ত দেন। নবাব আলিবর্দী খানের সময় হরিপ্রসাদের কর্মচারী বৈদ্যনাথের ছেলে নীলকণ্ঠ এ জমিদারির বন্দোবস্ত লাভ করে।[১১৬] প্রসঙ্গত ইদ্রাকপুর এবং রাজনগর জমিদারির কথাও উল্লেখ করা যায়। সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ইদ্রাকপুর জমিদারির উৎপত্তি হয়েছিল দিনাজপুরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে।[১১৭] মুর্শিদকুলি খান বিশ্বনাথ কায়স্থের সাথে এ জমিদারির বন্দোবস্ত করেছিলেন। রাজনগর জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা রাজবল্লভ। মুর্শিদাবাদ নিযামতের এ প্রভাবশালী আমলা[১১৮] নিজ প্রভাব বলে এ জমিদারির অধিকারী হন। বরিশালের শায়েস্তাবাদ[১১৯] জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইরিচ খান। জানা যায় তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। নোয়াখালির চন্দ্রার জমিদার ছিলেন আরিফত চৌধুরি। সুজাউদ্দিন খানের রাজস্ব বন্দোবস্তের তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে নবাবী আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূ-অভিজাত শ্রেণী সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। সামগ্রিক চিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সামন্ততান্ত্রিক নবাবী সমাজকাঠামোতে রায়ত ও সরকারের মাঝখানে ছিল এ ভূস্বামী জমিদারদের অবস্থান। সরকারের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই জমিদারদের ছিল দ্বৈতসত্ত্বা– একদিকে তারা ছিলেন ভূমিসত্ত্বভোগী এবং অন্যদিকে মধ্যসত্ত্বভোগী। জমিদারির আকার আয়তন এবং জমিদারদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের নিরিখে শিরিন আখতার বাংলার এ জমিদারদের স্বরাট (autonomus), প্রান্তীয় (frontier), বৃহৎ (big) ও ছোট (petty) এ চারটি বর্গে বিভক্ত করেছেন।[১২০] এদের মধ্যে প্রথম তিনটি বর্গভূক্ত জমিদারদের নিয়েই গড়ে ওঠেছিল নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর শক্তিধর অঙ্গশক্তি ভূ-অভিজাত শ্রেণী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ অভিজাত শ্রেণী ভূমি সংশ্লিষ্ট হলেও তাদের অভ্যন্তরীণ স্বরূপের মধ্যে একটি আমলাতান্ত্রিক চরিত্র ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নবাবী যুগেও ভূ-অভিজাত জমিদারগণকে মুঘল আমলের মতোই সরকারের প্রশাসনিক প্রয়োজন সাধন ও উদেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত

---

[১১৫] রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯

[১১৬] রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯

[১১৭] Shirin Akhter, *op. cit.* p. 36

[১১৮] রাজবল্লভ ছিলে বৈদ্য পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা কৃষ্ণজীবন ছিলেন মুর্শিদাবাদ নাওয়ারা দপ্তরের মজুমদার (কোষাধ্যক্ষ)। রাজবল্লভ প্রথমে কানুনগো দপ্তরের মুহরি হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং ক্রমান্বয়ে জাহাঙ্গীরনগরের দিউয়ান, নায়েব সুবাদার এবং মুঙ্গেরের সুবাদার পদে উন্নীত হন। আঠারো শতকের নবাবী বাংলার রাজনীতিতে বিশেষ করে পলাশীর রাষ্ট্র বিপ্লবে তিনি ছিলেন অন্যতম কুশীলব।

[১১৯] সম্ভবত সুবাদার শায়েস্তা খানের নামে শায়েস্তাবাদ পরগনার নামকরণ করা হয়েছিল।

[১২০] বিস্তারিত দ্র. Shirin Akhter, *op. cit.* p p. 4-17

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বস্তুত নবাব সরকার পরিচালনার প্রধান নিয়ামক শক্তি ছিল ভূমি 'জমা'। মুর্শিদকুলি খান ছিলেন খরচ কাতর লোক। এ জন্য তিনি স্থানীয় আমিল মারফত রায়তদের কাছ থেকে ভূমি জমা আদায়ের ব্যয় বহুল পদ্ধতির পরিবর্তে জমিদারদের উপর ভিত্তি করে অল্পব্যয়ে একটি রাজস্ব বা দিউয়ানি শাসন গড়ে তুলেন। জেমস গ্রান্ট পরিবেশিত তথ্য মোতাবেক নবাব সুজাউদ্দিন খানের *জমা তুমারি তখশিসে* যে পনেরটি বৃহৎ জমিদারির উল্লেখ আছে, তাদের দেয় ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল সমগ্র বাংলার রাজস্বের প্রায় অর্ধেক।[১২১] মুর্শিদকুলি খান এ জমিদারি প্রশাসন গড়ে তুলতে কিছু নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু পুরাতন রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও পদ্ধতিকে যে সর্বাংশে বর্জন করেন নি, উপরের আলোচনায় তা পরিলক্ষিত হয়েছে। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নবাবী যুগের ভূ অভিজাতগণ সবাই নতুনরূপে আবির্ভূত হননি। এসময় কিছু নতুন জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে, তবে ভূ-অভিজাতদের অনেকেই পূর্বাপর জমিদারি ভোগ করে এসেছেন। তাদের সকলের আর্থিক সঙ্গতি ও সমৃদ্ধিও নবাবী শাসনের আনুকূল্যে অর্জিত হয় নি। সুতরাং নবাবী বাংলায় বিশেষ করে মুর্শিদকুলি খানের ভূমির াজস্ব ব্যবস্থায় বাংলায় সর্বাংশে একটি নতুন ভূ-অভিজাততন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল- এ কথা না বলে, বরং তথায় একটি মিশ্র ভূ-অভিজাত শ্রেণীর বিদ্যমানতা স্বীকারই অধিক যুক্তিযুক্ত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদায়কৃত ভূমি রাজস্বের দ্বারাই পরিচালিত হতো গোটা নবাবী প্রশাসন। আর কৃষকদের কাছ থেকে এ রাজস্ব জমা আদায় করে দিতেন জমিদার নামীয় ভূস্বামীগণ। এ সময় বীরভুম, বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, নদীয়া, নাটোর ও দিনাজপুর এ ছয়টি বৃহৎ জমিদারির মাধ্যমে নবাব সরকার ভূমি রাজস্বের প্রায় ৫০ শতাংশ আদায় করতো।[১২২] রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব পালনের জন্য তারা পেতেন 'রুসুম' ও 'নানকর' নামক আর্থিক সুবিধা। যেহেতু জমিদারদের যথাযথ দায়িত্ব পালনের উপর রাজস্ব জমা আদায় নির্ভর করতো সে জন্যই তাদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষ নজর রাখা হতো। তাদের উপর নজরদারি করার জন্য ঢাকায় নায়েব নাজিম, রংপুর, রাজমহল, পুর্ণিয়া, সিলেট ইত্যাদি প্রত্যন্ত অঞ্চল ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রে ফৌজদারদের মোতায়েন রাখা হতো। ১ বৈশাখ পুণ্যাহের দিন জমিদাররা স্বয়ং অথবা তাদের উকিল মুর্শিদাবাদ রাজধানীতে এসে নজর ও সেলামীসহ নিধারিত রাজস্ব জমা দিতেন এবং বিনিময়ে নবাবগণ পদমর্যাদা অনুযায়ী জমিদারদের খিলাৎ দ্বারা সম্মানিত করতেন। পুণ্যাহের দিন মুর্শিদাবাদে নবাব, তাঁর অধীনস্থ অমাত্য রাজপুরুষ ও জমিদারদের মুখোমুখি অবস্থানে গোটা শাসন ব্যবস্থার একটি চাক্ষুষ প্রকৃতি উপস্থাপিত হতো এবং ঐদিনই নবাবী দরবারে কার কি অবস্থান তা স্পষ্ট হয়ে যেতো। সমসাময়িক সূত্রে দরবারের এ চিত্র থেকে শাসনযন্ত্রে ভূস্বামী জমিদারদের উচ্চ স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। বস্তুত মুর্শিদকুলি খান তাঁর নতুন ক্ষমতা কাঠামোতে অমাত্য মনসবদার অভিজাতদের পাশে জমিদারবর্গের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। নবাবী বাংলার অভিজাত চক্রে স্থান লাভকারী এ সামাজিকশক্তি আঠারো শতকের বাংলার ইতিহাসে তাদের সময়ধর্মী ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে নানা ভাবে প্রভাবিত করার সামর্থ প্রদর্শন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় নবাবী যুগে ভূ-

---

[১২১] Philip B Chalkins, 'The Formation of Regionally Oriented Ruling Group in Bengal', in *The Journal of Asian Studies*, vol. XXIX, No. 4, August 1970, p. 803

[১২২] নোমান আহমদ সিদ্দিকী, *মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালন ব্যবস্থা (১৭০০-১৭৫০)*, পার্ল পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃ. ৮৮

অভিজাত শ্রেণীতে নিরঙ্কুশ হিন্দু প্রাধান্য ছিল। বীরভূম ছাড়া এসময় আর কোনো মুসলিম বৃহৎ জমিদারির অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। তবে জমিদারি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে নবাবদের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণের কোনো বাছ-বিচারের মনোভাব কাজ করেছিল বলে মনে হয় না। আর এ কারণেই শুধু বর্ণ হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ নয় নবাবী আমলে জমিদার শ্রেণীতে নিম্ন বর্ণীয় তিলি, সদগোপ ও বাগদীদেরও জমিদার হয়ে উঠতে দেখা যায়। এভাবেই নবাবী যুগে বর্ণ প্রথায় আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে জমিদারি ব্যবস্থা সমাজে উঁচু স্তরে আরোহণের একটি সোপানে পরিণত হয়।

৫.২.৩ বণিক অভিজাত শ্রেণী

নবাবী আমলে অমাত্য অভিজাত ও ভূ-স্বামী জমিদার শ্রেণীর আবেষ্টনী জুড়ে একটি নব্য ধনিক-বণিক অভিজাত গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। রাষ্ট্র ও সমাজকাঠামোতে বণিকদের অভিজাত শ্রেণীতে ঠাঁই করে নেয়ার ঘটনা বাংলার ইতিহাসে একটি নবতর সংযোজন। প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলা যে সমৃদ্ধ ছিল এ ব্যাপারে পণ্ডিত মহলে বিশেষ কোন বিতর্ক নেই। বাংলার প্রাচীন তাম্রলিপ্তি বন্দর ও গ্রিক ঐতিহাসিক বিবরণাদিতে প্রাচীনকালে বাংলায় সমৃদ্ধ বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় বণিক-ব্যবসায়ীরা সমাজ জীবনে অভিজাত শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত ছিল কী-না, তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও সামাজে তারা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের (৩২০-৬০০ খ্রি.) পতনের পর থেকেই থেকে বাংলার অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। এসময় ব্যবসা-বাণিজ্যের অধোগতি শুরু হয়-যা পাল শাসনামলে (৭৫০-১১৭৪ খ্রি.) দ্রুততর হয়ে এবং সেন আমলে (১০৭০-১২৩০ খ্রি.) একেবারে ধ্বংস হয়ে পড়ে। এ সময় বণিকদের সামাজিক অবমূল্যায়ন হয়। বর্ণভেদ প্রথায় তারা মধ্যম শংকর বা তারও নিচে অসৎ শুদ্রের পঙক্তিভূক্ত হয়ে পড়ে। তবে বাংলায় সেন শাসনের অবসান এবং তুর্কো-আফগান মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় উপর্যুক্ত অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচুর উদ্বৃত্তি এবং সমুদ্রযাত্রায় শাসকদের নতুন উদ্দীপনার ফলে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুল সম্প্রসারণ ও প্রভূত উন্নতি হয়। চৈনিক, পর্তুগিজ ও ইতালীয় বিবরণী এবং সমকালীন সাহিত্য, বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ক্রমপ্রসারতা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বণিক শ্রেণীর উদ্ভবের সাক্ষ্য মেলে। উল্লেখ্য যে, এ সময় উত্তর ভারতের সাথে রাজনৈতিক বিরোধের কারণে বাংলা বাণিজ্য পূর্বমুখী হয়। ফলে স্থানীয় বণিক সমাজের বিকাশও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক হতে আবার অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। এ সময় থেকে সতের শতকের প্রথম তিন দশকব্যাপী বাংলায় পর্তুগিজদের একচেটিয়া বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলার উদীয়মান স্থানীয় বণিক শ্রেণীর বিকাশপথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় বাংলা মুঘল সম্প্রসারণবাদের শিকার হলে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পর্তুগিজ বণিকদের বাইরে ইউরোপাগত অন্যান্য বাণিজ্যিক কোম্পানি এবং উত্তর ভারত থেকে আগত বণিক মহাজন ও তাদের পৃষ্ঠপোষক মুঘল সুবাদার ও আমলারা বাংলা বাণিজ্যে ভাগ বসায়। সুবাদার শাহসুজা থেকে আজিম-উস-শান পর্যন্ত সব সুবাদার ও অন্যান্য পদস্থ আমলারা 'সওদায়ে খাস' নামে

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্য কুক্ষিগত করেন।[১২৩] ফলে পেশাজীবী বণিক শ্রেণী নিস্প্রভ হয়ে পড়ে; সামাজিক শক্তি হিসাবেও তাদের অবস্থান ক্ষুণ্ন হয়। অবশ্য সতেরো শতকের শেষ দিক থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। এই সময় নানা কারণে ব্যবসা বাণিজ্যে রাজপুরুষদের নিয়ন্ত্রণ বন্ধ হয়; 'সওদায়ে খাসে'র পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস এবং পক্ষান্তরে 'সওদায়ে আম' এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।[১২৪] এর ফলে শুধু অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নয় একটি প্রভাবশালী সামাজিকশক্তি হিসেবেও বাংলায় পেশাধার বণিক-ব্যবসায়ী-মহাজনদের উত্থান ও বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়।

আঠারো শতকে নবাব সরকার যুগে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। বাংলার রজনৈতিক স্থিতিশীলতা, মোটামুটি উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা ব্যবসা বাণিজ্য বিকাশের একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। বস্তুত সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল ভারতের সর্বত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। তবে ব্যতিক্রম ছিল সুবাহ্ বাংলা। এখানে আইন শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবনতি ঘটেনি; বরং মুর্শিদকুলি খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলা সুস্থিতি বজায় থাকে ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে। গোলাম হোসেন সলিম লিখেছেন, মুর্শিদকুলি খান সুবা বাংলায় প্রবল প্রাণশক্তি নিয়ে শাসন করার ফলে মুঘল কেন্দ্রীয় দরবারে সিংহাসন নিয়ে বিপ্লবজনিত অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা থেকে বাংলার জনগণ মুক্ত ছিলেন।[১২৫] এমনকি পুনপৌণিক মারাঠা আক্রমণ সত্ত্বেও মুর্শিদকুলি খানের সময় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও সুস্থিতির ঐতিহ্য মোটামুটিভাবে পলাশী যুদ্ধ পর্যন্ত বজায় থাকে। এর ফলে এসময় বাংলায় কৃষিজ উৎপাদনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুটির ও হস্ত শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বাণিজ্য পুঁজির সহজ যোগান এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এমনকি, ইউরোপের বাজারে বাংলা পণ্যের বিপুল চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ভারতীয় ও অন্যান্য এশীয় বণিকদের বাইরে বাংলা বাণিজ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির অংশ গ্রহণের ফলে বাণিজ্য জগতে অপূর্ব গতিবেগ আসে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির ফলশ্রুতি স্বরূপ এ সময় বাংলায় একটি সমৃদ্ধশালী বণিক-মহাজন গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে- যারা তাদের বিপুল ধনসম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের বদৌলতে রাষ্ট্র ও সমাজে মার্যাদাবান অভিজাত সামাজিকশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুঘল সুবাদারি যুগে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল রাজ পুরুষদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে। তাদের সহযোগী বণিকরা ছিল উত্তর ভারতীয় মুঘল, গুজরাটি এবং সেই সাথে আর্মেনিয় ও পারসিক। সতেরো শতকের শেষ দিকের পরিবর্তিত অবস্থায় এই বণিক শ্রেণী তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত রাখেন বটে; কিন্তু বাংলায় আগত ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে তাদের সাংগঠনিক চরিত্র ও ভূমিকায় আমূল পরিবর্তন আসে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে নবাব সরকার যুগে বাণিজ্য জগতে দালাল বণিক, সাররাফ বা মুদ্রা ব্যবসায়ী, ব্যাংকার ও মহাজন শ্রেণীরও বিকাশ ঘটে। বাংলায় বাণিজ্যরত ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো এ দেশের জটিল মাপ প্রণালী,

[১২৩] Susil Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization in Bengal,* Calcutta, 1975, pp.92-93

[১২৪] রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩

[১২৫] গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ ১৬৬ ; আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলি খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থা এবং বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ায় নিজেদের সুবিধার্থে দেশের সর্বত্র দালাল বা এজেন্ট নিযুক্ত করে। তবে অর্থ-বিত্তে স্বচ্ছল ও সামর্থবান হলেও দালাল বণিকরা সামাজিক মর্যাদায় অভিজাত সমাজভুক্ত হতে পারেনি। অভিজাত শ্রেণীভুক্ত বণিক-ব্যবসায়ী ছিলেন যাদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের সামর্থ ছিল। তাছাড়া এ সময় ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের বাণিজ্য তৎপরতা, তাদের বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য ও মূল্যবান ধাতু আমদানির ফলে বাংলায় যে সাররাফ বা মুদ্রা ব্যবসায়ী, ব্যাংকার ও মহাজন শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল তারাও অভিজাত বণিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অভিজাত বণিক ব্যবসায়ীরা সংখ্যায় খুব বেশি ছিলেন না।

নবাবী যুগের অভিজাত বণিকদের মধ্যে অন্যতম ছিল মুদ্রা ব্যবসায়ী ও ব্যাংকার মহাজন শ্রেণী। ১৭০৫ সালের ইংরেজ কোম্পানির দলিলপত্র থেকে সে সময়ে বাংলায় কর্মরত বেশ কয়েকটি ব্যাংক বা মহাজনী প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায়। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাটনা ও হুগলির ব্যবসায়ীগণ ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলায় বাণিজ্যরত ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহেরও লেনদেন ছিল। যে সকল বণিক-ব্যবসায়ীরা এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন তাদের মধ্যে ফতেহচাঁদ, আনন্দচাঁদ, মানিকচাঁদ, লালজী, ব্রীজবুকন, সদানন্দ শিবদত্ত, সুখদেব, হিম্মত সিং, লক্ষ্মণ সিং এবং মনেশ্বর নাথ প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। বর্ণিত বণিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে শিবদত্ত ও মিত্রসেন ছিলেন বঙ্গীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। বাকি সকলেই ছিলেন বহিরাগত উত্তর ভারতীয় জনগোষ্ঠী থেকে আগত। মানিকচাঁদ, ফতেহচাঁদ, ও আনন্দচাঁদ ছিলেন তদানিন্তন বঙ্গ-ভারতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান 'হাউজ অব জগৎশেঠের' (The House of Jagatseth) সত্ত্বাধিকারী।[১২৬] এদের উত্তরাধিকারী জগৎশেঠ মহাতাব রায় ও মহারাজা স্বরূপচাঁদের তত্ত্বাবধানে এ জগৎশেঠ পরিবারের সমৃদ্ধি অনেক বৃদ্ধি পায় এবং আর্থিক গণ্ডি পেরিয়ে শেঠ পরিবার বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনেও শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করে নেয়। আঠারো শতকের নবাবী বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রভাবশালী ভূমিকার জন্য মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের সাথে শেঠদের নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়ে। J. H. Little এর উদ্বৃতি দিয়ে N. K. Sinha উল্লেখ করেছেন, সম্রাট চালর্সের কাছে হাফসবার্গের ফুগার পরিবার এবং মধ্যযুগের রোমের পোপদের কাছে ফ্লোরেন্সের মেদিচি পরিবার যা- নবাবদের কাছে জগৎশেঠ পরিবার ছিল তাই। বস্তুত এসময় সমগ্র উপমহাদেশে তাদের সমকক্ষ কোনো ব্যাংকার বা ধনী বণিক ছিল না। এ যুগে হুজুরীমল, জনার্দন শেঠ, বানারসী শেঠ, রাম কিষেণ শেঠ, আনন্দ রাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ ব্যাংকিং ব্যবসা করতেন বটে, তবে জগৎশেঠ পরিবার ছিল বাংলার ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যমণি। এদেরকে বাংলার 'রথচাইল্ড' বলা হতো। রাজনৈতিক যোগাযোগ, বিশাল পুঁজির যোগান ও বিস্তৃত ব্যবসায়ী সংগঠন এদের ব্যাংকিং কার্যক্রমকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিল। এদের কাজকর্মকে এডমণ্ড বার্ক 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' (Bank of England) এর সাথে তুলনা করেছেন।[১২৭]

---

[১২৬] আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলি খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ২৩০

[১২৭] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

J. H. Little এর The House of Jagatseth[১২৮] শীর্ষক রচনায় জগৎশেঠ পরিবারের একটি নির্ভরযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। জগৎশেঠ পরিবারের মহাজনী ব্যবসার প্রতিষ্ঠাতা হিরানন্দ সাহু রাজপুতনার মারওয়ারের নাগৌরের অধিবাসী ছিলেন। জৈন ধর্মাবলম্বী ওসওয়াল উপজাতির গৈরলহর পরিবারভুক্ত হিরানন্দ সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে পাটনায় এসে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তাঁর পুত্র মানিকচাঁদ ছিলেন জগৎশেঠ পরিবারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে তিনিও মুর্শিদাবাদে চলে যান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করেন। এখানে তিনি মুর্শিদকুলি খানের প্রীতিভাজনে পরিণত হন এবং তার ব্যাংকার ও প্রধান উপদেষ্টার মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। ইংরেজ বাণিজ্যিক কোম্পানির সাথেও তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিল তাঁকে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর মর্যাদা দেয় এবং নবাবের কাছ থেকে সনদ সংগ্রহের ব্যাপারে আলোচনার জন্য তাদের পক্ষ থেকে তাঁকে নিযুক্ত করে।[১২৯] মুঘল কেন্দ্রীয় দরবারের সাথেও মানিকচাঁদের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত উত্তারধিকার যুদ্ধে তিনি আজিম-উস-শানকে সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য দান করেন। পুরস্কার স্বরূপ দিল্লী দরবার থেকে মানিকচাঁদকে 'নগর শেঠ' (নগরের মহাজন) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়। ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে মানিকচাঁদ মারা যান। কিন্তু তার পূর্বেই শেঠদের ব্যবসা ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদের আদি কুঠি থেকে বেনারস, এলাহাবাদ, কোরা ও জাহানাবাদ হয়ে দিল্লী আগ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মানিকচাঁদের পর ফতেহচাঁদের পরিচালনায় শেঠ পরিবার ও মহাজনী প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত খ্যাতি অর্জিত হয়। সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ ও ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের নথিপত্রে ফতেহচাঁদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ও নবাব দরবারে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তির চিত্র পাওয়া যায়। ইংরেজ ঐতিহাসিক রবার্ট ওর্ম তাকে 'The Greatest shroff and Banker in the Known world' বলে অভিহিত করেছেন।[১৩০] ১৭২৩ সালে ইংরেজ কোম্পানির নথিপত্রে ফতেহচাঁদকে 'Nobob's Chief favourite' বলে উল্লেখিত হতে দেখা যায়।[১৩১] মহাজনী পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করে ফতেহচাঁদ শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যই সম্প্রসারণ করেন নি, নবাব মুর্শিদকুলি খানের আস্থা ও নৈকট্য অর্জনেও তিনি সক্ষম হন। নবাব দরবারের সাথে সম্পর্কের সূত্রে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং দেশের রাজস্ব ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের ফলে এসময় শেঠ পরিবারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। পসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আঠারো শতকে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল ও বিরক্তিকর।[১৩২] তাই বাংলার পুঁজি বিকাশের সাথে মুদ্রা সংস্কার ছিল অতীব জরুরি। কিন্তু নবাব মুর্শিদকুলি জটিল মুদ্রা ব্যবস্থা সংস্কারের কোন কার্যকর ব্যবস্থা না করে ২.৫% শুল্ক প্রাপ্তির বিনিময়ে বুলিয়ান ক্রয় ও

---

[১২৮] J.H.Little, 'The House of Jagatseth' in *Bengal Past & Present*, vol. XX, (1920), pp. 141-200 & vol. XXII (1924) pp.119;

[১২৯] আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলি খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ২৩০

[১৩০] Robert Orme, Mss India vol. VI F. 1455. Cited in Susil Chaudhuri's article in *The Economic and Social History of the Orient*. Vol, XXXI. p. 91

[১৩১] The Diary and consultations of English Council in Calcutta, 26 August, 22 October, 1723

[১৩২] আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলি খান ও তাঁর যুগ*, পৃপৃ. ৮৮-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি টাকশাল থেকে মুদ্রা তৈরির একচেটিয়া অধিকার ফতেহ চাঁদের উপর ন্যস্ত করেন। এর ফলে প্রথমত দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার উপর থেকে সরকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে; টাকশাল তথা সমগ্র মুদ্রা ব্যবস্থার উপর ফতেহচাঁদ পরিবারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত মুদ্রা ব্যবস্থার উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে শেঠরা নিজেদের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের এই কর্তৃত্ব পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করে।

মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহ ১৭২৩ সালে ফতেহচাঁদকে 'জগৎশেঠ' (পৃথিবীর মহাজন) উপাধি দেন এবং পরবর্তীতে এটি তাঁদের পারিবারিক উপাধিতে পরিণত হয়। তাঁর এই উপাধি প্রাপ্তির পশ্চাতে মুর্শিদকুলী খানের সুপারিশ ছিল বলে *তারিখ-ই- বাঙ্গালাহ* ও *রিয়াজ-উস-সালাতিনে* উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৩] শুধু মুদ্রা ব্যবস্থার উপর নয়, বরং এ সময় জগৎ শেঠ পরিবার বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার উপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। জগৎশেঠের কুঠিকে 'শাহী খাজঞ্চীখানা' বলে মনে করা হতো। কেননা বাংলার জমিদাররা মুর্শিদাবাদ নিযামতের প্রাপ্য নির্ধারিত রাজস্ব জগৎশেঠের কুঠিতে জমা দিতো। অনেক সময় অনাদায়ী বকেয়া রাজস্ব পরিশোধেও জগৎশেঠের কুঠি জমিদারদের অর্থ ঋণ দিয়ে সহায়তা করতো। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারদের রাজস্ব পরিশোধ করা যেমন সহজ হতো, সরকারও তেমনি রাজস্ব আদায়ের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন।

১৭২৭ সালে মুর্শিদকুলী খান মৃত্যুবরণ করেন। উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুর্শিদাবাদ নিযামত শানসযন্ত্রে তিনি যে নতুন ক্ষমতা কাঠামো অভিজাত চক্র তৈরি করেছিলেন, এর অন্তর্দেশে বণিক শক্তি হিসাবে 'জগৎশেঠ'র প্রতিপত্তি তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সুজাউদ্দিনের শসানামলে (১৭২৭-১৭৩৯) এ প্রতিপত্তির সম্প্রসারাণ ঘটে। এসময় জগৎশেঠ নবাব দরবারের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতেও পরিণত হয়। নবাব সুজাউদ্দিন খান তার প্রশাসন পরিচালনা করার জন্য তিন সদস্যের একটি কাউন্সিল গঠন করেন। জগৎশেঠ ফতেহচাঁদ ছিলেন এই কাউন্সিলের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য। শুধু রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি নয়, এসময়ে জগৎশেঠ পরিবারের মহাজনী কারবারের আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। অন্যান্য ব্যবসার পাশাপাশি শেঠ পরিবারের হুন্ডি ব্যবসাও জমজমাট আকার ধারণ করে। উল্লেখ্য যে, এসময় পরিবহন সংকট ও ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মুদ্রাবহন ব্যয়বহুল ও বিপদজনক হওয়ায় ১৭২৮ সাল থেকে নবাব সরকার জগৎশেঠের ব্যাংকিং হাউজের হুন্ডি বা বিনিময় পত্রের (bill of exchange) মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ থেকে নিয়মিত দিল্লীতে বাংলার রাজস্ব প্রেরণ করতো। ইউরোপীয় কোম্পানি ও অন্যান্য বেণিয়াগণও তাদের বাণিজ্য কুঠিতে আগাম দাদন এবং সরাসরি মাল ক্রয়ের জন্য শেঠ পরিবারে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠতো। এজন্য জগৎশেঠ ব্যাংক প্রতিষ্ঠান তাদের শতকরা ২ থেকে ৮ ভাগ পর্যন্ত Discount বা বাট্টা দিতে হতো।[১৩৪]

---

[১৩৩] গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ*, পৃ. ২১৪, Salimullah, *op. cit.* p. 58

[১৩৪] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

নবাব সুজাউদ্দিন খানের উত্তরাধিকারী নবাব সরফরাজ খানের সময় ফতেহচাঁদ শুধু উপদেষ্টা পরিষদে বহালই ছিলেন না, এসময় তিনি রাজনীতি ও প্রশাসনে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হস্তক্ষেপের সুযোগ পান। আলিবর্দী খানকে মসনদ লাভে সক্রিয় সহায়তার পুরস্কার স্বরূপ তার সময়ে বাণিজ্য জগত ছাড়াও রাজনীতিতে জগৎশেঠের প্রভাব প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পায়। এসময় জগৎশেঠ পরিবার ছাড়াও দরবারে আরো কয়েকজন শেঠ-সওদাগরের প্রভাব ও তৎপরতা চোখে পড়ে। মারাঠা বর্গিদের বারংবার আক্রমণ প্রতিরোধ ও আফগান বিদ্রোহ দমনার্থে নবাব জগৎশেঠ ও অন্যান্য বণিকদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ নজরানা ও ঋণ নেন। ফলে অর্থদাতা এসব বণিকরা দরবার ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ পায়। আলিবর্দী খান অভিজাত বণিকদের অনেককেই গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে নিযুক্ত করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৩৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৭৪৩ সালে জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের মৃত্যুর পর শেঠ পরিবারের কর্তৃত্ব তাঁর পৌত্র মহাতাব চাঁদ ও স্বরূপচাঁদের উপর ন্যস্ত হয়। এদের তদারকিতে শেঠ পরিবারের ব্যবসার সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। মুঘল সম্রাট আহম্মদ শাহ মাহতাব চাঁদের জন্য 'জগৎশেঠ' উপাধি অনুমোদন করেন। নবাব দরবার থেকে স্বরূপচাঁদকে 'মহারাজা' উপাধি দেয়া হয়।[১৩৬]

বিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক সংগঠন ও নবাব দরবারের আনুকূল্যের কারণে মারাঠা হাঙ্গামা সত্ত্বেও শেঠ পরিবারের ব্যবসা-বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্যাপ্টেন ফ্যান উইকের বিবরণ এবং ওলন্দাজ কোম্পানির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আলিবর্দী খানের রাজত্বের শেষ দিকে শেঠ পরিবার ছিল বাংলার সবচেয়ে বড় মহাজনী পরিবার। এই মহাজনী পরিবারের হাতে বাংলার মুদ্রা ব্যবসায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল। এই সময় বাংলা ও বিহারের সর্বত্র ছোট বড় সররাফ বা মুদ্রা ব্যবসায়ীগণ বিভিন্ন মুদ্রা বিনিময়ে যে বাট্টা নিতো তার বিনিময় হার (exchange rate) জগৎশেঠ-এর কুঠিতে নির্ধারণ করা হতো।[১৩৭] পলাশী যুদ্ধের প্রক্কালে গোটা বাংলার খাজনার দুই তৃতীয়াংশ জগৎশেঠ-এর কুঠিতে জমা হতো এবং সরকার জগৎশেঠ কুটির উপর বরাত বা 'ড্রাফট' দিতেন বলে জানা যায়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জগৎশেঠ শুধু সরকারের সররাফ ছিলেন না, শুধু টাকশাল ও নবাব সরকারের উপর ভিত্তি করেই তাঁর বাণিজ্য পরিচালিত হতো না, বরং সাধারণ বণিক এবং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোরও তিনি মহাজন ছিলেন। শুধু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নয়, মধ্য এশিয়া থেকে আগত তুরানী বণিক, বসরা, মোখা ও জেদ্দায় রপ্তানি বাণিজ্যরত আর্মেনীয় বণিকসহ অন্যান্য বড় বড় বণিক-সওদাগররাও জগৎশেঠ-এর ঋণে ও হুন্ডিতে পণ্য সংগ্রহ করে বাণিজ্য করতো। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর কাছেও জগৎশেঠরা ছিল বড় উত্তমর্ণ।[১৩৮]

---

[১৩৫] Muhammad Mohar Ali, *The fall of Sirajuddaullah,* The Mehrub Publication, Chittagong, 1975, p

[১৩৬] রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৩

[১৩৭] ঐ, পৃ. ১৫৪

[১৩৮] For details Sushil Chaudhury, 'European Companies and Export Trade in the Eighteents Centry' in Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh: 1704-1971,* Vol.2, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka. 1992, pp. 195-98

Dhaka University Institutional Repository

নবাবী আমলে বাংলা বাণিজ্যে আর্মেনীয় বণিকদের সাফল্যও চোখে পড়ার মতো।[১৩৯] ভারতীয় বাণিজ্যে আর্মেনীয়দের উপস্থিতি দেখা যায় ষোড়শ শতকের শেষ দিকে। শুধু তাই নয়, বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যবোধের কারণে সম্রাট আকবরের সময় থেকেই আর্মেনীয়রা মুঘল রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সক্ষম হয়েছিল। মুঘল দরবারের সাথে তাঁদের ঘনিষ্টতার জন্য ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও আর্মেনীয়দের বিশেষ সমীহ করতো বলে জানা যায়। ১৬৮৮ সালে প্রভাবশালী আর্মেনীয় বণিক খোজা ফানুস কালান্দরের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন এর প্রমাণ।[১৪০] খোজা কালন্দরের ভ্রাতুস্পুত্র খোজা ইসরাইল সরহাদও এ সময় একজন প্রভাবশালী বণিক ছিলেন বলে তথ্য সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সতেরো শতকের শেষ নাগাদ তিনি ইংরেজদে অনুরোধে দিল্লী থেকে হুগলিতে এসে বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে আর্মেনীয়দের বসতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে সাঈদাবাদে আর্মেনিয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। খ্রিস্টান ধর্মমতে বিশ্বাসী আর্মেনীয় বণিকরা সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব অর্জন করে। ১৬৯৭ সালের জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসের ইংরেজ কোম্পানির 'Chutanutte Dairy and Consultations' থেকে জানা যায় যে, শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় ইংরেজ কোম্পানির অনুরোধে খোজা ইসরাইল ইংরেজদের কাছে সুতানটি, কলকাতা এবং গোবিন্দপুর নামক তিনটি গ্রাম বিক্রি করতে বাংলার সুবাদার আজিম-উস-শানকে রাজি করান। সম্রাট ফররুখসিয়ারের সাথেও তাঁর বিশেষ সখ্যতা ছিল। ১৭১৫ সালে ইংরেজদের 'শুরম্যান মিশনের' (Shurman Mission) সাথে খোজা ইসরাইলকে দিল্লী দরবারে যেতে দেখা যায়।[১৪১] সম্রাট ফররুখসিয়ারের কাছ থেকে ১৭১৭ সালে ইংরেজদের ফরমান লাভে খোজা ইসরাইল সরহদের বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে ধারণা করা হয়। বর্ণিত এসব তথ্য প্রমাণ সমকালীন বঙ্গ-ভারতে আর্মেনীয়দের বিশেষ প্রভাবেরই প্রমাণবহ। নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় খোজা সরহদ ছাড়াও খোজা দৈলান, খোজা আবিদ এবং খোজা আরাতুন পেট্রাস প্রমুখ আর্মেনীয় বণিকদের বিশেষ তৎপরতার কথা জানা যায়। শুধু বাংলা বা ভারতে নয় এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথেও তাদের বাণিজ্য ছিল বলে সূত্রে উল্লেখ।[১৪২] তাদের হাতে এত পরিমাণ পুঁজি ছিল যে তারা পণ্য সংগ্রহে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারতেন। তবে ধনসম্পদ, পদমর্যাদা ও নবাব দরবারের প্রভাব প্রতিপত্তিতে আর্মেনীয়দের মধ্যে সবচেয়ে যিনি খ্যাতিমান বণিক ছিলেন তাঁর নাম খোজা ওয়াজিদ। ঐতিহাসিক রবার্ট

---

[১৩৯] ভারতে আর্মেনীয় বণিকদের আগমন ও বাংলা বাণিজ্যে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে Mesrovb J. Seth, *History of the Armenians in India* ,একই লেখকের ' Armenians and the East India Company' in *Bengal Past & Present,* May 1926, pp. 99-112 এবং Sushil Chaudhury, 'Trading Networks in Traditional Diaspora-Armenians in India, C. 1600-1800',available at http://gpmsdbaweb.com/memoir2/_supportdocs/armenians%20in%20Bengal.pdf প্রবন্ধে।

[১৪০] চুক্তি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Mesrovb J. Seth, ' Armenians and the East India Company' in *Bengal Past & Present,* May 1926, pp. 105-107

[১৪১] Mesrovb J. Seth, 'Khojah Petrus: The Armenian Merchant-Diplomat in Calcutta' in *Bengal Past & Present,* May, 1927, pp. 111-112

[১৪২] Sukumar Battacharya, *East India Company and the Economy of Bengal, 1704-1740.* Luzac, London, 1954, pp.163-164

Dhaka University Institutional Repository

ওর্মের বর্ণনায় তাঁকে 'The Principal Merchant of the Province' এবং ইংরেজ কোম্পানির ওয়াটর্স ও কলেটের লেখায় একজন বড় ব্যবসায়ী ও নবাব দরবারে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মশিয়ে জ্যাঁ ল ও তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[১৪৩] খোজা ওয়জিদের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র ছিল হুগলিতে। তবে পাটনা, চন্দননগর, চাঁচুড়া ও সুরাত বন্দরেও তাঁর বাণিজ্যকুঠি ছিল। পাটনার বিখ্যাত সোরা বণিক কাশ্মিরী মুসলমান শেখ আফজাল ও তার পুত্র শেখ আশরফের সাথে তার ব্যবসায়িক ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। চন্দননগর কুঠি থেকে তিনি ফরাসি এবং চাঁচুড়া থেকে ওলন্দাজদের সাথে বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। সুরাত কুঠি থেকে তাঁর গোমস্তরা পারস্যোপসাগর ও লোহিত সাগর অঞ্চলে ব্যবসা পরিচালনা করতেন বলে জানা যায়।

সমসাময়িক ও পরবর্তী সকল সূত্র মতে, নবাব আলিবর্দী খানের আমলেই খোজা ওয়াজিদের ব্যবসার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সূক্ষ্ম কূটনীতি ও নবাব আলিবর্দী খানকে প্রয়োজন মতো আর্থিক সহায়তা দিয়ে খোজা ওয়াজিদ মুর্শিদাবাদ দরবারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন বলে সমসাময়িক ফারসি ঐতিহাসিক সূত্র এবং ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি কর্মকর্তাদের বিবরণী থেকে জানা যায়।[১৪৪] দরবারের সাথে এ ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে খোজা ওয়াজিদ বাংলায় সোরা ও লবণ এবং বিহারে আফিম ব্যবসার উপর একচেটিয়া অধিকার কব্জা করে নিয়েছিলেন। শুধু বাংলার অন্তর্বাণিজ্য নয়, সমুদ্র বাণিজ্যেও সমকালে খোজা ওয়াজিদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের রেকডর্স থেকে জানা যায় যে, ওয়াজিদের মালিকানাধীন অন্তত ছয়টি জাহাজ জেদ্দা, মোখা, বসরা, সুরাট ও মসলিপট্টমের সমুদ্রবাণিজ্যে তৎপর ছিল।[১৪৫] আর্থিক প্রতিপত্তি ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কারণে তাঁকে নবাব দরবার থেকে 'ফখর-উৎ-তুজ্জার' (Pride of the Merchant) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল। নবাব দরবারে খোজা ওয়াজিদের প্রভাব ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর দৃষ্টি এড়ায় নি। অনেকে তাঁকে দরবারের ওমরাহ বলে মনে করতেন। তাই ব্যবসায়িক স্বার্থে দরবারের আনুকূল্য অর্জনের আশায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো খোজা ওয়াজিদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে সচেষ্ট হয়। ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানির সাথে তাঁর বাণিজ্য সম্পর্ক থাকলেও ফরাসী কোম্পোনির সাথেই ছিল তাঁর মূল লেনদেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর রাজত্বকালেও দরবারে তার সম্মান ও প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে। সিরাজের প্রথম দিককার সন্ধি বিগ্রহের বিবরণ এবং ১৭৫৬ সালের পর খোজাকে লেখা তার চিঠি-পত্রাদি উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন দেয়।

রাজনীতিতে এবং কূটনীতিতে এই সময় আরেকজন বণিকের কথা জানা যায়, তিনি হলেন আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত খোজা পেত্রস। তার ভাল নাম পেত্রস আরাতুন। তিনি কখন বাংলায় আসেন এবং কিসের ব্যবসা করতেন তা সঠিকভাবে জানা না

---

[১৪৩] রজতকান্ত রায়, *পুর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০; S.C. Hil, Bengal in 1756-57. Vo. III p. 190

[১৪৪] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭; ওলন্দাজ কোম্পানির প্রধান হাউখেনস আঠারো শতকের পঞ্চাশের দশকের শুরুতে তাঁর স্মৃতিকথায় নবাব আলিবর্দী খানের দরবারে খোজা ওয়াজিদের প্রবল প্রতিপত্তি ও সম্মানের কথা বলেছেনে। তাঁর উত্তরসূরি ইয়ান কারসেবুমের লেখা থেকেও একই রকম তথ্য পাওয়া যায়। ইংরেজ কোম্পানির নথি পত্রেও নবাব সরকারের সাথে খোজা ওয়াজিদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এমনকি ওয়াজিদের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে কোম্পানি তাঁকে নবাব সরকারের কর্মকর্তা কীনা সে বিষয়ে তাদের সংশয়ের কথা প্রকাশ করেছে। সুশীল চৌধুরী, *পলাশির অজানা কাহিনী*, পৃ.পৃ. ১২৯-১৩০; kumkum Chatterjee: *op. cit.*, pp.71-72

[১৪৫] Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1957*,p. 134

Dhaka University Institutional Repository

গেলেও নবাব দরবারে যে তাঁর বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তা সন্দেহাতীত। রবার্ট ক্লাইভ কর্তৃক কলিকাতা পুনর্দখল হলে নবাব সিরাজ তাকে ইংরেজদের কাছে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন।[১৪৬] প্রসঙ্গত আরেকজন আর্মেনীয় বণিক খোজা ম্যানুয়েলের নাম উল্লেখ করতে হয়। সমকালীন বাংলার অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তিনিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন বলে জানা যায়। ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর সমৃদ্ধি ঘটেছিল নবাব আলিবর্দী খানের আমলে এবং নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময়ও তা অক্ষুণ্ন ছিল বলে সূত্রে প্রকাশ।[১৪৭]

নবাব সরকার যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং দরবার ও রাজনীতিতে প্রধান্য প্রতিষ্ঠাকারী আরেকজন অভিজাত বণিক ছিলেন আমীরচাঁদ। যিনি উমিচাঁদ নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী এবং নানকপন্থি শিখ ধর্মের অনুসারী। ভাই দীপচাঁদসহ তিনি আগ্রা থেকে পাটনা এবং সেখান থেকে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় তিনি বস্ত্র ব্যবসা শুরু করেন বড়ো বাজারের বিখ্যাত দাদনী বণিক বৈষ্ণবদাস ও তাঁর ভাই মানিকচাঁদের প্রতিনিধিরূপে। আলিবর্দী খানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ব্যবসায় উন্নতি লাভ করেন এবং ক্রমে একজন প্রধান সওদাগর ও দাদনী বণিকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। রবার্ট ওর্মের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বাংলা বিহারের সর্বত্র তার বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল এবং মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের প্রধান প্রধান অমাত্য-রাজ পুরুষদের দান ও উপকার সাধন করে তিনি এত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন যে, বিপদের সময় নবাবের সাথে মধ্যস্থতা করার জন্য ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতা প্রেসিডেন্সি তাঁর দ্বারস্থ হতো।[১৪৮] ১৭৪১ সালে তাঁকে পাটনার টাকশাল ইজারা ও ১৭৫৪ সালে নবাবের দিউয়ান নিযুক্ত এবং 'রায় রায়ান' উপাধি দেয়া হয়। আলিবর্দী খানের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদে আমীরচাঁদ সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে রাজবল্লভের সাথে যুক্ত থাকলেও পলাশীর পূর্ব পর্যন্ত দরবারে তাঁর মর্যাদা ও প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল।

উপরের আলোচনায় বাংলার নবাব সরকার যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে অভিজাত বণিকদের উত্থান, পর্যালোচনাধীন সময়ের কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী অভিজাত বণিকের বিষয়ে আলোকপাত করা হলো। বস্তুত আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বিরাজমান অনুকূল বাণিজ্যিক পরিবেশে এদের অভ্যুদয় ঘটে। নবাব দরবারের আনুকূল্য ছাড়াও বাংলার ক্রমবিকাশমান বৈদেশিক বাণিজ্য পুঁজির ছত্রছায়া এই নতুন পুঁজিপতি বণিক সমাজের সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এই বণিক সম্প্রদায়ের উপরিস্থিত সররাফ, শেঠ-সাহুকর, ব্যাংকার-মহাজনদের নিয়ে গড়ে ওঠেছিল নবাবী বাংলার অভিজাত বণিক শ্রেণী। উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে নবাবী বাংলার এ অভিজাত বণিকরা আঠারো শতকের গোড়া থেকেই নবাবী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্তর্দেশ পর্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এদের মধ্যে কতিপয় বণিক দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা, ব্যাংকিং ও রাজস্ব ব্যবস্থার উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপেও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে রাজনীতির নিয়ামক শক্তি হিসাবে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। এদের কেউ কেউ শাসক সৃষ্টির

[১৪৬] পেট্রাস আরাতুন বিস্তারিত দ্রষ্টব্য Mesrovb J. Seth, 'Khojah Petrus: The Armenian Merchant-Diplomat in Calcutta' in *Bengal Past & Present*, May, 1927, pp. 110-126

[১৪৭] এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩১

[১৪৮] Robert Orme, *op.cit.* pp. 50-51

ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়। আলোচ্য যুগে বাংলার সবকয়টি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তাদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে ভূ-অভিজাত শ্রেণীর মতো নবাবী বাংলার বণিক অভিজাত শ্রেণীতেও উল্লেখ করার মতো কোনো মুসলিম বণিকের নাম পাওয়া যায় না। বস্তুত এদের বেশিরভাগই ছিল হিন্দু-জৈন-শিখ এবং খ্রিষ্টান। এদের মধ্যে স্থানীয় বাঙ্গালির উপস্থিতিও নেই বলে চলে। মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি অনীহা এবং সামরিক চাকরি ও উচ্চরাজপদ লাভে তাদের আগ্রহকে বণিক অভিজাত শ্রেণীতে হিন্দু প্রাধান্যের কারণ বলে মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে নবাবদের উদারতা ও হিন্দুদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতাকেও বাণিজ্য জগতে অমুসলিম বিশেষ করে হিন্দু প্রাধান্যের কারণ বলে পরিগণিত হয়। তবে কারণ যাই হোক না কেন, এ কথা সত্য যে নবাবী যুগে হিন্দুরা ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং বিপুল বিত্ত-বৈভবের জোরে তারা একটি সমৃদ্ধ অভিজাত সামাজিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কালক্রমে নবাব দরবারেও তারা অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।[১৪৯]

৫.৩ অভিজাত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ও বিবিধ প্রসঙ্গ

আলোচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত তথ্য-প্রমাণাদি পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ শেষে বলা যায় যে, নবাব সরকার যুগে বাংলায় নতুন পরিস্থিতি ও নবতর বাস্তবতায় সমাজিক শক্তি হিসেবে অভিজাত শ্রেণীর গঠন শৈলী ও বৈশিষ্ট্যে কিছু পরিবর্তন ও নতুনত্বের সন্ধান মিলে। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র ও সমাজকাঠামোতে নবাবের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এসময় যথাবিহিত বহাল ছিল। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেশের অভিজাত শ্রেণী শাসকের সহযোগী সামাজিকশক্তি হিসেবে কাজ করে। নবাবী বাংলায়ও আমরা এরূপ একটি অভিজাত শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখতে পাই। সুবাদারি যুগের মতো সামরিক-বেসামরিক পদস্থ রাজকর্মকর্তা ও সেনাধ্যক্ষরা ছিল এই অভিজাত শ্রেণীর প্রধান অঙ্গশক্তি। সুবাদারি ঐতিহ্য অনুযায়ী অভিজাত শ্রেণীতে ভূ-স্বামী রাজা-জমিদারদের অবস্থানও পূর্বাপর অক্ষুণ্ন থাকে। তবে এতে বণিক-ব্যবসায়ী ও মহাজনদের ঠাঁই করে নেয়া নতুনত্বের প্রমাণ। এটি ভারতীয় বিশেষ করে মুঘল ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এছাড়াও আরো কিছু নতুনত্ব লক্ষ করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুবাদারি যুগে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে নিরঙ্কুশ মুসলিম প্রাধান্য ছিল। চূড়ান্তরূপে এ আভিজাত্যে বহিরাগত ইরানী, তুরানী, আফগান, আরব এবং ভারতীয় মুসলমানদের উপস্থিতি ছিল সুস্পষ্ট। তবে এতে স্থানীয় বাঙ্গালি মুসলমানের কোন স্থান ছিল না। নবাবী বাংলার অমাত্য অভিজাত শ্রেণীর সাংগঠনিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ সময় অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে মুসলিম প্রাধান্য থাকলেও তা সবসময় নিরঙ্কুশ ছিল না। এ সময় মুসলমানদের মধ্যে যারা নিয়োগ পান সুবাদারি যুগের ন্যায় এরাও ছিলেন বহিরাগত এবং পারসিক (ইরানী), আফগান, আরব ও উত্তর ভারতীয় জাতিসত্ত্বার প্রতিনিধি। নবাবী যুগেও স্থানীয় বাঙ্গালি মুসলমানদের অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। তবে নবাবী যুগের একটি নতুনত্ব হলো অমাত্য শ্রেণীতে হিন্দুদের নিয়োগ লাভ-সুবাদারি যুগে যা ছিল প্রায় অকল্পনীয়। হিন্দু অমাত্য নিয়োগে তত্ত্বগতভাবে প্রদেশগত কোন বাধা না থাকলেও নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে বাঙ্গালিদের

[১৪৯] এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১৩০-১৩১

একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। তবে এক্ষেত্রেও যেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাহলো, এসব হিন্দু অমাত্য অভিজাত ছিলেন মুখ্যত উচ্চবর্ণের। এ সময় অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে কোন মুসলমান আতরাফের নিয়োগ পাওয়া যেমন দুরূহ ছিল, তেমনি নিম্নবর্ণের হিন্দুরও। অবশ্য এর কারণও অস্পষ্ট নয়। বস্তুত নবাবী বাংলার অমাত্য অভিজাত্যের মানদণ্ডে মেধা ও যোগ্যতা অপেক্ষা আত্নীয়তার সম্পর্ক এবং শাসকগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্ব পায়। এ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে না পরায় নিম্ন শ্রেণীর লোকদের পক্ষে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া উচ্চপদে চাকরি লাভের নুন্যতম প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা অর্জন নিম্নবর্ণের লোকদের বাস্তব কারণেই সম্ভব হতো না।

শুধু অভিজাত অমাত্যদের ক্ষেত্রে নয় নবাব সরকার যুগে অভিজাত শ্রেণীর অপর দুটি গোষ্ঠী ভূ-স্বামী জমিদার ও বণিক-মহানজনদের মধ্যেও নিরঙ্কুশ হিন্দু প্রধান্য লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশ লাইব্রেরীর ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডে ওরম সংগ্রহের (Orme Collection) এর তালিকায় প্রাক-পলাশী বাংলার অভিজাত অমাত্য ও রাজা-জমিদারদের যে তালিকা রয়েছে তাতে দেখা যায় যে, আলিবর্দী খানের রাজত্বকালের শেষদিকে প্রশাসনের শীর্ষ অমাত্যদের (অভিজাত শ্রেণীভুক্ত) সাত জন কর্মকর্তার মধ্যে ছয়জন ছিলেন হিন্দু। একমাত্র মুসলিম ছিলেন মীর বখশি মীর জাফর আলী খান। একই সময়ে বাংলার বাংলার ভূ-অভিজাত ঊনিশ জন জমিদারের মধ্যে আঠারো জনই ছিলেন হিন্দু। বড় জমিদারদের মধ্যে একমাত্র বীরভূমের জমিদাররা ছিলেন মুসলিম। ওলন্দাজ কোম্পানির ইয়ান কারর্সবুমের ডায়রিতেও হিন্দু প্রধান্যের বিষয়ে প্রায় একই রকমের তথ্য পাওয়া যায়।[১৫০]

অভিজাত বণিকদের মধ্যেও বঙ্গ-ভারতীয় বা বর্হিভারতীয় মুসলমানদের যে ঠাঁই হয়নি এ তথ্য উপরের আলোচনায় দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, নবাব সরকার যুগের প্রশাসনযন্ত্রের সর্বত্র বঙ্গীয়করণে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হলেও এ যুগের অভিজাত বণিক শ্রেণীতে স্থানীয় বাঙ্গালিদের উপস্থিতি নজরে পড়ে না। অভিজাত বণিকদের প্রায় সকলেই ছিলেন অবাঙ্গালী- উত্তর ভারতীয় মাড়ওয়ারী, গুজরাটি, পাঞ্জাবি ও আর্মেনীয় এবং এদের মধ্যে হিন্দু প্রধান্য ছিল সুস্পষ্ট। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত বণিকদের বাণিজ্য পণ্যবাহী এবং ইংরেজদের কলিকাতা কাউন্সিলের ছাড়পত্র প্রাপ্ত ৩৩ টি জাহাজের (যেগুলো বাংলা থেকে এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে গিয়েছিল) মধ্যে ঊনিশটির মালিক ছিল মুসলমান।[১৫১] অবশ্য এসব জাহাজ মালিক মুসলমান বণিকদের বিস্তারিত কোনো পরিচয় জানা যায় না। ইংরেজ কোম্পানির নথিতে তাদের 'মুর' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুর দ্বারা পারস্যদেশীয় বা আরব মুসলমান বণিকদের নির্দেশ করা হয়েছিল কী-না তা নিশ্চিত করে বলার মতো তথ্য প্রমাণ নেই। যদিও তাদের হোসেন জাতীয় নাম থেকে আরব-পারস্যদেশীয় বণিক বলে কিছুটা অনুমান করা যায়। স্পষ্ট করে না বললেও আবদুল করিম এ রকমটাই ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে হয়।[১৫২] তবে এসব মুসলিম বণিক ব্যবসায়ীরা যে বাংলায় স্থায়ীভাবে বাস করতেন না সমকালীন

---

[১৫০] Orme Mss., India, VI, ff. 1500-2; Jan Kerseboom's 'Memoire', 14 Feb. 1755, VOC 2849, ff, 125-126 উদ্ধৃতি; sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757*, UPL, Dhaka, 2000, p. 64

[১৫১] আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলি খান ও তাঁর যুগ*, পৃপৃ.২২৬-২২৮

[১৫২] ঐ, পৃ. ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ কোম্পানির নথি থেকে জানা যায়।[১৫৩] আর এজন্যই তাদের নবাবী বাংলার বণিক অভিজাত শ্রেণীভুক্ত বলে বিবেচনায়ও আনা হয়নি। কেউ কেউ মনে করেন বাংলার বাণিজ্য জগতে ইউরোপীয় বিশেষ করে, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব বিস্তারকালে তাদের ঘিরে বাংলায় একটি হিন্দু বণিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এরা কোম্পানির সাথে বাণিজ্য ও ব্যাংকিং ব্যবসা করে প্রচুর বিত্তের মালিক হয় এবং বিপুল বিত্ত বৈভবের সুবাদে সমাজকাঠামোতে অভিজাত শ্রেণী হিসেবে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করে নেয়।[১৫৪]

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্মের পার্থক্য উপেক্ষা এবং অভিজাত শ্রেণীর অন্য দুটি গোষ্ঠীতে অমুসলিম হিন্দু ও অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের বিষয়টিকে অনেকেই বাংলার নবাবদের অনুসৃত পরমত সহিষ্ণুতার উচ্চ রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করেন। এ বক্তব্য স্বীকার করে নিলেও তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক বাস্তবতার বিষয়টি মনে রাখতে হবে। বস্তত সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নতুন নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার ফলে ঐসব অঞ্চল থেকে বাংলায় সরকারি কর্মচারীদের আগমন প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন কারণে পারস্য, পশ্চিম এশিয়া ও আফগানিস্তান থেকে বিদেশিদের আগমনও লক্ষণীয় মাত্রায় কমে যায়। এর ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল; তাতে নবাবী শাসন কাঠামোর মধ্যে স্থানীয় আঞ্চলিক শক্তিকে জায়গা করে দিতে হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় হিন্দুদের নিয়োগ দানই ছিল সবদিক বিবেচনায় নবাবদের জন্য নিরাপদ। সলিমুল্লাহর মতে, হিন্দুরা ছিল ভীতু ও নিরীহ। এদের দিক থেকে নবাবী কর্তৃত্বের উপর আঘাত হানার সম্ভাবনা ছিল কম। তদুপরি এ নীতির মাধ্যমে সকল শ্রেণীর সহযোগিতা নিশ্চিত করার আকাঙ্ক্ষাও ছিল। নবাবদের এ আশার বাস্তবায়ন কতটুকু হয়েছিল সেটি তর্ক সাপেক্ষ। তবে এ কথা সত্য যে, এ নীতির ফলে সুবাদারি যুগে বাধাগ্রস্ত বঙ্গীয় জাতিসত্ত্বার বিকাশক্রম পুনরায় গতিবেগ লাভ করে। ভু-স্বামী জমিদার শ্রেণীতে হিন্দু প্রাধান্য নবাবদের নীতির ফল হিসেবে বিবেচনার অবকাশ নেই। কেননা নবাবী যুগে ভূ-স্বামী জমিদার হিসেবে যাদের দেখা যাচ্ছে, তাদের বেশির ভাগই ছিলেন পুরণো বনেদি জমিদার পরিবারের বংশানুক্রমিক প্রতিনিধি। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ তাদের সাথে বন্দোবস্ত নবায়ন করে তাদের রাষ্ট্রশক্তির বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন মাত্র। বাংলার বাণিজ্য জগতে মুসলমানদের সংশ্লিষ্টতা বরাবরই কম। অনেকে মনে করেন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মুসলমানদের অনীহা ছিল। উচ্চ রাজপদে চাকরি বিশেষ করে সামরিক বাহিনীতে কাজ করার বিষয়টি ছিল তাদের জন্য প্রধান আকর্ষণ। তবে এ কথাও সত্য যে, মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যমুখী করার ব্যাপারে রাষ্ট্রযন্ত্রের কোনো উদ্যোগ বা পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল না। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, নবাবী যুগে অভিজাত বণিক হিসেবে যারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তাদের এ প্রতিষ্ঠার পিছনে রাজদরবারের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য ছিল। নবাবদের উদার উৎসাহ ও আনুকূল্য দানের ফলে বহু হিন্দু ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয় এবং বিত্ত-বৈভবের জোরে নবাবী বাংলার রাজনীতি ও

---

[১৫৩] The Dairy and Consultations of the English Council in Calcutta, 2 May, 1720

[১৫৪] কে এম করিম, 'নবাবি আমলে সমাজকাঠামো', *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক জীবনে প্রভাবশালী অভিজাতরূপে আবির্ভূত হন।[১৫৫] স্বজাতি মুসলিমরা কেন এ ধরণের পৃষ্ঠপোষকতা পেলেন না, এ প্রশ্নের সহজ মীমাংসা করার মতো তথ্য উপাত্ত মিলে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অভিজাত শ্রেণী ছিল নবাবের সহযোগী শক্তি। তারা যেমন নবাবের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত, তেমনি রাজ্যের-ভাগ্যের সঙ্গেও বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। জনসমক্ষে রাষ্ট্রের এ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গশক্তির সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মুর্শিদাবাদের নবাবগণ সম্রাটের কাছ থেকে বিভিন্ন জমকালো উপাধির ব্যবস্থা করতেন। নবাবের সুপারিশক্রমে সম্রাটগণ অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে যেসব উপাধি প্রদান করেছিলেন, তন্মধ্যে 'সুজাউল-মুলক', 'হাশাম-উদ-দৌলা', 'মহাবত জঙ্গ', 'শাহামতজঙ্গ', 'সওলত জঙ্গ', 'হায়বত জঙ্গ', 'হায়দর জঙ্গ', 'রুস্তম জঙ', 'সাবিত জঙ্গ', 'শওকত জঙ্গ', 'বাবুর জঙ্গ', 'মুবারক-উদ- দৌলা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব উপাধি ছিল অমাত্য অভিজাতদের এবং উপধিগুলোর মধ্যে একটা সমরদ্যোতনা রয়েছে। এটি অমাত্য অভিজাত শ্রেণীর সামরিক চরিত্রেরও ইঙ্গিতবহন করে। ভূ-স্বামী জমিদার অভিজাতদের সাধারণত 'রাজা', 'মহারাজা' উপাধি দেয়া হতো। নদীয়ার জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে 'ধর্মমঙ্গল' উপাধি দেয়া হয়েছিল। বণিক অভিজাত মানিক চাঁদকে 'নগরশেঠ', ফতেহচাঁদ ও মহতাব চাঁদকে 'জগৎশেঠ' এবং খোজা ওয়াজিদকে 'ফখর-উৎ-তোজার' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল। এসব উপাধি ছাড়াও নবাব এবং তাঁর মনোনীত অভিজাতদের মুঘল বাদশাহী দরবার থেকে 'নহবত' বা রাজকীয় বাধ্য বাজানোর অধিকার দেয়া হতো। *মোজাফ্ফরনামার* তথ্য মতে, আলিবর্দী খানের সময় মুর্শিদাবাদের বারোজন ব্যক্তির সকাল-সন্ধ্যা নহবত বাজানোর অধিকার ছিল।[১৫৬] নবাবগণ ছাড়াও অভিজাতদের কাউকে কাউকে রাজকীয় পতাকা বহনের অধিকারও দেয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। বস্তুত এসব উপাধি, খিলাত, নহবত ও পতাকা বহনের অধিকারের কেবল রাজনৈতিক নয়, সামাজিক গুরুত্বও ছিল। এগুলো জনসাধারণের কাছে সংশ্লিষ্ট অভিজাত ব্যক্তিবর্গের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতো।

পরিশেষে নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন। সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকারান্তরে এটি ছিল একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী। পদস্থ অমাত্য, জমিদারবর্গ, বণিক-ব্যবসায়ীদের নিয়ে গড়ে ওঠা অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী চেতনাবোধ কোনো সময় বিশেষভাবে কাজ করেছে বলে প্রতীয়মান হয় না। ফলে নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর কোনো শক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে ওঠেনি। বস্তুত নবাবের সাথে অভিজাত শ্রেণীর সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পর্ক-যা কখনো শ্রেণীভিত্তিক সম্পর্কে উন্নীত হয়নি। নবাব তাদের প্রশাসনিক, সামরিক বা অন্যবিধ সহায়তার বিনিময়ে তাদের আর্থিক বা অন্যকোনো ধরনের সুবিধা দিলে তারাও নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতেন। কিন্তু নবাব কর্তৃক তাদের স্বার্থ বিপন্ন হলে বা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তাঁরা নবাবের পিছন থেকে সরে দাঁড়াতেন, বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করতেন এমনকি নবাবকে সরিয়ে দিয়ে তাদের স্বার্থানুকূল অন্য আরেকজনকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বুনতেন। বস্তুত এ

---

[১৫৫] এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩১

[১৫৬] করম আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

সময়কার অভিজাতদের মধ্যে একটি সাধারণ চরিত্র দেখা যায়, তা হলো ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির বাসনা। জাতীয়তাবোধ, দেশাত্ববোধ বা রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ এ ধরণের কোন আদর্শ তৎকালীন অভিজাতদের মধ্যে দেখা যায় না। অবশ্য সমকালীন বিশ্ব ইতিহাসের দিকে নজর রাখলে প্রাক-ধনবাদী ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক নবাবী বাংলার অমাত্য অভিজাতদের এ বৈশিষ্ট্য অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তবে যেটি লক্ষ করার বিষয়, তা হলো অভিজাতদের ব্যক্তিস্বার্থ চেতনাবোধ। নবাবী বাংলার সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির অন্যতম নিয়ামক শক্তি হওয়া সত্ত্বেও প্রবল ব্যক্তিস্বার্থ চেতনার কারণে তারা সামাজিক শ্রেণী হিসেবে কোন দীর্ঘস্থায়ী সুসংগঠিত শক্তি বলয় গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। স্বার্থানুসন্ধানী ও ঐশ্বর্য লিপ্সু অভিজাতদের ব্যক্তি স্বার্থ চেতনা, উচ্চাভিলাস ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নবাবী রাষ্ট্রকে দ্রুত পতনের পথে নিয়ে যায়। মারাঠাদের উপর্যুপরি আক্রমণ ও ইউরোপের অগ্রগামী শক্তি ইংরেজদের বাণিজ্য মৃগয়ার ছত্রচ্ছায়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে নবাবী রাষ্ট্র যখন চরম দুর্দশাগ্রস্ত তখন অমাত্য অভিজাত শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। তারা যুগ বাস্তবতার নিরিখে নতুন নীতি অনুসরণ করে রাষ্ট্র শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করে তোলার পরিবর্তে নিজেরাই তাঁর অবলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নবাবী আমলের প্রতিটি রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং রাষ্ট্র বিপ্লবে অমাত্য অভিজাতদের ভূমিকা বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে উপরোক্ত সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবাবী বাংলার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিকাশধারা এবং অভিজাত শ্রেণী

মুঘল শাসনের স্বর্ণযুগ এবং পতনের যুগের সন্ধিক্ষণে বাংলায় নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুবা বাংলার প্রশাসনে প্রথমে দিউয়ান এবং পরবর্তীতে সুবাদার বা নাযিম পদে মুর্শিদকুলি খানের নিযুক্তিতে বাংলার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এ যুগে বাংলার সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাতে স্পষ্টত কিছু নতুন ধারা সংযোজিত হয়। উল্লেখ্য যে, আইনত বাংলা মুঘল সম্রাটের সার্বভৌমত্বাধীনে থাকায় নবাবী যুগে বাংলার প্রশাসনিক কাঠামোতে মুঘল প্রাদেশিক শাসন রীতির অনুসরণ ছিল সুস্পষ্ট। তবে নবাবী যুগে বাংলায় উদ্ভুত নবতর পরিস্থিতিতে এখানকার সামগ্রিক প্রশাসনিক কাঠামো ও রাজনৈতিক গতিধারায় কিছু পরিবর্তন ও অভিনব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নবাবী বাংলায় ক্রমবিকাশমান এ প্রশাসনিক কাঠামো ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং এতে সমকালীন অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা বিচার-বিশ্লেষণ আলোচ্য অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুঘল প্রাদেশিক শাসনকাঠামোতে নাজিম বা সুবাদার ছিলেন সর্বোচ্চ পদমর্যাদার প্রশাসনিক কর্মকর্তা। স্বয়ং সম্রাট কর্তৃক সুবাদার নিযুক্ত হতেন এবং প্রশাসন পরিচালনায় তাঁর কর্তব্য কাজের ব্যাপারে সম্রাটকেই জবাবদিহি করতে হতো। মুর্শিদকুলি খান ছিলেন মুঘল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার শেষ নাজিম-সুবাদার। মুর্শিদকুলী খানের উত্তরসূরি নাজিম বা নবাবগণ হয় উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বাংলার মসনদে সমাসীন হয়েছেন।[১] তবে নবাবী যুগে বাংলা কার্যত স্বাধীন হলেও এর উপর মঘুল সম্রাটের আইনত সার্বভৌমত্ব বজায় থাকায় ক্ষমতায় আরোহণের পর নবাবদের কেন্দ্রীয় মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে একটি স্বীকৃতি সনদ লাভের বাধ্যবাধকতা ছিল। সনদ গ্রহণের এ রীতি ছিল বাংলার প্রশাসনে একটি অভিনব সংযোজন। দিল্লী সালতানাতের প্রথমিক যুগে ভারতের সুলতানদের মধ্যে কেউ কেউ আব্বাসীয় খলিফাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি সনদ আদায় করেছিলেন। তবে বাংলার স্বাধীন সালতান যুগে দিল্লী থেকে স্বীকৃতি সনদ লাভের দৃষ্টান্ত নেই। তবে কার্যত স্বাধীন হলেও নবাবদের এ সনদ আদায়ের পিছনে তাদের ক্ষমতা বৈধ ও আইনসিদ্ধ হওয়ার প্রশ্ন জড়িত ছিল। সিংহাসনকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতার এ যুগে নবাবগণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান শক্ত করার মানসে মুঘল সমাটের কাছ থেকে সনদ সংগ্রহে ব্যাতিব্যস্ত থাকতেন। সনদ প্রাপ্তির জন্য শুধু সম্রাটকে উচ্চ নজরানা নয়, সম্রাট দরবারের প্রভাবশালী অমাত্যদেরও উপহার উপঢৌকন দিতে হতো। সম্রাটের কাছ থেকে স্বীকৃতি সনদ লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্তও রয়েছে। প্রসঙ্গত সুজাউদ্দিন খান ও তাঁর পুত্র সরফরাজ খান এবং সিরাজ-উদ-দৌলাহ ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পুর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকতজঙের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এসব প্রতিযোগিতায়

---

[১] বলপ্রয়োগের মাধ্যম ক্ষমতাদখলকারীদের মধ্যে ছিলেন নবাব সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭-১৭৩৯খ্রি.) এবং নবাব আলিবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.)। আন্যদিকে উত্তারাধিকারসূত্রে মসনদে সমাসীন হওয়াদের মধ্যে ছিলেন নবাব সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০ খ্রি.) এবং নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ (১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রি.)

রাষ্ট্রের প্রভাশালী অভিজাতবর্গও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে নিজ নিজ প্রভুর পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতো। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জের মুর্শিদাবাদের রাজনীতিকে দ্বন্দ্ব মুখর করে রাখতো। মুর্শিদকুলি খানের নিয়োগের মধ্য দিয়ে শুধু নাজিম বা সুবাদার নিয়োগ নয়, কেন্দ্র থেকে অভিজাত অমাত্য পর্যায়ে গণ্য প্রশাসনের সকল সামরিক, বেসামরিক ও রাজস্ব বিভাগীয় পদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করে পাঠানোও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দিল্লীর সাথে বাংলার সম্পর্ক বার্ষিক রাজস্ব প্রেরণের আনুষ্ঠানিকতা ও নামকাওয়াস্তে আনুগত্য প্রকাশের পর্যায়ে সীমিত হয়ে পড়ে এবং বাংলার গোটা শাসন ব্যবস্থাই মুর্শিদকুলি খান এবং পরবর্তীতে তাঁর উত্তরসূরী নবাবদের হাতে কেন্দ্রীভুত হয়।

৬.১ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিকাশ ধারায় অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা: নবাব মুর্শিদকুলি খানের শাসনামল

পূনশ্চ উল্লেখ্য যে, মুঘল সাম্রাজ্যের এক যুগ সন্ধিক্ষণে বাংলার রাজনীতিতে মুর্শিদকুলি খানের উত্থান। পরাক্রমশালী সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (মৃ.১৭০৭ খ্রি.) পর মুঘল কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে সংঘটিত কয়েকটি উত্তরাধিকার যুদ্ধ এবং এতে সাম্রাজ্যের অমাত্য অভিজাতদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, তাদের স্বার্থান্বেষী তৎপরতা ও সাম্রাজ্যের সংহতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ঘটনা তিনি অবলোকন করেছিলেন। বিশাল এবং প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল সাম্রাজ্য কীভাবে অবক্ষয় ও পতনের পথে ধাবিত হচ্ছিল, তাও তিনি উপলব্ধি করেন। প্রাদেশিক সরকারগুলোর উপর মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ কীভাবে ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে, সেটিও তিনি যথার্থভাবেই অনুধাবন করেন। ফলে তিনি এমন একটি প্রশাসনযন্ত্র গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন, যার অমাত্য শ্রেণী নবাবকে একমাত্র অধিকর্তা হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান ও অনুগ্রহ লাভের জন্য সচেষ্ট থাকবে। দিল্লীর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কে চ্ছেদ এবং বাংলা প্রশাসনে উত্তর ভারত থেকে অভিজাত অমাত্যদের আগমন প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি এ সুযোগটি পেয়েও গেলেন। মুর্শিদকুলি খান বাংলার প্রশাসন কাঠামোতে নিজেদের ইচ্ছেমতো এবং পছন্দমতো কর্মকর্তা নিয়োগ দিলেন। এক্ষেত্রে বাংলায় অবস্থানকারী মুঘল মনসবদার শ্রেণী এবং নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রাধান্য দেয়া হলেও প্রশাসন পরিচালনার সুবিধার্থে স্থানীয় লোকদেরকেও ক্ষমতা কাঠামোতে অংশিদারীত্ব দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে নবাবের ব্যক্তিগত ক্ষমতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন লোকদের সচেতনভাবে এড়িয়ে চলা হলো। নবাবী প্রশাসনে স্থানীয় হিন্দু বাঙ্গালিদের নিয়োগ নীতি অনুসরণের পেছনেও এ উদ্দেশ্যই প্রধান ছিল বলে সমকালীন ইতিহাসবিদ মুন্শী সলিমুল্লাহর লেখায় স্থান পেয়েছে। মুর্শিদকুলি খানের উত্তরসূরী নবাবগণও তাঁর এসব দৃষ্টান্ত নিষ্ঠার সাথেই নুসরণ করেছিলেন বলে তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। নবাবদের এ নীতির ফলে বাংলার নিজামত শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় ও শক্তিশালী হয় এবং ক্ষমতা কাঠামোতে নবাবদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অমাত্যবৃন্দসহ রাষ্ট্রের অভিজাত গোষ্ঠীর দৃষ্টি দিল্লীর পরিবর্তে বাংলার দিকে নিবদ্ধিত হওয়ায় নবাবের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

সম্রাটের প্রগাঢ় আস্থা ও আনুকূল্য থাকায় বাংলা ও উড়িষ্যার নিযামত শাসন লাভের পূর্বেই দিউয়ান হিসাবেই মুর্শিদকুলি খান সুবা বাংলায় রাজকর্মকর্তা নিয়োগে ভূমিকা রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। বাংলা, বিহার

Dhaka University Institutional Repository

ও উড়িষ্যার দিউয়ান[২] থাকা অবস্থায় সৈয়দ আকরাম খানকে বাংলায় এবং সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানকে উড়িষ্যায় তাঁর সহকারী হিসেবে নিয়োগ দান একথা প্রমাণ করে। ১৭০৪ সালে মুর্শিদকুলি খান পারস্য থেকে আগত তাঁর চৌদ্দজন আত্মীয়কে সুবা বাংলার বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দেন বলে *আহকাম ই আলমগিরী* সূত্রে জানা যায়।[৩] এসময় সুবা প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধ কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। হুগলির ফৌজদারও করমণ্ডল উপকূলের সমুদ্র বন্দরসমূহের এডমিরাল জিয়াউদ্দিন খানের সাথে দিউয়ান মুর্শিদকুলি খানের সংঘাতের ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪] এ সংঘাতে জিয়াউদ্দিন খান ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ কোম্পানিসমূহের সহযোগিতা পেয়েছিলেন বলে সলিমুল্লাহ ও সলিম উভয়েই উল্লেখ করেছেন।[৫] এঘটনার মধ্য দিয়ে অমাত্যদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতার বিষয়টি যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয় লাভের জন্য প্রয়োজনে যে কারো সাথে এমনিকি বিদেশী ইউরোপীয় শক্তির সাথেও আঁতাত করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ দৃষ্টান্ত পরবর্তীতে আরো জোরালোভাবে অনুসৃত হওয়ায় ইউরোপীয় শক্তিসমূহ বিশেষকরে ইংরেজরা বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়এবং তাদের বাংলা জয়ের অনুকূল পটভূমি রচিত হয়।

১৭১২ সালের সম্রাট বাহাদুর শাহ মৃত্যুবরণ করলে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে আজিম-উস-শানসহ তাঁর চার পুত্র গৃহদ্বন্দ্ব এবং পরবর্তীতে বিজয়ী সম্রাট জাহান্দর শাহের (১৭১২-১৭১৩ খ্রি.) সাথে আজিম-উস-শানের পুত্র ফর্‌রুখসিয়ারের ক্ষমতার লড়াইয়ের সময় দিল্লীর কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে স্বার্থ চেতনাকে কেন্দ্র করে প্রভাবশালী অমাত্য অভিজাতদের মধ্যে যে দলাদলি ও রেষারেষি শুরু হয়েছিল, মুর্শিদকুলি খান এতে কোনোভাবেই নিজেকে জড়াননি। এতে ফররুখশিয়ার তাঁর প্রতি প্রথমে রুষ্ট হলেও পরে মুর্শিদকুলি খানের প্রতি কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে, বরং

---

[২] ১৭০০ সালে বাংলার দিউয়ান নিযুক্তির চার বছরের মধ্যেই মুর্শিদকুলি খান এ তিনটি সুবার পূর্ণ দিউয়ানী শাসনের দায়িত্ব লাভ করেন। এ সময় তিনি সুবা উড়িষ্যার সুবাদার হিসেবেও দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এক সঙ্গে এতগুলি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্তি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাথে তাঁর নিবিড় সর্ম্পকেরই পরিচায়ক।

[৩] ইনায়েত উল্লাহ খান, *আহকাম ই আলমগিরী;* আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, মোকাদ্দেসুর রহমান কর্তৃক বাংলায় অনদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২২। মুর্শিদকুলি খানের জন্ম ভারতীয় ভারতীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে। সম্ভবত তাঁর প্রথম পৃষ্ঠপোষক সফি ইস্ফাহানীর সূত্রে পারস্যদেশীয় এসব আত্মীয় স্বজন হয়েছিলেন। এর পেছনে বৈবাহিক সূত্রও থাকতে পারে।

[৪] জিয়াউদ্দিন খান ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রধান উজির মোল্লা আলাউল মুলক তুনীর (ফাজিল খান নামে সমাধিক পরিচিত) ভাইপো এবং সম্রাটের আরেক উজির বুরহান উদ্দিন (দ্বিতীয় ফাজিল খান নামে পরিচিত) তাঁর শ্বশুর ছিলেন । উচ্চ বংশীয় অভিজাত পরিবারের লোক হওয়ায় পদমর্যাদায় উচ্চ হলেও তিনি মুর্শিকুলি খানকে নিতান্তই মামুলি এবং একজন ভূঁইফোড় কর্মকর্তা মনে করে তাঁকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন। জিয়াউদ্দিন খান নিজেকে মুর্শিদকুলি খানের অধীন কর্মকর্তা হিসেবে মনে করতেন না এবং তাঁর আদেশ-নিষেধকে সবসময়ই অবজ্ঞা করতেন। মুর্শিদকুলি খান বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করলে সম্রাট হুগলি ফৌজদারিকে তাঁর অধীনস্থ করে দিলে তিনি জিয়াউদ্দিন খানকে বরখাস্ত করে তাঁর বিশ্বস্ত ওয়ালি বেগকে হুগলির ফৌজদার নিয়োগ করেন। জিয়াউদ্দিন খান এ বরখাস্ত আদেশ মেনে নিলেও ওয়ালি বেগের কাছে তাঁর সময়কার ফৌজদারির আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে মুর্শিদকুলি খানের সাথে তাঁর যুদ্ধ বেধে যায়। আবদুল করিম, 'নবাবি আমলে রাজনীতির ধারা' সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১,১ম খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৭০; Salimulla, *Tarikh-i-Bangla,* Eng. Trns. by F. Gladwin as a *A Narrative of the Transactions in Bengal,* Stuart & Cooper, Calcutta, 1906, p. 76; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৯

[৫] Salimulla, *op. cit.* p.77; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে 'জাফর খান নাসিরী' উপাধি দিয়ে বাংলার দিউয়ান পদে বহাল রাখেন। উপরন্তু তাঁকে বাংলার নায়েব সুবাদারির দায়িত্বও দেয়া হয়।[৬] মুর্শিদকুলিখানের কর্মদক্ষতা ছাড়াও তাঁর দল নিরপেক্ষ অবস্থান এবং সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাটের প্রতি আনুগত্যবোধ মুর্শিদকুলি খানের ব্যাপারে ফররুখসিয়ারের সিদ্ধান্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। ফরখুন্দাশিয়ার মৃত্যুমুখে পতিত হলে সম্রাট তাঁর বিশ্বস্থ বন্ধু মীর জুমলাকে[৭] বাংলার সুবাদার পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু মীর জুমলা তাঁর কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় নায়েব সুবাদার হিসেবে মুর্শিদকুলি খানই কার্যত বাংলা শাসন করতে থাকেন। এ পর্যায়ে মুর্শিদকুলি খানের বিরুদ্ধে মাহমুদাবাদ পরগণার অন্তর্গত ভূষণার জমিদার সীতারামের বিদ্রোহ এবং এ বিদ্রোহ দমনে তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।[৮] সলিমুল্লাহ ও গোলাম হোসেন সলিমের মতে সীতারাম ছিলেন একজন দস্যু সর্দার। কিন্তু সতীশচন্দ্র মিত্র সীতারামকে একজন জনপ্রিয় বাঙ্গালি বীর, বাংলার শেষ হিন্দু রাজা এবং তাঁর জমিদারিকে শেষ হিন্দু রাজ্য বলে চিত্রিত করেছেন।[৯] আচার্য যদুনাথ সরকারও সীতারাম সম্পর্কে শেষোক্ত মত পোষণ করেন।[১০] তবে সীতারামকে ডাকাত ও দস্যু সর্দার হিসেবে সলিমুল্লাহ ও সলিমের আখ্যা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি সতীশচন্দ্র ও যদুনাথ সরকার কর্তৃক তাঁকে জনপ্রিয় বাঙ্গালি বীর ও হিন্দু রাজা এবং তাঁর রাজ্যকে বাংলার শেষ হিন্দু রাজ্য বলে আখ্যাদানও অতিরঞ্জন বলে মনে হয়। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন সাধারণ জমিদার। প্রজাদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল এবং এ জনপ্রিয়তাই তাঁর শক্তির উৎস ছিল। মুর্শিদকুলি খান যখন হুগলির ফৌজদার জিয়াউল্লা খান এবং পরে ফররুসিয়ারকে মোকাবিলায় ব্যস্ত এই সুযোগে সীতারাম মুর্শিদকুলি খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তাঁর হাতে ভূষণার ফৌজদার আবু তুরাব নিহত হন। মুর্শিদকুলি খানের নির্দেশে তাঁর শ্যালক বখশ আলী খান পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমিদারদের সহায়তায় সীতারমকে পরাজিত করেন। বিদ্রোহের অপরাধে সীতারামকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত করে তাঁর জমিদারি নাটোরের রামজীবনের হাতে অর্পন করা হয়।[১১] সীতারামের বিদ্রোহ দমনে সাফল্য আশেপাশের জমিদারদের কাছে যেমন মুর্শিদকুলির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তেমনি মুঘল রাজন্যের কাছেও কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। তাছাড়া ভূষণার জমিদার তাদের স্বশ্রেণীভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের জমিদাররা তাঁকে দমনে সরকারি বাহিনীকে যে সহযোগিতা করেছিল, এর মাধ্যমে ভূ-স্বামী অভিজাত জমিদারদের প্রয়োজনে রাজশক্তিকে সামরিক সহায়তা প্রদানের বাধ্যবাধকতার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়। নবাবী যুগে পরবর্তী পর্যায়ে এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

---

[৬] এসময় বাংলা নিযুক্ত সুবাদার ছিলেন সম্রাটের শিশুপুত্র ফরখুন্দাশিয়ার। তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় প্রকৃত শাসন ক্ষমতায় মুর্শিদকুলি খানই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

[৭] প্রকৃত নাম ইবাদুল্লাহ। জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) কাজি হিসেবে কাজ করার সময়ই ফররুখসিয়ারের সাথে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তিনি প্রথমে শরীয়তউল্লঅহ এবং পরে মীর জুমলা উপাধি লাভ করেন। উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় তিনি ফররুখসিয়ারকে সাহায্য করেছিলেন।

[৮] সলিমুল্লাহ ও গোলাম হোসেন সলিম এর বর্ণনা এবং সমকালীন ইংরেজ কোম্পানির কনসালটেশন বা প্রতিবেদনে এ প্রসঙ্গটি গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। Salimulla, *op. cit.* p.107; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭১

[৯] সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোর- খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.

[১০] J.N. Sarkar (ed.), *op. cit.* p. 416

[১১] আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ.পৃ. ৪৫-৪৬

সম্রাট ফর্‌রুখসিয়ারের রাজত্বকালে দিল্লীর দরবারে ক্ষমতার লড়াইয়ে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে পরাস্ত হয়ে মীর জুমলা বাংলার সুবাদরি পদ হারান এবং সম্রাট এ পদে মুর্শিদকুলি খানকে নিয়োগ দেন।[১২] ১৭১৯ সালে সম্রাট ফর্‌রুখসিয়ার নিহত হলে দিল্লী দরবারের চরম রাজনৈতিক বিপ্লবজনিত নৈরাজকর‍্য[১৩] পরিস্থিতিতেও মুর্শিদকুলি খান কেবল বাংলা ও উড়িষ্যা প্রশাসনে স্বপদে বহাল থাকেননি, বরং তাঁর ক্ষমতার পরিধি সম্পসারণেও সক্ষম হন। দিল্লীতে রাজনৈতিক অরাজকতা ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতেও মুর্শিদকুলি খান তাঁর শাসিত প্রদেশসমূহে যেভাবে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন এবং বিপ্লবজনিত অসুবিধা থেকে জনগণকে মুক্ত রাখেন, তা নিঃসন্দেহে একজন প্রশাসক হিসেবে তাঁর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতারই পরিচায়ক। এজন্য সলিমুল্লাহ ও গোলাম হোসেন সলিম উভয়েই তাঁর উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন।[১৪]

পূর্ণাঙ্গ সুবাদার (এখন থেকে নবাব পদবি প্রযোজ্য হবে) পদাভিষিক্ত হয়ে এবং রাজধানী দিল্লীর দলীয়-রাজনীতি সৃষ্ট অনিশ্চিয়তা ও অরাজকতা প্রতিরোধ করে মুর্শিদকুলি খান বাংলা ও উড়িষ্যার প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থায় অখণ্ড মনোনিবেশ করেন। বাংলা ও উড়িষ্যা প্রশাসনে কার্যত স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারনের ক্ষমতা অর্জনের ফলে সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। এ লক্ষ্যে তিনি প্রথমেই অভিজাত অমাত্য হিসেবে গণ্য শাসন কাঠামোর উপরতলার গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে তাঁর নিকটাত্নীয়-পরিজন এবং তাঁর প্রতি নির্ভরশীল ও একান্ত বিশ্বস্ত লোকদের নিয়োগ দেন। নবাবের একমাত্র জামাতা সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানকে উড়িষ্যায় নায়েব নাজিম পদে নিয়োগ লাভ করেন। ব্যক্তি চরিত্রে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও প্রশাসক হিসেবে তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে বিশেষ কোনো দ্বিমত নেই। *সিয়ার-উল-মুখখিরিণের* বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সুজাউদ্দিন খানের শাসনাধীনে উড়িষ্যা সরকার, প্রশাসন ও রাজস্ব আয়ে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল।[১৫]

নবাবী আমলে নিজামত শাসনের অধীনে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) ছিল বৃহত্তম নিয়াবতী (নায়েব নাজিম শাসিত) এলাকা। ইংরেজ কোম্পানির প্রতিবেদনে মুর্শিদকুলি খানের সময় ঢাকায় নিয়োগপ্রাপ্ত তিনজন নায়েব নাজিমের কথা জানা যায় এবং এরা হলেন খান মওন্দী আলী খান (১৭১৭ খ্রি.), ইতিসাম খান (আনু. ১৭২৩-২৬খ্রি.) এবং ইতসাম

---

[১২] তাঁকে 'মুতামিন-উল-মূলক আলা উদ-দৌলাহ জাফর খান বাহাদুর নাসির জং' উপাধিতে ভূষিত এবং তাঁর মনসব সাত হাজারে উন্নীত করে তাঁকে সাম্রাজ্যের প্রধান আমিরদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। মুহাম্মদ মোহর আলীর মতে মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদার পদ লাভ করেছিলেন ১৭১৬ সালের শেষ অথবা ১৭১৭ সালের শুরুতে। Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* Vol. I A, p. 544। যদুনাথ সরকার একে ১৭১৭ সালের এবং আবদুল করিম নানাযুক্তি তর্কের মাধ্যমে ১৭১৬ সালের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। J.N. Sarkar (ed.), *op. cit.* p.399; আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ৪৭

[১৩] এক বছরের মধ্যে কেন্দ্রে তিনজন সম্রাট মুঘল মসনদে আরোহন করেন এবং এরা হলেন রাফি-উদ-দারাজাৎ (১৭১৯), রাফি-উদ-দৌলাহ (১৭১৯) এবং মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রি.)।

[১৪] Salimulla, *op. cit.* p.120; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৭

[১৫] সিয়ারে অবশ্য এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ সাফল্যের পিছনে সুজাউদ্দিনের অধীন দু'জন রাজকর্মচারী মির্যা মুহাম্মদ আলী (পরবর্তীকালে আলিবর্দী খান নামে পরিচিত) ও তাঁর ভাই হাজী মির্যা আহমদের বিশেষ অবদান ছিল। তবে এ দুজন কর্মচারীর পদমর্যাদা কী ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কে কে দত্তের মতে, সুজাউদ্দিন খান মির্যা মুহাম্মদ আলীকে উড়িষ্যা ফৌজদারির পরিদর্শক পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। আর তাঁর ভাই হাজি আহমদ পেয়েছিলেন মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকুরী। তবে এরা যে পার্থিব বিষয় ব্যবস্থাপনায় সুদক্ষ ও অসাধরণ ধী-শক্তি সম্পন্ন ছিলেন সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এ দু'ভাইয়ের পরামর্শ ও সহায়তায় সুজাউদ্দিন খান নায়েব নাজিম হিসেবে উড়িষ্যার শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন বলে কে কে দত্ত স্পষ্ট করে বলেছেন। K K Datta, *Alivardy and His Times,* University of Calcutta, 1939, pp.4,6

Dhaka University Institutional Repository

খানের পুত্র (নামোল্লেখ নেই, ১৭২৬-২৮ খ্রি.)। এদের মধ্যে শেষোক্ত দু'জন ছিলেন নবাবের আত্মীয়।[১৬] সলিমুল্লাহর বর্ণনা অনুযায়ী মুর্শিদকুলি খান তাঁর দৌহিত্রী দুর্দানা বেগমের স্বামী মির্যা লুৎফুল্লাহকে জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম নিয়োগ এবং তাঁকে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান উপাধি দিয়েছিলেন।[১৭] তবে নায়েব নাজিম হিসেবে এসব অমাত্য অভিজাতদের প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

নবাবী আমলে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে দিউয়ানের প্রভাবশালী অবস্থান ছিল। মুঘল সম্রাট কর্তৃক মুর্শিদকুলি খান একই সাথে সুবাদার ও দিউয়ান পদাভিসিক্ত হওয়ায় বাংলা প্রশাসনে স্বতন্ত্র দিউয়ানের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটেছিল। নবাব হিসেবে মুর্শিদকুলি খান তাঁর শাসনামলের শুরুর দিকে কিছু সময় কোনো স্বতন্ত্র দিউয়ান নিয়োগ দেননি। পরে অবশ্য তিনি দিউয়ানি দপ্তরে 'দিউয়ান-ই-খাল্সা' নামে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করেন। পরবর্তিকালে এর নামকরণ করা হয় 'দিউয়ান-ই-খাল্সা শরিফা'। খাল্সা বিভাগের দায়িত্ব প্রথমে মুর্শিদকুলি খান স্বয়ং নিজে পালন করতেন এবং তখন তাঁর অধীনে 'পেশকার' পদবিধারী একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এ বিভাগে সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। পরবর্তীতে খালসা বিভাগে স্বতন্ত্র দিউয়ান নিয়োগ দেয়া হয়।[১৮] তবে সহকারী হিসেবে পেশকার নিয়োগের বিধান যথারীতি অব্যাহত রাখা হয়। দিউয়ানের মৃত্যুর পর সাধারণত পেশকারই দিউয়ান পদে নিয়োগ পেতেন। মুর্শিদকুলি খান রাজস্ব প্রশাসনে 'দিউয়ান-ই-আলা' নামেও একটি পদ প্রবর্তন করেছিলেন। একে পূর্ববর্তী যুগের বাদশাহী দিউয়ানের স্থালাভিসিক্ত বলা যেতে পারে।[১৯] বর্ণিত এসব তথ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, মুর্শিদকুলি খানের সময়ই বাংলার রাজস্ব প্রশাসনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরী নবাবগণও মুর্শিদকুলি খানের প্রবর্তিত ধারা অনুসরণ করেন। তবে নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময় রাজস্ব প্রশাসনে 'দিউয়ান-ই-তান' নামে আরেকটি উচ্চপদ প্রবতন করা হয়। প্রদেশের সেনাবাহিনীর বেতন ও ভাতা প্রদানের কাজ তদারক করা ছিল তার কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, সুবাদারি যুগে সম্রাট ছিলেন দিউয়ানের নিয়োগকর্তা এবং বাংলায় মুর্শিদকুলি খান ছিলেন মুঘল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শেষ বাদশাহী দিউয়ান। এরপর থেকে দিউয়ান নিয়োগের ক্ষমতাও নবাবগণ নিজেদের হাতে তুলে নেন। ১৭১৭ সালে মুর্শিদকলি খান সৈয়দ রাজী খানকে (নবাবের দৌহিত্রী নাফিসা বেগমের স্বামী) দিউয়ান-ই-খালাসা নিযুক্ত করেন। রাজস্ব শাসন পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা কতটুকু ছিল এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে সমকালিন তথ্যসূত্রে তাঁকে একজন নিপীড়ক রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। *রিয়াজ-উস-সালাতিনের* বর্ণনা মতে, তিনি ছিলেন একজন সংকীর্ণমনা, গোঁড়া ও ক্ষণক্রোধী ব্যক্তি। বাংলার রাজস্ব আদায়ে তাঁর কঠোরতার বিষয়টি সমসাময়িক সূত্রসমূহে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। *রিয়াজ-উস-সালাতিনের* তথ্য মতে, রাজী খান একটি গর্ত মলাদি জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থে পূর্ণ করে ব্যঙ্গ করে একে হিন্দুদের স্বর্গের নামে এর 'বৈকুণ্ঠ' নাম দিয়েছিলেন। রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ জমিদার ও রাজকর্মচারীদের এই বৈকুণ্ঠে নিক্ষেপ করে শাস্তি দিতেন।

---

[১৬] Consultations, 29 March, 1731

[১৭] Salimulla, *op. cit.* p. 102

[১৮] কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল*, প্রথম প্রকাশ, ১৯০১, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ.পৃ ৩০৪-৩০৫

[১৯] কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের মতে 'দিউয়ান-ই-আলা' মূলত রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গণ্য হতেন। কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০১

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এরূপ কঠোর নীতি অবলম্বন করে সমস্ত বকেয়া রাজস্ব আদয় করেন। সলিমুল্লাহর *তারিখ-ই-বাঙ্গালা* গ্রন্থেও একই রকমের বর্ণনা রয়েছে।[২০] ১৭২০ সালে সৈয়দ রাজী খানের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি খানের দৌহিত্র মির্জা আসাদুল্লাহকে বাংলার দিউয়ান নিযুক্তকরা হয়। নবাবের সুপারিশে তাঁকে 'সরফরাজ খান' উপাধি দ্বারা স্মানিত করা হয়।[২১] সরফরাজ খান একইসাথে 'দিউয়ান-ই-আলা' পদাধিকারীও হয়েছিলেন । তবে তিনি যে নামমাত্র এ পদ অলঙ্কৃত করে ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা তথ্যসূত্রে দেখা যায় যে, ১৭২৭ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুর্শিদকুলি খানই বলতে গেলে দিউয়ানি শাসনও পরিচালনা করেছেন। কেন্দ্রে বার্ষিক রাজস্ব পাঠানোর দায়িত্ব দিউয়ানের কর্তব্যকর্মের মধ্যে থাকলেও নবাবকেই এ দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে মনে হয় যে, বাংলার নিজামত ও দিউয়ানি শাসন নিজ হাতে কুক্ষিগত করে রাখার জন্যই সুপরিকল্পিতভাবে তিনি তা করেন।

মুঘল প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় কানুনগো ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ। সুবাদার, বিশেষ করে প্রাদেশিক দিউয়ানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রদেশে সম্রাট কর্তৃক একজন প্রধান বা সদর কানুনগো নিয়োগ করা হতো। প্রাদেশিক দিউয়ানি দপ্তরে নিয়োজিত একজন সহকারী কানুনগো এবং পরগনা কানুনগোর সহযোগিতায় সদর কানুনগো তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। প্রদেশের জমির পরিমাণ, নিরিখ, হস্তবুদ, সরকারের প্রাপ্য কর ও অন্যান্য আবওয়াব, লাখেরাজ, জায়গির, ইস্তমুরারী, মোকররী ইত্যাদি সমন্ধীয় নথিপত্র এবং আদায় অনাদায়ের হিসাব সদর কানুনগো সংরক্ষণ করতেন।[২২] রাজস্ব নির্ধারণে, নতুন বন্দোবস্তে বা অন্যান্য প্রয়োজনে কানুনগো 'Registrar of Land Records' হিসেবে কাজ করতেন।[২৩] অনেক ক্ষত্রে এ পদটি বংশানুক্রমিক হতো। মুর্শিদকুলি খান সুবাদারি দায়িত্ব লাভের পূর্বেই দর্পনারায়ন বাংলায় সদর কানুনগো হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তবে এ দুজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। সলিমুল্লাহ ও গোলাম হোসেন সলিমের বর্ণনা মতে, মুর্শিদকুলি খান জাহাঙ্গীরনগর থেকে দিউয়ানি দপ্তর মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরের পর বার্ষিক নিকাশী কাগজপত্রসহ দাক্ষিণাত্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি দিউয়ানি সেরেস্তার কাগজ জমাবন্দী, ওয়াশীল বাকী ও জমা খরচ ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রস্তুত করে সদর কানুনগো দর্পনারয়নের কাছে তা স্বাক্ষরের জন্য পেশ করেন। কেননা রাজস্ব ও শাসন সম্পর্কীয় কাগজপত্র কানুনগোর স্বাক্ষর ছাড়া কেন্দ্রীয় দিউয়ানি দপ্তরে গ্রহণযোগ্য হতো না। দর্পনারয়ন কাগজপত্রে স্বাক্ষরের জন্য কানুনগোর রুসুম (কমিশন) বাবদ তিন লক্ষ টাকা দাবি করলে দিউয়ান তাঁর কাগজপত্র দর্পনারায়নের সহকারী জয়নারায়নের দ্বারা স্বাক্ষর করিয়ে নেন।[২৪] বলার অপেক্ষা রাখে না যে কানুনগোর এ আচরণে মুর্শিদকুলি খান খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। খালিসা দিউয়ানির পেশকার ভুপত রায়ের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি খান

---

[২০] গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭১; Salimulla, *op. cit.* pp. 79-80

[২১] Salimulla, *op. cit.* p. 100

[২২] শ্রী নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ-কাহিনী*, কমল চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, প্রথম পর্বে সংকলিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১০১

[২৩] R.B. Remsbotham, *Studies in the Land Rvenue History of Bengal, 1769-1787*, Oxford, 1926, p. 187

[২৪] Salimulla, *op. cit.* p.40; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

দর্পনারায়নের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। এর পিছনে তাঁর মুর্শিদকুলি খানের দর্পনারায়নের উপর প্রতিশোধ স্পৃহা কাজ করেছিল বলে সমকালিন সূত্রে বর্ণিত তথ্য পর্যালোচনায় মনে হয়। বস্তুত খালিসা দিউয়ানির দায়িত্ব প্রাপ্তির ফলে দর্পনারয়ন রাজস্ব বিভাগের সামগ্রিক দায়িত্বভার লাভ করেন। সুবা বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে দর্পনারয়নের প্রখর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তিনি এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত করে খালিসা থেকে তা আদায় করেন। এরূপ আয় বৃদ্ধির জন্য তাঁকে জমিদারদের বৃত্তির (নানকর) উপর হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। ফলে জমিদার ও রাজস্ব কর্মচারিরা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং কেউ কেউ মুর্শিদকুলি খানের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশও করেন। এ অবস্থায় মুর্শিদকুলি খান হিসাব নিরীক্ষার অজুহাতে দর্পনারয়নকে কারারুদ্ধ করেন এবং কারাগারেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এভাবেই তিনি দর্পনারায়নের উপর বহুদিনের সঞ্চিত বিদ্বেষের প্রতিশোধ নেন।[২৫] আবদুল করিম অবশ্য এ বিষয়ে কিছুটা দ্বিমত পোষন করেছেন। তিনি মনে করেন কোন বিদ্বেষ নয়, বরং ইচ্ছাকৃতভাবেই মুর্শিদকুলি খান দর্পনারায়নের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। রাজস্ব প্রশাসনে দর্পনারায়নের অভিজ্ঞতা এবং তাঁর কার্যাবলি দ্বারা যেন নবাবের কোন ক্ষতিসাধন করতে না পারেন, সে জন্যই মুর্শিদকুলি খান দর্পনারায়নের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে সম্ভবত তাঁকে দলভূক্ত রাখতে চেয়েছিলেন।[২৬] আবদুল করিম এর বক্তব্য অযৌক্তিক নয়, তবে সমকালীন রাজনীতিতে পদস্থ অমাত্যদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনের বিদ্বেষ প্রসুত পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত ও বিরল নয়।

দর্পনারায়নের মৃত্যুর পর নবাব মুর্শিদকুলি খান সদর কানুনগোর ক্ষমতা ও কার্যপরিধিকে খণ্ডিত ও দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেন। দর্পনারয়নের পুত্র শিবনারায়নকে কানুনগো পদের এখতিয়ারের দশ আনা এবং দর্পনারায়নের সহকারী জয়নারায়নকে (যিনি ইতোপূর্বে বিনা শর্তে মুর্শিদকুলি খানের প্রস্তুতকৃত হিসাব স্বাক্ষর করেছিলেন) ছয় আনা অর্পন করা হয়।[২৭] এ পদক্ষেপটি মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ছিল অভিনব। মুর্শিদকুলি খান ছিলেন প্রশাসনে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। দর্পনারায়নের পতন এবং সদর কানুনগো পদকে দিখণ্ডিতকরণের এ অভিনব পদক্ষেপের পশ্চাতে তাঁর এ অভিসন্ধি কাজ করেছিল বলে মনে হয়।

মুঘল প্রশাসনিক ঐতিহ্য অনুযায়ি অভিজাত অমাত্যদের বহুমূখী প্রতিভা বিশেষ করে সামরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হতো। তথ্যসূত্রে জানা যায় যে, একজন বেসামরিক বা দিউয়ানি দপ্তরের অভিজাত অমাত্যকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রণক্ষেত্রে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হতো। নবাবী যুগেও যে এ ঐতিহ্য অনুসরণ করা হয়েছিল মুর্শিদকুলি খানের সময়কার দিউয়ানি দপ্তরের দুজন পদস্থ অভিজাত অমাত্য লাহোরীমল ও রঘুনন্দের দৃষ্টান্ত থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৮] সেনাপতি মুহাম্মদ জানের নেতৃত্বে রাজশাহীর বিদ্রোহী জমিদার রাজা উদয়নারায়নের বিরুদ্ধে নবাব মুর্শিদকুলি

---

[২৫] শ্রী নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ-কাহিনী*, পৃ.১০৪

[২৬] আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ.৬৮

[২৭] Salimulla, *op. cit.* p.76; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৬৯

[২৮] লাহোরীমলের সঠিক পদবি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে ইংরেজ কোম্পানির বিভিন্ন কনসালটেশনে তাঁর নাম উল্লেখ থাকায় ধারণা করা হয় যে তিনি অবশ্যই একজন পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। অন্যদিকে রঘুনন্দ ছিলেন নাটোর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা রাজজীবনের বড় ভাই। লস্করপুরের জমিদারির উকিল হিসেবে রঘুনন্দ ঢাকায় সুবাদার দরবারে আগমন করেন। মুর্শিদকুলির খানের সাথে তিনি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে আসেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

খান প্রেরিত বাহিনীতে এ দু'জন অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবাবী যুগে ভূ-অভিজাত জমিদারদেরও সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হতো। নবাবের নির্দেশ মোতাবেক জমিদাররা স্ব-শরীরে রণক্ষেত্রে হাজির অথবা সেনাবাহিনীর যোগান দিতে বাধ্য থাকতেন। রাজা উদয়নারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযানেও নদীয়ার জমিদার রাজা রঘুরাম (বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা) উপস্থিতি দেখা যায়।[২৯]

নবাবী প্রশাসনে ফৌজদার অমাত্য অভিজাত শ্রেণীভূক্ত কর্মকর্তা ছিলেন। মুঘল শাসনাধীনে প্রত্যেক সুবায় প্রান্তভাগ রক্ষা, অবাধ্য ও বিদ্রোহী জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ ফৌজদারদের প্রধান দায়িত্ব ছিল। সাধারণত আমিল নামক কর্মকর্তা জমিদারদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। তবে দুর প্রদেশে অনেক ক্ষেত্রে ফৌজদারকেও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করতে হতো। অধীনস্থ থানাদারদের সাহায্যে ফৌজদার রাজস্ব বিভাগের এ দায়িত্ব পালন করতেন। দস্যু-তস্কর দমন করে জনগণের জানমালের নিরপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও ছিল ফৌজদারের উপর। এজন্য তিনি তাঁর অধীন এলাকায় থানা স্থাপন করে থানাদার ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করতেন। গৌরবের যুগে দিল্লীর মুঘল দরবার হতেই অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলা, উড়িষ্যা ও বিহারেও ফৌজদার নিয়োগ পেয়ে আসতেন। নবাবী শাসনামলে নবাবাগণ অন্যান্য কাজের মতো ফৌজদার নিয়োগের কাজটিও স্ব হস্তে তুলে নেন। উল্লেখ্য যে, নবাবী আমলে বাংলা ১০টি ফৌজদারিতে বিভক্ত ছিল। বিহারে ফৌজদারির সংখ্যা ছিল আটটি।[৩০] এ যুগে ফৌজদাররা উপরে বর্ণিত তাদের নির্ধারিত প্রশাসনিক দায়িত্বপালন করতেন, তবে ক্ষেত্র বিশেষে তারা যে আরো অনেক দায়িত্ব পালন করতেন সে তথ্যও জানা যায়। মুর্শিদকুলি খানের সময় রাজশাহীর বিদ্রোহী জমিদার উদয়নারায়নের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানে মুর্শিদাবাদের ফৌজদার মুহাম্মদ জানের নেতৃত্ব দানের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সলিমুল্লাহ ও গোলাম হোসেন সলিমের তথ্য মতে, রাজ্যের জননিরাপত্তার জন্য মুর্শিদকুলি খান কটোয়া, মুর্শিদগঞ্জ, এবং পোবতিহল নামক যে কয়টি থানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফৌজদার মুহাম্মদ জান এসব থানার থানাদার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বাণিজ্য বিষয়ে নবাব সরকারের সাথে ইংরেজ কোম্পানির বিরোধ (১৭২২/২৩ সালে) নিস্পত্তিতে বালাসোরের ফৌজদার তকী খানকে বেশ সক্রিয় দেখা যায়। ১৭২৬ সালে তিনি অস্টেন্ড কোম্পানিকে[৩১] বালাসোরে কুঠি নিমার্ণের অনুমতি দিয়েছিলেন। ফৌজদার কর্তৃক একটি বিদেশী কোম্পানিকে কুঠি নিমার্ণের অনুমতি প্রদানের ঘটনায়

দিউয়ানি দপ্তরের চাকুরি নেন। তাঁর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে মর্শিদকুলি খান তাঁকে দিউয়ানি দপ্তরে সহকারী কাননগো পদে নিয়োগ দেন। মুর্শিদকুলি খান যখন ভূমি বন্দোবস্ত শুরু করেন, তখন রঘুনন্দ দক্ষতার সাথে কাগজ পত্র ও হিসাব নিকাশ প্রস্তুত করে তাঁকে সহযোগিতা করেন। তাঁর কার্যদক্ষতা ও অধ্যবসায় দেখে মুর্শিদকুলি খান তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে দিউয়ানি দপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেন। তিনি নায়েব দিউয়ান আকরাম খানের প্রধান মুৎসুদ্দি হিসেবে শুল্ক বিভাগের বন্দোবস্তের কাজও করেছিলেন বলে জানা যায়। শ্রী নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, পৃ.৫৫৩; ইংরেজ কোম্পানির প্রতিবেদনে রঘুনন্দ টাকশালের দারোগা ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। Consultations, 18 July, 1717

[২৯] Consultations, 18 July, 1717

[৩০] বর্তমান গবেষণার অন্যত্র বাংলার ১০টি ফৌজদারির উল্লেখ করা হয়েছে। বিহারের ফৌজদারিগুলো ছিলঃ শাহাবাদ, রোটাস, মুঙ্গের, চম্পারণ, বিহার, শারণ, ত্রিহুত, হাজিপুর। বাংলার নির্দষ্ট ফৌজদারির বাইরে মুর্শিদাবাদে একজন ফৌজদার এবং নবাব সুজাউদ্দিনের সময় ত্রিপুরা আংশিক বিজিত হলে সেখানেও কিছুদিনের জন্য একজন ফৌজদার নিয়োগ করা হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩০৪

[৩১] ১৭১৩ সালে সম্পাদিত ইউট্রেক্টের সন্ধি দ্বারা নেদারল্যান্ড অস্ট্রিয়ার একটি অংশে পরিণত হয়। অস্ট্রিয়ার রাজা ষষ্ঠ চার্লস তাঁর নতুন প্রজা নেদারল্যান্ডবাসীকে প্রাচ্য বাণিজ্যে অংশ নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেন। রাজার উৎসাহে ফ্ল্যান্ডার্স প্রদেশের বণিকরা প্রাচ্য বাণিজ্যে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে অস্টেন্ড নামক একটি কোম্পানি গঠন করে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনযন্ত্রে তাঁর প্রভাবের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। পুর্ণিয়ার ফৌজদার ও জিলালগড় বন্দরের গভর্নর ছিলেন সায়েফ খান। তাঁর তত্ত্বাবধানে পুর্ণিয়ায় নবাবী কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয়েছিল। তিনি শুধু সুশাসন প্রতিষ্ঠা নয়, রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বীরনগরের জমিদার রাজা দুর্জন সিংহ ফৌজদারের অবাধ্যতা করায় তাঁকে জমিদারি থেকে উচ্ছেদ করেন। পুর্ণিয়ার অন্যান্য জমিদারদের বিরুদ্ধেও নানা রকম ব্যবস্থা নিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়। নবাবের সম্মতি ও সহায়তায় সায়েফ খান পার্বত্য রাজ্য মৌরঙ্গের অনেক অঞ্চল অধিকার করে ফৌজদারির সীমা সম্প্রসারণ করেন। সলিমুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, নবাব তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন এবং পুর্ণিয়া ফৌজদারির প্রশাসন ব্যাপারে নবাব মুর্শিদকুলি খান সায়েফ খানের গৃহীত ব্যবস্থাদিতে কোন হস্তক্ষেপ করতেন না।[৩২] দুরবর্তী ও প্রান্তীয় সীমানাস্থ ফৌজদারি এলাকার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বও যেহেতু ফৌজদারদের পালন করতে হতো সে জন্য তাদেরকে অনেক সময় জমিদার এমনকি বাংলায় বাণিজ্যরত ইউরাপীয় কোম্পানিগুলোর সাথেও দ্বন্দ্ব-সমন্বয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করতে হতো। এই সুযোগে ফৌজদারদের কেউ কেউ ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে বিদেশী কোম্পানিসমূহকে অন্যায্য সুবিধা দিতেন বলেও তথ্য সূত্রে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে হুগলি ফৌজদার মীর ইব্রাহিম ও মুহাম্মদ রিজার কথা বলা যেতে পারে। প্রথমোক্ত ফৌজদার মুর্শিদকুলি খানের নিকট থেকে সুবিধাজন শর্তে বাণিজ্য সনদ আদায়ে ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন।[৩৩] তাছাড়া তিনি উৎকোচের বিনিময়ে ওলন্দাজদের হুগলিতে নির্বিঘ্নে বাণিজ্য করার সুযোগ দিয়েছিলেন। ফৌজদার মুহাম্মদ রিজার সাথে ইংরেজদের বিরোধ, হুগলিতে ইংরেজদের বাণিজ্য বন্ধ করে এবং নিরূপায় ইংরেজদের বাণিজ্য সচল রাখতে ফৌজদারের মাধ্যমে সুবাদার ও দিউয়ানের সাথে আপোষ-মিমাংসার কথা সমকালিন ইংরেজ কোম্পানির কাগজপত্রে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।[৩৪] হুগলির অপর ফৌজদার জিয়াউদ্দিন খানের সাথেও ইংরেজ কোম্পানির বিশেষ সখ্য ছিল। তিনি মুর্শিদকুলি খানকে এড়িয়ে ইংরেজদের জন্য দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের কাছ থেকে তাদের জন্য একটি বাণিজ্যিক সুবিধা সম্বলিত ফরমান যোগাড় করে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়।[৩৫] অবশ্য তাঁর প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হওয়ার আগেই তিনি হুগলির ফৌজদারের পদ থেকে অপসারিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শুধু ইংরেজ নয় ওলন্দাজ ও ফরাসিদের সাথেও জিয়াউদ্দিন খানের সম্পর্ক ছিল। তাই মুর্শিদকুলি খানের সাথে বিরোধের সময় ওলন্দাজরা মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এসেছিল।

হুগলির একজন খ্যাতিমান ফৌজদার ছিলেন আহসান উল্লাহ খান (১৭১৮-১৭২৮ খ্রি.)। তাঁর সময়কার দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে অস্টেন্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সুজাত খান ও নাজাত খান নামক দু'জন অবাধ্য বিদ্রোহী জমিদারকে দমন। সলিমুল্লাহ ও গোলাম হোসেন সলিমের গ্রন্থে এ দু'টি ঘটনাই স্থান পেয়েছে।[৩৬] সূত্র মতে, অস্টেন্ড কোম্পানি বাঁকিবাজারে কুঠি স্থাপনের জন্য নবাব মুর্শিদকুলি খানের নিকট থেকে একটি পরওয়ানা লাভ করেছিল। প্রথমে কোম্পানি সাধারণ গৃহ নির্মাণ করে বসবাস ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম শুরু করলেও পরে বুরুজ ও

---

[৩২] Salimulla, *op. cit.* p.70

[৩৩] C. R. Wilson, *Early Annals of the English in Bengal,* Vol. I, London, 1895, p.162

[৩৪] আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ.১৩৩

[৩৫] C. R. Wilson, *Early Annals of the English in Bengal,* Vol. II, London, 1900, p.I, IV

[৩৬] Salimulla, *op. cit.*p p.103-108; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১৭৭-১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিখা নির্মাণের মাধ্যমে একে সুরক্ষিত দূর্গে পরিণত করে। এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি যৌথভাবে হুগলির ফৌজদার আহসান উল্লাহ খানের মাধ্যমে বিষয়টি নবাবের দৃষ্টিগোচর করেন।[৩৭] নবাবের নির্দেশে ফৌজদার অস্টেন্ড কোম্পানির কুঠি আক্রমণ এবং তাদেরকে ১৭২৪ সালে বাঁকিবাজার ত্যাগে বাধ্য করেন।[৩৮] সলিমুল্লাহ ও সলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সুজাত খান ও নাজাত খান নামক দুজন আফগান ছিলেন মাহমুদাবাদ পরগণার টঙ্কি স্বরূপপুরের জমিদার। তারা নিজ এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী জমিদারদের এলাকায় লুঠতরাজ করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। নবাবের নির্দেশে ফৌজদার আহসান উল্লাহ খান অনুচরবর্গসহ বিদ্রোহী আফগানদের গ্রেপ্তার করে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। তাদের জমিদারি বাজেয়াপ্ত করে তা নাটোরের রামজীবনের সাথে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।[৩৯]

আমত্য শ্রেণী একটি রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্রের মূল স্তম্ভ । এদের কর্মদক্ষতা ও আনুগত্যের উপর প্রাশাসনিক শৃঙ্খলা ও সাফল্য অনেকাংশে অনেকাংশেই নির্ভর করে। দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ও কর্মকুশলী নবাব মুর্শিদকুলি খান এ সত্যটি যথাযথভাবে উপলব্দি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। তাই নবাব সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন পরিচালনার জন্য একটি দক্ষ, বিশ্বস্ত ও অনুগত অমাত্য শ্রেণী গড়ে তোলার কাজে বিশেষ মনযোগী হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর সাফলতা ছিল নিংসন্দেহে ইর্ষণীয় পর্যায়ের। বস্তুত তিনি এমন একটি অমাত্য শ্রেণী গড়ে তুলেছিলেন যারা শুধু তাদের কর্ম দক্ষতা গুণে প্রাশাসনিক বিকাশধারাকে তরান্বিত করেনি, নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ভিত্তিকে মজবুতকরণে সহায়তা করেছিলেন। প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মুর্শিদকুলি খানের উত্তরসূরী নবাবগণ তাত্বিকভাবে মুর্শিদকুলি খানের অনুসৃত প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থাই অনুসরণ করেছিলেন। তবে প্রায়োগিক বাস্তবতায় কিছুটা পরিবর্তন, পরিমার্জন লক্ষ করা যায়। বিশেষকরে ক্ষমতাকাঠামোয় অভিজাত অমাত্যদের অবস্থান এবং তাদের ভূমিকাতে বেশ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

মুর্শিদকুলি খানের নিজামত আমলেই অমাত্য অভিজাতদের বাইরে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে অভিজাত শ্রেণী হিসেবে ভূ-স্বামী জমিদার ও বণিক- ব্যবসায়ীদের ক্রমোত্থান ঘটে। এ অভিজাতরা ভূমি ও ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হন এবং এই অর্থ-বিত্তের জোরে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মুর্শিদকুলি খানের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার প্রসঙ্গে আলোচনায় বাংলায় একটি মিশ্র ভূ-অভিজাত শ্রেণীর বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা এও দেখেছি যে, নবাবী আমলের জমিদারদের অভ্যন্তরীণ স্বরূপের মধ্যে একটি আমলাতান্ত্রিক চরিত্রও ছিল। মুঘল যুগের মতো এ সময়ও জমিদারদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হতো।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জমিদারির আকার আয়তন এবং জমিদারদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের নিরিখে বাংলার জমিদারদের স্ব[illegible], প্রান্তীয়, বৃহৎ, ও ছোট এ চারটি বর্গে বিভক্ত ছিল। এ চার শ্রেণীর জমিদারদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও

---

৩৭ এজন্য তারা ফৌজদারকে মোটা অংকের আর্থিক সুবিধাও দিয়েছিল বলে সূত্রে উল্লেখ। Consultations, 13 February, 1727

৩৮ আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ২০৬

৩৯ Salimulla, *op. cit.*p.107; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

কর্তব্যের পরিধির মধ্যে কিছুটা বিভিন্নতা অবশ্যই ছিল। স্বরাট জমিদাররা তাত্ত্বিকভাবে রাজকীয় প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে অর্ন্তভূক্ত ছিল। তবে তাদের অধিকার, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা অন্যান্যদের থেকে ভিন্ন ছিল। মুঘল রাজস্ব পদ্ধতি তাদের জমিদারিতে প্রযোজ্য ছিল না। তাদের প্রদত্ত কর কখনো সাধারণ খাজনা হিসেবে বিবেচি হতো না, বরং চিরাচরিত 'ট্রিবিউট' হিসেবেই একে গণ্য করা হতো। বাংলার উত্তর পূর্ব এবং পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রান্তীয় জমিদারগণ দেশের অভ্যন্তরীণ জমিদারদের তুলনায় অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতো। নবাবী প্রশাসনের সাথে তাদের সম্পর্ক অনেকটাই পেশকাশ প্রদানের মধ্যেই সীমিত ছিল। বাংলার উত্তর, উত্তর পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী জমিদারদের অবস্থাও ছিল অনেকটা এরকমই। রাজস্ব প্রশাসনে দেশের অভ্যন্তরে বড় জমিদারদের অবদান ছিল মূখ্য। এরা ছিলেন সরকার ও অধীনস্ত বিভিন্ন ধরনের ভূম্যধিকারীদের রাজস্ব আদায়ের যোগসূত্র। পদমর্যদা ও প্রতিপত্তি অনুযায়ী এরা 'রাজা', 'মহারাজা', 'মহারাজাধিরাজা' ইত্যাদি পদবী এবং রাজকীয় 'খিলাত' লাভ করতেন। জমিদারকূলের মধ্যে ক্ষুদে জমিদারদের সংখ্যা ছিল অনেক। তরফ, তপ্পা বা শুধু একটি গ্রামের ভূম্যধিকারী ছিলেন এ শ্রেণীভূক্ত। শাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় এদের ভূমিকা ছিল সীমিত।

ভূমি রাজস্ব আদায় এবং তা যথাযথভাবে পরিশোধ করা ছিল জমিদারদের প্রধান কর্তব্য। সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমিলও এ দায়িত্ব পালন করতেন। এজন্যই সম্ভবত রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতি আলোচনা করতে গিয়ে *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ* গ্রন্থ রচয়িতা সলিমুল্লাহ সবসময় জমিদার ও আমিল শব্দটি পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন। ভূমি রাজস্ব হারের পরিমাণ কত ছিলো তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে সার্বিক তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনায় ধারণা করা যায় যে, এর পরিমাণ গড় পড়তায় উৎপাদনের অর্ধাংশ ছিল। মুর্শিদকুলি খান থেকে শুরু করে তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরি নবাবদের আমলে নির্ধারিত ভূমি করের বাইরে 'আবওয়াব' নামক উপকর প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়।[৪০] জমিদারগণ 'সায়ের'[৪১] ও 'বাজে জমা'[৪২] নামে কর আদায়েও সরকারকে সাহায্য করতো। প্রশাসনের সুবিধার্থে জমিদারি বিশেষত বড় জমিদারি ক্রমানুসারে সরকার, পরগনা ও তরফে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি বিভাগীয় কাচারীতে নায়েবের অধীনে কর্মচারীরা রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা ও পাটোয়ারিরা জমি ও খাজনার হিসাব রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। অধীনস্থ এলাকার কৃষির সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গহণের দায়িত্বও জমিদারদের পালন করতে হতো।[৪৩]

---

[৪০] সম্রাট আকবরের সময় থেকে 'তুমার জমা'ই ছিল একমাত্র ভূমি রাজস্ব। কিন্তু মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকেই 'আবওয়াব' নামীয় অতিরিক্ত করারোপ শুরু হয়। 'আবওয়াব' হচ্ছে সম্রাটের অনুমোদিত নির্ধরিত রাজস্ব বহির্ভূত বাড়তি নতুন কর। মুর্শিদকুলি খানের প্রবর্তিত আবওয়াবকে বলা হতো 'আবওয়াব-ই- খাসনবিশী' এবং এ খাতে ধার্যকৃত করের পরিমাণ ছিল ২,৫৮,৮৫৭ টাকা।

[৪১] মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থায় ভূমিকর ব্যতিত অন্যসমস্ত শুল্ক ও করকে এক কথায় 'সায়ের' বলা হতো। নবাবী যুগে সায়ের রাষ্ট্রীয় আয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল। মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে সায়ের আদায়ের জন্য পৃথক বিভাগ গড়ে তোলা হয়। সায়েরের উৎস ছিল বাড়ি, দোকান, হাট-বাজার, গঞ্জ, মেলা, মাদক দ্রব্য, আমদানি-রপ্তানি দ্রব্য, গুদাম, কুঠি ও ফেরিঘাটের উপর। তাছাড়া লাইসেন্স ফি, সেতু শুল্ক প্রভৃতিও সায়েরের আওতাভূক্ত ছিল।

[৪২] সাময়িক বা অনিয়মানুগত যেমন- জরিমানা, উত্তরাধিকারের অভাবে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি, জমিদার পরিবারের বিয়ে ও পুজা-পার্বন উপলক্ষে রায়তদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ বাজে জমা নামে পরিচিত।

[৪৩] Shirin Akhter, *The Role of The Zaminders in Bengal 1707-1772,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka. 1982, p. 71

Dhaka University Institutional Repository

রাজস্ব আদায়ের সাথে সাথে জমিদারদের দেশের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা এবং প্রজাসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি আনয়নে সরকারের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হতো। মর্যাদা ও প্রয়োজন অনুসারে বড় বড় জমিদারগণ বিভিন্ন ধরনের সেনাবাহিনী প্রতি পালন করতো। সার্বক্ষণিক সামরিক বাহিনী প্রতিপালন অপেক্ষা প্রয়োজনে এ স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী প্রধানদের সামরিক কাজে ব্যবহার একটি মুঘল প্রাশাসনিক ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্য অনুসারের বাংলার নবাব সরকারও অধীনস্থ জমিদারদের সামরিক কাজে ব্যবহার করেন। স্বরাট জমিদার থেকে অভ্যন্তরীণ বড় বড় জমিদারগণ দেশের নিরাপত্তার জন্য বহিঃশক্তির আক্রমণ মোকাবেলা এবং বিদ্রোহ দমনে প্রয়োজনীয় সৈন্যদ্বারা সরকারকে সাহায্য করতো।[৪৪] উপরে এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

মুঘল প্রশাসনিক ঐতিহ্য অনুযায়ি অপরাধ দমন ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার সার্বিক দায়িত্ব ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকার ফৌজদারের উপর। তবে এ কাজে ফৌজদারকে সার্বিক সহযোগিতা করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এলাকার জমিদারদের বাধ্যবাধকতা ছিল। জমিদারদের অধীন কিছু সংখ্যক কর্মচারী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। তবে প্রধান প্রধান জমিদারদের সুবিন্যস্ত পুলিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল বলে সূত্রে উল্লেখ।[৪৫] পুলিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ একক ছিল থানা। প্রতিটি থানার অধীনে একাধিক চৌকি বা ফাঁড়ি থাকতো। থানদারদের অধীনে চৌকিদার তার অধীনস্থ পাইক ও পেয়াদাদের সাহায্যে অপরাধ দমন, আইন ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। নবাব সরকার যুগে বর্ধমানের জমিদারের বিশাল প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ১০০টি থানা ও ৪২২টি নিরাপত্তা চৌকি ছিল বলে জানা যায়।[৪৬] সরকারী ডাক চলাচল নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার দায়িত্বও জমিদারদের পালন করতে হতো। শুধু অপরাধ দমন ও শান্তি শৃঙ্খলা নয়, অভিজাত ভূ-স্বামী জমিদারদের দিউয়ানি ও ফৌজদারি বিচারিক দায়িত্বও পালন করতে হতো। জমিদারদের সদরে জেলখানা এবং দরবারে কাজী ও আইনজ্ঞ পণ্ডিতদের উপস্থিতি জমিদারদের বিচারিক ভূমিকার প্রমাণ।

উপরের বর্ণনায় নবাবী যুগের ভূ-অভিজাতদের আমলাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল। বস্তুত নবাবী প্রশাসনে ভূ-অভিজাতদের রাজস্ব বিষয়ক দায়িত্বের বাইরেও সামরিক- বেসামরিক অনেক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হতো। এর ফলে একদিকে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যয় লাঘব হতো, অন্যদিকে ভূ-অভিজাতদের শাসন কাঠমোর আওতায় এন তাদেরকে অনুগত্যাধীন ও জবাবদিহীতার মধ্যে রাখা সম্ভব হতো।

মুর্শিদকুলি খান বাংলায় যে নতুন প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তোলেন তার ছত্রছায়ায় রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে একটি ধনী বণিকগোষ্ঠী অভিজাত পদমর্যাদায় অভিসিক্ত হয়েছিল। পুরো নবাব সরকার যুগে এই শ্রেণীর পুরোধা হিসেবে জগৎশেঠ পরিবারের অবস্থান দেখা যায়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ পরিবারের উত্থান সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হয়েছে। আঠারো শতকের সূচনায় শেঠ পরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মানিকচাঁদ তদানিন্তন ঢাকায় বিশিষ্ট বণিক-ব্যবসায়ী সমাজ,

---

[৪৪] জমিদারদের সামরিক দায়িত্ব সম্পর্কে শিরিন আখতার তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। Shirin Akhter, *op. cit.* pp. 90-114

[৪৫] Shirin Akhter, *op. cit.*p.120

[৪৬] Bengal Revenue Consultations, July 8, 1784

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনের উর্ধতন মহল বিশেষ করে দিউয়ান মুর্শিদকুলি খানের সাথেও বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠেছিলেন। J. H. Little এর মতে, এ সময় থেকেই সম্ভবত মানিক চাঁদ মুর্শিদকুলি খানের অর্থনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে দিউয়ানি দপ্তর স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের পিছনেও তাঁর ভূমিকা ছিল বলে Little উল্লেখ করেছেন।[৪৭] তথ্যসুত্রে জানা যায় যে, মুর্শিদাবাদে দিউয়ানি দপ্তর স্থানান্তরিত হলে মানিকচাঁদও দিউয়ানের অনগামী হন। মুর্শিদাবাদে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মূখ্যত পারস্পরিক প্রয়োজন ও লাভালাভের ভিত্তিতে মুর্শিদকুলি খান এবং মানিকচাঁদের মধ্যে সম্পর্ক শুধু গভীরই হয়নি, ব্যবসা পরিচালনায় দিউয়ানি দপ্তরের আনুকূল্য লাভের ক্ষেত্রেও এক নতুন ধারার সূচনা হয়। শেঠদের বংশ বিবরণী মতে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাংলার প্রশাসনিক পদ বহাল রাখতে মানিকচাঁদ মুর্শিদকুলি খানকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।[৪৮] কৃতজ্ঞ মুর্শিদকুলি খান মানিকচাঁদের জন্য মুঘল দরবার থেকে সম্মানজনক 'নগরশেঠ' উপাধি নিশ্চিত করেন। শুধু তাই নয়, মুর্শিদকুলি খান মানিক চাঁদকে তাঁর অর্থ উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন বলেও জানা যায়। পরবর্তীতে এ পদটি তাঁর পরিবারের একচেটিয়া হয়ে গিয়োছল বলে সূত্রে উল্লেখ।[৪৯]

মানিকচাঁদ মারা যাওয়ার পর তাঁর ভাগনেয় ও দত্তকপুত্র ফতেহচাঁদের[৫০] উপর মহাজনী কারবারের দায়িত্ব বর্তায়। ফতেহচাঁদের পরিচালনায় শেঠ পরিবার ও মহাজনী প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত খ্যাতি অর্জিত হয়। ফতেহ চাঁদ তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কাজ দ্বারা নবাব মুর্শিদকুলি খানের সুদৃষ্টি, আস্থা ও নৈকট্য অর্জনেও সক্ষম হন। এ সময় দেশের মুদ্রা এবং রাজস্ব ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে শেঠ পরিবারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। পূবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আঠারো শতকে বাংলার পুঁজি বিকাশের সাথে মুদ্রা সংস্কার ছিল অতীব জরুরী। কিন্তু নবাব মুর্শিদকুলি জটিল মুদ্রা ব্যবস্থা সংস্কারের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না করে বুলিয়ান ক্রয় ও সরকারী টাকশাল থেকে মুদ্রা তৈরীর একচেটিয়া অধিকার ফতেহ চাঁদের উপর ন্যস্ত করেন। ফলে ১৭২১ সালের মধ্যেই ফতেহচাঁদ টাকশালের উপর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ফলে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার উপর থেকে সরকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে; টাকশাল তথা সমগ্র মুদ্রা ব্যবস্থার উপর ফতেহ চাঁদ পরিবারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, দিউয়ানি দপ্তরসহ অন্যবিধ আর্থিক লেন-দেন প্রক্রিয়া তরান্বিত করে সরকারের প্রয়োজন মেটাতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে সরকারী কোষাগার বা ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতো সরকারী অর্থ-ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু তা না করে নবাব সরকারকে তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার এসব বিষয়ে শেঠ পরিবারের আর্থিক সংস্থার উপরই নির্ভরশীল হতে দেখা যায়। পরিণামে অভ্যান্তরীণ ভূমি রাজস্বের জমা গ্রহণ, নবাবকে প্রয়োজনী অর্থসরবরাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ সংরক্ষণ, নবাবের পক্ষ থেকে দিল্লীতে সম্রাটের কাছে রাজস্ব প্রেরণ, সংকটকালীন অর্থ যোগান–এসব

---

[৪৭] J. H. Little, 'The House of Jagatseth' in *Bengal Past & Present*, vol. XX, (1920), p. 118

[৪৮] শ্রী নিখিল নাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, পৃ. ৮৩

[৪৯] হাবিবুর রহমান, *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৯০

[৫০] মানিকচাঁদের বোন ধনবাঈয়ের স্বামীর নাম ছিল নাম উদয় চাঁদ। তিনি ছিলেন বারাণসীর বিখ্যাত শেঠ। ফতেহ চাঁদ এ দম্পতির সন্তান। কোনো পুত্র সন্তান থাকায় মানিকচাঁদ তাঁর ভাগ্নে ফতেহচাঁদকে দত্তক নেন এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ন্যাস্ত করেন। শ্রী নিখিল নাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

কারবার মোটা অংকের লভ্যাংশের বিনিময়ে শেঠদের আর্থিক সংস্থার উপরই বর্তায়। এ ছাড়া বকেয়া রাজস্ব আদায়ে সুদের বিনিময়ে জমিদারদের বিশেষ সময়ে ঋণ প্রদান এবং ইংরেজ, ওলন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির সাথে সুদ বা বাটার বিনিময়ে আর্থিক লেন-দেনের কারবার যে শেঠদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দকে তরান্বিত করেছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

১৭১৫ সালে সম্রাট ফর্‌রুখসিয়ার ফতেহচাঁদকে 'শেঠ' উপাধি দেন। দিল্লীর মুঘল রাজদরবার থেকে তিনি 'জগৎশেঠ' উপাধি পান ১৭২৩ সালে। তাঁর পুত্র আনন্দচাঁদকেও 'শেঠ' উপাধি দেওয়া হয়।[৫১] সলিমুল্লাহ ও গোলাম হোসেন সলিম উভয়েই উল্লেখ করেছেন নবাব মুর্শিদকুলি খানের সুপারিশেই সম্রাট[৫২] ফতেহ চাঁদকে এ উপাধি এবং বাংলার ট্রেজারী বা রাজকোষাগারের কর্মাধ্যক্ষ্য নিয়োগ করেন।[৫৩] ফলে ফতেহচাঁদ মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন। J. H. Little এর বর্ণনায় তাঁকে নবাবের প্রধান উপদেষ্টা, দক্ষিণ হস্ত এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিষয়ে উপদেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৪] ইংরেজ কোম্পানির বিভিন্ন কনসালটেশনস থেকে জানা যায় যে, এ সময় নবাবের সাথে কোম্পানির কোন বিরোধ দেখা দিলে তার নিস্পত্তি এবং নবাবের উপর প্রভাব খাটানোর প্রয়োজন হলে কোম্পানি জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের দ্বারস্থ হতো।[৫৫] শুধু নবাব দরবারের নয় দিল্লীর সম্রাটের নিকটও যে ফতেহচাঁদের বেশ গুরুত্ব ছিল সে সম্পর্কেও সূত্রে নানা তথ্য রয়েছে।[৫৬]

বস্তুত সম্রাট, নবাব এবং জগৎশেঠের মধ্যকার এ পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় স্বার্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নবাব বাংলা থেকে দিল্লীতে সম্রাট দরবারে নিয়মিত রাজস্ব সরবরাহ করতো শেঠদের দিল্লীস্থ এজেন্সির মাধ্যমে। কাজেই এ রাজস্ব যোগানদাতা জগৎশেঠকে হাতে রাখার মধ্যে সম্রাটের নিয়মিত রাজস্ব প্রাপ্তির স্বার্থ নিহিত ছিল। মুদ্রা ও রাজস্বসহ প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জগৎশেঠ পরিবারের ভূমিকা ছাড়াও দিল্লী দরবারে তাঁর প্রভাবের বিষয় বিবেচনায় রেখে নবাব তাঁর সাথে সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে নিজের স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে নিজ পরিবার এবং আর্থিক সংগঠনের লাভালাভের জন্যই জগৎশেঠ সম্রাট ও নবাবের সাথে সম্পর্ক রেখে দুই দিক থেকেই সুবিধা নিতে প্রয়াসী ছিলেন।

শুধু শেঠ পরিবারই নয় মুর্শিদকুলি খানের সময় আরো কয়েকজন প্রভাবশালী অভিজাত বণিককে আর্থিক গণ্ডির বাইরে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও সক্রিয় দেখা যায়। এদের অন্যতম ছিলেন আর্মেনিয় বণিক খোজা ইসরাইল সরহাদ। সতেরো শতকের শেষ দিক থেকে তাঁকে বাংলার রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে বেশ সক্রিয় দেখা যায়। ১৭১৫ সালে ইংরেজদের 'সুরম্যান

---

[৫১] J. H. Little, *op. cit.*p.146

[৫২] সলিমুল্লাহ ও সলিম উভয়ের বর্ণনা মতে সম্রাট ফররুখসিয়ার এ উপাধি দিয়েছিলেন। কিন্তু শেঠ পরিবারের রক্ষিত ফরমান থেকে দেখা যায় এ উপাধিটি তিনি লাভ করেছিলেন সম্রাট মুহাম্মদ শাহের কাছ থেকে এবং ১৭২৩ সালে। শেষোক্ত মতটিই সঠিক।

[৫৩] Salimulla, *op. cit.*p.99; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৭৬

[৫৪] Consultations, 2 December, 1723; J. H. Little, *op. cit.*p.141

[৫৫] Consultations, 2 December, 1723; 25 October, 1726, 13 March, 1727

[৫৬] এ সব তথ্য কাহিনীর কিছু উল্লেখ করেছেন শ্রী নিখিল নাথ রায় তাঁর *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* গ্রন্থে। পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

মিশনের' সাথে খোজা ইসরাইলকে দিল্লী দরবারে যেতে দেখা যায়।[৫৭] সম্রাট ফররুখ শিয়ারের কাছ থেকে ১৭১৭ সালে ইংরেজদের ফরমান লাভে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে ধারণা করা হয়। নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় খোজা সরহদ ছাড়াও খোজা দৈলান, খোজা আবিদ এবং খোজা আরাতুন পেট্রোস প্রমুখ আমের্নিয় বণিকদের বিশেষ তৎপরতার কথা জানা যায়। খোজা সফফর নামক একজন বণিকের মধ্যস্থতায় অস্টেন্ডার কোম্পানি বালাসোরে কুঠি স্থাপনে নবাব সরকারের অনুমতি লাভ করে।[৫৮] মুর্শিদকুলি খানের সাথে অস্টেন্ডার কোম্পানির বিরোধ এবং যুদ্ধের সময় হুগলির বণিক খাজা মুহাম্মদ ফাজিল কাশ্মীরি ও তাঁর পুত্র খাজা কামালকে মধ্যস্থতার ভূমিকায় দেখা যায়।[৫৯] প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, এধরনের মধ্যস্থতা করা তাদের পক্ষেই সম্ভব ছিল সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর যাদের বিশেষ প্রভাব ছিল।

৬.২ নবাব সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের যুগে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা

উপর্যুক্ত আলোচনায় নবাব মুর্শিদকুলি খানের শাসনামলে রাষ্ট্র ও প্রশাসনে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকার বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে। মুর্শিদকুলি খানের উত্তরসূরী নবাব সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের সময় (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.) অভিজাত শ্রেণীর শক্তি-সংহতি আরো জোরদার হয়। মুর্শিদকুলি খানের কঠোর ও কুশলী শাসনে অভিজাত শ্রেণী রাজনীতিতে বিশেষ হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়নি, তবে সুজাউদ্দিন খানের সময় তাদের বিচরণক্ষেত্র প্রশাসনের গণ্ডিত অতিক্রম করে দেশের রাজনীতিতেও সক্রিয় হয়ে ওঠে। বস্তুত মুর্শিদকুলি খান পরবর্তীকালে মসনদ নিয়ে সুজাউদ্দিন খান ও পুত্র সরফরাজ খানের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সূত্রে রাজনীতিতে অভিজাত শ্রেণীর হস্তক্ষেপের সুবর্ণ সুযোগ ঘটে।

নবাব মুর্শিদকুলি খানের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় দৌহিত্র মির্যা আসাদউল্লাহ 'সরফরাজ খান'কে তাঁর ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। তবে নবাবের এ মনোনয়ন বাংলা-উড়িষ্যার নিজামত প্রত্যাশী তাঁর জামাতা (সফরাজখানের পিতা) উড়িষ্যার নায়েব নাজিম সুজাউদ্দিন খানের মনোপুত হয়নি। এ অবস্থায় উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে পিতা-পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিছু মতভিন্নতা থাকলেও এ দ্বন্দ্বের গতি-প্রকৃতি ও সমাধান সম্পর্কে সমসাময়িক ফারসি সূত্রসমূহে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।[৬০] এ সকল ত্যসূত্রসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে পিতা-পুত্রের মধ্যকার এ বিরোধকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বাংলার রাজনীতিতে কয়েকজন অভিজাত অমাত্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ করে নেন। এদের মধ্যে মির্যা মুহাম্মদ আলী (পরবর্তীতে আলিবর্দী খান নামে পরিচিত) ও তাঁর ভাই হাজী আহমদ ছিলেন অন্যতম। পিতা পুত্রের মধ্যকার এ বিরোধে মুর্শিদকুলি খানের স্ত্রী নাসিরা বেগম এবং সরফরাজ খানের মাতা (সুজাউদ্দিন খানের স্ত্রী) জিনাত-উন-নিসাকেও যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন* গ্রন্থের ভাষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়

---

[৫৭] Mesrovb J. Seth, 'Khojah Petrus: The Armenian Merchant-Diplomat in Calcutta' in *Bengal Past & Present*, May, 1927, pp. 111-112

[৫৮] আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ. ২০৫

[৫৯] আবদুল করিম, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, পৃ.২০৩

[৬০] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩; করম আলী খান, *মোজাফফরনামা*, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মো. জাকারিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১১৯৮; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৮৪; Salimulla, *op. cit.*pp.125-126; ইউসুফ আলী খান, *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ-ই-মহাবতজঙ্গী*, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মো. জাকারিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

যে, এ বিরোধে সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের প্রধান সহায়ক শক্তি ছিলেন আলিবর্দী খান ও হাজী আহমদ। তাদের মন্ত্রণা ও পরামর্শে সুজাউদ্দিন বাংলা ও উড়িষ্যার নিজামত ও দিউয়ানি সানন্দ লাভের জন্য দিল্লী দরবারেও আবেদন করেছিলেন।[৬১] যা'হোক সুজাউদ্দিন খানের সিংহাসন দাবির ফলে পিতা-পুত্র পরস্পর মুখোমুখী হলে মাতামহী ও মাতার হস্তক্ষেপে সরফরাজ খান প্রতিযোগিতার ময়দান থেকে সড়ে দাঁড়ান। এর ফলে একটি অনিবার্য যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয় এবং সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহন করেন। তাঁর মসনদে লাভের ব্যাপারে মির্যা মুহাম্মদ আলী ও তাঁর ভাই হাজী আহমদের ভূমিকা বিষয়ে ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও উড়িষ্যা প্রশাসনের পদস্থ অমাত্য আলম চাঁদসহ আরো কিছু সভাসদেরও যে ভূমিকা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে অবস্থা দৃষ্টে তা অনুমান করা যায়। সুজাউদ্দিন খানের মসনদ প্রাপ্তির ব্যাপারে জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের ভূমিকা বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে J. H. Little পরিবেশিত তথ্যও স্পষ্ট না হলেও জগৎশেঠ যে সুজাউদ্দিনের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন Little তা স্পষ্ট করেই বলেছেন।[৬২] পরবর্তীতে সুজাউদ্দিনের প্রশাসনে জগৎশেঠের তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান দৃষ্টে মনে হয় যে, এ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে জগৎশেঠের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল।

মসনদে আরোহনের পর নবাব সুজাউদ্দিন খান নবাব মুর্শিদকুলি খানের প্রবর্তিত প্রশাসনিক রীতি ঐতিহ্যশাসনযন্ত্রের পূনর্গঠন করেন। আত্নীয়, পরামর্শক ও বিশ্বাসভাজনদের রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি পুত্র সরফরাজ খানকে বাংলার দিউয়ানি পদে বহাল রাখেন। অপর পুত্র তকী খান লাভ করেন উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদ।[৬৩] রাজ্যের সার্বিক প্রশাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তিন সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করা হয়। একে প্রশাসনে সুজাউদ্দিন খানের অভিনব সংযোজন ও অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রগতিশীল ও সুপরিকল্পিত সংস্কার হিসেবে গণ্য করা হয়।[৬৪] সিংহাসন দখলে অন্যতম প্রধান সহযোগী হাজী আহমদকে এ কাউন্সিলের সদস্য পদ দেয়া হয়। এছাড়াও তাঁকে মুর্শিদাবাদের আবগারি শুল্ক বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।[৬৫] কাউন্সিলের অন্য দুজন সদস্য ছিলেন আলম চাঁদ এবং জগৎশেঠ ফতেহচাঁদ। সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ির মতে, কাউন্সিল সদস্যগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা পেয়েছিলেন।[৬৬] উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য পদ ছাড়াও আলম চাঁদ সরফরাজের সহকারী হিসেব বাংলার নায়েব দিউয়ান পদ এবং 'রায় রায়ান' উপাধি লাভ করেন। রাজ কর্মচারীদের মধ্যে আলম চাঁদই প্রথম এই সম্মানজনক উপাধিটি পেয়েছিলেন বলে সূত্রে উল্লেখ।[৬৭] ইউসুফ আলী খানের বর্ণনা মতে, নবাব তাঁর প্রিয়ভাজন মির্যা মুহাম্মদ আলীকে আকবর নগরের (রাজমহলের) ফৌজদার ও

---

[৬১] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

[৬২] J. H. Little, *op. cit.*p.146

[৬৩] তকী খান ছিলেন সরফরাজ খানের বৈমাত্রেয় ভাই। মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে তিনি বালাসোরের ফৌজদার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সুজাউদ্দিন খান মসনদ দখলের উদ্দেশ্যে উড়িষ্যা ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে যাত্রার পূর্বে তাঁকে উড়িষ্যার ভারপ্রাপ্ত নায়েব নাজিম নিয়োগ করে আসেন। এক্ষণে তাঁকে বালাসোরের ফৌজদারি ছাড়াও উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব দেয়া হয়।

[৬৪] আবদুল করিম, 'নবাবী আমলে রাজনীতির ধারা' *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮৩

[৬৫] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮

[৬৬] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬

[৬৭] শ্রী নিখিল নাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* , পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

'আলিবর্দী খান' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।[৬৮] *মোজাফফরনামার* তথ্য অনুযায়ী আলিবর্দী খান চার বছর রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন। এ সময় তিনি রাজমহলের চারপাশের উচ্ছৃঙ্খল ও লুটেরা পাহাড়ীদের বশীভূত করে জনজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।[৬৯] সিংহাসন দখলে সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ শুধু হাজী আহমদ ও আলিবর্দী খানকেই শুধু উচ্চ রাজপদে নিয়োগ দেয়া হয়নি যথাক্রমে তাদের তিনপুত্র ও জামাতাকেও উচ্চ রাজপদাভিসিক্ত করা হয়েছিল। জ্যেষ্ঠ মুহাম্মদ রেজা খানকে (পরবর্তীতে নওয়াজিশ মুহাম্মদ নামে পরিচিত) সেনা বাহিনীর বখশি পদে, কনিষ্ঠ জৈনউদ্দিন খানকে রাজমহলের ফৌজদার এবং আকা মুহাম্মদ খানকে (পরবর্তীতে সাঈদ আহমদ খান নামে পরিচিত) রংপুরের নায়েব ফৌজদার পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।[৭০]

নবাব সুজাউদ্দিন খানের জামাতা মির্যা লুৎফুল্লাহ (দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান) ছিলেন জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম। নায়েব নাজিম হিসেবে তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে চট্রগ্রাম পুনরাধিকার এবং ত্রিপুরা জয়। সুবাদার শায়েস্তা খানের আমলেই চট্রগ্রাম মুঘল দখলে এসেছিল। আজাদ আল হোসাইনীর বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে, নবাব সুজাউদ্দিন খানের শাসনামলের ফৌজদার মুহাম্মদ বাকের[৭১] আরকানীদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের নির্দেশে তাঁর সহকারী মীর হাবিব ইসলামবাদ পুনরাধিকার করেন।[৭২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পারস্য বংশোদ্ভুত মীর হাবিব একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের সহকারী হিসেবে জাহাঙ্গীরনগরের প্রশাসনিক সুবন্দোবস্ত করে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর পরামর্শে দ্বিতীয় মুর্শিকুলি খান জাহাঙ্গীরনগরে সওদা-ই-খাস নামক একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রচলন করেন এবং এ থেকে তাঁরা উভয়েই প্রচুর অর্থের মালিক হন বলে সূত্রে উল্লেখ। মীর হাবিব জামালপুর পরগনার প্রভাবশালী জমিদার নূরুল্লাহ খানকে হত্যা করে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি গ্রাস করে বৈভবের মালিক এবং একজন প্রভাবশালী অভিজাত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭২৯ সালে মীর হাবিব নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের নির্দেশে ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেন।[৭৩] এ ব্যাপরে তাঁকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন পাট পশারের জমিদার আগা সাদেক। মুহাম্মদ জান, মর্দান আলী খান, সৈয়দ ফতেহ রফিক, শেখ মোবারক মুহিউদ্দিন ও ওয়ালি বেগ প্রমুখ বীর সেনাপতিগণও এ অভিযানে অংশ

---

[৬৮] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮। আলিবর্দী খানের রাজমহলের ফৌজদার নিয়োগের বিষয়ে *তারিখ-ই বাঙ্গালা*, *মোজাফফরনামা* এবং *রিয়াজ-উস-সালাতিনের* বর্ণনায় ঐক্যমত দেখা যায়। কিন্তু সিয়ার-উল-মুতাখখিরিনের বর্ণনা অনুযায়ী এ পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন হাজী আহমদের কনিষ্ঠ পুত্র ও আলিবর্দী খানের জামাতা জৈনউদ্দিন খান। সিয়ারে আলিবর্দী খানকে নবাবের অন্যতম পরামর্শক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ.৫- ৬। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে মনে হয় জৈনউদ্দিন খান রাজমহলের ফৌজদার হয়েছিলেন, তবে সেটা সম্ভবত কয়েক বছর পর।

[৬৯] করম আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪

[৭০] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬। ইউসুফ আলীর বর্ণনা মতে মুহাম্মদ রেজা কে আবগারি শুল্ক বিভাগের সচিব পদে এবং সলিমের বর্ণনামতে, মুর্শিদাবাদের দারোগা পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮

[৭১] আ কা মো. যাকারিয়ার মতে, এই বাকের তখন চট্রগ্রামের ফৌজদার ছিলেন। তাঁর মতে, এই ব্যক্তি এবং নবাবী আমলের বিখ্যাত বুজুর্গ উমেদপুরের জমিদার আগা বাকের একই ব্যক্তি। বরিশালের সাবেক নাম বাকেরগঞ্জ এই ব্যক্তির নামেই হয়েছিল বলে আ কা মো যাকারিয়া মনে করেন। আজাদ-আল- হোসাইনি, *নওবহর-ই-মুর্শিদকুলি খানি*, বাংলা অনুবাদ, আ কা মো যাকারিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.১৩৮

[৭২]আজাদ-আল- হোসাইনি, *নওবহর-ই-মুর্শিদকুলি খানি*, পৃ. ১৩৮

[৭৩] ত্রিপুরা আক্রমণের বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য আজাদ -আল- হোসাইনির *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলি খানি* গ্রন্থ। এই ঘটনার বিবরণীর জন্যই পণ্ডিত মহলে এ ক্ষুদ্র গ্রন্থটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃতি পেয়েছে। কেননা এ বিষয়ে এ গ্রন্থেই সর্বপ্রথম বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া এ ঘটনার বিশদ বিবরণ একমাত্র এ গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েছিলেন। নবাবী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে রাজ ধর্মমানিক্য পলায়ন করলে ত্রিপুরা নবাবী শাসনের অধীনে আসে। নবাব সুজাউদ্দিন খান নব বিজিত ত্রিপুরা নামকরণ করেন 'রওশনাবাদ' (আলোর ভূমি)। বিজয়ী দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানকে 'রুস্তম জঙ্গ' এবং মীর হাবিবকে 'খাঁ' উপাধি দেওয়া হয়।[৭৪] ধর্মমানিক্যের দুর সম্পর্কীয় ভ্রাতুস্পুত্র জগৎরাম ঠাকুরকে 'জগৎমানিক্য' উপাধি দিয়ে ত্রিপুরার রাজা বলে ঘোষণা করা হয়। তাঁর উপর নবাব সরকারের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য আগা সাদিককে সেখানকার ফৌজদার পদে নিয়োগ দেয়া হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের রাজত্বকালে অভিজাতবর্গ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এ ক্ষেত্রে তারা কখনো গোষ্ঠী স্বার্থ, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থ দ্বারা তাড়িত হন। এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় নবাববের দুই পুত্র সরফরাজ খান ও তকী খানের মধ্যকার বিরোধের ঘটনায়। এরা দুজন ছিলেন বৈমাত্রেয় ভাই। প্রথমজন দিউয়ান হিসেবে পিতার সাথে রাজধানী মুর্শিদাবাদে এবং দ্বিতীয়জন নায়েব নাজিম হিসেবে উড়িষ্যায় কর্মরত ছিলেন। তকী খান ছিলেন একজন সাহসী ও রণনিপুন বীর এবং সেনাবাহিনী ও লোকসমাজে তাঁর বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। নবাবের কৃপাদৃষ্টিতে ইতোমধ্যে মুর্শিদাবাদ প্রশাসনে আলিবর্দী খান ও তাঁর ভাই হাজী আহমদের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ তাদেরকে ভীষণ রকমের উচ্চবিলাসী করে তুলেছিল। নবাব সরকারের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ এমনকি আলিবর্দী খানের মধ্যে ভীবষ্যতে নবাবী মসনদ দখলের স্বপ্নও তখন জেগে ওঠে বলে ধারণা হয়। তবে তাদের উচ্চাশা পুরণের প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন নবাবপুত্র সরফরাজ খান। দিউয়ানি দপ্তরের দায়িত্ব পালনে তারা নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করায় ইতোমধ্যেই সরফরাজ খানের সাথে হাজী আহমদ ও আলিবর্দী খানের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কথা সমকালিন সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আত্মস্বার্থ সাধনে সচেষ্ট প্রভাবশালী অভিজাত আলিবর্দী খান ও হাজী আহমদ নিজেদের উচ্চবিলাস চরিতার্থ করার মানসে নবাবের দুই পুত্রেরই বিনাশ সাধনের একটি নীলনকশা তৈরি করেন। এসময় তকী খান পিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য উড়িষ্যা থেকে মুর্শিদাবাদে আসলে ধুর্ত হাজী আহমদ দুই ভাইকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে একটি যুদ্ধাবস্থা তৈরি করেন। অবশ্য নবাব সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের মধ্যস্থতা ও প্রচেষ্টায় নবাবী বাংলার ইতিহাস তখনকার মতো ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের কলঙ্ক থেকে রেহাই পায়।

উপরে বর্ণিত ষড়যন্ত্রের ঘটনায় হাজী আহমদ ও আলিবর্দী খানের সাথে সুজাউদ্দিন খানের উপদেষ্টা কাউন্সিলের অপর দুই সদস্য রায় রায়ান আলম চাঁদ এবং জগৎশেঠ যুক্ত ছিলেন বলে মুন্শী সলিমুল্লাহ ও গোলাম হোসেন সলিমের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।[৭৫] সে যা'হোক এ ঘটনায় দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত সুজাউদ্দিন খান যে সকল প্রভাবশালী অভিজাতদের তাঁর কাউন্সিল সদস্য নিয়োগ করেছিলেন, যাদের উপর আস্থা স্থাপনকরে রাজ্যের শাসনভার অর্পন করেছিলেন, তারা কেউই তাঁর নিজের বা তাঁর পরিবারের সুহৃদ ছিলেন না। উচ্চবিলাসী এ স্বাথান্বেষী চক্র নবাবের আস্থা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের ক্ষমতার বিস্তার ঘটাতে তৎপর ছিলেন। তাদের পরবর্তী কার্যক্রমে যা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ যেন সমকালে দিল্লী দরবারের অভিজাতদের অবস্থারই একটি চিত্র। দ্বিতীয়ত এ ঘটনার মধ্য দিয়ে নবাবের উপর তাঁর স্ত্রী জিনাত-উন-নিসার প্রভাবের বিষয়টিও পরিলক্ষিত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে

---

[৭৪] গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯১

[৭৫] Salimulla, *op. cit.*p.139; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

যে, একসময় স্বামীর সাথে বনিবনা না থাকলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি যে নবাব তথা নবাব সরকারে বেশ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন এ ঘটনা তাঁর প্রমাণ। এসময় ব্যক্তিগত এবং অনেক রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে জিনাত-উন-নিসার মতামত উপেক্ষা করা নবাবের পক্ষে সম্ভব হতো না। দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা অবসান ঘটলে তকী খান পিতার সাথে সাক্ষাতের জন্য মুর্শিদাবাদ আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তবে স্ত্রী জিনাত-উন-নিসা অসন্তুষ্ট হতে পারেন এ আশঙ্কায় সুজাউদ্দিন খান তকী খানকে সাক্ষাতের অনুমতি দেননি। শুধু ঘটনাই নয়, বিহারে নায়েব নাজিম নিয়োগের ক্ষেত্রেও জিনাত-উন-নিসার ভূমিকা নবাবী প্রশাসনে তাঁর প্রভাবেরই প্রমাণ। সুত্র মতে, এতদিন বিহার একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। তবে বিহারের সুবাদার ফখরুদ্দৌলার বদলির পর সম্রাট মুহাম্মদ শাহ বিহারকে বাংলার সাথে যুক্ত করে এর শাসনভার নবাব সুজাউদ্দিনের উপর অর্পন করেন। এর ফলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা নবাবী শাসনাধীনে আসে। ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে বিহার অযোধ্যা, এলাহাবাদ, বেরার ও আওরঙ্গবাদ প্রভৃতি সুবাসমূহের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। ফলে নবাব এসব সুবার সাথে সংযোগ রক্ষাসহ বিহার প্রদেশে সুশাসনের জন্য নায়েব নাজিম হিসেবে একজন যোগ্য প্রশাসক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পছন্দের তালিকায় ছিল পুত্র সরফরাজ খান অথবা তকী খান। কিন্তু জিনাত-উন-নিসার বিরোধিতার কারণে নবাব তাদের কাউকে সেখানে নিয়োগ দিতে পারেননি। জিনাত-উন-নিসার তাঁর নিজ পুত্র সরফরাজ খানকে রাজধানী থেকে দুরবর্তী বিহারে পাঠাতে যেমন সম্মত হননি, তেমনি এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে তকী খান নিয়োগ পান তাও চাননি। শেষ পর্যন্ত নবাব এ পদে উপদেষ্টা কাউন্সিলের পরামর্শে তাঁর প্রিয়ভাজন আলিবর্দী খানকে বিহারের নায়েব নাজিম নিয়োগ করেন।[৭৬] *তারিখ-ই-বাঙালা-ই-মহাবতজঙ্গী* এর বর্ণনা মতে, আলিবর্দী খানকে এ পদ প্রদানের ব্যাপারে জিনাত-উন-নিসার ভূমিকা ছিল।[৭৭] নায়েব নাজিম হিসেবে শপথ ষেওয়ার পুর্বেই আলিবর্দী খানের জিনাত-উন-নিসার সাথে সাক্ষত এবং তাঁর কাছ থেকে খিলাত গ্রহণের ঘটনায় পূর্বোক্ত দাবির সমর্থন পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, জিনাত-উন-নিসা মুর্শিদকুলি খানের একমাত্র এবং প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী হিসেবে সাম্রাজ্যের অধিশ্বরীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর স্বামীকে রাজ্যের অধিশ্বর হিসেবে বিবেচনা না করে অধীশ্বরীর স্বামী হিসেবে গণ্য করতে চেয়েছিলেন।[৭৮] তাঁর লক্ষ্য যে কিছুটা হলেও বাস্তবায়িত হয়েছিল, তা বলা বাহুল্য।

বিহারের নায়েব নাজিম পদ লাভকে আলিবর্দী খান বাংলার রাজনীতিতে তাঁর উত্থানের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সিড়ি হিসেবে ব্যবহারে সফল হয়েছিলেন। এ পদে নিয়োগ আমাত্য অভিজাত হিসেবে তাঁকে প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে উন্নীত করে। নবাব তাঁকে 'বাহাদুর' ও 'মহাবতজঙ্গ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন এবং তাঁর জন্য পাঁচ হাজারী মনসব নিশ্চিত করা হয়। প্রশাসক হিসেবে আলিবর্দী খান ছিলেন বিজ্ঞ ও দুরদর্শী। পূর্ববর্তী সুবাদার ফখরুদ্দৌলাহর শাসন শৈথিল্যের কারণে বিহারের সর্বত্র এক বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান ছিল। আলিবর্দী খান প্রথমে পাটনার নগরশাসনে শৃঙ্খলা

[৭৬] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০

[৭৭] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

[৭৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

বিধানের মাধ্যমে নগরবাসীর হৃদয় জয় করেন। অতঃপর তিনি সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন এবং এ সেনাবাহিনীর সাহায্যে বানাজারা নামক লুঠেরা গোষ্ঠীকে পরাভূত করে বিহারের জননিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। আলিবর্দী খান বিহারের অধীনস্থ ভোজপুরের জমিদার সুন্দর সিংহ ও টিকারির নামদার খান এবং বেতিয়া, বাহওয়াসহ অন্যান্য অঞ্চলের অবাধ্য ও বিদ্রোহী জমিদারদের দমনপূর্বক তাদের কাছ থেকে প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত এবং নিয়মিত রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন।[৭৯]

পুনশ্চ উল্লেখ্য বিহারের নায়েব নাজিম পদ লাভ আলিবর্দী খানের সৌভাগ্য রবিকে মধ্য গগণে নিয়ে গিয়েছিল। নায়েব নাজিম হিসেবে শাসন দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তিনি কেবল তাঁর প্রতি নবাবের আস্থাই বৃদ্ধি করেননি, বরং কৌশলে প্রভূত ব্যক্তিগত আর্থিক উন্নতি অর্জন করেন। বিহারে থাকা অবস্থায়ই তিনি রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিপত্তিও নিশ্চিত করেন। বস্তুত বিহারে ক্ষমতার একটি দৃঢ়ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পরপরই আলিবর্দী খান বাংলার মসনদ অধিকারের উচ্চাশা পুরণের পথে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে শুরু করেন। এ ব্যাপারে তাঁর ভাই হাজী আহমদ তাঁকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন।

১৭৩৪ সালে নবাব পুত্র তকী খান মৃত্যু বরণ করেন। এ অবস্থায় নবাব সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান তাঁর জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন। এর ফলে জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিমের যে পদটি শূণ্য হয় নবাব এ পদে তাঁর পুত্র সরফরাজ খানকে নিয়োগ দেন। মীর হাবিব এবং যশোবন্ত রায় যথাক্রমে উড়িষ্যা ও জাহাঙ্গীরনগরের দিউয়ান পদ লাভ করেন। নিজ নিজ প্রদেশে এই দুই দিউয়ানের কর্তব্যনিষ্ঠা ইতিহাসবিদদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সূত্র মতে মীর হাবিব উড়িষ্যার বিদ্রোহী জমিদারদের দমন এবং তাদের নবাব সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করেছিলেন। ফলে সেখানকার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়। তদুপরি মীর হাবিব কঠোরভাবে প্রশাসনের ব্যয় সংকুচ করায় উড়িষ্যায় দৃশ্যমান উন্নতি ঘটে। অন্যদিকে দিউয়ান যশোবন্ত রায়ই প্রকৃতপ্রস্তাবে নায়েব নাজিম অনুপস্থিত থাকায় জাহাঙ্গীরনগরের রাজস্ব ও প্রশাসন ব্যবস্থার সমস্ত বিষয় তত্ত্বাবধান করতেন। প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং রাজ্যের কল্যাণের জন্য যশোবন্ত রায় তাঁর অভিজ্ঞতা ও কর্মনিষ্ঠাকে কাজে লাগান। তিনি তাঁর পূর্বসূরি দিউয়ান মীর হাবিব কর্তৃক প্রবর্তিত সওদা-ই-খাস ও শস্যের উপর আরোপিত অতিরিক্ত করসহ শোষণ ও নিবর্তনমূলক যাবতীয় কর বিলুপ্ত করেন। যশোবন্ত রায়ের সুবন্দোবস্তের ফলে অনেক অনাবাদী ভূমি চাষের আওতায় আসে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শস্যাদি সুলভ মুল্য হওয়ায় সুবাদার শায়েস্তা খান কর্তৃক বন্ধ করে দেয়া ঢাকা দূর্গের পশ্চিম দ্বার উন্মুক্ত করা সম্ভব হয় বলে গোলাম হোসেন সলিম উল্লেখ করেছেন।[৮০]

বার্ধক্যজনিত কারণে নবাব সুজাউদ্দিন খান তাঁর রাজত্বকালের শেষ দিকে পুত্র সরফরাজ খানের উপর রাজ্য শাসনের দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। এই সুযোগে সরফরাজ খান পিতার জীবদ্দশাতেই স্বাধীনভাবে অনেক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত

---

[৭৯] গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৮

[৮০] সূত্র মতে ঢাকা থেকে দিল্লীতে ফিরে যাওয়ার প্রক্কালে সুবাদার শায়েস্তা খান দূর্গের পশ্চিম দ্বার বন্ধ করে দিয়ে একটি প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ করেছিলেন যে, যার সময়ে খাদ্য শস্য তাঁর সময়ের অপেক্ষা সুলভে পাওয়া যাবে, তিনি এ দ্বারোদ্ঘাটন করতে পারবেন। তদবধি এ দ্বারটি বন্ধ ছিল। গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

নিতে শুরু করেন। জাহাঙ্গীরনগরের প্রশাসনে তাঁর সহকারী হিসেবে কর্মরত গালিব আলী খানকে প্রত্যাহার করে ভাগ্নে মুরাদ আলি খানকে সে পদে নিয়োগ দেন।[৮১] মুরাদ আলী খানের আনুকুল্যে রাজবল্লভ নামক এক বৈদ্য হিন্দু প্রথমে নাওয়ারার পেশকার পদ লাভ করেন। এরপর রাজবল্লভ ইতিহাসের এক আলোচিত চরিত্রে পরিণত হন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিনি 'মহারাজা' খেতাবে ভূষিত হয়ে বুজুর্গ-উমেদপুরের জমিদারি স্বত্ব ধারণপূর্বক 'রাজনগর এস্টেট' প্রতিষ্ঠা করেন।[৮২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুরাদ আলী খান সুশাসক ছিলেন না। তাঁর শাসনাধীনে জাহাঙ্গীরনগর শাসন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। বিরক্ত হয়ে যশোবন্ত রায় দিউয়ানি পদ ত্যাগ করলে পরিস্থিতি আরো অবনতি ঘটে।

নবাব সুজাউদ্দিন খানের শাসনামলে দু'একটি ব্যতিক্রম ঘটনা ছাড়া নবাব সরকারের সাথে ভূ-অভিজাতদের সম্পর্ক ভাল ছিল। জমিদারদের প্রতি সদাচরণ করতেন বলেই তারা নবাবের প্রতি অনুগত থাকেন এবং তাদের উপর অর্পিত রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। তাঁর সময়েই নদীয়ার মতো বৃহৎ ও প্রাচীন জমিদারির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। তদুপরি এসময় একাধিক নতুন জমিদারিরও উদ্ভব হয়। সমসাময়িক সূত্রসমূহে জমিদারদের প্রতি তাঁর নমনীয় ও সদাচারণের প্রশংসা করা হয়েছে। আধুনিক গবেষকগণ মনে করেন যে, জমিদারদের প্রতি এ নমনীয় আচরণের পেছনে নবাবের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আপোসরফা এবং তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবার একটি কৌশলী মস্তিস্ক সক্রিয় ছিল। উপেদষ্টা কাউন্সিল সদস্য রায় রায়ান আলম চাঁদ এবং জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের পরামর্শক্রমেই তিনি এরূপ নীতি গ্রহণ করেছিলেন বলে সূত্রে ইঙ্গিত বর্তমান। বস্তুত নবাব সুজাউদ্দিন খানের এ নীতির পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল বর্ধিত রাজস্ব লাভের পথ সুগম করা এবং বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধি তরান্বিতকরা।[৮৩] তবে এতদসত্ত্বেও কেউ কেউ যে বিদ্রোহ করেননি, এমনটা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিনাজপুরের জমিদার মহারাজা রামনাথ এবং কোচবিহারের রাজা উপেন্দ্রনারায়নের কথা বলা যেতে পারে। এ দুজন জমিদার নবাব সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে রংপুরের ফৌজদার মির্যা সাঈদ আহমদ তাদের দমন করে নবাবের প্রতি আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন।[৮৪] সমকালে বাংলার অন্যতম প্রভাবশালী ভূ-অভিজাত বীরভূমের জমিদার বদিউজ্জামান বার্ষিক রাজস্ব এবং আবাদি ভূমির খাজনা প্রদানে বিরত থেকে নবাবের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করলে উপদেষ্টা কাউন্সিলের পরামর্শে নবাব পুত্র সরফরাজ খানকে বদিউজ্জমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেন। সরফরাজ খান সাফল্যের তাঁকে দমন করেন। বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদ বীরভূম জমিদারের বকেয়া রাজস্ব পরিশোধে জামিনদার হলে বদিউজ্জমানকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৮৫] এ কয়টি ঘটনা ছাড়া উল্লেখ করার মতো আর কোনো বিরোধের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

নবাব সুজা উদ্দিন খানের সময় বণিক অভিজাতদের প্রতিপত্তি যে আরো বেড়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বণিক অভিজাতদের প্রধান জগৎশেঠ নবাবের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হয়ে রীতিমতো প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণে ভূমিকা

---

[৮১] মুরাদ আলী খান ছিলেন সরফরাজ খানের বোন নাফিসা বেগমের পুত্র। তাঁর পিতা সৈয়দ রাজি খান মুর্শিদকুলি খানের সময় বাংলার দিউয়ান ছিলেন।

[৮২] *District Gazrtteer of India,* Vol. VI, p. 167

[৮৩] এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত দ্রষ্টব্য হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১০৫-১০৮

[৮৪] Charles Stewart, *History of Bengal,* Black Perry and Co. London, 1813, p.268

[৮৫] গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৩; হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১০৫

Dhaka University Institutional Repository

রাখার মতো অবস্থা তৈরি করে নিয়েছিলেন। সমকালীন রাজনীতিতেও তাঁর প্রায় সরব উপস্থিতি নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময় থেকেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠেছিল। অপর অভিজাত বণিক উমিচাঁদের উত্থান ও তৎপরতার সূত্রপাতও নবাব সুজাউদ্দিন খানের আমলেই হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, নবাব মুর্শিদকুলি খানের মনোনীত উত্তরাধিকারী সরফরাজ খানের স্থলে পিতা হয়েও সুজাউদ্দিন খান আগেভাগে মসনদ দখলের উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে অভিজাতবর্গের উপর বিশেষ নির্ভরশীল হওয়ায় মসনদ লাভের পর সহযোগিতাকারী অভিজাতবর্গকে উপদেষ্টার পদদানসহ তাদের আত্মীয়-পরিজন এবং অনুগতদের উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দানে অনেকটা বাধ্য হন। শুধু তাই নয়, ইন্দ্রিয়াসক্ত নবাব নিজের আরাম-আয়েস এবং ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অভিজাত বিশেষ করে তাঁর উপদেষ্টা কাউন্সিলের উপর ছেড়ে দেন। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে একান্তভাবে জড়িত কিছু সংখ্যক অভিজাত ব্যক্তির আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়। সুজাউদ্দিন খানের রাজত্বে শেষভাগে তাঁর বাধ্যক্যের সুযোগে এ অভিজাত চক্র নবাবকে তাদের ক্রীড়ানকে পরিণত করে প্রশাসনযন্ত্র কে নিজেদের বলয়ে নিয়ে নেয়। রাষ্ট্র ও প্রশাসনযন্ত্রে এরূপ অবস্থান এ অভিজাত শ্রেণীর মনে আরো অধিক মাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম ও আত্মস্বার্থের সীমাহীন চেতনা বৃদ্ধি করে। ফলে তারা রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নিজেদের অনুকুলে নেয়ার প্রয়াস চালায়। জীবনের অন্তিমলগ্নে সুজাউদ্দিন খানকে দিয়ে তাঁর পুত্র ও পরবর্তী উত্তরাধিকারী সরফরাজ খানকেও তাদের প্রভাবধীনে রাখার ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করে নেয়।

৬.৩ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা: নবাব সরফরাজ খানের আমল

নবাব সুজাউদ্দিন খানের উত্তরসূরী হিসেবে সরফরাজ খান 'আলা-উদ-দৌলাহ হায়দর জঙ' ১৭৩৯ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে আরোহন করেন। সরফরাজ খান ছিলেন একজন দুর্বলচিত্ত, অনভিজ্ঞতা ও অদুরদর্শি শাসক। সিংহাসন দখলে তাঁকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবেলা করতে হয়নি সত্য, তবে তাঁর পিতার সময়ই সরকার ও রাষ্ট্রে প্রভাবশালী হিসেবে যে সব অভিজাত ব্যক্তি নিজেদের অবস্থান সুনিশ্চিত করে নিয়েছিলেন এখন তারাই নবাবের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। নবাবের অনভিজ্ঞতা ও অদুরদর্শিতার কারণে প্রথম থেকেই প্রভাবশালী অমাত্য ও অন্যান্য অভিজাতবর্গ তাঁর প্রতি একরকমের উপেক্ষাই প্রদর্শন করতে শুরু করেন। এসব প্রভাবশালী অভিজাতদের মনে দুর্বলচেতা সরফরাজ খানের স্থলে নিজেদের মধ্য থেকে তাদের স্বার্থানুকূল কোন একজনকে সিংহাসনে বসানোর উচ্চাশাও কাজ করছিল বলে অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। আর এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আলিবর্দী খান ছিলেন তাদের প্রধান ও একমাত্র পছন্দ। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুজাউদ্দিন খানের রাজত্বকালের শেষ দিকে এবং সরফরাজ খানের ক্ষমতালাভের পূর্বভাগে স্বার্থন্বেষী অভিজাতচক্র সরফরাজ খান ও মুহাম্মদ তকী খানের মধ্যে একটি যুদ্ধাবস্থা তৈরি করেছিলেন। নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থসিদ্ধির লালসা চরিতার্থের পথ নিস্কন্টক করার জন্যই তারা এ কাজটি করেছিলেন বলে মনে হয়। বস্তুত তাদের লক্ষ্য ছিল রক্তক্ষয়ী হানাহানিতে তাঁরা সরফরাজ খান বা তকী খানের মধ্যে যে কোন একজন ধ্বংস হবেন এবং তাতে অন্যজন একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় পতিত হবে। আর এতে করে তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

বাগে এনে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি সহজতর হবে। সুজাউদ্দিন খানের সময়োচিত হস্তক্ষেপ এবং পরবর্তীকালে মুহাম্মদ তকী খানের অকাল মৃত্যুজনিত কারণে অভিজাতদের প্রচেষ্টা তখনকার মতো সফল হয়নি। তবে নবাবের উপর প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তারা যে সরফরাজের রাজত্বকালেও নিজেদের অবস্থান সুনিশ্চিত রাখার আগাম ব্যবস্থা করে নিয়েছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। জীবনসয়াহ্নে সুজাউদ্দিন খান তাঁর পুত্রকে এমন প্রতিশ্রুতির বন্ধনে আবদ্ধ করে যান যে, নবাব হিসেবে তিনি হাজী আহমদ, রায় রায়ান আলম চাঁদ এবং জগৎশেঠ ফতেহচাঁদ প্রমুখের পরামর্শক্রমেই শাসন কাজ পরিচালনা করবেন।[৮৬] সরফরাজ খান পিতাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মন্ত্রক সভা অক্ষুন্ন এবং হাজী আহমদ, আলম চাঁদ এবং জগৎশেঠকে পূর্বের মতোই স্ব স্ব পদে বহাল রাখেন। বিহারের নায়েব নাজিম পদে আলিবর্দী খানকেও বহাল রাখা হয়।

রাজ্য শাসন ব্যাপারে নবাব সরফরাজ খান অযোগ্য হওয়ায়[৮৭] উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ পূর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পান। কিন্তু এ অভিজাতচক্রের উচ্চাশার মাত্রা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তারা আরো অধিক ক্ষমতা লাভের আশায় পর্যায়ক্রমিকভাবে অসুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে নবাবকে দুর্বল করে তুলতে সচেষ্ট হন। তারা সরফরাজ খানকে বিভিন্ন রকমের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পারস্যরাজ নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণের সময় মুঘল সম্রাটের উজির কামরুদ্দিন নবাব সরফরাজ খানের নিকট বাংলার বিগত তিন বছরের বকেয়া রাজস্ব দাবি করেন। মন্ত্রণা পরিষদ নবাবকে বকেয়া রাজস্ব আদায় না করতে পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয়, তাদের পরামর্শক্রমে নবাব নাদির শাহের নামে মুদ্রাঙ্কন ও খুৎবা পাঠের নির্দেশ জারি করেন। চার্লস স্টুয়ার্ট লিখেছেন, নাদির শাহের প্রত্যাবর্তনের পর মন্ত্রণা পরিষদ সদস্যগণই নাদির শাহের নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রাঙ্কনের জন্য সরফরাজ খানকে দায়ী করে তা অভিযোগ আকারে দিল্লীর সম্রাটের সমীপে পেশ করেন।[৮৮] এমনকি তারা এ অপরাধে নবাবের মৃত্যুদণ্ড এবং আলিবর্দী খানের অনুকূলে বাংলার সুবাদারি সানন্দ দানের জন্যও সম্রাট মুহাম্মদ শাহের (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রি.) কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন বলে গোলাম হোসেন সলিম উল্লেখ করেছেন।[৮৯] পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অভিজাতচক্র নিজেদের মধ্য থেকে তাদের স্বার্থানুকূল কোন একজনকে সিংহাসনে বসানোর উচ্চাশা পোষণ করতেন। উপর্যুক্ত ঘটনার সূত্রে সম্রাটের কাছে করা আবেদনের মধ্যে এ সত্য প্রমাণীত হয়েছে।

নবাব সরফরাজ খানকে উৎখাত করে আলিবর্দী খানকে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত করার মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন হাজী আহমদ। তবে তিনি এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রায় রায়ান আলম চাঁদ ও জগৎশেঠ ফতেহচাঁদকেও নিজ পক্ষভুক্ত করতে সক্ষম হন। নিজের ভাইকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে হাজী আহমদ সম্ভব সকল উপায়ে সরফরাজ খানকে উৎখাতের চেষ্টা করবেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু প্রশাসনে নিজ নিজ অবস্থান অক্ষুন্ন এবং পূর্ববৎ

---

[৮৬] গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৩

[৮৭] *সিয়ার-উল-মুতায়াখ্খেরিণ* ও *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ-ই-মহাবতজঙ্গী*সহ সমকালীন প্রায় সকল তথ্য উৎসেই সরফরাজ খানের প্রশাসনিক অযোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। সিয়ারে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, একজন নৃপতির পক্ষে যে বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তা তাঁর ছিলনা। অন্যদিকে ইউসুফ আলী খান বলেন, রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা এবং কূটনৈতিক কলাকৌশলে তিনি ছিলেন অজ্ঞ, অথচ পার্থিব জীবনে এগুলো ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। *সিয়ার-উল-মুতায়াখ্খেরিণ*, পৃ. ৬২; *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ-ই-মহাবতজঙ্গী*, পৃ.১৫

[৮৮] Charles Stewart, *History of Bengal,* Council of education, Calcutta, 184, p. 272

[৮৯] গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৪

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বহাল থাকা সত্ত্বেও জগৎশেঠ ও রায় রায়ান আলম চাঁদ কেন সরফরাজের বিপক্ষে আলিবর্দী খানকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন? সরফরাজ খানের সাথে জগৎশেঠের মনোবিবাদের কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের পৌত্র মহাতাব চাঁদের ১১ বছর বয়স্ক অনিন্দ্য সুন্দরী বালিকা বধুকে দেখার জন্য সম্রাট একরকমের বল প্রয়োগ করে তাকে প্রাসাদে পাঠাতে বাধ্য করেন।[৮০] এ ঘটনায় জগৎশেঠ অপমানিত বোধ করেন এবং নবাবের বিরুদ্ধে হাজী আহমদের সাথে যোগ দেন। অন্য একটি সূত্র মতে, নবাব মুর্শিদকুলি খান জগৎশেঠের কাছে সাত লক্ষ টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন। জগৎশেঠ এ টাকা ফেরৎ দিতে অস্বীকার করলে ক্ষুব্ধ হয়ে নবাব সরফরাজ খান জগৎশেঠকে তিরস্কার ও যথেষ্ট অপমান করেন। সূত্র ঘটনাকে সরফরাজ ও জগৎশেঠের মধ্যে মনোবিবাদের কারণ হিসেবে দেখিয়েছে।[৮১] তবে সমসাময়িক ফারসি উৎসসমূহে এ ব্যাপারে কোন উল্লেখমাত্র নেই। আলম চাঁদ নানাভাবে সরফরাজ খানের নিকট অপমানিত হয়ে বিরোধী শিবিরে যোগ দান করেন বলেও জনশ্রুতি রয়েছ। এমনকি হাজী আহমদও সরফরাজের কাছে নানা সময়ে নানাভাবে অপদস্থ হয়েছিলেন বলে সূত্রে প্রকাশ। নবাব কর্তৃক প্রকাশ্য দরবারে অপদস্থ হওয়ার ভয়ে তিনি কদাচিৎ দরবারে যেতন বলে হলওয়েল উল্লেখ করেছেন।[৮২] বর্ণিত এসব ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। তর্কের খাতিরে সত্য বলে ধরে নেয়া হলেও এসব কারণেই তারা সরফরাজের প্রতি বিরূপ হয়ে তাঁকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে নেমে পড়েছিলেন-এমন বক্তব্য মেনে নেয়া কঠিন। বস্তুত এর পিছনে এই অভিজাত গোষ্ঠির উচ্চাশা এবং তাদের স্বার্থচিন্তার বিষয়টিই ছিল মূখ্য। প্রাসঙ্গিক আলোচনায়ও এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে নবাবী রাষ্ট্র ও সমাজে যে অভিজাততন্ত্র গড়ে ওঠে সুজাউদ্দিন খানের সময় এসে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা আত্মস্বার্থের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নিজেদের অনুকূলে নেয়ার প্রয়াস চালান। তবে সরফরাজ খানের ক্ষমতারোহন অবধি পরিস্থিতি তাদের সর্বানুকূল না হওয়ায় তারা সফল হতে পারেননি। এ অবস্থায় অভিজাত গোষ্ঠী সরফরাজ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার গোপন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু একজন রাজ্য নায়ককে উপযুক্ত অজুহাত ও প্রস্তুতি ছাড়া কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনার মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা সহজ ছিল না। এর জন্য দরকার ছিল প্রথমত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। নবাবী রাষ্ট্র ছিল একটি সমর শক্তি নির্ভর রাষ্ট। সামরিক আমলাতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত নবাবী রাষ্ট্রে ক্ষমতার পালাবদলের জন্য প্রয়োজন ছিল বলিষ্ঠ সামরিক নেতৃত্ব এবং প্রয়োজনীয় সমর প্রস্তুতির। বিপ্লব সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় এ দুটো গুণই আলিবর্দী ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে ছিল। হাজী আহমদ ছিলেন প্রকৃতিগতভাবেই কূটনীতি জ্ঞানসম্পন্ন এবং আলিবর্দী খানের সমরপ্রতিভা, শক্তি সাহসও বীর্যবত্তার কথা সমসাময়িক সব ঐতিহাসিক সূত্রেই স্থান পেয়েছে। সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে এ দুই ভাই তাদের কূটনীতিজ্ঞান এবং সামরিক প্রতিভার সম্মিলন ঘটাতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এ কাজে তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে আলম চাঁদ এবং জগৎশেঠ ফতেহচাঁদকে তাদের সাথে জোটবদ্ধ করার

---

[৮০] এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য John Zephaniah Holwell, *Interesting Historical Events,* London, 1765, pp. 76-77

[৮১] কালিপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

[৮২] John Zephaniah Holwell, *op. cit.*p. 75

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বটি পালন করেন হাজী আহমদ। নিজ নিজ স্বার্থ ও সন্তুষ্টির কথা মনে রেখেই আলম চাঁদ ও ফতেহচাঁদ সরফরাজের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যুগিয়ে চলেন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, বর্ণিত এ অভিজাতদের স্বার্থের মধ্যে প্রকৃতিগত ভিন্নতা থাকলেও তার বাস্তবায়ন একটি একক সফলতার উপর নির্ভর করছিল, আর তা হলো সরফরাজ খানের উৎখাত সাধন। মুলত একারণেই এদের মধ্যে সরফরাজ বিরোধী একটি অভিন্ন মতৈক্যে উপনীত হওয়া ও জোটবদ্ধ হওয়ার পথে কোন বাধা দেখা যায়নি।

হাজী আহমদসহ উপদেষ্টা কাউন্সিলের উপরে বর্ণিত গোপন ষড়যন্ত্রের কথা যে একবারে গোপন ছিল তা নয়, হাজি লুৎফে আলী, মীর মুর্তজা এবং মর্দান আলী খান প্রমুখ সরফরাজ খানের বিশ্বস্ত এবং হাজী আহমদ বিরোধী কয়েকজন অভিজাত অমাত্য তা টের পেয়েছিলেন। এদের মাধ্যমে নবাবও ঘটনা অবহিত হয়েছিলেন। গোলাম হোসেন সলিম লিখেছেন, প্রকৃত অবস্থা জানার পর নবাব পীড়াক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ঔষধ প্রয়োগ করে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে যত্নশীল হন। এ জন্য আলিবর্দী খানকে পদচ্যুত করে নিজ জামাতা সৈয়দ মুহাম্মদ হোসেন খানকে বিহারের নায়েব নজিম নিয়োগে মনস্থ করেন। আকবরনগরের (রাজমহল) ফৌজদারের পদ থেকে হাজী আহমদের জামাতা আতাউল্লাহ খানকে সরিয়ে মীর সরফউদ্দিন বখশিকে নিয়োগ দেয়া হয়।[৯৩] তিনি দিউয়ান পদে যশোবন্ত সিংহকে নিয়োগ দানেরও সিদ্ধান্ত নেন। হাজী আহমদের কাছ থেকে দিউয়ানি সংশ্লিষ্ট মোহরাঙ্কিতকরণের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তা মীর মুরতজার কাছে হস্তান্তর করা হয়।[৯৪] তবে তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি, বরং সরফরাজ খানের গৃহীত উপরিউক্ত ব্যবস্থাদিতে সম্ভাব্য আরো বিপদের আশঙ্কায় হাজী আহমদসহ ষড়যন্ত্রকারী অভিজাতবর্গ নবাবকে উৎখাতের বিষয়ে আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। নবাবের বিনাশ সাধনের জন্য তারা নবাবকে সামরিক শক্তিতে দুর্বল করার অপচেষ্টা করেন। সরলপ্রাণ নবাব তাদের পরামর্শে ব্যয় সংকোচের উদ্দেশ্যে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করলে তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। হাজী আহমদ নবাব কর্তৃক চাকুরিচ্যুত সেনা সদস্যদের আলিবর্দী খানের সেনা বাহিনীতে নিযুক্তির জন্য বিহারে পাঠাতে শুরু করেন। সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও সংগ্রহ করা হয়।[৯৫]

সরফরাজ খান শুধু শাসক হিসেবে দুর্বল ও অযোগ্য ছিলেন না, তাঁর চরিত্রের মধ্যে প্রবল অসঙ্গতিও দেখা যায়। কুচক্রী অভিজাত হাজী আহমদ ও রায় রায়ান আলম চাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর অনুগত ও বিশ্বস্তদের পরামর্শে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তাদের স্তুতিবাক্যে বিগলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত করেন, এমনকি তাদেরই পরামর্শে সেনা বাহিনীর সংখ্যা হ্রাসের মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেন। শুধু তাই নয়, হাজী আহমদকে বিশ্বাসী বিবেচনা করে তাঁর অনুগত অভিজাতদের অনেক কথাই তাঁর কাছে প্রকাশ করে দেন।[৯৬] একে কেবল নবাবের অসঙ্গত আচরণ নয়, তাঁর আপোসকামী মনোভাবেরও প্রকাশ বলা যেতে পারে। কিন্তু এত কিছু করেও তিনি শেষ রক্ষা করতে পারেন নি।

---

[৯৩] আতাউল্লাহ খান ছিলেন ইরানাগত ও আফশার গোত্রীয়। নবাব সুজাউদ্দিন খানের আত্মীয় হওয়ায় নবাব তাঁকে রাজমহলের ফৌজদার পদে নিয়োগ করেছিলেন। সরফরাজ খান তাঁকে সরিয়ে নিজ জামাতা হাসান আহমদ খানকে এ পদে নিয়োগাদেশ দেন।

[৯৪] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৫

[৯৫] Salimulla, *op. cit.*p.157

[৯৬] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩; ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৬

Dhaka University Institutional Repository

নবাব সরফরাজ খান নায়েব নাজিম আলিবর্দী খানের নিকট বিহার প্রদেশের রাজস্ব হিসাব তলব এবং সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের সময় থেকে বিহারে অবস্থানরত সেনাদলকে রাজধানীতে ফিরে আসার নির্দেশ দিলে তিনি নিজের এবং তাঁর সমর্থক অভিজাতবর্গের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এরূপ পরিস্থিতিতে আলিবর্দী খান অযথা সময় নষ্ট না করে সরফরাজ খানকে উৎখাত করে মুর্শিদাবাদের মসনদ দখলের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন পুরণে তৎপর হন। সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিণ এর বিবরণ মতে, দিল্লীর মুঘল দরবারের মন্ত্রী ইসহাক খান ছিলেন আলিবর্দী খানের বন্ধু। আলিবর্দী খান গোপনে তাঁর মাধ্যমে সম্রাট মুহাম্মদ শাহের কাছে বাংলা, বিহার ও উড়িয়্যার নাজিম পদের সনদের জন্য আবেদন করেন। সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের মৃত্যুর তের মাস পর আলিবর্দী খান প্রার্থনা মতো সম্রাটের কাছ থেকে রাজকীয় সনদ লাভ করেন।[৯৭] বাদশাহী সনদ লাভের পর আলিবর্দী খান ভোজপুরের বিদ্রোহী জমিদারদের দমনের অজুহাতে তাঁর সেনাবাহিনীকে সংঘবদ্ধ করেন। চতুর আলিবর্দী খান প্রথমে তাঁর সেনাবহিনীকে অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যাখা না করলেও পরে আবেগঘন ভাষায় সরফরাজের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে তাদেরকে মুর্শিদাবাদ অভিযানে রাজী করাতে সক্ষম হন।[৯৮] মুস্তফা খান, সমশের খান, সরদার খান, ওমর খান, রহিম খান, সারান্দাজ খান প্রমুখ বিখ্যাত আফগান সেনাপতিবৃন্দসহ শেখ মাসুম, জাহান ইয়ার খান, মুহাম্মদ জেল ফোক্কর খান, চিদাম হাজারী বখশি, ভালিয়া সিংহ ও বক্তিয়ার সিংহ প্রমুখ সেনানায়কগণ এ অভিযানে আলিবর্দী খানের সহযাত্রী হয়েছিলেন। যাত্রার আগে আলিবর্দী খান তাঁর জামাতা জৈনউদ্দিন মুহাম্মদ খানকে বিহারে তাঁর প্রতিনিধি শাসক নিয়োগ করেন। সৈয়দ হেদায়েত আলী খান বাহাদুর আসাদ জঙকে[৯৯] সেরেস ও কুতুম্বা পরগণার প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে তাঁকে জৈনউদ্দিন মুহাম্মদ খানকে সহযোগিতা ও জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে আলিবর্দী খান তাঁর অভিযানের প্রতিটি পর্বে প্রতারণা ও চাতুরীর আশ্রয় নেন। সমকালিন সবক'টি ফারসিসূত্রেই এর বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। গোলাম সলিমের বর্ণনা মতে, আলিবর্দী খানের আগমন সংবাদ শুনে ভয় ব্যাকুল সরফরাজ খান হাজী আহমদকে বন্দী করেন।[১০০] তবে জগৎশেঠের মাধ্যমে আলিবর্দী খানের লেখা একটি প্রতারণামূলক পত্র পেয়ে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে নবাব হাজী আহমদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে তাঁর সভাসদদের পরামর্শ চাইলে রায় রায়ান আলম চাঁদ, জগৎশেঠ এমনকি নবাবের বিশ্বস্ত কর্মকর্তা গওস খান প্রমুখ হাজীকে আলিবর্দী খানের নিকট চলে যাওয়ার অনুমতি দিতে নবাবকে পরামর্শ দেন।[১০১] বিভ্রান্ত নবাব শেষ পর্যন্ত হাজী আহমদকে তাঁর পরিবাবর-পরিজন ও অনুসারীবৃন্দসহ মুর্শিদাবাদ ত্যাগের মতো একটি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেননা তাদের দরবারে আটক রাখলে তাদের নিরাপত্তার বিষয় চিন্তা করে আলিবর্দী খান নবাবের সাথে আপোস মিমাংসায়

---

[৯৭] এ জন্য আলিবর্দী খান সম্রাটকে বার্ষিক রাজস্ব বাবদ এক কোটি টাকা, সরফরাজ খানের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি এবং এ ছাড়াও অতিরিক্ত আরো এক কোটি টাকা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৬৩-৬৪

[৯৮] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৬৫-৬৬

[৯৯] সৈয়দ হেদায়েত আলী খান ছিলেন সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিণ গ্রন্থ প্রণেতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি'র পিতা। সম্ভ্রান্ত বংশজাত এ ব্যক্তি একসময়ে শাহাজাদা আলী গহরের (পরবর্তী সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম) প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বৈবাহিক সূত্রে তিনি আলিবর্দী খানের একজন নিকটাত্মীয় ছিলেন। এ আত্মীয়তার সম্পকের জন্য সিয়ার রচয়িতার বর্ণনায় আলিবর্দী খানের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি ও পক্ষপাতিত্ব লক্ষনীয়।

[১০০] গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৫

[১০১] করম আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

আসতে বাধ্য হতো। আলিবর্দী খানের নিকট পৌঁছার পর হাজী আহমদ বেশ কয়েকটি পত্রযোগে ও দরবারে অবস্থানরত তাঁর সহযোগী বন্ধুদের মাধ্যম নবাবকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন।[১০২] শুধু তাই নয়, হাজী আহমদ নবাবকে এক রকমের প্রচ্ছন্ন হুমকিও দেন।[১০৩] তবে পরিস্থিতি তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, নবাবকে আলিবর্দী খানের বিরুদ্ধে অভিযান ছোড়া আর কোনো গত্যান্তর ছিল না। সরফরাজ খান পুত্র হাফিজুল্লাহ খান উরফে মির্যা আমানীকে সেনাপতি ইয়াসিন খানের (ফৌজদার) তত্ত্বাবধানে মুর্শিদাবাদের ভার অর্পন করে তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত সেনাপতি ও সমর অভিজাতদের নিয়ে স্বয়ং নিজে যুদ্ধ যাত্রা করেন। সেনাপতি গাওস খান, মীর সফরউদ্দিনসহ নবাবের দুই জামাতা (হোসেন খান এবং মুহাম্মদ তকি খানের পুত্র), মীর মুহাম্মদ বাকের খান, মির্যা মুহাম্মদ ইরাজ খান, মীর কামেস, মীর গদায়ী, মীর হায়দার শাহ, মীর দিলির শাহ, বিজয় সিংহ, রাজা গন্ধর্ব সিং, সিলেটের ফৌজদার সমশের খান, হুগলির ফৌজদার সুজাকুলি খান, সেনাপতি মীর হাবিব, এবং মরদান আলী খান প্রমুখ সেনানায়কগন যুদ্ধাভিযানে নবাবের সহগামী হন। নবাবী ঐতিহ্য অনুযায়ি এ অভিযানেও কয়েকজন অভিজাত জমিদারও নবাবের সহাযাত্রী হয়েছিলেন বলে রিয়াজে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৪] তবে এ জমিদার কারা ছিলেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যুদ্ধের প্রাক্কালে শিবিরে মোতায়েন অবস্থায় উভয়পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও সমঝোতার দীর্ঘ প্রচেষ্টা চলে। আর এই সুযোগে নবাব বিরোধী চক্রীদলের অন্যতম প্রধান জগৎশেঠ পরিস্থিতিকে আলিবর্দী খানের অনুকূলে আনার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। এদিকে শান্তির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর গিরিয়ার[১০৫] যুদ্ধে উভয়পক্ষ শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে সরফরাজ খান তাঁর অনুগত নেতৃস্থানীয় সেনাপতি ও অমাত্য অভিজাতসহ নিহত হন।[১০৬] আর এভাবেই সরফরাজ খানের স্বল্পকালীন শাসনামলের ইতি ঘটে।

উপরের বর্ণনার আলোকে বলা যায় যে, গিরিয়া যুদ্ধ ছিল উচ্চাশা পুরণ এবং পদ ও ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারাসহ চাওয়া-পাওয়া চরিতার্থ করা নিয়ে দু'দল অভিজাতের মধ্যে স্বার্থ সংঘাতের চূড়ান্ত বহিপ্রকাশ। দেখা যায় যে, স্বার্থ সংঘাতে সংশ্লিষ্ট একদল অভিজাত উর্ধতন রাষ্ট্রীয় পদ ও তদনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক মান-মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্বেও আরো বেশি পাওয়ার, এমনকি মসনদ লাভের মনস্তাত্বিক উচ্চাশার মধ্যে ছিল। আর একদল অভিজাত কাঙ্ক্ষিত পদ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় উচ্চপদ ও ক্ষমতা হস্তগত করার প্রয়াসে তৎপর ছিল। শেষোক্ত অভিজাতবর্গ ছিলেন নবাব সরফরাজের সমর্থক এবং পুরাতন অমাত্য চক্রের ঘোর শত্রু। নবাবকে সামনে রেখে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস চালান। অন্যদিকে পুরাতন অমাত্য (যারা নবাব সুজাউদ্দিন

---

[১০২] সম্ভত হাজী আহমদের প্ররোচনায় আলম চাঁদ নবাবকে কুমন্ত্রনা দেন যে, আলিবর্দী খান তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য মুর্শিদাবাদ আসছেন। তারপরেও যদি নবাব যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন, তবে এর পরিণতির ব্যাপারে তিনি নবাবকে সাবধান করে দেন। আবদুল করিম, 'নবাবি আমলে রাজনীতির ধারা', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭

[১০৩] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

[১০৪] গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৫

[১০৫] রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ভাগিরথী নদীর তীরে গিরিয়া প্রান্তর অবস্থিত।

[১০৬] গিরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য নিখিল নাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, *পূর্বোক্ত* , পৃ.পৃ. ১০৯-১১১; K.K. Datta, *op. cit.* pp. 29-32

Dhaka University Institutional Repository

খানের আমল থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রে প্রভাবশালী হিসেবে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করেছিলেন) রায় রায়ান আলম চাঁদ ও জগৎশেঠ ফতেহচাঁদ প্রমুখ আরো যশোখ্যাতি, অর্থ-সম্পদ এবং প্রতিপ্রত্তি বৃদ্ধির প্রয়াস চালান। বিহারে আত্মপ্রতিষ্ঠার পর থেকে আলিবর্দীর মধ্যে বাংলার মসনদ লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়ার বিষয়টি সমকালিন সকল ঐতিহাসিক সূত্র দ্বারাই সমর্থিত। মসনদ দখলের উচ্চাশা পূরণের উদ্দেশকে ঘিরেই সরফরাজের বিরুদ্ধে তাঁর সামরিক অভিযান ও কথিত অভ্যুত্থানের ঘটনা। সমসাময়িক সূত্রসমূহে আলিবর্দী খানের সাথে তাঁর ভাই হাজী আহমদকেও মসনদ দখলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, হাজী আহমদ নিজে মসনদে আরোহনের ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। হাজী আহমদ তাঁর সমস্ত কূটনৈতিক প্রয়াস অব্যাহত রাখেন আলিবর্দী খানকে বাংলার মসনদে বসানোর লক্ষ্যে। এ ক্ষেত্রে তাঁর অন্যবিধ উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, তিনি চেয়েছিলেন প্রশাসনে নিজের অবস্থান অক্ষুন্ন রাখতে। উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সরফরাজ খান ক্ষমতায় আরোহনের পর তাঁর কথিত সুহৃদ ও বিশ্বস্ত ওমরাহদের বিরোধিতার মুখে রাষ্ট্র ও সরকারে হাজী আহমদের পূর্বতন প্রভাব প্রতিপত্তি ঝুঁকির মুখে পড়ে। এ অবস্থায় তিনি নিজের অবস্থান অক্ষুন্ন রাখার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেছিলেন। রাষ্ট্র ক্ষমতায় সরফরাজ বহাল থাকলে নিজের অবস্থান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে মনে করে তিনি নবাবকে উৎখাত করার এক গোপন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল প্রয়োগ করে তিনি তাঁর সুহৃদ-সহকর্মী অভিজাতদের কাছে টেনে নেন। সরফরাজের পতন এবং আলিবর্দী খানের সিংহাসন আরোহনের মধ্য দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হয়। নবাব আলিবর্দী খানের প্রথমস্থানীয় সহযোগী হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রে আমৃত্যু তাঁর অবস্থান বজায় ছিল। আলিবর্দী খানের অধীনে শুধু নিজের নয় হাজী আহমদ তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা ও পৌত্রবর্গের জন্যও রাষ্ট্রীয় উচ্চপদ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ধন-সম্পদের প্রতি হাজী আহমদের বিশেষ দুর্বলতার কথাও সমসাময়িক সূত্রে নির্দেশিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পদ পদবী লাভ ছাড়াও তাঁর মধ্যে অঢেল সম্পদের অধিকার সুনিশ্চিতকরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল ছিল বলে জানা যায়। সরফরাজের বিরুদ্ধে অভিজাতদের চক্রীদল গঠন এবং তাঁকে উচ্ছেদে ১৭৪০ সালের বিপ্লবে হাজী আহমদের কূটনৈতিক নেতৃত্ব দানের মূখ্য উদ্দেশ্য এটিই ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন।[১০৭]

উপরের আালোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গিরিয়ার যুদ্ধ বা অভ্যুত্থান ছিল মূলত দু'দল অভিজাতের লাভা-লাভকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফসল। বস্তুত নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময় নবাবী বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের অর্ন্তদেশ পর্যন্ত অভিজাত শ্রেণীর যে প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সূত্রধরেই তাদের তৎরপরতা প্রশাসনের গণ্ডি পেরিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিস্তৃত হয়। সরফরাজ খানের দুর্বলতা ও অদুরদর্শিতার ফলে শুধু দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ নয়, মসনদ দখলের মতো সক্ষমতাও তারা অর্জন করে। আর অভিজাতবর্গের এ ক্ষমতার সফল প্রয়োগের পরিণতি হলো সরফারজ খানের পতন এবং আলিবর্দী খানের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল।

---

[১০৭] হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩

৬.৪ নবাব আলিবর্দী খানের শাসনামলে অভিজাত শ্রেণীর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা

গিরিয়া যুদ্ধে জয় লাভ করে আলিবর্দী খান মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহন করেন। তাঁর দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময়ের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে গণ্য হয়। তাঁর শাসনামলে উপর্যুপরি মারাঠা আক্রমণসহ নানাবিদ সমস্যার মধ্যেও প্রশাসন ও রাজনীতিতে অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তি শুধু অক্ষুন্নই থাকেনি, ক্ষেত্রবিশেষে আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইতোপূর্বেকার আলোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, বাংলার রাজনীতিতে আলিবর্দী খানের উত্থান এবং প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা মূলত একজন সুবিধাভোগী অমাত্য হিসেবে। নবাব হিসেবে মুর্শিদাবাদের মসনদ লাভ, সেটিও ঘটে বাংলার নেতৃস্থানীয় অভিজাতদের একটি গোষ্ঠীর স্বার্থনুশ্রিত সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে। এ অবস্থায় ক্ষমতা দখলে সহযোগিতার ঋণ পরিশোধ এবং প্রশাসন পরিচালনা ও নবাবী ক্ষমতার সংহতি নিশ্চিত করার প্রয়োজনে তাঁকেও একটি অনুগত আমলাতন্ত্র গড়ে তোলার দিকে মনসংযোগ করতে হয়। প্রসঙ্গত পূনশ্চ উল্লেখ্য যে, দেশাত্ববোধ বা গণ সমর্থনের ভিত্তিতে ক্ষমতায় টিকে থাকার সুযোগ নবাবী আমলে ছিল না। একটি বিশ্বস্ত ও অনুগত ক্ষমতাবান অভিজাত শ্রেণীকে পরিপোষণ এবং রাষ্ট্র ও সমাজে তাদের পদ ও অবস্থানুযায়ী সুযোগ-সুবিধা দানের বিনিময়ে কার্যোদ্ধার এবং রাজস্বার্থ বজায় রাখার যুগ ছিল সেটি। নবাব সুজাউদ্দিন খানের ব্যাপকমাত্রায় অভিজাত নির্ভরতার খেসারত তাঁর পুত্র সরফরাজ খানকে দিতে হয়েছিল। এ দৃষ্টান্ত আলিবর্দী খানের সামনে থাকলেও এদের উপক্ষা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধারণ এবং প্রশাসন পরিচালনা করা যে সম্ভব হবে না, একজন বিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলে মনে হয়। কাজেই অভিজাত শ্রেণীকে উপেক্ষা করে নয়, বরং যতদুর সম্ভব বিশ্বস্ত ও অনুগত ব্যক্তিদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে তিনি প্রয়াসী হন।

পূনশ্চ উল্লেখ করতে হয় যে, গিরিয়ার যুদ্ধ ছিল ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও শঠতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এ যুদ্ধে জয় লাভ করলেও প্রভূ পুত্রের প্রতি নির্মম আচরণের জন্য আলিবর্দী খানের মনে একরকমের অপরাধবোধ কাজ করছিল বলে সমসাময়িক ফারসি সূত্র পাঠে অনুমিত হয়। তাই আলিবর্দী খান পরলোকগত নবাব সরফরাজ খানের পরিবারকে উপযুক্ত ভাতাদি এবং নবাবের শিশু পুত্র আকা বাবার ভরণ-পোষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।[১০৮] নবাব আলিবর্দী খান প্রশাসন পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে প্রথমেই রাষ্ট্রের উচ্চপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নবাব সরফরাজ খানের সাথে ক্ষমতার লড়াইয়ে যে সব অভিজাত তাঁর পক্ষ সমর্থন করেননি, নতুন নিয়োগে তাদের বিবেচনা আনা হয়নি। নতুন পদ বন্টনে তাঁরাই প্রাধান্য পেলেন যাঁরা ক্ষমতার লড়াইয়ে আলিবর্দী খানকে সমর্থন সহযোগিতা করেছিলেন। নতুন নিয়োগে আলিবর্দী খান তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা নাওয়াজিশ মোহাম্মদ খানকে সিলেট, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের প্রশাসনিক কর্তৃত্বসহ জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন। বাংলার দিউয়ানি পদও তাঁর হাতে অর্পন করা হয়। তাঁকে সাতহাজারি মনসবসহ 'ইহতিশাম-উদ-দৌলা' ও 'শাহাম্মত জঙ' উপাধি দ্বারা

---

[১০৮] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৯৬

Dhaka University Institutional Repository

সম্মানিত করা হয়।[১০৯] হোসেনকুলি খানকে তিন হাজারী মনসবদারীসহ জাহাঙ্গীরনগরে নওয়াজিশ মোহাম্মদের সহকারী নিয়াগ করা হয়। রায় গোকুলচন্দ্র ছিলেন হোসেনকুলি খানের দিউয়ান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিজ্ঞ লোক। সূত্র মতে, নাওয়াজিশ মোহাম্মদ ও তাঁর সহকারী হোসেনকুলি খান বেশির ভাগ সময়ই রাজধানী মুর্শিদাবাদে অবস্থান করতেন। তাদের অনুপস্থিতিতে গোকুলচন্দ্র প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন।[১১০] নবাবের দ্বিতীয় জামাতা সাঈদ আহমদ খান ছিলেন রংপুরের ফৌজদার। তাঁকে 'মহামদ-উদ-দৌলা' ও 'সওলত জঙ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়। আলিবর্দী খান সরফরাজের বিরুদ্ধে অভিযানকালে কনিষ্ঠ জামাতা জৈনউদ্দিন খানকে বিহারের ভারপ্রাপ্ত নায়েব নাজিম নিযুক্ত করে এসেছিলেন। তাঁকে নায়েব নাজিমের পূর্ণ দায়িত্বসহ 'ইহতিরাম-উদ-দৌলা' ও 'হয়বত জঙ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁকে সাত হাজার সৈন্যের মনসবও প্রদান করা হয়েছিল বলে সূত্রে উল্লেখ।[১১১]

নবাবের দুই দৌহিত্র মির্যা মুহাম্মদ (পরবর্তী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ) ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্যা কাজিমকেও[১১২] উচ্চ রাজপদে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রথমোক্তজনকে নবাব স্বয়ং দত্তক হিসেবে প্রতিপালন করছিলেন এবং তাঁকে জাহাঙ্গীরনগরের নাওয়ারা (নৌ বাহিনী) মহলের অধ্যক্ষ (Admiral) নিয়োগ করা হয়। ইকরাম-উদ-দৌলাহ লাভ করেন জাহাঙ্গীরনগরের সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পদ। তাদের উভয়ের জন্য সাত হাজারী মনসব নিশ্চিত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ দুই ভাই ছিলেন তখনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক। কিন্তু রাজ পরিবারের সদস্য এবং নবাবের বিশেষ প্রীতিভাজন হওয়ায় তাঁরা এসব উচ্চপদাধিকারী হন। বাল্যকাল থেকে তাঁরা বিস্তর ভূমিভোগের সুবিধাপ্রাপ্ত 'লর্ড' এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ আমির বা অমাত্য দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন বলেন সূত্রে উল্লেখ।[১১৩] হাজী আহমদের জামাতা রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লাহ খানকে ভাগলপুরের ফৌজাদারিসহ তিন হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের অধিনায়কত্বের ভার অর্পন করা হয়। তাঁকে সাত হাজারী মনসবদার ও 'ইজাজ-উদ-দৌলাহ সাবিত জঙ' উপাধি দ্বারাও সম্মানিত করা হয়। নবাবের ভগ্নিপতি মীর মোহাম্মদ জাফর আলী খান পুরাতন সেনাবাহিনীর বখশি নিয়োগ করা হয়। নবাবের বিশ্বস্ত নুরুল্লাহ বেগ খানকে নিয়োগ দেয়া হয় নতুন সেনাবাহিনীর বখশি পদে। রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন হায়দর আলী খান উপাধিধারী মীর নজর আলী খান।[১১৪] আতাইয়ার খান ও মুস্তফা খান প্রমুখ নবাবের আত্মীয়, বন্ধু ও অনুগ্রহভাজন প্রত্যেককে বিভিন্ন উপাধিসহ চাকুরিতে পদোন্নতি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল বলে সিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে।[১১৫] ফকিরুল্লাহ বেগ ছিলেন নবাবের অন্যতম ঘনিষ্ট সহচর। তাঁকে

---

[১০৯] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮৪

[১১০] K. K. Datta, *op. cit.* p. 38

[১১১] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮৪

[১১২] মির্যা কাজিম ইতিহাসে ইকরাম-উদ-দৌলাহ নামে সমাধিক পরিচিত। আলিবর্দী খানের বড় জামাতা জাহাঙ্গীরনগরের নাওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি একে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ* গ্রন্থে তাঁর নাম বাদশাহকুলি খান ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *সিয়ার*, পৃ. ৮৫ । সমসাময়িক অন্যকোন গ্রন্থে এ নামের উল্লেখ দেখা যায় না।

[১১৩] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮৫

[১১৪] হায়দার আলী খান ছিলেন নাওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের সহকারী হোসেনকুলি খানের চাচাতো ভাই K. K. Datta, *op. cit.* p. 38; সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮৫; ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ২৯-৩০

[১১৫] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮৫

সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় বখশির পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। মীর মুরতজা প্রাসাদ সরকারের পদে কর্মরত ছিলেন। আলিবর্দী খান তাঁকে সরিয়ে এ পদে তাঁর বিশ্বস্ত গোলাম হেসেন খানকে নিয়োগ দেন। নবাবের সৎভাই মুহাম্মদ ইয়ার খানকে (কোনো কোনো সূত্র আমিন খান বলে উল্লেখ) হুগলির ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। প্রথমে মেদিনিপুরে এবং পরে জাহাঙ্গীরনগরের ফৌজদার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছিলেন মীর কলন্দর। আলিবর্দী খানের ক্ষমতায় আরোহনের কিছুদিন পর দিউয়ান আলমচাঁদ মারা গেলে আলমচাঁদের পেশকার চিনরায়কে রায় রায়ান উপাধি দিয়ে দিউয়ান পদে নিয়োগ দেয়া হয়। রাজা জানকীরাম নিয়োগ পান সেনাবাহিনীর তালিকা সংরক্ষক ও পে-মাস্টার জেনারেলের পদ।

উপরের বর্ণনারে আলোকে বলা যায় যে, নবাব আলিবর্দী খান তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ ও বিজ্ঞতা অনুসারে রাজকীয় উচ্চপদ বন্টন করেন। এ ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের মতো তিনিও তাঁর সহযোগী, আত্মীয়-পরিজন ও বিশ্বস্ত অনুচরদের বিশেষ প্রাধান্য দেন। এর অন্যতম কারণ ছিল সে সময় প্রশাসনযন্ত্র ছিল একান্তই অভিজাত অমাত্য নির্ভর, কাজেই নবাবগণ এমন একটি অমাত্যগোষ্ঠী গড়ে তোলতে চাইতেন যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বা অন্য কোনো কারণে নবাবের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সতর্কতার সাথে নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেও পদ প্রত্যাশী সকলকে তিনি সন্তুষ্ট করতে পারেননি। অনেকেই পদ পেলেও আরো উঁচু পদ এবং সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় অসন্তুষ্ট রইলেন। সিয়ারের বর্ণনামতে, নবাবের আত্মীয় আবদুল আলী খান (সিয়ার গ্রন্থ প্রণেতার মামা) সেনা বাহিনীর বখশির পদ প্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু এ পদ প্রাপ্তি না ঘটায় তিনি কেবল অসন্তুষ্টই হননি, বরং অভিমান করে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে বিহারে নায়েব নাজিম জৈনউদ্দিন খানের নিকট আশ্রয় নেন।[১১৬] একই কথা ফকিরুল্লাহ বেগের প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। এ অভিজাত ব্যক্তিটিও কাঙ্ক্ষিত পদ না পেয়ে আবদুল আলী খানের অনুগামী হয়ে বিহারে চলে গিয়েছিলেন।

বাংলা ও বিহারে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও উড়িষ্যায় আলিবর্দী খানের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নবাব সুজাউদ্দিন খানের আমল থেকে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান রুস্তম জঙ উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।[১১৭] নবাব আলিবর্দী মুর্শিদকুলি খানকে উৎখাত করে উড়িষ্যায় নিজের মনোনীত লোককে নায়েব নাজিম হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। এ উদ্দেশ্যে নবাব উড়িষ্যা দখলে উদ্যত হলে তাদের মধ্যে এক দীর্ঘকালীন সংঘর্ষের সূচনা হয়। বলা বাহুল্য যে, এ সংঘর্ষ ছিল অভিজাতদের মধ্যকার পারস্পরিক স্বার্থের টানাপোড়েনের ফলশ্রুতি। বস্তুত, নায়েব নাজিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের মধ্যে উড়িষ্যাকে নিজ সম্পত্তি জ্ঞানকরত সেখানকার ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে আলিবর্দী খানও উড়িষ্যাকে মুক্ত করার জোরদার প্রয়াস চালান। উড়িষ্যা দখলে আলিবর্দী খানের প্রয়াসের মূলে ছিল তাঁর ব্যাক্তিগত প্রধান্য বিস্তার এবং সেই সাথে অনুগত কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাতকে উড়িষ্যা প্রশাসনে নিযুক্তির মাধ্যমে নিজের দলভারী করা। সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রাক্কালে তিনি তাঁর স্বপক্ষে অভিজাতদের সমর্থন

---

[১১৬] আবদুল আলী খান আগে থেকেই বিহার ও বেসফ নামক পরগনার রাজস্ব সংগ্রাহকের পদে নিয়োজিত ছিলেন। এখন জৈনুদ্দিন খান তাঁকে ত্রিহুতের শাসনকর্তার পদও দান করেন। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.; K. K. Datta, *op. cit.* p. 38

[১১৭] দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের প্রকৃত নাম মির্যা লুৎফুল্লাহ। তিনি সুজাউদ্দিন খানের কন্যা এবং সরফরাজ খানে ভগ্নি দুর্দানা বেগমের স্বামী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আদায়ের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে মসনদ লাভের যুদ্ধে বিজয়ী হলে তিনি তাদের মধ্য থেকেই উড়িষ্যা প্রশাসনের কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন। নবাব হিসেবে রাজকীয় কর্মকর্তা নিয়োগের সময়ও তিনি তাঁর দ্বিতীয় জামাতাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে উড়িষ্যা অধিকৃত হলে তাঁকে সেখানকার নায়েব নাজিম নিয়োগ করবেন।[১১৮] এ কারণে মুর্শিদাবাদে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর আলিবর্দী খান উড়িষ্যা অভিযানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের স্ত্রী দুর্দানা বেগম[১১৯] আলিবর্দীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর জন্য তাঁর স্বামীকে অনুপ্রাণীত করেন।[১২০] উল্লেখ্য যে, দুর্দানা বেগমের জামাতা ছিলেন মির্যা বাকের ইস্পাহানি। আলিবর্দী খানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানকে যুদ্ধে প্ররোচিত করার পিছনে দুর্দানা বেগমের ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্য ছিল বলে ধারণা করা হয়। বস্তুত, তাঁর প্রত্যাশা ছিল যুদ্ধে বিজয়ী হলে শুধু তাঁর ব্যক্তিগত তালুকই রক্ষা হবে না, নিহত ভাই সরফরাজ খানের রেখে যাওয়া সম্পত্তিরও তিনি ভাগিদার হবেন। তাঁর জামাতা মীর্জা বাকেরও ছিলেন খুবই উচ্চবিলাসী ব্যক্তি। তিনি বাংলার প্রশাসনিক ক্ষমতা দখলে আগ্রহী ছিলেন।[১২১] স্ত্রী ও জামাতার চাপে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান আলিবর্দী খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাধ্য হন। যুদ্ধে দুই জামাতা মির্যা বাকের ও আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খানসহ বেশ কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক অভিজাত এবং স্থানীয় জমিদারগণ মুর্শিদকুলিকে সহায়তা করে বলে সূত্রে উল্লেখ। তবে এ জমিদার কারা সে সর্ম্পকে সূত্রে কোন উল্লেখ নেই। অবশ্য এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের বন্ধু খোরদাহের জমিদার দ্বিতীয় রামচন্দ্র দেবের কথা জানা যায়।[১২২] মীর মোহাম্মদ জাফর আলী খান, কাসেম আলী খান, মুস্তাফা খান, মির্যা ফকিরুল্লাহ বেগ, খয়েরুল্লাহ বেগ ও নূরুল্লাহ বেগ প্রমুখ সামরিক অভিজাতগণ আলিবর্দী খানের সাথে অভিযানে অংশ নেন। ভূস্বামী অভিজাতদের মধ্যে বর্ধমানরাজ আলিবর্দী খানকে সহায়তা করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৭৪১ সালে সংঘটিত চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান পরাজিত হলে উড়িষ্যা নবাব আলিবর্দী খানের কর্তৃত্বাধীনে আসে। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাঁর দ্বিতীয় জামাতা সাঈদ আহমদ খান সওলত জঙকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নিয়োগ করা হয়। কাসেম বেগ গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ এবং শেখ হেদায়েত উল্লাহ কটকের ফৌজদার নিযুক্ত হন।[১২৩] রোহিলা আফগান সেনাপতি গোজর খানের নেতৃত্বে একটি সেনাদলকে উড়িষ্যার নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলার রাজনীতিতে আলিবর্দী খানের উত্থান শুরু হয়েছিল এ উড়িষ্যা থেকেই। নায়েব নাজিম সুজাউদ্দিন খানের অধীনে তিনি দীর্ঘ দিন উড়িষ্যায় ছিলেন এবং এই সূত্রে এ অঞ্চলের জমিদারদের সাথে তাঁর

---

[১১৮] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮৫

[১১৯] *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণের* ভাষ্য মতে, দুর্দানা বেগম একজন তেজস্বীনি মহিলা ছিলেন। বাংলায় তিনি তাঁর স্বামী অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। নবাব আলিবর্দী খানের নিকট পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নেন। দুর্দানা বেগম সেখানে বাঙ্গলী বেগম নামে পরিচিতি লাভ করেন।

[১২০] ঐ. পৃ. ৯০

[১২১] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৯০

[১২২] K. K. Datta, *op. cit.* p. 47

[১২৩] গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৬

Dhaka University Institutional Repository

সু সম্পর্ক ছিল। নবাব হিসেবে উড়িষ্যায় এসে তিনি সকল জমিদারদের ডেকে পাঠান এবং তাদের সদাশয় আচরণ ও যোগ্যতা মাফিক অনুগ্রহ দান করায় তাঁরা হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ জমিদারি এলাকায় ফিরে যান।[১২৪]

নায়েব নাজিম হিসেবে উড়িষ্যার প্রশাসন পরিচালনায় সাঈদ আহমদ খান কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। বস্তুত সাঈদ আহমদ ছিলেন শাসন কাজে অনভিজ্ঞ সংকীর্ণমনা ও অর্থ লোলুপ ব্যক্তি।[১২৫] তাঁর ভ্রান্ত শাসন নীতির[১২৬] ফলে উড়িষ্যার সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। প্রত্যাশা পুরণ না হওয়ায় অভিজাত কর্মকর্তারাও নায়েব নাজিমের বিরোধিতা করতে থাকে এবং দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের সময়কার অভিজাতরা মাথাছাড়া দিয়ে ওঠে। ছলিম খান, দরবেশ খান, নেয়ামত খান ও মীর আজিজ উল্ল্যাহ প্রমুখ সমর অভিজাতবৃন্দ[১২৭] সাঈদ আহমদ খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ক্ষমতাচ্যুত নায়েব নাজিম মুর্শিদকুলি খানের জামাতা মির্যা বাকের খানকে উড়িষ্যা আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। উড়িষ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কয়েকজন জমিদার, প্রভাবশালী অমাত্য এবং বণিক-ব্যাংকারের সহায়তায় মির্যা বাকের উড়িষ্যা আক্রমণ করেন।[১২৮] পরিবার-পরিজনসহ নায়েব নাজিম সাঈদ আহমদ খানকে বন্দী করা হয়। ফলে উড়িষ্যা নবাবের হাতছাড়া হয়ে যায়। উড়িষ্যা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নবাব আলিবর্দী খানের মর্যাদা ও ক্ষমতার জন্য ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ । এ অবস্থায় জেষ্ঠ্য জামাতা নাওয়াজিশ মুহাম্মদ খানের (জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম) উপর মুর্শিদাবাদের দায়িত্বভার অর্পন করে নবাব মীর জাফর আলী, মুস্তফা খান, সমশের খান, সরদার খান, ওমর খান, বালান্দ খান, ছারান্দাজ খান, কলিদুর খান প্রমুখ সামরিক অভিজাতদের সাথে নিয়ে দ্রুত উড়িষ্যা অভিমূখে যাত্রা করেন।[১২৯] নবাবের আগমন সংবাদ শুনে মির্যা বাকের খান উড়িষ্যা ত্যাগ করলে নায়েব নাজিম সাঈদ আহমদ খান সওলত জঙ্গমুক্ত হন। তবে নবাব তাঁকে আর উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে বহাল রাখেননি। উড়িষ্যা থেকে প্রত্যাহার করে তাঁকে প্রথমে হুগলির ফৌজদার এবং পরে পুর্ণিয়ার ফৌজদার নিয়োগ করা হয়।

ইউসুফ আলী খানের বর্ণনা মতে, উড়িষ্যা পুনরুদ্ধার করে নবাব আলিবর্দী খান সেখানকার নায়েব নাজিম পদে প্রথমে হাজী আহমদের জামাতা মুখলিস আলী খানকে নিয়োগ দেন, কিন্তু পরে এ নিয়োগ বাতিল করে সে পদে শেখ মুহাম্মদ মাসুম নামক আরেকজন অভিজাতকে নিয়োগ করেন। নবাব সমর অভিজাত মুস্তফা খানের পরামর্শে শেখ মাসুমকে নিয়োগ দিয়েছিলেন বলে সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।[১৩০] এ তথ্য থেকে নবাবের উপর মুস্তফা খানের প্রভাব সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, মুস্তফা খান ছিলেন আফগান সেনাপতি। সমকালে সমরপতিদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রধান ছিলেন বলে সমসাময়িক সূত্রে উল্লেখ। নবাবের উপর তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল

---

[১২৪] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৯৫

[১২৫] গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৬

[১২৬] এ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ২০৬-২০৭; সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১০৫-১০৭; ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৭

[১২৭] এরা সকলেই নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের অধীনে প্রভাবশালী সমর অভিজাত হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অনভিজ্ঞ নায়েব নাজিম সাঈদ আহমদ খান তাদেরকে নিজের সেনা বাহিনীতে নিয়োগ দিয়েছিলেন। নায়েব নাজিমের দুর্বলতার সুযোগে তারা বিদ্রোহ করেন।

[১২৮] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭

[১২৯] নবাব আলিবর্দী খান কর্তৃক উড়িষ্যা পূনর্দখলের বিবরণ *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ*, *রিয়াজ-উস-সালতিন*, *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ-ই-মহাবতজঙ্গীসহ* সমসাময়িক সকল ফারসি ইতিহাস গ্রন্থেই সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।

[১৩০] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৪১; সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১১৬

বলেই তাঁর পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে নবাব তাঁর ভাই হাজী আহমদের জামাতাকে পদচ্যুত করে শেখ মাসুমকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিমের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। শেখ মাসুম সম্পর্কে ইতিহাসে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ গ্রন্থে তাঁকে পানিপথের অধিবাসী এবং আলিবর্দী খানের বন্ধু ও বিশিষ্ট সেনাপতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৩১] শেখ মাসুমকে সহযোগিতা করার জন্য যোগ্য সৈনিক ও কর্মকর্তাদের উড়িষ্যা প্রশাসনে নিয়োগ দিয়ে নবাব আলিবর্দী খান রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজা জানকীরামের পুত্র রাজা দুর্লভরাম নায়েব নাজিমের পেশকার পদে নিয়োগ লাভ করেন।[১৩২]

উড়িষ্যা থেকে প্রত্যাবর্তন পথে আলিবর্দী খান প্রভাবশালী ভূ-অভিজাত ময়ূরভঞ্জের জমিদার জগদীশ্বর ভঞ্জের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। *তারিখ -ই- বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী* ও *রিয়াজ-উস-সালাতিনের* বর্ণনা মতে রাজা জগদ্বীশ্বর মির্যা বাকেরকে সহয়তা করে নবাবের বিরাগভাজন হন। এমনকি মির্যা বাকেরের পরাজয়ের পরেও তিনি নবাবের আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে নবাব তাঁর বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। রাজা জগদ্বীশ্বর পার্বত্য অঞ্চলের গভীর অরণ্যে আত্নগোপন করলে ময়ূরভঞ্জে নবাবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৩৩]

আলিবর্দী খান যখন উড়িষ্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা বিহারের নায়েব নাজিম জৈনউদ্দিন খান কয়েকজন সুযোগ্য সামরিক-বেসামরিক অমাত্য ও অনুগত ভূ-অভিজাতের সহযোগিতায় বিহারের প্রশাসনিক সুবন্দোবস্ত করেন।[১৩৪] সূত্র মতে নায়েব নাজিম জৈনউদ্দিন খান শাহবাদ এলাকার দু'জন বিদ্রোহী জমিদার ভারত সিংহ ও উদয়ন্ত সিংহকে দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং রাজস্ব শৃঙ্খলা ফিরেয়ে আনেন। রৌশন খান তেরাহী নামক একজন আফগান কর্মকর্তা শাহাবাদ অঞ্চলের ফৌজদার ছিলেন। উপরে বর্ণিত দু'জন বিদ্রোহী ভূ-অভিজাতের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও সংযোগ থাকার অভিযোগ এনে নায়েব নাজিম তাঁকে হত্যা করেন। নায়েব নাজিমের নির্দেশে হেদায়েত আলী খান পালামোই অঞ্চলের জমিদার রাজা সুন্দর সিংহ ও রাজা জয়কিসেন সিংহ এবং সেরকুটুম্বা ও শিরগাওতি অঞ্চলের জমিদারদের সহায়তায় প্রতিপত্তিশালী ভূ-অভিজাত রামগড় রাজকে পরাজিত করতে সক্ষম হন।[১৩৫]

আলিবর্দী খানের রাজত্বকালে মরাঠা বর্গীদের আক্রমণ বাংলার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিপর্যস্ত মারাঠাশক্তি ইতোমধ্যে আবার মাথছাড়া দিয়ে ওঠে এবং শিবাজীর পুত্র শাহুর নামমাত্র আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে নাগপুরে তাদের রাজ্য স্থাপন করে। আলিবর্দী খান যখন অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠনে ব্যস্ত তখন ১৭৪২ সালে মারাঠা নেতা রঘুজী ভোসলার প্রধানমন্ত্রী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে উড়িষ্যা সীমান্ত দিয়ে মারাঠারা বাংলা আক্রমণ করে। এরপর ১৭৫১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এক দশক ধরে মারাঠারা পুনঃ পুনঃ আক্রমণের

---

[১৩১] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১১৬

[১৩২] K. K. Datta, *op. cit.* p.54

[১৩৩] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৪১; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২০৯

[১৩৪] অভিজাতবর্গের মধ্যে ছিলেন নায়েব নাজিমের দিউয়ান চিন্তামন দাস, বখশি হেদায়েত আলী খান, মেহদি নিসার খান, আবদুল আলী খান, টিকারীর জমিদার সুন্দর সিংহ, নরহাটি ও সাময়ী অঞ্চলের জমিদার নামদার খান, কাগমার খান, রানমাস্ত খান এবং সরদার খান প্রমূখ।

[১৩৫] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ.১১৮-১২৩; K. K. Datta, *op. cit.* p.55

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে ব্যাপক লুঠতরাজ ও জান-মালের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেন।[১৩৬] মারাঠা আক্রমণ নিঃসন্দেহে নবাব আলিবর্দী খানের জন্য একটি মহাদুর্যোগ ছিল। এ আক্রমণের ফলে নবাবী রাষ্ট্রের অর্ন্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত গভীর সংকট তৈরি হয়। আর এ সংকট নিরসনে নবাবের ব্যস্ততার ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোতে নানা রকম সমস্যা তৈরি হয়। এসময় অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতাকেন্দ্রিক উচ্চবিলাস বৃদ্ধি পায়। আলিবর্দী খানের বিরুদ্ধে আফগান বিদ্রোহ, তাঁর জামাতা বিহারের নায়েব নাজিম জৈনউদ্দিন খান এবং দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিদ্রোহ এ উচ্চবিলাসেরই বহিপ্রকাশ। মারাঠা আক্রমণেরসূত্রে নবাবী রাষ্ট্রের ক্ষমতালোভী অভিজাতদের কারো কারো মারাঠাদের সাথে যোগদানের কথাও জানা যায়।[১৩৭] এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উড়িষ্যার ভুতপূর্ব দিউয়ান মীর হাবিব। মীর হাবিবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান। নবাব আলিবর্দী খান কর্তৃক উড়িষ্যা প্রশাসন থেকে নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানকে উচ্ছেদ করার পর বিক্ষুব্ধ মীর হাবিব মারাঠাদের সাথে যোগ দেন। মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সূত্র মতে, এই মীর হাবিবই মারাঠাদের বাংলা আক্রমণের জন্য ডেকে এনেছিলেন।[১৩৮] অবশ্য অন্য সূত্রে বলা হয়েছে যে, হায়দ্রাবাদের নিজাম-উল-মুলক আসফজাঁহর প্ররোচনায় সম্ভব হলে বাংলা অধিকার অথবা 'চৌথ'[১৩৯] আদায়ের উদ্দেশ্যে মারাঠারা বাংলা আক্রমণ করে।[১৪০]

দীর্ঘ দশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে আলিবর্দী খান দুর্ধর্ষ মারাঠা হানাদারদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করেন। এ কাজে তাঁকে মুস্তফা খান, সরদার খান, সমশের খান এবং ওমর খান ও মুসাহিব খান প্রমুখ আফগান সেনানায়কগণ, উড়িষ্যার নায়েব নাজিম শেখ মাসুম, হুগলির ফৌজদার মুহামম্মদ ইয়ার, পুর্ণিয়ার ফৌজদার সায়েফ আলী খান, মেদিনিপুরের ফৌজদার মীর কলন্দর, সেনাপতি ফকিরউল্লাহ বেগ খান, নুরুল্লাহ বেগ খান, হায়দর আলী খান, নবাবের দুই জামাতা সাঈদ আহমদ খান ও জৈনউদ্দিন মুহাম্মদ খান, প্রভাবশালী অমাত্য সৈয়দ আবদুল আলী খান, মীর জাফর আলী খান, ভাগলপুরের ফৌজদার আতাউল্লাহ খান, বিহারের বখশি মেহদী নিসার খান এবং নবাবের দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাহ প্রমুখ প্রভাবশালী ও অনুগত সামরিক-বেসামরিক অমাত্য অভিজাতগণ সহায়তা করেন। মারাঠা বর্গী হানা মোকাবেলায় নবাব ভূ-স্বামী অভিজাতদেরও সহযোগিতা পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। অবশ্য এ ব্যাপরে সমকালিন তথ্য উৎসে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এ ক্ষেত্রে বীরভূমের পাঠান জমিদারের বীর পুত্র আলি নকী খানের সহযোগিতার বিষয়ে বীরভূমে অনেক গল্প কথা প্রচলিত আছে।[১৪১] বর্ধমানের রাজার পক্ষ থেকেও আলিবর্দী

---

[১৩৬] ফারসি ইতিহাস গ্রন্থ ছাড়াও সমসাময়িক সকলসূত্রে আলিবর্দী খানের সময় বাংলায় মারাঠা বর্গী আক্রমণ এবং নবাবের সাথে তাদের যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এ সব তথ্য উৎসের যথার্থ ব্যবহার করে প্রখ্যাত পণ্ডিত কে কে দত্ত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Alivardi and His Times* এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পৃ.পৃ. ৫৬-১। এ ছাড়া গঙ্গারামের *মহারাষ্ট্র পুরাণ* এ সর্ম্পকিত একটি প্রামাণিক উৎস।

[১৩৭] *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ* গ্রন্থে মারাঠাদের সাথে যোগদানকারী মীর আবুল হাসেন ও মীর আবুল কাসেম নামে দু'জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া মীর হাবিবের মাধ্যমে উড়িষ্যার কিছু জমিদারেরও মারাঠাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছিল বলে সিয়ারে উল্লেখ রয়েছে। তবে এ সূত্রে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। সিয়ার, পৃ. ১৪৩

[১৩৮] কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১১৩

[১৩৯] চৌথ হচ্ছে রাজস্বের এক চতুর্থাংশ। মারাঠারা অবক্ষয়ী মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বলপূর্বক চৌথ আদায় করে। ভারতের অন্য অনেক রাজ্য থেকেও মারাঠারা চৌথ আদায় করতো। তখন পর্যন্ত বাংলা এ থেকে মুক্ত ছিল।

[১৪০] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৪২

[১৪১] রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

খানকে সহায়তার কথা জানা যায়। আলিবর্দী খানের সাহায্যের আবেদনে মুঘল সম্রাটের অনুরোধে পেশোয়া বালাজি রাও এবং অযোধ্যার সুবাদার আবুল মনসুর খান সফদর জঙ মারাঠাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। তবে শেষোক্ত সফদর জঙ এ সুযোগে বিহারের বিহারের উপর নিজের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারে বিহার প্রশাসনের প্রভাবশালী অমাত্য হেদায়েত আলী খানের সাথে তাঁর গোপন আঁতাত হয়েছিল। অবশ্য সফদর জঙের এ অপপ্রয়াস সফল হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ যুদ্ধের পরও মারাঠাদের সাথে চূড়ান্ত জয় পরাজয় নিশ্চিত না হওয়ায় অভ্যন্তরীণ নানা সংকটের কারণে রণক্লান্ত বয়োবৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী খান শেষপর্যন্ত মারাঠাদের সাথে আপোস মিমাংসায় যেতে বাধ্য হন। ১৭৫১ সালের মে মাসে দু'পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।[১৪২]

নবাবী বাংলার ইতিহাসে মারাঠা আক্রমণের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য ও প্রভাব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হবে। প্রাসঙ্গিক কারণেই এখানে এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রথমত এ আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তার সুযোগে নবাবকে কিছু অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। দ্বিতীয়ত, মারাঠা আক্রমণের ফলে উড়িষ্যা বলতে গেলে নবাব সরকারের নিয়ন্ত্রণ চ্যুত হয়ে যায়। ১৭৫১ সালের চুক্তি অনুযায়ী মারাঠাদের সহযোগী সেনাপতি মীর হাবিবকে নবাবের পক্ষে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নিয়োগ দেয়া হয়। ১৭৫২ সালের মারাঠাধিপতি জানুজীর জনৈক সৈন্যের হাতে মীর হাবিব নিহত হলে জানুজীর দরবারের সভাসদ মুসলেহ উদ্দিন মুহাম্মদ খানকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নিয়োগ করা হয়। ফলে উড়িষ্যা নামমাত্র বাংলার নবাবের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। তবে বাংলার পরবর্তী রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে মারাঠারা উড়িষ্যাকে তাদের বেরার রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করে।

বাংলায় মারাঠা আক্রমণের ফলে শুধু উড়িষ্যার কর্তৃত্ব হস্তচ্যুত হয়নি এর প্রতিক্রিয়ায় আলিবর্দী খানকে বেশ কিছু রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও সমস্যারও মোকাবিলা করতে হয়। এসব সমস্যার মধ্যে অন্যতম ছিল আফগান অভিজাতদের বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন সমর অভিজাত সেনাপতি মুস্তফা খান। ইতোপূর্বে নবাবী প্রশাসন বিশেষ করে নবাবের উপর তাঁর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। সমসাময়িক সূত্র মতে, মুস্তফা খানের প্রভাব শুধু সামরিক বেসামরিক প্রশাসনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, রাষ্ট্রের খালাসা রাজস্ব বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করে তিনি ভূ-স্বামী অভিজাতদের উপরও কর্তৃত্ব নিশ্চিত করেছিলেন।[১৪৩] মুস্তফা খানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, নবাবের পক্ষে শাসন বিষয়ে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করা অনেক সময়ই সম্ভব হতো না বলে ইউসুফ আলী খান লিখেছেন।[১৪৪] বস্তুত সীমাহীন ক্ষমতা মুস্তফা খানকে অহংকারী, উদ্ধত ও উচ্চবিলাসী করে তুলেছিল। মুস্তফা খানের এ অহংকার ও জাগ্রত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই আফগান বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ বলে সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ির বর্ণনা থেকে বুঝা যায়।[১৪৫] উচ্চবিলাস চরিতার্থকরণের জন্য তিনি স্ব গোত্রীয় আফগানদের ঐক্যবদ্ধ করে নবাবকে হত্যা

---

[১৪২] নবাব আলিবর্দী খান এবং মারাঠাদের মধ্যকার এ চুক্তি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ.১৫০-১৫১; সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৪৯; K. K. Datta, *op. cit.* p. 114

[১৪৩] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭২

[১৪৪] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭২

[১৪৫] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৯২

করার মতো দুঃসাহসী পরিকল্পনাও করেছিলেন বলে জানা যায়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মুস্তফা খান তাঁর স্ব গোত্রীয় আফগানদের ঐক্যবদ্ধ করার অজুহাত হিসেবে নবাবের আফগান বিদ্বেষী নীতিকে কাজে লাগান।[১৪৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানের এক পর্যায়ে নবাব মুস্তফা খানকে বিহারের নায়েব নাজিম পদ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় ক্ষুব্ধ মুস্তফা খান সেনাপতির পদে ইস্তফা দিয়ে ১৭৪৫ সালে বিদ্রোহ করেন। ভ্রাতুস্পুত্র উড়িষ্যার নায়েব নাজিম আবদুর রসুল খান তাঁর সাথে যোগ দেন। আফগান বিদ্রোহীরা রাজধানী মুর্শিদাবাদ দখলের ব্যর্থ হয়ে বিহার দখলের চেষ্টা করে। তবে বিহারের নায়েব নাজিম জৈনউদ্দিন খান সাফল্যের সাথে বিদ্রোহী আফগানদের মোকাবিলা করেন। বিদ্রোহী নেতা মুস্তফা খান নিহত হলে নবাব সরকার একটি বড় অভ্যন্তরীণ সংকটের হাত থেকে রেহাই পায়। উল্লেখ্য যে, মুস্তফা খানের বিদ্রোহ দমনে জৈনউদ্দিন খানের অধীনে নবাব সরকারের প্রতি অনুগত অমাত্য ও ভূ-অভিজাতদের একটি একব্যবদ্ধ শক্তিজোট কাজ করেছিল। শক্তিজোটভূক্ত ভূ-অভিজাতদের মধ্যে ছিলেন টিকারির জমিদার রাজা সুন্দর সিংহ, নরহাটের জমিদার নামদার খান, কামগর খান, সিকরির জমিদার বেসিন সিংহ, শিরীষ কুটুম্বার জমিদার পালোহান সিংহসহ সার্তার সিংহ ও ভুরাত সিংহ এবং অমাত্য অভিজাত আহমেদ খান কোরেশী, শেখ জাহান ইয়ার, শেখ হামিদ উদ্দিন, শেখ আমরুল্লাহ, করম খান, গোলাম জিলানী, খাদেম হোসাইন খান, জসওয়ান্ত নাগর, রাজা কিরাত চাঁদ ও রাজা রামনারায়ন প্রমুখ।[১৪৭]

আফগান বিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটি ছিল একটি একান্তই স্বার্থপ্রসূত সংঘাত। বস্তুত, নবাব আলিবর্দী খান ও আফগানদের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিটি ছিল একান্ততাবেই পারস্পরিক স্বার্থপ্রসূত। আর এ পারস্পরিক স্বার্থের টানাপোড়েনের কারণেই এ বিদ্রোহ। আফগান বিদ্রোহ দমনে জৈনউদ্দিন খানের বিশেষ তৎপরতার পিছনেও তাঁর ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তাই মূখ্য ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। বস্তুত সাম্রাজ্যের অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ অভিজাত অমাত্যের মনেও বাংলার মসনদ দখলের উচ্চবিলাস জাগ্রত হয়েছিল। আর এ উচ্চবিলাস পুরণের জন্যই তিনি বিহারে নিজের শক্তিভিত্তিকে সুসংহত করা প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। বিদ্রোহী আফগানদের বিরুদ্ধে অমাত্য ও ভূ অভিজাতদের সমন্বয়ে শক্তিজোট তৈরির পিছনেও তাঁর এ স্বার্থ চিন্তা কাজ করে থাকতে পারে। তাছাড়া এর সাথে বিহারে তাঁর নিজের ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রশ্নটিও বিশেষভাবে জড়িত ছিল। কেননা বিদ্রোহী নেতা মুস্তফা খান নিজে বিহারের নায়েব নাজিম পদের দাবিদার ছিলেন। এ ভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আফগান বিদ্রোহ ও এর দমনের পিছনে কোনো জাতীয় স্বার্থ চিন্তা নয়, বরং অভিজাত গোষ্ঠীর ব্যক্তিস্বার্থ চেতনা জোরালোভাবে কাজ করেছিল।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রাজনীতিতে উচ্চবিলাস এবং ক্ষমতার মোহ আপন-পরের বাধা মানে না। আলিবর্দী খানের সময়কার কিছু ঘটনার মধ্যে এ সত্যের প্রতিফলন দেখা যায়। প্রসঙ্গত বিহারের নায়েব নাজিম জৈনউদ্দিন খানের বাংলার মসনদ লাভের প্রচেষ্টার কথা বলা যেতে পারে। সমসায়য়িক প্রায় সকল ফারসি তথ্য উৎসে এ প্রসঙ্গটি

---

[১৪৬] সুত্রমতে, নবাব তাঁর বিভিন্ন সামরিক অভিযানে আফগান বাহিনীকে ব্যবহার করেন। তবে কাজ সমাধা হওয়ার পর আফগানদের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করা হতো। এমনকি কোনো কেনো ক্ষেত্রে কাজ সমাধা হয়ে যাওয়ার পর কোন নোটিশ ছাড়াই বকেয়া বেতন পরিশোধ না করেই আফগান সেনাদের ছাঁটাইয়ের নজীরও সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নবাবের এ পদক্ষেপ আফগানদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরী করেছিল। মুস্তফা খান এ সুযোগটি গ্রহণ করেন। হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৩

[১৪৭] হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪; K. K. Datta, *op. cit.* p. 123

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। সূত্র মতে, মারাঠা আক্রমণ ও আফগান বিদ্রোহের ফলে অবনতিশীল পরিস্থিতিতে জৈনউদ্দিন খান উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন এবং বৃদ্ধ নবাবকে অবসর দিয়ে বাংলার সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি শমসের খান ও সরদার খানের নেতৃত্বাধীন দলছুট বিদ্রোহী আফগানদের নিজের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করেন।[১৪৮] তবে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সদ্য তাঁর দলভূক্ত আফগানদের হাতে প্রাণ দিয়ে মসনদ লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম মূল্য দেন।[১৪৯] আফগানরা জৈনউদ্দিন খানের পরিবারের সদস্যদের সাথেও চরম অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। তাদের নিপীড়নের শিকার হয়ে নবাবের ভাই ও জৈনউদ্দিন খানের পিতা হাজী আহমদেরও করুণ মৃত্যু ঘটে। উল্লেখ্য যে, উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদ থেকে সাঈদ আহমদ খান সওলত জঙকে অপসারনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি বিবাদের জের ধরে হাজী আহমদ তাঁর ভাই নবাব আলিবর্দী খানের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাজধানী ত্যাগ করে বিহারে পুত্র জৈনউদ্দিন খানের সাথে অনেকদিন ধরে বাস করছিলেন।[১৫০] সে যা'হোক নিজের ভাই এবং জামাতার মৃত্যু নিংসন্দেহে নবাবের জন্য শোক ও উৎকণ্ঠার বিষয়। তবে তিনি প্রকাশ্যে কোন শোক প্রকাশ না করে পরিপূর্ণ মর্যাদা ও ধৈর্য্যের সাথে বিহার পুনরাধিকারে বের হন এবং পাটনার অদূরে কালাদিয়া নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে বিদ্রোহী আফগান ও মারাঠাদের[১৫১] সম্মিলিত বাহিনীকে বিধ্বস্ত বিহার পুনরাধিকার করেন। বিদ্রোহী নেতা শমসের খান, সরদার খান ও মুরাদ শীর খান প্রমুখ সমর অভিজাত যুদ্ধে নিহত হন।

বিদ্রোহী আফগানদের হাত থেকে বিহার পুনরাধিকার অভিযানে নবাব আলিবর্দী খান বেশ কয়েকজন সামরিক ও ভূ-অভিজাতের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে মীর জাফর আলী খান, পুর্ণিয়ার ফৌজদার সায়েফ আলী খান, খাদিম হোসেন খান, মীর ইসমাঈল খান (সহকারী বখশি), বাহাদুর আলী খান (জিনসী কামান বাহিনীর প্রধান), হায়দর আলী খান (দস্তী কামান বাহিনীর প্রধান), মোহাম্মদ কাজিম খান (সেনাপতি, মীর জাফরের সৎভাই), আল্লাইয়ার খান, মোহাম্মদ ইরাজ খান (সিরাজ-উদ-দৌলাহর শ্বশুর), টিকারীর জমিদার রাজা সুন্দর সিংহ ও জমিদার কামগার খান প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সামরিক সহযোগিতা ছাড়াও সৈন্যদের বকেয়া বেতন পরিশোধ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেয়ার ব্যাপারেও নবাব আলিবর্দী খান অভিজাতদের সহায়তা পেয়েছিলেন। নবাবকে ঋণ ও অনুদান প্রদানকারী অভিজাতদের মধ্যে নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান ও তাঁর স্ত্রী ঘসেটি বেগম এবং জগৎশেঠ প্রমুখ ব্যাংকার মহাজনদের নাম সমকালিন সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।[১৫২] অবশ্য কোনো কোনো

---

[১৪৮] উল্লেখ্য যে মুস্তফা খানের বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে অপর দুজন আফগান সমর অভিজাত শমসের খান ও সরদার খান নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। ইউসুফ আলী খানের মতে, এ দুই আফগান নেতার মধ্যেও বাংলা শাসনের উচ্চবিলাস জাগ্রত হয়েছিল জন্য তারা মারাঠাদের সাথে গোপন আঁতাত গড়ে তুলেন। এ দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে নবাব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে শমসের খান ও সরদার খানকে সেনাবাহিনী থেকে বহিস্কার করেন। তাঁরা অনুগত আফগান বাহিনীসহ উত্তর বিহারের দ্বারভাঙ্গায় আশ্রয় নেন। এ পর্যায়ে জৈনউদ্দিন খানতাদের দলভূক্ত করে নিয়েছিলেন। ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৯৫-৯৮

[১৪৯] এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৪; ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ.৯৮-১০৩; করম আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৩; K. K. Datta, *op. cit.* pp. 132-133

[১৫০] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ.৭০-৭১

[১৫১] পূর্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী মীর হাবীব ও রঘুজী ভোসলের পুত্র জানুজীর নেতৃত্বে মারাঠারা বিদ্রোহী আফগানদের সহায়তার উদ্দেশ্যে আজিমাবাদে এসে উপস্থিত হয় এবং আফগানদের সাথে সম্মিলিতভাবে আলিবর্দী খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

[১৫২] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১০৫

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাতকে এর বিপরীত ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। যেমন- সেনাপতি ফকিরুল্লাহ বেগ ও জাহান ইয়ার বেগ খান নবাবের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন বটে, তবে যুদ্ধে তাদের আন্তরিকতার ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অমাত্য অভিজাত আতাউল্লাহ খানের (সেনাপতি ও ভাগলপুরের ফৌজদার) ভূমিকার কথাও উল্লেখযোগ্য। তিনি গোপনে বিদ্রোহী আফগানদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদ্রোহী নেতা শমসের খান ও সরদার খানকে লেখা আতাউল্লাহ খানের পত্রটি সৌভাগ্যক্রমে পথিমধ্যেই নবাবের হস্ত গত হয়।

বিহার পুনরুদ্ধারের পর এখানকার নতুন প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণে করার সময় নবাবকে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল। কেননা বিহারের নায়েব নাজিম পদকে কেন্দ্র করে অভিজাতদের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তি ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। নবাবের জামাতা সাঈদ আহমদ খান সওলত জঙ বিহারের নায়েব নাজিম পদ প্রত্যাশী ছিলেন। মেহদী নিসার খান, নকি আলী খান এবং গোলাম হোসেন খান প্রমুখ প্রভাবশালী অমাত্য অভিজাতগণ সাঈদ আহমদ খানের দাবিকে সমর্থন করেন। নবাব পত্নী শরফ-উন-নিসা বেগম বিহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে সাঈদ আহমদ খানের নিয়োগের জোরালো বিরোধিতা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবাব আলিবর্দী খান রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীর উপদেশের প্রতি বেশ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে জানা যায়। সমসাময়িক প্রায় সকল ফারসি ইতিহাস গ্রন্থেই বলা হয়েছে যে, রাজ্যশাসন ব্যাপারে শরফ-উন-নিসা ছিলেন স্বামী নবাব আলিবর্দী খানের একজন গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা। নবাব যখন মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত তখন শরফ-উন-নিসা শাসন কাজ পরিচালনায় সর্বোচ্চ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। রাজ্যের সংকটময় অবস্থায় তিনি সাহস, বিজ্ঞোজনোচিত পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে নবাবকে সংকট উত্তরণে সহযোগিতা করেছেন।[১৫৩] কাজেই শরফ-উন-নিসা বেগম যখন বিহারের নায়েব নাজিম পদে সওলত জঙের নিয়োগের বিরোধিতা করেন, তখন নবাবের পক্ষে তা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। বস্তুত নবাব পত্নী এ পদে তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাহকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। নবাবের কাছে এ পদ দাবি করার জন্য তিনি সিরাজকেও প্ররোচিত করেছিলেন বলে ইউসুফ আলী খান উল্লেখ করেছেন।[১৫৪] উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নবাব শেষ পর্যন্ত সিরাজ-উদ-দৌলাহকে বিহারের নায়েব নাজিম এবং রাজা জানকীরামকে তাঁর সহকারী নিয়োগ করেন। বিহারের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর নবাব আলিবর্দী খান রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। নবাবের বিশ্বাসভঙ্গ এবং বিদ্রোহী আফগানদের সাথে গোপন আঁতাত স্থাপনের চেষ্টার অপরাধে ভাগলপুরের ফৌজদার আতাউল্লাহ খানকে বাংলা থেকে বহিস্কার করা হয়।[১৫৫]

---

[১৫৩]গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৯; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *Begums of Bengal*, বাংলা অনুবাদ ডাঃ এম এ কাসেম ও সুভাষচন্দ্র রায়, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.১৬; সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৪

[১৫৪] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১১৬

[১৫৫] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১১৭; উল্লেখ্য যে আতাউল্লাহ খান ১৭৪৭ সালে মীর জাফর প্রমুখের সাথে মিলিত হয়ে মারাঠাদের সহায়তায় আলিবর্দী খানকে মসনদ থেকে উৎখাত এমনকি নবাবকে হত্যার মতো একটি জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। করম আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭১

বিদ্রোহীদের সাথে যোগশাজসের অভিযোগে ওমর খান, রহম খান ও আবদুল আলী খান, ফকিরুল্লাহ বেগ এবং শেখ জাহান ইয়ার বেগ প্রমুখ প্রভাবশালী সমর অভিজাতদেরও নানা রকমের দণ্ড প্রদান করা হয়।[১৫৬]

১৭৫০ সালে নবাব আলিবর্দী খান যখন মেদিনীপুরে মারাঠাদের মোকাবিলায় ব্যস্ত, তখন তাঁর দৌহিত্র ও ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী সিরাজ-উদ-দৌলাহ নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। বস্তুত, মাতামহের অপাত্য স্নেহ ও ভালবাসায় সিরাজ ইতোমধ্যেই বিহারের নায়েব নাজিম পদসহ রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। এসব প্রাপ্তিতে সন্তুষ্টির পরিবর্তে তিনি আরো বেশি উচ্চবিলাসী হয়ে ওঠেছিলেন। ফলে মাতামহের জীবদ্দশাতেই তিনি নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন।[১৫৭] এ ব্যাপারে মেহদী নিসার খানসহ নবাব সরকারের কতিপয় স্বার্থন্বেষী অভিজাত অমাত্য তরুণ সিরাজকে উৎসাহিত করেছিলেন বলে সমকালিন সূত্রসমূহে উল্লেখ রয়েছে। বিচক্ষণ নবাব স্বার্থন্বেষী চক্রের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সিরাজের ভবিষ্যত সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় মীর জাফর আলী খান ও রাজা দুর্লভরামের উপর মেদিনীপুরে মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দায়িত্ব দিয়ে নিজে বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তবে তাঁর বিহারে পৌঁছার পূর্বেই নবাবের অনুগত সহকারী নায়েব নাজিম রাজা জানকীরাম সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিহার জয়ের প্রচেষ্টা প্রতিহত করেন। সহযোগী মেহদী নিসার খান যুদ্ধে নিহত হলেসে সিরাজ নবাবের কাছে আত্মসমর্পন করেন। নবাব সিরাজকে নায়েব নাজিম পদ থেকে অপসারণ করে রাজা জানকীরামকে সে পদে নিয়োগ দেন। অতপর আলিবর্দী খান সিরাজ কে নিয়ে রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৫৮] ১১৬৫ হিজরী (১৭৫১-৫২ খ্রি.) সালে নবাব তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাহকে তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে রাজ্যের রাজস্ব ও প্রশাসন ব্যাপারে লিখিত ও অলিখিত অনেক দায়িত্বভার তাঁর উপর অর্পন করেন।[১৫৯]

১৭৫১ সালের চুক্তির ফলে নবাবের সাথে মারাঠাদের দীর্ঘ এক দশকের যুদ্ধের অবসান ঘটে। তবে এসময় রাজ্যের অভিজাত চক্রের মধ্যকার স্বার্থ ও ক্ষমতার লড়াই বয়োবৃদ্ধ নবাবের উপর একরকমের বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নবাবকে রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা ও তাঁর উত্তরাধিকারী সিরাজ-উদ-দৌলাহর ভবিষ্যত নিস্কন্টক করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অভিজাতচক্রের কারো কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয়। এ প্রসঙ্গে নবাব সরকারের প্রভাবশালী অমাত্য হোসেনকুলি খান ও তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র আহসান উদ্দিন খানের[১৬০] কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হোসেনকুলি খান ছিলেন ঢাকার নায়েব নাজিম নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের সহকারী ও দিউয়ান। সমসাময়িক সূত্র মতে, নায়েব নাজিম ও তাঁর স্ত্রী নবাব দুহিতা ঘসেটি বেগমের সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকায় হোসেনকুলি খান নবাব সরকারের একজন অত্যান্ত প্রভাবশালী অভিজাত অমাত্য হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র জাহাঙ্গীরনগর হলেও সেখানে না গিয়ে শুরু থেকে তিনি নায়েব নাজিমের সাথে মুর্শিদাবাদেই অবস্থান

---

[১৫৬] করম আলী খান, পূর্বোক্ত, পৃ.পৃ.৭৮-৭৯

[১৫৭] এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা: সেকালের সমাজ ও রাজনীতি*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, বাংলা ১৪১৭, পৃ.পৃ. ১৯-২২

[১৫৮] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৪৪; সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৩২৫-৩৪৪

[১৫৯] করম আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮২

[১৬০] সিয়ারে এ ব্যক্তির নাম হোসেন উদ্দিন খান বলা হয়েছে। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৪

Dhaka University Institutional Repository

করতে থাকেন। দিউয়ানের অনুপস্থিতিতে তাঁর সহকারী গোকুলচন্দ্রই সব দায়িত্ব পালন করেন। গোকুলচন্দ্র ছিলেন একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা। এক পর্যায়ে তিনি দিউয়ান হোসেনকুলি খানের দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থ তছরূপের ব্যাপারে নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে নবাব তাঁকে দিউয়ানের পদ থেকে পদচ্যুত করেন। জাহাঙ্গীরনগরের ফৌজদার ইয়াসিন খানকে দিউয়ান পদে নিয়োগ দেয়া হয়। অবশ্য হোসেনকুলি খান নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান ও তাঁর স্ত্রী ঘসেটি বেগমের মধ্যস্থায় অচিরেই পুনরায় স্বপদে নিয়োগ লাভ করেন এবং পূর্বাপেক্ষা প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে কাজ করতে থাকেন।[১৬১] তাঁর প্রতিশোধ পরায়ণতার শিকার হয়ে গোকুলচন্দ্র তাঁর পদ হারান এবং রাজবল্লভ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।
পুনরায় দিউয়ান পদে নিযুক্তি লাভের পরও হোসেনকুলি খান জাহাঙ্গীর নগর না গিয়ে রাজধাণীতেই অবস্থান করেন। ভাইপো ঢাকার কিল্লাদার আহসান উদ্দিন খানের উপর দিউয়ানি দায়িত্ব অর্পন করে তিনি মুর্শিদবাদ দরবারের ঘরোয়া রাজনীতির সাথে নিজেকে বিশেষভাবে জড়িয়ে ফেলেন। সমসাময়িক সকল তথ্য উৎসই লিখেছে যে, হোসেনকুলি খান ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। অকৃতদার সুর্দশন এ ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ দ্বারা নবাব দুহিতা ঘসেটি বেগম এবং পরবর্তীতে সিরাজ মাতা আমেনা বেগমের সাথেও বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলেন। এ সম্পর্ক স্বাভাবিক শালীনতার পর্যায় অতিক্রম করেছিল বলে সমসায়িক ফারসি সূত্রসমূহে উল্লেখ। শুধু নবাব দুহিতাদের নয়, বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও কূটকৌশলের সাহায্যে হোসেনকুলি দরবারী রাজনীতির প্রধান প্রধান কুশীলবদের অধিকাংশেরই দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। সুযোগ বুঝে হোসেনকুলি খান ভবিষ্যত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধেও জড়িয়ে যান। দরবারী রাজনীতিতে তাঁর অস্বাভাবিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে নবাব আলিবর্দী খান এবং তাঁর উত্তরাধিকারী সিরাজ-উদ-দৌলাহ্ উভয়েই শঙ্কাবোধ করেন। নিজের ভবিষ্যত নিস্কন্টক করার মানসে সিরাজ হোসেনকুলি খানের বিনাশ সাধনের সিদ্ধান্ত নেন। এ ব্যাপারে মতামহী শরফ-উন-নিসা তাঁকে পরোক্ষ সমর্থন দেন বলে সূত্রে উল্লেখ।[১৬২] ১৭৫৪ সালে সিরাজ-উদ-দৌলাহর নির্দেশে হোসেনকুলি খান কে হত্যা করা হয়। এর আগে হোসেনকুলির চাচাতো ভাই আহসান উদ্দিন খান নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ডের পিছনেও সিরাজ-উদ-দৌলাহর হাত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৬৩] এ সময় আর যে সব অভিজাতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তাদের অন্যতম বখশি আবদুল হাদী খান। নবাবের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ এবং ষড়যন্ত্র করার অপরাধে মীর জাফর আলী খানকে পদচ্যুত করে এ কর্মকর্তাকে বখশি পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। বখশি হিসেবে আবদুল হাদী খান প্রভূত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তবে ধৈর্যের অভাবে এ কর্মকর্তা এত ঔদ্ধত হন যে, নবাবের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা ও সীমা লংঘন করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এ াবস্থায় প্রশাসনে শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থেই নবাব তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন।[১৬৪]

এ পর্যায়ে নবাবী বাংলার ক্ষমতা কাঠামোর প্রভাশালী শরিক ভূ-অভিজাত জমিদারদের সাথে নবাব আলিবর্দী খানের সম্পর্ক সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন। নবাব আলিবর্দী খানের সাথে রাজ্যের প্রভাবশালী শক্তি জমিদারদের

---

[১৬১] হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৩

[১৬২] শ্রী নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১২৫

[১৬৩] এ দু'টি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে *মোজাফফরনামা*, *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙী* ও *সিয়র-উল-মুতাখ্খিরিন* গ্রন্থে বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

[১৬৪] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের পরিমাণ স্বাভাবিক প্রত্যাশার চেয়ে কম। সম্ভবত মসনদ লাভের পর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নবাবের বিশেষ ব্যস্ততা, মারাঠা আক্রমণ মোকাবিলায় প্রায় এক দশকের ক্লান্তিকর ও কষ্টসাধ্য সামরিক অভিযান এবং আফগান বিদ্রোহ প্রভৃতি কারণে নবাবের পক্ষে নতুন ভূমি বন্দোবস্ত এমনকি জমিদারদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে আরেকটি সম্ভাবনার কথাও বলা যায় এবং তা হলো তাঁর পূর্বসূরী নবাবদের সময় সূচিত নিয়মতান্ত্রিকতা ও স্বার্থানুকূল রাজস্ব প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় আলিবর্দী খান রাজস্ব প্রশাসন বা তৎসংশ্লিষ্ট জমিদারবর্গের ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামানোর তাগিদ অনুভব করেননি। তবে বর্গী হামলা মোকাবেলার জন্য আলিবর্দী খানকে জমিদারকুলের নিকট থেকে সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতা নিতে হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের জমিদারকূল সরাসরি বর্গী আক্রমণের শিকার হওয়ায় নবাব পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের জমিদারবর্গের নিকট থেকে বর্ধিত হারে রাজস্ব ও বিবিধ খাতে অর্থ আদায় করেন। রাজশাহী, দিনাজপুর ও নদীয়ার জমিদারগণ রাজ্য রক্ষায় নবাবের বর্ধিত রাজস্ব দাবি মেটাতে বাধ্য হন। বাংলার অন্যতম বৃহত্তম জমিদারি ছিল নদীয়া। নবাব আলিবর্দী খান নদীয়া থেকে বর্ধিত রাজস্ব আদায়ের জন্য যে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তাতে সেখানকার প্রজাকূলের সর্বশান্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল বলে *নদীয়া কাহিনীতে* বলা হয়েছে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যগ্রন্থ সূত্রে নদীয়া কাহিনী গ্রন্থাকার আরো জানাচ্ছেন যে, নবাবের দাবি মোতাবেক দশলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া নদীয়াধিপতি বিখ্যাত ভূ-অভিজাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে কিছুকালের জন্য কারাবরণও করতে হয়েছিল।[১৬৫] যদুনাথ সরকার মনে করেন, আলিবর্দী খানের আবওয়াবসহ ভূমি রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়ার বর্ধিত চাপের মুখে জমিদারবর্গের মধ্যে যথেষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।[১৬৬] আর এর মাশুল দিতে হয় তাঁর উত্তরাধিকারী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহকে। মাতামহের নীতি জমিদারদের সাথে তাঁর সম্পকর্কে প্রভাবিত করে।

আগেই বলা হয়েছে যে, আঠারো শতকের গোড়া থেকেই নবাবী রাষ্ট্রের অর্ন্তদেশ পর্যন্ত বণিক-সওদারগরদের প্রভাব গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। নবাব আলিবর্দী খানের সময় নানা কারণে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বণিক শক্তির প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পায়। এসব বণিকদের মধ্যে জগৎশেঠ পরিবারের প্রাধান্য পূর্বের মতো বহাল থাকে। সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে আলিবর্দী খানের ষড়যন্ত্র এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে জগৎশেঠ ফতেহচাঁদকে আলিবর্দীর মিত্ররূপে দেখা যায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সাহায্যকারীদের প্রতি নবাব আলিবর্দী খান যেভাবে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন, তা থেকে ফতেহচাঁদও বঞ্চিত হননি। ১৭৪৪ সালে জগৎশেঠ ফতেহচাঁদ মারা যান। পৌত্র মহাতাব চাঁদ ও স্বরূপ চাঁদ তাঁর উত্তরাধিকারী হন।[১৬৭] মুঘল সম্রাট আহমদ শাহ (১৭৪৮-১৭৫৪ খ্রি.) মহাতাব চাঁদকে 'জগৎশেঠ' ও স্বরূপ চাঁদকে 'মহারাজা' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। আলিবর্দী খানের সাথে জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের যে সম্পর্ক ছিল তাঁর উত্তরসূরি মহাতাব চাঁদ ও স্বরূপ চাঁদের সাথে পূর্বোক্ত সম্পর্কের ধারা শুধু অক্ষুন্ন থাকেনি, বরং আরো জোরদার

---

[১৬৫] কুমদনাথ মল্লিক, *নদীয়া কাহিনী*, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ.২৫

[১৬৬] J N Sarkar, *History of Bengal Vol.II*, p. 454

[১৬৭] জগৎশেঠ ফতে চাঁদের আনন্দ চাঁদ, দয়া চাঁদ ও মহা চাঁদ নামে তিন পুত্র ছিল। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'জন পিতার জীবদ্দশাতেই মারা যান। মহাতাব চাঁদ ছিলেন আনন্দ চাঁদের এবং স্বরূপ চাঁদ দয়া চাঁদের পুত্র। শ্রী নিখিল নাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬ । ফতেহ চাঁদ তাঁর জীবিত পুত্র মহা চাঁদকে কেন উত্তরাধিকারী করেন নি এবং পরবর্তীতে তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। শ্রী নিখিলনাথ রায় লিখেছেন যে, নবাব সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এসময় শেঠদের প্রতিপত্তি ও বাণিজ্যিক কারবার উন্নতির শীর্ষে আরোহন করে। তিনি আরো বলেন, নবাব আলিবর্দী খান জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদকে যথেষ্ট খাতির করতেন এবং শাসন ব্যাপারে ফতেহচাঁদের মতো তাঁরও পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[১৬৮] J H Little এর তথ্য অনুযায়ী মারাঠাদের আক্রমণ চলাকালে জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদ ও মহারাজা স্বরূপ চাঁদ নবাবকে অতি প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি সমরোপকরণ সরবরাহ করে সহযোগিতা করেন।[১৬৯] নবাবী বাংলার অন্যতম বৃহৎ ও প্রভাবশালী জমিদারি ছিল নাটোরের জমিদারি। জমিদার রামকান্তের দুর্বলতার সুযোগে এ জমিদারিকে কেন্দ্র করে গৃহ বিবাদ দেখা দিলে নবাব এ সংঘাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং জমিদারি রামকান্তের বিরোধী পক্ষ তাঁর ভাইপো দেবী প্রসাদকে অর্পণ করেন। তব্যে জগৎশেঠের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত নবাব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং রামকান্তকে জমিদারি ফিরিয়ে দেয়া হয়।[১৭০] এ ঘটনায় নবাবের উপর জগৎশেঠের প্রভাব এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন যে, বাহ্যত শেঠ পরিবাবর এবং নবাবের মধ্যে সম্পর্কে কোনো ঘাটতি না থাকলেও মারাঠা আক্রমণকালে শেঠদের নিকট থেকে নবাববের উপর্যুপরি অর্থ আদায়, মারাঠাদের দ্বারা তাদের গদি লুন্ঠন ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে উভয়ের সম্পর্কে কিছুটা হলেও টানাপোড়েনের সৃষ্টি করেছিল। পলাশীর ঘটনায় শেঠদের নবাব বিরোধী ভূমিকায় এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

শেঠ-সওদাগরদের মধ্যে আর্মেনিয় বণিক খোজা ওয়াজিদের ভূমিকাও বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যের গণ্ডির বাইরে এ প্রভাবশালী বণিককে আলিবর্দী খানের আমলে রাজনৈতিক অঙ্গনেও সক্রিয় দেখা যায়। মারাঠাদের সাথে ১৭৫১ সালে নবাব আলিবর্দী খানের যে চুক্তি হয়েছিল, তাতে খোজা ওয়াজিদ ছিলেন অন্যতম মধ্যস্থতাকারী।[১৭১] নবাব সরকারকে অর্থ যোগান দেয়ার কারণে উপরে বর্ণিত বণিক-সওদাগরদের বাইরেও অন্যান্য অভিজাত বণিকগণও দরবার এবং রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলে জানা যায়।

নবাব আলিবর্দী খান তাঁর পুরো শাসনামল নানা সংকট ও সমস্যার মধ্যে অতিবাহিত করেন। নানা রকম মানসিক যন্ত্রণা ও পীড়নের মধ্য দিয়ে তাঁর শেষ জীবন অতিক্রান্ত হয়। নবাব সরকারের প্রভাবশালী অমাত্য তাঁর তিন জামাতার (জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান, পুর্ণিয়ার ফৌজদার সাঈদ আহমদ খান সওলত জঙ এবং বিহারের নায়েব নাজিম জৈনউদ্দিন খান) মৃত্যু, বড় ভাই হাজী আহমদ খান এবং দৌহিত্র ইকরাম-উদ-দৌলাহ (সিরাজ-উদ-দৌলাহর ছোট ভাই) মৃত্যুতে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী খান দারুণভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং শোককাতর অবস্থায় ১৭৫৬ সালের ৯ এপ্রিল মৃত্যু মুখে পতিত হন । মৃত্যুর পূর্বে সাঈদ আহমদ খানের পুত্র শওকত জঙকে নবাব তাঁর পিতার স্থলে পুর্ণিয়ার ফৌজদার নিয়োগ করেন। পরে এই শওকত জঙই বাংলার মসনদকে কেন্দ্র করে সিরাজ-উদ-দৌলাহর সাথে ক্ষমতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

---

[১৬৮] শ্রী নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮৭

[১৬৯] J H Little, *op. cit.* p. 137

[১৭০] শাহ আজিজুর রহমান, *রাজশাহী পরিচিতি*, বরেন্দ্র একাডেমী, রাজশাহী, ১৯৮০, পৃ.পৃ. ১৮৪-১৮৫

[১৭১] K. K. Datta, *op. cit.* p

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, নবাবী যুগে সরকার ও বিশেষ করে রাজনীতিতে অভিজাত প্রধান্যের যে ঐতিহ্য সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের শাসনামলে শুরু হয়েছিল আলিবর্দী খানের সময় তা আরো শক্তিশালী রূপধারণ করে। এসময় অভিজাত চক্রে হিন্দু প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এই হিন্দু প্রাধান্য বৃদ্ধির কারণ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন যে, মুর্শিদকুলি খানের বংশকে সরিয়ে নবাবী পদ লাভ করায় মুসলমান অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই আলিবর্দী খানের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। কাজেই আত্মরক্ষার্থে তিনি হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ দেন। আর হিন্দুরাও তাঁকে রাজ্যের স্থিতি ও শক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।[১৭২] রমেশচন্দ্র মজুমদারের এ বক্তব্যে কিছুটা অতিরঞ্জন রয়েছে। আলিবর্দী খান বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখল করেছিলেন সত্য, কিন্তু এ কারণে সাধারণভাবে মুসলমান অভিজাতগণ তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন এমন তথ্য সমকালিন ঐতিহাসিক সূত্রে পাওয়া যায় না। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন দুরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে যাঁকে তাঁর প্রয়োজন ছিল তাঁকে তিনি কাছে টেনে নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম বিবেচনা মূখ্য ছিল না। আর প্রশাসনে হিন্দুদের নিয়োগের ঐতিহ্য মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকেই পরিলক্ষিত হয়। আলিবর্দী খানের সময় সরকার ও রাজনীতির দৃষ্টপট থেকে কিছু পুরনো অভিজাতের বিদায় এবং হোসেনকুলি খান, রাজা রাজবল্লভ প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির প্রশাসনে উচ্চপদ লাভ এবং তাদের বিশেষ সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন সমকালিন ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোন কোন পণ্ডিত একে একটি নতুন ধারার আভিজাতিক বিকাশ বলে মনে করেন।[১৭৩] বস্তুত নতুন ধারার এ অভিজাত চক্র নবাব আলিবর্দী খানের রাজত্বের শেষ প্রান্তে এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, তাদের সম্মিলিত অবস্থান বাংলার পরবর্তী ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

৬.৫ বাংলার প্রশাসন ও রাজনীতিতে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা: নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর শাসনামল

নবাব আলিবর্দী খানের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাহ 'নবাব মনসুর-উল-মুলক মির্যা মোহাম্মদ শাহকুলি খান সিরাজ-উদ-দৌলাহ হয়বত জঙ বাহাদুর' উপাধি নিয়ে ১৭৫৬ সালের ১৫ এপ্রিল বাংলার মসনদে আরোহন করেন। সিরাজ-উদ-দৌলাহ ছিলেন প্রয়াত নবাব আলিবর্দী খানের মনোনীত উত্তরাধিকারী।[১৭৪] আলিবর্দী খানের জীবদ্দশায় সিরাজকে উত্তরাধিকার নিয়োগের বিষয়ে প্রকাশ্যে কেউ বিরোধিতা না করলেও সমকালিন অভিজাতদের অনেকেই একে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে নবাবের জ্যেষ্ঠ জামাতা নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান ও তাঁর স্ত্রী ঘসেটি বেগম কথা বলা যায়। বাংলার মসনদের প্রতি স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সীমাহীন লোভ ছিল বলে জানা যায়। আলিবর্দী খানের জীবদ্দশাতেই নওয়াজিশ মোহাম্মদ মারা যাওয়ায় সিংহাসনে স্বামীর দাবি না থাকলেও ঘসেটি বেগম মসনদকে কুক্ষিগত করার আশা ত্যাগ করেননি। তিনি তাঁর দত্তক পুত্র প্রয়াত ইকরাম-উদ-দৌলাহর শিশু পুত্র মুরাদ-উদ-দৌলাহকে সামনে রেখে পিতৃ মসনদে নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু এতে সফল না হওয়ায়

---

[১৭২] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, *২য় খন্ড*, কলিকাতা, পৃ. ২৩১

[১৭৩] হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪২

[১৭৪] ১৭৫১/৫২ সালেই নবাব আলিবর্দী খান সিরাজকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। করম আলী খান,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মেঝো বোনের[১৭৫] বড় ছেলে পুর্নিয়ার ফৌজদার শওকত জঙকে সিরাজের পরিবর্তে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। এতে তাঁর নিজের বিশেষ কিছু লাভ না হলেও সম্ভবত তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। বস্তুত সিরাজের প্রতি ঘসেটি বেগমের ছিল চরম বিদ্বেষ। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাহাঙ্গীরনগরের দিউয়ান ও সহকারী হোসেনকুলি খান ছিলেন ঘসেটি বেগমের অতিপ্রিয়ভাজন। সিরাজ-উদ-দৌলাহর নির্দেশে হোসেনকুলির নিহত হওয়ার ঘটনায় ঘসেটি বেগম সিরাজের প্রতি চরম বিক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই শওকত জঙকে মসনদ প্রতিষ্ঠিত করে ঘসেটি বেগম সিরাজের প্রতি তাঁর যে জিঘাংসা ছিল তা চরিতার্থ করার করার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে মীর জাফর, রাজবল্লভ প্রমুখ কয়েকজন অভিজাত অমাত্য তাঁর সাথে জোট বেধেছিলেন।

নবাবী যুগে সরকার ও রাজনীতিতে মীর জাফর আলী খানের উত্থান সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মীর জাফরের উত্থান ও প্রতিষ্ঠার পিছনে আলিবর্দী খানের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। কিন্তু মীর জাফর ছিলেন অকৃতজ্ঞ ও সীমাহীন উচ্চবিলাসী। আলিবর্দী খানের জীবদ্দশাতেই তিনি একাধিকাবার ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস ঘাতকতার মাধ্যমে বাংলার সিংহাসন দখলের যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন, সে সংবাদ সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থে রয়েছে।[১৭৬] আলিবর্দী খানের সময় সফল না হলেও বাংলার মসনদ দখলের আকাঙ্ক্ষা মীর জাফরের মন থেকে মুছে যায়নি। তবে এ ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বড় বাধা মনে করতেন সিরাজ-উদ-দৌলাহকে। কেননা কিছুটা উদ্ধত প্রকৃতির হলেও সিরাজ ছিলেন বুদ্ধিমান এবং প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আলিবর্দী খানের উত্তরসূরীদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। ক্ষমতালোভী মীর জাফরের ভয় ছিল একবার সিরাজ মসনদে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তাঁকে আর সরানো সম্ভব হবে না। আর আলিবর্দী খানের পরিবারের সদস্য ব্যতিরেকে তাঁর নিজের সিংহাসন দখলের বিষয়টিও ঝুকিপূর্ণ হবে। কেননা এতে সেনাবাহিনী বা সাধারণ মানুষ কারো সমর্থন পাওয়া যাবে না। এ অবস্থায় মীর জাফর সিরাজের পরিবর্তে শওকত জঙকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। কারণ তিনি জানতেন নবাব হিসেবে শাসন কাজ পরিচালনা করার মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা জড়বুদ্ধির শওকত জঙের নেই।[১৭৭] এ অবস্থায় তাঁকে হটিয়ে সিংহাসন দখল তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। এ চিন্তা সম্ভবত মীর জাফরকে সিরাজের ব্যাপারে ঘসেটি বেগমের সাথে আঁতাত স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিছু শর্তসাপেক্ষে সিরাজ-উদ-দৌলাহর কাছ থেকে মসনদ অধিকারের ব্যাপারে সহায়তার প্রস্তাব দিয়ে শওকত জঙকে পাঠানো মীর জাফরের পত্রের বিষয়ে *সিয়ার-উল-মুতখ্খিরিনে* উল্লেখ রয়েছে।[১৭৮] উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মীর জাফর বখশি ও সেনাপ্রধান হিসেবে তাঁর প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের প্রধান প্রধান সমর অভিজাতদেরও তাঁর দলভূক্ত করেন। রাজা দুর্লভরাম, ইয়ার লতিফ খান, উমর খান, সৈয়দ খাদিম হোসেন খান, রাজা মানিকচাঁদ প্রমুখ

---

[১৭৫] সমকালীন তথ্য সূত্রসমূহে নবাব আলিবর্দী খানের এ দ্বিতীয় কন্যার নাম উল্লেখ নেই। অবশ্য আ ক মো যাকারিয়া বলেছেন তাঁর নাম ছিল মোমেনা খাতুন বা মায়মুনা খাতুন।

[১৭৬] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য মোহাম্মদ মামুনর রশীদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. পৃ. ২২-২২৫

[১৭৭] শওকত জঙ যে জড়বুদ্ধির, ইন্দ্রিয়াক্ত, উদ্ধত প্রকৃতির ও অকমর্ণ্য যুবক ছিলেন সমকালীন ইংরেজ কোম্পানির দলিল এবয় ফারসি গ্রন্থাদিতে সে কথা বলা হয়েছে। করম আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১২; ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৯; Consultations, 15 September, 1756; অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা*, দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৪৪

[১৭৮] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪৫

সমর অভিজাতগণ ছিলেন এদের অন্যতম।[১৭৯] প্রসঙ্গত রাজবল্লভের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজবল্লভ নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের অধীনে জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব দিউয়ান ছিলেন। হোসেনকুলি খান নিহত হওয়ার পর তিনি দিউয়ান পদ লাভ করেন। নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের মৃত্যুতে রাজবল্লভের উত্থানের পথ আরো সুপ্রশস্ত হয়। কেননা নায়েব নাজিমের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরনগর প্রশাসনের উত্তরাধিকার তাঁর স্ত্রী ঘসেটি বেগমের উপর বর্তায়। আর ঘসেটি বেগম জাহাঙ্গীরনগরে অনুপস্থিতির সুযোগে সেখানকার প্রশাসনে রাজবল্লভ একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৮০] এমতাবস্থায় মুর্শিদাবাদ মসনদকে ঘিরে যে উত্তরাধিকার সংঘাত শুরু হয়, তাতে রাজবল্লভ হয়ে ওঠেন ঘসেটি বেগমের প্রধান সহকারী ও পরামর্শদাতা। সিরাজের প্রতি রাজবল্লভের ব্যক্তিগত আক্রোশও ছিল বলে জানা যায়। প্রাপ্ত তথ্য মতে, আলিবর্দী খানের জীবন সয়াহ্নকালে মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারী সিরাজের হাতে রাজবল্লভকে আটক হয়ে মুর্শিদাবাদে কিছুকাল বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছিল। ঘসেটি বেগমের তৎপরতায় তখন তিনি মুক্তি পান।[১৮১] সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিপক্ষ দলীয়দের সাথে রাজবল্লভের একজোট হওয়ার পিছনে বর্ণিত এ ঘটনার জেরও যে ভূমিকা রেখেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সিরাজ-উদ-দৌলাহ এসব ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই মসনদে আরোহন করে বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে নবাব তাঁর খালা ঘসেটি বেগমের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। গোলামাল পরিত্যাগ করে মোতিঝিল প্রাসাদ ছেড়ে মুর্শিদাবাদে নবাবের প্রসাদে এসে তাঁকে বাস করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। এ অনুরোধে সাড়া না দেয়ায় নবাব মোতিঝিল প্রাসাদ অধিকার করেন।[১৮২] ঘসেটি বেগমকে কৌশলে নিজ প্রাসাদে এনে মতামহী ও মাতার সাথে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য সিরাজের প্রাসাদে এসেও ঘসেটি বেগম হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিলেন না। এখানে থেকেও তিনি মীর জাফর আলী খানের সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং তাঁর কাছে রক্ষিত অর্থ পাঠিয়ে সিরাজকে উৎখাত করার জন্য মীর জাফরকে উৎসাহ দিতেন বলে জানা যায়।[১৮৩]

নবাব হিসেবে সিরাজ-উদ-দৌলাহ প্রশাসন ও সামরিক বিভাগকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কিছু বিশ্বস্ত লোককে প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান করেন। *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ* এর তথ্য অনুযায়ী চক্রান্তকারী মীর জাফর আলী খানকে বখশি পদ থেকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদনকে বখশি পদে নিয়োগ দেয়া হয়। কাশ্মিরী মোহনলাল লাভ করেন দিউয়ান ও প্রধানমন্ত্রীর পদ। সিয়ারের বর্ণনা মতে, মোহনলালকে প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়ে তাঁকে মহারাজা উপাধি এবং পাঁচ হাজারী মনসবদার করা হয়েছিল। প্রশাসনে মীর মদন ও মোহনলালের উত্থান ও গুরুত্বপূর্ণ রাজ পদ লাভের ঘটনায় নবাব

---

[১৭৯] আ কা মো যাকারিয়া, *সিরাজ-উদ-দৌলা*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১১৮

[১৮০] হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৬

[১৮১] S.C. Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, p. 3

[১৮২] সমকালীন তথ্য উৎস থেকে জানা যায় যে, এ সময় ঘসেটি বেগমের অনুগ্রহভাজন এবং প্রিয়পাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সেনাপতি মীর নযর আলী। তিনি এবং মীর কুদরত উল্লাহ, মীর শরফ উদ্দিন ও মীর গোলম আলী প্রমূখ সামরিক অভিজাতগণ ঘসেটি বেগমের বদান্যতায় প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাঁরা কেউ সিরাজের আক্রমণ থেকে ঘসেটি বেগমকে রক্ষা করতে পারেননি। এমনকি মীর নযর আলী পর্যন্ত ঘসেটি বেগমকে শত্রুর হাতে ফেলে রেখে নিজে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৪

[১৮৩] আ কা মো যাকারিয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী অভিজাত অমাত্যগণ আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মীর জাফরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে।[১৮৪] পুরনো অভিজাত কর্মকর্তাদের পদচ্যুতি এবং অনুগত কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দান নবাব সরকার যুগের কোনো অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। সিরাজ-উদ-দৌলাহর পূর্বসূরী প্রত্যেক নবাবই এ কাজ করেছেন। পূর্বসূরী নবাবদের গৃহীত এ ব্যবস্থা স্বাভাবিক বলে গণ্য হলেও সিরাজ-উদ-দৌলাহর এ পদক্ষেপকে সমকালিন প্রায় সকল ঐতিহাসিক গর্হিত কাজ বলে সমলোচনা করেছেন। বস্তুত এরূপ সমালোচনা ইতিহাসবিদদের সত্যনিষ্ঠ আচরণ নয়, বরং সিরাজের প্রতি তাঁদের বিরূপ ও অনুদার মনোভাবেরই বহিপ্রকাশ।

ঘসেটি বেগমকে নিয়ন্ত্রণে আনার পর সিরাজ-উদ-দৌলাহর পরবর্তী লক্ষ ছিল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পুর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙকে দমন। তবে এ কাজে অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই তাঁকে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হয়। তাই এ পর্যায়ে প্রাসঙ্গিকতার কারণেই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সাথে ইংরেজ কোম্পানির বিরোধ এবং এতে নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা বিচার-বিশ্লেষণ আবশ্যক। বস্তুত কোম্পানির সাথে সিরাজ-উদ-দৌলাহর সংঘাত ও সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, গোলাম হোসেন সলিম, করম আলী খানসহ সমকালিন এবং এস. সি. হিল, সি. এ বেইলি, পিটার জে মার্শাল এবং রজতকান্ত রায় প্রমুখ পরবর্তী ঐতিকহাসিকদের অনেকেই ইংরেজদের সাথে বিরোধ ও সংঘর্ষের জন্য নবাবকেই দায়ী করেছেন।[১৮৫] হিল এর মতে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর আত্মম্ভরিতা (vanity) ও অর্থলিপ্সাই (avarice) ইংরেজদের সাথে নবাবের সংঘর্ষের মূখ্য কারণ। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে নবাবের উত্থাপিত সুনিদৃষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলোকে হিল ইংরেজদের আক্রমণ করার জন্য 'নবাবের মিথ্যা অজুহাত' বলে অভিহিত করেছেন।[১৮৬] কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন মনস্তাত্ত্বিকভাবে সিরাজ-উদ-দৌলাহ ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন এবং এদেশ থেকে ইংরেজদের বহিস্কার করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।[১৮৭] কিন্তু উপরে বর্ণিত এসব অভিযোগ সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সুশিল চৌধুরী সমকালিন ইংরেজ, ফরাসি এবং ডাচ কোম্পানির দলিল-দস্তাবেজ বিচার-বিশ্লেষণ করে ইংরেজদের সাথে নবাবের সংঘর্ষের কারণ হিসেবে উপরে বর্ণিত অভিযোগসমূহ

---

[১৮৪] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৪

[১৮৫] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ.৪৩৭-৪৩৮; গোলাম হোসেন সলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৬; করম আলী খান,*পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১০৪-১০৫; S. C. Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. I, Introduction, p. liii; C. A. Bayly, *Indian Socitey and the Making of the British Empire,* Cambridge, 1987, pp. 49-50; P. J. Marshall, *Bengal-The British Bridgehead,* Cambridge, 1987, pp. 67, 75-77, Rajat Kanta Roy, 'Colonial Penetration and Initial Resistance: The Mughal Ruling Class, the English East India Company and the Struggle for Bengal', *Indian Historical Review,* 12 (July 1985-January 1986), pp. 12, 14-15

[১৮৬] S. C. Hill, *op. cit.* Vol. I, p. liii

[১৮৭] S. C. Hill, *op. cit.* Vol. III, p. 163; C. A. Bayly, *op. cit.* p. 46, রজকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র*, পৃ. ৩২; যদুনাথ সরকার মনে করেন যে, নবাব হবার আগে সিরাজ-উদ-দৌলাহ কয়েকবার ইংরেজদের দ্বারা অপমানিত হন এবং নবাবব হবাব পর চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ইংরেজদের কাছ থেকে উপঢৌকন পাননি। ফলে তাঁর মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিঘাংসা জেগে ওঠে এবং অকারণে নিজের পতন ডেকে আনেন। J. N. Sarkar, *op. cit.* pp.471-72

Dhaka University Institutional Repository

যে যথার্থ নয়, তা প্রমাণ করেছেন।[১৮৮] বস্তুত নবাব হওয়ার পূর্বে এমনকি, নবাব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরেও ইংরেজদের প্রতি সিরাজ-উদ-দৌলাহর যে বিদ্বেষ, শত্রুতা বা বিরূপ মনোভাব ছিল না তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ইংরেজসমেত ইউরোপীয়দের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মাতামহ নবাব আলিবর্দী খানের মতোই। সন্দেহ নেই দক্ষিণ ভারতের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সিরাজ তাদের ব্যাপরে সতর্ক ছিলেন, কিন্তু তাদের প্রতি বিরূপ বা শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন-তা সত্য নয়। ফোর্ট উইলিয়ামের নথিপত্রেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৮৯] লন্ডন থেকে কোম্পানির পরিচালক সমিতির ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলকে লেখা দু'টো চিঠিতে ইংরেজদের প্রতি নবাবের প্রসন্ন মনোভাবের কথা উল্লেখ করে এ সম্পর্কের আরো উন্নতি এবং এ সুযোগকে কাজে লাগানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[১৯০] নবাব হবার পর ইংরেজ কোম্পানি নবাবকে একটি চিঠি লিখে অভিনন্দন জানায় এবং তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ ও নিরাপত্তা কামনা করলে নবাব ইংরেজদের প্রতি আলিবর্দী খানের চেয়ে ভালো ব্যবহার করবেন বলে আশ্বাস দেন।[১৯১] ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া বা তাদের বিতাড়িত করা যে নবাবের মোটেই অভিপ্রায় ছিল না, সেটা মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জের গভর্নর পিগটকে লেখা তাঁর পত্রেতেও সুস্পষ্ট।[১৯২] বর্ণিত এসব তথ্য প্রমাণ নবাবের ইংরেজদের প্রতি বিরূপ বা বিদ্বেষ নয়, বরং তাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাবেরই প্রকাশ। অবশ্য নবাব হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দুপক্ষের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি এবং পরিণামে বিরোধ ও সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এজন্য যে ইংরেজরা যে দায়ী ছিল একথা কোম্পানির কর্মকর্তা রিচার্ড বেচারও স্বীকার করেছেন।[১৯৩] বস্তুত নবাবের সাথে কোম্পানির বিরোধে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ঘসেটি বেগম ও শওকত জঙ প্রমুখ সিরাজ বিরোধী দেশীয় অভিজাত চক্রের সাথে ইংরেজদের গোপন আঁতাত ও সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তে যোগ দান।[১৯৪]

মসনদে আরোহনের পর নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ ইংরেজদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন তারা যদি শান্তিপূর্ণভাবে প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তবে তিনি তাদের সবরকমের সুযোগ-সুবিধা দেবেন। অন্যথায় তাদের এদেশ থেকে বহিস্কার করাই হবে তাঁর একমাত্র নীতি।[১৯৫] একজন সার্বভৌম নৃপতি হিসেবে একটি বিদেশী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে নবাবের এ ধরণের অবস্থান নিঃসন্দেহে যৌক্তিক ও প্রশংসনীয়। তবে

---

[১৮৮] Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757,* The Bangladeshi ed. The University Press Ltd. Dhaka, 2001, pp.37-61; *পলাশির অজানা কাহিনী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ.পৃ. ৩৭-৫৫; 'পলাশী যুদ্ধ ও সিরাজউদ্দৌলা' বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.পৃ. ১০৮-১১৯

[১৮৯] Bengal Public Consultations (BPC), Range I, Vol. 25, 18 September, 1752; Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire,* p. 40

[১৯০] Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire,* p. 40

[১৯১] S. C. Hill, *op. cit.* Vol. III, p. 294

[১৯২] Letter from Nawab Sirajuddaullah to Governor Pigot, 30 June 1756; S. C. Hill, *op. cit.* Vol. I, p.196

[১৯৩] Letter of Richard Becher to Fort William Council, 25 January, 1757; S. C. Hill, *op. cit.* Vol. II, p.162

[১৯৪] Renault to Dupleix, Chandanagore, 26 August 1756; Law's Memoir; S. C. Hill, *op. cit.* Vol. III, p.219; Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire,* pp. 41-42

[১৯৫] S. C. Hill, *op. cit.* Vol. II, p. 18; সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ কোম্পানি নবাবের এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি। কোম্পানি তাদের বাণিজ্য পরিচালনায় আইনের সীমা শুধু লংঘন করেনি, নিজস্ব নিরাপত্তার নামে নবাবী কর্তৃত্বের প্রতি উপেক্ষা-উপহাস এবং দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও প্রশাসনে হস্তক্ষেপের মতো গর্হিত কাজ করে নবাবের বিরাগভাজন হয়। তিনটি নির্দিষ্ট অপরাধের কারণে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলে স্বয়ং নবাব বলেছেন। অভিযোগ তিনটি হলো- (ক) নবাবের অনুমতি ছাড়াই ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংস্কার ও দূর্ভেদ্য করার প্রচেষ্টা, (খ) দস্তকের যথেচ্ছ অপব্যহার এবং (গ) নবাবের অপরাধী প্রজাদের কলকাতায় কাছে আশ্রয় দান।[১৯৬] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাব কর্তৃক উত্থাপিত এসব সুনির্দিষ্ট অভিযোগকে এস. সি. হিল মিথ্যা অজুহাত বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নবাবের একটি অভিযোগও অন্যায্য বা অজুহাত ছিল না। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংস্কার ও দূর্ভেদ্য করার ক্ষেত্রে ইংরেজরা যে তাদের 'অধিকারের সীমা অতিক্রম করেছিল' এস. সি. হিল নিজেও তা স্বীকার করছেনে।[১৯৭] ফোর্ট উইলিয়ামসহ তাদের সব বাণিজ্য কুঠি সুরক্ষিত করার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা নবাবের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেনি। প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ইংরেজরা তাদের দুর্গ সুসংহত করেছিল বলে দাবি করা হয়। তবে 'দেশীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার জন্য, তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই' যে বাণিজ্যকুঠি সুরক্ষিত করা হয়েছিল তা ইংরেজদের একাধিক নথিতেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।[১৯৮] আর ইংরেজদের এ দেশীয় শত্রু যে নবাব সিরাজ-উদ- দৌলাহই ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। সুতারাং নবাবের উত্থাপিত উপরের অভিযোগটি যে মিথ্যা অজুহাত নয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখশিয়ার কোম্পানিকে শুল্ক মুক্ত আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনার অনুমতি দিয়েছিলেন।[১৯৯] কিন্তু কোম্পানি শুরু থেকেই এই সুবিধার অপব্যহার শুরু করে এবং আঠারো শতকের পঞ্চাশের দশকে দস্তকের যথেচ্ছ ব্যবহার এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, ইংরেজদের লেখনীতেই 'দস্তক নিয়ে কি লজ্জাকর বেশ্যাবৃত্তিই না চলছে' বলে উল্লেখ করা হয়।[২০০] দস্তকের অপব্যহারের ফলে কোম্পানি ও কোম্পানির কর্মচারীগণ লাভবান হলেও নবাব সরকার বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য শুল্ক থেকে বঞ্চিত হয় এবং নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর রাজত্বকাল পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় দেড় কোটি টাকা।[২০১] এ অবস্থায় দস্তক সম্পর্কে নবাবের অভিযোগ কে মিথ্যা অজুহাত বলে উড়িয়ে দেয়ার কোন অবকাশ আছে কী? কোম্পানির বিরুদ্ধে নবাবের তৃতীয় অভিযোগটিও যে অসার নয় এর প্রমাণ কলকাতা

---

[১৯৬] Letter from Nawab Siraj to Khwaja Wajid, 1 June 1756; Mohammad Mohar Ali, *The Fall of Sirajddaulah,* The Mehrub Publication, Chittagong, 1975, p.19

[১৯৭] S. C. Hill, *op. cit.* Vol. I, pp. liv-lv

[১৯৮] Watts to Drake and Fort William Council, BPC, 15 August, 1755; Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire,* p.52

[১৯৯] সম্রাট ফররুকশিয়ারের এ ফরমান সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য Sukumar Battacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal from 1704-1740,* London, 1954, pp. 28-29

[২০০] সুশীল চৌধুরী, *পলাশীর অজানা কাহিনী*, পৃ. ৫০

[২০১] ঐ, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

কাউন্সিল কর্তৃক ঢাকার দিউয়ান রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেয়ার ঘটনা। ভবিষ্যত বিপদের আশঙ্কায় রাজবল্লভ তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাসকে ৫৩ লক্ষ টাকা সমেত পরিবার-পরিজনসহ কলকাতায় তাঁর মিত্র ইংরেজদের কাছে পাঠিয়ে দেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরের কাছে লেখা একটি চিঠিতে ওয়াটস লিখেছিলেন, 'রাজবল্লভ আমাদের কাজে লাগে এবং ভবিষ্যতে আরো বেশী কাজে লাগবে।'[২০২] কোম্পানি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে মিত্র রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে তাদের কাছে আশ্রয় দেয়।[২০৩]

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণীত হয় যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবের আনীত উপর্যুক্ত তিনটি অভিযোগই যৌক্তিক ও সঙ্গত। ইংরেজদের বর্ণনাতেও নবাবের অভিযোগকে 'Strictly true' বলে স্বীকার করা হয়েছে।[২০৪] এর পরও নবাব ইংরেজদের সাথে সশস্ত্র সংঘাত না গিয়ে কূটনৈতিক প্রয়াসের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ, বিশেষ করে কলকাতার গভর্নর ড্রেকের কঠোর, অনমনীয় ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের জন্য নবাব কর্তৃক প্রেরিত নারায়ন সিংহ ও খোজা ওয়াজিদের দৌত্য[২০৫] নিস্ফল হয়। ফলে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া নবাবের সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। তারপরও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে নবাব এ ব্যাপারে তাঁর প্রভাবশালী অমাত্যদের মতামত নেন। এ বিষয়ে অমাত্যগণ দুই রকম মত দেন। গোলাম হোসেন খান, জয়নাল আবেদিন, মীর্জা হাবিব বেগ ও মীর হাসাউল্লাহ প্রমুখ অমাত্যবৃন্দ 'ইংরেজদের আগুনের বলয়' (flames of fire) হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের সাথে সংঘাতে না যাওয়ার জন্য নবাবকে পরামর্শ দেন। অন্যদিকে খোজা ওয়াজিদ, মীর জাফর এবং রাজা দুর্লভরাম প্রমুখ বিরোধ নিস্পত্তিতে কূটনৈতিক প্রয়াসের পাশাপাশি শক্তি প্রয়োগেরও পরামর্শ দেন।[২০৬] নবাব শেষোক্ত দলের পরামর্শ গ্রহণ করেন। প্রথমে ইংরেজদের কাশিম বাজার দুর্গ দখল করেন। কাশিমবাজার কুঠির সমস্ত মালামাল তালিকাবদ্ধ করে সীল করে দেয়া হয়, যাতে কোনো লুঠতরাজ না হতে পারে। নবাবের ইংরেজদের বিরোধী তৎপরতার পিছনে তাঁর ধন লিপ্সা সম্পর্কিত যে অভিযোগ ঐতিহাসিকগণ এনেছেন, কাশিম বাজারের ঘটনায় তার অসারতা প্রমাণিত হয়। কাশিম বাজার কুঠি দখলের পর নবাব কলকাতা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং ১৭৫৬ সালের ২০ জুন কলকাতা দখল করে নেন। এ রাতেই কলকাতায় ঘটে একটি দুর্ঘটনা-যা তথাকথিত 'অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ড'

---

২০২ Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire,* p.56

২০৩ সিরাজুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

২০৪ ডেভিড রেনি ছিলেন এজন ইংরেজ নাবিক। এসময় তিনি বাংলায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি Causes of Loss of Calcutta নামক একটি লেখায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবের তিনিটি অভিযোগই অত্যন্ত খাঁটি ছিল বলে মন্তব্য করেছেন। সুশীল চৌধুরী, *পলাশীর অজানা কাহিনী*, পৃ. ৫২

২০৫ নবাবের শত্রু রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে ফেরত দেয়া, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সুরক্ষা কাজ বন্ধ করা এবং অন্যান্য বিরোধ নিস্পত্তির জন্য সিরাজ-উদ-দৌলাহ প্রথমে নারায়ন সিং ও পরে খোজা ওয়াজিদ নামক আর্মেনিয় বণিককে ইংরেজদের নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। ইংরেজরা সিরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করে বিরোধ নিস্পত্তিতো করেই নি, উপরন্তু আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে নবাবের দূতদের অপমান করার দুঃসাহস দেখায়। দূতকে অপমান করা যে সারা পৃথিবীতে সংশ্লিষ্ট রাজন্যের অপমান বলে গণ্য হয় তা ইংরেজ কোম্পানির রিচার্ড বেচারও উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, B K Gupta, *Sirajudaullah and the East India Company,1756-1757,* E J Brill, Leiden, 1966, pp. 51-54; সুশীল চৌধুরী, *পলাশীর অজানা কাহিনী*, পৃ.পৃ. ৫৩-৫৫

২০৬ করম আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৬; B K Gupta, *op. cit*, p. 52

Dhaka University Institutional Repository

(Blackhole Tragedy) নামে বিশেষভাবে পরিচিত।[২০৭] কলকাতা দখলের পরও দেখা গেল নবাব ইংরেজদের কুঠি বা দুর্গ লুটপাট করেননি। এ ঘটনা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজদের অর্থ-কড়ি কুক্ষিগত করার যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা শুধু অসত্যই নয়, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘসেটি বেগমকে কব্জায় আনার পর সিরাজ-উদ-দৌলাহর পরবর্তী লক্ষ ছিল পুর্নিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙকে দমন। কেননা ঘসেটি বেগম ও মীরজাফর আলী খান প্রমুখের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তিনি সিরাজ-উদ-দৌলাহকে হটিয়ে বাংলার মসনদ দখলের চেষ্টারত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলকাতা অভিযানের পরই নবাব দরবারের পুরনো অভিজাত অমাত্য মীর জাফর আলী খান, রায় দুর্লভ, রায় রায়ান উম্মিদ রায়, জগৎশেঠ, ওমর খান, রহিম খান, ও রাজা সকত সিং প্রমুখের সাথে নবাবের ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে যায়। নবাব কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী মোহনলালের উপর সমস্ত কর্তৃত্ব অর্পিত হওয়ায় এসব পুরনো আমলারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন-বাহ্যত এরকম কথা বলা হলেও এর পিছনে যে উপরোক্ত অমাত্যদের উচ্চবিলাস ও স্বার্থ চিন্তা বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে মীর জাফর ও রাজবল্লভের স্বার্থ চিন্তা বিষয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। রাজ্যের এএক সংকটময় পরিস্থিতিতে মীর জাফরকে সম্মানিত করার মাধ্যমে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ তাঁর চিত্ত জয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এসময় মীর জাফরকে কেন্দ্র করেই দরবারে নবাব বিরোধী অভিজাত চক্র জোটবদ্ধ হয়। বণিক অভিজাত জগৎশেঠ আড়াল থেকে তাদের ইন্দন যোগাতে থাকেন। নবাব বিরোধীদের পক্ষ থেকে মীর জাফর শওকত জঙকে একটি পত্র দেন।[২০৮] এতে শওকত জঙকে সিরাজের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দানসহ কিছু শর্ত সাপেক্ষে তাঁকে বাংলার মসনদে আরোহনে সহায়তার প্রস্তাব দেয়া হয়। বাংলার মসনদে আরোহনের স্বপ্নে বিভোর শওকত জঙ পত্র পেয়ে দ্বিগুন উৎসাহে ঝাপিয়ে পড়েন। শেখ জাহান ইয়ার, কারগুজার খান খান, আবদুর রশীদ, সৈয়দ গোলাম গোসেন খান তবাতবায়ি, নকী আলী খান, মোহাম্মদ সাঈদ খান, মীর সুলতান খলিল খান, শাহজাহান ইয়ার, লালী হাজারী, শ্যামসুন্দর, মীর্জা হাবিব বেগ ও মীর মা'আলী খান প্রমুখ প্রভাবশালী অমাত্য অবিজাতগণ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিরুদ্ধে শওকত জঙকে উস্কানি দিতে থাকেন। এদের উস্কানি ও পরামর্শে শওকত জঙ দিল্লীর বাদশাহী দরবারের প্রধানমন্ত্রী ইমাদ-উল-মুলকের কাছ থেকে বাংলার নবাবী পদের একটি সানন্দও আনয়ন করেন।[২০৯] এ সানন্দ প্রাপ্তি শওকত জঙকে আরো বেশি অহঙ্কারী ও ক্ষমতালোভী করে তুলেছিল বলে সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি উল্লেখ করেছেন।[২১০] এ অবস্থায় সিরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে

---

[২০৭] নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ কর্তৃক কাশিমবাজার ও কলকাতা দখল এবং তথাকথিত 'অন্ধকূপ' হত্যা কাহিনী ও এর অসারতা সম্পর্কে বিচারধর্মী আলোচনা করেছেনে শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁর তাঁর *সিরাজউদ্দৌলা* গ্রন্থে। দ্রষ্টব্য পৃ.পৃ. ৮৮-১৩২এ। B K Gupta, *op. cit*, pp. 62-84; J H Little, 'The Blackhole: The Question of Holwell's Varacity', in *Bengal Past and Present*, Vol. XI, pp. 75-105.; আ কা মো যাকারিয়া, *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা*, পৃ. ১৬৭-১৮৮; মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ,*পূর্বোক্ত*, পৃ. পৃ. ১৪০-১৪২

[২০৮] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪৫

[২০৯] সিরাজ-উদ-দৌলাহকে উৎখাত করে তাঁর বাজেয়াপ্ত সম্পদ এবং বার্ষিক এক কোটি টাকা প্রদানের শর্তে প্রতিশ্রুতি পত্র দেয়া হয়েছিল। সুবা সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪৬

[২১০] মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উস্কানি[২১১] শওকত জঙকে উচ্চাশার চরম শিখরে উন্নীত করে। তিনি সম্রাট দরবার থেকে তাঁর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারি সনদ লাভের বিষয়টি পুর্নিয়ার কুণ্ডুয়া ও বীরনগরের ফৌজদার রাসবিহারীর মাধ্যমে নবাব সিরাজ-উদ- দৌলাহকে অবহিত করেন এবং তাঁর অনুকূলে মসনদ ত্যাগ করার পরামর্শ দেন।[২১২] বলা বাহুল্য যে, এ সংবাদ পেয়ে ক্ষুব্ধ নবাব নিজে শওকত জঙের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে বের হন। নবাবের নির্দেশে বিহারের নায়েব নাজিম রাম নারয়ণ ও টিকারির জমিদার সুন্দর সিং পশ্চিম দিক থেকে নবাবের বাহিনীর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। নবাবের অনুগত ও বিশ্বস্ত সমর অভিজাত রাজা মোহনালাল ও তোপখানার দারোগা মীরমদন সানন্দ চিত্তে নবাবের আদেশ আদেশে পুর্ণিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তবে শওকত জঙের সাথে গোপন আঁতাত থাকায় মীর জাফর এবং তাঁর বিশ্বস্ত প্রভাবশালী সমর অভিজাত দোস্ত মোহাম্মদ খান, ওমর খান, দিলির খান, আসালত খান ও মীর্জ হাকিম বেগ প্রমুখ অভিযানে অংশ নিতে ইতস্ত করেন। অবশ্য পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রকাশ্য নবাবী নির্দেশ উপেক্ষা করার সাহসও তাদের ছিল না। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মীর জাফর ও তাঁর অনুগত সমর অভিজতগণ অভিযানে অংশ দেন।

শওকত জঙের সামরিক শক্তি মোটেই উপেক্ষণীয় ছিল না। তাঁর সেনাপতিদের মধ্যেও অনেকে রণনৈপুন্যে প্রশংসনীয় দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তবে শওকত জঙের অনভিজ্ঞতা, তাঁর উদ্ভট যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনাপতিদের সাথে আপত্তিজনক আচরণ ইত্যাদি কারণে শেষপর্যন্ত সিরাজ-উদ-দৌলাহর সাথে তাঁর যুদ্ধটি একতরফা হয়ে গেল। শওকত জঙ শুধু পরাজিতই হলেন না, যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিজে প্রাণও হারালেন।[২১৩] বিজয়ী নবাব সিরা-উদ-দৌলাহ রাজা মোহনলালের সাহায্যে পুর্নিয়ায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। *মোজাফফরনামা*'র রচয়িতা ও ঘোড়াঘাটের ফৌজদার করম আলী খান ও মীর মা'আলীসহ শওকত জঙের অনুসারী ও সহযোগী অমাত্যদের বিরুদ্ধে নানারকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় হয়।[২১৪] যুদ্ধে নবাবকে সহায়তার জন্য বিহারের নায়েব নাজিম রাজা রামনারায়ণ, টিকারির জমিদার সুন্দর সিং, ভোজপুরের জমিদার পাহলোয়ান সিংসহ অন্যান্য ভূ-অভিজতদের উপযুক্ত উপঢৌকন ও খিলাত দ্বারা সম্মানিত করা হয়। মীর কাজেম খান রিসালাদার, বাল কিষেন হাজারী, কিশোয়ার খান এবং মীর্জা জয়নুল আবেদিন বাকাওয়াল প্রমুখ অনুগত অমাত্যদের পুর্ণিয়া প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়ে নবাব সাফল্যের স্বস্তি নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শওকত জঙের গোপন যোগাযোগ থাকায় মীর জাফরসহ নবাবের প্রভাশালী কিছু সামরিক-বেসামরিক অভিজাত অমাত্য অনিচ্ছা সত্যেও বাধ্য হয়ে শওকত জঙের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তবে সুযোগ পেলে যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবকে হত্যা করার পরিকল্পনা মীরজাফরের অনুসারী মীর্জ হাকিম বেগ, গোলাম আলী বেগ, আহমদ আলী খান, হাসান কুলী খান, ওমর খান, দিলীর খান ও

[২১১] Consultations, 15 September, 1756

[২১২] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫৬

[২১৩] নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ ও শওকত জঙের মধ্যকার যুদ্ধের সবিস্তার বিবরণ); সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ ৪৫৮-৪৬৮

[২১৪] ঐ, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

আসালত খান প্রমুখ সমর অভিজাতের মাথায় ছিল বলে জানা যায়। সিরাজও তাদের এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেছিলেন। তাই মুর্শিদাবাদে ফিরেই তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[২১৫]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, শওকত জঙের সাথে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর যে দ্বন্দ্ব সংঘাত, তাতে সমকালিন অভিজাত শ্রেণীর বিশিষ্ট ভূমিকা রাখেন। উপরে বর্ণিত অন্য অনেক ঘটনার মতো এ ক্ষেত্রেও যে অভিজাতদের স্বার্থ চিন্তাই প্রধান ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।। বস্তুত নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মীর জাফর প্রমুখ অভিজাতগণ শওকত জঙ এবং সিরাজকে মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। এ ক্ষেত্রে সিরাজ যেমন তাদের মিত্র ছিল না, তেমনি শওকত জঙও। সিরাজের উৎখাত সাধনে মীর জাফর ও তাঁর অনুগত অভিজাতগণ শওকত জঙকে নিমিত্ত হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্থুল বুদ্ধি শওকত জঙ তা মোটে বুঝতে পারেননি এবং জীবন দিয়ে তিনি এর খেসারত দেন।

ঘসেটি বেগম, শওকত জঙ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাফল্যে আত্মবিশ্বাসী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ নিজেকে নিস্কন্টক ভেবে যখন রাজধানীতে আনন্দ উৎসবে মত্ত তখন পরাজিত ইংরেজ শক্তি নতুন উদ্যম ও শক্তি নিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে রণ প্রস্তুতি শুরু করে। মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভের নেতৃত্বে সৈন্য বাহিনী পাঠানো হয়। কোম্পানি তাদের সহযোগিতার জন্য নবাব দরবারের প্রভাবশালী অভিজাত অমাত্যদের বিশেষ করে নবাব বিরোধী জোটেরও দ্বারস্থ হয়। আর্মেনিয় বণিক খোজা পেত্রস আরাতুন ও তাঁর বন্ধু ইহুদি ইব্রাহিম জেকবস ইংরেজদের নানাভাবে সহযোগিতা করেন। পেত্রস রজার ড্রেক ও কিলপ্যাট্রিককে কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের রাজনীতির গোপন খবরাখবর সরবরাহ করতেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পরামর্শে ইংরেজরা নবাব সরকারের কলকাতার ফৌজদার মানিক চাঁদ, প্রভাবশালী অমাত্য রায় দুর্লভরাম, বণিক অভিজাত উমিচাঁদ, জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদ ও খোজা ওয়াজিদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে যোগাযোগ করে এবং ইংরেজদের হয়ে নবাবের কাছে সুপারিশ করার তাদের অনুরোধ জানায়।[২১৬] এদের কেউ কেউ যে এতে সানন্দে রাজী হন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে কলকাতার ফৌজদার মানিক চাঁদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সমকালিন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানিক চাঁদের প্রশাসনিক দক্ষতা ও সৎকাজে সাহস না থাকলেও তাঁর মধ্যে উচ্চাভিলাস ও লোভের কোন পরিসীমা ছিল না। মানিক চাঁদের অনুধাবন করতে অসুবিধা হলো না যে, ইংরেজদের প্রভাব ক্রমাগতই বেড়ে চলছে এবং মীর জাফর-জগৎশেঠের নেতৃত্বে নবাবের বিপক্ষীয় দলও বাংলার রাজনীতিতে সংগঠিত ও ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হচ্ছে। সীমিত সংখ্যক বেসামরিক অমাত্য ও সমর অভিজাত ছাড়া পদস্থ প্রায় সকলেই যে সিরাজ বিরোধী দলে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে সে বিষয়টিও মানিক চাঁদ ভালভাবেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। এমতাবস্থায় নিজের ভবিষ্যত ও স্বার্থের কথা চিন্তা করে মানিক চাঁদ সর্বন্তকরণে ইংরেজদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন।[২১৭] তিনি ইংরেজদের সাথে আপোস মিমংসার প্রস্তাব দিয়ে নবাবকে বিভ্রান্ত করারও চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়।

---

[২১৫] করম আলি খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬

[২১৬] Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal* Vol. IA, p. 664

[২১৭] এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১৮১-১৮৫

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ এ সময় বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেছিলেন। দিল্লী দরবার থেকে নিজের নামে নবাবীর বৈধ সনদ জোগাড় করতে পারায় তাঁর আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। ফলে নতুন করে যুদ্ধ বিগ্রহ অপেক্ষা দেশ গঠন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাই ইংরেজদের ব্যাপারেও তিনি বিশেষ মনোযোগ দেননি। ইংরেজরা এ সুযোগটি পুরোমাত্রায় কাজে লাগায়। মাদ্রাজ থেকে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য এসে পৌঁছানোর পর ইংরেজরা কলকাতা পুনরাধিকারের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করে। নবাবের বিরোধী প্রভাবশালী অভিজাতদের স্বপক্ষে টানার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। এ ক্ষেত্রে ইংরেজরা যে ভাল অংকের উৎকোচ ব্যবহার করেছিলেন ইংরেজ কর্মকর্তাদের চিঠি-পত্রাদিতেই এর প্রমাণ রয়েছে।[২১৮] নবাব বিরোধী অমাত্য ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা বিশেষ করে কলকাতার ফৌজদার মানিক চাঁদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজরা ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারি কলকাতা আক্রমণ ও পুনরুদ্ধার করে। তবে ইংরেজদের লক্ষ যে কলকাতা পুনরুদ্ধারেই সীমিত ছিল না, একথাও ইংরেজদের বিবরণী থেকে জানা যায়।[২১৯] কলকাতা পুনরুদ্ধার করেই ইংরেজরা বাংলা বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হুগলি দখল করে নেয়

কলকাতা পুনরুদ্ধার ও হুগলি দখলের কোনো ঘটনাই মানিক চাঁদ যথাসময়ে নবাবকে অবহিত করেননি। ১৭৫৭ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় এ সংবাদ পেয়ে নবাব হতবাক হয়ে যান। এই সময় ইংরেজ কোম্পানির ভাইস এডমিরাল ওয়াটসনের একটি ধৃষ্টতাপূর্ণ পত্র নবাবের হাতে পৌঁছে।[২২০] এমতাবস্থায় নবাব তাঁর আত্মমর্যাদা সংরক্ষণ, নিজের শাসনক্ষমতা বজায় রাখা এবং নিরীহ প্রজাকুলের ধন-মান রক্ষার্থে দ্বিতীয়বার কলকাতা অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। নবাবের বিশাল বাহিনীর আগমন সংবাদে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে ক্লাইভ নবাবের সাথে সমঝোতার চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় ও বণিক প্রবর খোজা ওয়াজিদের মধ্যস্থতা কামনা করেছিলেন।[২২১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বণিক অভিজাত খোজা ওয়াজিদ এতদিন ফরাসিদের মিত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে ফরাসিদের দুরাবস্থা দেখে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। ইংরেজদের ক্রমপ্রসারমান প্রভাব এবং নবাব সরকারের প্রভাশালী অভিজাতদের মধ্যে সিরাজ বিরোধীদের শক্তি বৃদ্ধিতে খোজা ওয়াজিদ তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেন। চতুর বণিক রাজ বুঝতে পারেন ইংরেজদের সাথে মিতালী না করতে পারলে তাঁর সমূহ বিপদ ও অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা। তাছাড়া তিনি দেখলেন দরবার ও সরকারে যখন সিরাজ বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তখন একা পড়ে থাকাটা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। তাই তিনি প্রতিনিধি শিবুবাবুর মারফত ক্লাইভের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলেন। ওয়াটসসহ ইংরেজ মহলে তাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে প্রথমে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও সমকালিন কিছু ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে ইংরেজ মহল খোজা ওয়াজিদকে তাদের বিশ্বস্ত বলে মেনে নেয় এবং নবাবের সাথে মধ্যস্থতায় তাঁর সহযোগিতা কামনা করে। ইংরেজদের কাছ থেকে অনুরোধ পাওয়ার পর জগৎশেঠ ও খোজা ওয়াজিদ নবাবকে

---

[২১৮] Watts to Clive, 11 April 1757, sited in S C Hill, *Bengal,* Vol. II, p. 323

[২১৯] S C Hill, *Bengal,* Vol. I, pp. 239-240

[২২০] *Ive's Journal,* পত্রটি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর *সিরাজউদ্দৌলা* (দিব্য প্রকাশ সংস্করণ) গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। পৃ.পৃ. ১৫৬-১৫৭

[২২১] রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৬৪; S C Hill, *Bengal,* Vol. III, p. 187

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার জোর চেষ্টা শুরু করেন। তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, মীর জাফর, রায় দুর্লভ, মীর্জা ইরাজ খান প্রমুখ দরবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা যুদ্ধের ব্যাপারে প্রথম থেকেই অনীহ ছিলেন। এসময় কলকাতাভিমূখী নবাবকে পদস্থ আমীরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ পরিহারের পরামর্শ দেয়া হয়। তাঁরা নবাবকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, উপর্যুপরি যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে নবাবী ফৌজ যথেষ্ট ক্লান্ত, তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতিও যথেষ্ট নয়। তাছাড়া বিদেশী বণিকদের বিতাড়িত করলে রাজ্যের সমূহ অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয়েও নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।[২২২] বস্তুত এসবই ছিল নবাব বিরোধী কুচক্রী মহলের নবাবকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল এবং এতে তারা সফল হয়। খাজা আবদুল হাদি খানসহ নবাবের বিশ্বস্থ কতিপয় পদস্থ অমাত্য ইংরেজদের কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিলেও নবাব তাদের কথায় শেষ পর্যন্ত কর্ণপাত করেননি। কেননা অভিজাত অমাত্যদের পরস্পর বিরোধী অবস্থানের ফলে নবাব তাঁর প্রকৃত করণীয় সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। তিনি বুঝতে পারেন যে প্রধান অমাত্যদের অনেকেই যুদ্ধে অনিচ্ছুক। আর এমন অনিচ্ছুকদের নিয়ে যুদ্ধে জয় লাভের ব্যাপারে তাঁর মনের মধ্যে সংশয় জাগে। এমতাবস্থায় তিনি ইংরেজদের সাথে সমঝোতার সিদ্ধান্ত নেন। ইংরেজদের সাথে বেশ কয়েকবার পত্রালাপ ছাড়াও নবাব আর্মেনিয় বণিক খোজা পেত্রসের মাধ্যমে সন্ধির শর্ত নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশ্বস্ত লোক পাঠাতে ক্লাইভকে তাগিদ দেন।[২২৩]

ইংরেজদের সাথে সন্ধি সম্পাদনে নবাবের এরূপ অতিশয় আগ্রহের কারণ নবাব সরকারের সামরিক ও বেসামরিক অমাত্য অবিজাতদের মধ্যকার পরস্পর বিরোধী অবস্থান, বিশেষ করে রাজ্যের পুরনো প্রভাশালী অভিজাতদের নবাব বিরোধী তৎপরতা। তদুপরি আফগান অধিপতি আহমদ শাহ আবদালী কর্তৃক সম্ভাব্য বাংলা আক্রমণের গুজব ও ভীতির বিষয়টিও ইংরেজদের সাথে বিরোধ মিমাংসায় নবাবের অতি আগ্রহের কারণ বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।।[২২৪] তবে আবদালী ভীতির কারণে নবাব দ্রুত ইংরেজদের সাথে বিরোধ নিস্পত্তি করতে চেয়েছিলেন-এরূপ বক্তব্যের ঐতিহাসিক সারবত্তা আছে বলে মনে হয় না। কারণ দিল্লীতে আবদালীর আগমন আরো কিছুকাল পরের ঘটনা। বস্তুত নবাবের উদ্বেগের কারণ প্রথমোক্ত বিষয়টিই। বলাবাহুল্য যে, ইংরেজদের তুলনায় নবাবের সামরিক শক্তি ছিল অনেক বেশি। তবে সমর অভিজাতদের মধ্য সিরাজ বিরোধিতা এবং ইংরেজদের সাথে আঁতাত ইত্যাদি কারণে এ সামরিক শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ মিত্র বণিক অভিজাতর জগৎশেঠের পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি আন্দোলন পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছিল। বর্ণিত পরিস্থিতিতে খাজা আব্দুল হাদী খানসহ কয়েকজন বিশ্বস্ত সেনানায়ক ও আমীর আরো সুসংগঠিত উপায়ে আক্রমণ করে ইংরেজদের হামলার জবাব দেয়ার জন্য নবাবকে উদ্বুদ্ধ করলেও মীর জাফর ও তাঁর অনুসারী কুচক্রী সমর অভিজাতগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কোনো উৎসাহতো দেখানই নি, বরং উল্টো বর্তমান পরিস্থিতির জন্য নবাবকে দায়ী করেন। মীর জাফর এবং তাঁর অনুসারীরা কোনো যুদ্ধ নয়, বরং ইংরেজদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে ফিরে রাজধানীতে যাবার জন্য

[২২২] মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৫

[২২৩] মৃণাল চক্রবর্তী, *সিরাজ উদ দৌলা*, পৃ. ১৯৭, Luke Scrafton, *A History of Bengal*.- p. 64

[২২৪] আ কা মো যাকারিয়া, *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা*, পৃ. ২৩৫; মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ ২১৬, ২২১

নবাবের উপর চাপ বৃদ্ধি করেন। নবাবের শ্বশুর সেনাপতি ইরাজ খানও এদের সাথে সহমত পোষণ করেন।[২২৫] ক্রমবর্ধমান ইংরেজ শক্তির বিনাশ সাধন একান্ত কর্তব্য- নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ এ সত্য উপলব্দি করলেও মীর জাফরসহ প্রধান প্রধান সমর অভিজাতদের মনোভাব দেখে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সম্ভাব্য পরিণতি বুঝতে পেরেছিলেন। এমতাবস্থায় শুধু খাজা আব্দুল হাদী এবং মীর মদনের মতো গুটিকয়েক বিশ্বস্ত সমর অভিজাতের উপর ভরসা করে যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়া নবাবের কাছে সমিচীন মনে হয়নি। কাজেই নবাব ইংরেজদের সাথে একটা আপত মিমাংসা করে তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছিলেন বলেই অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য কারণ বলে মনে হয়।

নবাবের সাথে আপোষ ও চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃপক্ষের মধ্যে কিছুটা মত ভিন্নতা ছিল সত্য। তবে প্রতিদ্বন্দ্বি ফরাসিদের নবাবের সাথে ঐক্যজোট গঠনের সম্ভাবনা এবং আবদালী ভীতি ইত্যাদি কারণে তারাও চুক্তি সম্পাদনই অধিক লাভজনক হবে বলে মনে করে।[২২৬] এ অবস্থায় জগৎশেঠের প্রতিনিধি রণজিৎ রায়, বণিক অভিজাত খোজা পেত্রস এবং উমিচাঁদ প্রমুখের বিশেষ তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সাতটি ধারা বিশিষ্ট এ চুক্তিটি ইতিহাসে 'আলিনগরের সন্ধি' নামে পরিচিত।[২২৭] আলিনগরের সন্ধি নিঃসন্দেহে সিরাজ-উদ-দৌলাহর জন্য অত্যন্ত গ্লানিকর ছিল। কেননা এতে নবাবের নয়, বরং ইংরেজেদের ইচ্ছারই সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল। চুক্তিতে নবাব ছাড়াও ইংরেজদের ইচ্ছানুযায়ি অমাত্য অভিজাত মীরজাফর এবং রায়দুর্লভকেও স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। এটি নিঃসন্দেহে নবাবের জন্য অবমাননাকর ছিল। তাছাড়া কলকাতা আক্রমণের জন্য ক্ষতিপুরণের বাইরেও ফররুখশিয়ার কর্তৃক ১৭১৭ সালে ইংরেজদের প্রদত্ত দেশের স্বার্থ বিরোধী ফরমান অনুযায়ি ইংরেজদের সুবিধাদি দিতে নবাব বাধ্য হলেন। এ চুক্তির ফলে ইংরেজদের কলকাতা উপনিবেশ নবাব সরকারের স্বীকৃতি লাভ করায় বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হলো ।

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে আলিনগরের সন্ধি নবাবের জন্য অত্যান্ত অবমাননাকর। তবে বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে মনে হয় যে নবাবের এ অবমাননাকর অবস্থা মীর জাফরসহ তাঁর পদস্থ সেনা কর্মকর্তা ও অমাত্যদের অনেকেরই খুশীর কারণ হয়েছিল। কেননা নবাবের সবধরণের বিপর্যয়ই তাদের কাম্য ছিল। বস্তুত এসব অমাত্যদের কাছে দেশ প্রেম ও জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তি স্বার্থই মূখ্য ছিল। আর নবাবের যে কোনো বিপর্যয় তাদের ব্যক্তি স্বার্থের অনুকূল হবে বলেই তাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল। কিন্তু বাস্তবে তাদের সে আশা পুরণ হয়নি।

যা'হোক চুক্তি সম্পাদনের পর নবাব রাজধানী মুর্শিদাবাদের উদ্ধেশ্যে যাত্রা করেন। হুগলি অতিক্রমকালে ফরাসি কোম্পানির শীর্ষকর্তারা নবাবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাত আয়োজনে বণিক অভিজাত খোজা ওয়াজিদ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেন বলে জানা যায়। নবাব ফরাসিদের ইংরেজদের মতো বাণিজ্যিক সুবিধা ও সুরক্ষা

[২২৫] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭৮; ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১৭৫-১৭৬

[২২৬] S C Hill, *Bengal*, Vol. II, pp. 222-223

[২২৭] আলিনগরের সন্ধির ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য Charles Stewart, *History of Bengal*, London, 1847, App., p. ix

দানসহ তাদের সাথেও ন্যায়ানুগ আচরণের প্রতিশ্রুতি দেন। বিনিময়ে তারও যেন বাংলার শান্তি নষ্ট হয় এরূপ কোনো কাজ না করে সে নির্দেশ দেয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খোজা ওয়াজিদ ইতোমধ্যে ইংরেজদের নতুন মিত্রে পরিণত হয়েছিলেন। তবে বাংলার ভবিষ্যত রাজনৈতিক গতিধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হতে পেরে দীর্ঘদিনের মিত্র ফরাসিদের সাথে একবারে সম্পর্ক চ্ছেদ করেননি। একই অবস্থা দেখা যায় জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ প্রমুখ প্রধান অভিজাতদের ক্ষেত্রেও। বস্তুত কোনো নীতি নৈতিকতা নয়, বরং সরাসরি লাভালাভের বিষয়টি এসব অভিজাতদের প্রধান বিবেচনা হওয়ায় বেশিরভাগ সময় তাদের এরূপ নীতি বিবর্জিত দ্বৈত ভূমিকায় দেখা যায়।

নবাবের সাথে ফরাসিদের উপর্যুক্ত সাক্ষাত এবং নবাব কর্তৃক তাদের বাণিজ্য সুবিধা দানসহ সুরক্ষার প্রতিশ্রুতিতে ইংরেজরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ইউরোপে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ইংরেজরা তাদের প্রধান ইউরোপীয় প্রতিপক্ষ ফরাসিদের বাংলা থেকে উৎখাতের জন্য যখন মরিয়া, তখন তাদের প্রতি নবাবের সহনুভূতিশীল আচরণে তারা বিক্ষুব্ধ হয়। তবে এ বিষয়ে সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করে নবাবের প্রত্যক্ষ রোষানলে পড়া বা নবাব ও ফরাসিদের জোটবদ্ধ হওয়ার সুযোগ তৈরি করাকে ইংরেজরা যুক্তিসঙ্গত মনে করেনি। এমতাবস্থায় কৌশলে কার্যোদ্ধারের জন্য ইংরেজরা বাংলার অভিজাতদের দ্বারস্থ হয়। নবাবের সাথে ফরাসিদের নতুন সংযোগ তৈরিতে বণিক অভিজাত খোজা ওয়াজিদ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করায় ইংরেজরা তাঁকে এড়িয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তারা জগৎশেঠেরও সহযোগিতা পায়নি। ইংরেজদের মিত্র হলেও ফরাসিদের সাথে আর্থিক লেন-দেন থাকায় জগৎশেঠরা ফরাসিদের বিরুদ্ধে ইংরেজ তৎপরতার বিরোধিতা করেন। বাধ্য হয়ে ইংরেজরা অপর বণিক অভিজাত উমিচাঁদের দ্বারস্থ হয়। চতুর উমিচাঁদের সহায়তায় এ কাজে হুগলির ভারপ্রাপ্ত ফৌজদার নন্দকুমারকে দলে ভেড়ান।[২২৮] উদ্ভুত পরিস্থিতি করণীয় নির্ধারণে চতুর উমিচাঁদ নবাবের মনেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। সরল বিশ্বাসে নবাব তাঁর পরামর্শ মতো ফরাসিদের বিরুদ্ধে অগ্রসরমান ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মীর জাফরকে নির্দেশ দিয়েও তা প্রত্যাহার করে নেন।[২২৯] নবাবকে অনেক চড়া মূল্য দিয়ে এ ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিল

এদিকে ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াটস[২৩০] মুর্শিদাবাদে এসে দেখতে পান যে দিউয়ান রাজা মোহনলাল, গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান মীর মদন, এবং সেনাপতি খাজা আব্দুল হাদী ছাড়া দরবারের প্রভাবশালী অমাত্য এবং সমর অভিজাতদের প্রায় সকলেই নবাব বিরোধী এবং এবং নবাবের পতন ঘটাতে উন্মুখ। ওয়াটস এও বুঝতে পারেন যে, সিরাজ বিরোধী মীরজাফর, শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়, সেনাপতি উমর খান, রাজা দুর্লভরাম এবং ইয়ার লতিফ খান প্রমুখ অমাত্য মনসবদার ও অন্যান্য অভিজাতরা নীতি- নৈতিকতার দিক থেকে খুবই দুর্বল। তাদের কাউকে উপহার, কাউকে নগদ অর্থ ঘুষ দিয়ে এবং কাউকে কেবল মিষ্টি কথা দিয়েই দলে টানা সহজ। ইংরেজরা লক্ষ্য অর্জনে এ কাজটিই করেছিল। ঘুষ দিয়ে

---

[২২৮] নগদ ১২ হাজার রূপি প্রদান এবং ভবিষ্যতে উচ্চপদ দানের প্রলোভন দিয়ে নন্দকুমারকে দলভূক্ত করা হয়েছিল। রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৮

[২২৯] S C Hill, *Bengal,* Vol. II, p. 237; রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১৭৮-১৭৯

[২৩০] আলিনগরের সন্ধি সম্পাদনের পর এ সন্ধি বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য মুর্শিদাবাদ দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ওয়াটসকে পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। কারণ নিরীহ প্রকৃতির হওয়ায় তাঁকে নবাবের পছন্দ ছিল এবং তদুপরি তিনি হিন্দুস্তানী ভাষা ও তাদের মন মেজাজ সম্পর্কে বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন

ওয়াটস নবাবের একান্ত সহকারী ও গোয়েন্দা প্রধান রাজা রামকেও হাত করে নিয়েছিলেন।[২৩১] হুগলির ভারপ্রাপ্ত ফৌজদার নন্দকুমারের কথাতো ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

উমিচাঁদ ও অন্যান্য কুচক্রীদের পরামর্শে নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে এ পর্যায়ে সমরাভিযান থেকে বিরত থাকলেও তাঁর রাজ্যে ইংরেজ ও ফরাসিরা যুদ্ধে লিপ্ত হোক তা তিনি চাননি। তাই নবাব তাদের উভয়পক্ষকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিস্পত্তির নির্দেশ দেন। নবাবের কঠোর মনোভাবের কারণে ইংরেজ ও ফরাসিরা একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হয়। তবে এরূপ সমঝোতা প্রয়াস নবাব বিরোধী অমাত্য ও সমর অভিজাতদের মনপুত না হওয়ায় তারা একে ব্যর্থ করে দেন। গোয়েন্দা প্রধান রাজা রামসহ নবাব বিরোধী অভিজাতদের প্ররোচনায় ইংরেজরা সমঝোতা প্রয়াস থেকে সরে যায়[২৩২] এবং নবাবের নির্দেশ অমান্য করে ফরাসিদের চন্দননগর ঘাঁটি অবরোধ করে। গোপন মঝোতা অনুযায়ি হুগলির ফৌজদার নন্দকুমার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ইংরেজরা অনেকটা বিনা বাধায়ই চন্দননগর দখল করতে সক্ষম হয়। ইংরেজদের চন্দননগর দখলের সংবাদে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। কারণ এর ফলে শুধু বিদেশী শক্তির মধ্যকার শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়নি, ইংরেজ এবং তার মধ্যে ফরাসিদের যে একটি প্রতিরক্ষা দেয়াল ছিল তাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রভাবশালী অমাত্য ও অন্যান্য অভিজাতদের নবাব বিরোধী তৎপরতা এবং ইংরেজদের সাথে তাদের গোপন আঁতাতের ফলে রাজ্যের অভ্যান্তরীণ পরিস্থিতিও তখন মোটেই নবাবের জন্য সুখকর ছিল না। এরূপ ঘোরতর সংকটকালে করণীয় নির্ধারণে নবাবের মধ্যে দ্বিধা-সংশয় দেখা দেয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তারপরেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নবাব বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিল- পরাজিত ফরাসিদের কাশিমবাজারে আশ্রয় এবং জ্যাঁ ল (Jean Law) সহ কিছু সৈন্যকে নবাব সরকারের অধীনে চাকুরী দেয়া, মনসুরগঞ্জ প্রাসাদসহ মুর্শিদাবাদের বাইরে পরিখা খনন করে সম্ভাব্য ইংরেজ আক্রমণ প্রতিহত এবং রাজধানীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা, ইংরেজদের আগমন রোধ করার জন্য সুতি নদীতে সুউচ্চ বাঁধ নির্মাণ, সেনাপতি রায় দুর্লভ ও মীর মদনকে হুগলি থেকে প্রত্যাহর করে পলাশীর কাছাকাছি মোতায়েন ইত্যাদি। এর বাইরে ইংরেজ তুষ্টির জন্য কূটনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে নবাব তাদের সাথে সম্পাদিত আলিনগরের সন্ধি মেনে চলার অঙ্গিকার পুনর্ব্যক্ত করেন। এমনকি চন্দননগর জয়ের জন্য ক্লাইভকে অভিনন্দনও জানানো হয়েছিল।[২৩৩] কিন্তু এসব পদক্ষেপে ইংরেজরা যে সন্তুষ্ট হয়নি তার প্রমাণ নবাবের বিরুদ্ধে ফরাসিদের আশ্রয় ও চাকুরী দান করে চুক্তির লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন। এসময় ইংরেজরা স্থায়ী শান্তি স্থাপনের শর্ত হিসেবে কাশিমবাজারসহ অন্যান্যস্থানে আশ্রয়গ্রহণকারী ফরাসিদের ধনসম্পদসহ ইংরেজ কোম্পানির কাছে তুলে দেয়ার দাবি জানায়। নবাব বিরোধী এবং ইংরেজদের মিত্র প্রভাবশালী অভিজাতবর্গ ইংরেজদের দাবির সাথে সুর মেলায়। তারা রাজ্যের কল্যাণার্থে ইংরেজদের হাতে তুলে না দিলেও ফরাসিদের বহিস্কারের জন্য নবাবের উপর সংঘবদ্ধ চাপ তৈরি করেন।[২৩৪] ইংরেজ ও দেশীয়

---

[২৩১] Watts *Memoirs*, p. 18; মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ ২৩৬

[২৩২] Watts *Memoirs*, p p. 18-19

[২৩৩] মৃণাল চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬২

[২৩৪] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮১

অভিজাতবর্গের দ্বিমুখী চাপে অনুন্যপায় নবাব ফারাসি কোম্পানির মঁশিয়ে জ্যাঁ ল'কে ডেকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তাদের কাশিমবাজার ও হুগলি ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। জ্যাঁ ল অনিচ্ছা সত্ত্বেও নবাবের নির্দেশ পালনে সম্মত হন। তবে যাবার পূর্বে তিনি দরবারে প্রভাবশালী অভিজাতদের নবাব বিরোধী অবস্থান এবং ইংরেজদের সাথে তাদের গোপন আঁতাতের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে যান। ফরাসিদের চলে যাওয়ার পর এসব স্বার্থান্বেষীরা ইংরেজদের সাথে নবাবের বিবাদ তৈরি করে তাঁর পতনের পথকে যে সুগম করবেন ল সে বিষয়েও নবাবকে হুঁশিয়ার করে দেন।[২৩৫] ফরাসিদের কাশিমবাজার ত্যাগের ফলে ইংরেজদের আর কোনো শক্ত ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। এবার তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। এ লক্ষ্যে তারা নবাব বিরোধী দেশীয় শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জোর প্রচেষ্টা চালায়। স্বার্থান্বেষী অভিজাত চক্র সহজেই ইংরেজদের জালে ধরা দেয়। যার ফলে এদের মিলিত প্রয়াসে বাংলার ইতিহাসের ভয়াবহ ট্রেজেটি পলাশীর পট রচিত হয়। অভিসন্দর্ভের একটি সতন্ত্র অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

উপরের সার্বিক আলোচনার শেষে একথা বলা যায় যে, নবাব সরকার যুগ বাংলার ইতিহাসে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অধ্যায়। এসময় আইনত বাংলা মুঘল সম্রাটের সার্বভৌমত্বাধীন হওয়ায় প্রশাসনিক কাঠামোতে মুঘল প্রাদেশিক শাসন রীতির অনুসরণ ছিল সুস্পষ্ট। তবে এযুগে বাংলায় উদ্ভুত নবতর পরিস্থিতিতে এখানকার সামগ্রিক প্রশাসনিক কাঠামো ও রাজনৈতিক গতিধারায় কিছু পরিবর্তন ও অভিনব বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। এসময় কেন্দ্র থেকে বাংলা প্রশাসনের শীর্ষ নির্বাহী নাজিম পদে নিয়োগ দান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এ পদ দখলকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার রাজনীতি শুরু হয়। আর এ সুযোগে বাংলার অভিজাতবর্গ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের বাইরে রাজনীতিতেও নিয়ামক শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করে। মুর্শিদকুলি খানের কঠোর ও সংযমী শাসনাধীনে অভিজাতবর্গ তাদের গণ্ডি অতিক্রমের সুযোগ না পেলেও তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগে অভিজাতবর্গ রাজনীতি অত্যান্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। শাসক হিসেবে আলিবর্দী খানের যোগ্যতা সম্পর্কে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে মসনদ দখল প্রক্রিয়ায় একদল অভিজাতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নেয়ায় নবাব হিসেবে তিনি তাদের আর নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। তাছাড়া মারাঠা আক্রমণসহ অন্যবিদ আরো কিছু অভ্যন্তরীণ সংকটের ফলে তাঁর অভিজাত নির্ভরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের ক্ষমতার আরো বিস্তৃতি ঘটে। এমনকি এসময় মীর জাফর আলী খানসহ কতিপয় অভিজাত ব্যক্তির মনে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের মতো উচ্চবিলাস জাগ্রত হয়। আর এ উচ্চবিলাস চরিতার্থকরণে তাদের নানামুখি তৎপরতা-অপতৎপরতায় নবাবী বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে। বাংলায় ঘণীভূত এ রাজনৈতিক সংকটময় পরিস্থিতিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন বাংলা বিজয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়ে যায়। এজন্য চতুর ইংরেজ শক্তি ক্ষমতালোভী ও স্বার্থান্ধ দেশীয় অভিজাত চক্রের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে। আর এর ফলে আলিবর্দী খানের রাজত্বের অন্তিমলগ্নেই বাংলার রাজনৈতিক

---

[২৩৫] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮১

আবহাওয়া চরম দুর্যোগপূর্ণ হয়ে ওঠে। আলিবর্দী খানের উত্তরসূরী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় বাংলা প্রবল দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এসময়কার মুর্শিদাবাদের দরবার পরিস্থিতি ও অভিজাতদের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ কর্মকর্তা উইলিয়াম ওয়াটস লিখেছেন, নবাবের দরবারে কোনো ঐক্য নেই, সবাই নবাবের বিপক্ষে। তবে বিপক্ষবাদীরাও নিজেরা কেউ কারো পক্ষে নয়, সবাই যার যার স্বার্থ ছাড়া কোনো কথা বলে না। তাঁরা কাজ করছেন নবাবের সেবার জন্য নয়, বরং বিরক্তি ও বিবাদ সৃষ্টির জন্য। তারা এক অপরকে বিশ্বাস করে না এবং মনের কথা একজন আরেকজনকে বলে না। সব ধ্বংস হলেও নিজে যেন ধ্বংস না হয় সে চিন্তায় তারা মশগুল। ওয়াটসের মতে, সে সময় দরবারে কেউ তার নিজের অবস্থান সম্পর্কে নিরাপদ ছিলেন না। ওয়াটস দরবারের প্রায় সকলকেই দুর্নীতিগ্রস্থ বলেও অভিহিত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, নবাব সব কিছুই একক কর্তৃত্বে করে যাচ্ছেন, ফলে তিনি সফল হবেন না এবং তাঁর ধ্বংস আসবেই। তিনি নবাবের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকদের মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন।[২৩৬]

ওয়াটসের শেষোক্ত বক্তব্যের কিছু বিষয়ের সাথে দ্বিমত পোষনের অবকাশ রয়েছে। তবে দরবার পরিস্থিতি ও অভিজাতদের অবস্থা সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্য বাস্তব চিত্রেরই প্রতিফলন। সমকালিন অন্যান্য তথ্য উৎসের বিবরণীতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অভিসন্দর্ভের অন্যত্র ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিবর্তিত বাস্তবতায় নবাবী বাংলায় যে অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠেছিল নবাব ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক স্বার্থের। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদা এবং আর্থিক সুবিধা বহাল থাকলে তারা নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতেন। কিন্তু এর অন্যথা হলে তাঁরা নবাবের পিছন থেকে সড়ে দাঁড়াতেন, বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করতেন এবং ষড়যন্ত্রের জাল বুনতেন। বস্তুত এসময়কার অভিজাতদের মধ্যে একটি সাধারণ চরিত্র দেখা যায়, তা হলো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির বাসনা। জাতীয়তাবোধ, দেশাত্ববোধ বা রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ এ ধরণের কোন আদর্শ অভিজাতদের মধ্যে ছিল না। সমকালিন বিশ্ব ইতিহাসের দিকে নজর রাখলে প্রাক-ধনবাদী ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর এ বৈশিষ্ট্য অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তবে যেটি লক্ষ্য করার বিষয়, তা হলো নবাবী বাংলার অভিজাতদের ব্যক্তিস্বার্থ চেতনাবোধ। এ চেতনার কারণেই স্বার্থানুসন্ধানী ও ঐশ্বর্য লিপ্সু অভিজাতদের দ্বারা নবাবী রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়নি। মারাঠাদের উপর্যুপরি আক্রমণ ও ইউরোপের অগ্রগামী শক্তি ইংরেজদের বাণিজ্য মৃগয়ার ছত্রচ্ছায়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে নবাবী রাষ্ট্র যখন চরম দুর্দশাগ্রাস্থ তখন অভিজাত শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রকে রক্ষাও শক্তিশালী করে তোলার পরিবর্তে নিজেরাই তাঁর অবলুপ্তির প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়-রাষ্ট্রের পতনকে তরান্বিত করে। নবাবী বাংলার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণে এ সত্য আরো পরিস্ফুটিত হবে।

---

[২৩৬] Watts *Memoirs*, p p. 37-38

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

নবাবী বাংলার অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি ও অভিজাত শ্রেণী

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নবাব সরকারের প্রশাসন ও নবাবী যুগের রাজনীতিতে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর নবাবী বাংলার অর্থনীতি এবং সমাজ ও সংস্কৃতিতে সমকালীন অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা বিচার-বিশ্লেষণ সঙ্গত কারণেই জরুরি। কেননা এর ফলে নবাবী যুগের বাংলার ইতিহাসের একটি সামগ্রিক চিত্র এবং এতে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা নির্ণয় সম্ভব হবে। এ প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই উপর্যুক্ত শিরোনামায় আলোচ্য অধ্যায়ের আলোচনার অবতারণা।

৭.১ অর্থনৈতিক অবস্থা ও অভিজাত শ্রেণী

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে মুঘলদের অবক্ষয় ও অবনতির যুগে তাদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যখন চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অরাজকতা শুরু হয়েছিল, তখন বাংলা ছিল এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম (a singular exception)। নবাবদের সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতাধীনে বাংলায় তখন শুধু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শান্তি -শৃঙ্খলা বজায় ছিল না, তখন বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অগ্রগতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। শুধু সমকালীন ঐতিহাসিক নয়, আধুনিক ঐতিহাসিক ও গবেষকদের রচনাতেও নবাবী বাংলার অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে।[১] সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্য সূত্রে বাংলাকে 'জান্নাত-আবাদ' বা 'স্বর্গরাজ্য', 'ভারতের স্বর্গ' এবং 'জান্নাত-উল-বিলাদ' বা 'জাতির স্বর্গ' ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িতকরণ বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিরই প্রমাণ।[২] প্রাক-ব্রিটিশ যুগে বাংলার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং উন্নতির বিষয়টি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পদস্থ কর্মকর্তা চার্লস গ্রান্টের (১৭৪৬-১৮২৩) বর্ণনাতেও বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।[৩] নবাবী আমলের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা যে পরবর্তী কোম্পানি আমলের চেয়ে উন্নত ছিল সে কথা আরো অনেক ইংরেজ পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন।[৪] অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি এবং সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল সব ব্যবস্থা তখন নবাবী বাংলায় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বাংলার সমতল পলিযুক্ত উর্বর ভূমিসম্পদ ছিল কৃষি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত অনুকূল।

---

[১] এ বিষয়ে সমকালীন ফারসি উৎস *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, *সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন* এবং *তারিখ-ই মনসুরী*'র বর্ণনাতে বাংলার ধনৈশ্বর্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে সুশীল চৌধুরী (১৯৯৫) এবং এন. কে. সিনহা (১৯৫৬) প্রমুখের লেখনিতেও নবাবী বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা ওঠে এসেছে। তবে এ ব্যাপারে যে মতভিন্নতা নেই, তা কিন্তু নয়। ব্রিজেন কে গুপ্তা (১৯৬৬) এবং কে. এন চৌধুরী (১৯৭৮) প্রমুখ পণ্ডিতগণ নবাবী বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিশেষ কিছু ছিল না বলে মনে করেন। তারা মনে করেন প্রাক-পলাশী যুগেই বাংলার অর্থনৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। অবশ্য নবাবী বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কিত সার্বিক তথ্য-উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণ করলে শেষোক্ত দু'জন পণ্ডিতের বক্তব্যের সাথে সহমত পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই।

[২] শেষোক্ত অভিধাটি ব্যবহার করেছেন ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম। গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, শ্রী রামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত বাংলা অনুবাদ, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৫

[৩] Quted in N. K. Sinha, *The Economic History of Bengal,* Vol. II, Calcutta, 1968, p. 230

[৪] Richard Becher's letter to Governor Harry Verelst, 24 May, 1769 quoted in W. K. Firminger, *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report,* Calcutta, 1962, p. 183

Dhaka University Institutional Repository

বৈচিত্র্যময় ও গুণে মানে উন্নত শিল্পজাত দ্রব্যের বিপুল উৎপাদন নবাবী বাংলার আর্থিক অগ্রগতির অন্যতম একটি কারণ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক হ্যারি ভেরেলস্ট (Harry Verelst) একেই বাংলার সম্পদশ্রীর কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছাড়াও অনুকূল অন্যান্য কারণে নবাবী যুগে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার এবং প্রভূত উন্নতি হয়। এ ছাড়াও এসময় বাংলা থেকে উত্তর ভারতে সম্পদ নিষ্ক্রমণ বন্ধ হওয়ায় প্রকারান্তরে তা বাংলার সামগ্রিক সম্পদ পরিবৃদ্ধিতেও সহায়ক হলো।[৬]

উপরের আলোচনায় নবাবী বাংলার সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র পাওয়া গেল। এ পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের খাতভিত্তিক আলোচনা এবং এতে সমকালীন বাংলার অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা নির্ণয়ের প্রয়াস রইল।

৭.১.১ কৃষি, ভূমি রাজস্ব ও অভিজাত শ্রেণী

সামন্ততান্ত্রিক নবাবী বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান ক্ষেত্র ছিল কৃষি ও ভূমি রাজস্ব। এটিই ছিল নবাবী রাষ্ট্রের আর্থিক বুনিয়াদের প্রধান অবলম্বন। এ বিষয়ে দ্বিমত করার কোনো অবকাশ নেই যে, নদী বিধৌত পলিমাটি দিয়ে গড়া বাংলার বিশাল সমতল উর্বর ভূমি ছিল কৃষি কাজের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কৃষি উৎপাদনের উপযোগী সবকিছু বাংলায় বিদ্যমান থাকায় এখানে বিচিত্র ধরণের কৃষিজ পণ্য উৎপাদন হতো। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সার্ভেয়ার মেজর জেমস রেনেল (Major James Rennell) তাঁর 'জার্নালে' বাংলার কৃষি ও উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।[৭] বাংলার অভন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর উৎপাদিত কৃষিজ ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ রপ্তানি করা হতো। কৃষি পণ্য রপ্তানির প্রধান বাজার ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়ার দেশগুলোতে। উল্লেখ্য কৃষি পণ্য পচনশীল এবং আকারে বিশাল ছিল বলে পরিবহন খরচ বেশি হওয়ায় বাংলা থেকে তা সুদুর ইউরোপে রপ্তানি করা হতো না।

তথ্য পরিসংখ্যান মতে, আঠারো শতকে শুরু থেকেই আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের শুল্ক বাবদ নবাব সরকারের আয় অনেক বৃদ্ধি পায়। তবে এন. কে. সিনহা ১৭০০-১৭৫৭ খ্রি. পর্যন্ত সময়কালে নবাব সরকারের ভূমি রাজস্বের যে পরিসংখ্যান পেশ করেছেন তা থেকে বুঝা যায় যে, তখনো কৃষি ও ভূমি রাজস্বই ছিল সরকারের আয়ের প্রধান উৎস।[৮] সে সময় ভূমি রাজস্ব ছাড়া আর সমস্ত রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসকেই অস্থায়ী ও অনিশ্চিত বলে মনে করা হতো। আর এ কারণেই কৃষি ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ নজর রাখা ছিল সে যুগের রাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য। পূনশ্চ উল্লেখ্য যে, ভূমি

---

[৫] Harry Verelst to Court of Director, 5 April, 1769 cited in 'Fort William-India House Correspondence' Vol. 5, ed. by N. K. Sinha, p. 545; সুবোধকুমার মখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা*, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৩৬

[৬] মুঘল সুবাদারি যুগে সুবাদার ওঅন্যান্য পদস্থ অমাত্যদের মাধ্যমে বাংলা থেকে দিল্লী, আগ্রা এবং উত্তর ভারতে প্রচুর ধন নিষ্ক্রামণ হতো। সুবাদার শায়েস্তা খানের ১৮ বছরে ৯ কোটি টাকা, খান জাহান বাহাদুরের এক বছরে ২ কোটি টাকা এবং আজিম-উস-সানের ৯ বছরে ৮ কোটি টাকা বাংলা থেকে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকে সম্পদ নিষ্ক্রামণেরপরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

[৭] James Rennell, *Journals*, pp. 13, 15, 19, 48, 54, 63, 63, 68, 73; এ ছাড়াও গোলাম হোসেন সলিম এর *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, (পৃ.পৃ. ৩৫, ৩৬, ৪৮) ডব্লিউ. কে. ফারমিংগার (W. K. Firminger) সম্পাদিত *The Fifth Report* Vol. II (pp. 177, 194-204) এবং কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এর *অন্যদামঙ্গল*, (পৃ. ১১) কবি গঙ্গারাম এর *মহারাষ্ট্রপুরাণ* (পৃ. ১৮)সহ সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বাংলায় উৎপন্ন কৃষি ফসলের তথ্য পাওয়া যায়।

[৮] Narendra Krishna Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol. II, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1968, p. 3

রাজস্ব নবাব সরকারের রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস ছিল। এ রাজস্ব আদায়ের জন্য নবাব সরকার মুঘল ঐতিহ্য অনুসারে একটি রাজস্ব আমলাতন্ত্র গড়ে তুলেছিল। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে ভূমিকে খালিসা বা খাস জমি, জায়গির জমি এবং জমিদারি এ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর ভূমি আয় নবাব ও তাঁর পরিবারের ব্যক্তিগত আয় হিসেবে গণ্য হতো এবং এর পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সরসরি নবাব সরকারের রাজস্ব বিভাগের। নবাবী বাংলার ইতিহাসে জায়গির ভূমির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। জায়গির ভূমি সামরিক-বেসামরিক অমাত্য অভিজাতদের মধ্যে বেতনের বিকল্প হিসেবে সাময়িকভাবে বন্টন করা হতো। কাজেই এ শ্রেণীর ভূমি আয় থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আলাদাভাবে অর্থাগম হওয়ার সুযোগ ছিল না। তবে এ ভূমির সাথে বাংলার ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী অমাত্য অভিজাত শ্রেণীর উত্থান এবং বিকাশের বিষয়টি ঘনিষ্টভাবে জড়িত এবং একারণেই এর এত গুরুত্ব। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নবাবের সভাসদ ও উজিরগণ ব্যতিত অন্যসব জায়গিরভোগী কর্মকর্তাকে তাদের অধীনস্থ জায়গিরের আয়-ব্যয়ের হিসাব সরকারের অর্থ দপ্তরে দাখিল করতে হতো। তথ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, সম্বৎসরের ব্যয় নির্বাহের পরও জায়গিরভোগী অভিজাত অমাত্যদের হাতে যে বিপুল অংকের অর্থ জমা হতো, তার সুবাধে কয়েক বৎসরের মধ্যে তারা এমনই আর্থিক সঙ্গতির অধিকারী হতেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে সহজেই প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হতেন।

নবাবী যুগে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ভূমি রাজস্ব জমার প্রধান খাত ছিল জমিদারি ভূমি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবাবী রাষ্ট্র কাঠামোতে জমিদারগণ ছিলেন ভূ-অভিজাততন্ত্রের সুবিধাপুষ্ঠ অন্যতম শক্তিবিশেষ। মোটা দাগে বলতে গেলে জমিদাররা ছিলেন সরকার ও কৃষক-রায়তদের মধ্যে সেতুবন্ধন। রায়তদের কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব আদায় এবং সরকারি কোষাগারে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা ছিল ভূ-অভিজাত জমিদারদের প্রধান দায়িত্ব। ভূমি রাজস্বের সিংহভাগই জমিদারদের মাধ্যমে আদায় করা হতো। জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে রাজধানী মুর্শিদাবাদে পূণ্যাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সরকারের সাথে তাদের সম্পাদিত বন্দোবস্ত অনুযায়ী রাজস্ব পরিশোধ করতেন। উল্লেখ্য যে, জমিদারগণ শুধু ভূমি রাজস্ব আদায় করতেন না, বরং রায়তদের কাছ থেকে তারা 'সায়ের'[৯] এবং 'আবওয়াব'[১০] নামীয় নানা উপকরও আদায় করতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দিউয়ানি দপ্তর পরিচালনায় সহায়তা প্রদানসহ অন্যবিধ আর্থিক লেনদেন প্রক্রিয়া তরান্বিত করার জন্য রাজধানী মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারের একটি সরকারি কোষাগার বা ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতো অর্থ-ব্যবস্থাপনা

---

[৯] মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থায় ভূমিকর ব্যতিত অন্যসমস্ত শুল্ক ও করকে এক কথায় 'সায়ের' বলা হতো। নবাবী যুগে সায়ের রাষ্ট্রীয় আয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল। সায়েরের উৎস ছিল বাড়ি, দোকান, হাট-বাজার, গঞ্জ, মেলা, মাদক দ্রব্য, আমদানি-রপ্তানি দ্রব্য, গুদাম, কুঠি ও ফেরিঘাটের উপর। তাছাড়া লাইসেন্স ফি, সেতু শুল্ক প্রভৃতিও সায়েরের আওতাভূক্ত ছিল।

[১০] সম্রাট আকবরের সময় থেকে 'তুমার জমা'ই ছিল একমাত্র ভূমি রাজস্ব। কিন্তু মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকেই 'আবওয়াব' নামীয় অতিরিক্ত করারোপ শুরু হয়। 'আবওয়াব' হচ্ছে সম্রাটের অনুমোদিত নির্ধরিত রাজস্ব বহির্ভূত বাড়তি নতুন কর। মুর্শিদকুলি খানের প্রবর্তিত আবওয়াবকে বলা হতো 'আবওয়াব-ই- খাসনবিশী'। সুজাউদ্দিন খানের সময় প্রবর্তিত আবওয়াব ছিল 'নযরারনা মুকররি', 'যর মা-তাহুত', 'মা-তাহুত ফীলখানা', ও 'আবওয়াব-ই- ফৌজদারি' এবং নবাব আলিবর্দী খান প্রবতিত আবওয়াব ছিল 'চৌথ মারাঠা','আহুক','নযারানা-ই-মনসুরগঞ্জ' ইত্যাদি। মুর্শিকুলি খানের সময় ধার্যকৃত আবওয়াবের পরিমাণ ছিল ২,৫৮,৮৫৭ টাকা, যা নবাব সুজাউদ্দিন খানের আমলে ১৯,১৪,০৯৫ টাকায় উন্নীত হয়। পরবর্তী নবাবদের সময়ে এর পরিমাণ যে আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নবাব সরকার রাজধানীতে এ ধরনের কোনো অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে না পারায় এ বিষয়ে তাদের বণিক অভিজাত জগৎশেঠদের উপর নির্ভর করতে হয়। শেঠরা তাদের 'হাউজ অব জগৎশেঠ' (The House of Jagatseth) নামীয় আর্থিক সংস্থার মাধ্যমে নবাব সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে নিজেদের আর্থিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি নিশ্চিত করে নেয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, হাউজ অব জগৎশেঠ বাংলার অভ্যন্তরীণ ভূমি রাজস্বের জমা গ্রহণ করতো। পলাশী যুদ্ধের প্রক্কালে গোটা বাংলার খাজনার দুই তৃতীয়াংশ জগৎশেঠ-এর কুঠিতে জমা হতো। এজন্য জগৎশেঠের কুঠিকে বলা হতো 'সরকারের খাজাঞ্চিখানা'। জমাকৃত রাজস্ব থেকে নবাবকে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ সংরক্ষণ এবং সংগৃহীত রাজস্ব থেকে বাৎসরিক রাজস্বরূপে প্রদানযোগ্য অংশ দিল্লীতে মুঘল সম্রাটের নিকট প্রেরণের (বাংলার রাজস্ব বাবদ অর্থ দিল্লীতে 'হুণ্ডি' বা bill of exchange আকারে প্রেরণ করা হতো এবং শেঠদের দিল্লীস্থ এজেন্সি হাউজ বিষটি সমন্বয় করতো) দায়িত্বটিও সুচারুরূপে পালন করতো হাউজ অব জগৎশেঠ। শুধু তাই নয়, এ প্রতিষ্ঠান নবাবের প্রাপ্য বকেয়া রাজস্ব পরিশোধ এবং কৃষির উন্নতির জন্য বাংলার ভূ-অভিজাত জমিদারবর্গকে সময় বিশেষে অর্থ ধার প্রদান এবং সংকটকালে সরকার এবং অভিজাতবর্গকে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিতো। এর মাধ্যমে জগৎশেঠ কুঠি যে কেবল বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছিল তা নয়, বণিক প্রতিষ্ঠান হয়েও বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্রের ইতিহাসে এটি বিশিষ্ট অবস্থান করে নিয়েছিল।[১১]

শুধু রাজস্ব আদায় নয়, বরং রায়তদের সুসংহত করে তাদের চাষাবাদে উৎসাহিত করা, অনাবাদী ভূমিকে চাষাবাদের আওতায় আনা, জলসেচ ও বাঁধের ব্যবস্থা করা এবং কৃষি পণ্যের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করাও ভূ-স্বামী জমিদারদের কর্তব্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেক সরকারি সনদে জমিদারদের প্রতি সরকারের এতদসংক্রান্ত নির্দেশনামা দেখা যায়।[১২] তবে বাস্তবে জমিদাররা এ দায়িত্ব খুব একটা পালন করতো না। লক্ষণীয় যে, নবাবী যুগে ভুমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে যেমন কোনো বড়রকমের পরিবর্তন ঘটেনি, তেমনি কৃষি প্রকরণ ও উৎপাদন পদ্ধতিতেও কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চোখে পড়ে না। সে যুগের কৃষি ছিল প্রধানত কৃষক নির্ভর। কৃষকরা সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতো এবং তাদের চাষাবাদের যন্ত্রাদিও ছিল সেকেলে।[১৩] এই সনাতন চাষবাদ পদ্ধতি পরিবর্তন এবং চাষাবাদে প্রযুক্তির ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা বা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কোনো উদ্যোগ আয়োজন সে কালের জমিদারবর্গ করেছিলেন-এমন কোনো তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি পণ্যের চাহিদার নিরিখে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে কোনো না কোনো প্রযুক্তির প্রয়োগ ছিল অপরিহার্য। ভূ-অভিজাত জমিদারগণ সে কাজটি করতে তো পারেননি, এমনকি চাষাবাদের উন্নতির জন্য তাদের দীর্ঘ মেয়াদী কোনো কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের কথাও জানা যায় না। ভূ-সম্পত্তি

---

[১১] মোঃ হাবিবুর রহমান, *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৮৬

[১২] *Sanad* to Raja Ramkanta cited by John Shore in his *Minute*, April, 1788, quoted in W. K Friminger (ed.), *The fifth Report*, Vol. I, p. xlvii

[১৩]কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিবায়ন* কাব্যে সে যুগে ব্যবহৃত সেকেলে চাষযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। রামেশ্বর ভট্টাচার্য, *শিবায়ন*, কলকাতা, ১৩১০, পৃ.পৃ. ৪৪-৪৫; সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

উপস্বত্তভোগী জায়গিরদারদের তরফেও (সাধারণত অভিজাত অমাত্য) এরূপ কোনো প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য জায়গিরদারদের কাছ থেকে এরূপ উদ্যোগ প্রত্যাশিতও ছিল না। কেননা জায়গির ভূমি বন্দোবস্ত হতো সাময়িক সময়ের জন্য এবং জায়গিরের অবস্থানও পরিবর্তন করা হতো। তাই জায়গিরদাররা কোনো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার পরিবর্তে তাৎক্ষণিক লাভের জন্য যেনতেন প্রকারে জায়গির ভূমি ব্যবহার করতে উৎসাহী ছিলেন। ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার অনুপস্থিতির কারণে ভূ-অভিজাতদের মধ্যে চাষাবাদের উন্নতি এবং কৃষি উৎপাদনে কলা-কৌশলিক প্রথা-পদ্ধতি চালুর ব্যাপারে অনীহা কাজ করতো বলে মনে হতে পারে। তবে মালিকানা না থাকলেও কিন্তু জমিদারদের ভোগস্বত্ব একরকমের স্থায়ীই ছিল। এ অবস্থায় ভূমি ও চাষাবাদের উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল এবং তাদের প্রতি সে ধরণের সরকারি নির্দেশনাও ছিল। তারপরেও তারা এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি বা করতে পারেননি। বস্তুত নবাবী বাংলার জায়গিরদার-জমিদারের ছিল অবক্ষয়ী ও দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশক্তির প্রতিনিধি। মুসা আনসারী যথার্থই বলেছেন যে, উৎপাদন শক্তির কলা-কৌশলিক উদ্বোধন ও উন্নয়নে এরূপ ক্ষয়িষ্ণু সামন্তদের কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ কল্পনা করা চলে না।[১৪]

যে কৃষি ছিল নবাবী বাংলার রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস এবং বাংলার জাতীয় সম্পদ সে কৃষি উৎপাদনের মূলনায়ক কৃষকদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থাও মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। কৃষি ও কৃষককে রক্ষার জন্য নবাব সরকার দৈব-দুর্বিপাকে ফসলের ক্ষতি হলে কৃষকদের খাজনা মওকুফ এবং 'তাকাভি' বা কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করতেন। তবে দুযোর্গ পেরিয়ে উৎপাদন স্বাভাবিক হলে কৃষকদের সরকারি ঋণ পরিশোধে বাধ্য করা হতো। এর জন্য প্রয়োজনে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করা হতো। এমনিতেই ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। সরকারি রাজস্ব পরিশোধের পর কৃষকের হাতে খায়খোরাকি ছাড়া উদ্বৃত্ত হিসেবে বলতে গেলে অবশিষ্ট কিছুই থাকতো না। ফলে স্বচ্ছল উন্নত জীবন যাপনের প্রত্যাশা থাকলেও সে জীবন যাপনের সাধ্য বাংলার কৃষকদের ছিল না। জমিদারদের সাথে রায়ত-কৃষকদের সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ। জমিদারদেরকে ভাবা হতো রায়তদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তবে কৃষকদের রক্ষায় এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়নে জমিদারদের পক্ষ থেকে কোনো কর্মসূচি যে ছিল না, তা নিশ্চিত। অবশ্য কোম্পানি আমলের জমিদারদের মতো নবাব সরকার যুগের জমিদারদের প্রজাপীড়নেরও কোনো সুযোগ ছিল না। এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে জমিদারদের উপর কড়া নজর রাখা হতো।[১৫] তবে এর পরও কৃষকদের যে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি, সে ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। বস্তুত কৃষিজাত পণ্যের স্বল্প মূল্যের কারণে দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের পর কৃষকের হাতে কোনো সঞ্চয় অবশিষ্ট থাকতো না। আর সঞ্চয়ের অভাবে দুর্দিনে মেষের মতো কৃষকরা দলে দলে মারা যেতো বলে যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেছেন।[১৬] এ বক্তব্যে অতিরঞ্জন আছে বলে মনে হয়, তবে এর মধ্য দিয়ে কৃষকদের দুরাবস্থার কথাও নির্দেশিত হয়েছে এবং বাস্তবে কৃষকদের এ দুরাবস্থা ছিল। এ অবস্থার

---

[১৪] মুসা আনসারী, 'প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার আর্থ-সামাজিক বিকাশধারা' *ইতিহাস: সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৩২

[১৫] Abdul Karim, *op. cit.*, p. 220

[১৬] উদ্ধৃতি; গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ১৩৯৮, পৃ.পৃ. ৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নে তখনকার অভিজাতগণ বিশেষ করে ভূ-অভিজাতদের তরফে কোনো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

৭.১.২ শিল্প, শিল্পজাত পণ্য ও অভিজাত শ্রেণী

সামন্ততান্ত্রিক নবাবী বাংলায় সম্পদশ্রী ও সমৃদ্ধির প্রধান ক্ষেত্র কৃষি ও ভূমি রাজস্ব হলেও বৈচিত্রপূর্ণ শিল্প ও শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার কার যায় না। বস্তুত শিল্প ছিল সে যুগের বাঙ্গালির দ্বিতীয় প্রধান উপজীবিকা এবং বিভিন্ন শিল্পে উৎপন্ন পণ্য ছিল সমকালীন বাংলার জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। সিরাজুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন, ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের সময় এবং এর আগে সমগ্র বিশ্বে বাংলার পরিচিতি ছিল এবং সে পরিচিতির কারণ ছিল বাংলার শিল্পপণ্য।[১৭]

নবাবী যুগে বাংলার শিল্পের মধ্যে প্রধান ছিল বয়ন শিল্প। বয়ন শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ ও বৃহত্তর শিল্প ছিল বস্ত্র শিল্প। বস্তুত বস্ত্র শিল্পের সাথে এদেশের জনতার একটি বিপুল অংশের জীবন সাধনা জড়িত ছিল।[১৮] প্রকাশ্যত পেশাটি বর্ণ নির্ভর হলেও বয়ন শিল্প ছিল ব্যাপক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের কুটির শিল্পজাত উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। সময়ের অগ্রগতির সাথে বাংলা বস্ত্রের স্থানীয়, উত্তর ভারতীয় ও ইউরোপীয় চাহিদা বৃদ্ধি এবং বাজার সম্প্রসারিত হলে বিভিন্ন স্থানে আড়ং বা কারিগরি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। উৎপাদি বস্ত্র স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পর ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান এবং এশীয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো।[১৯] বাংলায় ব্যাপকহারে রেশম চাষ হতো। ইউরোপীয় বাজারে বাংলার কাঁচা রেশম ও রেশমি বস্ত্র রপ্তানি হলেও এর প্রধান ক্রেতা ছিল ভারতীয় এবং অন্যান্য এশীয় বণিকরা এবং এশীয় বণিকরাই রেশম বাজার নিয়ন্ত্রণ করতেন।[২০] বস্ত্র শিল্প বিশেষ করে সুক্ষ্ম ও মোটা সূতী এবং সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের জন্য ঢাকার খ্যাতি শুধু দেশে নয়, সমকালীন ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানে উৎপাদিত মসলিনের বেশিরভাগই ইউরোপে রপ্তানি করা হতো।।[২১]

বস্ত্র ছাড়া নবাবী যুগে বয়ন শিল্পের মধ্যে কার্পেট, মাদুর ও শীতলপাটি তৈরি হতো। তাঁতে চট বোনা হতো এবং চট থেকে ব্যাগ ও কার্পেট তৈরি করা হতো। তবে এসব পণ্যের সবই বাংলার অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতো। পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলার অপর প্রধান শিল্প ছিল চিনি এবং বাংলার রপ্তানি পণ্যের তালিকায় এর অবস্থান ছিল তৃতীয়।[২২] বাংলার চিনি ভারতের গোলকুন্ডা, কর্ণাট এবং ভারতের বাইরে মোখা, বসরা এবং পারস্যের বাজারে রপ্তানি করা হতো। বাংলার সমুদ্রোপকূলে লবন শিল্প গড়ে ওঠেছিল। লবন উৎপাদকরা মালঙ্গি নামে পরিচিত ছিল। তাদের

---

[১৭] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৭০৪, ১৯৭১, ২য় খণ্ড, পৃ. ভূমিকা-১

[১৮] সমকালীন দেশীয় এবং ইউরোপীয় লেখক এবং পর্যটকদের বিবরণে দেখা যায় যে, বাংলার প্রতিটি গ্রামে পুরুষ, নারী ও শিশুরা বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত ছিল। Robert Orme, *Historical Fragments of the Mughal Empire*, London, 1905, p. 406

[১৯] John Zephaniah Holwell, *Interesting Historical Events, Rrelative to the Provinces of Bengal*, Vol. 1., T. Becket and P. A. De Hondet, London, 1765, p. 194; সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ ৩৮-৩৯

[২০] সুশীল চৌধুরী, *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ*, পৃ.পৃ. ১০৮, ১১০-১১১, ১১৫, ১১৭; Harry Verelst to Court of Director, 5 April, 1769

[২১] ১৭৫৫ সালের একটি ইংরেজ নথি থেকে জানা যায় যে, সে বছর তাদের কোম্পানি ঢাকা থেকে সরবতি, মলমল, অলবিল, তাঞ্জীব, তেরিন্দাম, নয়নসুখ, দুরিয়া এবং জামদানী ইত্যাদি নানা নামের মসলিন সংগ্রহ করেছিল Letter From the Court, 19 December, 1755

[২২] ওলন্দাজ কোম্পানির একটি প্রতিবেদন মতে, পলাশী যুদ্ধের প্রক্কালে বাংলা থেকে চিনির বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ ছিল গড়ে আশি হাজার মন। Stavorinous, *Voyage to the East Indies*, English Trns. Willckok, Vol. I., London, 1793, p. 232

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদিত লবন বাংলার অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর ভূটান, আসাম, কাশ্মির, তিব্বত ও নেপালে রপ্তানি করা হতো।[২৩] কাগজী নামক একশ্রেণীর কারিগররা নবাবী আমলে বাংলায় কাগজ প্রস্তুত করতেন। গুণে-মানে উন্নততর না হলেও এ কাগজ বাংলার প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরণ করতো। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কিছু পরিমাণে বাংলার কাগজ রপ্তানি হতো এমনকি, ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী থেকেও মাঝে মাঝে বাংলার কাগজ সংগ্রহ করা হতো বলে জানা যায়।[২৪]

সমকালীন ইতিহাসবিদ ও কবি সাহিত্যিকদের রচনা এবং বিদেশী বণিক ও পর্যটকদের বিরণীতে নবাবী যুগে বাংলার বিভিন্ন উন্নত ধরণের হস্তশিল্পের বিবরণ পাওয়া যায়। এসব হস্তশিল্পের মধ্যে ছিল সোনা-রূপার অলংকার, পিতল-কাঁসার তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র, শাঁখার তৈরি বিভিন্ন গহণা ও অলংকার, মাটির তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র, লোহার তৈরি বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র, কাঠের তৈরি বিভিন্ন আসবাবপত্র ও শৌখিন দ্রব্য প্রভৃতি। এর বাইরে উল্লেখযোগ্য ছিল মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের কারুশিল্প (ivory carving)। বাংলায় এই শিল্পের উৎপত্তি নবাবী আমলেই এবং আঠারো শতকে মুর্শিদাবাদের এ কারুশিল্পটি ভারতের অন্য যে কোনো অঞ্চলের চাইতে অনেক বেশি সুনাম অর্জন করেছিল। দিল্লী, বেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে হাতির দাঁতের কারুশিল্পে বাংলার শিল্পরীতি অনুসরণ করা হতো বলে জানা যায়।[২৫]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে নবাবী বাংলায় শিল্প ছিল বহুমাত্রিক এবং এসব শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার ক্রমশ নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। বাংলায় সক্রিয় ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের বাণিজ্যিক তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, পর্যালোচনাধীন সময়ে বিশ্ববাজারে বাংলা পণ্যের একটানা চাহিদা ছিল এবং কখোনই বাংলার পণ্যের চাহিদায় মন্দা দেখা দেয়নি।[২৬] বস্তুত আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকেই এককভাবে বাংলা হয়ে ওঠে বিশ্ববাজারের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী দেশ। এরূপ বাস্তবতায় স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন ছিল সময়ের দাবি। কেননা বাংলার শিল্পোৎপাদন পদ্ধতি ছিল সেকেলে এবং এতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও ছিল একবারেই সনাতন এবং স্থুল ধরণের। সনাতন পদ্ধতির উৎপাদন কৌশল ও সেকেলে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে এখানে শিল্পে ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি শ্রমশক্তির প্রয়োজন হতো। এরূপ বাস্তবতায় নবাবী বাংলায় শিল্পোৎপাদনে কী কোনো মৌলিক রূপান্তর ছিল সময়ের দাবি। কিন্তু বাস্তবে শিল্পোৎপাদন প্রণালীতে কোনো মৌলিক বা প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটেনি। বাংলার কারিগরদের পক্ষে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রূপান্তর ঘটানো সম্ভ ছিল না। কেননা কারিগররা বলতে গেলে প্রায় মহাজনী ব্যবস্থার নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। তারা গ্রামীণ সমাজে নুন্যতম উদ্বৃত্তের উপর নতুন মহাজন বা দাদনি পুঁজির উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল। ফলে এখানকার কারিগরদের মধ্যে ইউরোপের মতো গিল্ড (Guild- মধ্যযুগীয় স্থানীয় ক্ষুদ্র বাণিজ্য সংঘ) জাতীয় সংগঠনের উদ্ভব হতে পারেনি। এজন্য তাদের দ্বারা উৎপাদন পদ্ধতিতে মৌলিক রূপান্তর সাধন সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে মমতাজুর রহমান তরফদারের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন,

---

[২৩] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২

[২৪] *The Diary and consultations of English Council in Calcutta*, 1 October, 1739

[২৫] K. M. Mohsin, *A Bengal District In Transition: Murshidabad*, Dacca, 1973, pp. 74-75

[২৬] Om Prokash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal: 1630-1720*, Priceton University Press, New Jersy, 1985, p. 234

গ্রামীণ ইউনিটগুলোতে আবদ্ধ শ্রমজীবীদের শিক্ষা-দীক্ষা, কারিগরি অভিজ্ঞতা, আর্থিক সামর্থ্য এবং জগৎ ও জীবন সমন্ধে ধারণা ছিল স্বভাবতই অত্যন্ত সীমিত। নতুন নতুন শিল্প-প্রযুক্তির উপযোগ সমন্ধে তাই তাদের মনে কৌতুহল বা উদ্যম কমই জাগত। পৃথিবীর অন্য প্রান্তের প্রকৌশলগত উদ্ভাবন জানবার বা বুঝবার মতো কোনো উপায় তাদের ছিল না। কিছুটা দুরবর্তী অঞ্চলে কোনো প্রযুক্তি প্রকৌশলের উদ্ভাবন হলেও গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতার দরুন তারা এর খোঁজখবর রাখতো না। আর খোঁজ পেলেও বা কোনো প্রযুক্তির উপযোগিতা বুঝতে পারলেও আর্থিক অনটনের কারণে তার প্রয়োগ তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না।[২৭]

তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, সমকালীন অমাত্য ও ভূ অভিজাত শ্রেণী বাংলার কোনো কোনো শিল্পের বিশেষ করে নগরশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[২৮] অভিজাতদের বিলাস দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা এসব শিল্পের প্রধান দায়িত্ব ছিল। তবে উৎপাদন প্রণালীর মৌলিক রূপান্তর বা কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তারা কোনো অবদান রাখতে পারেননি। এ ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল বলেও মনে হয় না। প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, কাঠামোগতভাবে নবাবী যুগের অভিজাত শ্রেণীর অমাত্য ও ভূ-স্বামীরা ছিল উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন। কাজেই তারা উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ও কারিগরি প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। কৃষক-কারিগরদের শোষণ করে সবচেয়ে বেশি সম্পদ আহরণ করতে পারলেই তারা সন্তুষ্ট থাকতেন। মমতাজুর রহমান তরফদারের মতে, গ্রামের কৃষক-কারিগরদের কাছ থেকে তারা রাজস্ব ও পণ্যসহ অনেক কিছুই নিতেন, কিন্তু বিনিময়ে তারা বলতে গেলে কিছু দিতেন না। বস্তুগত আদান-প্রদানের এ ব্যবস্থাকে তরফদার 'একতরফাভাবে প্রতিষ্ঠিত গ্রহণধর্মী ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছেন।[২৯] বর্ণিত এ পরিস্থিতিতে পণ্য উৎপাদনে প্রযুক্তি ব্যবহারে রক্ষণশীলতা দুরীকরণে বাংলার বণিক সমাজ বা অভিজাত বণিক শ্রেণীর বিশেষ ভূমিকা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তারাও সে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বস্তুত বাংলার বণিক সমাজ ছিল অনেকটাই পরজীবী বা দালাল বণিক। বাংলায় স্বউদ্যোগে বণিক সমাজের বিকাশ ঘটেনি, ফলে এরা ইউরোপীয় বণিক সমাজের ন্যায় প্রগতিশীল উৎপাদনশক্তির প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি।

বাংলাভিত্তিক অভিজাত শ্রেণী তথা ধনিক বণিকরা উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরে কোনো প্রচেষ্টা না নিলেও পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলায় শিল্প পণ্য উৎপাদনে কিছু উন্নতি যে হয়নি, তা কিন্তু নয়। ইউরোপের বাজারে চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্র সরবরাহের জন্য বয়নযন্ত্রের নতুন বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। দেশীয় অভিজাত শক্তি এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি সে কথা ইতিমোধ্যেই বলা হয়েছে। তবে এ কাজে এগিয়ে আসে ইউরোপীয়রাই। তারা বয়ন ও উৎপাদন কৌশলে কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা চালায়। ইউরোপ থেকে রঞ্জক ও বস্ত্র শিল্পীদের এনে দেশীয় তাঁত শিল্পীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ওলন্দাজরা প্রথমে এ কাজটি করে এবং পরে

---

[২৭] মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩২

[২৮] সুশীল চৌধুরী, *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ*, পৃ. পৃ.১২১,; শ্রী রসিকলাল গুপ্ত, *মহারাজা রাজবল্লভ সেন*, সাথী প্রেস, কলিকাতা, পৃ.৭৭; গোলাম রব্বানী, *উপনিবেশপূর্ব বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫৭

[২৯] মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, পৃ. ৩৩

ইংরেজরাও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলার বয়নশিল্পে কিছু নতুন টেকনিক প্রবর্তন করে।[৩০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবাবী যুগ বা তারও আগে মুঘল আমলে বাংলায় বৃহদায়তনের কিছু শিল্প কারখানা ছিল। তবে সেগুলো ছিল সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য ইউরোপীয়দের পরিচালিত কারখানার সাথে সরকারি কারখানার মৌলিক পার্থক্য ছিল। ওলন্দাজ পরিচালিত কারখানার লক্ষ্য ছিল পণ্য উৎপাদন, কিন্তু সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করখানাগুলোতে মূলত রাজপরিবার, অভিজাত শ্রেণী আমলা ও সৈনিকদের প্রয়োজনীয় ভোগ্যসামগ্রী তৈরি করা হতো। এতে বৃহত্তর বাজারের জন্য কোনো পণ্য উৎপাদন করা হতো না। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সরকারি পর্যায়ে কারখানা থাকলেও এগুলো দেশে শিল্পপুঁজি বিকাশে কোনো অবদান রাখতে পারেনি। এ অবস্থায় বিদেশীদের প্রতিষ্ঠিত করাখানা শিল্প অবশ্যই বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তবে লক্ষ করার বিষয় এই যে, ইউরোপীয়রা নিজেদের স্বার্থে বাংলায় শিল্পোৎপাদনে কিছু নতুন টেকনিক বা উৎপাদন শৈলী প্রর্বতন করলেও তারা উৎপাদন প্রণালীতে (mood of production) কোনো মৌলিক রূপান্তরের চেষ্টা করেনি। উৎপাদন ব্যবস্থায় তারা কোনো প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বা সংযোজনেরও উদ্যোগও নেননি। মুনাফালোভী ইউরোপীয় শক্তির কাছ থেকে তা কাম্যও নয়। এ দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল এদেশীয় শাসকগোষ্ঠী বা অভিজাত শ্রেণীর, বিশেষকরে বণিক-মহাজনদের। কিন্তু তারা সেটি করেনি বা করতে পারেনি। কেন পারেনি- তার কিছু ইঙ্গিত উপরের আলোচনায় রয়েছে। প্রসঙ্গত আরো দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইরফান হাবিব মনে করেন সস্তা দক্ষ শ্রমশক্তির পর্যাপ্ততার কারণে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বা প্রসারণের চাপ অনেকখানি বাধা পেয়েছিল। তাছাড়া প্রযুক্তিগত বিষয়ে ভারতীয়দের আগ্রহের অভাবকেও তিনি উৎপাদন প্রণালীতে মৌলিক রূপান্তর এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অন্তরায় ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৩১]

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক নির্মাণে নেতৃত্বদানকারী সচেতন বাণিজ্যিক বুর্জোয়া শ্রেণী বাংলায় সে সময় গড়ে ওঠেনি। এসময় বাংলায় মহাজনী বা ব্যবসায়ী পুঁজির বিকাশ হয়েছিল সত্য। তবে একমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থে এ বিকাশ ঘটায় বাংলার বণিক পুঁজি ইউরোপের মতো শিল্প পুঁজিতে রূপান্তর হয়নি। উল্লেখ্য যে ব্যবসায় পুঁজির বিনিয়োগ হয় স্বল্প মেয়াদি, কিন্তু শিল্প বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদি। এ দীর্ঘমেয়াদি অর্থলগ্নির ঐতিহ্য, ব্যবস্থা বা প্রচেষ্টা কোনোটিই এদেশীয় বণিক পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে ছিল না। এজন্য তারা কারিগরি শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়নি। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, প্রযুক্তির প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের ভূমিকার রাখার প্রশ্নই আসেনি।

উপরে বর্ণিত অভ্যন্তরীণ সমস্যাদি ছাড়াও স্বদেশী তৎপরতার প্রতিবন্ধকতায় ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহেরও ভূমিকা ছিল বলে ধারণা করা অমুলক হবে না। বস্তুত ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ এদেশের উৎপাদক ও কারিগর শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতো তাদের সহযোগী এ দেশীয় দাদনি-দালাল বণিকদের মাধ্যমে। কারিগর শ্রেণীর উপর দেশীয় পুঁজিপতি ও বণিক-ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে বিদেশীদের সাথে তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিতো। এরূপ

---

৩০ Om Prokash, *op. cit.*, *pp.* 101, 104; *English Factory Records*, Dacca, Vol. II, p. 29

৩১ Irfan Habib, 'Technology and Barriers to Technological Change in Mughal India', *Indian Economic and Social History Review*, Vol. V, (1-2), 1978, pp. 152-174

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতিতে সরকার দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর পাশে দাঁড়ালে ইউরোপীয় বণিকদের এদেশের ব্যবসা বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়িত হতো না। এ সত্য ইউরোপীয় বণিক-ব্যবসায়ীরা যথাযথভাবেই উপলব্ধি করেছিল। তাই তারা কোনোভাবেই চায়নি এদেশের অভিজাত শ্রেণী বিশেষ করে পুঁজিপতি বণিক ব্যবসায়ীরা উৎপাদনের সাথে যুক্ত হোক বা দেশের শিল্পোৎপাদনের মৌলিক রূপান্তরে ভূমিকা রাখুক। ফলে অনুকূল পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও বাংলার শিল্পের উৎপাদন প্রণালীতে শ্রম চাহিদা লাঘবকারী কোনো প্রযুক্তিগত উন্নয় ঘটেনি। এতে করে বাংলার শিল্প তার ঐতিহ্য কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে এবং তা কখনো ইংল্যান্ডের মতো স্বাধীন উদ্যোগে কারখানা শিল্পস্তরে উন্নীত হতে পারেনি। মোদ্দা কথা বাংলার উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার না থাকায় একে সরল উৎপাদনই বলতে হয়। আর এরূপ সরল উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থারই সারকথা।

৭.১.৩ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অভিজাত শ্রেণী

কৃষিজ ও শিল্পজাত পণ্যের ব্যাপক উৎপাদনের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার লাভ ছিল নবাবী বাংলার অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদগণ আলোচ্য সময়ে বাংলা বাণিজ্যের সামগ্রিক উন্নতির যে সব আর্থ-সামজিক কারণ নিদেশ করে থাকেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- (ক) বাংলায় কৃষি ও উন্নতমানের শিল্পজাত পণ্যের ব্যাপক উদ্বৃত্তি এবং বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও ইউরোপে বাংলা পণ্যের বিপুল চাহিদা, (খ) সস্তায় অব্যাহত শ্রমশক্তির যোগান এবং পণ্যের সস্তা ও সুলভ মূল্য, (গ) উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। জেমস রেনেল, আলেকজেন্ডার ডাও সহ সমকালীন পণ্ডিতদের বিবরণীতে বাংলার স্থল এবং নদী ও সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্য অনুকূল উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে।[৩২] (ঘ) বাংলার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, উন্নত মুদ্রা এবং বাণিজ্য পুঁজির সহজ যোগানের ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি (ঙ) বাংলার নবাবদের শাসন ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচার থাকলেও তা উৎপীড়নমূলক ছিল না। নবাবদের আরোপিত বাণিজ্য শুল্কের পরিমাণও ছিল তুলনামূলকভাবে কম। এ সবই বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য বিকাশের একটি অনুকূল পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল। তদুপরি নবাব ও রাজপুরুষদের *সওদা-ই-খাস* নামক একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসানের বিষয়টিও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বস্তুত মুঘল সুবাদারি যুগে সুবাদর-রাজপুরুষগণ *সওদা-ই-খাস* নামে বিশেষ বিশেষ পণ্যের একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করায় এ যুগে সাধারণ পেশাধার বণিকদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ব্যহত হয়। সরকারি কর্মচারীদের একচেটিয় বাণিজ্যের ফলে পেশাদার বণিকরা নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। নবাবী যুগে এ অবস্থার অবসান ঘটে; নবাব ও রাজপুরুষদের *সওদা-ই-খাস* নামক একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান এবং *সওদা-ই-আম*-এর বিস্তার ঘটায় নবাবী যুগে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যে

---

[৩২] James Rennell, *Description of Roads in Bengal and Bihar,* London, 1778, pp. 5, 37-38, 40-71; যন্ত্রশিল্প উদ্ভাবনের আগের মানদণ্ড অনুযায়ী বিবেচনা করলে নবাবী যুগে বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল বলে পি জে মার্শালও উল্লেখ করেছেন। P J Marshall, *.Bengal: the British Bridgehea: Eastern India, 1740 - 1828*, Cambridge University Press, London, 1988, p. 13; বাংলার প্রধান তিনটি কর্মকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ, কলকাতা এবং ঢাকার সঙ্গে উত্তরে নেপাল ও ভূটান, দক্ষিণে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা, দক্ষিণ পশ্চিমে সিংভূম, পালামৌ ও ছোটনাগপুর, পশ্চিমে কাশী ও গাজীপুর, উত্তর পশ্চিমে বিহারের বাতিয়া, উত্তরে শ্রীহট্ট, জয়ন্তিয়া ও খাসপুর এবং দক্ষিণ পূর্বে চট্রগ্রাম, রাজঘাট ও জুলকুদ্দার সংযোগ ছিল।

রীতিমতো একটি বিপ্লব সাধিত হয়। ইউরোপসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলা বাণিজ্যের একটি অনুকূল ভারসাম্য (favourable blance of trade) বজায় থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি অপরিসীম। সে অনুপাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকারও অনেকরকম। পর্যালোচনাধীন নবাবী বাংলার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তবে আলোচনার সুবিধার্থে নবাবী বাংলার সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ, আন্তপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক -এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজার ও বাণিজ্য ছিল বিশাল। নবাব সরকার যুগে মুর্শিদাবাদের কাছে ভগবানগোলা এবং ঢাকার কাছে রাজনগর ছিল অভ্যন্তরীণ বাজারের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। ঢাকার কাছে নারায়ণগঞ্জ, বর্ধমান, নাটোরের ভবানীগঞ্জ, শিবগঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ, কলকাতার শোভাবাজার, বাগবাজার, হাটখোলা বাজার, চার্লস বাজার, বেগমবাজার এবং নয়াবাজার ইত্যকার আরো অনেক বাজার ও গঞ্জ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। এর বাইরেও সারা রাজ্যে অনেক বাজার, গঞ্জ ও হাট ছিল। এসব বাজার পরিচালনা এবং তদারকিতে ভূ-অভিজাত জমিদার গোষ্ঠীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। সরকারি কর্মচারিদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার জমিদারদের কর্মচারিরা জিনিসপত্রের গুণগতমান, মুল্য ও ওজন-পরিমাপ তদারক করতো। হাট-বাজার, গঞ্জ ও মেলা থেকে জমিদারদের 'সায়ের' নামীয় শুল্ক আদায় এবং তা রাজকোষে জমা দেয়ার যে দায়িত্ব ছিল- এ কথা ইতোমধ্যে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলার বড় বড় ব্যবসায়ী মহাজন থেকে শুরু করে অসংখ্য ছোট ছোট বণিক ব্যবসায়ীও দোকানদার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল।[৩৩] সে সময়কার বণিক অভিজাতদের মধ্যে আর্মেনিয় বণিক খোজা ওয়াজিদ, পাঞ্জাবী উমিচাঁদ ও তার ভাই দ্বীপচাঁদ নবাব দরবার ও অভিজাত অমাত্যদের সাথে তাদের ঘনিষ্টতার সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু পণ্যের উপর তাদের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার (monopoly rights) প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, বাংলার সোরা ও লবন এবং বিহারের অফিম ব্যবসার উপর খোজা ওয়াজিদ একচেটিয়া অধিকার কুক্ষিগত করেছিলেন। খোজা ওয়াজিদের পক্ষে তাঁর আত্মীয় মীর আফজাল ও মীর আশরাফ নামক দু'জন ব্যবসায়ী বিহারে সোরা ও আফিমের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। ওয়াজিদের আগে বিহারের সোরা ও আফিম ব্যবস্যার উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল বণিক অভিজাত উমিচাঁদ ও তাঁর ভাই দ্বীপচাঁদের।[৩৪] উল্লেখ্য যে, পণ্যের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জন সম্পূর্ণ নবাব দরবারের কৃপার উপর নির্ভরশীল ছিল। এজন্য বণিক ব্যবসায়ীদের শুধু অর্থের জোর থাকলেই চলতো না, এর সাথে দরবারের সাথে রাজনৈতিক যোগাযোগও থাকতে হতো। আর এ যোগাযোগের জন্য ব্যবসায়ীদের সরকারকে বার্ষিক এককালীন টাকা যেমন দিতে হতো, তেমনি নবাব দরবারের উচ্চ আমলাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যও তাদের মোটা অংকের টাকা খরচ করতে হতো। যা'হোক দেশী বা বিদেশী বণিক যেই হোক না কেন এসব পণ্য সংগ্রহের জন্য তাদেরকে একচেটিয়া অধিকারপ্রাপ্ত বণিক মহাজনদেরই দ্বারস্থ হতে হতো। এ সুযোগে তারা সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকাটিও পালন করতেন।

---

[৩৩] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫

[৩৪] Bengal Public Consultations, Range 1, Vol. 26, f. 110; Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire*, p. 134

Dhaka University Institutional Repository

আকার ও বৈচিত্রের দিক থেকে নবাবী যুগে বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য ছিল বিস্তৃত ও বিশাল। রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালিত হতো ভারতের আন্তঃপ্রদেশ এবং বহির্বিশ্বে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, আফ্রিকা ও ইউরোপে। পূর্বে আসাম, ভূটান, পশ্চিমে গুজরাট, বোম্বে ও সুরাট, উত্তরে কাশ্মিরসহ বিভিন্ন অঞ্চল এবং দক্ষিণে করমণ্ডল ও মালাবার উপকূল, উত্তর ও মধ্যভারতের দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, কাশী, বুন্দেলখণ্ড ও মালবের সঙ্গে স্থল ও জল পথে বাংলার আন্তপ্রাদেশিক বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। আন্তপ্রাদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বণিক দল বাংলায় আসতো।[৩৫] আন্তপ্রাদেশিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলা থেকে বণিক দলকে দিল্লী, আগ্রা, আসাম, বালেশ্বর, কাশী, এলাহাবাদ ও অযোধ্যায় যেতে দেখা যায়। বালা বাহুল্য যে, বাংলার বণিকদের মধ্যে যারা বিপুল পুঁজির মালিক ছিলেন, তাদের পক্ষেই আন্তপ্রাদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ সম্ভব ছিল। ডাচ কোম্পানির রেকর্ডস থেকে জানা যায় যে, আঠারো শতকের চল্লিশের দশকে বণিক অভিজাত খোজা ওয়াজিদের বাণিজ্যতরী বাংলার পণ্যসম্ভার নিয়ে সুরাট যাচ্ছে। একই বণিকের বাণিজ্যতরীকে পঞ্চাশের দশকে মুসলিপট্রমে যাতায়ত করতে দেখা যায়।[৩৬] বাংলা ও ভারতীয় বণিকদের বাইরে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যাক্তিগতভাবে[৩৭] আন্তপ্রাদেশিক বাণিজ্যে অংশ নিতো।

নবাবী যুগে বাংলার আন্তর্জাতিক বা বহির্বাণিজ্যও ছিল আয়তনে বিশাল এবং প্রকৃতিতে বৈচিত্রপূর্ণ। বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর এর প্রভাব ছিল গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। ঐতিহাসিক মহলে এতদিন প্রচলিত ধারণা ছিল বাংলার বহির্বাণিজ্যে ইউরোপীয় বণিকদেরই মূখ্য ভূমিকা ছিল এবং এক্ষেত্রে এশীয় বা বাংলার অভিজাত বণিকদের ভূমিকা ছিল গৌণ।[৩৮] কিন্তু অধুনা সুশীল চৌধুরীসহ ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে উক্ত ধারণার অসারতা প্রমাণ করেন।[৩৯] সন্দেহ নেই আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বাণিজ্য কেবল বাংলার অর্থনৈতিক দৃশ্যপট নয়, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও বেশ বড় রকমের পরিবর্তন

---

[৩৫] উইলিয়াম বোল্টস (১৭৩৯- ১৮০৮) লিখেছেন, বাংলার পণ্য সংগ্রহের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে থেকে কাশ্মিরী, মুলতানী, আফগান, শেখ, পাগাইয়্যা (পাগড়িধারী উত্তর ভারতীয় বণিক), সন্ন্যাসী, ভুটিয়া ইত্যাদি নানা জাতি ধর্মের বণিক ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধভাবে বাংলায় আসতো এবং সংগৃহীত পণ্য তা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যেতো। William Bolts, *Considerations on India Affairs*, London, 1172, p. 200; Narendra Krishna Sinha. op.cit., p.110; প্রায় একই রকমের বক্তব্য পাওয়া যায় অপর ইংরেজ কোম্পানি কর্মকর্তা লিউক স্ক্রাফটন এর বর্ণনাতেও। Luke Scrafton, *Reflections on the Government of Indostan*, London, 1760, p. 20

[৩৬] Jan Kerseboom's 'Memoire', VOC 2849, f. 122 cited in S. C. Hill, *Bengal in 1756-1757*, Vol. II, p. 87

[৩৭] ব্যক্তিগতভাবে বাণিজ্য পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয়রা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল- (ক) লাইসেন্সধারী স্বাধীন বণিক (free merchent) এবং লাইসেন্সবিহীন বে-আইনি বণিক (interloper) ।

[৩৮] কে. এন. চৌধুরী, ওম প্রকাশ, পি জে মার্শাল, সি এ বেইলী এবং বি. কে গুপ্তা প্রমুখের গবেষণা গ্রন্থ পাঠে এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। K. N. Chadhuri, *The Trading World of Asia;* Om Prokash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal;* P. J, Marshall, *Bengal- the British.Bridgehead;* Cambridge, 1987; C A Bayly, *Indian Society and the Making of the British Empire,* Cambridge, 1987; B. K. Gupta, *Sirajuddaullah and the East India Company,* Lieden, 1966

[৩৯] এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে সুশীল চৌধুরীর, *From Prosperity to Decline: Eighteenth Century Bengal; The Prlude Empire: Plassey Revolution of 1757;* 'The Asian merchants and cmopanies in Bengal's export trade, circa mid-eighteenth century', Sushi Caudhury and Michel Morineau (ed.), *Merchants, Companies and Trade: Europe and Asia in the Early Modern Era,* Cambridge University Press, 2007

Dhaka University Institutional Repository

ঘটায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলার বহির্বাণিজ্যে সক্রিয় প্রধান তিনটি ইউরোপীয় কোম্পানি ছিল ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তবে এদের বাইরে দিনেমার, বেলজিয়ামের অস্টেণ্ড ও জার্মানির এমডেন কোম্পানিও বাংলার বহির্বাণিজ্যে ভাগ বসানোর চেষ্টা করলেও মোটেই সফল হতে পারেনি। ইউরোপীয়রা ছাড়াও এ যুগে বাংলার বহির্বাণিজ্যে এশীয় বণিক এবং বাংলার অভিজাত বণিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়।

এ কথা মোটামুটিভাবে সবারই জানা যে, বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, কৃষিজ ও শিল্প সম্পদের প্রাচুর্য এবং বাণিজ্যিক সুবিধার খ্যাতি শুধু এশীয় বণিকদের নয়, ইউরোপীয় বণিকদেরও বাংলায় আগমনে প্রলুব্ধ করেছিল। নবতর মার্কেন্টাইল বাণিজ্যিক আদর্শ নিয়ে ইউরোপীয়দের বাংলা তথা প্রাচ্যে আগমন ঘটেছিল বিশ্ব সভ্যতার এক বিশেষ পর্যায়ে।[৪০] উত্তমাশা আন্তরীপ (Cape of Good Hope) হয়ে প্রাচ্যে আসার নতুন জলপথ আবিস্কার ও ইউরোপের সাথে সরাসরি ভারতবর্ষের বাণিজ্য যোগাযোগ স্থাপনের পথিকৃত হলো পর্তুগিজ শক্তি। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরাবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রবল নৌশক্তিধর পর্তুগিজরা বাংলা বাণিজ্যে তাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়। সাতগাঁও, হুগলি এবং চট্রগ্রাম ছাড়াও বঙ্গোপসাগর ও অন্যান্য জলপথে পর্তুগিজ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সতেরো শতকেই নানা কারণে বাংলা বাণিজ্যে পর্তুগিজ প্রাধান্যের অবসান ঘটে।[৪১] ফলে নবাব সরকার যুগে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাদের অংশ গ্রহণের প্রশ্ন ছিল না।

বাংলা বাণিজ্যে পর্তুগিজদের স্থান দখল করে ওলন্দাজ, ইংরেজ এবং আরো পরে দৃশ্যপটে আসে ফরাসিরা। আন্তমহাদেশীয় বাণিজ্যে বর্ণিত এ তিন শক্তি নতুন আদর্শ-চেতনা, নতুন জীবন ও নতুন আমেজ নিয়ে আসে।[৪২] প্রাচ্য বাণিজ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অধিকতর বাণিজ্য বিকাশের স্বার্থে ইংরেজরা ১৬০০ সালে *The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies* (সংক্ষেপে The English East India Company) নামে একটি কোম্পানি গঠন করে। ইংরেজদের অনুকরণে ১৬০২ সালে ওলন্দাজরা *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (সংক্ষেপে VOC, ইংরেজিতে United East India Company) এবং ফরাসিরা ১৬৬৪ সালে *Compagnie des Indes Orientales* (The French East India Company) নামক কোম্পানি গঠন করে। সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ওলন্দাজ এবং ইংরেজরা বাংলা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। চিনসুরায় বাংলা বাণিজ্যের ওলন্দাজ সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। ১৬৬২ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭-৭ খ্রি.) কর্তৃক প্রদত্ত একটি উদার সনদকে বাংলা বাণিজ্যে ওলন্দাজ সমৃদ্ধির

---

[৪০] পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপীয় সমাজে এক আমুল রূপান্তর প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। সামন্ততন্ত্রের অর্ন্তনিহিত বিরোধ এবং এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সমন্বয় প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সেখানকার সামন্ত সমাজে অবক্ষয় দেখা দেয় এবং সামন্তন্ত্রের গর্ভে বণিকতন্ত্রের (Mercantilism) জন্ম হয়। mercantilism তত্ত্বে, সংগঠনে, উদ্দেশ্যে, পরিব্যাপ্তি ও ব্যবস্থাপনায় পূর্বের ব্যবসায়-বাণিজ্য হতে ছিল ভিন্ন প্রকৃতির।

[৪১] পর্তুগিজরা ৷ ছিল তদানিন্তন ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মুখপাত্র ও সামন্ততান্ত্রিক বণিকদের প্রতিনিধি। তারা নির্ভেজাল বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ভারতে আসেনি। ভারত মহাসাগরের উপর প্রভূত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় রণনীতি ও রণকৌশল, শক্তি, সম্পদ এবং চেতনা সংগঠন পর্তুগিজদের ছিল না। তাদের ধর্মনীতি এবং দাস ব্যবসা ও জলদস্যুতা ইত্যাদি তাদেরকে স্থানীয় জনতার প্রতিরোধের মুখোমুখী করে। এ অবস্থায় ইউরোপ থেকে আগত ওলন্দাজ এবং ইংরেজ বণিক গোষ্ঠীর তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে পর্তুগিজ প্রাধান্যেরঅবসান ঘটে।

[৪২] এরা ছিল রেনেসাঁস উজ্জিবীত সেদিনের ইউরোপের অগ্রগামী শক্তি। এরা mercantilism নামক নতুন বাণিজ্যিক আদর্শের প্রতিনিধি ছিল।

নিয়ামক হিসেবে গণ্য করা হয়।[৪৩] এই সনদ সূত্রে কোম্পানির বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতি হয়। ওম প্রকাশ (Om Prakash) পরিবেশিত কিছু তথ্য পরিসংখ্যান থেকে সতেরো শতকের মধ্যভাগ থেকে আঠারো শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত বাংলা বাণিজ্যে ওলন্দাজদের প্রভূত উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৪] এ যুগে ওলন্দাজদের মোট এশীয় বাণিজ্যের এক তৃতীয়াংশ বাংলার সঙ্গে পরিচালিত হতো।[৪৫] বাংলাকে ইউরোপীয় বাজারের সংগে নিবিড়ভাবে যুক্ত করার বড় কৃতিত্বটি অবশ্যই ওলন্দাজদের প্রাপ্য। এত সাফল্য সত্বেও বাংলায় ওলন্দাজ বাণিজ্যের সুদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সতেরো শতকের শেষ দিক হতে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ইউরোপীয় বাস্তবতায় উদ্ভুত নতুন নতুন সমস্যার সাথে নিজেদের খাফ খাওয়াতে না পাড়ায় ওলন্দাজ বাণিজ্যে ভাটা শুরু হয় এবং আঠারো শতকের প্রথমার্ধেই বাংলা বাণিজ্যে তাদের পতন ঘটে।

পশ্চিমাদের কাছে প্রাচ্য বাণিজ্যলক্ষ্মীর দুয়ার উন্মুক্ত করার বড় কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ইংরেজদেরই প্রাপ্য। সতেরো শতকের শুরুতে ভারত মহাসাগরে ইংরেজদের আগমন ঘটলেও বাংলা বাণিজ্যে তাদের অংশগ্রহণ ঐ শতকের মধ্যভাগে। ১৬৫১ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র হুগলিতে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এঘটনাকে 'বাংলায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৪৬] কেননা এরপর থেকে বাংলায় ইংরেজ বণিক কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বছরই কোম্পানি বাংলার সুবাদার শাহ সুজার কাছ থেকে বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বিনা শুল্কে ব্যবসার সুবিধা সংক্রান্ত একটি নিশান আদায় করে। এ নিশান প্রাপ্তিকে বাংলা বাণিজ্যে কোম্পানির একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হয়। একে কোম্পানির মুক্তি সনদ হিসেবেও কেউ কেউ বিবেচনা করেন।[৪৭] ১৬৫৭ সালে কোম্পানি মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট থেকে বাংলা বাণিজ্য পৃথক এবং বাংলায় স্বাধীন বাণিজ্য এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করে। ইতোমধ্যে স্টুয়ার্ট রেস্টুরেশনের (Stuart Restoration, 1660) মাধমে ইংল্যান্ডে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে মার্কেন্টাইলিজমের জয় হয়। এ পরিস্থিতিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বাণিজ্য সম্পসারণের উদ্দেশ্যে শান্তিবাদী নীতি ত্যাগ করে যুদ্ধংদেহী মনোভাব গ্রহণ করলে ১৬৮৬ সালে সুবেদার শায়েস্তা খানের সাথে কোম্পানির যুদ্ধ বাধে।[৪৮] চার বছর যুদ্ধ চলার পর ১৬৯০ সালে কোম্পানি মুঘলদের কাছে নতিস্বীকার এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করেন। আওরঙ্গজেবের দুর্বল ও দেউলিয়া সরকার অর্থনৈতিক কারণেই কোম্পানিকে ক্ষমা করতে বাধ্য হয়। বার্ষিক তিন হাজার টাকা শুল্ক প্রদানের শর্তে কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করা অনুমতি সম্বলিত একটি শাহী ফরমানও দেয়া হয়। ইংরেজদের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের জন্য বাংলার সুবেদার ইব্রাহীম খান কোম্পানির এজেন্ট

[৪৩] উক্ত ফরমান বলে ওলন্দাজ কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা বাণিজ্যে রাহাদারি ও বিভিন্ন আবগারি শুল্ক থেকে রেহাই পায়। তাছাড়া এতে দেশীয় বণিকদের দালাল নিয়োগ এবং চিনসুরার কুঠি প্রধানের প্রদত্ত দস্তক প্রদর্শন করে বাংলার সর্বত্র ওলন্দাজদের পণ্য নির্বিঘ্নে এবং অবাধে চলাচলের অনুমতি দেয়া হয়। Om Prakash, *op. cit.*, p.221

[৪৪] বিস্তারিত Om Prakash, *op.cit*, p.p. 76-79, 212, 216, 234

[৪৫] P. J. Marshall, *East Indian Fortunes: The British in Bengal in the Eighteenth Century*, Oxford. 1976. p. 29

[৪৬] Sushil Chaudhury,, *Trade and Commercial Organization in Bengal, 1650-1720*, Calcutta, 1975, p. 26

[৪৭] মুসা আনসারী, 'প্রাক-পলাশী যুগে কোম্পানির আর্থ-সামাজিক বিকাশধারা', *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৩২

[৪৮] যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে Abdul Karim, *History of Bengal, Mughal period*, vol. II, pp645-663

Dhaka University Institutional Repository

জব চার্নককে সুতানটিতে বাণিজ্য কুঠি নিমার্ণের অনুমতি দেন। কালক্রমে এই সুতানটি প্রাচ্যের বৃহত্তম নগরী কলকাতায় পরিণত হয় এবং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় নিজস্ব উদ্যোগ আত্মরক্ষার অজুহাতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডয়া কোম্পানি তাদের সুতানটি কুঠিতে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে এ দূর্গ তাদের নিরাপত্তাই নয়, রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্র এবং এদেশে ইংরেজ রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের প্রথম খুঁটি হিসেবে গণ্য হয়। ১৭১৭ সালে কোম্পানি সম্রাট ফররুখ সিয়ার (১৭১৩-১৭১৯ খ্রি.) কাছ থেকে একটি সনদ লাভ করে। অনেকেই এ সনদকে অনেকভাবে মূল্যায়ন করলেও ইংরেজদের কাছে এ সনদ ছিল 'ম্যাগনা কার্টা' (Magna Carta)।[৪৯] কেননা এটি ছিল কোম্পানির রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিস্তার এবং বাণিজ্যিক প্রবৃদ্ধির আইনগত ভিত্তি।

নবাবী যুগে বাংলার বহির্বাণিজ্যে সক্রিয় অপর ইউরোপীয় শক্তি ছিল ফরাসিরা। এরা ইংরেজ ও ওলন্দাজদের অনেক পরে বাংলায় আসে। ১৬৬৪ সালে প্রাচ্য বাণিজ্যে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে *Compayne des Indes Orientals* নামে একটি ফরাসি বাণিজ্য সংস্থা গঠন করা হয়।[৫০] ১৬৬৭ সালে সুরাটে ফরাসি বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। তবে বাংলায় তাদের পদার্পন ঘটে ১৬৭৪ সালে। এবছর সুবেদার শায়েস্তা খানের অনুমতি নিয়ে ফরাসিরা বাংলায় তাদের প্রথম বসতি স্থাপন করে। ১৬৯০ সালে চন্দননগরে গৃহায়ণ ও বাণিজ্যকুঠি নিমার্ণের অনুমতি পায় এবং পরে এখানেই তারা ফোর্ট অরলিয়েন্স দূর্গ প্রতিষ্ঠা করে। ১৬৯৩ সালে ফরাসিরা সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বাণিজ্য সুবিধা সম্বলিত একটি ফরমান আদায় করে। তবে এত কিছুর পরও আঠারো শতকের বিশের দশকের আগে বাংলা বাণিজ্যে ফরাসিদের বিশেষ অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। তবে ঐ শতকের ত্রিশের দশকে ডুপ্লের (Joseph Francois Marquis Dupleix, 1697 –1763) নেতৃত্বে ফরাসি কোম্পানি এবং এর কর্মচারিদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে। ডুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসি কোম্পানি বাংলা বাণিজ্যে ইংরেজদের জন্য প্রধান হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য ডুপ্লের বাংলা ত্যাগের মধ্য দিয়ে বাংলা বাণিজ্যে ফরাসিদেরও দুর্দিন শুরু হয়।

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, নবাবী আমলে বাংলার বহির্বাণিজ্যে সক্রিয় প্রধান তিনটি ইউরোপীয় শক্তি ছিল ওলন্দাজ, ইংরেজ এবং ফরাসীরা। ওম প্রকাশ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী আঠারো শতকের প্রারম্ভে ওলন্দাজ কোম্পানি কর্তৃক হল্যান্ডে রপ্তানিকৃত এশীয় পণ্যের শতকরা চল্লিশ ভাগ ছিল বাংলা পণ্য এবং ইংরেজ কোম্পানির ক্ষেত্রে তা ছিল তাদের মোট এশীয় রপ্তানির প্রায় অর্ধেক।[৫১] লক্ষণীয় যে, ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর ব্যবসার ধরন (pattern) ছিল অনেকটা একই রকমের। তথ্য উৎস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোম্পানি কর্মচারিরা এখানকার বাজারের হালচাল যেমন বেশি বুঝতো না, তেমনি স্থানীয় ভাষা না বুঝায় পণ্য সংগ্রহে নানা রকম অসুবিধা হতো। এরূপ বাস্তবতায় রপ্তানি পণ্য সংগ্রহের জন্য (তাদের ভাষায় investment) কোম্পানিসমূহকে এক শ্রেণীর মধ্যস্থ বণিকের উপর নির্ভর করতে

---

[৪৯] Sukumar Bhattacharya, *The East India Company and the economy of Bengal from 1704 to 1740*, Luzac & Co., London, 1954, pp. 221-229; Abdul Karim, *Murshidkuli Khan and His Time*, pp. 166-191

[৫০] মুসা আনসারী, 'ইউরোপীয় বাণিজ্যতন্ত্রের আবর্তে সোনার বাংলা', পৃ. ২২

[৫১] Om Prokash, *op. cit.*, p. 8

Dhaka University Institutional Repository

হতো। বাংলার ইতিহাসে এসব বণিক ব্যবসায়ীরা 'দালাল' নামে পরিচিতি। দালালরা ছিল কোম্পানিগুলোর পণ্য সরবরাহ্ সংগঠণ কাঠামোর মধ্যমণি। বাংলার সমাজ জীবনে এসব দালাল বণিকদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল বলে জানা যায়। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে নবাবী যুগে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসি কোম্পানি কর্তৃক তাদের বাংলার বাণিজ্যকুঠিসমূহে নিযুক্ত বহুসংখ্যক দালাল-বণিকের নাম পাওয়া যায়।[৫২] কোম্পানির নিযুক্ত দালাল বণিকগণ তাদের নিজস্ব গোমস্তা বা এজেন্টের মাধ্যমে কোম্পানির ইউরোপগামী জাহাজের জন্য পণ্য সংগ্রহ করতো। দালালদের সুপারিশ মোতাবেক কোম্পানি এসব পাইকার বা গোমস্তা বণিকদের সাথে পণ্য সরবরাহ চুক্তি সম্পাদন করতো। চুক্তি অনুযায়ী পণ্য সরবরাহের জন্য কোম্পানিকে চুক্তিবদ্ধ বণিকদের পণ্যমূল্যের অর্ধেক টাকা আগাম বা দাদন দিতে হতো। এ জন্য আগাম প্রদানকারী বণিকেরা সাধারণত 'দাদনি বণিক' নামে পরিচিত ছিল।[৫৩] কোম্পানির পণ্য সংগ্রহের এ ব্যবস্থাকে 'দাদনি ব্যবস্থা' বা 'চুক্তি ব্যবস্থা' (contact system) বলা হতো।[৫৪] কালক্রমে দাদনি ব্যবস্থায় পণ্য সংগ্রহে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিলে ১৭৫৩ সালে কোম্পানি এ ব্যবস্থার পরিবর্তে 'এজেন্সি ব্যবস্থা' (agency system) চালু করে। এ নীতি অনুযায়ী কোম্পানি দালাল বা দাদনি বণিকের পরিবর্তে সরাসরি তার নিজস্ব এজেন্টের মাধ্যমে প্রাথমিক উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করতো।

বাংলা থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর রপ্তানি দ্রব্যের তালিকা বেশ দীর্ঘ। তবে প্রধান তিনটি রপ্তানি পণ্য ছিল বস্ত্র, কাঁচা রেশম ও সোরা। বাংলায় উৎপাদিত বস্ত্রের এত বৈচিত্র ও বিবিধ ধরণের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এদের শ্রেণীকরণ রীতিমতো একটি দুরূহ ব্যাপার। সমকালীন নথিপত্রে বাংলায় উৎপাদিত অন্তত ৭৫টি বিভিন্ন নামের কাপড়ের উল্লেখ আছে। তবে কোম্পানিগুলো বাংলা থেকে যে বস্ত্র আমদানি করতো তার মধ্যে সুক্ষ্ম ও মোটা সূতী বস্ত্র, রেশম ও সূতীর মিশ্রবস্ত্র এবং রেশমী বস্ত্র ছিল প্রধান।[৫৫] বারুদ তৈরির একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সোরা (salt-petre)। ইউরোপে এ সোরার বিশেষ চাহিদা থাকায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর রপ্তানি তালিকায় এ পণ্যটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। তবে এ পণ্যটির উপর সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা বিশেষ করে বাংলার অভিজাত বণিক হিসেবে পরিচিত উমিচাঁদ ও তাঁর

---

[৫২] যেসব সূত্রে এসব দালাল বণিকদের নাম পাওয়া যায় তনমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ Om Prokash, *op. cit.*, pp. 103, 105; Sushil Chaudhury, *Trade and Commercial Organization in Bengal*, pp. 62-96, 98; Mazaharul Huq, *The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal (1698-1784)*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1964, p. 161, 180, 184; Sukumar Bhattacharya, *op. cit.*, pp., 180, 202

[৫৩] বিভিন্নসূত্রে নবাবী যুগে বাংলায় কিছু দাদনি বণিকের নাম পাওয়া যায়, এদের মধ্যে দীপচাঁদ বেল্লা, জনার্দন শেঠ, বারানসী শেঠ, রাম কিষেন, হরিনাথ , বৈষ্ণবদাস শেঠ, সুখময়শীল, কিশোর শেঠ, রামভদ্র চৌধুরী, পরমানন্দবসাক, দুর্গারাম দত্ত, শুকদেব মিত্র, কৌতুকরাম ঘোষ, বেজরাম বোস, গোবর্ধন নিমদাশ, উমিচাঁদ, হাফিজুল্লাহ পাইকের, মাহমুদ পাইকের প্রমুখ। Abdul Karim, *Murshidkuli Khan and His Time*, p. 235; Sukumar Bhattacharya, *op. cit.*, p. 202; মুসা আনসারী, *ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, পৃ. ১৩৬

[৫৪] এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে Sushil Chaudhury, 'Merchants, Companies and Rulers: Bengal in the Eighteenth Century' *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol.31, No.1, 1988, pp. 75-86

[৫৫] ইউরোপীয়দের রপ্তানিকৃত বস্ত্রের ধরণ ও রকমারিতা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন সুশীল চৌধুরী তাঁর 'আঠারো শতকে ইউরোপীয় কোম্পানি ও বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে। সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০০-১৯৭১*, ২য় খণ্ড, পৃ.পৃ. ১৯৮-২০২। উপরে বর্ণিত তিনটি পণ্য ছাড়াও ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের রপ্তানি তালিকায় আর যে সব পণ্য ছিল বলে জানা যায় এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- চাল, চিনি, ঘি, সরষের তেল, আফিম, মোম, বোরাক্স, গালা, কড়িও চটের থলি ইত্যাদি।

ভাই দ্বীপচাঁদ এবং পরে খোজা ওয়াজিদ একচেটিয়া (monopoly) অধিকার থাকায় এর রপ্তানিতে ইউরোপীয়দের কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে হতো।

নবাবী যুগে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইউরোপীয় ছাড়াও এশীয় যেমন- আরব, পারসিক, তুর্কি, আফগান, চীনা, জর্জীয় ও আর্মেনিয় বণিকরাও যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা থেকে ইউরোপীয় বণিকরা যেসব পণ্য রপ্তানি করতো এশীয় বণিকদের রপ্তানি তালিকাতেও প্রায় একই রকম পণ্য দেখা যায়। এশীয় বণিকরা বাংলার পণ্য নিয়ে যেতো লোহিত সাগর, আরব সাগর ও পারস্যোপসাগরের উপকূলে জেদ্দা, মোখা, বন্দর আব্বাস, বসরা, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়ার সুমাত্রা, মালয়, ম্যানিলা, চীন এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কেনিয়া ও মোজাম্বিকে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতদিন ঐতিহাসিক মহলে একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, নবাবী যুগে বাংলার বহির্বাণিজ্য বিশেষকরে রপ্তানি বাণিজ্যে ইউরোপীয়দের ভূমিকা ছিল মূখ্য। কিন্তু অধুনা প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণাদি বিচার বিশ্লেষণ করে সুশীল চৌধুরীসহ কেউ কেউ এরূপ ধারণাকে অসার প্রতিপন্ন করেছেন।[৫৬] তাদের দেয় তথ্য থেকে বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যে এশীয় বণিকদের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়।

এ পর্যায়ে বাংলার বহির্বাণিজ্যে তখনকার অভিজাত বণিকদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আঠারো শতকের প্রথমার্ধের শেষ তিন দশকে বাংলার বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর জগৎশেঠ, খোজা ওয়াজিদ ও উমিচাঁদ প্রমুখ প্রধান তিনজন অভিজাত বণিকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের মধ্যে জগৎশেঠ ছিলেন ব্যাঙ্কিং ও মুদ্রা ব্যবস্থার মূল নিয়ন্ত্রক। বহির্বাণিজ্যে সরাসরি হাউজ অব জগৎশেঠের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে টেলর ১৭৪৭ সালে ঢাকা থেকে সূতী বস্ত্র রপ্তানিকারকদের যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে অন্যান্যদের সাথে জগৎশেঠের নাম রয়েছে। সূত্র মতে, জগৎশেঠ ১,৫০,০০০ টাকার বস্ত্র রপ্তানি করেছিলেন।[৫৭] বাংলার শস্য ব্যবসায়ও জগশেঠদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, জগশেঠরা বাংলার জমিদারদের বাকী খাজনার জামিনদার হতেন। এছাড়া জমিদাররা তাদের জমিদারির উন্নয়ন, কৃষি সেচের সুবিধার জন্য বাঁধ নির্মাণ, আবাদ বৃদ্ধির জন্য জঙ্গল কেটে ভূমি উদ্ধার ইত্যাদি কাজে জগশেঠদের কাছ থেকে ঋণ নিতো। অনেক সময় উৎপাদিত শস্য দ্বারা এ ঋণ পরিশোধ করা হতো। ফলে জগশেঠরা অনেকটা বাধ্য বাধকতার কারণেই শস্য ব্যবসার সাথে যুক্ত হতে হয়েছিল।[৫৮]

বাংলার অভ্যন্তরীণ এবং আন্তপ্রাদেশিক বাণিজ্যের মতো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও অভিজাত বণিক খোজা ওয়াজিদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল বলে জানা যায়। প্রথমে তিনি হুগলির অন্যান্য বণিকদের সাথে মিলিতভাবে সমুদ্র বাণিজ্যে অংশ নিলেও পরে এককভাবেই বাণিজ্য পরিচালনা করেন। ওলন্দাজ কোম্পানির রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, ১৭৪৬ সালে

---

৫৬ সুশীল চৌধুরী দেখিয়েছেন আঠারো শতকের মধ্যভাগে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের রপ্তানিকৃত বস্ত্রের মোট মূল্য যেখানে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকার বেশি ছিল না, সেখানে একই পণ্যের এশীয় বণিকদের রপ্তানি মূল্য ছিল ৯০ থেকে ১০০ লক্ষ টাকা। আঠারো শতকের পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে পলাশী যুদ্ধ পর্যন্ত রেশম রপ্তানিতে এশীয়দের যেখানে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার বাণিজ্য হয়েছিল সেখানে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকারও কম। Sushil Chowdhury, *From Prosperity to Decline*, pp. 202—213, 249-258,

৫৭ উদ্ধৃতি; Abdul Karim, *Dacca: The Mughal Capital*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1964, p. 87

৫৮ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২

খোজা ওয়াজিদের প্রথম জাহাজ বিপুল পরিমাণ চাল, চিনি, বস্ত্র ও রেশম হুগলি থেকে বন্দর থেকে সুরাট বন্দরে গিয়েছিল।[৫৯] বিভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, খোজা ওয়াজিদ মোট ৬টি বাণিজ্যতরী এবং প্রায় ২০০০ নৌকার মালিক ছিলেন।[৬০] লবন, সোরা ও আফিম ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে তাঁর নৌকাগুলো জলপথে নিম্নবঙ্গ থেকে পাটনা পর্যন্ত আসা যাওয়া করতো। অন্যদিকে তাঁর জাহাজগুলো বহির্দেশীয় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কলকাতা বন্দরের সমৃদ্ধি এবং এখানে ইউরোপীয় ও এশীয় বণিকদের মুখরিত পদাচারণায় একদা বাংলার বাণিজ্যিক রাজধানী বলে খ্যাত হুগলি বন্দরের বাণিজ্য বিপর্যয় ঘটেছিল। হুগলি বন্দরের এই পড়ন্ত দিনে বলতে গেলে খোজা ওয়াজিদই জাহাজে বিদেশে পণ্য প্রেরণের ঐতিহ্যটি ধরে রেখেছিলেন। হুগলি থেকে তাঁর পণ্যভর্তি জাহাজ সুরাট হয়ে জেদ্দা, বসরা ও মোখাসহ পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের বিভিন্ন বন্দরে বাংলার পণ্য নিয়ে যেতো। ফরাসিদের সাথেই তাঁর লেনে-দেনের পরিমাণ বেশি থাকলেও ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের সাথেও তাঁর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ।

নবাবী যুগের প্রভাশালী অভিজাত বণিক ছিলেন উমিচাঁদ প্রথম দিকে একজন দাদনি বণিক হিসেবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য ইনভেস্টমেন্ট (পণ্য) সংগ্রহ করতেন। পরে কলকাতার দাদনি বণিক বৈষ্ণব শেঠের সাথে কাপড়ের ব্যবসা করে বিপুল ভিত্তের মালিক হন। বিহারের সোরা ও আফিম ব্যবসার উপর তিনি একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার করেছিলেন। ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিকে সোরা সরবরাহ করে উমিচাঁদ প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিলেন।

ইউরোপীয় এবং এশীয় ব্যবসায়ী বা স্থানীয় অভিজাত ব্যবসায়ীরা যে বর্হিবিশ্বে শুধু বাংলা থেকে পণ্য রপ্তানিই করতো না, পরিমাণে কম হলেও বাংলায় তারা পণ্য আমদানিও করতো। বাংলায় আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে ছিল ব্রড ক্লথ (সূতী ও পশমের মিশ্র একধরণের ঝকমকে কাপড়), পশমী বস্ত্র, দস্তা, সীসা, লোহা, তামা পারদ, টিন, কাঁচা তুলা, ফল-মুল, শাঁখা, ঔষধ, কড়ি, বাদাম, গোলপ জল এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিছু মশলা।

৭.১.৪ ঋণ বাজার ও মুদ্রা ব্যবসা

প্রসঙ্গত এ পর্যায়ে বাংলার স্থানীয় ঋণবাজার এবং মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা জরুরি। কেননা শুধু ব্যবসা বাণিজ্য নয় সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তদুপরি ঋণবাজার এবং মুদ্রাকে কেন্দ্র করে বাংলায় একটি আর্থিক ব্যারণ গোষ্ঠীরও আবির্ভাব ঘটেছিল। সমকালীন বাংলার প্রধান বণিক জগৎশেঠ ছিলেন ঋণ ও মুদ্রা ব্যবসায়ী সররাফ-মহাজনদেরও মধ্যমণি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলায় ইউরোপীয় পণ্যের বিশেষ কোনো চাহিদা ছিল না। ফলে আমদানিকৃত পণ্য বিক্রি করে রপ্তানি পণ্যের মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। তাই

---

[৫৯] VOC, 2661, f. 163; Sushil Chowdhury, 'Trading Networks in A Traditional Diaspora-- Armenians in India, C. 1600-1800', p. 13 available at http://gpmsdbaweb.com/memoir2/_supportdocs/armenians%20in%20Bengal.pdf

[৬০] তার মালিকানাধীন জাহাজগুলোর নাম ছিল *Salmat Ressan, Salamat Manzil, Mobarak, Gensamer, Medina Baksh* এবং *Mubarak Manzil.*; Sushil Chowdhury, 'Trading Networks in A Traditional Diaspora', p. 13; রজতকান্ত রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপীয়রা পণ্য সংগ্রহের জন্য সোনা-রূপা আমদানি করতো এবং বাংলায় এ দুটো জিনিসের নিয়মিত চাহিদা ছিল।[৬১] তবে আমদানিকৃত সোনা-রূপা দিয়ে পণ্য সংগ্রহ করাও সহজ ছিল না। কেননা সোনা-রূপা আসতো বিশেষ মওশুমে। এর সাথে স্থানীয় বাজার থেকে পণ্য সংগ্রহ সময়ের মিল থাকতো না। তাছাড়া সোনা-রূপা স্থানীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করাতেও কোম্পানিকে নানা রকম সমস্যা মোকাবিলা করতে হতো। এর ফলে কোম্পানিগুলোকে স্থানীয় পণ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের দীর্ঘস্থায়ী অভাব মোকাবিলা করতে হতো।[৬২] মূলধনের এ সংকটের পটভূমিতে বণিক সংগঠনগুলোকে বাংলার স্থানীয় ঋণ বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহে মনোনিবেশ করতে হয়। উল্লেখ্য যে, এ সময় বাংলার স্থানীয় ঋণবাজার ছিল অত্যন্ত সুসংহত ও সুসংগঠিত। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, বাংলার ক্রমসম্প্রসারণশীল রপ্তানি বাণিজ্য ও দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে টাকা-পয়সা লেন-দেনের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে ওঠা ছিল সময়ের দাবি। কিন্তু নবাব সরকার যুগে আধুনিক অর্থে ব্যাংকিং ব্যবস্থা বলতে যা বুঝায় সরকারি পর্যায়ে তা গড়ে ওঠেনি, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলধন যোগান ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপযোগী ঋণব্যবস্থা ও মুদ্রা ব্যবসাকে কেন্দ্র করে তখন বাংলায় 'সররাফ' নামে পরিচিত একশ্রেণীর বণিক ব্যবসায়ী এবং তাদের ব্যাংকিং হাউজের বিকাশ ঘটে। সমসাময়িক বিভিন্ন তথ্যসূত্রের বিচ্ছিন্ন বর্ণনা থেকে সে সময়কার সররাফ মহাজনদের মধ্যে হিম্মত সিং, লালাজী ব্রিজবুকন, লক্ষ্মণ সিং, মনেশ্বর নাথ, শিবদত্ত ও মিত্রসেন প্রমুখের নাম জানা যায়।[৬৩] বণিক অভিজাত উমিচাঁদেরও ব্যাংকিং ও হুণ্ডি ব্যবসা ছিল বলে সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।[৬৪] আলেকজেন্ডার হিউমের (Alexander Hume) ভাষ্য থেকে আত্মীয় নয়নসুখ নামক একজন সররাফের নাম জানা যায়।[৬৫] তবে মুদ্রা ব্যবসা ও ঋণ বাজারে জগৎশেঠ পরিবারের অবস্থান ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রবার্ট ওর্ম জগৎশেঠকে তদানিন্তন বিশ্বের সবচেয়ে বড় মহাজন ও ব্যাংকার (the gratest shroff and banker in the world) এবং ক্যাপ্টেন ফনউইক (Captain Fenwick) লিখেছেন লন্ডনের ল্যামবার্ড স্ট্রীটের সব ব্যাংকারকে একত্রিত করলেও জগৎশেঠ মতো বড় ব্যাংকার হবে না।[৬৬] লিউক স্ক্রাফটন এবং রবার্ট ক্লাইভের লেখনীতেও জগৎশেঠদের সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে।[৬৭] হাউজ অব জগৎশেঠকে 'বাংলার রথচাইল্ড' এবং এদের কাজকর্মকে এডমন্ড বার্ক (Edmund Burke) যে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' এর সাথে তুলনা করেছেন এ কথা ইতোমধ্যে অন্য একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। জগৎশেঠদের ব্যাংকিং হাউজ শুধু কৃষি ও বাণিজ্যিক

---

[৬১] এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, পলাশী বিপ্লব পর্যন্ত কেবল ইংরেজ কোম্পানিরই বাংলায় আমদানি দ্রব্যের তালিকায় সোনা-রূপার পরিমাণ ছিল শতকরা ৭৪ ভাগ। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪

[৬২] এ আলোচনা সভাতে সমস্যা মোকাবিলায় স্থানীয় বাজার থেকে ঋণ গ্রহণের বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছিল। Bengal Public Consultations, Range I, Vol. 4, 29 May, 1751

[৬৩] Abdul Karim, *Murshidkuli Khan and His Time*, p. 234

[৬৪] Sushil Chowdhury, *The Prlude to Empir*, p. 125

[৬৫] উদ্ধৃতি, সুশীল চৌধুরী, 'ইউরোপীয় কোম্পানি ও বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮০

[৬৬] Quoted in Sushil chaudhury, 'Merchants, Companies and Rulers: Bengal in the Eighteenth Century', p. 91

[৬৭] Sushil chaudhury, 'Merchants, Companies and Rulers:, pp. 91-92

Dhaka University Institutional Repository

ঋণের ব্যবসা করতো না, জনসাধারণের আমানত সংগ্রহ, বিভিন্ন ধরণের টাকার বিনিময় হার নির্ধারণ ও হুণ্ডি ব্যবসাও করতো। এসব ব্যবসা করে জগৎশেঠ পরিবার বিপুল ধন সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। সমকালীন একজন বাঙ্গালি কবির উদ্ধৃতি দিয়ে জে এইচ লিটল (J.H. Little) লিখেছেন, "As Ganges pours its water into the sea by a hundred mouths, so wealth flowed into the treasury of the Seths".[৬৮] জগৎশেঠদের পরে কাশিমবাজারের সররাফগণ এবং কলকাতাবাসী কাটমারদের অবস্থান ছিল বলে জানা যায়।[৬৯]

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, বাংলার স্থানীয় ঋণবাজারে জগৎশেঠ পরিবার ছিল সবচেয়ে বড় ঋণদাতা। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর উত্তমর্ণের তালিকায় প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল হাউজ অব জগৎশেঠ। ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও অস্টেন্ড কোম্পানি সকলেই ঋণ গ্রহিতার তালিকায় ছিল। শেঠদের মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, কাশিমবাজার, হুগলি, ঢাকা ও পাটনা কুঠি থেকে তাদের ঋণ সরবরাহ করা হতো।[৭০] ফরাসি কোম্পানির প্রধান ডুপ্লে জগৎশেঠ ফতেহচাঁদকে 'ইহুদিদেরও অধম' এবং 'আমাদের কসাই' বলে গালমন্দ করলেও ঋণের জন্য তাঁকেও বারবার জগৎশেঠের কুঠিতেই ধর্ণা দিতে হয়েছে। ১৭৫৭ সালে মার্চ মাসে চন্দননগরের পতনের সময়ও হাউজ অব জগৎশেঠে ফরাসিদের ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ টাকা।[৭১] ১৭৫৫-১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ে জগৎশেঠদের কাছে ওলন্দাজ কোম্পানির ঋণের পরিমাণ ছিল ২৩,৮৫,৮০৩ টাকা।[৭২] ইংরেজ কোম্পানির ঋণের বড় যোগানদারও ছিলেন হাউজ অব জগৎশেঠ। ইংরেজ কোম্পানির নথি পত্রেও জগৎশেঠ পরিবারকে তাদের বাণিজ্যিক মুলধনের বড় স্থানীয় উৎস হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।[৭৩] ইংরেজ কোম্পানির একটি নথি থেকে জানা যায় যে, ১৭৪৭-১৭৪৮ সালে সুদের পরিমাণ ছাড়াই কোম্পানির ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৫.৫০ লক্ষ টাকা।[৭৪] তবে এ ঋণের পুরোটাই জগৎশেঠের কুঠি থেকে নেয়া হয়েছিল কী-না, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে অনুমাণ করা যায় যে, এর সিংহভাগই এসেছিল জগৎশেঠের কুঠি থেকে। কেননা এ কুঠি ছাড়া বিপুল অংকের ঋণ প্রদান করার মতো আর্থিক সঙ্গতি অন্য কোনো ব্যাংকিং হাউজের ছিল না। শুধু ইউরোপীয় বণিক কোম্পানি নয়, ব্যক্তিগত বাণিজ্যে নিয়োজিত কোম্পানি কর্মচারী ও স্বাধীন ইউরোপীয় বণিকসহ মধ্য এশিয়া থেকে আগত তুরানি বণিক, জেদ্দা, বসরা, এবং মোখায় বাণিজ্যরত আর্মেনিয় বণিক এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তপ্রাদেশিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বড় বড় বণিক-ব্যবসায়ীগণও জগৎশেঠদের কাছ থেকে গৃহীত ঋণে পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে ব্যবসা-

---

[৬৮] J.H. Little, *The House of Jagatseth*, p. 3

[৬৯] Sushil Chowdhury, 'European Companies and Pre-modern South Asian Commercial System- A Study of Bengal in the Eighteenth Century', *Calcutta Historical Journal, XI: 1-2, 1986-1987*, pp. 136-142

[৭০] জানা যায় যে, শেঠদের এ কুঠিসমূহ তাদের পূর্বপুরুষদের নামে নামকরণ করা হয়েছিল। সূত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, শেঠদের মুর্শিদাবাদ কুঠি মানিকচান্দজী আনন্দচান্দজী, ঢাকার কুঠি শেঠ মানিকচান্দ জগৎশেঠ ফতেচান্দজী, পাটনার কুঠি মানিকচান্দজী দয়াচান্দজী, চুঁচড়া কুঠি ফতেহচান্দজী আনন্দজী নামে পরিচিত ছিল। রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৪

[৭১] Indrani Roy, 'Some Aspects of Frence Presence in Bengal', *Calcutta Historical Journal*, 1:1, 1976, p.91 97; সুশীল চৌধুরী, 'ইউরোপীয় কোম্পানি ও বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮১

[৭২] ঐ, পৃ. ১৮০

[৭৩] J. H. Little, *The House of Jagatseth*, pp. 19-33

[৭৪] Coast and Bay Abstract Vol. 5, f. 117, para 261, 10 January,1748; সুশীল চৌধুরী, 'ইউরোপীয় কোম্পানি ও বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮০

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্য চালাতো। ঋণের ক্ষেত্রে নগদ ও হুণ্ডি উভয়েরই প্রচলন ছিল। জগৎশেঠদের দেয়া হুণ্ডিতে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের লেন-দেন চলতো।[৭৫] বণিকদের বাইরে বাংলার ভূ-অভিজাত জমিদাররাও যে জগৎশেঠের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন, সে কথা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। জগৎশেঠদের প্রদত্ত ঋণ ছিল স্বল্প মেয়াদী, কিন্তু সুদের হার ছিল চড়া। ভূ-স্বামী জমিদারদের দেয় ঋণের সুদের হার ছিল শতকরা ১০টাকা। বাণিজ্য ঋণের সুদের হার ছিল প্রথম দিকে শতকরা ১২ টাকা। তবে ১৭৪০ সালের পর সুদের এ হার হ্রাস করে শতকরা ৯ টাকা ধার্য করা হয়।[৭৬] স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসেবে এ সুদের হার নিঃসন্দেহে অত্যন্ত চড়া ছিল। লিউক স্ক্রাফটন ১৭৫৭ সালে জগৎশেঠদের বার্ষিক আয়ের যে হিসাব দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে, এ বছরে তাদের বার্ষিক আয় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা । এর মধ্যে বাণিজ্যিক ঋণ বাবদ আয় প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা। আর জমিদারদের দেয়া ঋণ থেকে আয় ১৩ লক্ষ টাকারও বেশি।[৭৭] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জগৎশেঠদের মোট বার্ষিক আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসতো ঋণ ব্যবসা থেকে।

দেশের ভূমি রাজস্ব বা ঋণ ব্যবসায় শুধু নয়, মুদ্রা ও টাকশালের উপরও জগৎশেঠদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল। আঠারো শতকে বাংলায় সিক্কা (রৌপ্য মুদ্রা) ছিল বৈধ বিনিময় মাধ্যম।[৭৮] তবে বাংলার বাণিজ্যিক লেন-দেনের উৎকর্ষতার কারণে বাংলার বাজারে সারা ভারতের বহু রকমের মুদ্রা আসতো। সব মিলিয়ে এসময় বাংলায় পায় বত্রিশ রকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়।[৭৯] এরূপ রকমারি মুদ্রা প্রচলিত থাকায় এর বিনিময় ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই জটিলতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া প্রতি বছর নগদে কোটি টাকারও বেশি দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণের ফলে বাজারে প্রায়ই মুদ্রা সংকট দেখা দিতো। এসময় ইউরোপীয় এবং এশীয় ব্যবসায়ীদের আমদানিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য বাংলার আর্থিক জীবনে তাই অপরিহার্য হয়ে ওঠে।[৮০] এ অবস্থায় বাংলার পুঁজি বিকাশের স্বার্থে মুদ্রার সংস্কার অতীব জরুরি ছিল। কিন্তু নবাব মুর্শিদকুলী খান জটিল মুদ্রা ব্যবস্থা সংস্কারের কোন কার্যকর ব্যবস্থা না করে বুলিয়ান ক্রয় ও সরকারি টাকশাল থেকে মুদ্রা তৈরীর একচেটিয়া অধিকার ফতেহচাঁদের উপর ন্যস্ত করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী নবাবগণও এ

---

৭৫ রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৩; উল্লেখ্য যে, ভারতীয় বাজারে ঋণ জোগাড় করতে ও তহবিল স্থানান্তরে হুন্ডির ব্যবহার ছিল সর্বত্র। সররাফরা হুণ্ডি ইস্যু করতেন। জটজলদির বাজারে সাধারণত হুণ্ডিতেই বাণিজ্যিক লেন-দেন চলতো।

৭৬ Sushil chaudhury,'Merchants,Companiesand Rulers:Bengal in the Eighteenth Century',p.93-94

৭৭ Letter from Luke Scrafton to Clive, 17 December 1757 cited in Sushil chaudhury, *The Prlude to Empir*, p. 73

৭৮ এসময় টাকশালে রৌপ্য মুদ্রা ছাড়াও স্বর্ণ ও ধাতব মুদ্রা মুদ্রিত হতো। স্বর্ণ মুদ্রা 'মোহর' নামে পরিচিত ছিল। মোহরের বিনিময় হার ছিল ১:১৬ সিক্কা। মোহর সাধারণ লেন-দেনে ব্যবহৃত হতো না। সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব, উপহার, উপঢৌকন প্রদান ও সায়ের কাজে মোহেরর ব্যবহার হতো। কুচরা ক্রয় বিক্রয়ে ধাতব মুদ্রা 'দাম' এর প্রচলন ছিল। এক সিক্কায় পাওয়া যেতো চল্লিশ দাম। অবশ্য ক্রমান্বয়ে দাম এর ব্যবহার বিলুপ্ত হয় এবং এর স্থান দখল করে 'কড়ি'। এক সিক্কার সাথে কড়ির বিনিময় ছিল ১:৩২ পণ (কুড়িগন্ডায় এক পণ)।

৭৯ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫

৮০ এক পরিসংখান থেকে জানা যায় যে, ১৭০৮-১৭৫৬ সাল পর্যন্ত কেবল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই বাংলায় ৬৪,০৬,০২৩ পাউণ্ড মূল্যমানের সোনা রূপা আমদানি করেছিল। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫। উল্লেখ্য যে পণ্ডিত মহলে একটি প্রচলিত সাধারণ মত ছিল যে, বাংলা বাজারে ইউরোপীয়রাই প্রধান স্বর্ণ-রূপার আমদানিকারক। কিন্তু শিরীণ মুসভি তাঁর এক গবেষণায় এ ব্যাপারে সংশয় ও দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। Shireen Moosvi, 'The Silver influx, Money Supply, Prices and Revenue Extraction in Mughal India', *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. XXX, 1987, pp. 92-94; সাম্প্রতিককালে ইউরোপের বিভিন্ন মহাফেজখানায় প্রাপ্ত নথিপত্র বিচার বিশ্লেষণ করে সুশীল চৌধুরী দেখিয়েছেন যে, ইউরোপীয়দের তুলনায় রপ্তানি বাণিজ্যে তখনো এশীয় বণিকদের প্রাধান্য ছিল। আর এ সুবাধে স্বর্ণ-রৌপ্য আমদানিতেও এদের ভূমিকা বেশী ছিল। সুশীল চৌধুরী, 'ইউরোপীয় কোম্পানি ও বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য', *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১৯৭-১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

নীতি বহাল রাখেন। এর ফলে টাকশাল তথা সমগ্র মুদ্রা ব্যবস্থার উপর বংশানুক্রমিকভাবে জগৎশেঠ ফতেহচাঁদ পরিবারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুদ্রার বিনিময় ব্যবসা নবাব সরকার যুগে একটি লাভজনক ব্যবসা ছিল। বাংলায় বেশ কিছু ব্যাংকিং হাউজ এ ব্যবসা করতো। তবে এক্ষেত্রেও জগৎশেঠদেরই ছিল নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। জানা যায় যে, বাংলা বাজারে প্রচলিত প্রায় বত্রিশ রকমের মুদ্রার বাট্টা বা বিনিময় হার (exchang rate) শেঠ পরিবারের ব্যাংকিং হাউজ থেকে নির্ধারণ করা হতো।[৮১] মুদ্রার পুণটঙ্কন (recoining) জগৎশেঠ পরিবারের আরেকটি একচেটিয়া ব্যবসায়িক অধিকার ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলা বাজারে পুরাতন মুদ্রার চাহিদা এবং মুল্যমান কম ছিল। টাকশাল থেকে মুদ্রিত সিক্কা প্রথম একবছর পূর্ণদামে বাজারে চালু থাকতো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে এর নাম হতো 'সোনাত'। সিক্কা অপেক্ষা সোনাতের মূল্যমান পাঁচ শতাংশ কম ছিল। এ অবস্থায় বাংলার বণিক ব্যবসায়ীদের শতকরা দু'টাকা হারে রাজস্ব দিয়ে টাকশাল থেকে 'সোনাত'কে 'সিক্কায়' রূপান্তরিত করে নেয়ার সুযোগ ছিল।[৮২] ১৭৫৭ সালে প্রাপ্ত জগৎশেঠ পরিবারের বার্ষিক আয়ের তথ্য মোতাবেক নতুন মুদ্রা তৈরি, মুদ্রার পুণটঙ্কন এবং বাট্টার সুদ থেকে আয়ের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকারও বেশি।[৮৩] হুণ্ডি (bill of exchange) ব্যবসাও হাউজ অব জগৎশেঠের একক প্রাধান্য ছিল। নবাবী যুগে বাংলার অর্থ ও বাণিজ্য জগতে হুণ্ডির ব্যাপক প্রচলন ছিল। জমিদাররা রাজধানী মুর্শিদাবাদে ভূমিরাজস্ব প্রেরণ, ইউরোপীয় বণিকরা পণ্য সংগ্রহের জন্য সারা দেশে তাদের বাণিজ্যকুঠিতে আগাম দাদন প্রেরণ এবং সরকারের দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণে সহজ ও নিরাপদে মাধ্যম হিসেবে হুণ্ডির ব্যবহার করতো। সমকালে খাতেও হাউজ অব জগৎশেঠের শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়। আঠারো শতকের পঞ্চাশের দশকে এ প্রতিষ্ঠান এক কোটি টাকার 'দর্শনী হুণ্ডি' কাটার সামর্থ রাখতো। তারা হুণ্ডি গ্রহিতার কাছ থেকে বাট্টা (discount) বাবদ শতকরা ২ থেকে ৮ ভাগ পর্যন্ত মুনাফা নিতো।[৮৪]

উপরের আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, নবাব সরকার যুগে জগৎশেঠ পরিবার দেশের রাজস্ব, ব্যাংকিং, টাকশাল ও মুদ্রা সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে সর্বেসর্বা ছিল। অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে শেঠরা নিজেদের শুধু প্রভাবশালী আর্থিক ব্যারণ হিসাবে নয়, সমকালীন বাংলার প্রশাসন ও রাজনীতিতেও নিজেদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। জানা যায় যে, বাংলার নবাবগণ এবং বিশেষ করে অমাত্য অভিজাত বলে খ্যাত শাসকশ্রেণীর উপরতলার লোকেরা বার্ষিক সুদের বিনিময়ে জগৎশেঠের ব্যাংকিং হাউজে নিজেদের অর্থলগ্নির ব্যবসা করতেন।[৮৫] অন্যান্য ব্যাংকিং হাউজের সাথেও তাদের অনুরূপ অর্থলগ্নি ব্যবসা থেকে থাকতে পারে। তবে সকলেরই প্রধান ঝোঁক ছিল হাউজ অব জগৎশেঠের দিকে। আর শাসকশ্রেণীর এ পুঁজি বিনিয়োগের ফলে জগৎশেঠদের স্বার্থের তাদের স্বার্থ এক বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছিল। এ জন্যই শেঠ পরিবারের

---

[৮১] গোলাম রাব্বানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৬; সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫

[৮২] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৭

[৮৩] Letter from Luke Scrafton to Clive, 17 December 1757 cited in Sushil chaudhury, *The Prlude to Empir.* p. 73

[৮৪] বাট্টার হার হুণ্ডির চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করতো। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে তাদের পণ্য সংগ্রহের সময়, জমিদারদের রাজস্ব আদায়েরসময় হুণ্ডির বিশেষ চাহিদা তাকতো এবং এসময় এর বাট্টার হারও বেশি হতো।

[৮৫] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪

সমৃদ্ধিকে অনেকেই প্রকারান্তরে নিজেদেরই সমৃদ্ধি হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে চেষ্টা করতো। সমকালে ইউরোপীয় বা অন্য কোনো বণিক ব্যবসায়ীদের সাথে বিবাদ-বিসম্বাদে বাংলার শাসকশ্রেণীকে সবসময় জগৎশেঠদের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়।

নবাব দরবারে অপ্রতিরোধ্য প্রভাব এবং শাসকশ্রেণীর বিশেষ অনুকূল্যের কারণেই জগৎশেঠদের টাকশাল নিয়ন্ত্রণসহ ইউরোপীয় বা এশীয়দের আমদানিকৃত বুলিয়ান ক্রয়ে একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। একারণে শত চেষ্টা করেও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো তাদের আমদানিকৃত সোনা-রূপা খোলা বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করতে ব্যর্থ হয়। পর্যালোচনাধীন সময়ে ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসিরা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে নিজস্ব টাকশাল স্থাপন করে মুদ্রা তৈরি করতো। আঠারো শতকের প্রথমদিকে বাংলা বাজারে তাদের টাকশালে অঙ্কিত মুদ্রা চালু থাকলেও নবাব সুজাউদ্দিন খান তা বন্ধ করে দেন। এ অবস্থায় কোম্পানিগুলো ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলায়ও টাকশাল স্থাপন ও মুদ্রা তৈরির অনুমতি লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু শেঠদের বিরোধিতা কারণে তা সম্ভব হয়নি।

নবাবী যুগে বাংলার সাবির্ক অর্থনৈতিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ শেষে এ কথা বলা যায় যে, আঠরো শতকের প্রথম দিকে বাংলা ছিল ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও উন্নত অঞ্চল। অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সব অনকূল পরিবেশ পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকায় পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধি কিংবদন্তির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। কৃষি, শিল্প এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সমকালীন ভারতের অন্য যে কোনো প্রদেশের তুলনায় বাংলার অগ্রগতি ছিল বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। এসময় বিশ্ববাজারে বাংলার কৃষি ও শিল্প পণ্যের বিপুল চাহিদা এবং রপ্তানি বাণিজ্যে ইউরোপীয়দের অংশগ্রহণ বাংলায় রীতিমতো বাণিজ্য বিপ্লব ঘটিয়েছিল। বর্ণিত পরিস্থিতিতে বাংলায় যে বিপুল ধনাগম হয় তাতে দেশের উৎপাদন প্রণালী, উৎপাদন সংগঠন, বিতরণ ও বিপনন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছিল সময়ের দাবি। বলা বাহুল্য যে, চাহিদার সাথে যোগানের সমন্বয় সাধনের জন্য এসময় উৎপাদন কৌশল ও বাণিজ্যিক সংগঠনে কিছুকিছু নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছিল। তবে এসবের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বলে এসব নতুনত্বকে অভিনব বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলা চলে না। তদুপরি এসব পরিবর্তনে স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী বা অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। ভূ-অভিজাতদের কথা বাদ দিলেও আলোচ্য সময়ে ভূমি রাজস্বই অমাত্য অভিজাতদেরও আয়ের প্রধান উৎস ছিল। এজন্য কৃষির প্রতি তাদের অনুরাগ থাকলেও সার্বিক কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির অগ্রগতি সাধনে তাদের কোনো প্রয়াস দেখা যায় না। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত বা সরকারি কারখানায় অল্প মজুরিতে কারিগর নিয়োগ করে নিজেদের রুচি ও চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় বিলাসসামগ্রী উৎপাদনের মধ্যে তাদের শিল্পায়ন তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই শিল্পে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের তাগিদ তারা অনুভব করেননি। সমকালীন ইউরোপে কৃষি ও শিল্পোৎপাদনে বণিক শ্রেণী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাদের প্রচেষ্টায় ইউরোপে অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে। ইউরোপে বণিক সমাজকে প্রগতিশীল উৎপাদন শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। নবাবী যুগে বাংলায় বণিক শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল সত্য, বাণিজ্যিক পুঁজিপতি শ্রেণী হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে তাদের মহাদাপটও দেখা যায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য

যে, এই বণিক-পুঁজিপতি শ্রেণীর বিপুল অর্থ দেশের পুঁজিবাদী উন্নয়নে কোনো অবদান রাখেনি। এ বণিক শ্রেণী ইউরোপীয় বণিকদের মতো উৎপাদন শক্তির প্রতিনিধিত্ব করারও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। বাণিজ্য পুঁজিকে শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত করার কোনো মানসিকতা, প্রস্তুতি বা প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। ফলে বিপুল পুঁজির মালিক হলেও নবাবী বাংলার অভিজাত বণিকরা দেশের সামগ্রিক উৎপাদন প্রণালী, উৎপাদন সংগঠন বা বিপনন ব্যবস্থায় কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি। এ ব্যাপারে অমাত্য অভিজাত বা ভূ-অভিজাতদেরও কোনো ইতিবাচক ভূমিকা দেখা যায় না।

বণিক প্রধান শহরকে নাগরিক অর্থনীতির উৎস বলা হয়। সমকালে ইউরোপে এরূপ অনেক শহর গড়ে ওঠেছিল। কিন্তু আলোচ্য সময়ে বাংলা এরূপ কোনো বণিক শহর গড়ে ওঠেনি। হুগলির বকশ বন্দর, ঢাকার শাহ বন্দর এবং মুর্শিদাবাদের পাচুত্রা বন্দর কে কেন্দ্র করে বড় শহর গড়ে ওঠেছিল বটে, কিন্তু এদের কোনোটিকেই আধুনিক অর্থে বণিক শহরের পর্যায়ে ফেলা কঠিন। নবাব সরকার যুগে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। তবে দুঃখজনক হলো এ মুদ্রা অর্থনীতি এশীয় অচলায়তন ভেঙ্গে বাংলায় পণ্য উৎপাদনে গতি সঞ্চার করতে পারেনি।

নবাব সরকার যুগে বাংলা পণ্যের বিপুল চাহিদাও রপ্তানি পণ্যের মূল্য কাঠামোতে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেনি। জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, মারাঠা আক্রমণ, সরকারি শুল্ক বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পণ্য সংগ্রহে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও তুলানামূলকভাবে বেশি পরিমাণে স্বর্ণ-রৌপ্য আমদানি ইত্যাদি কারণে আঠারো শতকের চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে বাংলায় পণ্য মূল্য বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে একে কোনোক্রমেই ধারাবাহিক ও উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি বলা চলে না। সমকালে ল্যাটিন আমেরিকার রৌপ্য ইউরোপের বাজারে মূল্য বিপ্লব ঘটালেও বাংলার ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। বস্তুত সাময়িক মূল্যবৃদ্ধির কথা বাদ দিলে গোটা নবাবী যুগে বাংলার পণ্য মূল্য ছিল সস্তা এবং ভোগ্য পণ্য ছিল সুলভ। এমনকি নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময় বাংলায় খাদ্যদ্রব্যের সুলভ মূল্য গল্পকথায় পরিণত হয়েছিল। তবে প্রশ্ন হচ্ছে সুলভ ও সস্তা পণ্য মূল্য কী মানুষের জীবনমানের উন্নতির লক্ষণ? অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম কিন্তু তা বলে না। অর্থনৈতিক নিয়মানুযায়ী পণ্যের নিম্নমূল্য মানে উৎপাদকদের নিম্ন আয়, আর নিম্ন আয় মানে নিম্ন জীবনমান। নবাবী বাংলার ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। মন্দা মূল্যের বাজারে উৎপাদক ও সাধারণ মানুষের আয় রোজগার যে খুবই কম ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।[৮৬] অবশ্য কেউ কেউ দাবি করেন যে, সাধারণ মানুষের আয় কম হলেও টাকার ক্রয় ক্ষমতা বেশি থাকায় নিম্ন আয় দ্বারা তাদের জীবন যাপনে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয়নি। এমনকি কোম্পানি আমলের প্রথমদিকের তুলনায় নবাবী আমলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রারমান উন্নত ছিল।[৮৭] সাধারণভাবে মোটা ভাত-মোটা কাপড়ের স্বাচ্ছন্দ সংস্থানকেই যদি স্বচ্ছল জীবনের ছবি হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তবে পূর্বোক্ত মন্তব্যের সাথে সহমত পোষণ করা

---

[৮৬] সমসাময়িক তথ্য উপাত্তের নিরিখে সুশীল চৌধুরী বস্ত্র উৎপাদক তাঁতী শ্রেণীসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রাপ্ত মজুরির যে হার উল্লেখ করেছেন, তাতে নিম্ন আয়ের বিষয়টি প্রমাণীত হয় । সুশীল চৌধুরী, 'সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থাঃ নবাবী আমল', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ.পৃ. ৬০-৬১

[৮৭] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫; সুশীল চৌধুরী, 'সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থাঃ নবাবী আমল', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

যাবে। কিন্তু খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকাকে কোনোভাবেই উন্নত জীবনমানের লক্ষণ হিসেবে ধরে নেয়ার সুযোগ নেই। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন হতে পারে যে, তা হলে নবাবী বাংলার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি যে চিত্র আমরা সমকালীন তথ্য উৎসে পাই, সেগুলো কী অতিরঞ্জন? এর উত্তর অবশ্যই না। তবে একথা সত্য যে, নবাবী বাংলার স্বচ্ছল অর্থনীতির যে ছবি সমকালীন ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বিবরণীতে ফুটে ওঠেছে তা আপামর জনতার জীবনযাত্রার কোনো প্রতিচ্ছবি নয়। তাদের বর্ণনায় যে সমৃদ্ধ ও প্রাগ্রসর অর্থনীতির চিত্র পাওয়া যায় তা মুলত সেদিনকার শাসক অভিজাত, জমিদার ও বণিক শ্রেণীর অর্থনীতি। সুকুমার ভট্টাচার্যের বক্তব্যেও এ কথাটি ফুটে ওঠেছে।[৮৮] অভিজাতদের বাইরে একটি দালাল হিন্দু বণিক-মুৎসুদ্দি শ্রেণীরও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এ যুগে হয়েছিল। তবে উৎপাদন প্রযুক্তি বা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এদের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আঠারো শতকে বিশ্ববাজারে ব্রিটিশ শিল্প পণ্যের ক্রমপ্রসারের ফলে সেখানে শিল্প বিপ্লব ঘটে। কিন্তু বাংলা পণ্য অনুরূপ বিশ্ববাজার পেলেও এখানে কোনো শিল্প বিপ্লব ঘটেনি। বস্তুত ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতি হলেও দেশের অর্থনীতিতে যুগান্তর সৃষ্টি করার মতো সক্ষমতাসম্পন্ন কোনো শক্তিশালী উদ্যোক্তা শ্রেণী আবির্ভাব নবাবী বাংলায় ঘটেনি। এ সময় একটি ক্ষুদ্র বণিক সমাজ গড়ে ওঠেছিল সত্য, তবে তাদের বিকাশ পথে সামন্তবাদী নানা বাধা বিপত্তি ছিল। তাই তাদের পক্ষে ইউরোপীয় বণিক সমাজের মতো অর্থনীতিতে যুগান্তর সৃষ্টির মতো ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়নি।

৭.২ নবাবী যুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও অভিজাতশ্রেণী

একটি দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতির সম্পর্ক সুগভীর। ফলে কোনো দেশের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনায় সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক অধ্যয়ন সঙ্গত কারণেই খুব জরুরি। তবে এ বিষয়ে দ্বিমত করার কোনো অবকাশ নেই যে, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসর ও ব্যাপ্তি সুবিশাল। সমাজ-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে অসংখ্য বিষয় বিবেচ্য। সমাজ-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে শুধু ব্যক্তি চরিত্র চিত্রণেই আসে শাসকশ্রেণী থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ, তাদের আচরিত জীবনধারা এবং সামাজিক রীতি-রেওয়াজ। এর বাইরে বিবেচনাধীন সময়ের সাহিত্য, সঙ্গীত, চারু ও কারুশিল্প এসবই সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত। আর এসব বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র ও সুপরিসর গবেষণা এবং আলোচনা পর্যালোচনার বিস্তর সুযোগ রয়েছে। তবে আলোচ্য গবেষণায় এরূপ সুবিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনার অবকাশ নেই এবং তা খুব প্রাসঙ্গিকও নয়। কাজেই পর্যালোচনাধীন গবেষণার বিষয়বস্তু বা অভিষ্ট লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে সংক্ষেপে নবাবী বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি এবং এতে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা বিচার বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস চালানো হলো।

৭.২.১ অভিজাত শ্রেণীর জীবনাচার

নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর জীবন ধারা এবং তাদের সামাজিক অচার অভ্যাস সম্পর্কিত পর্যা‍ে পৃথকভাবে পর্যালোচনাধীন সময়ের অভিজাতদের সকলের জীবনাচার আলোচনার সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে সামাজিক ইতিহাস

---

[৮৮] Sukumar Bhattacharya, *op. cit.*, p. 13

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনায় ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের অনুসৃত নমুনাভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করাই হবে যথাযথ। কেননা এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিকাশপ্রবণতার মূলধারাটি সনাক্ত করা সম্ভব হবে। আর মূলধারার যথার্থ পর্যালোচনা করা সম্ভব হলে এর অন্তর্নিহিত উপধারাগুলো সহজেই উন্মোচিত হয়ে পড়বে। এজন্যই নবাবী বাংলার আভিজাত্যের জীবনাচার ও সামাজিক আচার অভ্যাস পর্যালোচনায় তাদের পৃথকভাবে উপস্থাপন করে আলোচনার পরিসর বৃদ্ধি না করে মুর্শিদাবাদ দরবারের নবাব ও নবাব পরিবারের সদস্যদের জীবনাচার তুলে ধরাই যথেষ্ট। কেননা এটা সর্বজনবিদিত যে, জীবনধারা ও আচার-অভ্যাসে সে সময়কার অভিজাত শ্রেণী মুর্শিদাবাদ দরবারের অন্ধ অনুকরণ করতো। কাজেই দরবারের জীবনাচার ও অভ্যাসের চিত্রের মধ্যেই অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক জীবন ও আচার অভ্যাসের খোঁজ পাওয়া যাবে।

সমসাময়িক তথ্য-উৎসে বাংলার নবাবদের আড়ম্বরপূর্ণ, অত্যান্ত বিলাসী ও জমকালো জীবনযাপনের চিত্র পাওয়া যায়।[৮৯] এক্ষেত্রে তারা মুঘল সম্রাটদের দরবারী জীবনের অনুসরণ করতেন বলে প্রতীয়মান হয়। নবাবগণ তাদের আয়ের একটি বিশাল অংশ আড়ম্বর এবং বিলাসিতার পেছনে ব্যয় করতেন। নবাবগণ কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন যেগুলো ছিল একান্তই তাদের জন্য। এর বাইরে তাদের জীবনযাপন প্রণালী অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা অনুসরণ করতো। বাংলার নবাবগণ রাজধানী মুর্শিদাবাদে সুরম্য ও আড়ম্বরপূর্ণ রাজপ্রাসাদে বাস করতেন। এসব প্রসাদের মধ্যে মুর্শিদকুলি খানের নির্মিত 'চেহেল সাতুন' প্রাসাদ, নাওয়াজিশ মুহাম্মদ খানের মোতিঝিল প্রাসাদ, সিরাজ-উদ-দৌলার হিরাঝিল ও মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ ছিল উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া নবাব আলিবর্দী খান নির্মিত খোশবাগ, সুজাউদ্দিন খানের ফার্হবাগ (সুখ কানন) ও রোশনিবাগ নবাবদের উন্নত রুচিবোধ এবং আড়ম্বড়েরর উজ্জ্বল নিদর্শন। বাংলার নবাবগণ জমকালো দরবারে বসে রাজ্যের শাসন কাজ পরিচালনা করতেন। নিজ নিজ প্রাসাদে নবাবদের দরবার অনুষ্ঠিত হতো। দরবারের আনুষ্ঠানিকতা ও দরবার প্রশাসন সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য নানা পদ-পদবির কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হতো।[৯০] প্রত্যেক নবাবেরই হারেম ছিল। হারেম পরিচর্যার দায়িত্ব ছিল খোজাদের উপর। নবাবের স্ত্রী এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল মহিলাগণ হারেমে বাস করতেন।[৯১] হারেমে বিপুল সংখ্যক নারী থাকলেও এর পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব থাকতো নবাবের প্রধান বেগমের উপর। তাঁর নির্দেশে হারেমের কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করতেন। নবাবদের রাজকীয় আড়ম্বরের বিশেষ চিহ্ন ছিল 'তিরাজ'। ফারসি তিরাজ শব্দের অর্থ সুন্দর

---

[৮৯] এ ক্ষেত্রে মুর্শিদকুলি খান এবং আলিবর্দী খান ছিলেন কিছুটা ব্যতিক্রম। সমসাময়িক তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, মুর্শিদকুলি খান ও আলিবর্দী খান উভয়ই অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তাঁরা উভয়েই অনাড়ম্বর ও পবিত্র জীবন যাপন করতেন। তাদের একজন করেই স্ত্রী ছিল এবং তাঁরা নিজ নিজ স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

[৯০] এসব কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল 'আমীর হাজিব', 'নকীব', 'আরজবেগ', 'দিউয়ান', 'বখশি', 'দারোগা-ই-খাসবরদার, 'শিলাদার', হস্তিরক্ষক 'শাহান-ই-ফিল', অশ্বরক্ষক 'মীর আখুর', 'দারোগা-ই-ফরাসখানা' এবং 'বাকাউল' ইত্যাদি। কে এম করিম, ' নবাবী আমলের সমাজ কাঠামো' *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৪৭*, দ্বিতীয় খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাঃ), বাংলা সংস্করণ, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩, পৃ. ২০৭

[৯১] হারেম সম্পর্কে সমসাময়িক রচনাসমূহে নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। *তারিখ-ই-বাঙ্গালার* বিবরণ অনুযায়ী সরফরাজ খানের হারেমে এক হাজার পাঁচশত নারী ছিল। মোজাফফর নামার বর্ণণা মতে, সিরাজ-উদ-দৌলার হারেমে নারীরর সংখ্যাা ছিল পাঁচশত। এসব বর্ণনায় নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জন আছে। তবে এসব বর্ণনা থেকে তৎকালীন নবাবদের বিলাসী জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচি-কর্ম। বস্তুত নবাবদের পরিধেয় রাজকীয় পোষাক লম্বা ঢিলা বহির্বাস স্বর্ণ-রৌপ্যের মনোরম কারকার্যখচিত ও সুন্দর সুচি-কর্ম সজ্জিত থাকতো বলে একে তিরাজ বলা হতো।[৯২]

বাংলার নবাবগণ আড়ম্বড়পূর্ণ বিলাসী জীবন যাপন করতেন। তারা মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঈদ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, শব-ই-বরাত, মুহরম ও পূণ্যাহসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব পালন করতেন। নবাব ও নবাব পরিবারের সদস্যগণ অমুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন ও তাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানেও যোগ দিতেন বলে জানা যায়। নবাবগণ কর্তৃক 'হোলি', 'বসন্ত পঞ্চমী' ও জলদেবতার স্মরণে 'বেরা' উৎসব পালনের কথা সমসাময়িক সূত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে।[৯৩] তাছাড়া নবাব পরিবারের সদস্যদের বিয়ে উপলক্ষে অত্যন্ত জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী* গ্রন্থে সরফরাজ খানের পুত্র শুকুরউল্লাহর সাথে সাঈদ আহমদ খানের কন্যার বিয়ের 'সাচক' বা গায়ে হলুদ এবং *সিয়ার-উল-মুতায়াখ্খিরিণ* গ্রন্থে সিরাজ-উদ-দৌলা এবং তাঁর ভাই ইকরাম-উদ-দৌলার বিয়ে উপলক্ষে আয়োজিত জমকালো অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ রয়েছে।[৯৪] সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিয়ের জাঁকজমক সম্পর্কে করম আলী খানও বর্ণনা দিয়েছেন।[৯৫] উপরে বর্ণিত ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবাদির বাইরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় 'নবারা' বা রাষ্ট্রীয় নৌ উৎসব নামে একটি বিশেষ উৎসব পালনের তথ্য জানা যায়। বর্ষাকালে রাজধানী মুর্শিদাবাদের গঙ্গা নদীতে এ উৎসব পালন করা হতো। রাষ্ট্রীয় নৌ বহরের বিভিন্ন ধরনের নৌকা সমবেত করে নদীবক্ষে দরবারও বসানো হতো।

বাংলার নবাবগণ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আড়ম্বরপূর্ণ জমকালো জীবনযাপন, জাঁকজমকপূর্ণ দরবার, মহাসমারোহে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবাদি উদ্‌যাপন ইত্যাদির সবিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা তাদের জীবনযাত্রায় রাজকীয় চাল-চলন বজায় রেখে চলাকে পছন্দ করতো। নবাব ও নবাব পরিবারের অনুকরণে জমকালো ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপনের মাধ্যমে সমাজ জীবনে তাদের বিশিষ্ট অবস্থান ও স্বাতন্ত্রের বিষয়টি জানান দেয়ার প্রবণতা সম্ভবত তাদের মধ্যে কাজ করতো। আড়ম্বরপূর্ণ, জমকালো জীবনাচারের ক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণী ও নবাবদের মধ্যে ফারাক ছিল কেবল মাত্রাগত। সমসাময়িক বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, নবাবী যুগে নবাব এবং অভিজাত শ্রেণী যে ধারার জীবনযাপন করতো তারা সাথে দিল্লী-আগ্রার মুঘল-রাজপুত জীবন চর্চার অনেকখানি মিল ছিল। এ জীবনধারা ছিল অনেকখানি আন্তর্জাতিক শহরমুখী চকচকে ও আড়ম্বড়ময়। এর ঝোঁকটি ছিল বহিরাগত পারস্য সংস্কৃতির দিকে। এরকম জীবনাচার শুধু মুসলিম অভিজাত আমির-ওমারদেরই ছিল না, হিন্দু ভূ-স্বামী রাজা জমিদাররাও এরকম জীবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিলেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা দুর্লভরাম, রাজা রাজবল্লভ, রাজা রামনারায়ণ, সীতাব রায় প্রমুখের জীবনযাত্রা থেকে উপরের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এসব অভিজাতরা নবাবদের অনুকরণে মূল্যবান কারুকার্যখচিত পোষক পরিধান এবং প্রাসাদোপম জাঁকালো ভবনে বাস করতেন। বণিক অভিজাত জগৎশেঠদের

[৯২] এ কে এম আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস*, পুনমুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ.১২৫

[৯৩] এ কে এম আবদুল আলীম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৪৪

[৯৪] ইউসুফ আলী খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬; সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ*, বাংলা অনুবাদ, পৃ.পৃ. ২৪৩-২৪৪

[৯৫] করম আলী খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

মহিমাপুর প্রাসাদ সেকালে বাংলার স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম নিদর্শন। মীর জাফর বাংলার নবাব হওয়ার পূর্বেই তাঁর বিখ্যাত জাফরগঞ্জ প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন।[৯৬] শুধু প্রাসাদ নির্মাণ নয় এর পরিচালনা ও রক্ষাণাবেক্ষণের জন্যও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ নবাবের অনুকরণে কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিপালন করতেন। ভূ-অভিজাত জমিদাররা নবাবের অনুকরণে রীতিমতো দরবার পরিচালনা করতেন। নবাব সরকারের মতো তাদেরও নিজস্ব প্রশাসন কাঠামো ছিল এবং এতে বহুতর পদ-পদবিধারী কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মরত ছিলেন। রাজা-জমিদারদের দরবারে নিজস্ব গায়ক, নতর্কী এবং পণ্ডিত-কবিদের উপস্থিতির তথ্যও জানা যায়। নবাবের অনুকরণে তাদেরও হারেম থাকতো। এসব হারেমে তাদের স্ত্রী ও নির্ভরশীল মহিলারা বাস করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিম অভিজাত জীবনের অনুকরণে হিন্দু অভিজাত অমাত্য ও রাজা জমিদারদের মধ্যেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের চল হয়েছিল। রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা দুর্লভরাম প্রমুখ অভিজাত ব্যক্তিবর্গের সকলেরই একাধিক স্ত্রী ছিল।[৯৭]

নবাবী যুগে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও জাঁক-জমকের সাথে ধর্মীয়-সামজিক ও পারিবারিক উৎসব আয়োজন করতেন। জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান, সাঈদ আহমদ খান ও সিরাজ-উদ-দৌলাহ হোলি উৎসব উদযাপন করতেন।[৯৮] মুসলমান অভিজাতগণ যেমন হিন্দুদের উৎসব আয়োজন করতেন এবং হিন্দুদের আয়োজিত উৎসবাদিতে যোগ দিতেন, তেমনি হিন্দু অভিজাতরাও মুসলমানদের উৎসবাদিতে যোগ দিতেন। রাজধানীর মহরম উৎসবে হিন্দুদের যোগদানের তথ্য জানা যায়। এমনকি অনেক হিন্দু জমিদার মহরম উৎসব আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন বলেও সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। বিষ্ণুপুরের মল্ল জমিদাররা সবচেয়ে ভাল তাজিয়াকে পুরস্কৃত করতেন। এসব ঘটনা নবাবী যুগের বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সমন্বয়েরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৭.২.২ বিনোদন: যাত্রাপালা ও নৃত্য-গীত

ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে নির্ধারিত আচার অনুষ্ঠানের বাইরে চিত্তবিনোদনের জন্য যাত্রপালা ও সঙ্গীতের আসরসহ নানা আয়োজন ছিল সামাজিক রীতিরই অঙ্গ। সৈয়দ জামিল আহমেদ লিখেছেন, আঠারো শতকে বেশ কিছু ধর্ম সম্প্রদায় ও উপাসক শ্রেণী তাদের কথানাট্যের বর্ণনামূলক ঐতিহ্য থেকে যাত্রা রীতির বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়। যেমন শাক্তগণ 'শক্তিযাত্রার' এবং নাথগণ 'নাথযাত্রার' উদ্ভব ঘটায়। তাছাড়া পাল রাজাদের জনপ্রিয় কাহিনী নিয়ে রচিত হয় 'পালযাত্রার'।[৯৯] মন্দির প্রাঙ্গন, সরকারি উৎসব ময়দান এবং অভিজাতব্যক্তিবর্গের বাড়ীর উঠোনে সাধারণত যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হতো। এসব যাত্রাপালার প্রদর্শনীতে বিপুল সংখ্যক সাধারণ দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি ঘটতো। যাত্রাপালায় নাচ ও গান ছিল এক বিশেষ আকর্ষণীয় উপাদান। কিছু জনপ্রিয় গীতের সাথে ধ্রুপদী সঙ্গীতের চর্চাকে মানসম্মত ধরা হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আঠারো শতকী যাত্রাপালা সর্বাধিকভাবে প্রসারলাভ করেছিল বিষ্ণুপুর,

---

[৯৬] নবাব হওয়ার পর মীর জাফর সিরাজ-উদ-দৌলাহর মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে বসবাস শুরু করেন এবং জাফরগঞ্জ প্রাসাদটি তখন তাঁর পুত্র মীরণকে দিয়ে দেন। এই প্রাসাদেই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহকে হত্যা করা হয়। এজন্য লোকে বর্তমানে ঘৃণাভরে একে 'নিমক হারাম দেউড়ি' বলে আখ্যায়িত করেন।

[৯৭] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা*, পৃ. ১৩০

[৯৮] করম আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩

[৯৯] সৈয়দ জামিল আহমেদ, 'নাটক ও নাট্যকলা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪, ১৯৭১*, ৩য় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.৪৫৬

Dhaka University Institutional Repository

বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া এবং যশোর অঞ্চলে। সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূ-অভিজাত জমিদারগণ এ শিল্পের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল পর্যালোচনাধীন সময়ে বাঙ্গালির সামাজিক জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলার নবাবদের মধ্যে মুর্শিদকুলি খান ও আলিবর্দী খান ছাড়া অন্য সকলেই সঙ্গীত ও নৃত্যের সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অবশ্য সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ির বর্ণনামতে, নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রতি নবাব আলিবর্দী খানের বিশেষ আকর্ষণ না থাকলেও এসব বিষয়ে পারদর্শিদের তিনি যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন।[১০০] শুধু নবাবগণই নয়, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অভিজাতদের মধ্যেও নৃত্য-গীত উপভোগের রীতি প্রচলিত ছিল। অভিজাতদের অনেকেই ব্যক্তিগত গায়িকা ও নর্তকী রাখতেন। সমসাময়িক তথ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের অনেক সুন্দরী গায়িকা ও নর্তকী ছিল। এদের মধ্যে তিনি ভাগবাঈ নামক একজন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ঘসেটি বেগমের পরেই হারেমে এই মহিলার স্থান ছিল। নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের দত্তক পুত্র ইকরাম-উদ-দৌলাহরও যে ব্যক্তিগত নতর্কী দল ছিল সে কথাও সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ির বর্ণনা থেকে জানা যায়।[১০১] নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহরও বহু সংখ্যক গায়িকা ও নতর্কী ছিল বলে জানা যায়। এদের মধ্যে 'ফৈজুবাঈ' এবং 'আলেয়া বেগমের' কথা *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ* গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদক হাজী মুস্তাফা উল্লেখ করেছেন।[১০২] ভূ-স্বামী জমিদারদেরও ব্যক্তিগত গায়িকা ও নতর্কী ছিল বলে জানা যায়। শুধু আমোদ-আহলাদের জন্য ব্যক্তিগত গায়িকা বা নতর্কী রাখা নয়, অভিজাতদের অনেকেই সঙ্গীত বা নৃত্যকলার পৃষ্ঠপোষকতা দানের মাধ্যমে সংস্কৃতির এ বিশেষ মাধ্যমটিকে সমৃদ্ধকরণেও ভূমিকা রেখেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পণ্ডিত মহলে এ বিষয়ে বিশেষ কোনো দ্বিমত নেই যে, উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার সঙ্গীত-সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল আঠারো শতকে।[১০৩] বস্তুত আঠারো শতকের প্রথম দিকে মুঘল সাম্রাজের অবক্ষয় ও দুর্দিন শুরু হলে মুঘল দরবার, রাজপুরুষ ও দরাবার ঘনিষ্ঠ অভিজাত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আশ্রিত সঙ্গীতজ্ঞরা পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত হয়ে ভাগ্যান্বেষণে ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। ক্রমে তাদের অনেকেই বাংলায় আসেন এবং মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, চুচঁড়া, বর্ধমান ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে রাজপুরুষ ও অভিজাত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সঙ্গীত কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় নেন। এক্ষেত্রে নদীয়ার জমিদার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০-১৭৮২ খ্রি.) সঙ্গীতসভায় কলাবতদের সবচেয়ে বেশি সমাবেশের সুখ্যাতি শুনতে পাওয়া যায়। কবি ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর (১৭১২-১৭৬০ খ্রি.) এর *অন্নদামঙ্গল কাব্যে*'র

---

১০০ সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৬

১০১ নওয়াজেশ মোহাম্মদ খানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর আত্মীয় এমনকি অভিজাতগণও ভাগবাঈয়ের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করতেন। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৩৭৪- ৩৭৫

১০২ সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি *পূর্বোক্ত*, ইংরেজী অনুবাদ হাজী মোস্তফা, ২য় খণ্ড, পাদটীকা, পৃ.পৃ. ৯৪, ১৮৭ । প্রথমোক্ত ফৈজুবাঈ ছিলেন নিখুত দেহ শৈষ্ঠবের অধিকারী ভারতীয় সুন্দরী। তিনি এতই সুক্ষদেহী ছিলেন যে তার ওজন ছিল মাত্র ২২ সের। সিরাজ তাকে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে দিল্লী থেকে মুর্শিদাবাদে এনেছিলেন। আলেয়া বেগম ছিলেন দিউয়ান মোহনালালের বোন। কাশ্মিরি এ মহিলাও ছিলেন ভারতীয় সোন্দর্যের এক অনন্য প্রতীক।

১০৩ করুণাময় গোস্বামী, 'সঙ্গীত', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪, ১৯৭১*, ৩য় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫১০

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনায় কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারের উচ্চসাঙ্গীতিক পরিবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। ওস্তাদ বিসরাম খাঁ ছিলেন এ সময়কার একজন বিখ্যাত সঙ্গীত সাধক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজে এ ওস্তাদের কাছে হিন্দুস্তানী ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত শিখতেন বলে জানা যায়। নদীয়ারাজ ছাড়াও এসময় বর্ধমানের জমিদারবর্গ এবং বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা সঙ্গীত ও নৃত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

আঠারো শতকের সঙ্গীত সংস্কৃতি উন্নয়ন ও বিকাশে দু'জন বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন কবি ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর এবং রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১ খ্রি.)। এ দুজনই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ভারতচন্দ্র নানাভাবে বাংলা গানের ভবিষ্যত গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করেন। রাগসঙ্গীতের উপর তাঁর বিশেষ দখল ছিল বলে জানা যায়। বাংলা সঙ্গীতের খ্যাতিমান গবেষক করুণাময় গোস্বামী লিখেছেন:

> দেবী মহিমা প্রচারমূলক আখ্যানসঙ্গীত মঙ্গলকাব্যের ধারায় অবতীর্ণ হলেও তাঁর রচনায় ক্রমেই সেই দৈবিকতার আবরণ ফিকে হয়ে আসে এবং তা মানবিক সঙ্গীতে পরিণত হবার প্রয়াস পায়। আখ্যানগীতির কাঠামোয় থেকেও যেভাবে তিনি খণ্ডগীতি রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন তাও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দরের* আদি রসোচ্ছাস পরবর্তীকালে যাত্রা, ঢপযাত্রা, কবিগানসহ নানা ধরনের গানে অনুসৃত হয়। কীর্তনসঙ্গীতের পরিমণ্ডলের বাইরে রাগাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান রচনায়ও তিনি পথিকৃথের ভূমিকা পালন করেন।[১০৪]

শাক্তপদ রচনার প্রাথমিক সাফল্যেও ভারতচন্দ্রের। আর এ জন্যই তাঁকে রামপ্রসাদ সেন এবং রামনিধিগুপ্তের (১৭২০-১৭৮১ খ্রি.) পূর্বসূরি বলা হয়। রামপ্রসাদ সেন ছিলেন একাধারে শক্তিসাধক, কবি ও গায়ক। শাক্ত বা শ্যামাসঙ্গীতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। প্রথমজীবনে তিনি কলকাতায় মহুরির চাকুরি করতেন। পরে তিনি নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। তাঁর অসামান্য কাব্য প্রতিভার জন্য তিনি নদীয়ারাজ কর্তৃক 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ করেন। বৈষ্ণব কবিতার অধোগতি এবং শাক্ত সাধনার উন্মেষ কালপর্বে এর বিক্ষিপ্ত ধারাগুলো রামপ্রসাদের সাধনায় ও গানে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বলে শ্রীকুমার বন্দোপধ্যায়ের অভিমত।[১০৫] রামপ্রসাদ প্রবর্তিত শাক্তসঙ্গীতের ধারা পরবর্তীকালে বাংলা সঙ্গীতজগতে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১ খ্রি.) থেকে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.) পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালি সঙ্গীতকার অগণিত শাক্তপদ রচনা করে সঙ্গীতের এই ধারাটিকে পরিপুষ্ট করে তোলেন। বাংলার সঙ্গীত জগতে রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধি যুগোত্তীর্ণ হয়েছে। তার রচিত গান 'রামপ্রসাদী সঙ্গীত' এবং তাঁর গীতি-ভঙ্গী 'রামপ্রসাদী সুর' নামে আজও বাংলা সঙ্গীত ভুবনে পরিচিত হয়ে আছে।

আলোচ্য সময়ে বাংলায় উত্তর ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতেরও বিশেষ কদর ছিল। হিন্দুস্তানী ধ্রুপদ ও খেয়াল সঙ্গীতে সাথে এসময় বাংলার এক রকমের আত্মিক বন্ধন তৈরি হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুর ঘরণার উদ্ভব আঠারো শতকের বিশেষ অবদান। জানা যায় যে, সঙ্গীত সম্রাট তানসেন পরিবারের একজন গায়ক মল্ল জমিদারদের রাজধানী বিষ্ণুপুর এসে সেখানকার জমিদার পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিষ্ণুপুর ঘরণার সৃষ্টি করেন। এ বিষ্ণুপুর ঘরণার মধ্য দিয়ে হিন্দুস্থানী ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের সাথে বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য যে,

---

[১০৪] করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১১

[১০৫] শ্রীকুমার বন্দোপধ্যায়, *সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে*, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

নবাবী যুগে বাংলায় বিষ্ণুপুর ঘরণার শিল্পীদের মধ্যে গদাধর চক্রবর্তী, মাধব ভট্টাচার্য, কৃষ্ণমোহন গোস্বামী, নিতাই নাজীব ও বৃন্দাবন নাজীব ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিল্পী রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের অনুশীলন ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বিষ্ণুপর ঘরণার সাঙ্গীতিক খ্যাতি বিশেষভাবে বর্ধিত হয়।[১০৬]

বাংলার অভিজাতদের মধ্যে নৃত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগের কথা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্টেভোরিনাস সে সময়কার বাংলায় পেশাদার নৃত্য শিল্পীদের কথা উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে এরা নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে দর্শকদের আনন্দ দিতো বলে সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।[১০৭] সমাজে মহিলা নৃত্য শিল্পীদের বিশেষ কদর থাকলেও পুরুষদের নৃত্যকে নিন্দার চোখে দেখা হতো বলে সমকালীন ফারসি ইতিহাস গ্রন্থ *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণে* উল্লেখ রয়েছে। তবে তাই বলে যে পুরুষ নৃত্য শিল্পী ছিলেন না, তা নয়। নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে শের মুহাম্মদ নামক একজন পুরুষ নৃত্য শিক্ষকের কথা জানা যায়। তিনি উত্তর ভারতীয় কথক নৃত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নৃত্যের এ বিশেষ ধারাটিই শেখাতেন।[১০৮]

৭.২.৩ শিক্ষা ব্যবস্থা ও অভিজাত শ্রেণী

সমকালীন ঐতিহাসিক সূত্রসমূহের ভাষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নবাবী যুগে বাংলায় কোনো সুসংহত উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল মূলত ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগে। নবাব, অভিজাতবর্গ, বিশেষকরে ভূ-স্বামী রাজা-জমিদাররা ছিলেন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ* ও *রিয়াজ-উস- সালাতিনের* বর্ণনায় নবাব মুর্শিদকুলি খান, নবাব সুজাউদ্দিন খান ও নবাব আলিবর্দী খানকে বিদ্যানুরাগী ও বিদ্বান, ধর্মজ্ঞ এবং পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নবাব আলিবর্দী খানের আমলে যে সব মহান বিদগ্ধ জ্ঞান তাপস পণ্ডিত জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন এবং যারা নবাবের বদ্যনতা বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন সিয়ারে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।[১০৯] প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে এসব মহান পণ্ডিত এবং তাদের কীর্তি সম্পর্কে আলোচ্য অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়নে অভিজাতবর্গ বিশেষ করে ভূ-অভিজাতদের ভূমিকা বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমকালে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সম্পদশালী অভিজাতবর্গ। তাদের উৎসাহ ও উদ্যোগে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল। শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নে সমকালীন অভিজাতদের মধ্যে যাদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবি রাখে তাদের মধ্যে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র ও রাজা তিলকচন্দ্র, বীরভূমের জমিদার আসাদ-উজ-জামান ও বদি-উজ-জামান, বিষ্ণুপুরের মল্ল জমিদার গোপাল সিংহ ও

---

[১০৬] অতুল সুর, *আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১২০

[১০৭] Stavorinous, *Voyage to the East Indies,* Vol. I, Eng. Trans. Wiilcock, London, 1973, p. 438 প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদের সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল 'মুজরা' বা নৃত্য-গীত অনুষ্ঠান। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য অভিজাত লোকেরার তাদের বাড়ীতে বিভিন্ন উৎসব আয়োজন উপলক্ষে মুজরা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন। এস এম রেজা আলী খান, *মুর্শিদাবাদ ও বাঙলার নায়েব নাজিম*, পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৯৯

[১০৮] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা*, পৃ. ১৩৬

[১০৯] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৪১২-৪২৫

চৈতন্য সিংহ, নাটোরের জমিদার রামকান্ত দেব ও তাঁর স্ত্রী রাণী ভবাণী, এবং বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ ছিলেন অন্যতম। এ সকল ভূ-অভিজাতগণ তাদের জমিদারি আয়ের একটি অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষক, ছাত্র, বিদ্বান ও পণ্ডিতদের পরিপোষণের জন্য ব্যয় করতেন।[১১০] এ প্রসঙ্গে আলিবর্দী খানের জামাতা পুর্ণিয়ার শাসনকর্তা সাঈদ আহমদ খান সওলত জঙের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। শিক্ষা-দীক্ষার বিস্তার ও জ্ঞানী-গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা দানে তাঁরও বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে সমসাময়িক ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।[১১১] শিক্ষানুরাগ ও শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অগ্রণী ভূমিকা সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে কোনে দ্বিমত নেই। কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় শাস্ত্র অনুশীলন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় সমকালে নদীয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আর এই প্রসিদ্ধির জন্যই নদীয়াকে বাংলার 'অক্সফোর্ড' বলে অভিহিত করা হতো।[১১২] এ সময় চতুস্পাঠীসমূহেরও শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল নদীয়া।

৭.২.৩ ক. শিক্ষার বিভিন্ন ধারা

উল্লেখ্য যে, নবাবী যুগে বাংলায় সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম ছিল পাঠশালা ও তোলাবখানা। এ দুটি ধারাই ছিল মিশ্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পাঠশাল এবং তোলাবখানার দ্বার হিন্দু মুসলিম উভয় শ্রেণীর বালক বালিকাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। শতকরা আশি ভাগ বা তারও বেশি বাঙ্গালি সন্তানের লেখাপড়ার পাঠ পাঠশালা বা তোলাবখানায় শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই সমাপ্ত হতো। পাঠশালা ও তোলাবখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মূলেও যে অভিজাত ব্যক্তিবর্গের বদান্যতা ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টি যুক্ত ছিল তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, সাধারণত পাঠশালাসমূহ পরিচালিত হতো জমিদারদের চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির বা সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিদের গৃহে। পাঠশালায় সাধারণত কোনো পাঠ্য বই ছিল না। এখানে গুরু মশাইয়ের তত্ত্বাবধানে ছেলে-মেয়েদের বর্ণ পরিচয়, সামান্য লেখা এবং দৈনন্দিন জীবনের জন্য উপযোগী অঙ্ক শেখানো হতো। তোলাবখানায় ছাত্রদের আরবি ফারসি ও বাংলা শেখানো হতো বলে শমসের গাজীর পুঁথিতে উল্লেখ রয়েছে।[১১৩]

নবাবী যুগে চতুস্পাঠী, টোল এবং মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল উচ্চ শিক্ষার প্রধান মাধ্যম। চতুস্পাঠী ও টোল ছিল হিন্দুদের এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো। সাধারণত হিন্দু অভিজাত অমাত্য বা ভূ-অভিজাত রাজা-জমিদাররাই ছিলেন এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক। অন্যদিকে মক্তব মাদ্রাসা ছিল মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাংলার নবাব ও মুসলিম অভিজাতদের বদ্যনতায় ও অর্থানুকূল্যে মক্তব-মাদ্রাসাকে ঘিরে মুসলিম উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল। হিন্দু-মুসলিমদের জন্য এ পৃথক ও স্বতন্ত্র ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেউ কেউ সমকালীন বাংলার সমাজ সংস্কৃতির ধর্মভিত্তিক দ্বিধাভিক্তির প্রতীক বলে মনে করেন।[১১৪] তবে হিন্দু-মুসলিমদের উচ্চ শিক্ষার এ স্বতন্ত্র ধারার নিরিখে সে যুগের সমাজের সাম্প্রদায়িক দ্বিধা বিভাজনের এ মতটি

---

১১০ A. P. Mallick, *History of Bishnupurra,* Calcutta, 1921, pp. 115-117

১১১ A. P. Mallick, *op.cit.,* p. 422

১১২ অতুল সুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৯

১১৩ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা*, পৃ. ১০৮

১১৪ অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী*, কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২৪১

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ সঠিক নয়। বস্তুত স্বতন্ত্র ধর্ম সম্প্রদায়ের নিজ নিজ বিশেষায়িত শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা কোনো নজীরবিহীন ঘটনা নয়। কাজেই নবাবী বাংলায় প্রচলিত এধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত দিয়ে সাম্প্রাদায়িক দ্বিধাবিভক্তি প্রমাণের চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নয়।

সংস্কৃত কাব্যের 'ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থম'- পংক্তিতে রাজশক্তি এবং ব্রাহ্মণশক্তিকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল যুগ্মশক্তি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মূল কথা হচ্ছে রাজা ব্রাহ্মণ শক্তিকে প্রতিপালন করবেন এবং ব্রাহ্মণ রাজাকে সমাজ-শাসনে সাহায্য করবেন। এসময় হিন্দু জমিদারগণ ঐতিহ্য অনুযায়ী ব্রহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা দানের দায়িত্বটি পালন করেন। তারা নিজেদের জমিদারী এলাকায় চতুষ্পাঠী ও টোল স্থাপন করে এর পরিচালনার ভার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হাতে ন্যাস্ত করেন। চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, ন্যায়, স্মৃতি, জোতিষ শাস্ত্র ও দর্শন শেখানো হতো। চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা সমাপান্তে মেধাবী ও অভিজাত পরিবারের শিক্ষার্থীরা টোলে শিক্ষা লাভের জন্য যেতো। বস্তুত টোল ছিল সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নদীয়ার জমিদার কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সেসময় নদীয়া চতুষ্পাঠী ও টোল শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আঠারো শতকের কবি দয়ারামের *সারদামঙ্গল* কাব্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে সময় নদীয়ায় নব্যন্যায় অধ্যাপনার জন্য পাঁচটি টোল ছিল।[১১৫] শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে কৃষ্ণচন্দ্রের বদান্যতা শুধু নদীয়াবাসী শিক্ষার্থী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল না। নদীয়ার বাইরে সুদূর বিক্রমপুর ও বাকলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও তাঁর অর্থানুকূল্য ভোগ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নদীয়ার চতুষ্পাঠী ও টোলসমূহের এমনই সুখ্যাতি ছিল যে, সমকালে সংস্কৃত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা নদীয়ায় আসতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এসব বিদেশাগত শিক্ষার্থীদের জন্য মাসে দু'শো টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিলেন।[১১৬]

নবাবী আমলে সংস্কৃত শিক্ষা এবং হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলনের প্রধান পীঠস্থান নদীয়া হলেও পূর্ববঙ্গের কোটালিপাড়া, ঢাকার রাজনগর, সিলেট ও চট্টগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণী, বর্ধমান, চব্বিশ পরগণার ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়া, কামারহাটি, হাওড়াবালী, ভদ্রেশ্বর, জয়নগর-মজলিশপুর, সপ্তগ্রাম, আন্দুল ও বিষ্ণুপুরে উচ্চতর সংস্কৃত চর্চার ব্যবস্থা ছিল।[১১৭] হিন্দু শাস্ত্র ও সংস্কৃত শিক্ষা ও অনুশীলনে বর্ণিত এসব স্থানের খ্যাতি অর্জনের মূলে সংশ্লিষ্ট এলাকার হিন্দু অমাত্য অভিজাত এবং বিশেষ করে জমিদারদের যে পৃষ্ঠপোষকতা ও অবদান ছিল তা বলার অবকাশ রাখে না। রাজা কীর্তিচন্দ্র ও রাজা তিলকচন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধমানও একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কবি রামপ্রসাদ সেনের বর্ণনা মতে, সংস্কৃত বিষয়ক উচ্চশিক্ষা এবং শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য দ্রাবিড়, উৎকল, মিথিলা ও কাশী থেকে দলে দলে ছাত্ররা বর্ধমানের চতুষ্পাঠী ও টোলসমূহে আসতো।[১১৮] পূর্ব বাংলার রাজনগরে রাজা রাজবল্লভ হিন্দুদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখেছিলেন। রাজনগরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা, চতুষ্পাঠী

---

[১১৫] পরেশচন্দ্র মণ্ডল, 'সংস্কৃত সাহিত্য', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪, ১৯৭১*, ৩য় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪১৩

[১১৬] K. K. Datta, *Alivardi Khan and His Time,* University of Calcutta, Calcutta, 1939, p. 235

[১১৭] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা*, পৃ. ১১০; পরেশচন্দ্র মণ্ডল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১৩

[১১৮] K. K. Datta, *op. cit.*, p. 236

Dhaka University Institutional Repository

এবং টোলসমূহের খ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি নিজ ব্যয়ে রাজনগরের মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নদীয়ায় পাঠাতেন। তাঁর প্রেরিত ছাত্রদের মধ্যে নীলকণ্ঠ সার্বভৌম, কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীরা এবং কৃষ্ণকান্ত সিদ্ধান্ত কৃতী হয়ে রাজনগরে ফিরে এসে সংস্কৃত শিক্ষা দানের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।[১১৯]

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চতুস্পাঠী ও টোল যেমন হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, তেমনি মক্তব-মাদ্রাসা ছিল মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাংলার মধ্য ও পূর্বাঞ্চল ছিল মুসলিম প্রধান। এখানকার কয়েকটি মুসলমান প্রধান গ্রামের মুসলিম শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এখানে শিক্ষার্থীদের আরবি ফারসি ও উর্দু ভাষা শিক্ষা, আরবি-ফারসি সাহিত্যে মৌখিক পাঠদান এবং দৈনন্দিন জীবন পরিচালনায় উপযোগী অঙ্ক শেখানোর সাথে ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক পাঠ প্রদান করা হতো। সম্ভ্রান্ত মুসলিম অভিজাতদের বদান্যতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এসব মক্তব পরিচালিত হতো। মক্তবের মেধাবী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্ররাই পরবর্তিতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি হতো। এসময় রাজধানী মুর্শিদাবাদ ছাড়াও বাংলার প্রধান প্রধান শহর ও জেলা শহরগুলোতে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল।[১২০] মাদ্রাসাসমূহের পাঠ-পঠন এবং রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে লা-খেরাজ ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া ছাড়াও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মাসিক এবং বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দ দেয়া হতো। এসব মাদ্রাসা পরিচালনায় মুসলিম অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতারও প্রমাণ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বীরভূমের জমিদার বদি-উজ-জামান ও আসাদ-উজ-জামানের নামোল্লেখ করা যায়। মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত ছিলেন ইসলামি শাস্ত্রাভিজ্ঞ মৌলভী ও বিদ্বান ব্যক্তিরা। এসব খ্যাতিমান মুসলিম পণ্ডিতদের সম্পর্কে অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবাবী যুগে বাংলার স্থানীয় কোনো খ্যতনামা মুসলিম পণ্ডিত, ধর্মতত্ত্ববিদের সন্ধান পাওয়া যায় না। এ সময় বাংলায় মুসলিম শাস্ত্র চর্চাকারী ও বিদ্বান-পণ্ডিতদের প্রায় সকলেই ছিলেন বহিরাগত। স্থানীয় বাঙ্গলী মুসলিম পণ্ডিতের উপস্থিতি বলতে গেলে নেই। সেকালে হিন্দু সংস্কৃতির মূল উৎস ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা শাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্য এবং এগুলো চতুস্পাঠী ও টোল নামক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্যসূচিভূক্ত ছিল। আলোচ্য যুগে মুসলিম সংস্কৃতির মূল উৎস ছিল আরবি ভাষায় লেখা ধর্মগ্রন্থসমূহ (কোরআন, হাদিস ইত্যাদি), আরবি ও ফারসি ভাষায় লিখিত ইসলামী আইন শাস্ত্র এবং ফারসি ভাষায় লিখিত সাহিত্য ও দর্শন ইত্যাদি। মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিকুলামে এসব বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল।[১২১]

৭.২.৩ খ. ন্যায় ও তর্ক শাস্ত্র

উপরে বর্ণিত চতুস্পাঠী ও টোলে পাঠ-পঠনে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনেকেই সমকালে নৈয়ায়িক (Logicians) ও স্মার্ত হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবার ছিল নৈয়ায়িক ও স্মার্ত পণ্ডিতদের তীর্থভূমি। বিবিধ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ যে আশিজন বিদ্বান পণ্ডিত তাঁর দরবারকে আলোকিত করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নৈয়ায়িকও ছিলেন। এদের মধ্যে হরিরাম রাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রাম গোপাল

---

[১১৯] শ্রী রসিকলাল গুপ্ত, *মহারাজা রাজবল্লভ সেন*, সাথী প্রেস, কলিকাতা পৃ. ৮৯

[১২০] K. K. Datta, *op. cit.*, p. 241

[১২১] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা*, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

সার্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায় পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়লঙ্কার, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, মধুসুধন ন্যায়ালঙ্কার এবং শঙ্কর তর্কবাগীশ ছিলেন অন্যমতম। এদের মধ্যে শোষোক্ত শঙ্কর তর্কবাগীশকে (১৭২৩-১৮১৬ খ্রি.) তর্ক শাস্ত্রের প্রতিভার মূখ্য অবতার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১২২] বাঙ্গালি প্রতিভার মূর্ত প্রতীক হিসেবে তিনি ভারতের সর্বত্র পরিচিতি লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন সভাপণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার ও শিবরাম বাচস্পতি। সমকালে নৈয়ায়িক ও পত্রিকাকার হিসেবে বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অনুমানখণ্ডের চর্চা যখন চরমে, সেসময় শিবরাম বাচস্পতি প্রাচীন ন্যায়ের চর্চা পুনরুজ্জীবিত করেন। *গৌতমসূত্রবিধি* নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন এবং গদাধর রচিত যুক্তিবাদের উপর একটি টীকা প্রণয়ন শিবরামের অন্যতম কৃর্তি। ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি 'ষড়দর্শনবিৎ' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলন।[১২৩] রাজা রাজবল্লভ দ্বিজাচারে উপনায়ন-অনুষ্ঠানের জন্য যেসব পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র নিয়েছিলেন বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কারও তাদের অন্যতম।[১২৪] স্মার্থ পণ্ডিত হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমও নদীয়াধিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত *কৃষ্ণপদামৃত, পদাঙ্কদূত, মুকুন্দপদমাধুরী* ও *সিদ্ধান্তচিন্তামণি* ইত্যাদি গ্রন্থ ন্যায়শাস্ত্রের মুল্যবান তথ্যসূত্র হিসেবে পণ্ডিতমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত।

আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও পণ্ডিত ছিলেন ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৬-১৮০৭ খ্রি.)। তিনিও নদীয়া রাজের পৃষ্ঠাপোষকতা পেয়েছিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রথমজীবনে *রামচরিত* নাটকা রচনা করেছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে *বিবাদভঙ্গার্ণব* নামে যে বিশাল গ্রন্থটি রচনা করেন এটি তাঁকে শাস্ত্রজ্ঞ ও নৈয়ায়িক হিসেবে ইতিহাসে যশস্বী করে রেখেছে। ইংরেজ পণ্ডিত কোলব্রুক *A Digest of Hinu Law on Contracts and Succession* শিরোণামে *বিবাদভঙ্গার্ণব* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরবর্তী দীর্ঘকাল ধরে এ ইংরেজি অনুবাদের ভিত্তিতেই ভারতে হিন্দু আইনঘটিত বিবাদের নিস্পত্তি করা হয়েছে।[১২৫]

শুধু নদীয়া নয় বর্ধমান এবং রাজনগরেও ন্যায় শাস্ত্র চর্চায় ভূ-অভিজাতদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দানের বিষয় পরিদৃষ্ট হয়। নব্যন্যায়ের প্রখ্যাত পণ্ডিত দুলাল তর্কবাগীশ বর্ধামানের জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। নদীয়ার সভাপণ্ডিত শঙ্কর তর্কবাগীশ ছিলেন তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ। দুলাল তর্কবাগীশের রচিত নব্যন্যায় বিষয়ক পত্রিকা নদীয়ার বিদ্বৎসমাজসহ বাংলার বাইরে প্রচারিত হয়েছিল। নৈয়ায়িকও স্মার্ত পণ্ডিত হিসেবে সমকালীন বাংলায় সুপরিচিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, জাগমোহন তর্কসিদ্ধান্ত, জয়রাম তর্কপঞ্চানন, কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর ও দুর্গাদাস তর্কপঞ্চানন ছিলেন দুলাল তর্কবাগীশের কৃতি ছাত্রদের অন্যতম।[১২৬]

---

[১২২] অতুল সুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪

[১২৩] অতুল সুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৬

[১২৪] শ্রী রসিকলাল গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৯

[১২৫] পরেশচন্দ্র মণ্ডল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১১

[১২৬] অতুল সুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

৭.২.৩ গ. ভাষা চর্চা

নবাবী যুগে ফারসি ছিল দরবারি ও রাজভাষা। ফলে ফারসি এ যুগে বঙ্গ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। মুসলমানগণ তো বটেই সে যুগে জীবন-জীবিকার তাগিদে হিন্দুদেরকেও ফারসি ভাষা শিখতে হয়েছিল। তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, সেকালের শিক্ষিত হিন্দু বাঙ্গালিরা চাকুরি লাভে আশায় ফারসি শিখতেন। চাকরি পাবার তাগিদ না থাকলেও রাজন্যবর্গের সাথে যোগাযোগ সহজতর করার জন্য ভূ-অভিজাত জমিদারদেরকেও কমবেশি ফারসি শিখতে হয়েছিল। তাছাড়া নিছক জ্ঞানাহরণের উদ্দেশ্যেও অনেক হিন্দু রাজভাষা ফারসি শিখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সে যুগের দু'জন বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর এবং রামপ্রসাদ সেনের কথা উল্লেখ্য। তাদের দু'জনই ফারসি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।[১২৭] এ ছাড়াও ভারতচন্দ্রের শিক্ষক রামচন্দ্র মুনশী, ওয়ারেন হেস্টিংসের শিক্ষক রাজা নবকৃষ্ণ, ধর্মমঙ্গলের কবি নরসিংহ বসু প্রমুখ হিন্দুরা ফারসি ভাষায় দখল অর্জন করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সকালীন ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি নবাব সরকারের অভিজাত অমাত্য দিওয়ান রাজা কিরাতচাঁদের ফারসি ভাষায় অসামান্য বুৎপত্তির ভূয়সী প্রসংশা করেছেন।[১২৮] বিহারের নায়েব নাযিম ছিলেন রাজা রামনারায়ণ। তিনি ফারসি ভাষার একজন খ্যাতিমান কবিও ছিলেন।[১২৯] নবাবী আমলে বিহারের পাটনা ছিল ফারসি শিক্ষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ির বর্ণানা থেকে জানা যায় যে এসময় পারস্যদেশীয় বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ধর্মতত্ত্ববিদ বিহারে আগমন করেন। নায়েব নাজিম সুজাউদ্দিন খান এবং পরবর্তীকালে মুসলিম অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় এসকল পণ্ডিত ফারসি ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্ব চর্চা ও অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি নিজে পাটনায় কয়েকজন অধ্যাপকের অধীনে কয়েকশ ছাত্রকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নরত দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩০] বিহার ছাড়াও অন্যত্রও ফারসি শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল।

নবাবী যুগে নিম্ন স্তরে শিক্ষার বাহন হিসেবে বাংলা ভাষার কিছুটা ব্যবহার দেখা যায়, তবে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার একেবারেই ছিল না। একারণেই বাঙ্গালি কথা-বার্তা বা লেখনীতে বিশুদ্ধ বাংলার ব্যবহার ছিল একেবারেই কম। নবাবী যুগে অভিজাত মুসলমানরা বাংলায় কথা বলতেন না। অভিজাত হিন্দুদের কাছেও বাংলার বিশেষ কদর ছিল বলে মনে হয় না। বরং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও বাংলাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। সমকালে মুসলিমদের লেখনীতে যেমন বাংলার মধ্যে অসংখ্য আরবি, ফারসি ও উর্দুর সংমিশ্রণ দেখা যায়, তেমনি হিন্দু পণ্ডিতরাও এক প্রকার সংস্কৃত ও বাংলা মিশ্র রীতিতে লিখতেন যাতে সংস্কৃতের প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষা শিক্ষার প্রসারে মুসলিম অভিজাতদের বদান্যতা ও পৃষ্ঠপোষকতা হস্ত যতটা প্রসারিত ছিল, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ততটা নয়।

---

[১২৭] K. K. Datta, *op. cit.*, pp. 239-240

[১২৮] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৫

[১২৯] K. K. Datta, *op. cit.*, p. 240

[১৩০] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৭

Dhaka University Institutional Repository

একই কথা হিন্দু অভিজাত জমিদারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁরা সংস্কৃত ও শাস্ত্রীয় শিক্ষা প্রসারে অকাতর পৃষ্ঠপোষকতা দিলেও মাতৃভাষা বাংলার উন্নয়নে তেমন নজর দেননি।

নবাবী যুগে মুর্শিদাবাদ উর্দু ভাষা চর্চায় পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এসময় মুর্শিদাবাদের উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ-পঠনের খ্যাতি উত্তর পশ্চিম ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এক্ষেত্রে নবাব ও মুসলিম অভিজাতদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষাকতার কথা জানা যায়। এ ব্যাপারে হিন্দু অভিজাতদের অল্প বিস্তর পৃষ্ঠপোষকতা দানের প্রমাণ রয়েছে।

বাংলায় ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমন ও ক্রমতৎপরতা বৃদ্ধির সূত্রে প্রাক-পলাশী যুগেই কলকাতায় খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগ ও তৎপরতায় ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হয়েছিল।[১৩১] তবে মিশনারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ঐকান্তি আগ্রহ সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের দালাল গোছের কিছু স্থানীয় বাঙালী হিন্দু বণিক ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনীয় ইংরেজী ভাষা জ্ঞান আয়ত্ত্ব করলেও অভিজাত বা সাধারণ মানুষের মধ্যে তার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয় না।

৭.২.৪ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য।

সুলতানী যুগেই দরবারী ভাষা হিসেবে বাংলায় ফারসি ভাষা সংস্কৃতের স্থান দখল করে নিয়েছিল। তবে স্থানীয় এলাকাতে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুধু অব্যাহত নয়, বরং বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, শাসনতান্ত্রিক ভাষা ফারসি ও মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবি সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে বাংলা ভাষা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে অলোচ্য অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। বস্তুত মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে ইলিয়াস শাহী শাসকদের বিচ্ছন্নতা তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র চিন্তন এবং বাংলা ভাষাসহ স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে-হুসেন শাহী যুগে যার গতি তরান্বিত হয়। স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ তো বটেই, অভিবাসী মুসলমান বিশেষ করে তাদের এদেশে জন্মগ্রহণকারী পরবর্তী প্রজন্ম বাংলা ভাষার বহুল ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তুর্কি রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে চৌদ্দ শতকেই বাংলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহনে রূপান্তরিত হওয়ায় পরবর্তী শতকটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবময় শতাব্দীতে পরিণত হয়।।[১৩২] মুঘল যুগে বাংলা চর্চা পূর্বের মতো রাজ পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি । এর ফলে বাংলা সাহিত্য কিছুটা হলেও জৌলুস হারায় এবং নবাবী যুগে এর গৌরব কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে পড়ে। বাংলা সাহিত্য গবেষকগণ মনে করেন এ সময় ভাব-ভাষা রীতি ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের গুণগত উৎকর্ষ অর্জিত হয়নি। ওয়াকিল আহমদের মতে, আঠারো শতকে কবি এবং কাব্যের সংখ্যা অধিক, তবে দু'চারজন

---

[১৩১] ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান হলো ১৭৪২ সালে কলকাতার কলকাতার অনাথ ও ভবঘুরে বালকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত Old Charity School. বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে মিশনারী ম্যাপল্যাটফ, কিয়েরনানভার এবং তাঁর সহযোগী সিলভেস্টার আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কিয়েরনানভার ১৭৫৮একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। J. Long, 'Calcutta in the olden Time'; সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা*, পৃ. ১১৫

[১৩২] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য*, বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃপৃ. ১৭৮, ১৮০, ১৮১

ছাড়া প্রতিভাবান কবি ছিলেন না।[১৩৩] নবাবী যুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের সার্বিক পর্যালোচনায় এ মতের বিরোধিতার বিশেষ কোনো সুযোগ নেই। তবে এ কথাও সত্য যে, বাংলা ভাষা বাঙ্গালির জাতিসত্ত্বার প্রতীক। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাঙ্গালি সমাজ বরারই বাংলায় তাদের ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। নবাবী আমলেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নবাবী যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবাধ চর্চা জাতির ইতিহাসে একটি ইতিবাচক দিক নির্দেশ করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুঘল সুবাদারি যুগের মতো নবাবী যুগেও বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চা বিশেষ রাজ পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। তবে এক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার হাত প্রসারিত করেছিলেন বাংলা ভূ-অভিজাত জমিদারবর্গ। বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্রসারে এরা বিশেষ আগ্রহ না দেখালেও বাংলা সাহিত্য চর্চাকারী কবি সাহিত্যিকগণ তাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ, বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র, মেদিনিপুরের যশোবন্ত সিংহ, বিষ্ণুপুরের জমিদার গোপাল সিংহ, পঞ্চকুটাধিপতি রঘুনাথ সিংহ, নোয়াখালির জমিদার রাজা জয়চন্দ্র প্রমুখের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটাত্মীয় ছিলেন রাজাকিশোর মুখোপাধ্যায়। তিনিও বাংলা সাহিত্যের একজন সমঝদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে জানা যায়।[১৩৪] এ যুগের বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি মথুরেশ, কৃষ্ণরাম, রামেশ্বর ভটাচার্য, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ সেন, ঘনরাম চক্রবর্তী, হায়াত মাহমুদ, ফকির রাম ও শেখ মনসুর প্রমুখ। ছন্দে বাংলাকাব্য বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবকাব্য, অনুবাদকাব্য, প্রণয়োপাখ্যান, পীর পাঁচালী, দোভাষী পুঁথি, শাক্তপদ, কবিওয়ালা গান ইত্যাদি এসব সাহিত্যসেবীদের প্রধান রচনা ধারা। ধর্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষ জ্ঞানশাস্ত্রও তাঁদের রচনার উপজীব্য ছিল।

নবাবী যুগের সামন্ত শাসন ও সমাজব্যবস্থার প্রভাব সে যুগের সাহিত্য ধারায়ও সুস্পষ্ট ছিল। বস্তুত সামন্তবাদী চেতনা মানুষকে প্রভূদ্রোহী নয়, প্রভূভক্ত হতে শেখায়। সামন্তবাদ সমাজকে স্বপ্ন দেখায়; কিন্তু সমাজকে কর্মক্ষম, উদ্যোগী ও সংগ্রামী করে না। সামন্ত সমাজে ব্যক্তি-অধিকার ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বা স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না। ফলে সমাজে দৈবনির্ভরতা, অদৃষ্টবাদ, অলৌকিক বিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি প্রধান্য পায়। আর এসব জীবন দর্শন তাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। নবাবী যুগের বাংলা সাহিত্যেও যে এর প্রতিফলন দেখা যায়, এ যুগে মঙ্গলকাব্য রচনার প্রধান্য এর প্রমাণ।[১৩৫] এ সময়কার মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিন কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ঘনরাম চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্র রায়। তারা এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে তুচ্ছতার অগৌরব হতে অনেকটাই রক্ষা করতে পেরেছিলেন বলে অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় মনে করেন।[১৩৬] উল্লেখিত তিনজন ছাড়াও জগজ্জীবন ঘোষাল ও মানিক গাঙ্গুলীও মঙ্গলকাব্য ধারার প্রধান কবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে এদের মধ্যে নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্রের অবস্থান ছিল সবাব উপরে। আগেই বলা হয়েছে যে, তিনি নদীয়ার জমিদার কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। তাঁর কাব্য প্রতিভায় বিমুগ্ধ হয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'রায়

---

[১৩৩] ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০২

[১৩৪] K. K. Datta, *op. cit.*, p. 236

[১৩৫] বস্তুত মঙ্গলকাব্য বাংলার নিজস্ব সম্পদ। একে সমকালীন বাংলার জাতীয় কাব্যও বলা যেতে পারে। কেননা এতে বিষয়বস্তু ও চরিত্রে বাংলা ও বাঙ্গালীর খাঁটি চিত্র পাওয়া যায়। ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১০

[১৩৬] অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৯২০

গুণাকর' উপাধি দেন। *অন্নদামঙ্গল* কাব্য ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। রীবন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি রায় গুণাকরের *অন্যদাঙ্গল*কে রাজকণ্ঠে মনিমালার সাথে তুলনা করেছেন।[১৩৭] ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গলে* ধর্মের বন্ধন থাকলেও এতে মানবজীবনের আবেগ-আকাঙ্ক্ষাও প্রতিফলিত হয়েছে। এতে কৃষি অর্থনীতি অপেক্ষা ব্যবসায় অর্থনীতির গৌরব-কীর্তন যুগ ধর্মেরই প্রতিধ্বনিরই প্রমাণ।

নবাবী যুগে মঙ্গল কাব্যের অপর খ্যাতিমান কবি ছিলেন কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন কর্ণগড়ের ভূ-অভিজাত সামন্ত রামসিংহ ও তাঁর পুত্র যশোমন্ত সিংহের সভাকবি। পৃষ্ঠপোষক যশোমন্ত সিংহের নির্দেশে কবি রামেশ্বর তাঁর *শিবায়ন* বা *শিবকীর্তন* কাব্য রচনা করেন। রামেশ্বরের এ কাব্যে সমকালীন বাংলার কৃষি সমাজ ও দরিদ্র কৃষক পরিবারের গার্হাস্থ্যজীবন নিপুনভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এ কারণেই বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবেও *শিবায়ণ* কাব্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে ঘনরাম চক্রবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্টিত ছিলেন। বর্ধমানের জমিদার মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তাঁরই নির্দেশেই ঘনরাম তাঁর বিখ্যাত *ধর্মমঙ্গল* কাব্য রচনা করেছিলেন। নিম্নশ্রেণীর মানুষের পুজ্য ধর্মঠাকুরকে উপজীব্য করেই *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের কাহিনীর বিস্তার। এ কাব্যে যেমন বীররস রয়েছে, তেমনি আছে আদিরসও।[১৩৮] সমকালে মঙ্গল কবিদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেন এবং কবি প্রণরাম চক্রবর্তীর নামও উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মানসামঙ্গলের জনপ্রিয়তা সর্ববঙ্গীয়; এমনকি আসাম, উড়িষ্যা এবং বিহারেও এ ধারার কাব্য রচিত হয়েছে। দেবশক্তির সাথে মানবশক্তির সংগ্রাম মানসামঙ্গলের মূলসার। এর মধ্য দিয়ে সেকালের শাসক প্রভূশক্তির সাথে প্রজাপুঞ্জের লড়াইয়েরই চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হতো। আঠারো শতকে নবাবী যুগে এ ধারার কবিদের মধ্যে বগুড়ার জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, রাইপুরের দ্বিজ বাণেশ্বর এবং চট্রগ্রামের রামজীবন বিদ্যাভূষণ ছিলেন প্রধান।

বাংলা সাহিত্যে নয়া প্লাবন এসেছিল চৈতন্য পর্বে।[১৩৯] বস্তুত ষোল শতকে বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রাণাবেগ ও ভাব-উচ্ছলতার এক নতুন জোয়ার এসেছিল। সতেরো শতক পর্যন্ত ছিল বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির যুগ। এর পর বৈষ্ণব সাহিত্যে অবক্ষয় দেখা দেয় এবং বৃত্তাবদ্ধ ভাবস্রোতের ন্যায় তা গতি ও দ্যুতি হারিয়ে ফেলে।[১৪০] অবশ্য নবাবী যুগে নরহরি চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, নটবর দাস, দ্বীনবন্ধু দাস, গৌরসুন্দর দাস, ভগীরথ বন্ধু, পুরুষোত্তম মিশ্র ও রাধামোহন ঠাকুর প্রমুখ কবিগণ পূর্বসূরীদের এ রচনা ধারাটি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। বর্ণিত কবিদের মধ্যে নরহরি চক্রবর্তী ও রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। চৈতন্যজীবনী *ভক্তিরত্নাকার* নরহরি চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ রচনা। গোপাল হালদার একে 'বৈষ্ণব-ইতিহাসের বিশ্বকোষতুল্য' গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪১]*গৌরচরিতচিন্তামণি* নরহরির আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা। তৎকালীন নদীয়াবাসীদের জীবনাচার

---

[১৩৭] উদ্ধৃতি অনিল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৬

[১৩৮] সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ১৮১

[১৩৯] অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

[১৪০] ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১২

[১৪১] গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ১৮৭; নিখিলনাথ রায়ও নরহরির পাণ্ডিত্য এবং তাঁর *ভক্তিরত্নাকার* গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ.পৃ. ৬৫১-৬৫২

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে এতে অনেক তথ্য রয়েছে। নিখিলনাথ রায়ের মতে, আঠারো শতকে বৈষ্ণব সমাজে রাধামোহন ঠাকুরের সাথে তুলনীয় আর কোনো পণ্ডিত ছিল না। সমকালীন অভিজাত অমাত্য মহারাজা নন্দকুমার রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।[১৪২] বৈষ্ণব পদসংকলন *পদামৃতসমুদ্র* তাঁর প্রসিদ্ধ কীর্তি। এতে আট'শোরও বেশি পদ সংকলিত হয়েছে এবং এর মধ্যে চার'শোরও বেশি তাঁর নিজস্বকৃত পদ। রাধামোহনের অন্যতম শিষ্য বৈষ্ণব দাস। তিনি গুরুর *পদামৃতসমুদ্রকে* অন্তর্ভূক্ত করে তিন হাজারেরও অধিক পদ সংকলন করে *পদতরুকল্প* নামক একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করেন। উপরে বর্ণিত পদ সংকলনগুলো যে, বিস্মৃতি ও ধ্বংসের হাত থেকে বৈষ্ণব পদকে রক্ষা করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এখানেই নবাবী যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব।

বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে অনুবাদ সাহিত্য। হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় অনুদার ও রক্ষণশীল মনোভাব সত্ত্বেও সুলতানী আমল বা মুঘল সুবাদারি আমলের মতো নবাবী যুগেও অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশ অব্যাহত ছিল। সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ধ্রুপদী ভাষা (classical language) জানে না এমন পাঠকের কাছে ধর্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান, মহাকাব্য, রোমান্স ইত্যাদি অনুবাদের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে তাদের ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ ও আলোকিত করাই অনুবাদ সাহিত্যের উদ্দেশ্য। নবাবী যুগে অনুবাদ সাহিত্যিকদের শঙ্কর চক্রবর্তী, কবিভূষণ ফকির রাম, নিত্যানন্দ অদ্ভুত আচার্য শেখ মনসুর ও আলী রজা প্রমুখ ছিলেন অন্যতম ।[১৪৩] তবে অনুবাদের এ ধারায় নবাবী যুগে মুসলমানদের মধ্যে হায়াত মাহমুদ ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি এবং তাঁর কবিকর্মই সর্বাধিক। জানা যে যে, রংপুরের অধিবাসী হায়াত মাহমুদ আরবি ও ফারসি ভাষাভিজ্ঞ একজন উঁচু স্তরের আলেম ও বিচার বিভাগীয় একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি *জঙ্গনামা* নামে একটি কাহিনীকাব্য রচনা করেছিলেন। *হিতজ্ঞানবাণী ও আম্বিয়াবাণী* ইত্যাদি হলো তাঁর অনুবাদমূলক খণ্ডকাব্য। ওয়াকিল আহমদের মতে, তাঁর অনুবাদ কর্মের কৃতিত্ব আছে, কিন্তু শিল্পকর্মের লিপিচাতুর্য নেই।[১৪৪] তবে এ কথা অস্বীকার করার কোনো যো নেই যে, একজন স্বভাব কবি হিসেবে তিনি জ্ঞান ও নীতির বিষয়কে সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় অনেক কাব্যোক্তি আছে, যেগুলো তাঁর প্রজ্ঞা ও চিন্তা শক্তির পরিচায়ক। 'বিনা শ্রম ধন বিদ্যা তপস্যা না হয়', 'তিক্ত গুড়ে সুধা দিলে মিষ্টি নাহি হয়', 'মূর্খ মিত্র হৈতে ভাল জ্ঞানী শত্রু যেই' এবং কৃপনের ধন যেন বৃদ্ধের যুবতি' ইত্যাদি কাব্যোক্তির মধ্যে কবির গভীর চিন্তা শক্তির পরিচয় মেলে। হায়াত মাহমুদ প্রসঙ্গে মাযহারুল ইসলাম বলেছেন "নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতিনিধি হেয়াত মাহমুদের কবি-ভাষা আটপৌরে এবং তুলনামুলকভাবে সাধারণ, কিন্তু তাঁহার আবেগের সঙ্গে দেশজ প্রাণের যোগসূত্রটি অকৃত্রিম খাঁটি।"[১৪৫]

বাংলা রোমান্স বা প্রণয়োপাখ্যান রচনায় পনের ও ষোল শতকের বাংলার মুসলমান কবিগণ যে সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন নবাবী যুগের কবিরা তা পারেননি। এ সময় প্রণয়কাব্যের পূর্ব ধারা অনেকটাই ঔজ্জ্বলতা হারিয়ে নিস্প্রভ রূপ ধারণ করে। পনেরো শতকের কবি শাহ মুহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা* এর সাথে নবাবী যুগের কবি গরীবুল্লাহর *ইউসুফ-জোলেখা*, নওয়াজিশ খানের *গুলে বাকওয়ালী* এবং মুহম্মদ মুকীমের *গুলে বাকওয়ালী* ইত্যাদি কাব্যের

---

[১৪২] নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৫৯

[১৪৩] শঙ্কর চক্রবর্তী অনুদিত গ্রন্থের নাম ছিল *বাল্মিকীপুরাণ*, ফকিররামের *অঙ্গদ রায়বর* এবং নিত্যানন্দের *অদ্ভুতরামায়ন*।

[১৪৪] ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৭

[১৪৫] মাযহারুল ইসলাম, *হেয়াত মাহমুদ*, রাজশাহী, ১৯৬১, পৃ. ২৯৭

Dhaka University Institutional Repository

তুলনামুলক আলোচনায় এ দুর্বলতা ও অপকর্ষ ধরা পরে। এ ধারার অন্যান্য কবি যেমন- মুহাম্মদ রজা, শেখ সাদী ও শেরবাজ রজা ও মহম্মদ আলীর রচনাতেও এ দুর্বলতা স্পষ্ট। এসব কবিদের কাব্যে গল্প বলার আগ্রহ বেশি, শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস কম। তারপরেও একথা বলা যায় যে, নবাবী যুগের কবিগণ ভারতীয়, আরব এবং পারস্যের ইসলামিক ও অনৈসলামিক উপাদান ব্যবহার করে যে বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে কিছুটা হলেও প্রসারিত করেছিলেন তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপেক্ষনীয় নয়।

পাঁচালী কাব্য এ যুগের বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মুসলমান পীরের উপর হিন্দু দেবতার মহাত্ম্য আরোপ করে পীর-পাঁচালী কাব্যের উদ্ভব। এ ধরনের কাব্য বাংলার হিন্দু মুসলিম জনতার কাছে বিপুল জনপ্রিয় ছিল বলেই নবাবী যুগের প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায় (*সত্যপীরের ব্রতকথা*), রামেশ্বর ভট্টাচার্য (*সত্যপীরের পাঁচালী*) প্রমুখকেও পীর-পাঁচালী রচনা করতে দেখা যায়। ওয়াকিল আহমদের অভিমত, পীর-পাঁচালীর শিল্পমূল্য তুচ্ছ, তবে তা সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানকে এক-সূত্রে গেঁথেছে- এখানেই এর ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব নিহিত।[১৪৬] নবাবী যুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম মিশ্র ভাষারীতির দোভাষী পুঁথি।[১৪৭] নবাবী যুগের দোভাষী পুঁথি রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শাহ গরীবুল্লাহ। *সোনাভান, সত্যপীরের পুঁথি* ও *আমীর হামজা* তাঁর রচিত পুথির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এসব পুঁথিতে উচ্চভাব, জীবনদর্শন, অর্ন্তদৃষ্টি বা নিগূঢ় শিল্পচেতনার অভাব থাকলেও সমকালে এসব পুঁথি যে বাংলার সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর মুসলিম জনতার কাছে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তত এসব পুঁথি ছিল তাদের কাব্যরস পিপাসা নিবৃত্ত করার একটি বড় মাধ্যম। এতে সমকালের ছায়াপাতও লক্ষ্য করা যায়। ফলে সে যুগের ইতিহাস অধ্যয়নেও এসব দোভাষী পুঁথির গুরুত্ব রয়েছে।

আঠারো শতকে কোনো প্রতিভাধর বৈষ্ণবকবি না থাকায় এসময় বৈষ্ণবপদাবলী গতানুগতিক অনুবৃত্তিতে পর্যবসিত হয় এ অবস্থায় যুগের চেতনা ও চাহিদা থেকে শাক্তপদাবলীর উদ্ভব হয়।[১৪৮] বৈষ্ণবপদের মতো শাক্তপদও একাধারে গান ও গীতিকবিতা। শাক্তপদকে শ্যামাসঙ্গীতও বলা হয়। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়ায় কালীদেবীর প্রতি ভক্তি নিবেদন ও তাঁর কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা শাক্তপদ বা শ্যামাসঙ্গীতের মূল উপজীব্য। তৎকালীন বাংলার অভিজাত শ্রেণীর চর্চায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় শাক্তপদের শিল্পগুণ সমকালের বাংলা সাহিত্যে অন্য যে কোনো শাখার তুলনায় উন্নত ও মননসম্পৃক্ত ছিল বলে বাংলা সাহিত্য গবেষকদের মত।[১৪৯] নবাবী যুগে এ ধারার প্রধান প্রতিভা কবি রামপ্রসাদ সেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্যামাসঙ্গীতে তিনি কিছু নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, মুঘল সুবাদরি যুগের ন্যায় নবাবী যুগেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। আরবি এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা নবাবদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা পেলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তা হয়নি। ফলে উৎকর্ষ ও গুণে-মানে নবাবী যুগে বাংলা সাহিত্য কিছুটা হলেও তার গৌরব হারায়। তবে সুখের বিষয় হলো তৎকালীন ভূ-অভিজাত জমিদারদের অনেকেই বাংলা সাহিত্য সেবীদের

[১৪৬] ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৬

[১৪৭] এ মিশ্রণ ছিল ছিল শব্দাবলী, ব্যাকরণ ও বাকরীতিতে। আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ.পৃ. ১০৮-১১০

[১৪৮] ক্ষুদিরাম দাস, *বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি*, কলিকাতা, প্রকাশকাল অজ্ঞাত, পৃ.২৩৪

[১৪৯] ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৮

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসায় নবাবী যুগে বাংলা সাহিত্য চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। এযুগে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে কবিদের সংখ্যা নেহায়েত কম ছিল না, তবে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেনের ছাড়া সৃজনশীল কবি সাহিত্যিকের দেখা পাওয়া যায় না। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেনের সাথে কিছুটা তুলনীয় হতে পারে এমন মুসলমান সাহিত্য প্রতিভা হায়াত মাহমুদ ছাড়া আর কেউ ছিল না। সৃজনশীল প্রতিভার অভাবে এ যুগের সাহিত্যে বিষয়বস্তু, ভাব ও ভাষা-রীতিতে পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি বেশি, নতুন ধারা উদ্ভাবন সামান্য। মিশ্র ভাষার উদ্ভবকে কিছুটা নতুনত্বের সাক্ষর বলা যেতে পারে এবং এ ভাষারীতি জনপ্রিয়ও হয়েছিল। কিন্তু কৃত্রিম বলে তা শেষ পর্যন্ত টিকেনি। এ সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নবাবী যুগের বাংলা সাহিত্যের কিছু ইতিবাচক দিক ছিল, যেমন- ষোল শতকে শ্রী চৈতন্যদেব বাংলা সাহিত্যকে রাজ দরবার থেকে বৈষ্ণব আখড়ায় নিয়ে যান। আর একে দরবারের বাইরে দরগাহ, আখড়া এবং গণআসরসহ নানা স্থানে প্রসারিত করার কৃতিত্ব নবাবী যুগের কবি-সাহিত্যিকদের। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ যুগে হিন্দু-মুসলমান কবিগণ স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে মিলন হয়নি সত্য, তবে কেউ কারো সীমানা অতিক্রম না করায় সংঘর্ষও বাধেনি, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমন্বয়ের সুর আছে।

৭.২.৫ সংস্কৃত ও উড়িয়া সাহিত্য।

নবাবী যুগে উড়িষ্যাতে সংস্কৃত এবং উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ছিল। তবে এ সাহিত্য চর্চায় রাজন্যবর্গ বা অভিজাত শ্রেণীর লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে সূত্রে কোনো তথ্য উল্লেখ নেই। নিখিলনাথ রায় সে সময়কার উড়িষ্যার বেশ কয়েকজন উড়িয়া সাহিত্যিক ও তাদের সাহিত্যকর্মের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৫০] এদের মধ্যে *মথুরামঙ্গলের* (কৃষ্ণলীলা বিষয়ক) রচয়িতা কবি ভক্তচরণ, *কপটপাশা* ও *ভারতসাবিত্রী* গ্রন্থ রচয়িতা ভীমকবি, *সুদর্শনবিলাস* ও *হংসদূত* প্রণেতা চন্দমণি মোহন্ত, *রসকল্পলতা* প্রণেতা গদাধর পট্টনায়ক, *খড়ীলীলাবতী* গ্রন্থ রচয়িতা লোকনাথ নায়ক, *রামচন্দ্রবিহারী* প্রণেতা মাগুনি পট্টনায়ক, কৃষ্ণলীলামৃত ও পঞ্চশায়ক রচয়িতা হলদিয়ার রাজা নীলাম্বর ভঞ্জ ও কুঞ্জবিহারী পট্টনায়ক প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। কে কে দত্ত উড়িয়া কবিদের মধ্যে উপেন্দ্র ভঞ্জ, রামদাস, কৃষ্ণসিংহ, অভিম্যান্যু সামন্ত সিংহ, ব্রজনাথ ভঞ্জ এবং সদানন্দ কবি সুর্যব্রহ্ম মুখের নাম উল্লেখ করেছেন।[১৫১] এদের মধ্যে শেষোক্ত সদানন্দ কবি সূর্যব্রহ্ম *নিস্তারতরঙ্গিনী*, *নামচিন্তামণি*, *প্রেমপঞ্চামৃত*, *যুগলরাসামৃতহরী*, *প্রেমতরঙ্গিনী এবং প্রেমলহরী* ইত্যাদি ধর্মমূলক কাব্য রচনা করে বিশেষ যশোখ্যাতি লাভ করেছিলেন।[১৫২] শুধু উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন নয় নবাবী যুগে উড়িষ্যায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ চর্চা হতো বলে জানা যায়। সংস্কৃত সাহিত্য সেবীদের মধ্যে *গুণ্ডিচাচম্পু* গ্রন্থ প্রণেতা চক্রপাণি পট্টনায়ক, *হংসদূত* ও *নৈষধ* এর টীকাকার গোপীনাথ পট্টনায়ক, *নারয়নাস্টক* এর টীকাকার পীতাম্বর মিশ্র, *বৈদ্যকল্পলতিকা* ও *পায়শ্চিত্যতরঙ্গিণী* গ্রন্থ প্রণেতা ব্যাকরণবিদ রঘুনাথ দাস

---

১৫০ নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৬১

১৫১ K. K. Datta, *op. cit.*, p. 236

১৫২ নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৬১

এবং ব্যবহারশাস্ত্র সঙ্কলয়িতা শম্ভুকর বাজপেয়ী প্রমুখ ছিলেন প্রধান।[১৫৩] উড়িয়া ও সংস্কৃত ছাড়াও উড়িষ্যাবাসী কবিদের মারাঠি, হিন্দি ও বাংলা ভাষার উপরও কিছু পরিমাণে দখল ছিল বলে সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।[১৫৪]

৭.২.৫ উর্দু সাহিত্য

নবাবী যুগে মুর্শিদাবাদ উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে চর্চায় পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। উর্দু ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় নবাব ও মুসলিম অভিজাতদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষাকতার কথা জানা যায়।[১৫৫] এসময়কার একজন বিখ্যাত উর্দু কবি ছিলেন হৃদয়রাম জোদা। তিনি নবাব দরবারের পৃষ্ঠপোষপোষকতা লাভ করেছিলেন। নবাব সরফরাজ খান তাঁকে সভাকবির মর্যাদা দেন। ঢাকার নায়েব নাজিম নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানও ছিলেন উর্দু সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। তিনি প্রখ্যাত উর্দু কবি জহুর আলী খালিককে মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহের দরবার থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে মুর্শিদাবাদ নিয়ে এসেছিলেন।[১৫৬] গজল, নাজাম প্রভৃতি যেমন উর্দুভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ ছিল, তেমনি মারশিয়াও (পদ্যে লেখা কারবালার ইতিহাস)। বাংলার নবাব এবং অভিজাত মুসলিম আমিরদের বেশিরভাগই ছিলেন শিয়া। আর এজন্য তারা উর্দু মারশিয়ার বিশেষ অনুরাগী হওয়ায় এর সাথে জড়িত কবি সাহিত্যিকদেরও বিশেষ কদর করতেন। পর্যালোচনাধীন সময়ে নবাব দরবার ও ভূ-অভিজাতদের গৃহে মাঝে মধ্যেই মুশায়েরার (কবি সম্মেলন) আয়োজন হতো। এতে বিভিন্ন ভাষার কবিদের সমাবেশ ঘটতো। এসব কবিদের কাব্য পাঠানুষ্ঠান উপভোগে অভিজাতবর্গ ছাড়াও সাধারণ মানুষেরও অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব মুশায়রায় সমকালের উর্দু কবিগণও অংশ নিতেন।

কবি-সাহিত্যিকদের সমাজের বিবেক বলা হয়। আঠারো শতকের নবাবী যুগের সাহিত্যসেবী বিশেষ করে স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকদেরও সমাজের বিবেক অভিধায় অবিহিত করা অসঙ্গত হবে না। এ সময়কার কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় সমকালীন সমাজের চিত্র ফুটে ওঠেছে। নবাবী যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান কবি ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্যে রয়েছে সমাজের উপর তলার মানুষের জীবনাচার কবি রামপ্রসাদের গানে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সমাজস্থ নীচুতলার সাধারণ মানুষের দুঃখ-দৈন্যতা। যুগসন্ধিক্ষণে সামাজিক রূপান্তরের প্রভাব চিহ্নও এদের সাহিত্যে বিধৃত হয়েছে। ফলে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এবং রামপ্রসাদ সেন প্রমুখের রচনা শুধু সাহিত্য হিসেবেই নয় সমকালীন সামাজিক ইতিহাসেরও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। পুণশ্চ উল্লেখ্য যে, পর্যালোচনাধীন যুগে সাহিত্য সাধনার পেছনে পৃষ্ঠপোষকতার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এ সময় সাহ্যিত্য বিশেষ করে বাংলা সাহিত নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। তবে এ অভাব পুরণ করেছিল ভূ- অভিজাত রাজা জমিদাররা। হুমায়ুন আজাদ এদেরকে সাহিত্যবোধহীন সামন্তপ্রভূ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৫৭] হুমায়ূন আজাদের বক্তব্যে সারবত্তা আছে সন্দেহ নেই, তবে এ কথাও সম্ভবত অস্বীকার কারার কোনো

---

[১৫৩] নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৬১

[154] K. K. Datta, *op. cit.*, p. 237

[১৫৫] এস এম রেজা আলী খান, *পূর্বোক্ত*, ১০২

[১৫৬] এস এম রেজা আলী খান, *মুর্শিদাবাদ ও বাঙলার নাজিম*, পুঁথিপত্র (প্রাইভেট) লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১০১

[১৫৭] হুমায়ুন আজাদ, 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য' সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ৩য় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইট অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ নেই যে, এসব সামন্ত প্রভূদের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে সাহিত্য চর্চা বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কাজেই নবাবী যুগের অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট সাহিত্য কর্মের ঐতিহাসিক মূল্যকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

৭.২.৬ স্থাপত্য শিল্প ও চিত্রকলা

আবহমানকাল থেকে বাংলার স্থাপত্যশিল্প ও চিত্রকলা শাসকশ্রেণীর সংকল্পনা (idea), রুচি-অভিরুচি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তুর্কি, আফগান, মুঘল ও ইংরেজ সকলেই তাদের নিজ নিজ সাংস্কৃতিক অবস্থান থেকে বাংলার শিল্পকলার সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সাধনে অবদান রেখেছেন। সতেরো শতকে বাংলায় মুঘল কেন্দ্রীয় শাসন সুসংহত হওয়ায় এবং ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী থাকা কালে এখানকার স্থাপত্যে দিল্লীর রাজকীয় ঐতিহ্যের অনুকরণে একটি বিশিষ্ট মুঘল আঞ্চলিক রীতির বিকাশ ঘটে। নবাবী যুগের স্থাপত্য শিল্পে পরিণত মুঘল ঐতিহ্যের কিছুটা ছেদ পড়লেও এতে মুঘল রীতি একেবারে উপেক্ষিত হয়নি। নবাবী আমলের স্থাপত্য ইমারতগুলোকে প্রধানত পার্থিব ও ধর্মীয় এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। পার্থিব ইমারতগুলো মধ্যে প্রধান হলো প্রসাদ ও তোরণ স্থাপত্য। আর ধর্মীয় স্থাপত্যের নিদর্শন হচ্ছে মসজিদ, ইমামবাড়া, দরগাহ্, মঠ ও মন্দির। নবাবী যুগে প্রাসাদসমূহের মধ্যে নবাব মুর্শিদকুলি খানের নির্মিত 'চেহেল সাতুন' বা চল্লিশ স্তম্ভের প্রাসাদ, নবাব সুজাউদ্দিন খানের মুবারক মঞ্জিল, সিরাজ-উদ-দৌলার হিরাঝিল ও মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ এবং মীর জাফর আলী খানের জাফরগঞ্জ প্রাসাদ (এটি তিনি নবাব হওয়ার পূর্বেই তৈরি করেছিলেন।) উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পর্যালোচনাধীন সময়ে অভিজাতবর্গও নবাবদের অনুকরণে জমকালো জীবন যাপন করতেন। অভিজাতদের অনেকরই বিশেষকরে ভূ অভিজাত জমিদারদের প্রাসাদোপম বাসভবন ছিল। এ প্রসঙ্গে ঢাকার নায়েব নাজিম নাওয়াজিশ মুহাম্মদ খানের মোতিঝিল প্রাসাদ ও জগৎশেঠদের মহিমাপুর প্রাসাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ধর্মীয় ইমারতের মধ্যে মুসলমানদের মসজিদই হচ্ছে প্রধান। নবাবী যুগে নির্মিত মসজিদসমূহের মধ্যে মুর্শিদাবাদের 'জামি মসজিদ' বা 'কাটরা মসজিদ' উল্লেখযোগ্য। এটি ছিল বাংলায় নির্মিত মুঘল স্থাপত্য ঘরণার বৃহত্তম মসজিদ।[১৫৮] কাটরা মসজিদটি ঢাকাস্থ করতলব খান মসজিদের প্রতিকৃতি স্বরূপ। উল্লেখ্য যে, ঢাকার বেগম বাজারে মুর্শিদকলি খান একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে এটি করতলব খান মসজিদ নামে পরিচিত। এ যুগে নির্মিত অন্যান্য মসজিদ স্থাপত্যের মধ্যে মুর্শিদকুলি খানের পত্নী নাসিরা বানু বেগম নির্মিত মসজিদ, বেগম আজিমুন্নেসার (সুজাউদ্দিন খানের পত্নী) মসজিদ, খোশবাগে নির্মিত সুজাউদ্দিনের সমজিদ, ফুটি মসজিদ (নবাব সরফরাজ খান কর্তৃক নির্মিত), বেগম মসজিদ ((নবাব সরফরাজ খানের স্ত্রী কর্তৃক নির্মিত) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মুসলিম প্রধান নবাবী বাংলায় সর্বত্র আরো অনেক সমজিদ নির্মিত হয়েছিল এবং বলার অপেক্ষা রাখেনা সংখ্যায় কম হলেও অভিজাত মুসলমানদের কেউ কেউ ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু মসজিদ নির্মাণ করে থাকবেন। তবে এ বিষয়ে বিশেষ কোনো বর্ণনা

---

[১৫৮] Cathrine B. Asher, 'Inventory of Key Monoments- Murshidabad', in George Michell (ed.), *The Islamic Heritage of Bengal,* UNESCO, 1984, p. 91

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায় না। George Michell (ed.), *The Islamic Heritage of Bengal* গ্রন্থেও দু একটি মসজিদের বিবরণ ছাড়া আর কোনো তথ্য নেই ।

নবাবী যুগের মসজিদ স্থাপত্যে সুবিদিত মুঘল স্থাপতশৈলীর স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এসব স্থাপত্যের নির্মাণশৈলীকে পারভীন হাসান বাংলায় বিকশিত মুঘল রীতিরই পুনরাবৃত্তি বলে মন্তব্য করেছেন।[১৫৯] তবে নবাবী যুগে নির্মিত স্থাপত্যে প্রাক-মুঘল যুগের স্থাপত্যরীতিরও কিছু প্রভাব যে ছিল, সে কথা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। উদাহরণ স্বরূপ কাটরা মসজিদের কথা বলা যেতে পারে। এতে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের প্রবেশদ্বারের খিলান ও বর্হিগাত্রের অলঙ্করণশৈলীর যে ইঙ্গিতবহ তা প্রাক-মুঘল যুগের স্থাপত্যেরই বৈশিষ্ট্য ।

মুর্শিদকুলি খান ছাড়া বাংলার নবাবগণ ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। তাই ইমামবাড়া নির্মাণে তাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। ইমামবাড়াগুলোর মধ্যে ১৭৫৬-১৭৫৭ সালে নবাব সিরিজ-উদ-দৌলাহ নির্মিত মুর্শিদাবাদ ইমামবাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। একক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির এ ইমামবাড়াটি নবাবী যুগের এক অনুপম ধর্মীয় ইমারতে নিদর্শন। এসময় বাংলায় মহানবীর পদছাপ সম্বলিত দরগাহ নির্মাণের রীতি দেখা যায়। এসব দরগাহর মধ্যে ১৭১৮ সালে চট্টগ্রামে নির্মিত 'কদম-ই-মুবারক' অন্যতম। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ দরগাহ মসজিদটি সায়াহ্নকালীন মুঘল রীতিতে নির্মিত। অমাত্য অভিজাত চট্টগ্রামের ফৌজদার এর নির্মাতা মুহাম্মদ ইয়াসিন ছিলেন এর নির্মাতা।

মুসলমানদের যেমন মসজিদ, দরগাহ ও ইমামবাড়া, তেমনি হিন্দুদের ধর্মীয় ইমারত মঠ ও মন্দির। বাংলার নবাবগণ মুসলমান হওয়ায় তারা পুণ্য লাভ ও ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে সমকালে অনেক মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। শাসকরা মন্দির সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্বাহ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি বরাদ্দ দিয়েছেন সত্য, তবে শাসকদের সরাসরি মন্দির নির্মাণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মঠ-মন্দির নির্মাণের দায়িত্ত পালন করেছেন হিন্দু অভিজাত বিশেষকরে হিন্দু ভূ-স্বামী জমিদারবর্গ। আঠারো শতকে নবাবী যুগে মন্দির নির্মতা ভূম্যাধিকারীদের মধ্যে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচন্দ্র, নাটোরের রাণী ভবানী, ভূষণার সীতারাম রায়, দিনাজপুরের জমিদার মহারাজা প্রাণনাথ, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মল্ল জমিদারবর্গ এবং রাজা রাজবল্লভ অন্যতম। প্রসঙ্গত মন্দির নির্মাতা হিসেবে অমাত্য অভিজাত বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়নের নামও উল্লেখের দাবি রাখে। কিরীটেশ্বরীতে তাঁর এবং তাঁর উত্তরাধিকারী শিবনারায়ণ কানুনগোর নির্মিত গুপ্তমঠ, বৃহৎমন্দির শিব ও ভৈরব মন্দির বাংলার মন্দির স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন।[১৬০] হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্মণ রক্ষায় নাটোরের জমিদার রাণী ভাবনীর নাম হিন্দু সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভারে উচ্চারিত হয়। মুর্শিদাবাদ সন্নিহিত তাঁর অন্যতম বাসস্থান বড়নগরকে মুর্শিদাবাদের বারাণসী বলা হয়। এখানে রাণী ভবানী বহু মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এসব মন্দিরের মধ্যে ভাবনীশ্বর মন্দির ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাণী ভবানী এসব মন্দির ও দেবালয় পরিচালনার জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকার বৃত্তি বরাদ্দ করেছিলেন।

---

[১৫৯] পারভীন হাসান, 'স্থাপত্য ও চিত্রকলা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ৩য় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইট অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩,, পৃ.পৃ. ৬১৮, ৬১৯

[১৬০] নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, ষোল শতকে বাংলার অনেক বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এসব ব্যক্তিবর্গের অনেকেই বাংলার বিভিন্ন স্থানে রাধাকৃষ্ণ ও গৌর-নিতায়ের মন্দির এবং অনেক মঠ নির্মাণ করেছিলেন। আঠারো শতকে বাংলায় বৈষ্ণব মন্দির নির্মাণের ধরাবাহিকতা অব্যাহত ছিল, তবে পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলায় বহু শিব ও শাক্ত মন্দিরও নির্মাণ করা হয়েছিল। নির্মাণশৈলী ও স্থাপত্য রীতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলায় নির্মিত মন্দিরসমূহ 'চালা', 'রত্ন' ও 'চান্দনী'- এ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। চালা মন্দিরের মধ্যে ছিল দো-চালা, চার চালা ও আট চালা মন্দির। রাজশাহীর পুঠিয়া, নওগাঁর কালিগ্রাম ও যশোহরের সেনহাটি মন্দির দো-চালা মন্দিরের নিদর্শন। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে চার চালা মন্দিরের আধিক্য দেখা যায়। আট চালা মন্দির বিশেষভাবে লক্ষণীয় হাওড়া ও হুগলি অঞ্চলে। মন্দির স্থাপত্যে বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যরীতি অনুসৃত হলেও স্থাপত্যশৈলীর বিচারে এসব মন্দির স্থাপত্য মুঘল স্থাপত্য রীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। বাংলার শিব ও কালীমন্দিরসমূহে এ স্থাপত্য রীতির প্রাধান্য দৃশ্যমান।

আঠারো শতকে বাংলায় রত্ন বা চূড়াবিশিষ্ট মন্দির নির্মাণরীতিও বেশ জনপ্রিয় ছিল। রত্ন রীতির মন্দিরসমূহের মধ্যে একরত্ন, পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দিরের সংখ্যাই বেশি। বাঁকুড়ার মল্ল জমিদারদের নির্মিত কালাচাঁদের মন্দির ও রাধাশ্যামের মন্দিরসহ মন্দিরগুচ্ছ একরত্ন মন্দিরের বিশালতম ও চিত্তাকর্ষক নিদর্শন। পঞ্চরত্ন মন্দিরের প্রাধান্য রয়েছে বর্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুরে। যশোহরের হরেকৃষ্ণ মন্দির এবং ভূষণায় জমিদার সীতারাম রায়ের নির্মিত কৃষ্ণমন্দির, বর্ধমানের খাটনগরের লক্ষীনারায়ণের মন্দির পঞ্চরত্ন মন্দিরের নির্দশন। রত্ন মন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত নবরত্ন মন্দির। মেদিনীপুর, হুগলি ও হাওড়া জেলায় এ ধারার মন্দিরের আধিক্য দেখা যায়। দিনাজপুরের জমিদার মহারাজা প্রাণনাথ কর্তৃক নির্মিত কান্তজীর মন্দির এবং খুলনার সোনাবাড়ীয়ায় হরিনাথ সেন কর্তৃক ১৭৫৭ সালে নির্মিত শ্যামসুন্দর মন্দির নবরত্ন রীতির নিদর্শন।[১৬১] চান্দনী বা 'দালান' নামে খ্যাত সমতল ছাদবিশিষ্ট মন্দিরও নবাবী যুগে বাংলায় নির্মিত হতে দেখা যায়। এ রীতিতে নির্মিত মন্দিরের মধ্যে হাওড়ার গাজীপুরের গোবিন্দ মন্দিরটি সবচেয়ে প্রাচীন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শাসকবর্গ ও অভিজাতগোষ্ঠী কর্তৃক স্থাপত্য শিল্পের বিশেষকরে ধর্মীয় স্থাপত্যের নির্মাণ ও পৃষ্ঠপোষকতা দানের পেছনে তাদের ধর্ম চিন্তা ও প্রেরণা কাজ করেছিল সন্দেহ নেই, তবে এর পেছনে জনসমক্ষে নির্মাতাদের প্রভাব, মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব জাহিরের মনোবৃত্তিও কাজ করেছিল বলে মনে হয়। তবে উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন এর মাধ্যমে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ সাধনে অলক্ষ্যে হলেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

শুধু স্থাপত্য শিল্প নয়, নবাবী যুগে চিত্রশিল্পেও শাসক ও অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা দানের কথা জানা যায়। এ ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসের অনেকখানি জুড়েই রয়েছে মুঘল চিত্রকলার স্থান। মুঘল চিত্রকলাকে পৃথিবীর মিনিয়েচার চিত্রের এক পরম সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৬২] সম্রাট আকবর থেকে শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত শতাধিক বছরধরে রাজদরবারের উদার আনুকূল্যে মুঘল চিত্রকলা উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছিল। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের রক্ষণশীল মনোভাব এবং মিতব্যয়িতার কারণে মুঘল চিত্রশিল্পীদের চিত্রশালার দরজা একে একে বন্ধ

---

[১৬১] পারভীন হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৬২৩-৬২৪; অতুল সুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১১

[১৬২] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০২, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে যায়। ফলে পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে অসহায় মুঘল চিত্রশিল্পীদের কেউ কেউ বাংলার নবাবদের রাজধানী মুর্শিদাবাদেও আশ্রয় নিয়েছিল বলে জানা যায়। নবাব মুর্শিদকুলি খান যে কঠোর আত্মসংযমী ও অনাড়ম্বর জীবনচর্চায় অভ্যস্থ ছিলেন একথা সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন। আর এজন্যই দিল্লী থেকে আগত মুঘল চিত্রশিল্পীরা নবাবের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। তবে মহররম ও বেরা উৎসবের (খাজা খিজিরের স্মরণে পালিত) সময় দিল্লী থেকে সমাগত চিত্রশিল্পীদের ভাগ্যেও নবাবের কিছু দক্ষিণা জোটতো বলে জানা যায়। বর্ণিত উৎসবের সময় নবাব মুর্শিদাবাদ শহরকে জমকালোভাবে সুসজ্জিত করতেন। আর এ সাজ-সজ্জার অন্যতম অঙ্গ ছিল অগণিত লণ্ঠনের আলোকসজ্জা। দিল্লী থেকে আগত মুঘল চিত্রশিল্পীরা অভ্রফলকের লণ্ঠনগুলো চিত্রণের কাজ করতেন। রাবার্ট স্কেলটন (Robert Skelton) দরবারে উপবিষ্ট মুর্শিদকুলি খানের একটি চিত্র প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে চিত্রটির অঙ্কনকাল সম্ভবত ১৭২০ সাল।[১৬৩] এ তথ্যটি সঠিক হলে বর্ণিত এ চিত্রটি অবশ্যই মুঘল-শৈলীর পরম্পরায় উদ্ভূত মুর্শিদাবাদ চিত্রশৈলীর আদি নিদর্শন। এ চিত্রে অভ্রফলকের চিত্রিত লণ্ঠনে আলোকসজ্জার দৃশ্যও রয়েছে।

মুর্শিদকুলি খানের উত্তরসূরি নবাব সুজাউদ্দিন খান এবং নবাব সরফরাজ খান উভয়েই বিলাসী ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা হয় যে, এদের সময় চিত্রশিল্পীরা বিশেষ রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাকবেন। কিন্তু এ সময়কার মুর্শিদাবাদ শৈলীর কোনো চিত্রকর্ম আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। শিল্পকলার গবেষকগণ প্রায় ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, চিত্রশিল্পে মুর্শিদাবাদ শৈলীর প্রকৃত বিকাশ ঘটেছিল নবাব আলিবর্দী খানের আমলে। বিদুষকের হাস্যপরিহাস তাঁর প্রিয় বিনোদন হলেও চিত্রকলার প্রতি তাঁর যে বিশেষ আগ্রহ ছিল, সে কথা সমকালীন ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন খানের বর্ণনাতেও স্থান পেয়েছে। তবাতবায়ির মতে, তিনি শিল্পকলা (arts) বুঝতে পারতেন এবং শিল্পীদের (artistes) প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কার্পন্য করতেন না।[১৬৪] বস্তুত ১৭৫০-১৭৫৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে মুর্শিদাবাদে একটি জমজমাট চিত্রকলা চর্চার সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে রাবার্ট স্কেলটনের প্রবন্ধে।[১৬৫] তিনি Victoria ও Albert Museum, Bodlian Library, India office Library Mrs ও D'Archy Hart এর সংগ্রহে থাকা আলিবর্দী খান ও তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজ-উদ- দৌলাহর সময়ে চিত্রিত কিছু মূল্যবান চিত্রকর্ম প্রকাশ করেছেন। আলিবর্দী খানের সময়কার চিত্রকর্মে দরবারী জীবনযাত্রার প্রাধান্য সুস্পষ্ট। এসব চিত্রকর্মে সমকালীন অভিজাত শ্রেণীর প্রতিকৃতিও স্থান পেয়েছে। পারভীন হাসানের ভাষ্যমতে, এসব চিত্রকর্মে প্রায়শই পুরুষোচিত কর্মানুশীলনের প্রাধান্য লক্ষণীয়। এসব চিত্রকর্মের অঙ্কনশৈলী ছিল রূঢ় ও আঙ্গিকসর্বস্ব এবং ধুসর ও সাদা রঙের ব্যবহার এতে প্রাধান্য পেয়েছে।[১৬৬] নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর এক বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনকালকে মুর্শিদাবাদ শৈলীর চিত্রশিল্পের বিকাশের তাৎপর্যপূর্ণকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। সিরাজ-উদ-দৌলাহর পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রশিল্পীরা দরবারী পরিবেশের বাইরে থেকেও ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচন শুরু করেন। এ সময় শিল্পীরা নতুন স্বাচ্ছন্দ্যে নব নব

---

[১৬৩] Robert Skelton, 'Murshidabad Painting', *Marg,* Vol. X, December 1956, No. I, p. 10

[১৬৪] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৬; ইংরেজী অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬২

[১৬৫] Robert Skelton, *op. cit.,* pp. 11-15

[১৬৬] পারভীন হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪২

Dhaka University Institutional Repository

রূপবিন্যাসে আঁকলেন রাগমালা সিরিজের ছবি। রাবার্ট স্কেলটন তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এসব ছবির কয়েকটি প্রকাশ করেছেন। এসব ছবির রূপবিন্যাসে যেমন নতুন উদ্ভাবনা দেখা যায়, তেমনি রূপনির্মাণেও ফুটে ওঠে মুর্শিদাবাদ শৈলীর নিজস্বতা। এসময় পূর্ববর্তী আমলের সাড়ম্বর কৃত্রিম অঙ্কনরীতির স্থলে প্রাণবন্ত উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার সমাদৃত হয় এবং সুকোমল গঠন (modeling) ও শিথিল রেখার ব্যবহারে ছবির সজীবতা ও প্রাণবন্ততা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময়ই চিত্রকলায় মুর্শিদাবাদ শৈলীর বিকাশ চূড়ান্তরূপ ধারণ করে।

শুধু নবাব ও আমলাদের প্রতিকৃতি চিত্রায়ন নয়, পাশাপাশি নবাবী যুগে এক শ্রেণীর হিন্দু জমিদার ও তাঁদের আমলাদের চাহিদা পুরণের জন্য শিল্পীরা পৌরনিক কাহিনী নির্ভর চিত্রকর্মও তৈরি করেছেন। তবে এ জমিদার কারা এবং চিত্রশিল্পের বিকাশে তাদের ভূমিকা কী, সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায় না। অশোক ভট্টাচার্যের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, চিত্রশিল্পীরা ব্যাপক মাত্রায় হিন্দু জমিদার ও অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন পলাশীর যুদ্ধের পর। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, পলাশীর পরও নবাবী যুগের মুর্শিদাবাদ চিত্রশৈলীর প্রভাব অব্যাহত ছিল। মীর কাসিমের পতন এবং মীরজাফরের ক্ষমতায় পুনরাধিষ্ঠানের (১৭৬৪ খ্রি.) মধ্য দিয়েই মূলত মুর্শিদাবাদ শৈলীর পতন সূচিত হয়। আর মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার আদিরীতির অবনতির সাথে সাথে সরাসরি ইউরোপীয় প্রভাবে বাংলায় উদ্ভব ঘটে এক নতুন ধারার চিত্রশিল্পের।

৭.২.৭ সামাজিক রীতি-ঐতিহ্য

বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে ধর্ম বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নবাবী আমলে এ ধর্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লক্ষণীয় কোনো পরিবর্তন হয়নি। এসময় বাঙ্গালি সমাজ হিন্দু ও মুসলমান এ প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এ উভয় সমাজের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে পণ্ডিত মহলে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক নবাবী যুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের কথা বলেছেন।[১৬৭] সুশীল চৌধুরী মনে করেন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সমন্বয় দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছিল এবং আঠারো শতকে নবাবী যুগেও তা বজায় ছিল। এক্ষেত্রে বাংলার মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর উদার মানসিকতা ও সদিচ্ছার বিষয়টি পণ্ডিতদের বিবেচনায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। বাংলার হিন্দু-মুসলিম সামাজিক সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় ধারার সাক্ষ্য বহন করে সমকালীন বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে মঙ্গল কাব্য। মঙ্গল কাব্যকে বাঙ্গালির জাতীয় কাব্য বলা হয়ে থাকে। একে মধ্যযুগের সমাজ ইতিহাসের দলিল হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। কালের পরিক্রমায় বাংলার লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপুর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছিল, মঙ্গল কাব্যে এর পরিচয় রয়েছে। তবে বাংলায় হিন্দু মুসলিম সম্প্রতি ও ধর্ম-সমন্বয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সত্যপীরের পুজা। বস্তুত দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় প্রচেষ্টা থেকেই 'সত্যপীর' নামক দেবতার উদ্ভব- যিনি দুই সম্প্রদায়ের লোকের কাছেই পুজ্য ছিলেন। নবাবী যুগের প্রধান দুই কবি

---

[১৬৭] জগদীশ নারায়ন সরকার, *হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)*, পৃ.৩২; নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস;* Kalikaranjan Kanango, *Islam and its impact in India,* p. 62; K.K. Datta, *op. cit.*, pp. 257-260; গোলাম রব্বানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ.৪৬-৫৪; অসীম রায়, 'মুসলিম বাংলার ইতিহাসে সমন্বয়ধর্মী ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা', সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.পৃ.১৫৪-১৮৩; সুশীল চৌধুরী, *পলাশির অজানা কাহিনী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ.পৃ.৬২-৬৩

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *সত্যপীরের পাঁচালী* এবং রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *সত্যপীরের কথা* হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রক্রিয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কবি রমেশ্বর 'রাম' ও 'রহিমের' মধ্যে ঐক্যের কথা বলেছেনে। মধ্য আঠারো শতকে রচিত কবি ফৈজুল্লাহর কাব্যেও 'যে রাম, সেই রহিম' এমন অভিব্যক্তি সোচ্চার।

নবাবী যুগে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কথা শুধু ইতিহাস ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পরিলক্ষিত হয় না, সমাজ জীবনে উদযাপিত বিভিন্ন পালা পার্বন ও ও ধর্মীয়-সামাজিক উৎসবাদি উদযাপনেও এর প্রকাশ ঘটেছিল। যেমন উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের হোলি ও বেরা উৎসব উদযাপন। মুসলমানদের মহররম উৎসবে হিন্দুদের যোগদানেরও প্রমাণ রয়েছে। শুধু তাই নয়, এসময় মুসলমানদের হিন্দু মন্দিরে ভোগ এবং হিন্দুদের মুসলমানদের দরগায় সিন্নি প্রদানের ঘটনা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না।[১৬৮] বস্তুত দীর্ঘদিন একসঙ্গে পাশাপশি বসবাসের ফলে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এর ফলে হিন্দুদের সামাজিক জীবনে মুসলমানদের ধর্মের কিছু লৌকিক রূপ যেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল, তেমনি মুসলমানদের সামাজিক জীবনে হিন্দু ধর্মের লৌকিকরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল।[১৬৯]

বাংলার হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের বিষয়ে পণ্ডিতদের[১৭০] মধ্যে ভিন্নমতও রয়েছে। তারা মনে করেন তখনকার হিন্দু সমাজ স্মৃতিশাস্ত্রের শাসন এবং পূর্ব প্রচলিত রীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। অন্যদিকে মুসলমান সমাজ ছিল শরা-শরিয়ত এবং পির ও মোল্লা-মৌলভিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দুটি সমাজই নিজ নিজ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং এ বৃত্তের সর্বজন স্বীকৃত সীমারেখা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ তারা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত ছিল এবং আঠারো শতকের সাহিত্যেই এর ইঙ্গিত রয়েছে। এমনকি রমেশচন্দ্র মজুমদার হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের 'সত্যপীরের পুজা'কেও হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে মানতে নারাজ।[১৭১] জীবন জীবিকার প্রয়োজনে ফারসি ভাষা শিক্ষা, রাজকার্য উপলক্ষে উভয়ের মেলামেশা, কোনো মুসলিম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে দর্শকরূপে উপস্থিতি প্রভৃতি কারণে পোষাকে ও কথাবার্তায় উচ্চবর্ণের অভিজাত হিন্দুদের মধ্যে কিছু মুসলমানী ভাব ও রীতির প্রবেশ ঘটেছিল সত্য, কিন্তু এসব হিন্দুরা বিবাহ এবং খ্যাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব পুরুষের অনুসৃত রীতি ও ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম করার কথা চিন্তা ও করতে পারতো না। বাংলার হিন্দু মুসলিম সমাজের সাম্প্রদায়িক বিতক্তির বিষয়ে বর্ণিত এসব বক্তব্যের ভিত্তি দুর্বল। নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে তারা বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত সাম্প্রাদায়িকতার ইঙ্গিত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইতোপূর্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের স্পষ্ট সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক Edward C. Dimmock এর মন্তব্য প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। ডিমক তাঁর এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, মধ্যযুগের (পঞ্চদশ থেকে আঠরো শতক অব্দি) বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করে বাংলার দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি

---

[১৬৮] D. C. Sen, *History of Bengali Language and Literature*, p. 793

[১৬৯] গোলাম রব্বানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯

[১৭০] S.C Hill, (*Bengal in 1756-757,*) এবং B. K. Gupta, (*Sirajuddaullah and the East India Company*) প্রমুখ এ মতের সমর্থক।

[১৭১] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, কলকাতা, পৃ.পৃ. ৩৩০-৩৩১

Dhaka University Institutional Repository

গভীর বিদ্বেষ ও বিভেদের প্রমাণ খুজে বের করা দুস্কর।[১৭২] নবাবী যুগে বাংলায় হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিরোধের প্রসঙ্গে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর প্রতি হিন্দু অভিজাত বিশেষ করে ভূ-স্বামী জমিদারদের বিদ্বেষ এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধের কথাও বলা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই যে, মধ্য আঠারো শতকে প্রাক-পলাশী যুগে সমাজের উপরতলার অভিজাতগোষ্ঠীর মধ্যে কিছুটা টানাপোড়েন ছিল; হিন্দু অভিজাত বিশেষকরে জমিদার ও শাসক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ-বিসম্বাদের বিষয়টিও সত্য। তবে এ কথা আরো সত্য যে, অভিজাতশ্রেণীর মধ্যকার এ বিদ্বেষ-বিরোধ হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক চেতনা হতে উদ্ভূত নয়, তাঁর মূলে ছিল ব্যক্তি ও শ্রেণী বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের তাড়না। অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। এ পর্যায়ে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, নবাবী যুগে বাংলার হিন্দু মুসলমান সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রমাণের চেষ্টা অনৈতিহাসিক। বস্তুত বহুদিন ধরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, নবাবী যুগে তার বিশেষ কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

সমাজ জীবনে নারী জাতির অবস্থা থেকে সে সমাজের সার্বিক পরিস্থিতি এবং সমাজপতিদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সকল ঐতিহাসিক সূত্রেই জানা যায় যে, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সমাজ জীবনে সাধারণভাবে নারী জাতির অবস্থা ভাল ছিল না। মনীষী রাজা রামমোহন রায় তাঁর *সহমরণ* নামক গ্রন্থে সমকালে বাংলার নারী জাতির যে দুর্দশা-দুগর্তির চিত্র তুলে ধরেছেন আঠারো শতকের নবাবী যুগের নারীদের ক্ষেত্রেও এ বক্তব্য প্রযোজ্য।[১৭৩] এসময় নাটোরের রাণী ভবানী হিন্দু রমনীকুলে ঐতিহ্য ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে সুশিক্ষিত ও ধর্মপ্রাণা নারী হিসেবে ইতিহাসে চিত্রিত করা হয়েছে। বর্ধমানের জমিদার মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের মা বিষ্ণুকুমারী, রাজা নবাকৃষ্ণের স্ত্রীগণ এবং রংপুরের জমিদার জয়দুর্গা চৌধুরাণী বিদুষী ছিলেন বলে জানা যায়। শেষোক্ত জয়াদুর্গা রংপুরের জমিদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১৭৪] 'হরিলীলা'র কবি জয়নারায়ণ সেনের আত্মীয় আনন্দময়ী, দয়াময়ী ও গঙ্গাময়ী সকলেই বিদুষী ছিলেন এবং প্রত্যেকই অল্পবিস্তর কবি খ্যাতিসম্পন্না ছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র রায় ও রামপ্রসাদ সেনের *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যের নায়িকা বিদ্যাও ছিলেন শিক্ষিত ও বিদূষী। শুধু হিন্দু রমণী নয়, এসময় মুসলিম নারীদের মধ্যেও প্রতিভাময়ী ও বিদুষী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে মুর্শিদকুলি খানের স্ত্রী নাসিরা বেগম, মুর্শিদকুলী খানের কন্যা নবাব সুজাউদ্দিন খানের স্ত্রী জিনা-উন-নিসা বেগম, সুজাউদ্দিন খানের কন্যা দুর্দানা বেগম ও নাফিসা বেগম, নবাব আলিবর্দী খানের স্ত্রী শরফ-উন-নিসা বেগম এবং তাদের কন্যা মেহের-উন-নিসা ওরফে ঘসেটি বেগমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ণিত এসব নারী শুধু হেরেমেই নেতৃত্ব দেননি নবাব সরকারের প্রশাসন ও রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইতিহাসে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এসবই ছিল বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত। কাজেই এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে সে যুগের নারী জাতির সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

---

[১৭২] Edward C. Dimmock, 'Hiduism and Islam in Medieval India', Rachel van M Baumer (ed.), *Aspects of Bengaly History and Society*, p. 2

[১৭৩] উদ্ধৃতি অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ২৩৮-২৩৯

[১৭৪] অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নবাবী যুগে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোনো রীতিমাফিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সাধারণভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজই ছিল গোঁড়া ও রক্ষণশীল। পাঠশালায় মেয়েদেরও যাওয়ার সুযোগ ছিল, তবে সে সুযোগ খুব বেশি মেয়রা নিতে পারতো না। অভিজাতদের মধ্যে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন কেউ কেউ বাড়িতে গৃহশিক্ষক রেখে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। অর্থাৎ এযুগে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারটা ছিল অনেকখানি ব্যক্তিগত উদ্যোগের ব্যাপার। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবাবী যুগে নবাব, অভিজাত শ্রেণী, বিশেষকরে ভূস্বামী অভিজাত জমিদারবর্গ ছিলেন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তবে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্র বা বর্ণিত অভিজাতবর্গ কোনো দায়িত্ব নেয়নি। এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্কীর্ণতা ছিল বলে মনে হয়। বস্তুত সেকালের সমাজপতিরা মনে করতেন গৃহই হচ্ছে নারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র এবং গৃহকর্ত্রী হয়ে গৃহরক্ষাই নারী নিয়তি। নারী শিক্ষিত হয়ে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হউক, রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনায় ভূমিকা রাখুক তা সেকালের অভিজাত সমাজনেতাদের কাম্য ছিল না। কে কে দত্ত উল্লেখ করেছেন, নারীরা সাধারণত তাদের স্বামীর আদেশ-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। তারা অন্তপুরে আবদ্ধ থাকতো এবং তাদের জনসমক্ষে আসার অনমুতি দেয়া হতো না। কে কে দত্ত আরো উল্লেখ করেছেন যে, নারীকে জনদৃষ্টিগোচরে আনা যে চরম অসম্মানের কাজ সে বিষয়ে হিন্দুরা মুসলমানদের চাইতে কম ভীত ছিল না।[১৭৫]

নবাবী যুগে বাংলার সমাজ জীবনে কৌলিন্য প্রথা, বহু বিবাহ প্রথা, বাল্য বিবাহ, বরপণ প্রথা, সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা এবং বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ প্রথার মতো কিছু অনভিপ্রেত রীতি ও ঐতিহ্য চালু ছিল। বর্ণাশ্রম শাসিত হিন্দু সমাজে কৌলিন্য প্রথা ছিল অনেক কঠোর ও প্রবল।[১৭৬] তাত্ত্বিকভাবে ইসলাম কৌলিন্য ও বর্ণবৈষম্য নীতি বিরোধী। তবে নবাবী যুগে মুসলিম সমাজ যে কৌলিন্য নীতি দ্বারা কিছু পরিমাণে হলেও প্রভাবিত হয়েছিল, তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। মুসলমান ও হিন্দু উভয় সমাজেই বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল। তবে সাধারণ মানুষের তুলনায় অভিজাত সমাজের মধ্যেই এর প্রচলন বেশি ছিল। হিন্দুদের বহুবিবাহের সাথে কৌলিন্য প্রথার সম্পর্ক ছিল। কুলিনের জন্য কুলিনে কন্যাদান সামাজিক বিধি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ছিল। তাই কুল রক্ষার জন্য কন্যা দায়গ্রস্থ কুলিনেরা নিরূপায় হয়ে কুলিন সন্তানের কাছে যে কোনো উপায়ে কন্যার বিবাহ দিতো। এরূপ বিবাহের সাথে বরপণ গ্রহণের সম্পর্ক থাকায় হিন্দু সমাজের কুলিনেরা অর্থ লোভেও বহুবিবাহ করতো। হিন্দু আইনের দায়াধিকার সম্পর্কিত অন্যায় ব্যবস্থাও বহু বিবাহের অন্যতম কারণ ছিল বলে মনে হয়। যেহেতু স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর উত্তরাধিকার বা ভাগ বসানোর সুযোগ ছিল না, সেহেতু পুরুষরা নির্বিঘ্নে অগনিত বিবাহ করতে কুণ্ঠিত হতো না। বহুবিবাহ প্রথার কারণে সমাজ জীবনে নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটেছিল। এ ধরনের বহুবিবাহের বিষময় ফল হিসেবে বাংলার কুলিন সমাজ কুলষিত হয়েছিল বলে

---

[১৭৫] K .K. Datta, *op. cit.*, p. 244 মুখ বা মাথা খোলা রেখে নারীর জনসমক্ষে উপস্থিতি হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই অসম্মানজনক মনে করতো বলে এম এ রহিমও উল্লেখ করেছেন। এম এ রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮২

[১৭৬] বাংলার হিন্দু সমাজে কে কখন এবং কী উদ্দেশ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিল এ বিষয়ে ইতিহাসে তর্কাতীত কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। তবে অধিকাংশ কুলশাস্ত্রের মতে, বাংলায় কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক রাজা বল্লাল সেন। অবশ্য কোনো কোনে কুল শাস্ত্রের মতে, এ রীতির প্রবর্তক আদিশুরের বংশধর রাজা ক্ষিতিশুর। তবে এ কু প্রথাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও স্থায়ী রূপ দেয়ার কৃতিত্ব দেবীবর ঘটকের। অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ.পৃ.২৫০-২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

অতুল সুর মনে করেন।[১৭৭] বিবাহের সাথে বরপণ যুক্ত থাকায় অনেক দরিদ্র কুলিন তাদের মেয়েদের বিবাহ দিতে ব্যর্থ হয়ে তাদের কন্যাদের গঙ্গা জলে ভাসিয়ে দিয়ে সামাজিক নিগ্রহের হাত থেকে নিস্তার পাবার চেষ্টা করতো। অনেকে আবার মেয়েদের মন্দিরের দেবতাদের সেবায় মেয়েদের উৎসর্গ করতেন। পরবর্তীতে এদেরকেই মন্দিরের সেবা-দাসী বলা হতো। সে দিনকার বাঙ্গালি সমাজে নারীর সতীত্ব পুরুষদের পরম কাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল। এ সতীত্ব রক্ষার জন্যই কৌলিন্য কুলষিত সমাজে হিন্দু বিধবা রমনীদের স্বামীর চিতায় আত্মহুতি দিয়ে সতীত্ব রক্ষা করতে হতো।এ প্রথাটি সতী, সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ও রামপ্রসাদ সেনের কাব্যে এবং সমকালীন বিদেশী পর্যটক ও ইউরোপীয়দের বর্ণনাতে সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। তবে সহমরণ প্রথা হিন্দু সমাজের সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষা উচ্চ ও অভিজাতদের মধ্যে বেশি চালু ছিল। রাজা রামমোহন মনে করেন ভারতের অন্য যে কোন স্থান অপেক্ষা বাংলায় সহমরণ প্রথা ব্যাপক ছিল।[১৭৮] বস্তুত স্বামীর মৃত্যুর পর সহায় সম্বলহীন বিধবাদের অনেকেই সামজিক নিগ্রহ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইহকালে মায় ত্যাগ করে পরকালে স্বর্গসুখ লাভের আশায় স্বেচ্ছায় স্বামীর সাথে সহমৃতা হতো। তবে সব সময় যে স্বেচ্ছায় নারীরা সহমৃতা হতেন, তা কিন্তু নয়। বলপূর্বক বা আফিম সেবন করিয়ে অচেতন অবস্থায় স্বামীর চিতায় চাপিয়ে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অনেক ঘটনাও এদেশে ঘটেছে।[১৭৯]

সমকালীন বাঙ্গালি সমাজে প্রচলিত কু-প্রথাগুলোর অন্যতম আরেকটি ছিল বিধবা বিবাহের অপ্রচলন। বিধবা বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র পরিপন্থী ছিল না।[১৮০] কিন্তু সেকালে হিন্দু সমাজ শাস্ত্রের নিয়ম উপেক্ষা করে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ করে। এমনকি কালক্রমে এ শাস্ত্র বিরোধী কু-রেওয়াজটিকে তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ করে ফেলায় সাধারণ্যে তা অপরিহার্য পালনীয় আচারে পরিণত হয়। আর এভাবেই বিধবা বিবাহ বর্জন একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়। হিন্দু সমাজের প্রভাবে বাঙ্গালি মুসলিমদের মধ্যেও অল্প বিস্তর বিধবা বিবাহ বর্জনের নীতির বিস্তার ঘটেছিল।

উপরে বর্ণিত অনভিপ্রেত সামাজিক রীতি ও প্রথা নিবারণে কোনো বিশেষ উদ্যোগ আয়োজন নবাব সরকারের পক্ষ থেকে দেখা যায় না। অভিজাতদের তরফেও এধরণের কোনো প্রচেষ্টার প্রমাণ নেই। এক্ষেত্রে বাংলার সমাজ জীবনের প্রভাবশালী নিয়ন্তা ভূ-অভিজাত জমিদারদের ভূমিকাও ছিল হতাশাজনক। উল্লেখ্য যে, বাংলার কুলিন সমাজের মতো মিথিলাতেও কুলিন সমাজ বিশেষকরে ব্রাহ্মণরা অদ্ভুত ধরণের বহুবিবাহ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এ অবস্থায় মৈথেলী ব্রাহ্মণদের সমাজপতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না করলেও কুলিনদের পাঁচজনের বেশিস্ত্রী গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। বাংলার সমাজপতি রাজা-জমিদাররা কিন্তু এধরণেরও কোনো উদ্যোগ নিতে পারেননি।[১৮১] আগেই বলা হয়েছে পর্যালোচনাধীন সময়ে বিধবা বিবাহ বর্জন বাঙ্গালি সমাজে প্রচলিত আরেকটি বড় ব্যাধি ছিল। এব্যাধির

---

[১৭৭] অতুল সুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫

[১৭৮] নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ.পৃ. ৩০৪-৩০৫

[১৭৯] অতুল সুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫

[১৮০] হিন্দুশাস্ত্র *পরাশরসংহিতা*'র বিধানমতে, স্বামী নিরুদ্দেশ হলে কিংবা মারা গেলে অথবা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করলে অথবা পুরুষত্বহীন হলে কিংবা সমাজচ্যুত হলে স্ত্রীদের অন্য পতিগ্রহণ বিধিসম্মত। উদ্ধৃতি প্রীতিকুমার মিত্র, 'হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩,, পৃ. ২৮৫

[১৮১] শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা (১১০০-১৯০০খ্রী.)*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ.২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

চূড়ান্ত নিধন না করলেও একে সহজতর করার জন্য এসময় সমাজপতি জমিদারদের দু'টি উদ্যোগের কথা জানা যায়। প্রথম উদ্যোগটি নিয়েছিলেন রাণী ভবানী। রাণীর কন্যা তারাসুন্দরী বাল্য বিধবা হলে তিনি দারুণ মর্মপীড়াবোধ করেন। উল্লেখ্য যে সেময় বাল্য বিধবাদের একাদশী ব্রতের কঠোর নিয়ম পালন করতে হতো। রাণী তার বিধবা কন্যার কষ্ট কিঞ্চিত লাঘব করার জন্য বিধবাদের জন্য অনুসরণীয় একাদশীর কঠোরতা হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি সে সময়কার হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতসমাজের ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে পণ্ডিতগণ স্মার্তশিরোমণির বহুকাল প্রচলিত দেশাচারের সংস্কার সাধনে সম্মত না হওয়ায় রাণী ভবানীর মহতী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিধবাদের বিষয়ে দ্বিতীয় উদ্যোগটি নিয়েছিলেন বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ। তাঁর অপ্রাপ্ত বয়স্কা কনিষ্ঠ কন্যা অভয়া মাত্র আট বছর বয়সে বিধবা হলে তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলনের উদ্যোগ নেন। এবিষয়ে তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের একাংশের সম্মতিও লাভ করেছিলেন। কিন্তু নদীয়ার জমিদার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে তাঁর সভাপণ্ডিতদের বিরোধিতার কারণে রাজবল্লভের বিধবা বিবাহ প্রচলনের সাধু প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হয়ে যায়।[১৮২]

অনেকেই নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আঠারো শতকের বাংলার সামাজিক বিবর্তনের প্রতিফলকরূপে বিবেচনা করেন। নিংসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী, কবিগুণগ্রাহী, দেবদ্বিজপণ্ডিত প্রতিপালক। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি বিধাবা বিবাহ প্রচলনের মহতী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচারণ করেন। রসিকলাল গুপ্তের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে মনে হয় কৃষ্ণচন্দ্রের এ বিরোধিতার পিছনে ব্যক্তিগত ঈর্ষা কাজ করেছিল। অর্থাৎ বৈদ্যবংশীয় রাজা রাজবল্লভের মাধ্যমে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজ সংস্কার সাধিত হউক, তা কৃষ্ণচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল না। তাই তিনি এর বিরোধিতা করেন। এ বিষয়ে অবশ্য ভিন্নমত প্রকাশেরও সুযোগ রয়েছে। সন্দেহ নেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তবে মননের দিক থেকে তিনি ছিলেন অনেক রক্ষণশীল। অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তাঁকে রক্ষণশীল সমাজের শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১৮৩] *ক্ষিতিশ বংশাবলী* গ্রন্থ রচয়িতা কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের বক্তব্যেও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রক্ষণশীল অনুদার মনোভাবে পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণিত তথ্য উৎসানুযায়ি মহারা কৃষ্ণচন্দ্র স্বদেশের কোনো সামাজিক কু-প্রথা ও রীতি রেওয়াজ পরিশুদ্ধকরণে কখনো কোনো উদ্যোগ নেননি। অথচ তিনি উদ্যোগী হলে সমাজ জীবন থেকে প্রচলিত অনেক বিগর্হিত রীতি ঐতিহ্যের নিরসন সম্ভব ছিল। তবে রক্ষণশীল হলেও নদীয়া রাজ যে কোনো সামজিক কুসংস্কার নিরসনে কাজ করেননি এমনটা নয়। পর্যালোচনাধীন সময়ে বাঙালি সমাজে কন্যা বিক্রয়ের মতো ঘৃণ্য প্রথারও প্রচলন ছিল। নীচু শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং উচু শ্রেণীর কায়স্তেরা অর্থের বিনিময়ে বৃদ্ধ, রুগ্ন, অঙ্গহীন ব্যক্তির সঙ্গে কন্যা ও বোনদের বিবাহ দিতো। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর জমিদারি এলাকায় এই কু-প্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন।[১৮৪]

হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বসবাসের ফলে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের কিছু আচার অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহ বর্জনসহ কিছু সামাজিক অনাচার প্রবেশ করেছিল বলে তথ্যসূত্রে

---

[১৮২] এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে শ্রী রসিকলাল গুপ্তের *মহারাজা রাজবল্লভ সেন* গ্রন্থে পৃ.পৃ. ১১৩-১১৮

[১৮৩] অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৫

[184] নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৫

জানা যায়। হিন্দু সমাজের সংস্কারে অল্প পরিসরে হলেও কিছু উদ্যোগ হিন্দু অভিজাতদের মধ্য থেকে কেউ কেউ গ্রহণ করলেও মুসলিম সমাজ সংস্কারে অনুরূপ প্রয়াস তৎকালীন মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে দেখা যায়না। তাই উনিশ শতকে হাজী শরীয়তুল্লাহকে মুসলিম সমাজের সামাজিক কুসংস্কার নির্মূলে আসতে হয়েছিল।

উপরের সামগ্রিক আলোচনা-পর্যালোচনার শেষে একথা বলা যায় যে, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে মুঘলদের অবক্ষয় ও অবনতির যুগে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অরাজকতার মধ্যেও নবাব শাসিত বাংলা ছিল এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। নবাবদের অধীনে সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা বজায় থাকায় বাংলার রাজনৈতিক সুস্থিতি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। শুধু সমকালীন ঐতিহাসিক নয়, আধুনিক ঐতিহাসিক ও গবেষকদের রচনাতেও নবাবী বাংলার অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। বাংলা বরাবরই একটি কৃষি প্রধান দেশ। সামন্ততান্ত্রিক নবাবী শাসনামলেও কৃষিই ছিল জাতীয় আয়ের প্রধান খাত। তবে নবাব সরকার ভূমি ব্যবস্থানা বা ভূমি রাজস্ব খাতে কোনো বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধন করতে পারেনি। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি সরঞ্জামের আধুনিকায়নসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নেও নবাব সরকারের ভূমিকাকে হতাশা ব্যঞ্জকই বলতে হবে। এসময় রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে ভূ-অভিজাত জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেড়েছিল। তবে সমকালীন ইউরোপে সামন্ত জমিদাররা কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলার ভূ-অভিজাত জমিদাররা তা পারেননি। ফলে এ দেশের কৃষিখাত সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থার আবর্তেই ঘোর-পাক খেয়েছে। নবাবী যুগে শিল্প ছিল বাঙ্গালির দ্বিতীয় প্রধান উপজীবিকা এবং বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উৎস। নবাবী বাংলায় শিল্প ছিল বহুমাত্রিক এবং এসব শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ছিল বিশ্বজোড়ে। বস্তুত আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকেই এককভাবে বাংলা হয়ে ওঠে বিশ্ববাজারের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী দেশ। এরূপ বাস্তবতায় স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন ছিল সময়ের দাবি। কিন্তু নবাবী যুগে বাংলায় শিল্পোৎপাদন প্রণালীতে কোনো মৌলিক বা প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটেনি। রাষ্ট্রযন্ত্র এ দায়িত্ব পালন করেনি, শিল্প সংশ্লিষ্ট কারিগরদের পক্ষেও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রূপান্তর ঘটানো সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় এ দায়িত্বপালনে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তারাও সে ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে যে, নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর প্রধান দু'টি অঙ্গশক্তি অমাত্য ও ভূ-অভিজাতরা ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশক্তি। আর এরূপ ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশক্তির কাছ থেকে উৎপাদন শক্তির মৌলিক পরিবর্তনে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা আশা করা যায় না। তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, সমকালীন বাংলার অভিজাত শ্রেণী বাংলার কোনো কোনো শিল্পের বিশেষ করে নগরশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে এসব শিল্প কোনো পণ্য উৎপাদন করতো না। অভিজাতদের বিলাস দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা এসব শিল্পের প্রধান দায়িত্ব ছিল। বস্তুত নিজেদের রুচি ও চাহিদা মোতাবেক শিল্প দ্রব্য পেলেই এ অভিজাতরা সন্তুষ্ট থাকতো। প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, কাঠামোগতভাবে নবাবী যুগের অভিজাত শ্রেণীর অমাত্য ও ভূ-স্বামীরা ছিল উৎপাদন থেকে বিছিন্ন। কাজেই তারা উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ও কারিগরি প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। বর্ণিত এ পরিস্থিতিতে পণ্য উৎপাদনে প্রযুক্তি ব্যবহারে রক্ষণশীলতা দুরীকরণে বাংলার বণিকসমাজ বা অভিজাত বণিক শ্রেণীর বিশেষ ভূমিকা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তারাও সে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি। বস্তুত বাংলার বণিক সমাজ ছিল অনেকটাই পরজীবী । বাংলায় স্বউদ্যোগে বণিক সমাজের বিকাশ ঘটেনি, তাই এরা ইউরোপীয় বণিক সমাজের ন্যায় প্রগতিশীল উৎপাদনশক্তির প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। ফলে বাংলার উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার না থাকায় তা সরল উৎপাদনই থেকে যায়। আর এরূপ সরল উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থারই সারকথা।

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সমকালীন ভারতের অন্য যে কোনো প্রদেশের তুলনায় বাংলার অগ্রগতি ছিল বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। এ সময় বিশ্ববাজারে বাংলার কৃষি ও শিল্প পণ্যের বিপুল চাহিদা এবং রপ্তানি বাণিজ্যে ইউরোপীয়দের অংশগ্রহণ বাংলায় রীতিমতো বাণিজ্য বিপ্লব ঘটিয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল বিকাশের ফলে নবাবী যুগে বাংলায় একটি অভিজাত বণিক শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল সত্য, বাণিজ্যিক পঁজিপতি শ্রেণী হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে তাদের মহাদাপটও দেখা যায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে এই পুঁজিপতি শ্রেণীর বিপুল অর্থ দেশের পুঁজিবাদী উন্নয়নে কোনো অবদান রাখেনি। এ বণিক শ্রেণী ইউরোপীয় বণিকদের মতো উৎপাদন শক্তির প্রতিনিধিত্ব করারও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তাদের বাণিজ্য পুঁজিকে শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত করার কোনো মানসিকতা, প্রস্তুতি বা প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। ফলে বিপুল বণিক পুঁজির মালিক হলেও নবাবী বাংলার অভিজাত বণিকরা দেশের সামগ্রিক উৎপাদন প্রণালী, উৎপাদন সংগঠণ বা বিপনন ব্যবস্থায় কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি।

নবাবী শাসনামলে বাংলার সমাজ ও সস্কৃতির বিকাশে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সামাজিক জীবনাচারণে তারা মূলত নবাবদেরই অনুকরণ অনুসরণ করেছেন। এ জীবনধারা ছিল অনেকখানি আন্তর্জাতিক শহুরে সংস্কৃতি। এর ঝোঁকটি ছিল বহিরাগত পারস্য সংস্কৃতির দিকে। এরকম জীবনাচার শুধু মুসলিম অভিজাত আমির-ওমারদেরই ছিল না, হিন্দু ভূ-স্বামী রাজা জমিদাররাও এরকম জীবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে রাষ্ট্র কিছুটা ভূমিকা রেখেছে, তবে সার্বিক বিবেচনায় তা পর্যাপ্ত ছিল না। এক্ষেত্রে অমাত্য অভিজাতদের ভূমিকা মোটেই সন্তুষজনক ছিল না। বণিক অভিজাতদের কাছ থেকে সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশে অনেক বেশি ভূমিকা প্রত্যাশিত ছিল। সমকালীন বিশ্বে বিশেষকরে ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে সেখানকার বণিক সমাজ সামাজিক রূপান্তর সাংস্কৃতিক বিকাশে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু নবাবী যুগের অভিজাত বণিকরা এরূপ কোনো ভূমিকা পালন করেছিলেন, এমন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এক্ষেত্রে ভূ-অভিজাত জমিদারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রমাণ মেলে। ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ করে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নয়নে তারা অসামান্য অবদান রাখেন। চারু-কারুশিল্পের বিকাশেও অভিজাত শ্রেণীর এই অঙ্গশক্তির ভূমিকা প্রশংসনীয়। তবে নবাবী যুগে সমাজজীবনের কিছু পঙ্কিল দিক অপনয়নে রাষ্ট্র যেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি তেমনি অভিজাত শ্রেণীও। শুধু তাই নয়, বিধবাদের জীবন যাপন সহজতর এবং তাদের বিবাহ প্রচলনের মহতী প্রচেষ্টাও অভিজাতদের কারো কারো বিরোধিতায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সমাজজীবনে রক্ষণশীলতার প্রাধান্যের কারণেই এমনটি হয়েছিল বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

পলাশি বিপ্লব ও অভিজাত শ্রেণী

১৭৫৭ সালে ২৩ জুন পলাশি প্রান্তরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে যে যুদ্ধটি সংঘটিত হয় তা শুধু বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও একটি যুগান্তকারী ও তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। যুদ্ধ হিসাবে বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে এর স্থান নিতান্তই নগন্য হলেও, এর পরবর্তী প্রভাব ও পরিণতি বিবেচনায় পণ্ডিতগণ একে একটি চূড়ান্ত মিমাংসাত্মক ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অনেকের কাছে পলাশি কেবল একটি যুদ্ধ নয়, বরং এটি একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা। পর্যালোচনাধীন গবেষণায়ও পলাশিকে একটি মামুলি যুদ্ধ বা প্রহসন হিসেবে গ্রহণ না করে একে একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, পলাশির গটনায় সেদিনকার অভিজাত শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিতান্তই ব্যক্তি স্বার্থ তাড়িত হয়ে একদল অভিজাত নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহকে উৎখাতের জন্য পলাশির প্রেক্ষাপট তৈরি করে। কিন্তু ইতিহাসে নির্মম পরিহাসে তাদের স্বার্থ চেতনা বাস্তবায়ন তো হয়নি, উপরুন্ত পলাশি তাদের ক্রমঅবক্ষয় ও পরিশেষে পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আলোচ্য অধ্যায়ে এসব বিষয়ে অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকবে।

৮.১ বিপ্লবের সংজ্ঞা

পলাশিকে কেন বিপ্লবাত্মক ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে -এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে বিপ্লব সম্পর্কে একটি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া প্রয়োজন। 'বিপ্লব' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'revolution'। এটি একটি জটিল প্রত্যয় হলেও এ শব্দটি ইতিহাসে বহুল ব্যবহৃত। 'revolution' বা বিপ্লবের সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য (universally acceptable) কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ সহজ নয়। কেননা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদগণ একে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।[১] সাধারণ অর্থে বিপ্লব বলতে সমাজের অনেক ক্ষেত্রে এবং একটি জাতির রাজনীতির দ্রুত, আকস্মিক ও আমুল পরিবর্তনকে (sudden and fundamental change) নিদের্শ করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় সাধারণভাবে বিপ্লব হচ্ছে এমন একটি ঘটনা, যা দ্বারা আকস্মিকভাবে এবং বহুক্ষেত্রে হিংসাত্মক প্রক্রিয়ায় একটি পুরানো প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থা বা ক্ষমতাসীন শাসককে উৎখাত করে একটি নতুন সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা বা কোনো শাসককে ক্ষমতায় বসানো হয়। আরো বৃহত্তর অর্থে বিপ্লব বলতে কোনো দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নেতৃত্বের ধরন, সরকারি নীতি ও কার্যাবলি, অর্থনৈতিক নীতি-আদর্শ, সামাজিক কাঠামো এবং সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের আমুল পরিবর্তনকে বুঝায়। আধুনিককালে এ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় জনগণের

---

[১] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: Dale Yoder 'Current Definition of Revolution', *The American Journal of Sociology,* Vol. 32, No.3 (Nov., 1926), pp. 433-441, available in http://www.jstor.org/stable/2765544 ; Edwin R A Seligman (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences,* Macmillan and Co. Ltd. New York, 1986, vols. 13-14, pp. 501-506

Dhaka University Institutional Repository

বিরাট অংশের অংশগ্রহণকে আবশ্যকীয় বলে মনে করা হয় করেন। মার্কসবাদীরা বিপ্লবকে প্রগতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ইতিহাসের চালিকা শক্তি বলে মনে করেন। কার্ল মার্কসের মতে অর্থনৈতিক কারণেই বিপ্লব অত্যাসন্ন হয়। সমাজবিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই বিপ্লবের সূচনা হয় বলে কার্ল মার্কস মনে করেন। তাঁর মতে, বিপ্লবে ফলে সমাজ সভ্যতা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।[২]

৮.২ পলাশিকে বিপ্লবাত্মক ঘটনা বলা যায় কী-না

উনিশ ও বিশ শতকের পণ্ডিতদের প্রদত্ত বিপ্লবের উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় আঠারো শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত পলাশির ঘটনাকে পুরোপুরি প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। যে যুগের উপর আলোচ্য গবেষণার পরিসর নির্দিষ্ট সে যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বা সরকার সংশ্লিষ্টতা পরিলক্ষিত হয় না। তখনকার দিনে রাজনীতি ছিল রাজা-রাজড়া বা সমাজের উপর তলার মানুষের ব্যাপার। সেদিনের যুগ বৈশিষ্ট্য ছিল স্বীয় যোগ্যতাবলে শাসন অথবা কূটকৌশল, ষড়যন্ত্র ও রক্তপাতের মাধ্যমে একজনকে সরিয়ে দিয়ে স্বার্থনুকূল আরেকজনকে ক্ষমতায় বসিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করা। আর এ কাজটি করতেন একদল অভিজাত, যারা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য রাষ্ট্রীয় উচ্চপদ ও ক্ষমতা হস্তগত করার প্রয়াসে তৎপর থাকতেন। অতএব সরকার বা শাসক পরিবর্তনে তারাই মূখ্য ভূমিকা পালন করতেন। কাজেই সেখানে গণ-আন্দোলন বা গণ-বিপ্লবের কোনে সংশ্লেষ খোজার কোনো অবকাশ নেই। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহকে উৎখাতের পটভূমিতে সাধারণ জনতার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না সত্য, সাধারণ মানুষ ছিল পলাশির ঘটনার নিরুৎসুক দর্শক, তাদের কাছে সে যুগের অন্য আর পাঁচটা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মতো পলাশিও ছিল একটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের খেলা- যাতে দরবারের রাজ-রাজড়ারই খেলোয়ার ছিলেন। তবে পলাশির মাধ্যমে যে পরিবর্তন প্রক্রিয়া ঘটে তার মাধ্যমে রাতারাতি রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা সিরাজ ও তাঁর সমর্থক শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে প্রথমে মীর জাফর ও তাঁর সমর্থক অভিজাত গোষ্ঠীর হাতে এবং পরে ইংরেজদের হাতে চলে যায়। পলাশি প্রসূত রাষ্ট্র ক্ষমতার এ পরিবর্তনকে নিছক একজন শাসকের পরিবর্তন হিসেবে বিবেচনা করার কোনো সুযোগ নেই। বস্তুত পরবর্তী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় পলাশিকে ঐতিহাসিকভাবে একটি যুগান্তকারী পটপরিবর্তনসূচক ঘটনারূপে না দেখে পারা যায় না।

বর্তমানে পণ্ডিতগণ পলাশির ঘটনাকে ভারতীয় উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ কাল বিভাজক চিহ্ন হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছেন। কেননা পলাশির ঘটনায় শুধু বাংলার তরুন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর পতন হয়নি, বাংলার নবাব সরকার যুগেরও অবসান ঘটে। এর মধ্য দিয়ে বঙ্গ-ভারতের ইতিহাসে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তেনর সূচনা হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক মানদণ্ড রাজনৈতিক মানদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। ইংরেজ শক্তি প্রথমে বাংলায় তাদের নিরঙ্কুশ প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং এখান থেকেই ক্রমান্বয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটায়। লক্ষণীয় যে, ইংরেজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের মুঘল সনাতন সামন্ত শাসনকাঠামোতে

---

[২] আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৮৮৫, পৃ.৩৬০

Dhaka University Institutional Repository

সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে। তদুপরি ভারতীয়দের জীবন সাধানাতেও সুস্পষ্ট এমনকি একরকমের আমুল পরিবর্তন সূচিত হয়। ইউরোপীয় বাণিজ্যতন্ত্র ও বুর্জোয়া মূল্যবোধ দ্বারা ভারতীয় জনজীবন ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত হয়। দীর্ঘকালের কৃষিভিত্তিক গ্রামনির্ভর সমাজকাঠামোতে বাণিজ্য পুঁজি ও বুর্জোয়া মূল্যবোধের অনুপ্রবেশের ফলে বঙ্গ-ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বড় ধরনের রূপান্তত ঘটে। আরেকটু বিশদভাবে বলতে গেলে প্রাক-ব্রিটিশ যুগে বঙ্গ-ভারতের ক্ষমতাসীন সরকারসমূহের মধ্যে একটি সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, আর তা হলো বংশীয় শাসন ও আধিপত্য কায়েম এবং সে লক্ষ্যে রাজানুগত শক্তিশালী সুবিধাভোগী সামরিক-বেসামরিক রাষ্ট্রীয় অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি। এসময় রাষ্ট্রযন্ত্র সুকৌশলে সাধারণ মানুষকে রাজনীতি বিমুখ করে রাখার ব্যবস্থা করে। সাধারণ মানুষের জীবনদর্শনে পারলৌকিকতাকে অধিক গুরুত্বারোপ করায় তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরজাগতিক হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই রাজনীতি, জীবনমান, মানবিক অধিকার ইত্যাদি প্রশ্নে সাধারণ মানুষের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। পলাশির ঘটনায় সাধারণ মানুষের উদাসীনতা এর একটি বড় প্রমাণ। বস্তুত ধর্ম-বর্ণ ও সনাতন প্রথা প্রতিষ্ঠানের উপর হস্তক্ষেপ ও আঘাত না আসলে তৎকালীন সমাজের সাধারণ মানুষ রাজনীতি ও রাষ্ট্র ক্ষমতার পালাবদলে মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন বোধ করতো না। সাধারণ জনতাকে রাজনীতি বিমুখ করে রাখার সচেতন কৌশল হিসেবে এসময় কেন্দ্রীয় শাসনকে স্থানীয় পর্যায়ে পরিব্যাপ্তও করা হতো না। ফলে স্থানীয় সমাজের তাদের চিরাচরিত প্রথা-প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত আধা-স্বাধীনসত্তা বজায় রাখতে অসুবিধা হয় নি। এ অবস্থায় সরকার ও সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনাও অনেক কম ছিল। কিন্তু পলাশি-উত্তর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে বঙ্গ-ভারতে প্রচলিত এ ঐতিহ্যের অবসান ঘটে। শাসন কাঠামোতে ইংরেজ প্রাধান্য বৃদ্ধির বিপরীতে নবাবী আমলের বিস্তৃত দিক ঘিরে গড়ে ওঠা অভিজাত শ্রেণীরও অবক্ষয় ও পতন তারন্বিত হয়। এ দিক বিবেচনায় পলাশি ছিল নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর অবক্ষয় ও ধ্বংসেরও সূচক। কেননা ইংরেজদের দিউয়ানি লাভ এবং পরবর্তীতে পূর্ণ শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের মধ্য দিয়ে শাসন ব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তনের ফলে পুরানো অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর পতন হয়। লক্ষণীয় যে, ঔপনিবেশিক যুগে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রামের পর্ণকুঠির পর্যন্ত। ঔপনিবেশিক স্বার্থে এমন সব আইন-কানুন ও প্রশাসনিক নীতি ও ব্যবস্থা প্রর্বতিত হয়, ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে যার অধিকাংশেরই কোনো সঙ্গতি ছিল না। এসব আইন-কানুন ও প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থা মানুষের জাগতিক স্বার্থকেই নয়, তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও ঐতিহ্য চেতনাকেও আঘাত করে। ফলে সরকারের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এভাবে এখানকার রাজনীতিতেও নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে বঙ্গ-ভারতে একটি পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। বিনয় ঘোষের মতে, বাংলার আধুনিক ইতিহাস প্রধানত এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির হাতেই গড়া।[৩] এ শ্রেণীটি ইউরোপীয় রাজনৈতিক ভাবাদর্শের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল। চাকুরী এবং অন্যান্য ন্যায্য অধিকার আদায়ে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই এই সচেতন

[৩] বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, বুক ক্লাব, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশ সোচ্ছার হয়ে ওঠে। এদের মাধ্যমেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয় এবং ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়।

উপরে বর্ণিত পরিবর্তনসমূহ ভারতের সমাজ ও রাজনীতিতে অবশ্যই বৈপ্লবিক পরিবর্তন হিসেবেই বিবেচনার দাবি রাখে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল পলাশির যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই। প্রশ্ন হতে পারে পলাশি প্রসূত বৈপ্লবিক রূপান্তরের সব ফলাফলেই কী ইতিবাচক ছিল? এক কথায় এর উত্তর 'অবশ্যই না'। অর্থাৎ পলাশি-উত্তর ব্রিটিশ শাসন সূচিত রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের সব ফলাফল ইতিবাচক হয়নি এবং তা প্রত্যাশিতও নয়। বাংলা থেকে ব্রিটিশদের ধন নিস্কাষণ এবং এদেশের কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন নিঃসন্দেহে নেতিবাচক প্রভাবেরই স্বাক্ষর বহন করে। তারপরেও ভালো মন্দ সব মিলিয়ে পলাশির ঘটনা যে ভারতীয় রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন সাধন করেছিল-এ ব্যাপরে দ্বিমত পোষণের বিশেষ কোনো সুযোগ নেই। ইতিহাসের দূত হয়ে ইংরেজরা অনেকটা তাদের অজ্ঞাতসারেই ভারতবর্ষ তথা বাংলার সমাজে যে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, কার্ল মার্কসও স্বীকার করেছেন।[৪] বিনয় ঘোষ (২০০৩) উল্লেখ করেছেন যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের উপযোগী আর্থভিত্তি স্থাপন ব্রিটিশদের পক্ষে পুরোপুরি সম্ভব হয়নি, কিন্তু এমন কয়েকটি অনুপ্রাণনশক্তি শহরে-নগরে এবং শহর-নগর থেকে গ্রামে তারা সঞ্চারিত করেছিলেন যাতে এখানকার গ্রামীণ সমাজের মূল গড়নটাই বদলে গিয়েছিল।[৫] পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে অবশ্যই পলাশির সূদুরপ্রাসারী ফল হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে পলাশির যুদ্ধকে 'বিপ্লব' বা 'বিপ্লবাত্মক ঘটনা' হিসেবে আখ্যায়িত করার যে প্রয়াস আধুনিক গবেষক ও পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তাকে কোনোক্রমেই অযৌক্তিক হিসেবে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যুদ্ধ হিসেবে পলাশির গুরুত্ব যাই হোক না কেন বঙ্গ-ভারতের ইতিহাসের পরবর্তী গতিধারায় এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় রেখে পর্যালোচনাধীন গবেষণায়ও পলাশির যুদ্ধকে একটি 'বিপ্লবাত্মক ঘটনা' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.৩ পলাশির ঘটনা ও ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রে এর মূল্যায়ন

নবাব আলিবর্দী খানের রাজত্বকালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত দৃঢ়তা, সামরিক দক্ষতা,সর্তক শাসননীতি ও নানা কৌশলী পদক্ষেপ দ্বারা সমস্যা ও সংকট সত্ত্বেও জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখতে এবং নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। তবে এ সময় নবাবী বাংলার অভ্যন্তরে যে বহুমাত্রিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তাতে তাঁর পক্ষে রাষ্ট্রের সকল শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রণে রাখা প্রায় দুরূহ হয়ে পড়েছিল। অনেকে মনে করেন দৃঢ় মনোবল ও যোগ্যতাবলে নবাব আলিবর্দী খান নবাবী কর্তৃত্বকে ধরে রাখতে সফলকাম হলেও এ সফলতাকে অব্যাহত রাখার মতো

[৪] উদ্ধৃতি বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, পৃ. ৫০

[৫] ঐ

Dhaka University Institutional Repository

অনুকূল পরিবেশ তাঁর উত্তরাধিকারী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর জন্য নিশ্চিত করে যেতে পারেন নি।[৬] ফলে ক্ষমতায় আরোহন করেই সিরাজকে ঘরে বাইরে অসংখ্য শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়। অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে তরুণ নবাব সিরাজের মধ্যে রাজনৈতিক পরিপক্কতার কিছুটা অভাব ছিল। নানামুখী সংকট মোকাবিলা করে নিজেকে এবং তাঁর রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও কৌশল গ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে বাংলায় রাজনৈতিক সমস্যা ও সংকট ক্রমান্বয়ে জটিল থেকে জটিলতররূপ ধারণ করে – যার শেষ পরিণতি ১৭৫৭ সালের পলাশির ঘটনা।

পলাশির ঘটনার আড়াইশো বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়কালে বাঙ্গালি মানসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে বিস্তর। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো কিছু ব্যতিক্রমবাদে এসব আলোচনার অধিকাংশই উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রকৃত ইতিহাসকে পাশ কাটানোর প্রবণতা সুস্পষ্ট। সমকালীন মুসলিম ইতিহাসবিদগণও এসব সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে ওঠতে পারেননি। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ ও তাঁর রাজত্বকালের ঘটনাবলী এবং বিশেষ করে পলাশির ঘটনা সম্পর্কে আলোচনায় সমকালীন ফারসি ইতিহাস গ্রন্থ *মোজাফ্ফরনামা*, *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী* এবং *সিয়ার-উল্-মুতাখখিরিণ* এর গ্রন্থাকারগণ মোটেই সততা ও ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারেননি। ফলে পলাশির ঘটনা মুল্যায়নে এসব তথ্য উৎসের ব্যবহার নিবিড় পরীক্ষা নিরীক্ষার দাবি রাখে। এ ব্যাপারে সমকালীন ইংরেজ ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের রচনাসমূহেও একই রকমের সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। পলাশির ঘটনাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে চিত্রিত করার ব্যাপারে ইংরেজ ইতিহাসবিদদের একরকমের দায় ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পলাশি সম্পর্কিত শুধু সমকালীন নয়, উনিশ ও বিশ শতকের ইংরেজ ইতিহাসবিদ গবেষকদের রচনায়ও এ বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সমকালীন এমনকি হালের অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিকদের রচনাও ইংরেজদের উদ্দেশ্য সাধনেই বেশি কাজে লেগেছে। ইংরেজ শাসনাধীনে সমকালীন ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ইংরেজ প্রভূশক্তির তুষ্টি সাধনে পলাশির বিকৃত বর্ণনা দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু আজকের দিনেও কেন এদেশীয় ঐতিহাসিকদের তথ্য বিকৃতি? একে কেবল তাদের সংকীর্ণ মানসিকতা বলা যাবে না, ক্ষেত্রবিশেষে উপনিবেশবাদ-সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রমাণ বলেও মনে করা যেতে পারে। তবে সুখের বিষয় হলো সম্প্রতি ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ পলাশির ঘটনাকে নতুনভাবে মুল্যায়নের প্রয়াস নিয়েছেন। তারা পলাশির ঘটনাকে বৃহত্তর ইতিহাসের পটভূমিকায় সংস্থাপিত করে ভারতীয় ইতিহাসের ধারায় এর বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করেছেন।[৭] এদের কেউ কেউ সমকালীন ফারসি ও

---

[৬] মোঃ হাবিবুর রহমান, *সুবাহ বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৫৪-১৫৫

[৭] এ ধারার ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে Brijen K Gupta, (*Sirajuddaulah and the East India Company, 1756-1757*, Leiden, 1962) ও Sushil Chaudhury (*From Prosperity to Decline- Eighteenth Century Bengal*, New Delhi, 1995; *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757*, Dhaka, 2001 ও *পলাশির অজানা কাহিনী*, কলকাতা, ২০০৪) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদেরও আগে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (*সিরাজদ্দৌলা*, কলিকাতা, ১৮৯৮) এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (*সিরাজদ্দৌলা*, কলিকাতা, ১৯৪২) প্রমুখ পলাশি ও সিরাজ-উদ-দৌলাহ সম্পর্কে ইংরেজ ও তাদের অনুগত ভারতীয় ঐতিহাসিকদের বর্ণিত একদেশদর্শী ইতিহাসের অসারতা প্রমাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে তাদের রচনাসমূহ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপটে লেখা বিধায়

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি দলিল-দস্তাবেজের বাইরে সমসাময়িক ফরাসি, ওলন্দাজ এমনকি স্পেনিশ কোম্পানিসমূহের দলিল-দস্তাবেজকে গবেষণার উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[৮] ফলে এসব গবেষকদের রচনায় পলাশির ইতিহাস অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় তথ্যসূত্র হিসেবে সাম্প্রতিক এসব তথ্য-উৎস বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৮.৪ পলাশি ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

পলাশির ঘটনা যে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফসল ছিল এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে বিশেষ কোনো দ্বিমত নেই।[৯] আর নবাবী বাংলায় এরূপ ষড়যন্ত্র কোনো অভুতপূর্ব ঘটনাও নয়।[১০] এ বিষয়েও সকলেই এক মত যে, চরিত্রগত দিক থেকে অন্যান্য ষড়যন্ত্রের মতো এটিও ছিল একটি রাজকীয় ষড়যন্ত্র। পূর্ববর্তী ষড়যন্ত্রসমূহে সাথে যেমন তৎকালীন বাংলার সাধারণ জন-জীবনের নুন্যতম অংশগ্রহণ বা সম্পর্ক ছিল না, তেমনি পলাশির ক্ষেত্রেও। বস্তুত পলাশি পূর্ব প্রতিটি ঘটনা যেমন তৎকালীন অভিজাত কায়েমী স্বার্থবাদীদের কলকাঠির আন্দোলন ছিল, তেমনি পলাশির ঘটনাও। তবে পূর্ববর্তী ঘটানাবলী সাথে এর একটি বড় তফাৎ হলো এতে মুর্শিদাবাদের তৎকালীন ক্ষমতাবান, ক্ষমতালিপ্সু অভিজাত শ্রেণীর পাশে ইংরেজদের বিশেষ ভূমিকায় দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে দেশীয় অভিজাতগোষ্ঠী না ইংরেজদের ভূমিকা মূখ্য- সে বিষয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে সুস্পষ্ট বিতর্ক রয়েছে। পলাশির ঘটনায় সমকালীন বাংলার অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা বিচার-বিশ্লেষণই আলোচ্য অধ্যায়ের মূল উদেশ্য, তবে প্রাসঙ্গিক কারণেই এতে ইংরেজদের ভূমিকা বিষয়ে সংক্ষেপে হলেও কিছু আলোকপাত জরুরি।

সমকালীন ইংরেজ ঐতিহাসিক রচনা এবং ফারসি তথ্য উৎসের কথা বাদ দিলেও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক রচনা, এমনকি সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত কোনো কোনো রচনায়[১১] পলাশির ঘটনাকে একটি রাজকীয় ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে এতে বাংলার তৎকালীন অভিজাত চক্রকে মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত করার জোরালো প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ সব রচনার মূলসুর হচ্ছে পলাশির ষড়যন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশে ইংরেজদের কোনো ভূমিকা ছিল না। তাদের মতে, ইংরেজদের

এসব রচনায় তথ্যের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে ভাবাবেগ প্রাধান্য পেয়েছে। ব্রিজেন কে গুপ্ত এবং সুশীল চৌধুরী প্রমুখ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আর্কইভসে রক্ষিত তথ্য বিচার করে পলাশি এবং সিরাজ-উদ-দৌলাহর মুল্যায়ন করেছেন। ফলে তাদের রচনাসমূহের বস্তনিষ্ঠতা ও প্রামাণিক মূল্য অনেক বেশী। প্রসঙ্গত রজকান্ত রায়ের (*পলাশির ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, কলকাতা, ১৯৯৪) কথাও উল্লেখ করতে হয়। পলাশি সম্পর্কে তাঁর গবেষণা নিঃসন্দেহে মূল্যবান, করে সিরাজ চরিত্র মুল্যায়নে তিনি সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে ওঠতে পারেন নি।

[৮] এ প্রসঙ্গে সুশীল চৌধুরী ও বি কে গুপ্ত প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। সুশীল চৌধুরী বর্ণিত উৎসসমূহ ব্যবহার করে পলাশি সম্পর্কে বেশ কিছু মুল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি প্রণয়ণ করেছেন।

[৯] শুধু ভারতীয় নয় বরং অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিকও পলাশির যুদ্ধকে ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধের অভিনয় হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে রবার্ট ওর্ম (*Military Transactions in India*, pp. 35-37), উইলিয়াম বোল্টস (*Considerations*, p.40) এবং সি বি ম্যালিসন (*The Decisive Battles in India*, p.73) প্রমুখের কথা বলা যায়।

[১০] ইতোপূর্বে এরূপ ষড়যন্ত্র আরো দু তিনবার ঘটেছিল। প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৭২৭ সালে নবাব মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যুর পর সিংহাসন দখলকে কেন্দ্র করে সুজাউদ্দিন খান ও সরফরাজ খানের মধ্যকার লড়াইয়ের সময়। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৭৩৯/৪০ সালে নবাব সরফরাজ খানকে মসনদ থেকে উৎখাতের সময় এবং তৃতীয় ঘটনাটি ১৭৫৬ সালে সিরাজ-উদ-দৌলাহর সিংহাসনে আরোহনের সময়কার।

[১১] S. C Hill থেকে শুরু করে অধুনা P J Marshal, C A Bayly, Atul Chandra Roy এবং রজতকান্ত রায়ের (১৯৯৪) প্রমুখের রচনার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিজয় একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র, এর পেছনে তাদের কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল না। মুর্শিদাবাদ দরবারের অন্তর্দ্বন্দ্বই অনিবার্যভাবে ইংরেজদের বাংলার রাজনীতিতে টেনে এনেছিল।[১২] এ বক্তব্যের সমর্থক ইতিহাসবিদগণ বলতে চান যে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ্ এমনই দুশ্চরিত্র, দুর্বিনীত ও নিষ্ঠুর ছিলেন যে, তাতে কেবল রাজ্যের অভিজাতবর্গই নয়, সাধারণ মানুষও তাঁর প্রতি বিরূপ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেছিল। এমতাবস্থায় মুর্শিদাবাদের অভিজাত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁকে অপসারণ করতে বদ্ধপরিকর হয় এবং এ কাজ সহজ করতে তারা ইংরেজদের সামরিক সহায়তা পাওয়ার আশায় তাদের ডেকে আনে।[১৩]

দরাবের অমাত্য অভিজাত শ্রেণীর একটা বড় অংশ সিরাজ-উদ-দৌল্লাহর প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং সিরাজকে উৎখাত করার জন্য তারা তাঁর বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন- এটি ঐতিহাসিক সত্য। তবে উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রে পলাশির ঘটনায় ইংরেজদের সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে যে মতামত এবং তাদের দায়মুক্ত করার যে প্রয়াস লক্ষণীয় একে কোনোভাবেই বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক অভিমত হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। সম্প্রতি সুশীল চৌধুরী (২০০৪) পলাশির ষড়যন্ত্র ও বিপ্লবে এ দেশীয় অমাত্য অভিজাত নয়, বরং ইংরেজদের ভূমিকাই মূখ্য ছিল বলে একটি যুক্তি-তর্কভিত্তিক জোরালো মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, পলাশি বিপ্লব সাধনে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তাতে ইংরেজরাই ছিল মূল ষড়যন্ত্রকারী। ইংরেজরা পরিকল্পিতভাবেই এ কাজ সম্পন্ন করে এবং নানা প্রলোভন ও প্রচ্ছন্নভাবে ভয় দেখিয়ে মুর্শিদাবাদ দরবারের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে তাদের পরিকল্পনায় সামিল করে।[১৪] ফরাসি সেনাপতি মঁসিয়ে জ্যাঁ ল তাঁর স্মৃতি কথায় ইংরেজরা কিভাবে দরবারের অভিজাতবর্গের একটি বড় অংশকে উৎকোচের মাধ্যমে হাত করেছিলো, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। কার্ল মার্কস ও ইংরেজদের সম্পর্কে প্রায় একই রকমের মত পোষণ করেন।[১৫] সার্বিক দিক বিবেচনা করে সুশীল চৌধুরী যে মন্তব্য করেছেন, তা হলো- ইংরেজদের নেতৃত্বেই পলাশির চক্রান্ত পূর্ণ অবয়ব পেয়েছিলো এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এ ষড়যন্ত্র পূর্ণরূপ নিয়ে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর পতন ঘটাতে পারতো না।[১৬]

---

[১২] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন* (বাং অনুঃ), পৃ.পৃ. ৪৮২-৪৮৪; গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন* (বাং অনুঃ), পৃ.২২৬; শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র রায়, *ক্ষিতীশ বংশাবলী*, পৃ.পৃ. ১১২-১১৪; P J Marshal, *Bengal- The British Bridgehead,* Cambridge University Press, London, 1987, p. 91; C A Bayly, *Indian Society and the Making of the British Empire,* Cambridge University Press, London, 1987, p. 50; Atul chandra Roy, *The Career of Mir Jafar al Khan,* Das Gupta & CO. Lit. Calcutta, 1953 এবং রজতকান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ.পৃ. ১২, ১৬ মণি ঘোষাল, *পলাশির যুদ্ধ*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৭

[১৩] সুশীল চৌধুরী, *পলাশির অজানা কাহিনী*, পৃ. ৯

[১৪] সুশীল চৌধুরী, *পলাশির অজানা কাহিনী*, পৃ.পৃ. ১১, ৮৫, *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757,* p. 87

[১৫] কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, *প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ*, প্রগতী প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১, পৃ.পৃ. ২৪-২৫

[১৬] Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757,* p. 87

Dhaka University Institutional Repository

'দেশীয় অভিজাত নয়, ইংরেজরাই পলাশির মূল ষড়যন্ত্রকারী'- সুশীল চৌধুরীর এ বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত না হয়েও বলা যেতে পারে যে, বাংলার স্থানীয় অভিজাতচক্রের আমন্ত্রণে আকস্মিকভাবে নয়, বরং স্ব উদ্যোগে ভেবেচিন্তেই ইংরেজরা পলাশির ষড়যন্ত্র ও বিপ্লবে যুক্ত হয়েছিল। রজকান্ত রায় (১৯৯৪) মাদ্রাজ কাউন্সিলের পত্র নির্দেশ, পলাশি পূর্ব ক্লাইভ-ওয়াটসনের জল্পনা-কল্পনা বিচার বিশ্লেষণ করে বলতে চান যে, রাজ্য বিস্তারের চিন্তায় তখনো কোনো ইংরেজ মস্তিস্ক উত্তেজিত হয়ে ওঠেনি। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যাপারে মাদ্রাজ কাউন্সিলের পত্র নির্দেশ ছিল খুবই স্পষ্ট। এতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ইংরেজ রাজ প্রতিষ্ঠার কোনো ইঙ্গিত ছিল না। রায় আরো বলেন, যেহেতু তখন পর্যন্ত কোম্পানির বাংলা অভিযানের পুরো খরচই মাদ্রাজ কাউন্সিল বহন করতো, তাই মাদ্রাজ কাউন্সিলের নির্দেশনা তাদের জন্য শিরোধার্য ছিল।[১৭] কোম্পানি কর্তৃপক্ষের এরূপ মনোভাবের কারণ নির্ণয় করাও দুস্বাধ্য বিষয় নয়। বস্তুত বণিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুনাফা অর্জন কোম্পানির প্রথম লক্ষ্য হওয়ায় যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে তারা রাজ্য জয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। কেননা এতে কোম্পানির ব্যয় বৃদ্ধি এবং তাদের মুনাফা কমে যাওয়ার ঝুঁকি ছিল। তবে প্রশ্ন থাকে যে, যদি রাজ্য জয় ব্যয়বহুল না হয় অথবা যদি অল্প খরচে বা বিনা ব্যয়ে রাজ্য জয় সম্ভব হয়, তবে তাতে কী কোম্পানির পরিচালক সমিতির রাজ্য জয়ে আপত্তি ছিল? অবশ্যই না। তাছাড়া মাদ্রাজ কাউন্সিল বা লন্ডনের পরিচালক সমিতির সকল নির্দেশনা যে বাংলায় কোম্পানি কর্মকর্তারা সবসময় যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি এরও অনেক প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া বাংলা বিজয় বাসনার সদর্প ঘোষণা কোম্পানি কর্মকর্তাদের কারো কারো মুখে পলাশির ঘটনার বেশ আগে থেকে শুনা যাচ্ছিল।[১৮] কেউ কেউ মনে করেন যে, সতেরো শতকের শেষার্ধে মোম্বাইয়ের গভর্নর জেরাল্ড আঙ্গিয়ার ইংরেজ বাণিজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বলিষ্ঠ ও আক্রমণাত্মক নীতি প্রয়োগের সুপারিশ এবং শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যের (peaceful Trade) পরিবর্তে সশস্ত্র বাণিজ্য (armed trade) নীতি গ্রহণের মধ্যেই ইংরেজদের ভারত বিজয়ের স্বপ্নবীজ লুকায়িত ছিল।[১৯] আঙ্গিয়ার এ প্রস্তাব তখন কোম্পানি কর্তৃপক্ষের মনে ধরায় ভারতে কোম্পানির আগ্রাসী নীতি (Forward Policy) অনুসরণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল বলে সূত্রে জানা যায়। ভারতবর্ষে একটি সুরক্ষিত, স্থায়ী ও বৃহৎ ইংরেজ ডোমিনিয়ন স্থাপনের স্বপ্নের কথা ১৬৮৭ সালে লন্ডনের পরিচালক সমিতি কর্তৃক মাদ্রজ কাউন্সিলের নিকট প্রেরিত একটি নির্দেশনামাতেও দেখা যায়।[২০]

ইংরেজ কোম্পানি কর্মকর্তাদের উপরে বর্ণিত ইচ্ছা তখন হয়তো অলীক কল্পনা বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু অর্ধ শতাব্দী পরই তা বাস্তবরূপ লাভ করে। আঠারো শতকের মধ্যভাগে বঙ্গ-ভারতের বিরাজমান অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোম্পানি

---

[১৭] রজান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, পৃ. ১৬; এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন যে, বঙ্গ-ভারতে রাজ্য বিস্তার বিষয়ে কোম্পানির পরিচালক সমিতি স্পষ্টত কোনো নির্দেশনা দেয় নি। উপরন্তু পরিচালক সমিতির নির্দেশ ছিল বাংলার দরবারের কোনো রাজনৈতিক বিবাদে জড়িয়ে তারা যেন কোম্পানিকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না করে। Court of Directors to Fort William, 25 August, 1752; B K Gupta , *Sirajuddaulah and the East India Company, 1756-1757, p. 37*

[১৮] Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757*, p. 67

[১৯] সুশীল চৌধুরী, *পলাশির অজানা কাহিনী*, পৃ. ৬৪

[২০] ঐ, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

কর্তাগণ প্রকাশ্যেই বাংলা বিজয়ের কথা বলতে শুরু করেন। প্রমাণ স্বরূপ কর্নেল মিল এবং রবার্ট ওর্মের বক্তব্যের কথা উল্লেখ করা যায়।[২১] তারা মনে করতেন কোম্পানির পক্ষে বাংলা বিজয় খুবই সহজ হবে। এরূপ বাস্তবতায় ১৭৫১ সালে কলকাতার ইংরেজ কোম্পানির প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল স্কট বাংলা বিজয়ের একটি বিশদ পরিকল্পনাও প্রণয়ণ করে ফেলেন। স্কট মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বাংলা বিজয় কোম্পানির জন্য খুবই লাভজনক হবে। তাঁর মতে, এ বিজয়ের ফলে কেবল কোম্পানির মর্যাদা, সুনাম ও খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে না, কোম্পানির বিপুল পরিমাণ ঋণ পরিশোধেরও ব্যবস্থা হবে।[২২] স্কটসহ পূর্বসূরী ইংরেজ কর্মকর্তাদের বাংলা বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনা নিশ্চয়ই ক্লাইভ ও সমকালীন ইংরেজ কর্মকর্তাদের অজানা ছিল না। তাই পলাশির প্রাক্কালে ইংরেজদের বাংলা বিজয়ের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে পূর্বসূরীদের দ্বারা অনুপাণীত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ইংরেজদের বাংলা বিজয় কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, বাংলার অভ্যন্তরীণ সংকটের কারণে তারা হঠাৎ করে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহকে উৎখাতে দেশীয় অভিজাতদের সাথে হাত মেলায়নি। বস্তুত এটি ছিল ইংরেজদের একটি সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে লন্ডনের পরিচালক সমিতির সুস্পষ্ট নীতি-নির্দেশনা না থাকা সত্ত্বেও কোম্পানির কর্মকর্তাগণ বাংলা বিজয়ের ব্যাপারে এত উৎসুক হয়ে ওঠল কেন? নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ কী কোম্পানির বাণিজ্য বিস্তারের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন? সিরাজ কী এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন? পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা গেছে যে, সিরাজ এর কোনোটাই করতে চান নি। তবে কেন ইংরেজদের সিরাজ বিরোধিতা বা বাংলা বিজয়ের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা? সম্প্রতি গবেষকদের কেউ কেউ স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, ইংরেজদের বাংলা বিজয় পরিকল্পনার মূলে কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ অপেক্ষা কোম্পানি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থেই ইংরেজদের বাংলা বিজয় অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।[২৩] জানা যায় যে, উচ্চ বেতন-ভাতা প্রাপ্তির জন্য নয়, বরং কোম্পানি কর্মচারীরা সুদূর ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসতেন ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে অল্প সময়ে প্রচুর ধনোপার্জনের লক্ষ্য নিয়ে। প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে যে, আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকে তৃতীয় দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজ কোম্পানি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বর্ণযুগ ছিল। কিন্তু চল্লিশের দশক হতে ফরাসি ও আর্মেনীয় বণিকদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় ইংরেজ কোম্পানি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় কোম্পানি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের সংকটাপন্ন ব্যক্তিগত বাণিজ্য-স্বার্থ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বাংলা জয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা কোম্পানির এবং বিশেষ করে নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক স্বার্থোদ্ধারের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল বাংলা থেকে ফরাসিদের বিতাড়ন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ বাধ সাধেন। ফরাসিদের ব্যাপারে নবাবের মনোভাব ইংরেজদের রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল।

---

[২১] B K Gupta , *Sirajuddaulah,*, p p. 35-36

[২২] Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757,* p. 70

[২৩] Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empir,* p. 80

Dhaka University Institutional Repository

তদুপরি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহই প্রথমবারের মতো কোম্পানি কর্মচারিদের ব্যক্তিগত বে-আইনী ব্যবসা-বাণিজ্য ও দস্ত-কের যথেচ্ছ অপব্যবহার রোধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেন। নবাবের এরূপ অবস্থানের কারণেই ইংরেজ কোম্পানি কর্মকর্তাগণ তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পরিকল্পনা করে এবং পরিকল্পনা বাস্তাবায়নের জন্য একটি সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রের জাল বুনে। উইলিয়াম ওয়াটস, লিউক স্ক্রাফটন ও রবার্ট ক্লাইভ প্রমুখ কোম্পানি কর্মকর্তাগণ সিরাজ বিরোধী দেশীয় অভিজাত অমাত্য, বণিক ও ভূস্বামীদের সাথে হাত মিলিয়ে পলাশির বিপ্লব সফল করেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এক কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, পলাশির পটভূমিতে সিরাজ বিরোধী চক্রান্তের উদ্ভব ও বিকাশে ইংরেজদের কোনো ভূমিকা ছিল না, সিরাজ বিরোধী দেশীয় অভিজাত চক্রের অনুরোধে ইংরেজরা এতে সামিল হয়েছিলেন- এরূপ বক্তব্য মোটেই ইতিহাস সম্মত নয়। বস্তুত ইংরেজরা ভেবে চিন্তে সুপরিকল্পিতভাবেই এত সামিল হয়েছিলেন। পরবর্তী আলোচনায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

৮.৫ পলাশি ও অভিজাত শ্রেণী

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পলাশির বিপ্লবে নবাবী বাংলার অভিজাতদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সমসাময়িক ফারসি তথ্য-উৎসে নবাবী বাংলার সরকার ও রাজনীতিতে সক্রিয় কিছু সংখ্যক রাজপুরষ অমাত্য অভিজাতদের সংশ্লিষ্টতার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে লক্ষ করার বিষয় হলো *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ*সহ অন্য কোনো ফারসি সূত্রে পলাশির ঘটনায় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী অমাত্য অভিজাতদের কোনো পূর্ণাঙ্গ তালিকা নেই। কোনো কোনো সূত্রে এমন ব্যক্তির নামও যুক্ত রয়েছে যারা এ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।[২৪] যা'হোক ফারসি সূত্রসমূহে পলাশি বিপ্লবে সক্রিয় যে সকল অভিজাতের নাম পাওয়া যায়, তারা হলেন- মীর জাফর আলী খান, রাজা দুর্লভ রাম, রহিম খান, বাহাদুর আলী খান, আমীর বেগ, খোদাদাদ খান ইয়ার লতিফ ও খাদেম হোসেন খান প্রমুখ। এরা সকলেই ছিলেন নাবব সরকারের অভিজাত অমাত্য। সন্দেহ নেই পলাশির ষড়যন্ত্রে অমাত্য অভিজাতগণ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন, তবে এতে সমকালীন বাংলায় মুৎসুদ্দি, বেনিয়া-বণিক মহাজনদের নিয়ে যে প্রভাবশালী আর্থিক ব্যারণগোষ্ঠী বিকশিত হয়েছিল তাদের এবং ভূ-অভিজাতদের কারো কারো যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সমকালীন ফারসি সুত্রসমূহে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কোনো কোনো সুত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে বণিকরাজ জগৎশেঠ ও খোজা ওয়াজিদের নাম দু একবার উল্লেখিত হলেও এ সব তথ্য পাঠে পলাশির উদ্ভব ও বিকাশের তাদের ভূমিকার যথার্থতা নিরূপণ করা দুষ্কর। অবশ্য সমকালীন ইউরোপীয় তথ্যসূত্রে বণিক অভিজাতদের পলাশির ঘটনায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। ইংরেজদের কিছু নথিপত্রে ভূ-স্বামী

[২৪] উদাহরণ স্বরূপ রাজা রামনারায়ণের কথা বলা যেতে পারে। তিনি বিহারের নায়েব নাজিম ছিলেন। রাজা রামনারায়ণ আগাগোড়াই সিরাজ-উদ-দৌলাহর প্রতি অনুগত ছিলেন এবং পলাশি ষড়যন্ত্রে আদৌ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। কিন্তু অনেক সূত্রে তাঁকে বিপ্লবে সংশ্লিষ্ট চক্রান্তকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কার্ত্তিক চন্দ্রের *ক্ষিতীশ বংশাবলীতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিরাজকে উৎখাত করার চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ণের জন্য জগৎশেঠের গৃহে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণাসভায় রাজা রামনারয়ণ উপস্থিত ছিলেন। পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাতদের ভূমিকা বিষয়ে অল্প পরিমাণ কিছু তথ্য রয়েছে। তবে এ সব বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে পলাশির ঘটনায় ভূ অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা দুষ্কর। পণ্ডিত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম* (১৮০৫), কবি নবীনচন্দ্র সেনের *পলাশি যুদ্ধ* (১৮৭৫) এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের *রাজাবলী* (১৮৮৫) সহ বাংলা সাহিত্যের কিছু সূত্রে পলাশির বর্ণবহুল চিত্র পাওয়া যায়। বর্ণিত এ সব গ্রন্থের মধ্যে রাজীবলোচনের গ্রন্থটিই সবচেয়ে তথ্যবহুল। এ গ্রন্থে রাজীবলোচন পলাশি বিপ্লবে নদীয়া জমিদার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সক্রিয় সংশ্লিষ্টতার কথা বলেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র ছাড়াও বর্ধমান রাজ তিলকচন্দ্র, বীরভূমের জমিদার আসাদ-আল-জামান খান, বিষ্ণুপুরের জমিদার চৈতন্য সিংহ ও মেদিনীপুরের জমিদারের পলাশি বিপ্লবে অংশগ্রহণের কথা রাজীবলোচনের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে।[২৫] এ পর্যায়ে গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে অভিজাত ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকবে।

৮.৫.১ পলাশি ও অমাত্য অভিজাত শ্রেণী

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর রাজত্বকালের চরম ক্রান্তিকালে নবাব সরকারের পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে ইংরেজ কোম্পানি কর্মকর্তা ওয়াটস তাঁর স্মৃতি কথায় নবাবের দরবারে ক্রমবিস্তৃত অন্তর্কলহ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, দরবারের উচ্চপদস্থ অমাত্যগণ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া অন্য কিছুতেই আগ্রহী ছিল না।[২৬] পলাশি ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধেরর অন্যতম কুশীলব ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরুণ কর্মকর্তা লিউক স্ক্রাফটন তার বর্ণনায় টলেমির ফারসালিয়া যুদ্ধে পরাজয়ের পর মিশরের দরবারে যে অবস্থা তৈরি হয়েছিল তার সাথে সিরাজ-উদ-দৌলাহর দরবারের তুলনা করেছেন। তিনি দরবারে উচ্চপদস্থ থেকে নিম্নপদস্থ সকল পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২৭] সমকালীন ফারসি তথ্য সূত্রসমূহেও মুর্শিদাবাদ দরবারের অসন্তোষের চাপা আগুনের কথা বর্ণিত হয়েছে। সুশীল চৌধুরীর মতে চাপা অসন্তোষ থাকলেও ১৭৫৭ সালের এপ্রিল মাসের পূর্বে পলাশির চক্রান্ত দানা বাঁধেনি।[২৮] পলাশির প্রেক্ষাপট তখনো পূর্ণ অবয়ব না লাভ করলেও সিরাজের বিরুদ্ধে অভিজাতদের ষড়যন্ত্র, এমনকি তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টা যে এর আগ থেকেই শুরু হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। *সিয়ার-উল মুতাখ্খিরিন* গ্রন্থে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।[২৯] সিরাজের বিরুদ্ধে পুর্ণিয়ার শওকত জঙকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা সিরাজ বিরোধীদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রেরই অংশ ছিল। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্রে মীর জাফর একা ছিলেন না, তাঁর সাথে নবাব সরকারের কয়েকজন প্রভাবশালী সামরিক অভিজাতও ছিলেন বলে সূত্রে উল্লেখ। ফরাসি সেনাধ্যক্ষ মসিয়েঁ জ্যাঁ ল উল্লেখ করেছেন, ১৭৫৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সিরাজ কর্তৃক শওকত জঙের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের পূর্বেই সিরাজের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ দরবারে একটি ষড়যন্ত্র হয়েছিল। মীর জাফরসহ সামরিক গোষ্ঠীর কয়েকজন অভিজাত

[২৫] রাজীব লোচন, *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম*, বজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত দুস্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী-২, কলকাতা, ১৩৪৩, পৃ. ২৫-৩২

[২৬] William Watts, *Memoirs,* p. 74

[২৭] Letter of Scrafton to Walsh, 9 April, 1757, cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. III. p. 342

[২৮] সুশীল চৌধুরী, *পলাশির অজানা কাহিনী*, পৃ. ৮৯

[২৯] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪৫

এতে জড়িত ছিলেন। জ্যাঁ ল মনে করেন বিহারের নায়েব নাজিম রাজা রাম নারায়ণ এতে যোগ না দেয়ায় তখন ষড়যন্ত্রটি ভেস্তে গিয়েছিল।[৩০] অবশ্য রজতকান্ত রায় (১৯৯৪) মনে করে যে, শওকত জঙের নির্বুদ্ধিতার কারণেই তখন পুর্ণিয়াকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের ষড়যন্ত্র দানা বাঁধেনি।[৩১] ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে দেয়া ইংরেজ কোম্পানির মাদ্রাজ কাউন্সিলের ১৩ অক্টোবর ১৭৫৬ সালের নির্দেশনায়ও নবাবের বিরুদ্ধে অমাত্য অভিজাতবর্গের অসন্তোষের প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত নির্দেশনায় বাংলার নবাবের প্রতি বিক্ষুব্ধ এবং নবাব হওয়ার মতো উচ্চভিলাসী অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীর সাথে আঁতাত স্থাপনের চেষ্টা করতে বলা হয়েছিল।[৩২]

পলাশির ঘটনায় নবাব সরকারের অমাত্য অভিজাতদের অধিকাংশই সিরাজ বিরোধী গ্রুপে ছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে সিরাজ বিরোধী গ্রুপে সক্রিয় হিসেবে নবাব সরকারের প্রধান বখশি মীর জাফর আলী খান, সমর অভিজাত খোদাদাদ খান ইয়ার লতিফ, রাজা দুর্লভরাম, রাজা রাজবল্লভ, আমীর বেগ, বাহাদুর আলী খান, নন্দকুমার ও খাদেম হোসেন খান প্রমুখ অমাত্য অভিজাতের নাম পাওয়া যায়। তবে সংখ্যায় কম হলেও কয়েকজন বিশ্বস্ত অমাত্য অভিজাতও ছিলেন-যারা পলাশি বিপ্লব প্রতিহত করে নবাব এবং বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন।

সিরাজকে উৎখাত করার জন্য চূড়ান্ত ষড়যন্ত্র ১৭৫৭ সালের এপ্রিল মাসেই শুরু হয়ে যায়। এ সময় ক্লাইভ তার সতীর্থ দুজন কর্মকতাকে লেখা দুটো পৃথক চিঠিতে বাংলায় খুব শীঘ্রই বড় একটি বিপ্লব ও রাজনৈতিক পালা বদল ঘটবে বলে জানান। মাদ্রাজের গভর্নর পিগটকে লেখা চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, দরবারে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে আসন্ন রাজনৈতিক বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী হিসেবে বণিক অভিজাত জগৎশেঠ ও খোজা ওয়াজিদের নাম উল্লেখ করেছেন।[৩৩] লক্ষ করার বিষয় যে, ক্লাইভের চিঠিতে মীর জাফরের কথা বলা হয়নি। অথচ পলাশি বিপ্লবে দেশীয় অমাত্য অভিজাতদের মধ্যে মীর জাফর সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র। সাধারণ জন মানুষতো বটেই অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতবর্গ মীর জাফরকে পলাশি বিপ্লবের আসল নায়ক বলে মনে করেন। *সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিন*, *রিয়াজ-উস-সালতিন*, *মোজাফ্‌ফরনামা* এবং *তারিখ-ই-মনসুরী* ইত্যাদি সমসাময়িক গ্রন্থ এবং পরবর্তীকালে এস সি হিল (১৯০৫), পি জে মার্শাল (১৯৮৮) ও বি কে গুপ্তা (১৯৬৬) এবং অতুল চন্দ্র রায় (১৯৩৯) প্রমুখ রচিত গ্রন্থসমূহ[৩৪] পাঠে এরূপই মনে হয়। পলাশি বিষয়ে রচিত বাংলা সাহিত্য উৎসসমূহেও দেশদ্রোহী ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে মীর জাফরের স্থান সুবিদিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন বাংলার মসনদ দখল মীর জাফর আলী খানের মূল

---

[৩০] Law's, *Memoir,* cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. III. pp. 173-174

[৩১] রজান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, পৃ. ১৪০

[৩২] Cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. I, pp. 239-240

[৩৩] Clive to Pigot 30 April, 1757, cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II. pp. 368-369

[৩৪] S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. I, II & III, ; P J Marshal, *Bengal- The British Bridgehead,* Brijen K Gupta, *Sirajuddaulah and the East India Company, 1756-1757,* Atul Chandra Roy, *The Career of Mir Jafar al Khan*

লক্ষ্য ছিল। অতুল চন্দ্র রায়ের ভাষ্য মতে, শওকত জঙ নিহত হওয়ার পর মসনদ দখলের একমাত্র বাধা সিরাজ-উদ-দৌলাহকে সরাতে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এজন্য তিনি সিরাজের প্রধান শক্তিধর প্রতিপক্ষ ইংরেজদের সাথে নতুন যোগসাজসে লিপ্ত হন। রায় আরো উল্লেখ করেন যে, মীর জাফর নবাব দরবারের ক্ষুব্ধ ও নবাবের অবজ্ঞার শিকার পুরাতন অভিজাতবর্গের সিরাজ বিরোধী মানসিকতার সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেন এবং তাদের একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজের অধীনে সংঘবদ্ধ করেন। তিনি পুরাতন অভিজাতদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে চতুরতার আশ্রয় নেন এবং তাদেরকে এই মর্মে দিক-নির্দেশনা দেন যে, বাংলার নবাবী ক্ষমতার হাত বদল হলে তাদের সকলেরই মঙ্গল ও অধিক লাভালাভের সম্ভাবনা। মীর জাফরের এই চাতুর্যপূর্ণ প্রয়াসের মাধ্যমে দরবারস্থ প্রভাবশালী অমাত্য এমনকি ইংরেজদেরও সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছিলন বলে রায় উল্লেখ করেন।[৩৫] ইংরেজদের সাথে শেষ মূহুর্তের চুক্তি এবং সিরাজ-উদ-দৌলাহকে উৎখাত করে মীর জাফরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলেই সম্ভবত মীর জাফরকে দেশীয় চক্রের মূল হোতা হিসেবে ইতিহাসবিদগণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য যে, মীর জাফর পলাশি চক্রান্তে সংশ্লিষ্ট দেশীয় অমাত্য অভিজাতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তবে তাঁকে পলাশি চক্রান্ত ও বিপ্লবের আসল নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করার মতো যথেষ্ট যুক্তি ও ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ রয়েছে। প্রায় সকল ঐতিহাসিক সূত্রেই দেখা যায় যে, ইংরেজরা সিরাজ-উদ-দৌলাহর স্থলে প্রথমে ইয়ার লতিফ খানকে বাংলার মসনদে বসাতে চেয়েছিলেন। ইয়ার লতিফের ব্যাপারে ইংরেজদের প্রথম দিককার এ আগ্রহের কারণ ছিল তার প্রতি বণিকরাজ জগৎশেঠের আর্শিবাদ ও সমর্থন। কিন্তু ইংরেজরা পরবর্তীতে ইয়ার লতিফের পরিবর্তে মীর জাফরকে নির্বাচন করে। কারণ ইতোমধ্যে বাংলার ভাবী নবাব হিসেবে জগৎশেঠ ইয়ার লতিফের পরিবর্তে মীর জাফরকে দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আর এ জন্যই ইংরেজরাও ইয়ার লতিফের পরিবর্তে মীর জাফরকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনে শিখণ্ডী হিসেবে ব্যবহারের জন্য মনোনীত করে। কারণ বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির সার্বিক মূল্যায়নে ইংরেজদের ধারণা হয়েছিল যে, জগৎশেঠদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া বাংলায় কোনো রাজনৈতিক বিপ্লব বা পালাবদল সম্ভব নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মীর জাফর পলাশির বিপ্লবে সামনের কাতারে এসেছেন শেঠদের ইচ্ছায়। শেঠদের সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্যই ইংরেজরাও তাঁকে সিরাজ-উদ-দৌলাহর স্থলে নবাব হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন।

তারিখ-ই বাঙ্গালা-ই মহাবতজঙ্গী গ্রন্থে পলাশি চক্রান্তে মীর জাফরের সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হয়েছে, তবে এতে তাঁকে প্রধান হোতা হিসেবে দেখানো হয় নি।[৩৬] এ প্রসঙ্গে জ্যাঁ ল'র অভিমতও একই রকমের। তিনিও পলাশির ঘটনায় মীর জাফর আসল নায়ক ছিলেন বলে মনে করেন না। ল'র মতে এ ব্যাপারে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে প্ররোচিত করে। প্রথম পর্যায়ে মীর জাফর জগৎশেঠের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেও সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ থাকায় শেঠ ভাইদের ক্রমাগত প্রস্তাবে

[৩৫] Atul Chandra Roy, *op. cit.*,pp.18-19, 23

[৩৬] ইউসুফ আলী খান, *তারিখ-ই বাঙ্গালা-ই মহাবতজঙ্গী* (বাংলা অনুঃ), পৃ. ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

তিনি শেষপর্যন্ত এ ষড়যন্ত্রে যুক্ত হন এবং নবাবী পদ গ্রহণে সম্মতি দেন।[৩৭] ল'র এ অভিমত সর্বাংশে সত্য বলে মনে হয় না। বাংলার নবাব হওয়ার উচ্চাশা তাঁর মাথায় সবসময়ই ছিল। তবে শওকত জঙ নিহত হওয়ার পর তিনি এ ব্যাপারে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। তাঁর এ সতর্ক পদক্ষেপ সম্পর্কে ইংরজদের বিরণীতেও স্থান পেয়েছে। সুত্রে প্রকাশ ক্লাইভ যখন মুর্শিদাবাদ অভিযান শুরু করেন তখনো ইংরেজরা মীর জাফরের কাছ থেকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের নির্দেশনা তিনি পাননি। ১৯ জুন ১৭৫৭ সালে রবার্ট ক্লাইভ সিলেক্ট কমিটিকে লেখা চিঠিতে মীর জাফরের কাছ থেকে সহযোগিতার কোনো রকমের স্পষ্ট সংকেত না পাওয়ায় তাঁর উদ্বেগের কথা জানান। মীর জাফর যেন সেনাবাহিনী নিয়ে ইংরেজদের সাথে যোগ দেন তা নিশ্চিত করতে শেষ চেষ্টা করছেন বলেও ক্লাইভ সিলেক্ট কমিটিকে লিখে জানান।[৩৮] উদ্বিগ্ন ক্লাইভ একই তারিখে মীর জাফরকে লেখা এক চিঠিতে তাদের উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি 'খুব একটা গা করছেন না' বলে অভিযোগ করেন। চিঠিতে মীর জাফরকে সত্বর তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার ব্যাপারে অনুরোধ করা হয়।[৩৯] পলাশি বিপ্লবের মাত্র দুদিন আগে ২১ জুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধ বিষয়ক কাউন্সিলের যে সভা হয়, তাতেও মীর জাফরের কাছ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সিরাজকে উৎখাতের জন্য বিকল্প হিসেবে প্রয়োজনে মারাঠাদের সাথে মৈত্রী স্থাপনের সম্ভাব্যতার বিষয়ে চিন্তা করা হয়েছিল।[৪০] ২২ জুন পলাশি অভিমুখে যাত্রার প্রক্কালে উদ্বেগাকুল ক্লাইভ মীর জাফরকে একটি পত্রে আবারো লিখেন যে, তিনি মীর জাফরের জন্য সবকিছু করতে স্থির প্রতিজ্ঞ হলেও মীর জাফর নিজে কিছুই করছেন না। পত্রে মীর জাফর ইংরেজদের সাথে যোগ দিলে বাংলা বিহারের নবাব পদ দানের প্রলোভন পুনর্ব্যক্ত করার পাশাপাশি যোগ না দিলে তার পরিণতি সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ভীতিও প্রদর্শন করা হয়েছিল।[৪১] ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বর্ণিত এসব তথ্যাদির আলোকে বলা যায় যে, ইংরেজরা সিরাজ-উদ-দৌলাহকে হটানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠলেও মীর জাফর কিন্তু এ ব্যাপারে তখনো পুরামাত্রায় তৎপরতা দেখাননি। তার মানে এই নয় যে, মীর জাফর সিরাজের উৎখাত কামনা করেননি এবং এ সম্পর্কিত পরিকল্পনার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন না। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে পুরোপুরি উন্মোচিত না করে বেড়ার ধারে অপেক্ষা করা এবং যে দল শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে তার সাথে যোগ দিয়ে সুবিধা ভোগ করা। এই যার উদ্দেশ্য এবং অবস্থান পলাশির ঘটনায় তাঁকে আসল নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করার কোনো সুযোগ আছে কী?

---

[৩৭] Law's, *Memoir,* pp. 163-164; Atul Chandra Roy, *op. cit.* pp. 25, 27

[৩৮] Letter from Clive to the Select Committee, 19 June, 1757, cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, pp.417-418

[৩৯] Letter from Clive to Mir Jafar, Committee, 19 June, 1757, cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, p. 414

[৪০] S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. III, p. 54

[৪১] Letter from Clive to Mir Jafar, 22 June, 1757, cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, pp. 420-421

Dhaka University Institutional Repository

উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যাদির পর্যালোচনার আলোকে বলা যায় যে, পলাশির ষড়যন্ত্রে মীর জাফর আসল নায়ক ছিলেন না, তবে এতে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। বস্তুত আগাগোড়া মীর জাফর ছিলেন একজন ক্ষমতালোভী মানুষ। নবাব সরকারের শীর্ষ পদে আরোহন করার উদগ্র বাসনা তাঁর মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল। সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব এবং সিরাজের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারের মাধ্যমে দরবারে নিজের সমর্থনে অভিজাতদের একটি অংশকে সংগঠিতও করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে ভীরু ও দুর্বলচিত্তের একজন মানুষ হওয়ায় বুদ্ধিমান ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা বা সেনা সমর্থনে ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার মতো সাহস তাঁর ছিল না। তাই তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার পথেই অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সব সময়ই নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের উপর ভরসা করেছেন। বস্তুত সিরাজ-উদ-দৌলাহকে উৎখাতের ব্যাপারে ইংরেজদের সাথে গোপন চুক্তি সম্পাদনের পরও তাঁর দোদুল্যমান অবস্থান তাঁর সুযোগসন্ধানী মানসিকতারই বহিপ্রকাশ।

পলাশি বিপ্লবে সিরাজ বিরোধী দেশীয় অমাত্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইয়ার লতিফ। যদিও পদমর্যাদায় তিনি বিশেষ উচ্চপদাভিসিক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন দুহাজারী মনসব পদাধিকারী একজন সেনাপতি। তবে তিনিও ছিলেন প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ইংরেজরা যখন সিরাজের পরিবর্তে অন্য কাউকে বাংলার নবাব পদে অধিষ্ঠিত করতে মনস্থ করেন, তখন এই উচ্চাভিলাসী অমাত্য ইংরেজ মিত্র বণিক অভিজাত উমিচাঁদের মাধ্যমে নবাবী পদলাভের মনোবাসনার কথা ইংরেজদের জানান। তুলনামুলক নিম্ন পদমর্যাদাধিকারী হওয়ায় ইংরেজরা প্রথমে ইয়ার লতিফকে বিশেষ গুরুত্ব না দিলেও তাঁর সাথে জগৎশেঠদের বিশেষ সখ্য থাকার কারণে ইংরেজরা তাঁর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, নবাবী বাহিনীর সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও ইয়ার লতিফ জগৎশেঠদের অন্নদাস হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন।[৪২] প্রথম পর্যায়ে জগৎশেঠ সিরাজের পরিবর্তে তাঁর বিশ্বস্ত ইয়ার লতিফ খানকে বাংলার মসনদে বসানোর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন বলে সূত্রে প্রকাশ। লিউক স্ক্রাফটন ইয়ার লতিফকে নবাব হওয়ার পক্ষে "যোগ্য লোক" এবং তাঁর পক্ষে জগৎশেঠদর সমর্থন আছে বলে তাঁর বন্ধু ওয়ালশকে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেছেন।[৪৩] এ অবস্থায় শেষপর্যন্ত ইংরেজরার ইয়ার লতিফের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে।[৪৪] এক্ষেত্রে জগৎশেঠের পছন্দের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া ছাড়াও ইংরেজদের প্রত্যক্ষ লাভের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। বস্তুত তাঁকে বাংলার নবাব করা হলে ইংরেজরা যা চাইবে তা অম্লানবদনে তাদেরকে দিতে সম্মতি প্রদান বিষয়ক ইয়ার লতিফের প্রস্তাব ইংরেজদের বিশেষতাবে তাঁর ব্যাপারে প্রলুব্ধ করেছিল।[৪৫]

---

[৪২] ইয়ার লতিফ শেঠ পরিবারের নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। তিনি মাসোহারার বিনিময়ে শেঠদের বাড়ীর দ্বার রক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.১৮৫

[৪৩] Letter from Scrafton to Walsh, 18 April, 1757, cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, p. 343; মৃণাল চক্রবর্তী, *সিরাজ উদ দৌলা*, পৃ.পৃ. ২৮৭-২৮৮

[৪৪] ক্লাইভ ইয়ার লতিফ সম্পর্কে বিশেষ কিছু না জানলেও সিরাজের পরিবর্তে তাঁকে মসনদে বসানোর জন্য কোম্পানির কয়েকজন কর্তাব্যক্তি এবং মুর্শিদাবাদের প্রভাবশালী অভিজাতদের প্রস্তাবটি মেনে নিয়েছিলেন। Letter from Clive to Watts, 26, 28 April, 1757, cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, pp. 362, 366

[৪৫] ইংরেজদের এ প্রাপ্তি চিন্তার বিষয়টি ওয়ালশকে লেখা স্ক্রাফটনের পত্রেও প্রকাশ পেয়েছে। উদ্ধৃতি মৃণাল চক্রবর্তী, *সিরাজ উদ দৌলা*, পৃ. ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

ইয়ার লতিফকে নিয়ে ইংরেজরা যখন অগ্রসর হচ্ছিলেন ঠিক তখনই পলাশি বিপ্লবের আরেক চক্রান্তকারী আর্মেনীয় বণিক খোজা পেত্রসের মাধ্যমে কোম্পানি কর্মকর্তা ওয়াটস জানতে পারেন যে, সিরাজকে উৎখাতের ব্যাপারে নবাব সরকারের প্রধান সেনানায়ক মীর জাফর আলী খান ইংরেজদের সাথে একত্রে কাজ করতে সম্মত আছেন।[৪৬] এ সংবাদে ষড়যন্ত্রের গোটা চিত্রটিই পাল্টে যায়। ইংরেজরা ইয়ার লতিফের মতো চুনোপুটির পরিবর্তে মীর জাফরের মতো রাঘব বোয়ালের প্রতি ঝোঁকে পড়ে। কেননা মুর্শিদাবাদের দরবার ও রাজনীতিতে সিরাজ-উদ-দৌলাহর পরই মীর জাফরের মর্যাদা ও প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। এ অবস্থায় মীর জাফরকে সাথে পাওয়া মানে সাফল্য নিশ্চিত। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইংরেজদের কাছে ব্যক্তির কোনো গুরুত্ব ছিল না, তাদের আসল বিবেচনা ছিল সিরাজকে উৎখাত করা। আর এ উদ্দেশ্য সাধনে যার দ্বারা বেশি উপকার পাওয়া যাবে তারা তাকেই গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এর মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আসল চরিত্রটিও ফুটে ওঠেছে। যা'হোক ইংরেজরা লতিফকে নবাব করার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে মীর জাফরের প্রতি মনযোগী হয়।[৪৭] লতিফকে বাদ দিয়ে মীর জাফরকে গ্রহণ করার পেছনে শেঠদের সমর্থনের বিষয়টিও ইংরেজদের যে প্রভাবিত করেছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। লতিফের পরিবর্তে জগৎশেঠের মীরজাফরকে সমর্থন দানের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক সূত্রে বিশেষ কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা যেতে পারে যে, ইয়ার লতিফ শেঠদেরও একজন বেতনভূখ ব্যক্তি ছিলেন। এমন একজন বাংলার নবাব হয়ে তাদের উপর ছড়ি ঘুরাবেন এটি হয়তো শেঠদের কাছে শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। অন্যদিকে মীর জাফর রাজপরিবারেরই লোক এবং পদমর্যাদা ও ক্ষমতা কাঠামোতে নবাব সরকারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। কাজেই তাঁর প্রতি সমর্থন দানকেই সুবিবেচনার কাজ বলে শেঠরাও মনে করেছিলেন। তাছাড়া মীর জাফরের সাথে তাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। এ সবদিক বিচার বিবেচনা করে ১৭৫৭ সালের ১ মে ইংরেজ কোম্পানির সিলেক্ট কমিটি সিরাজ-উদ-দৌলাহর পর ইয়ার লতিফ নয়, বরং মীরজাফরকে বাংলার নবাব পদাভিসিক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। কোম্পানির এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে ইয়ার লতিফের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সূত্রে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে বিষয়টি মেনে নিয়েছিলে তা ভাববার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নবাব সরকারে ইয়ার লতিফ মাত্র দু হাজার মনসব পদাধিকারী একজন সেনানায়ক ছিলেন। দরবার বা সমকালীন রাজনীতিকে প্রভাবিত করার বা ইংরেজদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বস্তুত জগৎশেঠদের সমর্থনের কারণেই প্রধানত ইংরেজরা তাঁকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শেঠদের সমর্থন বঞ্চিত হওয়ায় তাঁর পক্ষে আর বিশেষ কিছু করার সুযোগ ছিল না। এ অবস্থায় তিনি শেঠদের নির্দেশে মীর জাফরের দলেই যোগদান করে নিজের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে হয়।

পলাশির ষড়যন্ত্রে সিরাজ বিরোধী গ্রুপের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন রাজা দুর্লভরাম- যিনি রায়দুর্লভ নামেই ইতিহাসে অধিক পরিচিত। সুশীল চৌধুরীর (২০০০) মতে, পলাশি বিপ্লবে রায়দুর্লভের ভূমিকা মীর জাফর, জগৎশেঠ ও

---

[৪৬] মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা: সেকালের সমাজ ও রাজনীতি*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০২

[৪৭] ওয়াটস পেত্রসকে দায়িত্ব দেন তিনি যেন মীর জাফরকে ষড়যন্ত্রের বলয়ে টেনে ঢুকানোর ব্যবস্থা করেন। মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৩

Dhaka University Institutional Repository

উমিচাঁদের মতো এত জোরালো বা প্রত্যক্ষ ছিল না। ষড়যন্ত্রের সাথে তাঁর সংযোগ অনেকটাই পরোক্ষ।[৪৮] পলাশি বিপ্লবে রায়দুর্লভের ভূমিকাকে হালকা করে দেখানোর সুশীল চৌধুরীর প্রয়াসটি যথার্থ নয়। সমকালীন ফারসি ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পলাশির ঘটনায় মীর জাফর ও জগৎশেঠদের সাথে রায়দুলর্ভের মিলিত সক্রিয় ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।[৪৯] লিউক স্ক্রাফটনও মীর জাফর এবং রায়দুর্লভের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্কের কথা বলেছেন এবং এ জন্য নবাব তাঁকে সন্দেহ করতেন বলেও উল্লেখ করেছেন।[৫০] রায়দুর্লভের প্রতি নবাবের সন্দেহের বিষয়টি সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ির বর্ণনায় তা স্পষ্ট। তাছাড়া ইংরেজদের সাথে মীর জাফরের গোপন চুক্তিতে রায়দুর্লভ যে শামিল ছিলেন সে কথাও তবাতবায়ির বর্ণনায় স্থান পেয়েছে।[৫১] বাংলার মসনদের উত্তরাধিকার পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে মীর জাফর ও ইংরেজদের মধ্যে গোপন চুক্তিটি রায়দুর্লভের পরামর্শ ও মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হয়েছিল বলে লিউক স্ক্রাফটনও উল্লেখ করেছেন।[৫২] তাছাড়া সিরাজকে উৎখাত বিষয়ে মীর জাফরের চুক্তি সম্পাদনের সময় উমিচাঁদ কর্তৃক রায়দুর্লভের পক্ষে নবাবের সম্পদের হিস্যা দাবি এবং পলাশি বিপ্লব সফল হওয়ার পর নবাব মীর জাফর কর্তৃক রায়দুর্লভকে তাঁর দিউয়ান নিয়োগ ও তাঁকে সমুদয় প্রশাসনিক কার্যব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে নিযুক্তকরণের[৫৩] মধ্যে পলাশি বিপ্লবে রায়দুর্লভের বলিষ্ঠ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত। শুধু রায়দুর্লভ নিজে নন, তাঁর ভাই কুঞ্জবিহারী ও রাসবিহারীকেও যথাক্রমে মুর্শিদাবাদ ও জাহাঙ্গীরনগর নায়েবতীর হিসাবকর্তা পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।[৫৪] পলাশি বিপ্লবে যদি রায়দুর্লভ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করতেন, তাহলে বিপ্লব পরবর্তীকালে তাঁকে প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে ও তাঁর ভাইদের অর্থ দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হতো না। বর্ণিত এসব তথ্য প্রমাণের আলোকে পলাশির ঘটনায় রায়দুর্লভের ভূমিকাকে খাটো বা হালকা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই, বরং বিপ্লবের আয়োজন এবং একে সফল পরিণতি দানে তাঁর ভূমিকা অন্য অনেকের চেয়ে বেশি ছিল বলেই মনে হয়।

নবাবী বাংলার প্রভাবশালী অভিজাত অমাত্যদের মধ্যে রাজবল্লভের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিরাজের রাজত্বকালের শুরুতে তাঁর সাথে রাজবল্লভের বৈরী সম্পর্কের জের হিসেবে নিশ্চিতভাবে তিনি পলাশির ষড়যন্ত্রে সিরাজ বিরোধী গ্রুপের সাথে সামিল হয়েছিলেন বলে অনেকেরই ধারণা।[৫৫] তবে সমসাময়িক কোনো সূত্রেই পলাশি বিপ্লবে রাজবল্লভের সরাসরি অংশ গ্রহণের বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য এ ব্যাপারে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। *ক্ষিতীশ বংশাবলী*

---

[৪৮] সুশীল চৌধুরী তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে জ্যাঁ ল'র কিছু বক্তব্যকে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757*, pp.130-131

[৪৯] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৪৮২, ৪৮৮; করম আলী খান, *মোজাফ্ফরনামা*, (বাংলা অনঃ), পৃ ১২১

[৫০] Luke Scrafton , *Reflections on the Government of Indostan*, London, 1763, p. 82

[৫১] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮৮

[৫২] Luke Scrafton, *A History of Bengal Before and Afterthe Battle of Plassey (1739-1758)*, Calcutta ed. 1975, p.55

[৫৩] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯৮

[৫৪] Atul Chandra Roy, *op. cit.* p. 95

[৫৫] মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র*, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিরাজকে উৎখাত করার চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ণের জন্য জগৎশেঠের গৃহে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণাসভায় রাজবল্লভ উপস্থিত ছিলেন।[৫৬] এ তথ্যটি সম্ভবত সঠিক নয়। কেননা তাঁর জীবনীগ্রন্থ সূত্রে জানা যায় যে, তিনি এ সময় মুর্শিদাবাদেই ছিলেন না। সূত্র মতে, সিরাজের স্থলে মীর জাফরকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে মতের মিল না হওয়ায় তিনি মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে কলকাতায় ইংরেজ সাহচার্যে চলে যান এবং পলাশি যুদ্ধের পূর্বে আর ফিরে আসেননি।[৫৭] এ সত্য স্বীকার করে নিয়েও কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন রাজবল্লভ পলাশি বিপ্লবে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও বিপ্লব সংগঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[৫৮] সরাসরি দৃশ্যপটে না এসে সিরাজ-উদ-দৌলাহর পতন ঘটাতে তিনি কূটপন্থা অবলম্বন করেন। রাজবল্লভের জীবন চরিত রচয়িতা রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, রাজবল্লভ বাংলার রাজনীতিতে এমন একটি নবতর উপাদান সংযোজিত করেন -যা অনতিকালের মধ্যে একটি বিপ্লবের (১৭৫৭ সালের পলাশি বিপ্লব বুঝাতে) শঙ্কার পথ প্রশস্ত করে।[৫৯] বর্ণিত এসব তথ্যসূত্র পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে রাজবল্লভ এ পলাশির ঘটনায় যুক্ত ছিলেন। শ্রী রসিকলাল গুপ্ত উল্লেখ করেছেন, রাজবল্লভ ঘসেটি বেগমের বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। অতএব ঐ মহিলার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যে পলাশি বিপ্লবের সাথে যুক্ত ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।[৬০]

নবাবী প্রশাসনে আমির বেগের অবস্থান কী ছিল সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর পদ-পদবি যাই ছিল না কেন সমকালীন রাজনীতিতে তাঁর অবস্থান যে মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বস্তত তিনি ছিলেন মীর জাফর আলী খানের বিশিষ্ট বন্ধু। ইংরেজদের সাথেও তার বিশেষ জানাশুনা ছিল। সূত্রে প্রকাশ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর কলকাতা অবরোধের সময় আমির বেগ কয়েকজন ইংরেজ মহিলাকে সসম্মানে তাদের পরিবারে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে ইংরেজদের বিশেষ প্রীতিভাজনে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর মাধ্যমে ইংরেজরা মীর জাফরের কাছ থেকে মুর্শিদাবাদ দরবারের অবস্থা এবং সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতেন বলে জানা যায়। নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করতে জগৎশেঠ, মীর জাফর ও রায়দুর্লভ প্রমুখ অভিজাতবর্গ ইংরেজদের সাথে যে গোপন জোটবদ্ধতা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেলেন আমির বেগ এতে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। *সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিন* গ্রন্থের বর্ণনা মতে, আমির বেগ কোম্পানি কর্মকর্তাদের অবহিত করেছিলেন যে, তিনি নিজে এবং অন্যান্য অভিজাত অমাত্যগণ সিরাজ কর্তৃক অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়েছেন এবং এতে অসন্তুষ্ট অমাত্যগণ নবাবকে উৎখাত করার জন্য একটি জোট গঠন দলিল স্বাক্ষর করেছেন। আমির বেগ ইংরেজদের এ দলিলটি প্রদর্শন করে নবাবকে উৎখাতে সহায়তার জন্য অনুরোধ এবং এজন্য

---

[৫৬] শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র, *ক্ষিতিশ বংশাবলী*, পৃ.পৃ. ১১২-১১৪

[৫৭] R. C. Majumdar, *Maharaja Rajballabh*, University of Calcutta, 1947, p. 26

[৫৮] মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৯

[৫৯] R. C. Majumdar, *op. cit.*, p. 26

[৬০] শ্রী রসিকলাল গুপ্ত, *মহারাজা রাজবল্লভ সেন*, সাথী প্রেস, কলিকাতা, পৃ. ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে তিন কোটি টাকাসহ আরো অনেক সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে সিয়ারের উল্লেখ করা হয়েছে।[৬১] সিয়ারের এ বর্ণনা ছাড়া সমকালীন আর কোনে ঐতিহাসিক সূত্রে পলাশি ঘটনায় আমির বেগের প্রত্যক্ষ ভূমিকার বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মীর জাফরের এ ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে এ রকম একটি সময়ে হাত-পা ঘুটিয়ে বসে ছিলেন এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই।

নবাবী বাংলার ইতিহাসে মহারাজ নন্দকুমার এক আলোচিত চরিত্র। পলাশির প্রাক্কালে তিনি হুগলি ভারপ্রাপ্ত ফৌজদার ছিলেন। পলাশি বিপ্লবে তাঁর প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা ও ভূমিকা নির্ণয়ের মতো কোনো ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। শ্রী নিখিলনাথ রায়ের মতে, সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজ এবং দেশীয় অমাত্যদের ষড়যন্ত্রে নন্দকুমার যুক্ত ছিলেন না।[৬২] তবে তিনি যে ইংরেজ মিত্র এবং সিরাজ বিরোধী ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জানা যায় যে, বণিকরাজ উমিচাঁদ নন্দকুমারকে হুগলির স্থায়ী ফৌজদারের পদ দান এবং নগদ অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ইংরেজদের দলে ভিড়িয়েছিলেন। ফলে তিনি নবাবের হুকুম অমান্য করে ফরাসিদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের চন্দননগর দখলে সহায়তা করেন। তাঁর এ অপকর্মের জন্য তিনি নবাব কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। তবে তিনি ইংরেজদের বন্ধুত্ব এবং প্রশংসা পেয়েছিলেন।[৬৩] প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পলাশি ঘটনায় নন্দকুমারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা প্রমাণিত না হলেও এক্ষেত্রে তাঁর পরোক্ষ ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর উৎখাত তথা পলাশি বিপ্লবের অপরিহার্যতা বিধানে ইংরেজদের সিরাজ পক্ষীয় ফরাসিদের বাংলা থেকে বিতাড়নের প্রয়োজন ছিল। নন্দকুমারের সহায়তায়ই ইংরেজরা তাতে সফল হয়। তাছাড়া আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পলাশির ঘটনায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা না রাখলেও নিজের ভবিষ্যত স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তিনি বিপ্লবের নায়ক ইংরেজদের সংশ্রব বা এদেশীয় চক্রান্তকারীদের সাথে মিত্রতা বজায় রেখেছিলেন। পলাশির পর তাঁকে প্রথমে ক্লাইভের দিউয়ান ও মুন্সির পদ দান এবং পরে মীর জাফর কর্তৃক হুগলি ফৌজদারির পূর্বতন দিউয়ানি পদ প্রদানের বিষয়টি পলাশির ঘটনায় তাঁর সম্পৃক্ততারই ইঙ্গিত দেয়।

খাদেম হোসেন খান ছিলেন একজন নবীন সেনাপতি ও মনসবদার। তিনি পলাশি বিপ্লবের অন্যতম নায়ক মীর জাফর আলী খানের কথিত ভাগ্নে হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত।[৬৪] আর সে সূত্রে সমকালীন বাংলার রাজনীতিতে তাঁর প্রতিপত্তি ও গুরুত্ব নেহায়েত কম ছিল না। পলাশি বিপ্লবে তাঁর সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে সমকালীন ঐতিহাসিক সূত্রে পর্যাপ্ত আলোকপাত করা

---

[৬১] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮৩

[৬২] শ্রী নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ-কাহিনী*, কমল চৌধুরী সম্পাদিত *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস* গ্রন্থে সংকলিত, পৃ.২১১

[৬৩] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৬

[৬৪] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ির বর্ণনা মতে, খাদিম হোসেন খানের সাথে মীর জাফরের কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না। বস্তুত তাঁর পিতা সৈয়দ খাদিম আলী খান মীর জাফরের এক বোনকে বিয়ে করেছিলেন। তবে খাদিম হোসেন খান মীর জাফরের সে বোনের গর্ভজাত সন্তান ছিলেন না। মূলত তিনি ছিলেন তাঁর পিতার এক কাশ্মিরী স্ত্রীর সন্তান। তবে মীর জাফরের সাথে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তবাতবায়ির মতে, খাদিম হোসেন নিজেকে জোর গলায় মীর জাফরের ভাগ্নে বলে পরিচয় দিতেন এবং এরা পরস্পর পরস্পরের অনেক দুস্কর্মের সাথী ছিলেন। সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১৮

হয়নি। করম আলী খান উল্লেখ করেছেন, পলাশি যুদ্ধে তিনি মীর জাফরের সাথে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন।[৬৫] এ থেকে ধারণা করা অমূলক হবে না যে, পলাশি ষড়যন্ত্রে তাঁর সংশ্লেষ ছিল এবং তিনি মীর জাফরের সাথে যুক্ত ছিলেন। সিয়ারের বর্ণনা মতে, গুপ্ত কৌশল উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অস্বাভাবিক কার্যব্যবস্থা গ্রহণে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম।[৬৬] এরূপ একজন কর্মকুশলী মানুষ- যার সাথে মীর জাফরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তার পলাশির ঘটনায় অংশ গ্রহণ থাকবে না এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই? তাছাড়া পলাশি উত্তর নবাব মীর জাফর কর্তৃক তাঁকে পুরস্কৃতকরণ এবং তাঁর প্রত্যাশা অনুযায়ী পুর্ণিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শাসন কর্তৃত্ব প্রদান ইত্যাদি পলাশি বিপ্লবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্টতাই প্রমাণ করে।

নবাবী বাংলার রাজনীতিতে এক আলোচিত সমালোচিত চরিত্রের নাম ঘসেটি বেগম। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সাথে তাঁর বৈরী সম্পর্ক এবং নবাব কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ে ইতোমধ্যেই অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। পলাশির ঘটনায় তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের কথা দু একটি সূত্র ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। *সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিনের* বিবরণ মতে, সিরাজ-উদ-দৌলাহর দুই সেনাপতি (মীর জাফর ও রায়দুর্লভ), জগৎশেঠ ও অন্যান্য বিদ্রোহী অমাত্যগণ একজোট হয়ে যখন নবাবকে উৎখাতের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সেই ক্রান্তিলগ্নে নবাবের পুরনো শত্রু ঘসেটি বেগম দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়ে মীর জাফরের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং যে সব লোকের সাথে তাঁর সংযোগ ছিল তাদেরকে মীর জাফর ও দুর্লভরামের সাথে যোগ দিতে বলেন। মোতিঝিল প্রাসাদ থেকে বহিস্কৃত হওয়ার সময় তিনি তাঁর ভৃত্যদের মাধ্যমে যে সম্পদ পাচার করেছিলেন, এখন তা বিতরণ করে সিরাজের বিরুদ্ধে শত্রুদের সংঘটিত করতে শুরু করেন। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা মীর জাফর একটি বড় সেনাদল গঠন করতে সক্ষম হন বলে সিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৭] অতুলচন্দ্র রায় (১৯৩৯) সিয়ারের এ বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন।[৬৮] সিরাজের প্রতি ঘসেটি বেগমের মারাত্মক বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছিল তা সত্য, তবে সিরাজকে উৎখাতে মীর জাফর প্রমুখের সাথে পলাশি চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার মতো অবস্থায় তখন কী তিনি ছিলেন? সিরাজের প্রাসাদে গৃহবন্দী থেকে ঘসেটি বেগম সিয়ারে বর্ণিত পর্যায়ে ভূমিকা রাখতে পেরেছিলেন কী-না, তাতে সন্দেহ প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

উপরে বর্ণিত অমাত্য অভিজাত ছাড়াও বিভিন্ন সূত্রে পলাশি বিপ্লবে সংশ্লিষ্ট নবাব সরকারের আরো কয়েকজন প্রভাবশালী অমাত্যের নাম পওয়া যায়। এদের মধ্যে গোলন্দাজ বাহিনীর দারোগা বাহাদুর আলী খান, সেনাপতি রহিম খান, উমিদ রায় এবং মানিক চাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ কোম্পানির নথি-পত্রে পলাশি চক্রান্তকারী হিসেবে প্রথমোক্ত দুজন সেনানায়কের নাম পাওয়া যায়।[৬৯] অবশ্য *মোজাফ্‌ফরনামায়* বাহাদুর আলী খানকে নবাবের অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি

---

[৬৫] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৪

[৬৬] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১৮

[৬৭] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮২

[৬৮] Atul Chandra Roy, *op. cit.* p. 31

[৬৯] Letter from Watts to Clive, 26 April, 1757, cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, p. 363

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পলাশিতে যুদ্ধ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[৭০] একই কথা মানিক চাঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উমিদরায় ছিলেন মুর্শিদাবাদ নবাবী খালাসা বিভাগের দিউয়ান। সূত্র মতে উমিদরায় একজন বিজ্ঞ ও সৎ কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু শওকত জঙের পরাজয়ের পর নবাব যখন প্রশাসনকে নতুন করে ঢেলে সাজান সে সময় উমিদরায় তাঁর পদটি হারান। কেন তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছিল সূত্রে সে সম্পর্কে পরিস্কার করে কিছু বলা না হলেও ধারণা করা যায় যে, মোহনলালের ইচ্ছায় তাঁর চাচাকে ঐ পদাভিসিক্ত করার জন্য নবাব এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[৭১] বলার অপেক্ষা রাখে না এ পদচ্যুতি তাঁকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। কেননা খালসার দিউয়ানি পদটি শুধু সম্মানজনক ও উচ্চ রাজকীয় পদ ছিল না, বরং এটি বিশেষভাবে অর্থকরীও ছিল। কাজেই এ পদ বঞ্চিত হয়ে বিক্ষুব্ধ উমিদরায়ের পলাশির ঘটনায় নবাব বিরোধী শিবিরের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা অসম্ভবের কিছু না। যদিও এ ব্যাপারে খুব অল্প তথ্যই জানা যায়।

পলাশির ঘটনায় আরো দু একজন অমাত্যের নবাব বিরোধী ভূমিকা ছিল, যদিও তাদের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। এদের মধ্যে একজন সুজাত আলী খান। তিনি ছিলেন নবাব সরকারের একজন কুঞ্চকী (Chamberlain)। পলাশির রণক্ষেত্রে তিনি মীর জাফরের পাশেই ছিলেন বলে জানা যায়। রাত্রিকালে পলাশি থেকে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর পলায়নের সংবাদটি তিনিই মীর জাফর আলী খানকে দিয়েছিলেন বলে *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই মহাবতজঙ্গী* গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।[৭২] প্রসঙ্গত রাজমহলের ফৌজদার মীর দাউদ আলী খানের নামোল্লেখ করতে হয়। ইনি ছিলেন মীর জাফর আলী খানের ছোট ভাই। আগাগোড়াই তাঁর মধ্যে নবাবের প্রতি বিশ্বস্ততার অভাব দেখা যায়। সূত্র মতে নবাব চন্দননগরে ফরাসিদের কাছে যে সব পত্র লিখতেন পথিমধ্যে তিনি তা হস্তগত করে খুলে পড়তেন এবং ইংরেজদের তা জানিয়ে দিতেন। বড় ভাইয়ের সাথে পলাশি চক্রে তিনিও যে জড়িত ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পলাতক সিরাজ-উদ-দৌলাহকে গ্রেপ্তারের কৃতিত্বটিও তাঁর।[৭৩]

সংখ্যায় অল্প হলেও পলাশির ঘটনায় নবাবের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত কিছু অভিজাত অমাত্যের কথাও বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়। এসব অমাত্যদের মধ্যে মোহনলাল, মীর মদন, রাজা রামনারায়ণ, খাজা আবদুল হাদী, ইরাজ খান, হায়দার আলী খান এবং মীর মোহাম্মদ খাজেম খান প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর প্রশাসনে মোহনলাল ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান একজন কর্মকর্তা। নবাবের কৃপা এবং নিজ যোগ্যতাবলে তিনি সামান্য অবস্থা থেকে তিনি কীভাবে নবাব সরকারের দিউয়ান তথা প্রধানমন্ত্রীর পদাভিসিক্ত হয়েছিলেন তা অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। সমসাময়িক প্রায় সকল ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখিত হয়েছে যে মোহনালালের উপর নবাবের অধিক আস্থা পুরনো অভিজাত অমাত্যদের অন্তর্জ্বালার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং নবাবের প্রতি তাদের বিদ্বেষের এটিও ছিল অন্যতম কারণ।

---

[৭০] করম আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৪

[৭১] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭২

[৭২] ঐ. পৃ. ১৮৮

[৭৩] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০০

Dhaka University Institutional Repository

তবে নবাব মোহনলালের প্রতি যে আস্থা স্থাপন করেছিলেন তিনি এর মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করেছেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহকে উৎখাতে যখন দেশের নেতৃস্থানীয় পুরনো অভিজাত অমাত্যবর্গ ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্রে সক্রিয়, তখন মোহনলাল বিশ্বস্ততার সাথে শুধু নবাবকে নয়, বাংলার সার্বভৌমত্ব রক্ষারও সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। এ জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করেননি।[৭৪] একই বক্তব্য বখশি মীর মদনের প্রসঙ্গেও। মীর মদনেরও উচ্চ রাজপদ লাভ ঘটেছিল সিরাজ-উদ-দৌলাহরই অনুগ্রহে। আর এজন্যই বাংলার রাজনীতির চরম ক্রান্তিলগ্নে মীর মদন শুধু নবাবের প্রতি অবিচল বিশ্বস্ত থাকেন নি, বরং পলাশি রণক্ষেত্রে নবাব এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আত্মদান করে ইতিহাসে অমর স্থান করে নেন।

নবাবী প্রশাসনের আরেকজন উচ্চপদস্থ অমাত্য ছিলেন খাজা আব্দুল হাদী। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর রাজত্ব তুরানী বংশোদ্ভূত এ সমর অভিজাত কিছুদিন বখশি পদে নিযুক্তি ছিলেন। অবশ্য নবাব কর্তৃক পদচ্যুত হলেও খাজা আব্দুল হাদী মীর জাফর ও তাঁর সহযোগী অমাত্যদের মতো সিরাজ বিরোধী গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যোগ দেননি, বরং নবাবের প্রতি অবিচল অনুগত থেকে পলাশির যুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করে গুরুতর আহত হয়েছিলেন বলে সূত্রে জানা যায়।[৭৫] সেনাপতি ইরাজ খান ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলাহর শ্বশুর। তিনিও নবাবের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে পলাশি রণপ্রান্তরে শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। অবশ্য পলাশির পরাজয়ের পর চরম দুর্যোগ মুহূর্তে নবাব যখন তাঁর সঙ্গ চেয়েছিলেন, তখন তিনি নবাবের পাশে এসে দাঁড়াননি না বলে *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন* গ্রন্থে বলা হয়েছে।[৭৬] বাহাদুর আলী খান ছিলেন গোলন্দাজ বাহিনীর দারোগা। তিনি পলাশি চক্রী দলের অন্যতম ছিলেন বলে ইংরেজ নথিতে উল্লেখ রয়েছে। সিরাজ কর্তৃক মোতিঝিল প্রাসাদ অধিকার করার সময় ঘসেটি বেগমের অন্যতম অনুগত সেনাপতি হিসেবে বাহাদুর আলী খানের নামও সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। মীর জাফরের সাথে তাঁর যে সখ্য ছিল সে ব্যাপারেও তথ্য পাওয়া যায়।[৭৭] তবে এদতসত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত চক্রান্ত কারীদের দল ছেড়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা রক্ষায় সিরাজের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেন এবং রণক্ষেত্রে আহতও হন। বিহারের নায়েব নাজিম ছিলেন রাজা রামনারায়ণ। কোনো কোনো সূত্রে তাঁকে সিরাজ বিরোধী চক্রী দলের অন্যতম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৮] তবে রাজা রামনারায়ণ আগাগোড়াই সিরাজ-উদ-দৌলাহর প্রতি অনুগত ছিলেন এবং পলাশি ষড়যন্ত্রে আদৌ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর দৃঢ়তার কারণেই শওকত জঙকে কেন্দ্র করে মীর জাফর প্রমুখের সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্র ফলপ্রসু হয়নি। পলাশি বিপ্লবের পর বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের বিরুদ্ধে

---

[৭৪] পলাশি যুদ্ধের পর মোহনালকে বন্দি করে রাজা রায়দুর্লভের হাতে তুলে দেয়া হয়। রায়দুর্লভ তাঁর সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করেন এবং তাঁকে কারারুদ্ধ এবং পরে হত্যা করেন। সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০১

[৭৫] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা*, পৃ.৩০৭

[৭৬] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯১

[৭৭] Letter from Watts to Clive, 26 April, 1757, cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol. II, p. 363

[৭৮] কার্ত্তিক চন্দ্র, *ক্ষিতীশ বংশাবলী*, পৃ.১১২

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি বিহারের জমিদারদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন বলেও সূত্রক্রমে জানা যায়।[৭৯] অবশ্য তাদের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত আপোষ করতে বাধ্য হন এবং প্রশাসনে নিজের অবস্থান বহাল রাখেন। কোনো কোনো সূত্রে মানিক চাঁদকেও পলাশি বিপ্লবে চক্রান্তকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৮০] কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়। মানিক চাঁদ কলকাতার ফৌজদার ছিলেন। সন্দেহ নেই ইংরেজদের কলকাতা পুনর্দখলের সময় তাঁর ভূমিকা রহস্যজনক ছিল। তথাপি নবাব তাঁর প্রতি বিশেষ রুষ্ট ছিলেন বলে মনে হয় না। কলকাতা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার পর ফরাসি সেনাধ্যক্ষ রেনেলকে লেখা এক পত্রে নবাব মানিক চাঁদকে তাঁর স্নেহ ধন্য ছোট ভাই বলে উল্লেখ করেন।[৮১] পরে অবশ্য রাজস্ব লোপাটের দায়ে নবাব তাঁকে ফৌজদার পদ থেকে অপসারণ ও কারারুদ্ধ করেছিলেন। ১০ লাখ রুপি দণ্ড দিয়ে তিনি মুক্তি পান বলে জানা যায়। এতদসত্ত্বেও তিনি সিরাজ বিরোধী চক্রে যোগ না দিয়ে পলাশি যুদ্ধে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন এবং এ যুদ্ধে তিনি আহতও হয়েছিলেন বলে *তারিখ-ই বাঙ্গালা-ই মহাবতজঙ্গী* গ্রন্থ সূত্রে জানা যায়।[৮২]

৮.৫.২ পলাশি ও বণিক অভিজাত

পলাশি ঘটনায় সিরাজ বিরোধী এবং তাঁর সমর্থক অভিজাত অমাত্যদের সম্পর্কে অলোচনার পর এ পর্যায়ে এ বিপ্লবে বণিক অভিজাতদের ভূমিকা বিষয়ে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেয়া হলো। সমকালীন ফারসি সূত্রসমূহে পলাশি বিপ্লবে অভিজাত বণিকদের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য না থাকলেও সমকালীন ইউরোপীয় তথ্যসূত্রে পলাশির ঘটনায় তাদের অগ্রণী ভূমিকার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। অবশ্য প্রাপ্তসূত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এ বিপ্লবে বণিক অভিজাতদের ভূমিকা শ্রেণীগত পর্যায়ের ছিল না, বরং অমাত্য অভিজাতদের মতো তাদের ভূমিকাও ছিল একান্তই ব্যক্তিগত পর্যায়ের। ব্যক্তি স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে সে সময়কার কয়েকজন উল্লেখযোগ্য বণিক পলাশি বিপ্লবের উদ্ভব ও বিকাশে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখেন। এদের মধ্যে খোজা পেত্রস আরাতুন, উমিচাঁদ, খোজা ওয়াজিদ এবং জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন অন্যতম। বণিক অভিজাত খোজা পেত্রস আরাতুন জাতিতে আর্মেনীয় ছিলেন। সম্ভবত আঠারো শতকের মধ্যভাগে পেত্রস আরাতুন তাঁর অপর দুই ভাই খোজা গ্রেগর এবং আগা বারসিকসহ কলকাতায় বসতি স্থাপন করেছিলেন।[৮৩] খোজা পেত্রস কিসের ব্যবসা করতেন সে সম্পর্কে সূত্রে কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও রবার্ট ক্লাইভ তাঁকে কলকাতার সম্ভ্রান্ত আর্মেনীয় বণিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৮৪] ইংরেজ কোম্পানির সাথে তাঁর যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল সে

---

[৭৯] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১৬

[৮০] N. K Sinha (ed.) *The History of Bengal (1757-1905),* University of Calcutta, Secon Edition, 1996, p. 8; Muhammad Mohar ALi, *History of the Muslims of Bengal,* Vol. IA, KSA, 1985, p. 680

[৮১] উদ্ধৃতি; মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৯

[৮২] ইউসুফ আলী খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৪; আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩০৭

[৮৩] রজতকান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, পৃ. ১৬৭; আগা বারসিক সম্ভবত লবনের ব্যবসা এবং খোজা গ্রেগর থান কাপড়ের ব্যবসা করতেন। অবশ্য পরবর্তীতে গ্রেগর নবাব মীর কাসিমের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধানের পদ এবং ইতিহাসে গুরগীন খান নামে পরিচিতি লাভ করেন। পলাশি ঘটনার সাথে খোজা গ্রেগরের অল্প হলেও সম্পর্ক ছিল।

[৮৪] M. J. Seth, 'Khojah Petrus: The Armenian Merchant-Diplomat of Calcutta', *Bengal Past and Present*, Vol.XX, p. 113

Dhaka University Institutional Repository

কথাও সূত্রক্রমে জানা যায়। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ্ কর্তৃক কলকাতা দখলের সময় খোজা পেত্রস ইংরেজদের সাথে তাদের ফ্যাক্টরিতে ছিলেন এবং নবাবী ফৌজকে বাধা দানে ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন বলেও জানা যায়। খোজা পেত্রসের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ইহুদী বণিক আব্রাহাম জ্যাকব। সম্ভবত এ দুজনই ব্যবসা সূত্রে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাই কলাকাতা থেকে বিতাড়িত হয়ে ফলতায় আশ্রয় নিয়ে ইংরেজরা যখন চরম দুরাবস্থার মধ্যে দিন অতিবাহিত করছিল তখন খোজা পেত্রস তাঁর বন্ধু জ্যাকবকে নিয়ে তাদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন। পলাশির যুদ্ধের দেড় বছর পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সের (Court of Directors) কাছে লেখা এক পত্রে খোজা পেত্রস এ প্রসঙ্গে সবিস্তার বিবরণ দিয়েছিলেন।[৮৫] এ পত্রে আলিনগরের সন্ধির মধ্যস্থতাসহ পলাশি বিপ্লবে তাঁর ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। পত্রের ভাষ্য অনুযায়ী পলাশির ঘটনার প্রাক্কালে মীর জাফরকে ইংরেজদের সাথে গোপন চক্রান্তে সামিল করানোর কৃতিত্ব খোজা পেত্রসের।[৮৬] পত্রে বর্ণিত পেত্রসের ভাষ্যে কিছুটা অতিশয়োক্তি রয়েছে বলে মনে হয়, তবে মুর্শিদাবাদের রাজনীতির এক চরম মূহুর্তে তিনি যে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিরুদ্ধে ইংরেজ ও দেশীয় চক্রীদলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে কাজ করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আলিনগরের সন্ধির পর ওয়াটস যখন সন্ধি বাস্তবায়ন তদারকির উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ আসেন তখন পেত্রসকেও তাঁর সঙ্গী করে এনেছিলেন। এসব ইংরেজদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাই প্রমাণ করে।

পলাশি বিপ্লবের অন্যতম নায়ক ছিলেন বণিকরাজ উমিচাঁদ (আমির চাঁদ নামে পরিচিত)। সুশীল চৌধুরীর (২০০০ খ্রি.) মতে, তাঁর সাহায্যেই ইংরেজরা নবাব দরবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রের টোপ গেলায় এবং ষড়যন্ত্রকে পাকা করে তোলে।[৮৭] আর্থিক ব্যারণ হিসেবে পাটনার নায়েব নাজিম এবং মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। নবাব দরবারে তাঁর এ প্রভাব প্রতিপত্তির কারণেই পলাশি বিপ্লবের পূর্বে বিভিন্ন সময় ইংরেজ কোম্পানিকে তাঁদের বিপদে আপদে নবাবের সাথে মধ্যস্থতা করার জন্য উমিচাঁদের দ্বারস্থ হতে দেখা যায়। উমিচাঁদ নবাব আলিবর্দী খান ও নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ্ উভয়েরই প্রিয়পাত্র ছিলেন।[৮৮] আলিবর্দী খানের মৃত্যুর পর সিরাজের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধে উমিচাঁদ সিরাজ বিরোধী গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিলেন। রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণদাস ঢাকা থেকে পালিয়ে কলকাতায় এলে উমিচাঁদই তাকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং পরে ফোর্ট উইলিয়ামে তাঁর আশ্রয় নিশ্চিত

---

[৮৫] খোজা পেত্রস ছিলেন একজন সুযোগ সন্ধানী সুবিধাবাদী ব্যক্তি। ইংরেজদের সাহায্যকরার মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধা হাসিল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজদের নিকট থেকে কিছু প্রাপ্তি না ঘটায় তিনি এ পত্র লিখেন এবং নিজের ভূমিকা জাহির করেন। Letter from Khojah Petrus to the Court of Directors, 25 Jan, 1759, cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. III, p. 103

[৮৬] খোজা পেত্রসের এসব দাবির যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায় Letter from Watts to his father, 13 August, 1757, cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, p. 468; Watts *Memoirs,* p. 82; Robert Orme, Military *Transactions*, Vol. II. p. 163

[৮৭] Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757,*p.124

[৮৮] নবাব আলিবর্দী খানের চিকিৎসা সূত্রে ডাঃ ফোর্থের মুর্শিদাবাদের দরবারের যতায়ত থাকায় তিনি দরবারের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালই খোঁজ খবর রাখতেন। সিরাজ-উদ-দৌলাহ্ কর্তৃক কলকাতা অধিকারের পর তিনি একটি লিখিত বিবৃতেতে সমকালীন পরিস্থিতি এবং দরবার ও রাজনীতিতে উমিচাঁদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল উমিচাঁদেরই সুপারিশে। তারপরেও সিরাজের দরবারে উমিচাঁদের প্রতিপত্তি অটুট ছিল। এর কারণ সম্ভবত উমিচাঁদের সুযোগ সন্ধানী চরিত্র। তিনি সবসময় নিজের তালে থাকতেন। কৃষ্ণদাসকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে ফেরত আনার জন্য নবাবের দূত নারায়ণ সিংহ যখন কলকাতায় গেল তখন উমিচাঁদই তাকে গভর্নর ড্রেকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কৃষ্ণদাসকে ফেরত দিতে ইংরেজদের অনুরোধ করেছিলেন।[৮৯] ড্রেক তাঁর কথা না শুনায় চতুর উমিচাঁদ নবাবের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান রাজারামের সাথে যোগাযোগ করে কলকাতার খবরা খবর দিতে লাগলেন। এমনকি তিনি সিরাজের বিশ্বস্ত আরেক বণিক অভিজাত খোজা ওয়াজিদের সাথেও এ ব্যাপারে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। সূত্র মতে ফরাসিদের মিত্র খোজা ওয়াজিদ ছিলেন উমিচাঁদের বন্ধু এবং অনেক ব্যবসাতেই তাঁর অংশীদার। উমিচাঁদের এ ভূমিকায় ইংরেজরা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ কলকাতা দখল করে তাঁকে মুক্ত করেন। কিন্তু উমিচাঁদ অচিরেই বুল পাল্টান। বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষার্থে তিনি ইংরেজদের সাথে সখ্য স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং সে সুযোগও তিনি পেয়ে যান। কলকাতা থেকে বিতাড়িত হয়ে ফলতায় আশ্রয় গ্রহণকারী ইংরেজরা তাঁর সহযোগিতা চাইলে উমিচাঁদ তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে যান। তাঁর চেষ্টাতেই কলকাতার ফৌজদার মানিক চাঁদ ফলতায় ইংরেজদের কাছে খাদ্য সামগ্রী প্রেরণের অনুমতি দেয়। নবাবের সাথে বিরোধ নিস্পত্তিতে মধ্যস্থতা করার জন্য মানিক চাঁদ, খোজা ওয়াজিদ, রায়দুর্লভ ও গোলাম হোসেন খানের নিকট ইংরেজরা আর্জির পর যে আর্জি পাঠাচ্ছিলেন তাঁর পিছনে ছিল উমিচাঁদের পরামর্শ। জগৎশেঠের সাথে উমিচাঁদের সম্পর্ক বিশেষ ভাল ছিল না। এ কারণে আলিনগরের সন্ধির সময় উমিচাঁদ যেন বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে না পারেন জগৎশেঠ সে চেষ্টা করেছিলেন। তবে এতে কোনো কাজ হয়নি। উমিচাঁদ চুক্তি সম্পাদনে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেন এবং এ বাবদ নবাবের কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন। শুধু তাই নয়, নবাবের আগ্রহের কারণে ইংরেজরা মুর্শিদাবাদ দরবারে ওয়াটসের নেতৃত্বে প্রেরিত প্রতিনিধি দলে উমিচাঁদকে অন্তর্ভূক্ত করতে বাধ্য হয়।[৯০]

নবাব কর্তৃক অনুগ্রহ লাভ করলেও উমিচাঁদ মোটেই নবাবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন নি। নবাবের পরিবর্তে তিনি এসময় ইংরেজদের হিতচিন্তায় যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেছিলেন ইংরেজ কোম্পানির নথিপত্রে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।[৯১] উমিচাঁদ মুর্শিদাবাদ দরবারে নিয়মিত যাতায়ত করে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অভিজাত অমাত্যদের সামিল করার চেষ্টা করেন।

---

[৮৯] এখানেও তাঁর মতলবি বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। নারয়ণ সিংহ ছিলেন নবাবের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান রাজারামের ভাই। এই রাজারামের সাথেও উমিচাঁদের ভাল সম্পর্ক ছিল। উত্তরাধিকার সংঘাতে সিরাজ বিরোধী গ্রুপের পরাজয় ঘটলে তিনি সুর পাল্টান এবং নবাব দরবারে নিজের অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সচেষ্ট হন। নারায়ণ সিংহকে ড্রেকের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং কৃষ্ণদাসকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধের পেছনে তাঁর এ মতলবি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল বলে মনে হয়।

[৯০] রজতকান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, পৃ. ১৭৯

[৯১] Letter from Charles F Noble to Select Committee, Fort St. George, 22 September, 1756, cited in S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. III, p.328; Letter from Holwell to Court of Dirctors, 30 November, 1756, S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, p.21; Luke Scrafton, *Reflections,* p. 81; Letter from Watts to Clive, 26, March, 1757, S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, p.294

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজদের চন্দননগর দখলের সময় উমিচাঁদ কূটনৈতিক কর্মকুশলতার দ্বারা হুগলির ভারপ্রাপ্ত ফৌজদার নন্দকুমারকে ইংরেজদের সাহায্য করতে রাজী করিয়েছিলেন বলে সমকালীন সকল ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। সিরাজ-উদ-দৌলাহকে উৎখাত করে ইয়ার লতিফকে নবাব করার প্রস্তাবটিও ইংরেজদের তিনিই দিয়েছিলেন বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৯২] কিন্তু ইংরেজরা পরবর্তীতে ইয়ার লতিফের পরিবর্তে মীর জাফরকে নবাব করার সিদ্ধান্ত নিলে উমিচাঁদ তার বিরোধিতা করেননি। বস্তুত এর পেছনেও তাঁর স্বার্থবুদ্ধি কাজ করেছিল। মীর জাফরকে নবাব করার পরিকল্পনা মেনে নিয়ে তিনি নিজের স্বার্থ সুরক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হয়েছিলেন। পলাশির প্রাক্কালে ইংরেজদের সাথে মীর জাফরের গোপন চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উমিচাঁদ নবাবের ধনসম্পদের পাঁচ শতাংশ দাবি করেন। শুধু তাই নয়, পলাশি চক্রের আরেক প্রভাবশালী রায়দুর্লভকে দলে টানতে তিনি তাঁর জন্যও হিস্যা দাবি করেছিলেন। অবশ্য মীর জাফর এবং জগৎশেঠ উভয়েই এ চুক্তিতে উমিচাঁদকে যুক্ত করতে অনীহা প্রকাশ করেন। কিন্তু সুযোগ সন্ধানী ইংরেজরা প্রকাশ্যত উমিচাঁদের দাবি অগ্রাহ্য করে তাঁকে ক্ষেপিয়ে পরিকল্পনা বানচালের ঝুঁকি নিতে চায়নি। কেননা ইংরেজ ও নবাব বিরোধী চক্রকে চাপে রাখার কৌশল হিসেবে উমিচাঁদ নবাবের কাছে তথ্য ফাঁসের হুমকি দিয়েছিলেন।[৯৩] এতে ইংরেজরা উমিচাঁদকে ষড়যন্ত্রের বলয়ে ধরে রাখার জন্য তাঁর সাথে সমঝে চলার সিদ্ধান্ত নেন বটে, তবে তাঁকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি গোপন পরিকল্পনাও করেছিলেন। পলাশির প্রাক্কালে মীর জাফরের সাথে চুক্তি সম্পাদনের সময় ইংরেজদের উমিচাঁদকে অর্থ দেয়ার ব্যাপারে একটি জাল চুক্তিনামা প্রণয়ন এ পরিকল্পনারই ফসল। পলাশি বিপ্লব সফল হওয়ার পর উমিচাঁদ এ প্রতারণার কথা জানতে পারেন। রবার্ট ওর্ম এর তথ্য মতে, এ প্রতারণার ঘটনায় উমিচাঁদ দারুণ মর্মাহত হন এবং তিনি পুরোপুরি অপ্রকৃতস্থ হয়ে যান।[৯৪] অবশ্য ওর্মের এ তথ্যটির যথার্থতা বিষয়ে সন্দে প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। তবে সে যাই হোক এ ঘটনার পর তিনি বেশিদিন বেঁচে থাকেননি। বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তিনি ইংরেজদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে প্রতারিত হয়ে মারাত্মক মর্মযাতনা নিয়ে ইহধম ত্যাগ করেছিলেন।

পলাশি চক্রান্তে সংশ্লিষ্ট আরেক প্রভাবশালী বণিক অভিজাত ছিলেন খোজা ওয়াজিদ।[৯৫] পদমর্যাদা, ধনসম্পদ ও নবাব দরবারে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে জগৎশেঠদের পরেই ছিল তাঁর স্থান। রাবার্ট ওর্ম তাঁকে সমকালীন বাংলার প্রধান বণিক এবং ওয়াটস ও কলেট বাংলার নবাবের উপর তাঁর বিশাল প্রভাবের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।[৯৬] প্রথম থেকে খোজা ওয়াজিদ

---

[৯২] এক্ষেত্রেও উমিচাঁদের সুক্ষ্ম বিষয় বুদ্ধি দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত নবাবী প্রশাসন এবং রাজনীতিতে ইয়ার লতিফ তেমন জবরদস্ত আমলা ছিলেন না। এ অবস্থায় উমিচাঁদ মনে করেছিলেন তাঁকে নবাব করতে পারলে সহজেই বাগে রাখা সম্ভব হবে।

[৯৩] Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757,* p. 128

[৯৪] Robert Orme, *Military Transactionsin Idostan*, Vol. II, p. 51

[৯৫] খোজা ওয়াজিদ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য রয়েছে সুশীল চৌধুরী প্রণীত 'Khwaja Wazid in Bengal Trade and Politics', *Indian Historical Review,* Vol. xvi, nos. 1-2, July, 1989-1990, pp. 137-148

[৯৬] Robert Orme, *Military Transactionsin Idostan*, Vol. II, p. 58; রজতকান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, পৃ. ১৬০। খোজা ওয়াজিদ মুঘল ভারতীয় রেওয়াজ অনুযায়ী এ বণিক অভিজাত প্রাচ্য বণিক ও ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বিবাদ মিমাংসায়

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর একান্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বন্ধু। জগৎশেঠের প্রতি তরুণ নবাবের বিরাগ থাকায় স্বাভাবিকভাবে খোজা ওয়াজিদের উপর তাঁর নির্ভরতা বেড়েছিল। ফলে সিরাজের সময় ব্যবসায় বাণিজ্য ছাড়াও রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকার্য এবং কূটনীতিতে তাঁকে বেশ তৎপর দেখা যায়। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ ইংরেজদের সাথে বিরোধ মিমাংসার খোজা ওয়াজিদকে দৌত্য কাজে নিয়োগ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথম দিকে ইংরেজদের সাথে খোজা ওয়াজিদের বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল না। তিনি ছিলেন ফরাসিদের মিত্র এবং দরবারে ফরাসিদের হয়েই নবাবের কাছে ওকালতি করতেন। তবে বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে বাংলার পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি ইংরেজদের সাথে সু সম্পর্ক গড়ে তুলেন। এজন্য দেখা যায় যে ইংরেজদের হুগলি আক্রমণের সময় তিনি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হলেও তিনি নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ মিমাংসার ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন।[৯৭] ফরাসি কোম্পানির মঁশিয়ে জ্যাঁ ল ঠিকই বলেছেন যে, বস্তুত ওয়াজিদ সবার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইতেন।[৯৮] বস্তুত ওয়াজিদ ছিলেন একজন পাকা ব্যবসায়ী। বাণিজ্যিক স্বার্থে তিনি নবাবসহ সকলের সাথেই শত্রুতা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন। নবাবের শত্রুদের সাথে হাত মেলানোর পেছনেও তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থ চিন্তাই মূখ্য ছিল বলে মনে হয়।

সকল ঐতিহাসিক সূত্রেই খোজা ওয়াজিদকে পলাশি ঘটনায় সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী অভিজাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে, তিনি এতে যুক্ত হয়েছিলেন একেবারে চূড়ান্ত পর্বে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক ফরাসিদের চন্দননগর দখল এবং কাশিমবাজার থেকে তাদের বিতাড়িত করার পর খোজা ওয়াজিদ ইংরেজদের দিকে বিশেষভাবে ঝঁকে পড়েন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথম পর্যায়ে পলাশি চক্রান্তে বাইরে থাকলেও তিনি এ ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে মোটেই অন্ধকারে ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে তিনি তখন এতে সামিল হননি। বস্তুত ফরাসিদের বিতাড়নের পর মুর্শিদাবাদ দরবারের ভেতরকার চেহারাটা যখন দ্রুত পাল্টে যেতে থাকে, তখন দরবারের অন্য অনেকের মতো তিনিও নিজের অবস্থান পাল্টে রাতারাতি ইংরেজ এবং তাদের মিত্র দেশীয় অভিজাত ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে হাত মেলান। বস্তুত মুর্শিদাবাদের রাজনীতির এক সংকটময় মূহুর্তে সিরাজ-উদ-দৌলাহর পতন যখন প্রায় সুনিশ্চিত, তখন তিনিও চক্রান্তকারীদের সাথে হাত মিলেয়ে নিজের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত রাখতে চেষ্টা করেন।

পলাশি চক্রান্ত ও বিপ্লবে দেশীয় অভিজাতদের মধ্যে জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদ ও তাঁর ভাই মহারাজা স্বরূপচাঁদের অগ্রগণ্য ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ও অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণাদি আধুনিক গবেষণায় উদ্ঘাটিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জগৎশেঠ পরিবার ছিল আঠারো শতকের বাংলার সবচেয়ে ধনাঢ্য বণিক- ব্যাংকার। সমকালীন বাংলার রাজনীতিতেও এই পরিবারের বিশেষকরে জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল । বাংলার ব্যবসা- বাণিজ্য ও রাজনীতিতে শেঠ

মধ্যস্থতা করতেন বলে দরবারে তিনি 'ফিরিঙ্গি বিশারদ' (Confidential agent with the Europeans) নামেও পরিচিত ছিলেন। Law's *Memoir*, S. C Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol. III, p.187

[৯৭] Sushil Chaudhury, *From Prosperity to Decline*, pp. 77-79

[৯৮] Law's *Memoir*, S. C Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol. III, p.190

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের উত্থান ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচ্য গবেষণার অন্য একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৯৯] মুর্শিদাবাদের নবাব বাড়ীর একটি চিত্রের বরাত দিয়ে রজকান্ত রায় (১৯৯৪) লিখেছেন যে, আলিবর্দী খানের সময় দরবারে নবাবের ঠিক বামপার্শ্বে জগৎশেঠের আসন নির্দিষ্ট ছিল।[১০০] সূত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, এ সময় জগৎশেঠ পরিবারই ছিল বাংলার রাজনীতির আসল ভাগ্য নিয়ন্ত্রক। অনেকদিন ধরেই এরা বাংলার রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রধান হোতা ছিলেন বলে মঁশিয়ে জ্যাঁ ল লিখেছেন।'[১০১] জ্যাঁ ল'র এ বক্তব্যে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও এর মধ্যে শেঠদের রাজনৈতিক প্রভাবের বিষয়টি স্পষ্টত বুঝা যায়। নবাব দরবারে শেঠদের রাজনৈতি প্রভাব-প্রতিপত্তির পেছনে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক আদান-প্রদানের বিষয়টি নিঃসন্দেহে কাজ করেছিল।[১০২]

সমকালীন বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, শুরুর দিকে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সাথে শেঠদের সম্পর্ক খারাপ ছিল না।[১০৩] সিংহাসনে আরোহনের পর সিরাজের বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব দিয়ে তাঁর মাতামহী ও জগৎশেঠকে তাঁর বিদ্রোহী খালা ঘসেটি বেগমের কাছে পাঠানোর ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আলিনগরের চুক্তি সম্পাদনের সময় জগৎশেঠের প্রতিনিধি রঞ্জিত রায়ের বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের মধ্যেও নবাবের সাথে জগৎশেঠের সুসম্পর্কের ইঙ্গিত রয়েছে। অবশ্য পরবর্তী অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় প্রকাশ্যত সদ্ভাব বজায় রাখলেও সিরাজের প্রতি শেঠদের মানোভাব কখনো আন্তরিক ছিল না। এ কারণেই প্রথম থেকেই শেঠরা নবাব বিরোধী চক্রের সাথে যুক্ত ছিলেন। এমনকি নবাব উৎখাতের মূল পরিকল্পনায় দেশীয়দের মধ্যে তারাই নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। সিরাজ-উদ-দৌলাহকে উৎখাত করে শওকতজঙকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম চক্রান্তটিতেও জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদ কোনো না কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন।[১০৪] বস্তুত জগৎশেঠ ছিলেন অত্যন্ত দুরদর্শী ও তুখোর হিসেবী লোক। অসাবধানে আগ বাড়িয়ে কিছু করার পাত্র তিনি ছিলেন না- তিনি কলকাঠি নাড়াতেন গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে। আগেভাগে প্রকাশ্যে কিছু করে তিনি যে বিপদ ডেকে আনতে চাননি এ কথা জ্যাঁ ল'ও বলে

---

[৯৯] বাংলার বাণিজ্য, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে জগৎশেঠ পরিবারের উত্থান ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে J.H.Little, 'The House of Jagatseth' in *Bengal Past & Present*, vol. XX, (1920), pp. 141-200 & vol. XXII (1924) pp.119- ; Sushil Chaudhury, *From Prosperity to Decline*, pp.109-116; kumkum Chatterjee: *op. cit.*, pp. 178-200

[১০০] রজকান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র*, পৃ. ১৫৩; ইংরেজ ও ফরাসি কোম্পানি কর্মকর্তা বা ঐতিহাসিকদের বিবরণী ছাড়াও সমকালীন ওলন্দাজ কোম্পানির নথি-পত্রেও জগৎশেঠদের অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের কথা স্থান পেয়েছে। Dutch Trade letter, 14, February, 1755, J H Little, op. cit., p. viii

[১০১] Law's *Memoir*, S. C Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol. III, p.175

[১০২] বস্তুত শেঠদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের পেছনে তাদের প্রতি দরবারের অনুকূল্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি নবাব এবং অভিজাত অমাত্যদেরকে তাদের আর্থিক সুবিধাদি দানের বিষয়টিও প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে। স্মর্তব্য যে, মারাঠা আক্রমণ মোকাবিলায় শেঠরা ছিল আলিবর্দী খানের সবচেয়ে বড় অর্থ যোগানদাতা। এ অর্থ তারা যেমন নিজের কুঠি থেকে দিয়েছেন, তেমনি নবাবের প্রত্যাশা মতো ইংরেজসহ অন্যদের কাছ থেকেও আদায় করে দিয়েছেন।

[১০৩] এমনকি ১৭৫৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ ও শেঠরা যে পরস্পরের প্রতি প্রকাশ্যে কোনো শত্রুতা দেখায়নি জ্যাঁ ল'র বর্ণনা থেকে তা জানা যায়। Law's *Memoir*, S. C Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol. III, pp.185, 208

[১০৪] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫৭

Dhaka University Institutional Repository

গেছেন।[১০৫] কাজেই প্রকাশ্যত সদ্ভাব বজায় রাখলেও এবং নবাব তাদের প্রতি বিরূপভাব প্রকাশ না করলেও শেঠরা যে শুরু থেকেই নবাবের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, তা সন্দেহাতীত। প্রথমদিকে শেঠরা নবাবের প্রকাশ্য বিরোধিতা থেকে বিরত থেকেছিলেন একান্তই কৌশলগত কারণে।

পূনশ্চ উল্লেখ্য যে, দেশীয় অভিজাতদের মধ্যে জগৎশেঠরাই ছিলেন পলাশি চক্রান্তের মূল নায়ক। মাদ্রাজের গভর্নর পিগটকে লেখা এক চিঠিতে রবার্ট ক্লাইভ উল্লেখ করেছেন, 'নবাবের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে, এর মধ্যে অনেক গণ্যমান্য লোক আছেন এবং এদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জগৎশেঠ।[১০৬] দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে শেঠরাই যে ছিলেন পলাশি চক্রান্ত ও বিপ্লবের মূল উদ্যোক্তা (the originators of the revolution) এ কথা মঁশিয়ে জ্যাঁ ল'ও বলেছেন। তাঁর মতে, ইংরেজরা যা করেছে শেঠদের সম্মতি ও সহযোগিতা ছাড়া তা কখনো করতে পারতো না।[১০৭] এ প্রসঙ্গে ল দ্যা লরিস্টন (Law de Lauriston) এর অভিমতও প্রায় অনুরূপ। তিনি লিখেছেন, ষড়যন্ত্রে জগৎশেঠরা সক্রিয় অংশ না নিলে বাংলায় বিপ্লব সম্ভব হতো না।[১০৮] জগৎশেঠদের এরূপ নেতৃস্থানীয় ভূমিকার কারণেই তাদেরকে ইংরেজদের পক্ষে রাখার ব্যাপারে বিশেষ মনযোগ দেয়ার ব্যাপারে সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক উইলিয়াম ওয়াটসকে বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল।[১০৯] ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিরাজকে অপসারণ করে ইংরেজরা প্রথমে ইয়ার লতিফ খান এবং পরে মীর জাফর আলী খানকে বাংলার নবাব করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার পেছনে শেঠদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই ছিল মূখ্য। কারণ ইংরেজরা ভালোভাবেই জানতো যে, জগৎশেঠদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া তাদের কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব সফল এবং লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, পলাশি ঘটনায় দেশীয় অভিজাতদের অনেকেই সংশ্লিষ্ট থাকলেও মূল নেতৃত্ব ছিলৃ ছিল জগৎশেঠদের হাতে। এ জন্যই পলাশি বিপ্লব বাস্তাবয়নের জন্য সিরাজ বিরোধী অভিজাত চক্রের চূড়ান্ত গোপন সভাটি বসেছিল জগৎশেঠেরই মুর্শিদাবাদের বাড়ীতে। এ ঘটনাটি পলাশি বিপ্লবে জগৎশেঠের নেতৃস্থানীয় ভূমিকারই নির্দেশক হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে।

৮.৫.৩: পলাশি ও ভূ-অভিজাতবর্গ

পলাশির ঘটনায় নবাবী বাংলার অন্যতম অভিজাত বলে গণ্য এ ভূ-অতিজাত জমিদার শ্রেণী সমষ্টিগতভাবে যুক্ত হয়েছিলেন এমন কোনো জোরালো ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক তথ্যাদি নিতান্তই অপ্রতুল। আলোচ্য অধ্যায়ের অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু রচনায় পলাশির বর্ণবহুল বিবরণ পাওয়া যায়। এসব রচনার কোনো কোনোটিতে ভূ-স্বামী অভিজাতদের কারো কারো বিশেষ করে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের

[১০৫] Law's *Memoir,* S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. III, pp.175, 186

[১০৬] Letter from Clive to Pigot, 30 April, 1957, S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, p. 368

[১০৭] Law's *Memoi,cited by* S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. III, p.175

[১০৮] Law de Lauriston ছিলেন পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নিযুক্ত ফরাসি গভর্নর। Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire:,* p. 118

[১০৯] letter from Select Committee to Watts, 14 March, 1957

Dhaka University Institutional Repository

সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। ইংরেজ কোম্পানির কর্মকর্তা ওয়াটস কর্তৃক ক্লাইভের কাছে লেখা একটি পত্রের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ পত্রের তথ্য অনুযায়ী সিরাজকে উৎখাতের পর নতুন নবাব যেন মুর্শিদকুলি খানের আমলের তুমর জমা অনুযায়ী খাজনা আদায় করেন সে ব্যাপারে ইংরেজদের মিত্র বণিক অভিজাত উমিচাঁদ জমিদারদের পক্ষ থেকে একটি দাবিনামা পেশ করেছিলেন।[১১০] সিরাজ বিরোধী চক্রের সাথে জমিদারদের কোনো সংশ্রব না থাকলে উমিচাঁদ তাদের পক্ষে এরূপ দাবি উত্থাপন করতেন না। অবশ্য এ পত্রে কোনো জমিদারের নাম উল্লেখ নেই। তবে ১৮৭২ সালে *Calcutta Review* তে প্রকাশিত 'The Territorial Aristocracy of Bengal:The Nadia Raj' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছাড়াও বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, দিনাজপুর, বীরভুম ও মেদিনীপুরের জমিদারগণ পলাশি বিপ্লবে যুক্ত ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম প্রখ্যাত পণ্ডিত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে পলাশি ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত তথ্যাদি আলোকে ডি সি সেন (১৯১১) দাবি করেন যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মীর জাফরকে ইংরেজদের সহায়তায় সিরাজ-উদ-দৌলাহকে সিংহাসনচ্যুত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[১১১] তবে ডি সি সেনের এ বক্তব্যটি অবশ্যই অতিরঞ্জন বলে মনে হয়। কেননা সমকালীন বা পরবর্তী কোনো ঐতিহাসিক সূত্রে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এরূপ ভূমিকার কথা উল্লেখ নেই। সন্দেহ নেই পলাশি ষড়যন্ত্রে তিনি সিরাজ বিরোধী গ্রুপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন, তবে সিরাজকে উৎখাতের পরিকল্পনাটি **প্রথম** তাঁর মাথা থেকে এসেছিল এবং তিনিই **প্রথম** মীর জাফরকে নবাব হবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন- এরূপ বক্তব্য সম্পর্কে দ্বিমত করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। রাজীবলোচনের মতে, নবাব বিরোধী অভিজাত আমীর-ওমরাহ,শেঠ-সওদাগর এবং ইংরেজদের সাথে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও গোপন যোগাযোগ ছিল। পলাশির প্রাক্কালে পলাশির পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে জগৎশেঠের গৃহে যে গোপন মন্ত্রণা সভা বসেছিল তাতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন।[১১২] এ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলকাতায় গিয়ে রজার ড্রেকের সাথে সাক্ষাৎ করে সিরাজ-উদ-দৌলাহকে উৎখাত করার ব্যাপারে ইংরেজদের সহযোগিতার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিলেন। পলাশিতে ইংরেজদের জয় লাভের পর ১৭৫৮ সালের ৭ মার্চ বিজয়ী ইংরেজদের অভিনন্দন জানিয়ে মহারাজার প্রেরিত পত্রটিও নবাব বিরোধী অভিজাত গোষ্ঠীর সাথে তাঁর সম্পৃক্ততার প্রমাণ।[১১৩] নবীনচন্দ্র সেন রচিত *পলাশি যুদ্ধ* কাব্য (১৮৭৫) গ্রন্থেও পলাশি ষড়যন্ত্রে কৃষ্ণচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে কবি নাটোরের জমিদার রাণী তবানীর কথাও উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এতে রাণী ভবানীকে দেশপ্রেমিক বীরঙ্গনা হিসেবে চিত্রিত করার

---

[১১০] Letter from Watts to Clive, 14 May, 1757, S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, p. 392

[১১১] D C Sen, *History of Bengali Language Literature,* Calcutta, 1911, pp. 616-617

[১১২] রাজীবলোচন, পূর্বোক্ত, পৃপৃ. ২৫-২৭, শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র, *ক্ষিতিশ বংশাবলী*, পৃ,পৃ. ১১২-১১৪; শ্রী রসিক লাল গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৫

[১১৩] Shirin Akhter, *op. cit.,* p. 108

প্রয়াস দেখা যায়। নবীনচন্দ্রের ভাষ্যমতে, রাণী ভবানী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যোগ দিয়েছিল বলে তিরস্কার ও ভৎসনা করেছিলেন।[১১৪] *আর্য-নারী* নামক গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্যদের আচরণে রাণী ভবানী এতই বিরক্ত হয়েছিলেন যে, পুরুষ হয়ে স্ত্রী লোকের মতো আচরণের জন্য কৃষ্ণচন্দ্রকে বিদ্রুপ করে রাণী তাঁর নিকট শাঁখা সিদুঁর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[১১৫] তবে পলাশির ঘটনায় রাণী ভবানীর এরূপ ভূমিকা বিষয়ে সমকালীন ঐতিহাসিক সূত্রসমূহে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। নীলমনি বসাক রচিত *নব-নারী* এবং দুর্গাদাস লাহিড়ী রচিত *রাণী ভবানী* (১৩১৬) গ্রন্থে সিরাজ-উদ-দৌলাহ কর্তৃক রাণী ভবানীর বিধবা কন্যা তারাসুন্দরীকে অপহরণের কথা বলা হয়েছে। যদি এ কথা সত্য হয় তবে রাণী ভবানীর সিরাজ বিরোধী ভূমিকা পালন করাই স্বাভাবিক। কিন্তু উপরে বর্ণিত সূত্রসমূহে রাণী ভবানীকে বিপরীত ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত উনিশ শতকে প্রচলিত জনশ্রুতির উপর ভিত্তিকরেই রাণী ভবানীকে দেশপ্রেমিক বীরঙ্গনা হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাণী ভবানী সম্পর্কে এসব রচনা এমন সময় হয়েছে যখন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পটভূমিকায় পলাশির ঘটনার নব মূল্যায়ন শুরু হয়েছিল। বস্তুত এসময় বাঙ্গালি মানস চেতনায় পরিবর্তনের ফলে পলাশিতে সিরাজ বিরোধিতাকে আর গৌরবের বিষয় নয়, বরং উল্টো ভাবে দেখা শুরু হয়েছিল। এরূপ বাস্তবতায় বাংলা সাহিত্যে রাণী ভবানী স্বদেশপ্রীতির আদর্শ হয়ে ওঠেন। এর সাথে ঐতিহাসিক বাস্তবতার মিল নেই।

পূনশ্চ উল্লেখ্য যে, পলাশি ঘটনায় বর্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর ও দিনাজপুরের জমিদারগণ যুক্ত ছিলেন বলে কিছু স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ। এ বিষয়ে ইংরেজ তথ্য সূত্রেও কিছু প্রামাণাদি রয়েছে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্ণেল স্কট কলকাতায় অবস্থানকালে বণিক উমিচাঁদের মাধ্যমে বর্ধমানের জমিদার রাজা তিলকচন্দ্রের সাথে তাঁর যোগাযোগে হয়েছিল। এ যোগাযোগ থেকে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, নবাব সরকারের প্রতি হিন্দু জমিদারগণ ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট এবং সুযোগ পেলে তারা একটি রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা করবে।[১১৬] নবাবী শাসনের প্রতি তিলকচন্দ্র যে বিরূপ এবং রাজনৈতিক পটরিবর্তনে যে খুশি হয়েছিলেন তার একটি উজ্বল প্রমাণ হলো পলাশির পরপরই ২৭ জুন ১৭৫৭ সালে গভর্নর রবার্ট ক্লাইভকে লেখা তাঁর একটি চিঠি।[১১৭] পলাশি বিপ্লবের প্রাক্কালে এবং অব্যাবহিত পরে বীরভূম ও দিনাজপুরের জমিদারদের ক্লাইভকে লেখা চিঠিতেও তাদের নবাব বিরোধী অবস্থান এবং ইংরেজদের প্রতি সমর্থনের বিষয়টি স্পষ্টতই উল্লেখ রয়েছে। বীরভূমের জমিদার ছিলেন আসাদ আল জামান। পলাশি যুদ্ধের তিন দিন পর ক্লাইভকে লেখা তাঁর পত্র থেকে বুঝা যায় যে, পলাশির নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সামরিক সাহায্য প্রদানে তিনি প্রস্তুতি নিয়ে ছিলেন।[১১৮] তবে সাহায্য

---

[১১৪] উদ্ধৃতি, রজতকান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র*, পৃ. ১৯২

[১১৫] কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, *আর্য-নারী*, কলিকাতা, ১৩১৬, পৃ.২৩৮-২৩৯; অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *রাণী ভবানী*, দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ.পৃ. ৮২-৮৩

[১১৬] S. C Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol. II, p. 86; রজতকান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র*, পৃ. ১৮২

[১১৭] Shirin Akhter, *op. cit.*, p. 107

[১১৮] প্রাপ্ত সূত্র মতে পলাশির প্রাক্কালে ক্লাইভ তাঁর কাছে সামরিক সাহায্য চেয়ে ছিলেন। Shirin Akhter, *op. cit.*, p. 107

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরণের পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। এতে বুঝা যায় যে, বিশেষ সম্পর্ক ও যোগাযোগ না থাকলে বীরভূমের জমিদারের কাছে নবাবের শত্রু ইংরেজরা সামরিক সাহায্য কামনা করতেন না। আর নবাবকে উৎখাতে নিজের সায় না থাকলে বীরভূম রাজ নিজেও সাহায্য পাঠাতে সম্মত হতেন না।

বিষ্ণুপুরের জমিদার ছিলেন রাজা চৈতন্য সিংহ। তাঁর সাথে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর বৈরী সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। ১৭৫৬ সালে মুর্শিদাবাদে কয়েকবারই রটনা হয়েছিল যে, নবাব বিষ্ণুপুরের অবাধ্য জমিদার রাজা চৈতন্য সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে যাচ্ছেন। ইংরেজরাও এ সংবাদ শুনেছিল বলে তাদের সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।[১১৯] অতএব পলাশির প্রাক্কালে তাঁর সিরাজ বিরোধী শিবিরের সাথে হাত মেলানো কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। তবে পলাশি বিপ্লবে নবাব বিরোধী অভিজাতদের সাথে মেদিনীপুরের রাজার সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে রাজীবলোচন যে তথ্য দিয়েছেন তার সত্যতা সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। মেদিনীপুরের রাজা বলতে তখনকার দিনে সেখানকার ফৌজদার রাজা রামসিংহকে বুঝাতো। তিনি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর গুপ্তচর বাহিনীরও প্রধান ছিলেন। কোনো কোনো সূত্রমতে তিনি নবাবের প্রতি আগাগোড়াই অনুগত ছিলেন। পলাশি বিপ্লবের পর তিনি নবাব মীর জাফরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলার চেষ্টা করেছিলেন বলেও জানা যায়।[১২০] তবে এ তথ্য সম্ভবত সম্পুর্ণ সঠিক নয়। উপরের বর্ণনায় দেখা গেছে যে, ইংরেজদের উৎকোচে রাজারামও বশীভুত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর পক্ষে পলাশি বিপ্লবে নবাব বিরোধী শিবিরের সাথে যুক্ত থাকা অস্বাভাবিক নয়। দিনাজপুরের জমিদার রাজা রামনাথও পলাশি চক্রান্তে সামিল ছিলেন বলে রাজীবলোচনের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। প্রতাপশালী এ ভূ-অভিজাতের পলাশি সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে অন্য কোনো সূত্রে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, পলাশি ঘটনায় তখনকার ভূ-স্বামী অভিজাতদের অবশ্যই একটি যোগসূত্র ছিল। অবশ্য বাংলা সাহিত্যসূত্রে ভূ-স্বামী জমিদার অভিজাতদের বিপ্লবে মূখ্য ভূমিকা পালনকারী হিসেবে চিহ্নিত করার যে প্রয়াস দেখা যায়, তার ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণীত হয় না। পলাশির ঘটনায় ভূ-অভিজাত জমিদাদের বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করলে তা সমকালীন ঐতিহাসিকদের কারো না কারো বর্ণনায় আবশ্যই স্থান পেতো। কিন্তু সমকালীন ফারসি ঐতিহাসিক সূত্রে এ বিষয়ে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। কাজেই বলা যায় যে, পলাশি বিপ্লবে ভূ-স্বামী অভিজাত জমিদারদের অবশ্যই ভূমিকা ছিল, তবে তা মূখ্য পর্যায়ের নয়।

৮.৬ পলাশির অনিবার্যতা এবং এতে অভিজাতদের সংশ্লিষ্টতার কারণ পর্যালোচনা

এ পর্যায়ে পলাশির অনিবার্যতা এবং এতে নবাবী বাংলার অভিজাতদের যুক্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে নানা বিতর্ক রয়েছে। পলাশি বিষয়ে বিদ্যমান রচনাসমূহে এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনটি মত রয়েছে। **প্রথমত:** একদল ঐতিহাসিক পলাশির অনিবার্যতা এবং এতে অভিজাত শ্রেণীর সংশ্লিষ্টতা

---

[১১৯] S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, p. 68

[১২০] রজতকান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র*, পৃ. ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণে নবাবী বাংলার দ্বিধাবিভক্ত সমাজের উপর জোর দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো ঐতিহাসিক পলাশিকে বাংলার হিন্দু-জৈন মারাওয়ারী শেঠ সওদাগর ও ব্যবসায়ী- মহাজনদের বিপ্লব বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা Collaboration Thesis উল্লেখ করে বলেন যে বাংলার বণিক-ব্যবসায়ীদের সাথে ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজ বণিক দের পারস্পরিক সহযোগিতার যে সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল তাতে স্থানীয় বণিক মহাজনরা নিজেদের স্বার্থে বাংলা থেকে ইউরোপীয়দের বিতাড়িত করার নবাবের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। যার অনিবার্যপরিণতি পলাশির যুদ্ধ। তৃতীয়তঃ একদল ঐতিহাসিক মধ্য আঠারো শতকে সৃষ্ট বাংলার অভ্যন্তরীণ সংকটের তত্ত্ব দিয়ে পলাশির অনিবার্যতা ও এতে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা ৰির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাদের মতে, একদিকে অভ্যন্তরীণ সংকট এবং অন্যদিকে নবাব কর্তৃক শাসক গোষ্ঠীর বনেদী অমাত্য ও সমাজের অভিজাত বলে পরিচিত গণ্যমান্য বণিক-ব্যবসায়ী ও ভূ-স্বামীদের অপমান ও হেনস্থা করার ঘটনায় সে সময় বাংলায় এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নবাবের প্রতি বিরূপ এ অভিজাতবর্গ তাঁকে মসনদচ্যুত করার পরিকল্পনা করে।

উপরে বর্ণিত তিনটি অভিমত বাহ্যত যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। কিন্তু নিবিড় পর্যালোচনা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে উপর্যুক্ত অভিমতসমূহের দুর্বলতা এমনকি ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে জোরালে দ্বিমত প্রকাশ করা যায়। সাম্প্রতিককালে গবেষকদের কেউ কেউ প্রচলিত মতামতসমূহের অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে সুশীল চৌধুরীর অগ্রগণ্য। অবশ্য সুশীল চৌধুরীর অনেক ব্যাখ্যা সম্পর্কেও ভিন্নমত পোষণের অবকাশ রয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় বিষয়গুলো স্পষ্ট হবে।

পলাশির প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলার সামাজিক দ্বিধাবিভক্তি তত্ত্ব দ্বারা পলাশির অনিবার্যতা ও এতে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা মূল্যায়ন প্রয়াসের মূল উদ্যোক্তা ইংরেজ ঐতিহাসিক Samuel Charles Hill (S. C. Hill নামে সমাধিক খ্যাত)।[১২১] ব্রিজেন কে গুপ্তা (১৯৬৬) S. C. Hill-এর এ মতের একজন জোরালো সমর্থক। তিনিও মনে করেন প্রাক-পলাশি বাংলার সমাজ হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতারভিত্তিতে বিভক্ত ছিল। হিল ও গুপ্তা উভয়েই লিখেছেন যে, বাংলার হিন্দুরা মুসলিম শাসনকে ঘৃণার চেখে দেখতো এরং এর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় উদ্‌গ্রীব ছিল।[১২২] পলাশি বিপ্লব এরই পরিণতি। মোহাম্মদ মোহর আলী (১৯৭৫) পলাশির ঘটনাকে হিন্দু অভিজাতদের বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের প্রয়াস হিসেবে মুল্যায়ন করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, আঠারো শতকের মধ্যভাগে বঙ্গ-ভারতে হিন্দু

---

[১২১] মঁশিয়ে জ্যাঁ ল এবং কর্ণেল স্কটের দু'টো মন্তব্যের সূত্রে S. C. Hill (১৯০৩) মধ্য আঠারো শতকের বাংলায় হিন্দু-মুসলিম দ্বিধাবিভক্ত সমাজের কথা বলেছেন। জ্যাঁ ল বলেছিলেন, 'হিন্দু রাজারা (জমিদার) মুসলমান শাসনকে ঘৃণার চোখে দেখতো। প্রখ্যাত ব্যাঙ্কার জগৎশেঠরা (যাদের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল) না থাকলে সিরাজ-উদ-দৌলা যে বিপ্লবে বিতাড়িত হন, তারপরে তারা হিন্দু রাজত্ব কায়েম করতো।' অন্যদিকে স্কট তার বন্ধুকে লিখেছিলেন, হিন্দু রাজারা এবং রাজ্যের হিন্দুরা মুসলিম শাসনের নীপিড়নে ক্ষুব্ধ। তারা গোপনে এর পরিবর্তন চাইছিল এবং এই অত্যাচারী শাসনের অবসানে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।' S. C. Hill, *Three Frenchmen in Bengal,* London , 105, p. 120 available in http://www.fullbooks.com/Three-Frenchmen-in-Bengal1.html

[১২২] S. C. Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. I, p. lii; B. K. Gupta, *op.cit.*, p. 41

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্জাগরণ ঘটে এবং এ প্রেক্ষাপটে বাংলার হিন্দু পুঁজিপতি শ্রেণী মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিল।[১২৩] তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ও (২০০৩) পলাশিকে হিন্দুদের বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১২৪] পলাশি মুসলিম শাসন উৎখাতে হিন্দু অভিজাতদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফসল কী-না এবং এর পিছনে হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল কী-না- এসব বিষয় বিবেচনার পূর্বে আঠারো শতকের নবাবী বাংলার সামাজিক জীবনে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে পাশাপাশি বাস করে এসেছে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু ও অপরাপর প্রজাসাধারণের প্রতি মুসলিম শাসকবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার ও সহনশীল। হিন্দু ও মুসলমানরা ঘনিষ্ঠতর সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।[১২৫] সমকালীন বাংলা সাহিত্যেও হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক সামাজিক সম্প্রীতির প্রতিফলন দেখা যায়। কবি ক্ষেমানন্দের *মনসামঙ্গল কাব্য*, *বেহুলাসুন্দর কাব্য*, কবি ভারতচন্দ্রের রচনাবলী এবং কবি ফৈজুল্লাহর *সত্যপীর* কাব্যে আঠরো শতক পর্যন্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় প্রক্রিয়ার চিত্র পাওয়া যায়। এ সমন্বয় প্রক্রিয়া শুধু স্থানীয় সাধারণ বাঙ্গালি সমাজের চিত্র ছিল না, সমাজের উপরতলার অভিজাত মানুষদের মধ্যেও এ সমন্বয় ধারা চোখে পড়ে।[১২৬] এডওয়ার্ড সি ডিমকও মনে করেন যে, পনের থেকে আঠারো শতকে রচিত বাংলা সাহিত্যে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে বাঙ্গালি হিন্দু-মুসলিম সমাজে সাম্প্রদায়িক দ্বিধাবিভক্তি এবং 'গভীর বিদ্বেষে'র প্রমাণ মিলে না।[১২৭]

নবাবী যুগে হিন্দু নিপীড়নে কথা কেউ কেউ বলে থকেন। অথচ নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে বাংলার প্রশাসন যন্ত্রে হিন্দু রাজকর্মচারীদের প্রাধ্যান্য লক্ষ্য করা যায়। A. Rahim, তাঁর 'The Rise of Hindu Aristocracy under The Bengal Nawabs' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।[১২৮] সম্প্রতি সুশীল চৌধুরী লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডসের *Orme Collections* এবং নেদারল্যান্ডের রাজকীয় মহাফেজখানায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রাক-পলাশি নবাবী বাংলার অমাত্য অভিজাত ও ভূ-স্বামী জমিদার শ্রেণীতে নিরঙ্কুশ হিন্দু প্রাধান্যের বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১২৯] অমাত্য ও জমিদার ছাড়াও নবাবী বাংলায় বণিক অভিজাতদের মধ্যেও হিন্দু ও জৈনদের নিরঙ্কুশ

---

[১২৩] Mohammad Mohar Ali, *The Fall of Sirajuddaulah*, pp. 8-12

[১২৪] তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, *পলাশির যুদ্ধ*, পৃ. ৪৫

[১২৫] এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খণ্ড,পৃ. ৩১২

[১২৬] করম আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ., ৮৩, ১২১; এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৩

[১২৭] Edward C Dimmock, 'Hinduism and Islam in Medieval Bengal', in Rachel van M Baumer (ed.), *Aspects of Bengali History and Society*, p. 2

[১২৮] Dr. A. Rahim, 'The Rise of Hindu Aristocracy under The Bengal Nawabs', *Journal of Asiatic Society of Pakistan*, vol. VI, 1961, pp. 104-118

[১২৯] তাঁর পরিবেশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, নবাব আলিবর্দী খানের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সাতটি শীর্ষ রাজকর্মকর্তার পদের ছয়টিই ছিল হিন্দুদের দখলে এবং এক্ষেত্রে মীর জাফর আলী খান ছিলেন একমাত্র মুসলমান। এ সময়কার ১৯ জন হিন্দু ভূ-স্বামী জমিদারের মধ্যে একমাত্র বীরভূমের জমিদার

Dhaka University Institutional Repository

প্রাধান্য ছিল। এসব তথ্য প্রমাণের আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নবাবী আমলে মুসলমান রাজত্বে হিন্দুরা মুসলমানদের চাইতেও সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। তাই সম্প্রদায়গতভাবে তারা নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন এবং এজন্য তারা মুসলিম শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য পলাশি বিপ্লব ঘটিয়েছিল এরূপ যুক্তি অসার। বস্তুত প্রাক-পলাশি বাঙ্গালি সমাজের সাম্প্রদায়িক দ্বিধাবিভক্তি প্রমাণের চেষ্টা ইংরেজ ঐতিহাসিকদের একটি উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রয়াস। মূলত দ্বিধাবিভক্ত সমাজের তত্ত্ব দিয়ে ইংরেজরা তাদের বাংলা বিজয়ের যথার্থতা প্রমাণ করতে চান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাক-পলাশি বাংলার সমাজের উপরতলার অভিজাতদের মধ্যে টানাপোড়েন ছিল সত্য, কিন্তু এ টানাপোড়েন কোনোভাবেই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে উৎসরিত ছিল না। এর মূলে ছিল প্রধানত ব্যক্তিস্বার্থ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রেণীগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ চিন্তা। বস্তুত পলাশি বিপ্লবে অভিজাতবর্গ মূখ্যত ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অংশত শ্রেণী বা গোষ্ঠী স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে নবাবের পক্ষে বা বিপক্ষে অংশ নিয়েছিল, কোনোক্রমেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয়। সাম্প্রদায়িক কারণে পলাশির ঘটনা ঘটেনি বলেই নবাব বিরোধী চক্রে যেমন হিন্দু অভিজাত ছিলেন, তেমনি মুসলমান অভিজাতও। নবাবের পক্ষভূক্ত অভিজাতদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তদুপরি পলাশি যদি হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির মুসলিম শাসন উৎখাতের প্রচেষ্টা হতো, তবে এক মুসলমান নবাবকে হটিয়ে আরেক মুসলমানকে নিশ্চয়ই মসনদে বসানো হতো না। বর্ণিত এসব যুক্তির অলোকে পলাশিকে কোনভাবেই বাংলার হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দ্বিধাবিভক্ত সমাজের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই।

পলাশির অনিবার্যতা এবং এতে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় আধুনিক ইতিহাসবিদদের কেউ 'পারস্পরিক সহযোগিতা তত্ত্বের' (Collaboration Thesis) উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। S. C. Hill কে এ তত্ত্বেরও মূল উদ্‌গতা (originator) বলা যেতে পারে। পরবর্তী ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্রিজেন কে গুপ্তা, মাইকেল এডওয়ার্ডস (১৯৬৯) এবং পিটার জে মার্শল (১৯৮৮) ও ক্রিস এ বেইলী (১৯৮৭) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ Collaboration Thesis এর আলোকে পলাশির ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এই তত্ত্বের অনুসারী ঐতিহাসিকগণ মনে করেন ইউরোপীয় বাণিজ্য বিকাশের ফলে বাংলার অভিজাত হিন্দু-জৈন ব্যবসায়ীদের সাথে ইউরোপীয়, বিশেষ করে ইংরেজদের একটি ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের মতে, বাংলায় ইউরোপীয়রাই বাণিজ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি সোনা-রুপা আমদানি করতো এবং এর ফলে বাংলায় একটি প্রভাবশালী মুদ্রা ব্যবসায়ী সাররাফ শ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটে। ইউরোপীয়দের সাথেও তাদের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[১৩০] এমনকি ক্রিস বেইলী একথা ও বলেছেন যে, বাংলার বণিক-ব্যবসায়ী ও জমিদারদের স্বার্থ ইউরোপীয়দের স্বার্থের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে, নবাব কর্তৃক বাংলা থেকে ইংরেজদের

ছিলেন মুসলমান এবং বাকী ১৮ জনই হিন্দু। আলিবর্দী খানের সময়কার হিন্দু প্রাধান্যের এ চিত্র নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় কোনো পরিবর্তন হয়নি, বরং এ সময় সর্বক্ষেত্রে হিন্দু প্রাধান্য আরো বেড়ে গিয়েছিল। Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire:*, p. 64

[১৩০] Peter J Marshall, *op.cit.*, pp. 65,67; Michael Edwards, *Plassey: The Foundin of An Empire.* Hamis Hamilton, London, 1969, p.111

Dhaka University Institutional Repository

তাড়ানোর ব্যাপারটা তারা সহ্য করতে পারছিল না এবং সেজন্যই পলাশির ঘটনাটি ঘটলো।[১৩১] ব্রিজেন কে গুপ্তাও প্রায় একই রকম মত প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন যে, বাংলার হিন্দু ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ ইউরোপীয়দের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ায় তারা নবাবী শাসনের অবসান এবং বাংলায় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রধান সহায়কের (cataytic agent) ভূমিকা পালন করেছিল।[১৩২]

পলাশির অনিবার্যতা এবং এতে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা ব্যাখ্যায় Collaboration Thesis আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত মনে হলেও এর ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রশ্নে যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। ইউরোপীয়রা সোনা-রুপা সবচেয়ে বেশি এনে এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন- শিরীন মুসভি এ মতের ব্যাপারে জোরালো দ্বিমত প্রকাশ করেছেন।[১৩৩] অন্যদিকে সুশীল চৌধুরী বিভিন্ন তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন মধ্য আঠারো শতকেও বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের তুলনায় এশীয় বাণিজ্যের পরিমাণ বেশি ছিল।[১৩৪] প্রসঙ্গত সুশীল চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে, ইউরোপীয়ই হোক বা এশীয়ই হোক সব ব্যবসায়ীকে সোনা-রুপা বা নগদ অর্থ নিয়ে এসে বাংলা থেকে পণ্য সংগ্রহ করতে হতো। তাই বেশি পণ্যের রপ্তানিকারক হিসেবে বাংলায় নগদ টাকা বা সোনা-রুপা আনার ভূমিকা ইউরোপীয়দের তুলনায় এশীয় বণিকদেরই বেশি।[১৩৫] ইংরেজ কোম্পানির কর্তা William Bolts, Harry Verelest এবং Luke Scrafton- এর জবানীতেও সুশীল চৌধুরীর মতের সমর্থন পাওয়া যায়।[১৩৬] সুতরাং ইউরোপীয় বাণিজ্য এবং তাদের আমদানি করা সোনা-রুপা দ্বারা এদেশের বণিক ব্যবসায়ীদের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার বিষয়ে সংশয় প্রকাশের যথেষ্ট কারণ আছে। কাজেই এ বিষয়টিকে প্রধান্য দিয়ে এর সাথে অভিজাতদের সম্পৃক্ত করার যৌক্তিকতা সম্পর্কেও প্রশ্নের অবকাশ থাকছে।

ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজ কোম্পানির ভাগ্যের সাথে এ দেশের বণিক-ব্যবসায়ী ও জমিদারদের ভাগ্য নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল- বহুল বর্ণিত একথাটিও যথার্থ বলে মেনে নেয়া যায় না। কেননা এ কথাটি তখনই সত্য হবে যখন দেখা যাবে যে ইউরোপীয়দের সাথে বাণিজ্যিক লেন-দেন নবাবী বাংলার অভিজাত বণিক ব্যবসায়ীদের আয়বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান উৎস হবে। কিন্তু প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা যায় যে, পলাশির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বণিক-ব্যবসায়ী ও জমিদারদের

---

[১৩১] C. A. Bayly, *Indian Society*, p. 50

[১৩২] B. K. Gupta, *op.cit.*, p. 32

[১৩৩] Shireen Moosvi, 'The Silver influx, Money Supply, Prices and Revenue Extraction in Mughal India', *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, vol. XXX, 1987, pp. 92-94

[১৩৪] উদাহরণ স্বরূপ তিনি তাঁর বর্ণনায় বাংলার প্রধান দুটি রপ্তানি পণ্য বস্ত্র ও রেশমের রপ্তানি বাণিজ্যে এক দশকের (১৭৪৭-১৭৫৭) একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রদত্ত চিত্রে দেখা যায় যে, পর্যালোচনাধীন সময়ে বর্ণিত দু'টি পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের তুলনায় এশীয় বণিকদের অবদান অনেক বেশি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Sushil Chaudhury, 'The Asian merchants and companies in Bengal's export trade, circa mid-eighteenth century', in *Merchants, Companies and Trade: Europe and Asia in the Early Modern Era*, edited by Sushil Chaudhury, Cambridge University Press, 1999, pp. 320-333

[১৩৫] Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire:*, pp. 71-72

[১৩৬] William Bolts, *Considerations of Indian Affairs*, p. 200; Harry Verelest to court of Directors, 2 April, 1769, *Bengal Public Consultations*, Vol 24; Luke Scrafton, *Reflections*, p. 20

Dhaka University Institutional Repository

কেউই ইউরোপীয় বা ইংরেজদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রতিপত্তিশালী হননি। পলাশির ঘটনার প্রধান তিন অগ্রণী ছিলেন বণিক অভিজাত জগৎশেঠ, খোজা ওয়াজিদ এবং উমিচাঁদ। ১৭৫৭ সালে লিউক স্ক্রাফ্‌টন জগৎশেঠদের বার্ষিক আয়ের যে হিসাব দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, তাদের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে মুদ্রা বিনিময় বাট্টা এবং বাণিজ্যিক ঋণের সুদ থেকে আয় ছিল মাত্র ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা।[১৩৭] আর এ আয়ের সবটাই কিন্তু ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ বিশেষ করে ইংরেজদের প্রদত্ত বাণিজ্যিক ঋণ বা তাদের আনা সোনা-রুপায় তৈরী মুদ্রার বাট্টা থেকে অর্জিত হয়নি। তারা এশীয় ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও বাণিজ্যিক ঋণ দিতেন। সোনা-রুপা আমদানির ক্ষেত্রেও যে ইউরোপীয় বা ইংরেজদের প্রাধান্য ছিলনা সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জগৎশেঠদের বেশির ভাগ আয়ের উৎস কোনভাবেই ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজদের বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল না। একই কথা খোজা ওয়াজিদ এবং উমিচাঁদের প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। খোজা ওয়াজিদের প্রধান বাণিজ্য সহযোগী ছিল ফরাসিরা। উমিচাঁদের মাধ্যমে ইংরেজ কোম্পানির সাথেও তিনি কিছু বাণিজ্য করতেন। তবে তাঁর বিশাল বিস্তৃত বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যে ইউরোপীয় বাণিজ্যের অবদান ছিল নিতান্তই নগণ্য। উমিচাঁদের সাথে ইংরেজদের ব্যবসা ছিল বটে, তবে তিনিও মূল অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন সোরা, আফিম ও শস্যের একচেটিয়া ব্যবসার মাধ্যমে এবং এসব একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার লাভ করেছিলেন নবাব দরবারের আনুকূল্যে। উপরে বর্ণিত তথ্য উপাত্তের আলোকে একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, বাংলার অভিজাত বণিক ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজ কোম্পানির সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল বলে যে মত প্রকাশ করা হয় তা তথ্যভিত্তিক নয়। ইংরেজ বা ইউরোপীয় কোম্পোনির সাথে যে সকল বণিক ব্যবসায়ী নিবিড় সম্পর্কে জড়িত ছিলেন, তারা ছিলেন দালাল গোছের বণিক। বাংলার তদানিন্তন সমাজ জীবনে তারা অভিজাত হিসেবে পরিগণিত হননি এবং পলাশি বিপ্লবে ভূমিকা রাখার মতো সক্ষমতা তাদের ছিল না। সামাজিক শক্তি হিসেবে অভিজাত পর্যায়ভুক্ত বণিক ব্যবসায়ীদের উত্থান এবং তাদের প্রতিপত্তি কোনোভাবেই ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল ছিল না। একারণেই নিজেদের স্বার্থে এদেশীয় অভিজাত শেঠ-সওদাগররা ইউরাপীয় কোম্পানি বিশেষ করে ইংরেজ কোম্পানিকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করার নবাবী পরিকল্পনা নস্যাতে পলাশি বিপ্লব সংঘটনে ভূমিকা রাখেন- এরূপ বক্তব্যও অসার বলেই প্রমাণিত হয়।

আধুনিককালে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মধ্য আঠারো শতকের বাংলার অভ্যন্তরীণ গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের কথা বলে ইংরেজদের বাংলা বিজয় এবং পলাশি ও এতে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন। এ মতানুসারী ইতিহাসবিদগণ মনে করেন যে, মুর্শিদকুলি খান থেকে নবাব আলিবর্দী খান পর্যন্ত নবাবী রাষ্ট্রে যে সংহতি এবং স্থায়িত্ব - তা ছিল মূলত তদানিন্তন অমাত্য, ভূ-স্বামী-জমিদার ও বণিক-ব্যাঙ্কারদের নিয়ে গড়ে ওঠা অভিজাত শ্রেণীর সাথে নবাবের নিবিড় জোটবদ্ধতার ফসল। তাদের মতে, সিরাজ-উদ-দৌলাহ নবাব হওয়ার পর অভিজাত শ্রেণীর

[১৩৭] Luke Scrafton to Clive, 17 December, 1757 ; Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire:*, pp.72-73

Dhaka University Institutional Repository

সাথে নবাবের জোটবদ্ধতায় ছেদ পড়ে এবং এতে করে বাংলায় এক গভীর রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়।[১৩৮] সিরাজের ক্ষমতারোহনের ফলে নবাবের সাথে অভিজাত শ্রেণীর জোটবদ্ধতায় ভাঙ্গনের কারণ ব্যাখ্যায় তারা নবাবের ব্যক্তিগত দোষ ক্রটির উপর বিশেষ জোর দেন। সমকালীন কিছু ফারসি ঐতিহাসিক তথ্য সূত্র এবং বাছাই করা কিছু ইউরোপীয়-ইংরেজ পর্যবেক্ষক ইতিহাসবিদের বক্তব্যের আলোকে তারা বলেন যে, সিরাজ-উদ-দৌলাহ ছিলেন রুক্ষ, বদ-মেজাজী এবং কর্কশ স্বভাবের। নবাব হওয়ার পর তিনি পুরনো অভিজাত অমাত্যদের (যারা তারা মাতামহের সময় থেকে মুর্শিদাবাদ প্রশাসনে প্রভাবশালী ছিলেন) সাথে অন্যায় আচরণ শুরু করেন। *সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিণের* বিবরণ মতে, তরুণ নবাব ক্ষমতায় আরোহনের পর প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন। এই পরিবর্তনে পুরনো অভিজাতরা ক্ষমতা বঞ্চিত হয়ে নবাবের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হন। তাছাড়া তাঁর দুর্বিনীত আচরণে অভিজাত সভাসদগণ তাঁকে ভীষণ অপছন্দ করতে থাকেন এবং তাঁকে যে কোনো ছল বা কৌশলে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সচেষ্ট হন।[১৩৯] অন্য সূত্রে বলা হয়েছে যে, দরবারে নবাবের ব্যবহার দেখে অভিজাত অমাত্যবৃন্দ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। একদিকে আমির ওমরাদের সামনে পেলে চক্ষু রক্তবর্ণ করে নবাব অশ্রাব্য ভাষায় তাদের গালিগালাজ করতেন, অন্যদিকে মসকরাচ্ছলে সম্ভ্রান্ত পুরনো অভিজাতদের এমন সব নামকরণ করতেন যা শুনে হাঁসি সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়তো।[১৪০] ইউসুফ আলী খানের ভাষ্য মতে, নবাবের সাথে সাক্ষাত করতে গেলে আমির-ওমরাদের সম্মান বিসর্জন দিয়ে উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার মধ্যে যেতে হতো। এমন একদিন ছিল না যে তিনি সম্মানার্হ ব্যক্তিদের প্রতি অসম্মান ও অপমানজনক আচরণ করেননি।[১৪১] *সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিণের* ভাষ্যও কমবেশি একই রকমের। সিয়ারে বলা হয়েছে যে, সিরাজের হিংস্রতা ও ঘনঘন মেজাজ পরিবর্তনের ফলে দরবারের অভিজাত অমাত্যবর্গ সন্ত্রস্ত ও তটস্থ হয়ে থাকতেন। তারা মনে করতেন সিরাজের অধীনে তাদের জীবন, সম্মান ও সম্পদ নিরাপদ নয়। নবাবের কর্কশ ভাষা ও আবেগপূর্ণ আচরণের জন্য পদস্থ অমাত্যগণ তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সিয়ারের ভাষ্য অনুযায়ী, নবাবের প্রতি অসন্তুষ্ট অমাত্যবর্গ তাঁর শাসনাধীনে থাকার ব্যাপারে অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং প্রয়োজনে নবাবকে হত্যা করে তাঁর কবল থেকে মুক্তি কামনা করেন। সিয়ার রচয়িতা আরো উল্লেখ করেছেন যে, জগৎশেঠের বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলেন আমির বেগ। পলাশির প্রক্কালে জগৎশেঠের নির্দেশে তিনি ইংরেজদের কলকাতা কুঠিতে গিয়ে নবাব কর্তৃক দরবারের অমাত্যদের উপর অন্যায় অত্যাচারের বিষয় তুলে ধরে তাদের মুক্ত করার জন্য ইংরেজদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন।[১৪২] নবাব আলিবর্দীর আমলের বনেদি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সিরাজ-উদ-দৌলাহ কর্তৃক পদেপদে অপমানিত ও অসম্মানিত হচ্ছিলেন বলে উইলিয়াম ওয়াটসও তাঁর স্মৃতি কথায় উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন, দরবারে কেউই

---

[১৩৮] Peter J Marshall, *op.cit.*, pp. 66-67, 75; C. A. Bayly, *Indian Society*, p.o.49-50; Rajatkanta Roy, 'Colonial Penitration', p. 7, 12,. 14

[১৩৯] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৪

[১৪০] রজতকান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র*, পৃ. ১৩৯

[১৪১] ইউসুফ আলী খান, পূর্বোক্ত, পৃ., ১৭১

[১৪২] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, প,পৃ. ৪৪০, ৪৪৭, ৪৮২

তার অবস্থান সম্পর্কে নিরাপদ নয়, তাই কেউই সন্তুষ্টিতে নেই।[১৪৩] বর্ণিত এসব তথ্যের মোদ্দা কথা হচ্ছে সিরাজ-উদ-দৌলাহ ছিলেন একজন দুর্বিনীত ব্যক্তি। তিনি ব্যক্তিগত অসাদাচরণের মাধ্যমে সামরিক- বেসামরিক অমাত্য অভিজাতদের (যারা ছিলেন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের প্রতীক) বিক্ষুব্ধ করে তোলেন। ফলে তারা সিরাজের হাত থেকে রেহাই পেতে তৎপর হয়ে ওঠেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ উপরে বর্ণিত সূত্রসমূহের বরাত দিয়ে বলতে চান যে, সিরাজ-উদ-দৌলাহর ব্যক্তিগত আচরণের কারণেই পুরনো অভিজাতরা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফলে নবাবের সাথে অভিজাতদের দীর্ঘদিনের জোটবদ্ধতা ভেঙ্গে পড়ে এবং বাংলায় রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। আর পলাশি এ রাজনৈতিক সংকটেরই ফসল।

সিরাজ-উদ-দৌলাহর প্রতি ভূস্বামী জমিদারদের বিরাগভাজন হওয়া প্রসঙ্গে নবাব কর্তৃক তাদের জাতি-ধর্ম নাশের আশঙ্কার কথা বলা হয়। সূত্র মতে নবাব ছিলেন দুঃশ্চরিত্রের অধিকারী। তিনি লাম্পট্য হেতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্ত্রী-কন্যাদের হরণ করে নিয়ে এসে তাদের জাতি-ধর্ম নাশ করতেন। উদাহরণ স্বরূপ নাটোরের রাণী ভবানীর বিধবা কন্যা তারাসুন্দরীর ঘটনার অবতারণা করা হয়। রজকান্ত রায়সহ আধুনিক ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ এমতের উপর আস্থাশীল বলে মনে হয়। বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য রজকান্ত রায় রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, নীলমনি বসাক, দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রমুখ উনিশ শতকের কয়েকজন বাঙ্গালি লেখক এবং মঁশিয়ে জ্যাঁ ল ও গোলাম হোসেন তবাতবায়ির বক্তব্যকে তুলে ধরে সিরেজের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট লোকদের স্ত্রী হরণের বিষয়টি অসত্য নয় বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪৪] তবে রজত কান্তের এমত গ্রহণযোগ্য হিসেবে নেয়া যায় না। এ সম্পর্কে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (২০০৬)-এর বর্ণনা যুক্তিসঙ্গত। মৈত্রেয় যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তারাসুন্দরীর অপহরণসহ নবাবের বিরুদ্ধে এ সংক্রান্ত কিছু অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করেছেন।[১৪৫]

প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক যে, সিরাজের ব্যক্তি চরিত্র ও পুরনো অভিজাতদের সাথে তার দুর্বিনীত আচরণ সম্পর্কে সমকালীন ফারসি সূত্রসমূহের বর্ণনা কোনক্রমেই তর্কতীত নয়। পর্যালোচনাধীন গবেষণার অন্যত্র এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। নানা কারণে সমকালীন এসব ইতিহাস রচয়িতাদের নবাবের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশের কথাও অজানা নয়। যার প্রতিফলন তাদের লেখনিতে থাকা স্বাভাবিক। তদুপরি এসব গ্রন্থ রচনার পিছনে ইংরেজদের তুষ্ট করারও একটি প্রবণতা ছিল। আর সমকালীন ইংরেজ বা ইউরোপীয় সূত্রসমূহ যে বাজারি গুজবে ভরতি ছিল, তা বলা বাহুল্য। কাজেই এসব তথ্য উপাত্তকে অবলম্বন করে নবাব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বনেদি অভিজাতদের অসম্মান অপদস্ত করার মতো বিষয় টেনে এনে একে দিয়ে জোটবদ্ধতার ভেঙ্গে পড়ার বিষয়টি প্রমাণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা খুবই স্বাভাবিক। তদুপরি সিরাজ-উদ-দৌলাহর পূর্বসূরী নবাবদের সাথে অভিজাত শ্রেণীর যে জোটবদ্ধতার কথা বলা হচ্ছে সে সম্পর্কেও দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ রয়েছে। সুশীল চৌধুরী মনে করেন নবাবী বাংলায় পদস্থ অমাত্য, জমিদার ও বণিক মহাজনদের নিয়ে যে অভিজাত শ্রেণী

[১৪৩] Watts' *Memoirs*, p. 38
[১৪৪] রজতকান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র*, পৃ.পৃ. ১৮৮-১৮৯
[১৪৫] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৫

গড়ে ওঠেছিল তাকে একটি মজবুত ও সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখা বা একে একটি বিশিষ্ট শক্তিসংঘ হিসেবে গণ্য করা মোটেই ঠিক হবে না। নবাবদের সঙ্গে অভিজাতবর্গের জোটবন্ধনকে শ্রেণীভিত্তিক হিসেবে গণ্য করা যায় না। বস্তুত নবাব ও অভিজাতদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক জোটবদ্ধতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল। নবাবের সঙ্গে অভিজাতদের মৈত্রী ছিল নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা প্রসুত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কোনো শ্রেণী বা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ছিল না। সুশীল চৌধুরী উদাহরণ স্বরূপ পলাশি পূর্ব ১৭৩৯-৪০ সালে নবাব সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে আলিবর্দী খানের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান এবং এতে অভিজাতবর্গের সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, এই রাজনৈতিক পালাবদলে অভিজাত শ্রেণীর কোনো শ্রেণীগত সমঝোতার প্রয়াস দেখা যায় না। এতে ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে অভিজাতদের কেউ কেউ নবাবের পক্ষে এবং কেউ কেউ আলিবর্দী খানের পক্ষে কাজ করেছিলেন।[১৪৬] পলাশি বিপ্লবের প্রক্কালে লিউক স্ক্রাফ্টনের উদ্দেশে উইলিয়াম ওয়াটসের পাঠানো বিবরণীতেও এ বিষয়টি লক্ষণীয়। উক্ত বিবরণী মতে, নবাবের দরবারে কোনো ঐক্য নেই, সবাই নবাবের বিপক্ষে, তবে বিপক্ষীয়গণও নিজেরা কেউ কারো পক্ষে নয়, প্রত্যেকেই স্বার্থপর এবং যার যার স্বার্থ ছাড়া কেউ কথা বলে না।[১৪৭] এসব যুক্তি প্রমাণের আলোকে বলা যায় যে, নবাবী আমলে অভিজাতদের সাথে নবাবদের কোনো শ্রেণীগত জোটবদ্ধতা গড়ে ওঠেছিল তা নিশ্চিতরূপে বলা সম্ভব নয়। কাজেই সিরাজ-উদ-দৌলাহর ক্ষমতায় আরোহণের ফলে (কারণ যাই হোক না কেন) শ্রেণীগত জোটবদ্ধতা ভেঙ্গে পড়ে এবং এর ফলে বাংলায় রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়- এরূপ বক্তব্য যৌক্তিক বলে মনে হয় না। আর একারণেই প্রাক পলাশি বাংলায় কথিত এ রাজনৈতিক সংকটের আলোকে পলাশিকে ব্যাখ্যা এবং এতে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা মূল্যায়ন সমিচীন হবে না। কোনো কোনো পণ্ডিত প্রাক-পলাশি বাংলায় অর্থনৈতিক সংকটের কথাও বলছেন।[১৪৮] এ সংকটের লক্ষণ হিসেবে অর্থনৈতিক অবস্থার অধোগতি, শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি, বণিক ব্যবসায়ীদের আর্থিক দুর্গতি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি কথা বলা হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে পর্যালোচনাধীন সময়ে ইংরেজ কোম্পানিসহ ইউরোপীয়দের রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাটতির কথাও উল্লেখ করা হয়।[১৪৯] তাদের ভাষ্যমতে, এ আর্থিক দুর্গতি বাংলায় দীর্ঘ ও পুণপৌণিক মারাঠা আক্রমণের ফল। মারাঠা আক্রমণের ফল যে বাংলার জনজীবন ও অর্থনীতির উপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল তা প্রমাণের জন্য তারা প্রধানত গঙ্গারাম প্রণীত *মহারাষ্ট্র পুরাণসহ* সমসাময়িক কিছু সাহিত্য ও *রিয়াজ-উস-সালাতিনসহ* কিছু ফারসি ইতিহাস গ্রন্থকে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তবে *মহারাষ্ট্র পুরাণ* এবং সমকালীন সাহিত্য উপকরণে মারাঠা আক্রমণের ফলাফল সম্পর্কিত বর্ণনায় কাব্যিক ও সাহিত্যিক ভাবাবেগ এবং উচ্ছ্বাস অনেক বেশি মাত্রায় থাকায় এসব সূত্রকে

---

[১৪৬] Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire:*, pp.75-76
[১৪৭] Watts' *Memoirs*, p. 37
[১৪৮] K N Chaudhuri, *Trading World of Asia and the English East India Company1660-1760*, Cambridge, 1978; Peter J Marshall, *East Indian Fortune*, Oxford, 1976
[১৪৯] K. N. Chaudhuri, *op. cit.*, p.545

ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে গ্রহণ ও এসবের আলোকে সিদ্ধান্তে আসা সমীচিন নয়। এ প্রসঙ্গে সমকালীন ফারসি উৎসসমূহের বর্ণনাতেও অতিরঞ্জন রয়েছে বলেই মনে হয়।

কোনো কোনো গবেষক মনে করেন মারাঠা আক্রমণের ফলে নবাব আলিবর্দী খান বণিক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছিলেন, তাতে অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল। বণিক ব্যবসায়ীদের এ আর্থিক দুর্গতির জন্যই ইংরেজ ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা বাংলায় মধ্যস্বত্বভোগী দাদনি ব্যবসায়ীদের পরিবর্তে নিজস্ব বেতনভোগী গোমস্তাদের মাধ্যমে উৎপাদকদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য সংগ্রহ শুরু করেছিল।[১৫০] প্রসঙ্গত তারা প্রাক-পলাশি বাংলার দব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করে বাংলার অর্থনীতির দুরাবস্থার কথা প্রমাণ করতে চান। সুশীল চৌধুরী আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাংলার অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ও সংকট সম্পর্কিত উপরে বর্ণিত মতামতসমূহের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে তাঁর বেশকিছু মূল্যবান লেখা রয়েছে।[১৫১] এসব রচনায় সুশীল চৌধুরী যুক্তি প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, প্রাক-পলাশি বাংলায় যে অর্থনৈতিক সংকটের কথা বলা হয় তা মোটেই বাস্তবভিত্তিক নয়। চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে, মারাঠাদের আক্রমণের ফলে বাংলার শিল্প বাণিজ্যে কোনো দীর্ঘস্থায় প্রভাব পড়েনি। প্রমাণ স্বরূপ তিনি মধ্য আঠারো শতকে বাংলা থেকে ইউরোপীয় ও এশীয় বণিকদের বিপুল রপ্তানির তথ্য দিয়েছেন।[১৫২] তিনি মনে করেন আঠারো শতকের পঞ্চাশের এর দশকের প্রথম পাঁচ বছর ইংরেজদের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ সামান্য হ্রাস পেয়েছিল বটে, তবে ইউরোপীয় কোম্পানি সমূহের সামগ্রিক রপ্তানি বাণিজ্যের কোন ঘাটতি হয়নি। আর ইংরেজদের সামন্য যে রপ্তানি ঘাটতি হয়েছিল তা বাংলার অর্থনৈতিক সংকটের কারণে নয়, বরং তাদের নিজস্ব কিছু সমস্যা এবং গোমস্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের নতুন পদ্ধতির কারণে।[১৫৩] প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বণিকদের আর্থিক দুরাবস্থার কারণে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো পণ্য সংগ্রহে দাদনি ব্যবস্থার পরিবর্তে গোমস্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল- এরূপ বক্তব্যও মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর ইংরেজ ও অন্যান্য কোম্পানির এরূপ নীতি গ্রহণের বিষয়টি ছিল নিতান্তই সাময়িক ব্যবস্থা। আর তাও আবার গৃহীত হয়েছিল নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক সমস্যার কারণে, এর সাথে বাংলার বণিকদের আর্থিক দুর্গতিকে যুক্ত করার কোনো কারণ নেই।[১৫৪] অর্থনৈতিক সংকটের কথা বলতে গিয়ে মধ্য আঠারো শতকে বাংলায় জিনিসপত্রের মূল্য বিশেষ

---

[১৫০] *Ibid*, pp. 310-312

[১৫১] এ বিষয়ে সুশীল চৌধুরীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছেঃ 'সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থাঃ নবাবী আমল', 'আঠারো শতকে ইউরোপীয় কোম্পানি ও বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য'। এ দুটি প্রবন্ধই সংকলিত হয়েছে সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ২য় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩; *Rethinking Early Modern India,* ed. Richard B. Barnet, New Delhi, 2002 তে প্রকাশিত । এ ছাড়াও রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *From Prosperity to Decline: Bengal in the Eighteenth Century,* এবং *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757* ।

[১৫২] বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সুশীল চৌধুরী, 'সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থাঃ নবাবী আমল', *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ৩৬-৬১

[১৫৩] Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire,* p. 77

[১৫৪] সুশীল চৌধুরী, 'সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থাঃ নবাবী আমল' *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

করে বস্ত্র, রেশম এবং চালের মূল্যস্তরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির যে কথা কোনো কোনো পণ্ডিত[১৫৫] বলেছেন বিস্তারিত তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে সুশীল চৌধুরী তারও গলদ ও ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করেছেন।[১৫৬] তিনি মনে করেন বর্ণিত এসব পণ্যের মূল্য এমন কিছু বাড়েনি যাতে এ মূল্যবৃদ্ধিকে 'লক্ষণীয় ও ক্রমাগত' (marked and sustained) বৃদ্ধি বলা যেতে পারে। উপরের পর্যালোচনা এবং বর্ণিত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, পলাশির অনিবার্যতা এবং এতে অভিজাত বণিক-ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণের ব্যাখ্যায় প্রাক-পলাশি বাংলার যে অর্থনৈতিক সংকটের কথা বলা হয় তার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে বড় রকমের প্রশ্ন রয়েছে। সুতরাং এ সংকটের তত্ত্ব দিয়েও পলাশিতে অভিজাতদের ভূমিকা মূল্যায়ন যথাযথ হবে না।

এ পর্যায়ে সঙ্গত কারণেই পলাশি বিপ্লবে অভিজাতদের অংশগ্রহণের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পলাশির ঘটনায় সিরাজী বিরোধী চক্রীদলের সাথে যুক্ত ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থবাদী কিছু ব্যক্তি। *সিয়ার-উল- মুতাখখিরিণ*'র বিবরণ মতে, নবাবের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট অমাত্যবর্গ ও অভিজাতগণ দরবারে একটি জোট তৈরি করেছিল এবং এ ব্যাপারে তারা একটি সম্মতি দলিলে স্বাক্ষরও করেছিলেন।[১৫৭] তবে জোট গঠনের এ তথ্যটি সমকালীন আর কোনো সূত্রে উল্লেখ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যদি সিরাজ বিরোধী অভিজাতদের মধ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক জোট হয়েও থাকে, তবে তা কোনো শ্রেণী স্বার্থগত জোট ছিল না। এটি ছিল কায়েমি স্বার্থবাদী অভিজাতদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার উপায় মাত্র। বস্তুত পলাশির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সিরাজ বিরোধী অভিজাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অভিন্ন লক্ষ্য ছিল মাত্র একটি, আর তা হলো যে কোনো উপায়ে সিরাজকে নবাব পদ হতে উৎখাত। এ অভিন্ন লক্ষ্যের পেছনে ছিল তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্বার্থ চিন্তা। ইতোমধ্যে উল্লেখিত উইলিয়াম ওয়াটসের বক্তব্যেও বিষয়টি ফুটে ওঠেছে। বস্তুত নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহার উৎখাত সাধনে মীর জাফরের যে স্বার্থ ছিল, তার সাথে অমাত্য অভিজাত চক্রের রাজা দুর্লভরাম, ইয়ার লতিফ বা রাজা রাজবল্লভের স্বার্থকে এক করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। নবাব আলিবর্দী খানের সময় থেকে মীর জাফর আলী খান রাষ্ট্রীয় সামরিক প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহও তাঁকে এ পদে বহাল রাখেন। তবে সীমাহীন ক্ষমতালোভ ও উচ্চাভিলাসী হওয়ায় বাংলার নবাব পদ লাভের একটি উদগ্র বাসনা তাঁর মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল। নবাবের খালা ঘসেটি বেগমের সাথে এবং পুর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার পিছনে তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল এই একটাই। অবশ্য উপর্যুপরি ব্যর্থতার ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর আশংকা হয়েছিল যে, বাংলার নবাব হওয়াতো দুরের কথা নবাব সরকারে তাঁর বর্তমান অবস্থান ধরে রাখাও ক্রমশ অসম্ভব হয়ে ওঠছে। দায়িত্ব গ্রহণের পরই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ কর্তৃক সামরিক ও বেসামরিক

[১৫৫] K. K. Datta, *Bengal Subah*, pp. 463-469; K. N. Chaudhuri, *op. cit.*, pp.99-108; B. K Gupta, *op. cit.*,p. 33; P. J Marshall, *East Indian Fortune*, p. 35

[১৫৬] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য Sushil Chaudhury, *From Prosperity to Decline*, pp. 278-305; *The Prelude to Empire*, pp. 77-79

[১৫৭] সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনের পুনর্গঠন এবং মোহনলাল, মীরমদন এবং খাজা আবদুল হাদি খান প্রমুখ নব্য অভিজাত অমাত্যদের প্রশাসনে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা মীর জাফরসহ পুরনো অভিজাত অমাত্যদের নবাব সরকারের ক্ষমতাকাঠামোতে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখা সম্পর্কে শংকিত করে তুলেছিল। নবাব সরকারের ক্ষমতাবান অমাত্য হিসেবে পরিচিত মুর্শিদাবাদের পাচেত্রার দারোগা হুকুম বেগকে সিরাজ-উদ-দৌলাহ দেশ থেকে বহিস্কার করলে মীর জাফরসহ ক্ষমতাসীন অভিজাত গোষ্ঠী রীতিমতো তটস্থ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় মীর জাফর দরবার ও প্রশাসনে নিজের অবস্থান বজায় রাখার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। সেনাবাহিনীতে নিজের কর্তৃত্ব এবং সিরাজের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারের মাধ্যমে মীর জাফর তাঁর নিজের সমর্থনে দরবারে অভিজাতদের একটি অংশকে সংগঠিত করেন। তারপরও বুদ্ধিমান ও প্রখড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তরুণ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা বা সেনা সমর্থনে ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার মতো সাহস মীর জাফরের ছিল না। এজন্য তিনি বাঁকা পথে অগ্রসর হন। জগৎশেঠদের সাথে তাঁর সম্পর্ক বহুদিনের এবং এ সম্পর্ক ছিল একান্তই পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। এ পর্যায়ে সিরাজকে উৎখাত প্রশ্নে তাদের মধ্যে আঁতাত হয়। বাংলা বিজয়ে উদগ্রীব ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতালোভী মীর জাফরকে তাদের দলে টেনে নেয়। স্বার্থান্ধ মীর জাফর সুদুরপ্রসারী হিতাহিত চিন্তা না করেই ইংরেজদের অভিলাষ পুরণে শিখণ্ডী হিসেবে ব্যবহৃত হন।

প্রাশাসনে অপেক্ষাকৃত নিম্নপদাধিকারী অমাত্য হওয়ায় রাজনৈতিক অঙ্গনে ইয়ার লতিফের বিশেষ প্রভাব না থাকলেও পুরোমাত্রায় একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় এবং জগৎশেঠদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকায় তিনিও বাংলার নবাব হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে দৃশ্যপটে মীর জাফরের আগমনে তাঁর নবাব হওয়ার স্বপ্ন-স্বাধ ধুলিস্যাত হয়ে গেলেও সম্ভাব্য পটপরিবর্তনে নিজের অবস্থান বজায় এবং নতুন ক্ষমতাকাঠামোতে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির আশায় শেষপর্যন্ত তিনি সিরাজ বিরোধী চক্রান্তে সামিল থাকেন। পলাশি বিপ্লবে যুক্ত অন্যতম অভিজাত অমাত্য রায়দুর্লভ অংশত তাঁর পিতার প্রতিপত্তি জোরে[১৫৮]এবং সেই সাথে নিজ প্রতিভাবলে নবাবী প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[১৫৯] শুরুর দিকে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর প্রশাসনেও যে রায়দুর্লভের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান বজায় ছিল আলীনগরের সন্ধিতে নবাবের সাথে তাঁর স্বাক্ষর করার বিষয়টি থেকে তা অনুমান করা যায়। তবে তাঁর এ অবস্থান যে হুমকির মুখে পড়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সূত্র মতে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর প্রশাসনিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার ফলে পুরনো কিছু অভিজাত অমাত্যের মতো সরকার ও রাজনীতিতে রায়দুর্লভেরও মর্যাদা ও প্রভাবের হানি ঘটেছিল। নবাব মোহনলালকে রায়দুর্লভের কার্যক্রম তদারকির ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন বলে জানা যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, মোহনলাল ছিলেন নবাবী প্রশাসনে নব্য অভিজাত অমাত্য। পুরনো বনেদি অভিজাতরা তাঁকে ভুঁইফোড় বলেই মনে করতেন। কাজেই মোহনলালের মতো একজন নব্য ভূঁইফোড় অমাত্য তাঁর উপর খবরদারি করবে রায়দুর্লভ তা মেনে নিতে

---

[১৫৮] দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ রায় দুর্লভের পিতা রাজা জানকী রামও মুর্শিদাবাদ প্রশাসনের পদস্থ আমলা ছিলেন এবং জীবনের শেষভাগে তিনি বিহার প্রদেশের ডেপুটি গর্ভনর হয়েছিলেন।

[১৫৯] S C Mukhopadhya, *The career of Raja Durlabram Mohindra,* Jangabari, Varansi, 1974, p.28

পারেননি। তাছাড়া এ পরিবর্তনের ফলে তার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ারও আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এ অবস্থায় বিক্ষুব্ধ রায়দুর্লভ একান্তই ব্যক্তি স্বার্থ বিবেচনায় নবাব বিরোধী অভিজাতদের শিবিরে যোগ দেন এবং তিনি পলাশি বিপ্লবের অন্যতম ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। এতে তাঁর ভবিষ্যত লাভের হিসেবও ছিল বলে ধারণা করা যায়। নবাব মীর জাফর আলী খানের প্রশাসনে বাংলার দিউয়ান ও সমুদয় প্রশাসনিক কার্যব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁর নিয়োগ নিশ্চিতকরণের মধ্যে এ কথারই প্রমাণ মেলে।।

অমাত্য অভিজাতদের মধ্যে পলাশির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও কমবেশি নিজস্ব স্বার্থ চিন্তার বিষয়টি বিবেচ্য। অর্থাৎ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ কর্তৃক মীর জাফরের মতো প্রভাশালী অমাত্যের অপসারণ এবং মানিকচাঁদের মতো কর্মকর্তাকে কারাদণ্ড প্রদানের ফলে তারা নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। কেননা এসব অমাত্যদের মীর জাফর ও অন্যান্য নবাব বিরোধী অমাত্যদের সাথে ঘনিষ্ঠতার কথা নবাবের অজানা ছিল না। মীর জাফরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন বলে পরিচিত খাদিম হোসেন খানকে রাজপদ থেকে অপসারণ তাদেরকে রীতিমতো আতঙ্কিত করে তুলেছিল। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উচ্চপদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এতদিন অন্যায় পথে তার যে বিশাল সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিলেন, নতুন পরিস্থিতিতে তাদের মনে সে সম্পদ হারানোরও আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। নবাব কর্তৃক রাজবল্লভের কাছে হিসেব তলব তাদের আশঙ্কাকে বদ্ধমূল করেছিল। এমতাবস্থায় নিজেদের একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থে তারা নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিরোধিতায় নামেন এবং পলাশি ঘটনা সংঘটনে সক্রিয় সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করেন।

উপরের পর্যালোচনা থেকে বুঝা যায় যে, পলাশি ছিল পদ ও ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারাসহ চাওয়া-পাওয়া চরিতার্থ করা নিয়ে অভিজাতদের মধ্যে স্বার্থ সংঘাতের একটি চূড়ান্ত বহিপ্রকাশ। একদল অভিজাত উর্ধতন রাষ্ট্রীয় পদ ও তদনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক মান-মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আরো বেশি পাওয়ার, এমনকি কেউ কেউ মসনদ লাভের মনস্তাত্ত্বিক উচ্চাশার মধ্যে ছিলেন। সিরাজ-উদ-দৌলাহ এবং তাঁর সহযোগী নব্য অভিজাত অমাত্যগণ তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্তরায় হওয়ায় তাকে সরিয়ে নিজেদের স্বার্থনুকূল অন্য একজনকে নবাব পদে আসীন করার প্রয়াসের পরিণতি হলো পলাশি। পলাশির ঘটনায় সিরাজকে সমর্থনদানকারী অমাত্য অভিজাতদের মধ্যে কতটুকু দেশ প্রেম ছিল তা তর্কসাপেক্ষ। তাদের দেশ প্রেমর বিষয়টি স্বীকার করে নিলেও তারাও যে তাদের নিজস্ব স্বার্থচিন্তা দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন, তা ভাববার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বস্তুত ঐ সময়টি ছিল একান্তভাবেই ব্যক্তি স্বার্থচিন্তার যুগ। এ যুগে একদল রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশিদারিত্ব বজায় রেখে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে এবং অন্যদল ক্ষমতাকাঠামোতে অংশিদার হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে প্রয়াসী ছিল। মোট কথা তাদের ক্রিয়াকাণ্ডের পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি ও বিবেচনার বিষয়টিই ছিল প্রধান। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও দেশ প্রেম ইত্যাদি আদর্শ চেতনা তাদের উপর খুব একটা যে প্রভাব ফেলেনি, তা বালা বাহুল্য।

Dhaka University Institutional Repository

নবাবী রাষ্ট্রের অভিজাত শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গশক্তি ছিল ভূ-স্বামী জমিদার গোষ্ঠী। পলাশি বিপ্লবে তাদের কারো কারো প্রত্যক্ষ- পরোক্ষ অংশ গ্রহণের কথা ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এ শ্রেণীর অভিজাতরা ছিলেন প্রায় সকলেই হিন্দু। কাজেই পলাশি বিপ্লবে তাদের অংশগ্রহণকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোন অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম বিভেদের পটভূমিতে যে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করতে চান, তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এ অভিমত যে মোটেই বস্তুনিষ্ঠ নয় একথাও ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। তবে তারা কেন নিজেদের সিরাজ বিরোধী চক্রের সাথে জড়িয়েছিলেন? এ ব্যাপারে কোনো সুজাসুজি বক্তব্য বিদ্যমান তথ্যসূত্রসমূহে পাওয় যায় না। তবে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণে মনে হয় যে, জমিদারদের এরূপ ভূমিকার পেছনেও তাদের বৈষয়িক স্বার্থের বিষয়টিই মূখ্য ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবাব আলিবর্দী খান উপর্যুপরি মারাঠা আক্রমণ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি ছাড়াও রাজা-জমিদারদের উপর আবওয়াব ও অন্যান্য করের নামে নিয়মিত অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতেন। এতে ভূ-অভিজাত জমিদাররা বাড়তি আর্থিক চাপে পড়ায় নবাবের প্রতি কিছুটা হলেও অসন্তুষ্ট ছিল। এই অসন্তুষের জের যে নবাবের দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাহর উপর পড়েছিল কুমুদনাথ মল্লিক ও সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তা স্পষ্ট করেই বলেছেন।[১৬০] তাছাড়া প্রচলিত রাজস্ব জমাও যে জমিদারদের মনোপুত ছিল না এরও প্রমাণ পাওয়া যায় পলাশির প্রাক্কালে ইংরেজদের নিকট উপস্থাপিত বণিক অভিজাত উমিচাঁদের একটি দাবিনামায়। এতে উমিচাঁদ জমিদারদের পক্ষ থেকে দাবি করেছিলেন যে, সিরাজকে উৎখাতের পর নতুন নবাব যেন মুর্শিদকুলি খানের আমলের তুমর জমা অনুযায়ী খাজনা আদায় করেন।[১৬১] এই দাবি উমিচাঁদ নিজে থেকে করেছিলেন এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। বস্তুত এটি ছিল জমিদারদেরই দাবি, উপযুক্ত সময়ে উমিচাঁদের মাধ্যমে এ দাবিটি পেশ করে সম্ভবত জমিদারগণ তাদের আর্থিক সুবিধাটি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পলাশির ঘটনায় দেশীয় চক্রীদলের প্রধান হোতা ছিলেন জগৎশেঠরা। আর জগৎশেঠদের সাথে বাংলার ভূ-স্বামী জমিদারদের যে ঘনিষ্ঠ বৈষয়িক যোগসূত্র ছিল সে কথাও ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। জগৎশেঠ শুধু তাদের বিপদে অর্থ ঋণ দিয়েই সাহায্য করতেন না, অনেক সময় তাদের রাজস্ব জামিনদারও হতেন। জগৎশেঠের কুঠিতে সরকারের প্রাপ্য রাজস্বও জমা দিতে হতো। কাজেই সিরাজ বিরোধী গ্রুপে এই জগৎশেঠ যখন নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন তার সাথে ঘনিষ্ঠ বৈষয়িক সম্পর্কে যুক্ত জমিদারদের কারো কারো হাত মেলানোর বিষয়টি অস্বাভাবিক মনে হয় না।

উপরের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পলাশি বিপ্লবে ভূ-অভিজাতদের যুক্ত হওয়ার পিছনেও তাদের বৈষয়িক স্বার্থের বিষয়টি মূখ্য ছিল। কাজেই তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক বা সামাজিক অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করার অবকাশ থাকছে না।

---

[১৬০] কুমুদনাথ মল্লিক, *নদীয়া কাহিনী*, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ.পৃ. ২৫-২৬; Subashchandra Mukhopadhyya, *The Career of Raja Durlabram Mohindra (Raj Rurlab)*, Jangabari, Varansi, 1974, p. 14

[১৬১] Letter from Watts to Clive, 14 May, 1757, S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. II, p. 392

Dhaka University Institutional Repository

পলাশি বিপ্লবে বণিক অভিজাতদের সংশ্লিষ্টতা প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত কোলাবোরেশন থিসিস এবং প্রাক পলাশি বাংলার অর্থনৈতিক সংকটের বিষয়টি যে যুক্তিসঙ্গত নয়, একথা ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। তবে তারা কেন সিরাজের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন? এর জবাবে কোনো একক সাধারণ কারণ চিহ্নিত করার সুযোগ নেই। আগেই বলা হয়েছে যে, পলাশির ঘটনায় বণিক অভিজাতদের ভূমিকাকে শ্রেণীগত পর্যায়ে বিবেচনা করা যায় না, বরং এটি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত পর্যায়ে। কাজেই ব্যক্তি বিশেষের বিপ্লবে অংশগ্রহণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, পলাশি বিপ্লবে দেশীয় শক্তিসমূহের মধ্যে জগৎশেঠ পরিবারের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে গণ্য। এই পরিবারের অধিকর্তা জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদের বিপ্লবে মূখ্য ভূমিকা পালনের কারণ ব্যাখ্যায় পূর্বোক্ত কোলাবোরেশন থিসিস বা তদানিন্তন বাংলার অর্থনৈতিক সংকটে তাঁর ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিষয়টি ছাড়াও বিভিন্ন সূত্রে আরো কিছু কারণের কথা বলা হয়েছে। সূত্রমতে মুঘল কেন্দ্রীয় দরবারে শেঠদের বিশেষ প্রভাব থাকায় তারা সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার নবাবদের জন্য বাদশাহী সানন্দ লাভে সহযোগিতা করতেন। সিরাজ-উদ-দৌলাহ মসনদ লাভের পর বেশ কিছু দিন কেন্দ্রীয় সরকারের সনদ আদায় করতে পারেননি। এ ব্যাপারে নবাবের অনুরোধ সত্ত্বেও জগৎশেঠ কোনো উদ্যোগ না নেয়ায় নবাব তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে জব্দ করার জন্য পূর্ণিয়া অভিযানের পর বণিক সওদাগরদের কাছ থেকে তিন কোটি টাকা সংগ্রহ করে দেয়ার জন্য জগৎশেঠকে নির্দেশ দেন। কিন্তু জগৎশেঠ এতে অপারগতা প্রকাশ করলে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে নবাব প্রকাশ্যে তাঁকে চপেটাঘাত করেন এবং বন্দি করে রাখার নির্দেশ দেন।[১৬২] এতে স্বাভাবিকভাবেই শেঠরা ক্ষুব্ধ হন এবং তাদের এ ক্ষোভ পলাশি বিপ্লবের দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় রূপান্তরিত হয় বলে মনে করা হয়।[১৬৩] সার্বিক পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণে জগৎশেঠকে চড় মারার বিষয়টি নেহায়েতই গুজবের উপর ভিত্তি করে প্রচলিত বাজারে গল্প বলেই মনে হয়। আর এ গল্পটির উদ্‌গতা ছিলেন ইংরেজ কোম্পানির সার্জন উইলিয়াম ফোর্থ (William Forth)। ফোর্থের দাবি তিনি এ সংবাদটি পেয়েছিলেন ওলন্দাজ কোম্পানির প্রধান বিসডম (Bisdom) এর কাছ থেকে।[১৬৪] তবে মজার ব্যাপার হলো বিসডমের ডায়রি বা অন্যকোনো ওলন্দাজ রেকর্ডে এ ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। শুধু তাই নয়, সমসাময়িক কোনো ফারসি গ্রন্থ বা ওয়াটস, ক্র্যাফট্‌সন বা জ্যঁা ল প্রমুখ ইউরোপীয়দের রচনাতেও এ ব্যপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। জগৎশেঠ কোনো মামুলি লোক ছিলেন না। কাজেই তাঁর মতো বিখ্যাত ব্যক্তি নবাবের হাতে প্রহৃত হলে সমকালীন ফারসি বা ইউরোপীয় গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও লেখকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতো না। কাজেই আধুনিক ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ[১৬৫] এরূপ গল্পের প্রতি আস্থা প্রর্দশন করলেও এ ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নেয়ার কোনো কারণ নেই।

---

১৬২ Long's Selections, p. 77; নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮; রজকান্ত রায়, *পলাশির ষড়যন্ত্র*, পৃ. ১৫৬

১৬৩ J. H. Little, *The House of Jagatseth,* p. 51

১৬৪ Fort William Consultations, Fulta, 5 September, 1756

১৬৫ প্রসঙ্গত নিখিলনাথ রায়, রজতকান্ত রায় এবং মোঃ হাবিবুর রহমান প্রমুখের কথা বলা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ কেউ মনে করেন যে, শেঠরা ভয়ে ছিলেন যে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ তাদের সম্পদ পঞ্জিভবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন এবং তাদের সঞ্চিত সম্পদ কেড়ে নেবেন। জ্যাঁ ল'র ভাষ্য মতে, শেঠদের সম্পদই সিরাজের লক্ষ্য ছিল এবং যে কোনো সময় তিনি তাদের সম্পদ কেড়ে নিতেন।[১৬৬] তবে এ মতটি যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। কেননা শেঠদের সম্পদ হরণের মতো মনোবৃত্তি নবাবের মধ্যে ছিল এমন কোনো তথ্য সমকালীন অন্য কোনো উৎসেই উল্লেখ নেই। এমনকি শেঠরা যে নবাবের হাত থেকে সম্পদ বাঁচাবার জন্য পলাশির ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন এমন কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত অন্য কোনো সূত্রে উল্লেখ নেই। কাজেই এ অভিমতের আলোকেও পলাশি বিপ্লবে শেঠদের অংশ গ্রহণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা সমীচীন হবে না।

বস্তুত নবাবের প্রতি শেঠদের মনোভাব পরিবর্তন এবং নবাব বিরোধী অভিজাত চক্রকে সংগঠিত করে পলাশির প্রেক্ষাপট তৈরি করার পিছনে ভিন্ন কারণ ছিল। জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও তাঁর ভাই মহারাজা স্বরূপচাঁদ যে একান্তই নিজেদের স্বার্থ চিন্তাতেই সিরাজের বিরুদ্ধে মীর জাফরদের সাথে ঐকবদ্ধ হয়েছিলেন সে ইঙ্গিত *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিণ* গ্রন্থেও রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, সিরাজ-উদ-দৌলাহর ক্ষমতায় আরোহন এবং তাঁর প্রশাসনিক পুনর্গঠন রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোতে এক নতুন ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছিল। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে শেঠরা যখন দেখলেন নবাব একদিকে তাঁর শাসন কাঠামোতে মোহনলাল, মীরমদন ও খাজা আবদুল হাদির মতো একদল নব্য অভিজাত অমাত্যদের স্থান করে দিচ্ছেন, অন্যদিকে মীর জাফর, রাজবল্লভ ও হুকুম বেগ প্রমুখ বনেদি ও পুরাতন অমাত্যদের দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন, এমনকি দুর্লভরামের মতো কর্মকর্তার ক্ষমতাও খর্ব করে ফেলেছেন, তখন তারা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা আশঙ্কা করে যে, তরুণ নবাব তাদের সম্পদ পঞ্জিভবনের উৎসগুলো বন্ধ এবং তাদের একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগগুলো কেড়ে নেবেন। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জগৎশেঠরা বিপুল বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছিলেন টাকশাল ব্যবহার ও মুদ্রা তৈরি, বাট্টা ধার্য ও বাংলার রাজস্ব আদায়ের একচেটিয়া ব্যবসা থেকে। আর এই সুবিধাগুলো তারা পেয়েছিলেন নবাবদের অনুগ্রহে, দরবারের আনুকূল্যে। নবাবের অনুগ্রহ ও দরবারের আনুকূল্য লাভে তাদের প্রধান সহায়ক ছিলেন মীর জাফর, দুর্লভরাম প্রমুখ প্রভাবশালী অমাত্যবৃন্দ। সিরাজ নবাব হওয়ায় এবং তার গৃহীত নতুন ব্যবস্থায় উল্লিখিত অমাত্য অভিজাতবর্গ দুরাবস্থায় পতিত হলে শেঠদের নবাবের অনুগ্রহ ও দরবারের আনুকূল্য প্রাপ্তির ব্যাপারে আশঙ্কা দেখা দেয়। তাছাড়া নবাব দরবার ও রাজনীতিতে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা তৈরি হয়। উল্লেখ্য যে, নবাব আলিবর্দী খানের আমলেও যে জগৎশেঠ সরকার ও রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল সে কথা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সিরাজের প্রশাসন কাঠামোতে যারা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন তাদের সাথে শেঠদের বিশেষ ভাল সম্পর্ক ছিল না, বরং সিরাজের সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং সিরাজের প্রশাসনের সবচেয়ে প্রভাবশালী অমাত্য মোহনলাল ছিলেন জগৎশেঠের প্রবল শত্রুদের অন্যতম। বস্তুত

[১৬৬] Law's *Memoir,* S. C Hill, *Bengal in 1756-57,* Vol. III, p.175

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনাধীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য নবাব দরবার ও অমাত্যদের সাথে এত নিবিড় ছিল যে, দরবারের অমাত্যদের সহযোগিতা ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। কাজেই পরিবর্তিত প্রশাসনের অমাত্যদের সহযোগিতা প্রাপ্তির বিষয়ে অনিশ্চয়তা শেঠদের শংকিত করে তুলেছিল। এমতাবস্থায় এই বণিকরা সম্পদ আহরণের প্রতিবন্ধকতা দূর এবং দরবার ও রাজনীতিতে নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে সিরাজকে উৎখাত করে পছন্দসই নবাব নির্বাচন করার চক্রান্ত শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে সিরাজের স্থলে মীর জাফরকে নির্বাচনের পেছনে শেঠদের ভবিষ্যত বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করার স্বার্থবুদ্ধিটি সমানভাবে কাজ করে বলে মনে হয়। জগৎশেঠ ছিলেন একটি আর্থিক সংস্থার প্রধান। আর এ জন্য বর্ণিত তথ্য প্রমাণে দেখা যাচ্ছে যে, যে দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন পলাশি বিপ্লবে তাদের ভূমিকাকে কোনোক্রমেই তাদের আর্থিক স্বার্থবুদ্ধির উর্ধ্বে স্থান দেয়া যাচ্ছে না। শেঠদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বজায় রাখার মনস্তত্ত্বের পিছনেও যে ব্যবসায়িক স্বার্থ চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল উপরের আলোচনায় তাও প্রমাণিত হয়েছে।

পলাশির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট প্রভাশালী অভিজাত বণিকদের অন্যতম ছিলেন খোজা ওয়াজিদ। তিনি এতে যোগ দিয়েছিলেন শেষ পর্যায়ে- যখন পলাশি ষড়যন্ত্র একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে। সুশীল চৌধুরী মনে করেন, বণিক রাজ জগৎশেঠের সাথে ওয়াজিদের দ্বন্দ্ব এবং প্রবল স্বার্থ সংঘাত ছিল বলে ওয়াজিদ যতদিন সম্ভব এ চক্রান্তের বাইরে থেকে নিজেকে নবাবের সাথে যুক্ত রাখেন।[১৬৭] বস্তুত ফরাসিরা বাংলা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর খোজা ওয়াজিদ তার অবস্থান পাল্টে রাতারাতি ইংরেজ এবং তাদের মিত্র দেশীয় অভিজাত ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে হাত মেলান। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, দরবারে নবাবের বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলছে এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন অত্যাসন্ন। এ অবস্থায় একা একা স্রোতের উল্টো দিকে যাওয়া কোনোক্রমেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ওয়াজিদ ছিলেন ঝানু ব্যবসায়ী এবং দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে মুর্শিদাবাদ দরবারের আনুকূল্যে তিনি বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছেন। তিনি এও জানতেন যে, রাজনৈতিক আনুকূল্য ছাড়া তাঁর বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর রাজনৈতিক গতিপ্রবাহ কোনদিকে যাচ্ছে, তা বুঝতে যখন আর বাকী রইল না তখন তিনি দ্রুত এ ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। সিরাজ-উদ-দৌলাহর সাথে সম্পর্কের অবনতির বিষয়টিও এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। বলা হয় যে, ওয়াজিদের মিত্র ফরাসিদের সাথে নবাবের আঁতাতের বিষয়টি ব্যর্থ হওয়ায় নবাব তাঁর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন, এমনকি তিনি ওয়াজিদের ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ অবস্থায় ওয়াজিদ তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যত ছাড়াও নিজের জীবনেরই নিরাপত্তার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন বলে জানা যায়। সার্বিক পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করে তিনিও শেষাবধি নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নবাবের পক্ষ ত্যাগ করে পলাশি চক্রান্তে যোগ দেন।

পলাশি চক্রে যুক্ত অভিজাত বণিক উমিচাঁদ ছিলেন আগাগোড়াই একজন সুযোগ সন্ধানী অর্থলোভী মানুষ। সবসময়ই তিনি নিজের তালে থাকতেন এবং নিজের স্বার্থ উদ্ধারে নীতি-নৈতিকতা বিসর্জনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না। নবাব

[১৬৭] Sushil Chaudhury, *The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1957*, p. 135

দরবারের আনুকূল্যে তিনিও সোরা, শস্য এবং আফিমের একচেটিয়া বাণিজ্য বাগিয়ে নিয়েছিলেন। যুগের হাওয়া বুঝতে তারও বিলম্ব হয়নি। তাঁর সুবিধাবাদী চরিত্রের জন্যই ইংরেজরা তাঁকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত হিসেবে বেছে নেয় এবং তাঁর মাধ্যমে অনেককে সিরাজ বিরোধী চক্রান্তে জালে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। চরম অর্থ লোভী উমিচাঁদও তাঁর বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিক লাভালাভের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তাদের সাথে হাত মেলান। আরেক বণিক অভিজাত খোজা পেত্রস। উপরে বর্ণিত তিন বণিকের তুলনায় তাঁর বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি এবং রাজনৈতিক প্রভাব অনেক কম ছিল। তবে তাঁরও লক্ষ্য ছিল নিজের বাণিজ্যিক প্রসার বৃদ্ধি। আর এ জন্য তিনি দরবার অপেক্ষা ইংরেজদের সহায়তার বেশি মুখাপেক্ষী ছিলেন বলে মনে হয়। অবশ্য মোক্ষম সময়ে তিনি ঠিক কাজটি করে নিজের আখের গোছাতে চেয়েছিলেন। ইংরেজদের কাছে ইয়ার লতিফের পরিবর্তে মীর জাফরকে নবাব করার প্রস্তাবটি তিনিই প্রথম উত্থাপন করেছিলেন। এর মধ্যে অবশ্যই নিজস্ব তাঁর স্বার্থবুদ্ধি কাজ করেছিল।

উপরের বর্ণনাতে একথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে, নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর অন্য দুটি অঙ্গ শক্তির লোকদের মতো পলাশি বিপ্লবে অভিজাত বণিকদের কয়েকজনের অংশ গ্রহণের পিছনেও তাদের নিজস্ব আর্থিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা প্রবলভাবে কাজ করেছে।

৮.৭ পলাশির পরবর্তী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া: অভিজাত শ্রেণীর ক্রমঅবক্ষয় ও পতন

পলাশির অনিবার্য প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় কেবল যে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহরই পতন ঘটেছিল এমন নয়, এর মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাবী শাসনেরও পতন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। পলাশির সূত্র ধরেই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় তার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে বাংলায় কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠা করে। লক্ষণীয় যে, কোম্পানি রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি এদেশের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণও কব্জা করে নেয়। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নবাবী যুগের অভিজাত শ্রেণীরও ক্রমঅবক্ষয় ও পতন নিশ্চিত হয়। তবে একথাও অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, অভিজাত শ্রেণীর এ পতন প্রক্রিয়ায় তাদের নিজেদের মধ্যকার স্বার্থপ্রসূত সংঘাত ও হানাহানির বিষয়টি কম দায়ী ছিল না। অবশ্য অনেকেই মনে করেন যে, অভিজাতদের মধ্যকার এ আত্মহানাহানির পেছনে ইংরেজদের কূরিৎকৌশল প্রয়োগ ও হস্তক্ষেপের ঘটনা বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল।[১৬৮] সে যাই হোক পলাশির পরিণামেই যে বাংলার অভিজাত শ্রেণীর পতন হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত রাজতকান্ত রায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। রজকান্তের ভাষায়:

> সমাজের উপর তলায় যে তিনটি শ্রেণী অধিষ্ঠিত ছিল সেই মনসবদার, জমিদাররা ও সওদগর শশব্দে ভূপতিত হল এবং গোটা সমাজের বৈষয়িক কাঠামো তের বছর যেতে না যেতেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।[১৬৯]

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পলাশির প্রাক্কালে বাংলার অভিজাতবর্গকে লাভালাভের প্রলোভন ও আশ্বাস দিয়ে মীরজাফরের পক্ষে এবং সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিরুদ্ধে সংগঠিত করা হয়েছিল। এ অবস্থায় বাংলার মসনদে সমাসীন হয়ে

---

[১৬৮] মো: হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৯

[১৬৯] রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৫

নবাব মীর জাফর আলী খানকে তাঁর সহযোগী অভিজাতবর্গের স্বার্থ পুরণে মনযোগী হতে হয়। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, যে স্বল্পসংখ্যক অভিজাত পলাশিতে সিরাজের পক্ষে ছিলেন, ক্ষমতার পালাবদলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাকাঠামো থেকে তারা ছিটকে পড়েন। এমনকি নবাবের পরিজনবর্গ সরকারী নিগ্রহের শিকার হওয়ার পাশাপাশি তারা তাদের জায়গির স্বত্ব থেকেও উৎখাত হলেন। নবাবের কনিষ্ঠ ভাই শাহজাদা মির্জা মেহদিকে কারারুদ্ধ অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর স্ত্রী লুতফ-উন-নিসা এবং নবাব আলিবর্দী খানের কন্যাদের সাথেও অসম্মানজনক আচরণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলিবর্দী খানের কন্যাদের মধ্যে ঘসেটি বেগম ছিলেন আগাগোড়াই সিরাজ বিরোধী। আর এই সূত্রেই মীর জাফরের সাথে তাঁর গোপন আঁতাত ছিল। এমনকি সিরাজের প্রাসাদে নজরবন্দী থাকা অবস্থায়ও তিনি তাঁর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সিরাজকে উৎখাতে মীর জাফরকে সহায়তা করেছিলেন বলে সূত্রক্রমে জানা যায়।[১৭০] কিন্তু মসনদে আরোহন করে মীর জাফর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তো দুরে থাক তাঁর জীবন সংহারেও কুণ্ঠিত হননি। সিরাজের জননী আমেনা বেগমসহ ঘসেটি বেগমকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। আফগান সমর অভিজাত সেনাপতি ওমর খানের বীর পুত্র আসালত খান ও দিলির খান ছিলেন বরাবরই মীর জাফর আলী খানের ঘনিষ্ট সহযোগী। মীর জাফরের চরম দুর্দিনেও তাঁরা তাঁকে কখনো ত্যাগ করে যায়নি। কিন্তু ক্ষমতার পালাবদলের তাঁরাও নির্মম পরিস্থিতির শিকার হলেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ওমরা ছিলেন দিউয়ান রাজা মোহনলাল। পলাশির যুদ্ধ ক্ষেত্রে সিরাজের পক্ষে প্রাণপন যুদ্ধ করেও বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। তবে তিনি চাকরি রক্ষা তো নয়ই, শেষ পর্যন্ত জীবন রক্ষাও করতে পারেননি। রাজা রায়দুর্লভ তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিলেন বলে জানা যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, লাভালাভের প্রলোভন ও আশ্বাস দিয়ে যে অভিজাতদের নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছিল এ পর্যায়ে নবাব মীর জাফর আলী খানকে তাঁদের স্বার্থ পুরণে মনযোগী হতে হয়। অনুগতদের মধ্যে পদ ও সুবিধা বণ্টন প্রক্রিয়ায় নবাব পুত্র মীর সাদাকাত মোহাম্মদ মীরণ যে বিশেষ ক্ষমতা ও সুবিধা লাভ করেছিলেন, তা বলা বাহুল্য। সিংহাসনে অধিষ্ঠানের সময় নবাব স্বয়ং 'সুজা-উল-মূলক হুসাম-উদ-দৌলাহ মীর জাফর আলী খাঁন বাহাদুর মহাবতজঙ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং পুত্র মীরণকে দিয়েছিলেন 'শাহামত জঙ' উপাধি। মীরণ শুধু উপাধি নিয়েছিলেন তাই নয়, রাজ প্রশাসনেও তিনি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এমনকি তিনি নিজস্ব দিউয়ানসহ অনেক কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে নিজস্ব ঘরণার প্রশাসন গড়ে তোলার চেষ্টাও করেছিলেন।[১৭১] নবাবের জামাতা মীর কাশিমকে পূর্ণিয়া ও রংপুরের ফৌজদারির যৌথ দায়িত্ব দেয়া হয়। পলাশির অন্যতম প্রধান কুশীলব ছিলেন রাজা রায়দুর্লভ। প্রশাসনিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় তিনি পেলেন মন্ত্রী, দিউয়ান এবং সেনাবাহিনীর বখশির পদসহ অনেক সুযোগ-সুবিধা। তাঁর ভাই কুঞ্জবিহারী ও রাসবিহারীকেও যথাক্রমে মুর্শিদাবাদ ও জাহাঙ্গীরনগর নায়েবতীর হিসাবকর্তা পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। উপযুক্ত জায়গির সুবিধাসহ মীর জাফরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী খাদিম হোসেন খানকে

[১৭০] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪৭

[১৭১] ঐ, পৃ. ৫১৭

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হলো পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার পদ। অপর বিশ্বস্ত কর্মকর্তা আমির বেগ পেলেন হুগলির ফৌজদারের পদ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজা রাজবল্লভ মীরনের দিউয়ান পদসহ প্রভূত সুযোগ সুবিধার ভাগীদার হন। মীরণের আশির্বাদে এক পর্যায়ে তিনি জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিমের পদটিও দখল করেন। মহারাজা নন্দকুমার হুগলির ফৌজদারির পদ না পেলেও দিউয়ান রাজা রায়দুর্লভের সহকারী বা খালিসার পেশকার পদ লাভ করলেন। ইংরেজদের সাথ্যে সখ্য থাকায় তাঁর উপর নবাবের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি বহাল থাকল। বিহারের নায়েব নাজিম ছিলেন রাজা রামনারায়ণ। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর প্রতি একান্ত অনুগত থাকায় তাঁর প্রতি নবাব মীর জাফরের কোনো সহানুভূতি না থাকারই কথা। তবে অসাধারণ কর্ম দক্ষতা এবং নবাবী প্রশাসনে তাঁর বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি বিবেচনায় তাঁকে পূর্ব পদে বহাল রাখা হলো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পলাশির মতো একটি বৃহৎ ঘটনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নাম না জানা আরো অনেকেই যে জড়িত ছিলেন, তাতে দ্বিমতের কোনো কারণ নেই। তবে নতুন প্রশাসনিক বিন্যাসক্রমে সবাই যে যথোপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। উদাহরণ স্বরূপ শেঠভ্রাতৃদ্বয় জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদ ও মহারাজা স্বরূপ চাঁদ এবং মীর কাসিম আলী খান প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যায়। আর যারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন তাদের সকলেই যে তাতে হৃষ্ট হয়েছেন এমনটিও নয়। এ প্রসঙ্গে রাজা রায়দুর্লভের কথা উল্লেখের দাবি রাখে। পলাশির বাস্তবায়নে তিনি মীর জাফরের অতি নিকটজন হিসেবে কাজ করেছেন। বিপ্লব পরবর্তীকালে রায়দুর্লভ প্রশাসনে উচ্চপদ লাতসহ বিশেষভাবে লাভবান হলেও বিপ্লবে অন্য শরিক ইংরেজদের প্রাপ্তি এবং বিশেষ করে মীর জাফরের তুলনায় তাঁর প্রাপ্তিকে নিতান্তই অকিঞ্চিতকর ভেবে বসলেন। ফলে তাঁর মধ্যে মীর জাফরের প্রতি একরকমের ঈর্ষা তৈরি হয়-যা শেষপর্যন্ত তাদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘাতে রূপ নেয়। বিরোধের এক পর্যায়ে রায়দুর্লভ মীর জাফরকে মসনদচ্যুত করে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর ভাই মির্জা মেহদিকে ক্ষমতাসীন করার পরিকল্পনা করেন বলে জানা যায়। অবশ্য যথাসময়ে মীর জাফর আলী খানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মির্জ মেহদিকে হত্যা করার ফলে নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার রায়দুর্লভের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।[১৭২] রায়দুর্লভের এ পরিকল্পনা সফল না হলেও নবাবের সাথে রাজ্যের প্রধান অমাত্য অভিজাতের এ বিরোধ বাংলার অভিজাতবর্গের উপর এমন প্রভাব ফেলেছিল যে, এতে অভিজাত শ্রেণীর ক্রমঅবক্ষয় ও পতন দ্রুততার সাথে তরান্বিত হয়েছিল। কেননা এর পর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই অভিজাতের নিজ নিজ শক্তিবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় অভিজাতবর্গ ও সেনাবাহিনীকে পক্ষভূক্ত করার চেষ্টার ফলে অভিজাতদের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তি প্রবল হতে থাকে। যা বাংলার অতিজাতবর্গের ঐক্য বিনষ্ট করে এবং পরিণামে তারা দুর্বল হয়ে পতনের পথে ধাবিত হয়।

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, নবাব মীর জাফর আলী খান ও রাজা রায়দুর্লভের মধ্যকার বিরোধের সূত্রে অভিজাতদের মধ্যে বিভক্তি তৈরি হয়। রায়দুর্লভকে শক্তিহীন ও দুর্বল করার লক্ষ্যে নবাব তাঁর অনুগত ও আত্মীয় অভিজাতদের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারণ করেন। অন্যদিকে রায়দুর্লভও নবাবের প্রতি অসন্তুষ্ট অভিজাতবর্গকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সম্মিলিত

[১৭২] সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১৭

ঐক্যজোট গঠনে সচেষ্ট হন। অমাত্য অভিজাত খাজা আবদুল হাদী, কাজিম আলী খান এবং বিহারের নায়েব নাজিম রাজা রামনারায়ণ প্রমুখ তাঁর সাথে যোগ দেন। মীর জাফরের বিরুদ্ধে সহায্যের জন্য তারা ইংরেজদেরও দ্বারস্থ হয়। অভিজাতদের এই ইংরেজ অনুগ্রহনির্ভরতা প্রকারান্তে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি এবং তাদের বাংলার দিউয়ানি লাভের পথ সুগম করে। আর বাংলার ইতিহাসে এর ফলাফল হয় সুদূরপ্রসারী এবং অভিজাত শ্রেণীর জন্য মর্মান্তিক। প্রকৃতপক্ষে অভিজাতদের মধ্যকার এ দলাদলির পেছনে ছিল তাদের স্বার্থ চিন্তা। রায়দুর্লভের সাথে বিরোধের বিষয়ে নবাব ও তাঁর মধ্যকার স্বার্থ সংঘাত প্রসঙ্গে ইতোমধ্যেই আলোকপাত করা হয়েছে। নবাবের সাথে রাজা রামনারায়ণের বিরোধেরও ভিত্তিস্থল ছিল স্বার্থের টানাপোড়েন। বস্তুত পলাশির ঘটনায় মীর জাফরের পক্ষে রামনারায়ণের সক্রিয় না হওয়ায় তাঁর প্রতি নতুন নবাবের সহানুভূতি না থাকারই কথা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রথম পর্যায়ে নবাব তাঁকে বিহারের নায়েব নাজিম পদে বহাল রেখেছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রামনারায়ণকে তাঁর পদে বহাল রাখার ব্যাপারে নবাব আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এমতপরিস্থিতিতে রামনারায়ণ নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রথমে রায়দুর্লভের এবং পরে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইংরেজদের শরণাপন্ন হন। অবশ্য এতে তাঁর শেষ রক্ষা হয়নি। রামনারায়ণ তাঁর নায়েব নাজিম পদটি হারান এবং এ পদে নিয়োগ দেয়া হয় মীর জাফরের অতি ঘনিষ্ঠজন খাদিম হোসেন খানকে।[১৭৩]

আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলার অভিজাতদের মধ্যে দলাদলি ও হানাহানি সৃষ্টিতে ইংরেজদের ইন্দন ছিল। ইংরেজরা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাংলায় একটি সংকটঘন স্থিতিহীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। আর এ জন্য তারা পরিস্থিতি বুঝে কখনো নবাবকে এবং কখনোবা নবাব বিরোধী চক্রকে সমর্থন সহযোগিতা দিয়ে বিরোধ বজায় রাখার চেষ্টা করে। তবে নবাব বিরোধী জোটের সকলকেই তারা সমান গুরুত্ব দেয় নি। এজন্য দেখা যায় যে, নবাবকে চাপ দিয়ে তারা রায়দুর্লভকে স্বপদে বহাল রাখলেও রাজা রামনারয়ণের পদ উদ্ধারে সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি। বস্তুত ইংরেজরা এ নীতির মাধ্যমে বাংলার অভিজাতদের দুর্বল করে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছিল। দেশপ্রেমহীন স্বার্থান্ধ অভিজাত গোষ্ঠী ইংরেজদের এ দুরভিসন্ধি বুঝতে না পেরে তাদের কৌশলের জালে ধরা দেয় এবং বাংলার রাজক্ষমতা ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়ার পথ সুগম করে। আর এর মধ্য দিয়ে প্রকারান্তে তারা নিজেদের ধবংসযজ্ঞ নিজ হাতেই সম্পন্ন করে।

রাজ্যব্যাপী উদ্ভুত নানা সংকট এবং এই সংকট মোকাবিলায় নবাব মীর জাফর আলী খানের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে নবাব পুত্র মীরণ নিজেই এক পর্যায়ের পিতার স্থলে মসনদ লাভের পরিকল্পনা করেন। এলক্ষ্যে তিনি অযোধ্যার নবাবের ভাই এবং ভোজপুর রাজের সাথে একটি শক্তিজোট গড়ে তোলেন বলেও জানা যায়। এমতপরিস্থিতিতে নবাবের প্রতি বিক্ষুব্ধ রাজা রামনারায়ণ নিজের হারানো পদ উদ্ধার এবং অন্যবিদ সুবিধা প্রাপ্তির আশায় শাহজাদা মীরণকে সিংহাসন দখলে ইন্ধন যোগান। এ ব্যাপারে রাজা রাজবল্লভও তাঁকে প্ররোচিত করেন। তবে শেষ পর্যন্ত মীরণের পরিকল্পনা সফল হয়নি।

---

[১৭৩] Luke Scrafton, *op.cit,* p. 107

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজদের হস্তক্ষেপে মীর জাফর সে যাত্রা মসনদ রক্ষা করেন।[১৭৪] ইতোমধ্যে শাহজাদা মীরণের সাথে মীরজাফরের প্রশাসনের অন্য এক প্রভাবশালী অমাত্য খাদিম হোসেন খানের স্বার্থ সংঘাত শুরু হয়। খাদিম হোসেন খানকে দমনের উদ্দেশ্যে মীরণ সসৈন্যে পূর্ণিয়া আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর তাবুতে বজ্রাঘাত হলে মীরণ নিহত হন। অনেকে মনে করেন বজ্রাঘাতে নয়, বরং নবাব জামাতা এবং বাংলার সিংহাসন লাভে আগ্রহী অমাত্য অভিজাত মীর কাশিমের কূরিৎকৌশলে মীরণ নিহত হয়েছিলেন। অন্যদিকে মীরণের আক্রমণে খাদিম হোসেন খান তরাইয়ের গভীর অরণ্যে পালিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরাল হলেন। তাঁর এ অন্তর্ধানের মধ্য দিয়ে বাংলার ইতিহাসের দুই প্রভাবশালী অমাত্যের পতন নিশ্চিত হয়।

নানামুখী সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থতা এবং ইংরেজদের ক্রমবর্ধিত অর্থচাহিদা পুরণে অপারগতা দৃষ্টে নবাব মীর জাফর আলী খানের উপর থেকে ইংরেজদের আস্থা ক্রমশ লোপ পায়। এ সময় বিহার সীমান্তে সম্রাট শাহ আলমের সশস্ত্র অবস্থান নবাব মীর জাফরের জন্য সমূহ বিপদের কারণ হড়ে দাঁড়ায়। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিহারের ভূ-স্বামী জমিদারদের নবাব বিরোধীদের সাথে যোগ সাজস এবং বীরভূম, বর্ধমান, ঢাকা ও পূর্ণিয়া অঞ্চলের জমিদারদের অসহযোগিতা ও তাদের রাজস্ব অনাদায়ের কারণে নবাব মীর জাফর আলী খানের আর্থিক সঙ্গতিকে নিঃশেষ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় বকেয়া বেতনের দাবিতে মুর্শিদাবাদে সেনা বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজনৈতিক নৈরাজ্য তৈরি হয়। বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে নবাব মীর জাফর আলী খান তাঁর পুরনো মিত্র জগৎশেঠদের কাছে টাকা ঋণ চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। মীর জাফরের এমন অসহায় অবস্থায় ইংরেজরা ১৯৭৬০ সালে মীর জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তাদের চাহিদা মোতাবেক চট্টগ্রাম মেদিনীপুর এবং বর্ধমানের রাজস্বাধিকার অর্পন করার শর্তে নবাবের জামাতা মীর কাশিমকে বাংলার মসনদে বসায়।

নবাব মীর জাফরের ক্ষমতাচ্যুতি এবং মীর কাশিমের ক্ষমতায় আরোহন সহজাত এবং সুব্যবস্থায় হয়েছিল বলে ধারণা করার কোনো কারণ নেই। ক্ষমতার এই পালাবদলের পেছনে যে ইংরেজদের কারসাজি ছিল এ কথা ইতোমেধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এজন্য নতুন নবাবের কাছ থেকে তারা যে বিশাল সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করে নিয়েছিলেন তা বলা বাহুল্য। পট পরিবর্তনের এ ঘটনায় বাংলার অভিজাত চক্রের অভ্যন্তরীণ কোন্দল হানাহানি ও স্বার্থ সংঘাত যে ছিল না এমনটা নয়। এতে অমাত্য অভিজাত রায়দুর্লভ রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ প্রমুখের সম্পৃক্ততা ছিল বলে সূত্রে জানা যায়। এমনকি মীর জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে মীর কাশিমকে ক্ষমতায় বসানোর ব্যাপারে ইংরেজদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি রায়দুর্লভের পরামর্শক্রমেই হয়েছিল বলে সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন।[১৭৫] মীর কাশিমকে নবাব পদে বসানোর জন্য ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নরকে রায়দুর্লভের স্বাগত জানানোর ঘটনাও ১৭৬০ সালে রাজনৈতিক পলাবদলে তাঁর জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণ করে। আর বিহরের নায়েব নাজিম পদ হারানোর ক্ষোভ থেকে রাজ রামনারায়ণ মীর জাফরের পতন এবং মীর কাশিমের মসনদ দখলের ঘটনাকে সমর্থন করে।

---

[১৭৪] Luke Scrafton, *op.cit,* p. 119

[১৭৫] Subhas Chandra Mukhopadhyay, *The Career of Maharaja Durlabhram Mohindra (Rai Durlab)*. Jangibari, Varansi, 1974, p. 142

মীর কাশিমের উত্থানের ফলে অভিজাতদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের অবসান হয়নি, বরং তাদের মধ্যকার স্বার্থ দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রায়দুর্লভ এবং রাজা রামনারায়ণ প্রমুখের সাথে বিরোধের কারণে নবাব মীর জাফর তাদের বিপক্ষে প্রচুর সুযোগ সুবিধা দিয়ে কিনুরাম, মনুলাল, চিকনলাল প্রমুখকে নবাবী প্রশাসনে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। মীর কাশিম ক্ষমতায় এসে রায়দুর্লভ এবং রাজা রামনারায়ণ প্রমুখকে সন্তুষ্ট করতে তাদের শত্রু এবং নবাবী প্রশাসনের সদ্য উদীয়মান কিনুরাম, মনুলাল, চিকনলাল প্রমুখকে ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দি করেন। এর পর এ সব অমাত্যের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা আর জানা যায় না। বিহারের নায়েব নাজিম পদটি ফিরিয়ে না দিলেও রাজা রামনারায়ণকে বড় ধরনের জায়গির সুবিধাসহ কয়েক হাজার সেনা সদস্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করেছিলেন। বিহারের নায়েব নাজিম পদে নিয়োগ দিয়ে তিনি রাজা রাজবল্লভকে নিজ পক্ষভূক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এত কিছু করেও মীর কাশিম স্বার্থান্ধ অভিজাতদের মন রক্ষা করতে পারেননি। রাজা রায়দুর্লভ এবং রাজা রামনারায়ণ মীর জাফরের পতন এবং মীর কাশিমের ক্ষমতা লাভে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও মীর কাশিম যখন নবাব হিসেবে নিজ ক্ষমতা জোরদার করে ইংরেজ নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বনির্ভর প্রশাসন দাঁড় করাতে সচেষ্ট হলেন, তখন এ স্বার্থপর অভিজাতরা তাঁর পাশে না দাড়িয়ে শুধু ব্যক্তি লাভের তাড়নায় ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করে। এমনকি রায়দুর্লভ মীর কাশিমের মতি-গতি সম্পর্কে গোপনে ইংরেজদের সংবাদ সরবরাহ করতেন বলে জানা যায়।[১৭৬] বিহারের নায়েব নাজিম পদ ফিরে না পেয়ে রাজা রামনারায়ণও মীর কাশিমের বিরুদ্ধাচারণ শুরু করেন এবং এমনকি মীর কাশিমের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। অন্যদিকে বিহারের নায়েব নাজিম পদ প্রদানের মাধ্যমে নবাব মীর কাশিম রাজা রাজবল্লভকে পুরস্কৃত করলেও নবাবের সাথে তাঁর সম্পর্কও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাঁর অধিক মাত্রায় স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা নবাবের কাছে অসহনীয় মনে হয়। ফলে নবাব তাঁর কাছ থেকে বিহারের নায়েব নাজিমের পদটি কেড়ে নিয়ে রাজা নর্তবৎ সিংহকে সে পদ দান করেন।[১৭৭] শুধু তাই নয় এসব অমাত্য অভিজাতের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে নবাব মীর কাশিম এখন তাদের চূড়ান্ত বিনাশ সাধনের সিদ্ধান্ত নেন। রাজা রামনারায়ণের বিরুদ্ধে নারীঘটিত এবং অর্থ তছরূপের অভিযোগ এনে তাঁকে বন্দি করা হয় এবং বন্দি অবস্থায়ই এ প্রভাবশালী অভিজাতের জীবনাবসান ঘটে।[১৭৮] প্রাণঘাতী নির্যাতনে দিউয়ান উমিদ রায় রায় রায়ানেরও জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। উল্লেখ্য যে, উমিদ রায়ের সাথেও ইংরেজদের বিশেষ সখ্য ছিল। মীর জাফরের সময় উৎকোচ নিয়ে তিনি বর্ধমান ও চব্বিশ পরগণার জমিদারি ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মীর কাশিমের সময়ও ইংরেজদের সাথে বিশেষ যোগাযোগ রক্ষার কারণে নবাব তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। নবাব মীর কাশিম মহারাজা রাজবল্লভের বিরুদ্ধেও চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেন। পুত্র কৃষ্ণদাসসহ রাজবল্লভকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। শুধু তাই নয় নবাব তাঁর বিশ্বস্ত সেনানী আ কা রেজার মাধ্যমে রাজবল্লভের রাজনগর এস্টেট

---

[১৭৬] Subhas Chandra Mukhopadhyay, *op.cit*, p. 142

[১৭৭] R. C. Majumder, *Maharaja Rajballabha*, University of Calcutta, 1947, p.79

[১৭৮] Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal*, The Cambridge University Press, London, 1969, p.50

Dhaka University Institutional Repository

বাজেয়াপ্ত করে সেখানকার ধনাগার কব্জা করেন।[১৭৯] এভাবে মীর কাশিমের সাথে স্বার্থের সংঘাতে সমকালীন বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট অভিজাতের পতন নিশ্চিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, ইংরেজদের হীন শর্তে সম্পাদিত অমর্যাদকর চুক্তির মাধ্যমে মীর কাশিম ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু নবাব হওয়ার পর তিনি যখন স্বাধীন নবাবের মতো নিজেকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান এবং ইংরেজ বিতাড়নের লক্ষ্যে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলাহ ও মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সাথে মৈত্রী জোট গঠনে প্রয়াসী হন, তখন স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজরা তাঁকে উৎখাতের সিদ্ধান্ত নেয়। ইংরেজ মিত্র রাজা রামনারায়ণ, মহারাজা রাজবল্লভ ও উমিদ রায় প্রমুখের জীবনাবসানে ইংরেজরা বিশেষ অসুবিধায় পড়েছিল বলে মনে হয় না। বরং এতে তাদের সুবিধাই হয়েছিল। কেননা ইংরেজদের এখন আর এতগুলো লোভাতুর মানুষের মন যোগানোর বাধ্যবাধকতা থাকলো না। বরং রাজা রায়দুর্লভ ও সৈয়দ মোহাম্মদ রেযা খানের মতো অল্প কয়েকজনকে ব্যবহার করে সহজেই নির্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিলের সুযোগ পেয়ে গেল। ১৭৬৩ সালে নতজানু মীর জাফরকে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার সিংহাসনে সমাসীন করা হয়। ইংরেজদের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেও মীর কাশিম শেষ রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। বক্সারের যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের দৃশ্যপট থেকে মীর কাশিম বিদায় নেন। ১৭৭৭ সালে দিল্লীতে নিতান্ত দীনহীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।[১৮০]

মীর জাফরের দ্বিতীয়বারের শাসনামলেও অভিজাতদের মধ্যে পদ-পদবি নিয়ে প্রতিযোগিতা অব্যাহত ছিল। তাঁর প্রথমবারের শাসনকালেই রাজা রায়দুর্লভের সাথে তাঁর বিরোধের কথা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। জীবনরক্ষার্থে রায়দুর্লভ যে ইংরেজদের কলকাতার দপ্তরে আশ্রয় নিয়েছিলেন সে কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও ইংরেজরা ক্ষমতার পট পরিবর্তনে মীর কাশিমের বিপক্ষে তাঁর সমর্থন পেয়েছিলেন ভবিষ্যতে খালিসার দিউয়ানি পদ প্রদানের প্রলোভন দিয়ে। মীর জাফরের ক্ষমতায় আরোহনের পর তিনি এ পদ লাভের আশায় কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে আসেন। কিন্তু মীর জাফর তাঁকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত পদে নিয়োগ না দিয়ে সে পদটি নন্দকুমারকে প্রদান করেন। তাঁকে মহারাজা উপাধি দিয়েও সম্মানিত করা হয়।[১৮১] অর্থকরী পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বভাবতই রায়দুর্লভ ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিপক্ষ নন্দকুমারের সাথে স্বার্থ বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। ইংরেজদের কথামতো রায়দুর্লভকে খালাসার দিউয়ানি পদ না দিলেও মীর জাফর তাদের দাবি মতো জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিমের পদটি ইংরেজ মিত্র অমাত্য সৈয়দ মোহাম্মদ রেযা খানকে দিতে বাধ্য হন।[১৮২] ফলে রায়দুর্লভ, মহারাজা নন্দকুমারের সাথে মোহাম্মদ রেযা খানও রাজনৈতিক মঞ্চে এসে সামিল হলেন। তবে

---

[১৭৯] R. C. Majumder, *op.cit,* p.83; সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২৫

[১৮০] শ্রী বজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'মীর কাসিমের শেষ জীবন', অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত *মীর কাসিম* (দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৬) গ্রন্থে সংকলিত। পৃ. ১৬৭

[১৮১] Abdul Majed Khan, *op.cit.,* p.51

[১৮২] *Ibid*

লক্ষণীয় যে, এ অভিজাতদের মধ্যে কোনো প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। বস্তুত এ তিন প্রভাবশালী অমাত্যকে পরস্পরের মুখোমুখী করার পেছনে ইংরেজদের ইন্ধন ও উস্কানি ছিল বলেই প্রতীয়মান হয়। রায়দুর্লভ এবং নন্দকুমারের মধ্যে নিঃসন্দেহে রায়দুর্লভেই ইংরেজদের বেশি অনুগত ও প্রীতিভাজন ছিলেন। তাই প্রথমে সফল না হলেও এক পর্যায়ে ইংরেজরা নন্দকুমারের উপরিস্থিত নায়েব দিউয়ান পদে রায়দুর্লভের নিয়োগ নিশ্চিত করে তাদের স্বার্থপুরণের পথে আরো একধাপ এগিয়ে যান। অপর অমাত্য অভিজাত রেযা খানের প্রতি ইংরেজদের একচেটিয়া সমর্থন বহাল থাকায় প্রশাসনে নন্দকুমার কোনঠাসা হয়ে পড়েন। কোম্পানি তাঁর উপর নজরদারি বহাল রাখার জন্য ১৭৬৫ সালে তাঁকে কলকাতায় এনে নজরবন্দি করে রাখে। অবশেষে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ১৭৭৫ সালে তমসুল দলিল জাল এবং সরকারি অর্থ আত্মসাতের অপরাধে নন্দকুমারকে ফাঁসি দেয়া হয়। মীর জাফরের মৃত্যুর পর ইংরেজ ক্রীড়ানক হিসেবে তাঁর পুত্র নাজম-উদ-দৌলাহ (১৭৬৫-১৭৬৬ খ্রি.) নবাব হলেও রেযা খান এবং রায়দুর্লভের পদ ও সুবিধা বহাল ছিল।

উপরের আলোচনার মধ্যমে পলাশি পরবর্তী পরিস্থিতিতে নবাবী বাংলার প্রধান প্রধান অমাত্য অভিজাতদের পরিণতি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া গেল। এ পর্যায়ে নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর অপর দুটি অঙ্গশক্তি বণিক অভিজাত ও ভূস্বামী অভিজাতদের পরিণতি সম্পর্কেও তথ্যানুসন্ধান প্রয়োজন। পলাশি চক্রান্তে ইংরেজদের অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন বণিক অভিজাত উমিচাঁদ। কিন্তু বিপ্লব পরবর্তীকালে ইংরেজ ও এ দেশীয় মিত্র অভিজাতদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাঁর মস্তিস্ক বিকৃতি এবং মৃত্যুবরণের কথা আলোচ্য অধ্যায়ের অন্যত্র বলা হয়েছে। পলাশি ষড়যন্ত্রে সিরাজ বিরোধী গ্রুপে সক্রিয় ছিলেন আর্মেনীয় বণিক অভিজাত খোজা পেত্রস। ভবিষ্যত লাভের আশায় তিনি ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজের ঘাঁটের বেশ কিছু টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে পলাশি পরবর্তীকালে নতুন পরিস্থিতিতে তাঁর ভাগ্যেও কিছু জোটেনি। এমনকি তাঁকে একজন "পাকা ষড়যন্ত্রকারী" বলে ইংরেজরা কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। পলাশিতে নিজের ভূমিকার কথা বলে ১৭৫৯ সালে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে পুরস্কার বা অন্তত তাঁর নিজের ব্যয় করা টাকাটা ফেরত চেয়ে আবেদন নিবেদন করলেও তাতে কোনো ফল হয়নি।[১৮৩]

নবাবী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বণিক খোজা ওয়াজিদের শেষ মুহূর্তে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর পক্ষ ত্যাগ করে ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে হাত মেলানোর কথা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর এ পক্ষ ত্যাগের পেছনে যে তাঁর হিসেবী বিষয়বুদ্ধি কাজ করেছিল সে কথাও অজানা নয়। তবে পলাশির পর নয়া জামানাতে তিনিও ঠিকে থাকতে পারেননি। ফরাসিদের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের ইংরেজরা তাঁকে কখনো বিশ্বাস করেনি। ক্ষমতার পালাবদলের পর তাঁর বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য ঠিকে থাকুক ক্লাইভ তা কখনো চাননি। তাই পলাশির পর দুবছর যেতে না যেতেই ইংরেজরা খোজা

---

১৮৩ রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াজিদের বিরুদ্ধে ফরাসি ও ওলন্দাজদের সাথে ষড়যন্ত্রে অভিযোগ এনে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। এ অপমানের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে সেখানেই তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন।[১৮৪]

পলাশি বিপ্লবে দেশীয় অভিজাত চক্রের মূল নেতা ছিলেন বণিক অভিজাত জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদ। এ ব্যাপারে তাঁর ঘনিষ্ট সহায় ছিলেন তাঁরই ভাই মহারাজা স্বরূপ চাঁদ। এ শেঠ ভাইরা ছিল নবাব মীর জাফর আলী খানের প্রধান মিত্র। তাদের ইচ্ছাতেই ইংরেজরা সিরাজ-উদ-দৌলাহর স্থলে মীর জাফর আলী খানকে বাংলার নবাব নির্বাচন করেছিল। মীর জাফর নবাব হলে শেঠদের আরো অধিক উন্নতি হবে, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি আরো বাড়বে এমনটিই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু অচিরেই তাদের সে আশা তিরোহিত হয়। ক্ষমতার পটপরিবর্তনে শেঠদের প্রত্যক্ষত কোনো উচ্চপদ লাভ করে লাভবান হতে দেখা যায়নি। আর্থিক প্রতিপত্তি বজায় রেখে নবাব ও দরবারের রাজনীতিতে কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখার যে স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন বাস্তবে তাও পুরণ হয়নি। মীর জাফরের ক্ষমতায় আরোহনের মধ্য দিয়ে শুধু ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তিই বৃদ্ধি পায়নি, পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের অভাবনীয় প্রাধান্য বিস্তার ঘটে। এতে শেঠদের আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। নবাবের আনুকূল্যে এ সময় ইংরেজরা কলকাতায় টাকশাল প্রতিষ্ঠা করে। এতে শেঠদের দীর্ঘদিনের টাকশাল ব্যবসার একচেটিয়াত্ব বিনষ্ট হয়। এটি তাদের সমূহ আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু টাকশাল পরিচালনায় একচেটিয়া অধিকার নয় নতুন পরিস্থিতিতে ইংরেজ কোম্পানির অর্থনৈতিক প্রাধান্য ক্রমবৃদ্ধির সাথে সাথে শেঠদের প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক প্রাবল্য বিনষ্ট হতে থাকে। এ অবস্থায় আর্থিক সংকটে নিপতিত নবাব মীর জাফর আলী খান শেঠদের কাছে ঘন ঘন অর্থ দাবি করতে থাকলে তাদেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং অথলগ্নীকে কেন্দ্র করে নবাবের সাথে তাদের বিরোধ ও মনোমালিন্য দেখা দেয়।[১৮৫] আর একারণেই মীর জাফর আলী খানের প্রথম রাজত্বের অন্তিম লগ্নে বকেয়া বেতনের দাবিতে মুর্শিদাবাদে যখন সেনা বিদ্রোহ দেখা দেয়, তখন নবাবের অনুরোধ সত্ত্বেও শেঠরা তাঁকে অর্থ সহায়তা দেয়নি। এই সেনা বিদ্রোহের জের ধরেই মীর জাফরের প্রথম রাজত্বে অবসান ঘটে। এ জন্য মনে করা হয় যে, নবাবের আবেদনে সাড়া না দিয়ে শেঠরা প্রকারান্তরে ১৭৬০ সালের পট পরিবর্তনকে তরান্বিত করেছিলেন।

১৭৬০ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে শেঠদের ভূমিকাকে নিছক মীর জাফর আলী খানের প্রতি তাদের ব্যক্তিগত বিরাগ হিসেবে দেখার কারণ নেই। বস্তুত মীর জাফরের স্থলে মীর কাশিমের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেঠরা তাদের নতুন স্বার্থ সম্ভাবনা সৃষ্টি তাগিদ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও শেঠদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। মীর কাশিম ক্ষমতায় এসে ইংরেজ বণিকদের সমান্তরালে দেশীয় শেঠ সওদাগরদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেন। এতে সাধারণভাবে দেশীয় বণিক ব্যবসায়ীরা উপকৃত হলেও শেঠদের বিশেষ কল্যাণ হয়নি। উপরুন্তু নবাব মীর কাশিম খান কর্তৃক মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরের ঘটনা শেঠদের জন্য বিরাট আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা সাম্রাজ্য জুড়ে শেঠদের আর্থ-ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাজধানী মুর্শিদাবাদ। কিন্তু এক্ষণে মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে মুঙ্গের নিজামত প্রশাসনের রাজধানী

[১৮৪] রজতকান্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৮

[১৮৫] কমল চৌধুরী (সম্পা.), *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রথম পর্ব*, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

স্থানান্তর হওয়ায় মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। এতে শেঠদের বাণিজ্য ব্যবস্থা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় শেঠরা নবাব মীর কাশিমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। এমনকি মীর কাশিমের বিরুদ্ধে শেঠরা তাদের পুরতান মিত্র নবাব মীর জাফর আলী খান এবং ইংরেজদের সাথে পুনরায় জোট গঠন করেন। মীর কাশিমের বিরুদ্ধে জগৎশেঠের ইংরেজ ও মীর জাফর আলী খানকে লেখা কিছু চিঠি নবাবের হস্তগত হলে নবাব তাঁর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে তৎপর হন। নবাবের নির্দেশে বীরভুমের ফৌজদার তকী খান জগৎশেঠ মহাতাব রায় ও তাঁর ভাই মহারাজা স্বরূপ চাঁদকে গ্রেপ্তার করে মুঙ্গেরে প্রেরণ করেন। শেঠরা মুঙ্গেরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনে নবাবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় নবাব মীর কাশিম তাঁর রাজত্বের অন্তীম লগ্নে অন্যান্য অভিজাতদের সাথে শেঠ ভাইদেরও নির্মমভাবে হত্যা করেন।[১৮৬] এই হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে মূলত সমকালীন বাংলার ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বণিক প্রতিষ্ঠান 'হাউজ অব জগৎশেঠের'ও অবক্ষয় ও পতন তরান্বিত হয়। মীর জাফর আলী খানের দ্বিতীয় রাজত্বকালে জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদের পুত্র খোশালচাঁদ এবং স্বরূপ চাঁদের পুত্র উদয় চাঁদ মুঘল সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক যথাক্রমে 'জগৎশেঠ' ও 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন।[১৮৭] কিন্তু পরিবর্তিত বাস্তবতায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রম দুর্গতির কারণে এই খেতাব নিতান্তই অন্তরসারশূণ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

মীর জাফর দ্বিতীয় দফায় যখন ক্ষমতায় আসেন তখন তিনি ইংরেজদে হাতে ক্রীড়ানক নবাবমাত্র। এরই মধ্যে বাংলার পুরনো বনেদি অভিজাতদের মধ্যে রায়দুর্লভ ছাড়া সকলেরই দৃশ্যপট থেকে করুণ বিদায় ঘটে। এ পর্যায়ে নবাবী বাংলার ভূ-অভিজাত জমিদারদের পরিণতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাতের মধ্য দিয়ে আলোচ্য অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দিউয়ানি ক্ষমতা অধিগ্রহণ ইংরেজদের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে নবাব মীর জাফর আলী খানের মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অনভিজ্ঞ পুত্র নাজম-উদ-দৌলাহর নবাবী পদ লাভের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের সেই স্বপ্ন সাধ পুরণের ক্ষণ আসে। ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রি.) সাথে সম্পাদিত এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজ কোম্পানি বাংলার দিউয়ানি ক্ষমতা তথা ভূমি রাজস্বের কর্তৃত্ব লাভ করে।[১৮৮] কোম্পানির দিউয়ানি লাভ বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যের যেমন পরিবর্তন ঘটায় বাংলার পুরতান ভূ-অভিজাতদের পতন ধারা সুনিশ্চিত করে। উল্লেখ্য যে, ভু-অভিজাতদের পতন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল পলাশির পর যখন ইংরেজরা দ্রুত এবং অনায়েস পদক্ষেপের মাধ্যমে সহজেই বাংলার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে তাদের জমিদারি অধিকার সম্প্রসারণ শুরু করে। সিরাজকে উৎখাতে সহায়তার পুরস্কার হিসেবে নবাব মীর জাফর আলী খান প্রথমেই ইংরেজদের চব্বিশ পরগনার জমিদারি প্রদান করেন। ১৭৬০ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সূত্রে ইংরেজরা নবাব মীর কাশিম

---

[১৮৬] জগৎশেঠ মহাতাব রায়কে দুর্গশিখর থেকে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। তবে মহারাজা স্বরূপ চাঁদকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় না। কমল চৌধুরী (সম্পা.), *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রথম পর্ব*, পৃপৃ. ৯৩, ১০০

[১৮৭] কমল চৌধুরী (সম্পা.), *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রথম পর্ব*, পৃ. ৯৩

[১৮৮] কোম্পানির দিউয়ানি লাভ সংক্রান্ত আরো তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, বংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯ , পৃ.পৃ. ৫৭-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

আলী খানের নিকট থেকে বাংলার দুটি পুরনো বনেদি জমিদারি বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব স্বত্ব কব্জা করে নেয়।[১৮৯] একই ঘটনাসুত্রে ইংরেজরা চট্টগামের উপরও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। নবাব মীর কাশিমের সম্মতির বিরুদ্ধে ইংরেজরা ত্রিপুরা জমিদারিও দখল করে নেয়। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে দিউয়ানি লাভের মধ্য দিয়ে বাংলার ভূ-অভিজাতদের উপর কর্তৃত্বের পূর্ণ অধিকার অর্জন করে। এই সুবাধে তারা বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র এবং বীরভূমরাজ আসাদ-উজ-জামানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহন করতে দ্বিধা করেনি। উল্লেখ্য যে, পলাশি বিপ্লব পরবর্তী প্রশাসনিক শৈথিল্যের সুযোগে বর্ধমানরাজ ও বীরভূমরাজ নবাব সরকারকে রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। এমনকি রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করার লক্ষ্যে নবাবী তৎপরতা মোকাবিলায়তারা একটি ঐক্য জোটও গঠন করেছিলেন। নবাব মীর জাফর কর্তৃক বর্ধমানের রাজস্ব স্বত্ব লাভ করেই কোম্পানি প্রথমে সামরিক শক্তি প্রয়োগে বর্ধমান রাজকে বশে আনার চেষ্টা করে। তবে এত চূড়ান্ত সাফল্য অর্জিত না হওয়ায় আপোসের কৌশলী নীতির মাধ্যমে বর্ধমানরাজকে কব্জায় নিয়ে নেয়। কোম্পানির কাছে বর্ধমান রাজ তিলক চন্দ্রের নতী স্বীকারের ঘটনাটি প্রকারান্তরে বীরভূমের জমিদার রাজা আসাদ-উজ-জামানের পরাভবের পথও প্রশস্ত করে। বস্তুত ইংরেজদের সামরিক পরাক্রম ও কৌশলের কাছে নবাব মীর কাশিম যখন পর্যুদস্ত, সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজদের প্রতি আপোসকামী হয়ে চুক্তিবদ্ধ এবং বর্ধমান রাজা তিলক চন্দ্র যখন ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পন করেছেন, তখন বীরভূম অধিপতির পক্ষে একা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বীরভূমে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯০] ইংরেজ আগ্রাসনের শিকার হয়ে জমিদারি হারায় মেদিনীপুরের জমিদার রাম রাম সিংহ। তথ্যসূত্রে জানা যায় যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে নবাব মীর কাশিম প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদার উপশমকল্পে ভূ-অভিজাত জমিদারদের উপর মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব হার চালু করেছিলেন। চতুর ইংরেজরা দিউয়ানি লাভের পর বাংলার ভূ-অভিজাত জমিদারদের বশীভূতকরণে মীর কাশিম প্রযুক্ত অত্যাধিক মাত্রার রাজস্ব নির্ধরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ প্রক্রিয়ায় নাটোর, দিনাজপুর, নদীয়া ও বিষ্ণুপুরের প্রভৃতি অঞ্চলের ভূ-অভিজাত জমিদারদের সর্বশান্ত করে ফেলা হয়। নাটোর ছিল বাংলার সর্ববৃহৎ জমিদারি। নবাব মীর কাশিমের সময়ই রাণী ভবানীর এ জমিদারির উপর স্বাভাবিকের চেয়ে আট গুন বেশি রাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল। ইংরেজরা রাজস্ব বৃদ্ধির এই হারই কেবল বজায় রাখেনি উপরুন্ত নানা রকম নিপীড়ন নির্যাতনের মাধ্যমে এ জমিদারির বিত্ত-বৈভব ধবংস করে ফেলে। এমনকি রাণী ভবানীর জীবদ্দশাতেই এই জমিদারির অস্তিস্ত হুমকির সম্মুখীন হয়। রাণীর দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণের সময় ইংরেজরা তাদের অধীনে বহু তালুকদারের সাথে নাটোর জমিদারি বন্দোবস্ত দেয়। ফলে এ জমিদারির যশোগৌরবের পতন ঘটে।[১৯১] মাত্রারিক্ত রাজস্ব আরোপ করে বিখ্যাত ভূ-অভিজাত রাজা রামনাথের পুত্র রাজা বৈদ্যনাথের পরিচালনাধীন দিনাজপুর জমিদারিকেও অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দেয়া হয়।

---

[১৮৯] Abdul Majed Khan, *op.cit.*, p. 35

[১৯০] রাখাল দাস মুখোপাধ্যায়, *বর্ধমান রাজবংশানুচরিত*, বর্ধমান, ১৩২১ বাং, পৃপৃ. ৫৮, ৬৪,৭৮

[১৯১] মোঃ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১১

Dhaka University Institutional Repository

সমকালে বাংলার অন্যতম বৃহৎ জমিদারি ছিল নদীয়া। নদীয়ার ভূ-অভিজাত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আঠারো শতকের এক আলোচিত চরিত্র। পলাশি বিপ্লবে ভূ-অভিজাতদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সক্রিয়। ইংরেজ সহায় এ জমিদার পলাশি বিপ্লবের পর কোনোভাবে পুরস্কৃত তো হননি উল্টো নতুন ব্যবস্থাপনার তিনি নির্মম শিকার হন। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দিউয়ানি লাভের পূর্বেই নদীয়ার রাজস্বাধিকার ইংরেজদের হস্তগত হয়েছিল। এ রাজস্ব আদায়ে ইংরেজরা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নানাভাবে উৎপীড়ন করেন। এমনকি সনাতন হিন্দু সমাজের প্রধান নেতা নদীয়ারাজকে জাতি নাশের ভয় পর্যন্ত দেখানো হলো। শুধু তাই নয়, নদীয়া রাজের রাজস্ব প্রদানের ব্যর্থতার কারণে কোম্পানি নদীয়ার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নিল। পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুর্যাস্ত আইনের আওতায় নদীয়া জমিদারি নিলামে হাতবদল হয়ে গেল। এ পরিণতি যে শুধু নদীয়ার হলো তাই নয়, অন্যান্য বড় বড় জমিদারির ভূ স্বামী অভিজাতদেরকেও একই ভাগ্য বরণ করতে হলো।

উপরের সাবির্ক আলোচনার উপসংহারে একথা বলা যায় যে, বাংলার ইতিহাসে পলাশি কোনো মামুলি বা সাধারণ ঘটনা ছিল না। যুদ্ধ হিসেবে সামরিক ইতিহাসে পলাশি যত নগন্য ঘটনাই হোক না কেন, বঙ্গ- ভারতের পরবর্তী রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতি ধারায় এর সূদুরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে আধুনিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে একে একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা হিসেবে গণ্য করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে, তা যথোচিত। এ কারণে আলোচ্য গবেষণায় পলাশিকে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছে। এরূপ একটি বৈপ্লবিক ঘটনার সংঘটনে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল সত্য। তবে এতে নবাব সরকার যুগের দেশীয় অভিজাত চক্রও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন উপরের আলোচনায় তা সুপ্রমাণীত হয়েছে। আলোচ্য পর্যালোচনায় এটাও লক্ষ করা গেছে যে, পলাশি বিপ্লবে দেশীয় অভিজাতদের অংশ গ্রহণের বিষয়টি কোনোভাবেই শ্রেণীগত ছিল না। অভিজাতদের অংশগ্রহণের বিষয়টি শ্রেণীগত দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করার কোনো অবকাশ নেই। পলাশির ঘটনার পেছনে দেশীয় অভিজাতদের অংশগ্রহণ ছিল একান্তই ব্যক্তি স্বার্থ চেতনা প্রসূত। এজন্যই অংশগ্রহণকারী অভিজাতদের স্বার্থের মধ্যে প্রকৃতিগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য সংশ্লিষ্ট অভিজাতদের সকলেই মনে করতেন তাদের স্বার্থবুদ্ধির বাস্তবায়ন একটি একক সফলতার উপর নির্ভরশীল, আর তা হলো নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর পতন নিশ্চিত করা এবং তাদের স্বার্থনুকূল কাউকে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত করা। মুলত এ কারণেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং স্বার্থ চেতনায় এক না হওয়া সত্বেও এ অভিজাতদের সিরাজ বিরোধী একটি অভিন্ন মতৈক্যে উপনীত হওয়া ও জোটবদ্ধ হওয়ার পথে অসুবিধা হয়নি।

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, পলাশি বিপ্লবে বাংলার তদানিন্তন অভিজাত চক্রের অংশ গ্রহণের পেছনে কোনো শ্রেণীগত স্বার্থ বা আদর্শিক অবস্থান পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুত তাদের অংশগ্রহণ ছিল একান্তই ব্যক্তিগত স্বার্থ তাড়না প্রসূত। নিজ নিজ লক্ষ্য হাসিলে সিরাজ-উদ-দৌলাহর উৎখাত প্রশ্নে তার এক জায়াগা হলেও বিপ্লব পরবর্তী সময়ে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসেব নিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

উপসংহার

মুঘল সাম্রাজ্যের (১৫২৬-১৮৫৮খ্রি.) অবক্ষয় ও ক্রমাবনতির ফলে মুঘল শাসনাধীন ভারতে ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে আঠারো শতকে ভারতে যে সব স্বশাসিত এবং উত্তরাধিকৃত রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল নবাব শাসিত বাংলা ছিল এদের অন্যতম। আইনগত দিক থেকে বাংলা তখনো মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির সার্বভৌমত্বাধীন থাকলেও নবাব সরকারের শাসনাধীনে বাংলা ছিল কার্যত স্বাধীন।

নবাবী আমল নামে পরিচিত বাংলার এ বিশেষ যুগটি সমকালীন ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অধ্যায় হিসেবে পরিচিত। মুঘল সাম্রাজের অবক্ষয় যুগে সারা ভারতে যখন বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অরাজক পরিবেশ বিরাজমান ছিল, সে সময় বাংলা ছিল এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। মুর্শিদকুলি খান ও তাঁর উত্তরসূরি নবাবদের কর্মতৎপরতায় বাংলায় অস্থিরতাও অরাজকতার পরিবর্তে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে। নবাবদের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় বাংলায় শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। এ সময় আইনত বাংলা মুঘল সম্রাটের সার্বভৌমত্বাধীন হওয়ায় প্রশাসনিক কাঠামোতে মুঘল প্রাদেশিক শাসন রীতির অনুসরণ ছিল সুস্পষ্ট। তবে এ যুগে বাংলায় উদ্ভুত নবতর পরিস্থিতিতে এখানকার সামগ্রিক প্রশাসনিক কাঠামো ও রাজনৈতিক গতিধারায় কিছু পরিবর্তন ও অভিনব বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। আর কোনো দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনিক অবস্থায় যখন পরিবর্তন ঘটে এর প্রভাব পরে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং সমাজ-সংস্কৃতির উপর। নবাবী বাংলার ক্ষেত্রেও তা ঘটেছিল। এ সময়ে প্রশাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বেশ কিছু লক্ষণীয় ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। আধুনিক গবেষকদের কেউ কেউ মনে করেন নবাব সরকার যুগের এ পরিবর্তন সমকালীন ইউরোপের যে কোনো দেশের পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করার মতো ছিল।[1] নবাবী বাংলার বর্ণিত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে সে সময়কার অভিজাত শ্রেণীর সংগঠন, বিকাশ ও গতি-প্রকৃতির মধ্যেও কিছু পরিবর্তন ও নতুনত্ব দেখা যায়। নবতর পরিস্থিতিতে সৃষ্ট অভিজাত শ্রেণী ছিল নবাবের একান্ত শাসন সহযোগী শক্তি। তদানীন্তন বাংলার রাজনীতি ও আর্থ-সমাজিক জীবনেও তারা নানামুখী ভূমিকা পালন করেন। এক কথায় সমকালীন বাংলা ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনে অভিজাত শ্রেণীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব লক্ষণীয়।

নবাবী বাংলার ইতিহাস অধ্যয়ন ও সে সময়কার যুগ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্যই আলোচ্য গবেষণায় অভিজাত শ্রেণীর গঠন ও বিকাশ, তাদের চরিত্রের অভ্যন্তরীণ স্বরূপ, তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সমন্বয় এবং নবাবী বাংলার রাজনীতি ও আর্থ-সমাজিক জীবনে তাদের ভূমিকা বিস্তৃতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, নবাবী যুগে বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্রাট বা রাজা-বাদশাহগণ সমাজের চূড়াবিন্দুতে অবস্থান এবং পদমর্যাদা ও ক্ষমতার দিক থেকে এক অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। নবাবী বাংলার

---

[1] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ -১৯৭১*, প্রথম খণ্ড,, পৃ. এগারো

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

উপসংহার

মুঘল সাম্রাজ্যের (১৫২৬-১৮৫৮খ্রি.) অবক্ষয় ও ক্রমাবনতির ফলে মুঘল শাসনাধীন ভারতে ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে আঠারো শতকে ভারতে যে সব স্বশাসিত এবং উত্তরাধিকৃত রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল নবাব শাসিত বাংলা ছিল এদের অন্যতম। আইনগত দিক থেকে বাংলা তখনো মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির সার্বভৌমত্বাধীন থাকলেও নবাব সরকারের শাসনাধীনে বাংলা ছিল কার্যত স্বাধীন।

নবাবী আমল নামে পরিচিত বাংলার এ বিশেষ যুগটি সমকালীন ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অধ্যায় হিসেবে পরিচিত। মুঘল সাম্রাজের অবক্ষয় যুগে সারা ভারতে যখন বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অরাজক পরিবেশ বিরাজমান ছিল, সে সময় বাংলা ছিল এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। মুর্শিদকুলি খান ও তাঁর উত্তরসূরি নবাবদের কর্মতৎপরতায় বাংলায় অস্থিরতাও অরাজকতার পরিবর্তে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে। নবাবদের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় বাংলায় শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। এ সময় আইনত বাংলা মুঘল সম্রাটের সার্বভৌমত্বাধীন হওয়ায় প্রশাসনিক কাঠামোতে মুঘল প্রাদেশিক শাসন রীতির অনুসরণ ছিল সুস্পষ্ট। তবে এ যুগে বাংলায় উদ্ভুত নবতর পরিস্থিতিতে এখানকার সামগ্রিক প্রশাসনিক কাঠামো ও রাজনৈতিক গতিধারায় কিছু পরিবর্তন ও অভিনব বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। আর কোনো দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনিক অবস্থায় যখন পরিবর্তন ঘটে এর প্রভাব পরে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং সমাজ-সংস্কৃতির উপর। নবাবী বাংলার ক্ষেত্রেও তা ঘটেছিল। এ সময়ে প্রশাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বেশ কিছু লক্ষণীয় ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। আধুনিক গবেষকদের কেউ কেউ মনে করেন নবাব সরকার যুগের এ পরিবর্তন সমকালীন ইউরোপের যে কোনো দেশের পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করার মতো ছিল।[১] নবাবী বাংলার বর্ণিত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে সে সময়কার অভিজাত শ্রেণীর সংগঠন, বিকাশ ও গতি-প্রকৃতির মধ্যেও কিছু পরিবর্তন ও নতুনত্ব দেখা যায়। নবতর পরিস্থিতিতে সৃষ্ট অভিজাত শ্রেণী ছিল নবাবের একান্ত শাসন সহযোগী শক্তি। তদানীন্তন বাংলার রাজনীতি ও আর্থ-সমাজিক জীবনেও তারা নানামুখী ভূমিকা পালন করেন। এক কথায় সমকালীন বাংলা ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনে অভিজাত শ্রেণীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব লক্ষণীয়।

নবাবী বাংলার ইতিহাস অধ্যয়ন ও সে সময়কার যুগ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্যই আলোচ্য গবেষণায় অভিজাত শ্রেণীর গঠন ও বিকাশ, তাদের চরিত্রের অভ্যন্তরীণ স্বরূপ, তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সমম্বয় এবং নবাবী বাংলার রাজনীতি ও আর্থ-সমাজিক জীবনে তাদের ভূমিকা বিস্তৃতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, নবাবী যুগে বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্রাট বা রাজা-বাদশাহগণ সমাজের চূড়াবিন্দুতে অবস্থান এবং পদমর্যাদা ও ক্ষমতার দিক থেকে এক অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। নবাবী বাংলার

[১] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ -১৯৭১*, প্রথম খণ্ড,, পৃ. এগারো

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকাঠামো ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসেও একই চিত্র দেখা যায়। অন্যান্য সামন্তসমাজের মতো নবাবই ছিলেন বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজের শীর্ষ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাঁকে ঘিরেই রাষ্ট্র ও সমাজ আবর্তিত হতো। রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামো ও সামাজিক বিন্যাসক্রমে নবাবের পরেই ছিল অভিজাত শ্রেণীর স্থান। আর সে যুগে অভিজাত ছিলেন তারাই যাদের ধনৈশ্বর্যের সঙ্গতির পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। উল্লেখ্য যে, মুঘল সুবাদারি শাসনামলেয় রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে নিয়োজিত অমাত্যরাই ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের প্রধান অভিজাত। কৃষিজীবীদের উৎপাদিত সামাজিক উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে জীবিকা নির্বাহকারী জমিদারবর্গও রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে অভিজাত হিসেবেই গণ্য হতেন। তবে তুলনামূলকভাবে মুঘল আমলাতন্ত্রের নিষ্পেষণে এ শ্রেণীটি অনেকটাই নিস্প্রভ ছিল। মুঘল সুবাদারি যুগে বাংলায় ধনী বণিক-ব্যবসায়ী ছিল না এমনটা নয়, তবে সে সময় ব্যবসা বাণিজ্যে রাজপুরুষদের অংশগ্রহণ এবং *সওদা-ই-খাস*'র ব্যাপক বিস্তার ইত্যাদি নানা কারণে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে পেশাদার বণিক-ব্যবসায়ীরা অভিজাত শ্রেণীভূক্ত হতে পারেনি। কিন্তু নবাবী আমলে পরিস্থিতি নবতর রূপ লাভ করে। বস্তুত মুর্শিদকুলি খানের নিজামত ক্ষমতা লাভের মধ্য দিয়ে বাংলার শাসন ব্যবস্থা ও ক্ষমতা কাঠামোতে নতুন বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক নতুন রূপপরিগ্রহ লাভ করায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কাঠামোর মতো বাংলার সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসেও রূপান্তর দৃষ্টি গোচর হয়। এ সময় অভিজাত শ্রেণীর সংগঠন ও বৈশিষ্ট্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়। মুঘল সুবাদারি যুগের মতো রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে অভিজাত হিসেবে সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ অমাত্যবর্গের অবস্থান বহাল থাকে। পদস্থ অমাত্যদের পাশে ভূ-স্বামী জমিদার গোষ্ঠীকেও প্রভাবশালী অভিজাত হিসেবে সক্রিয় দেখা যায়। নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভূ-অভিজাত নামীয় বৃহৎ জমিদারগণ রাজা-মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে ক্ষমতাধর হিসেবে আবির্ভূত হয়। তবে অভিজাত শ্রেণীর সংগঠনে নবাবী যুগের বিশেষ অভিনবত্ব হচ্ছে এতে বণিক ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্তি। বস্তুত মুর্শিদকুলি খান এবং তাঁর পরবর্তী নবাবদের সময় বাংলায় একটি প্রতিপত্তিশালী ধনকুবের বণিকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য এবং মুদ্রা ও ব্যাঙ্কিং ব্যবসা থেকে এ বণিক শ্রেণী অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী হয়। জগৎশেঠ, খোজা ওয়াজিদ প্রমুখ বণিক-মহাজনরা ছিলেন এ নব্য আর্থিক ব্যারণগোষ্ঠীর প্রতিভু। সম্পদ, শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্যে সুবাদারি যুগের বণিক-ব্যবসায়ীদের তুলনায় নবাবী যুগের বণিক ব্যবসায়ীরা অনেক বেশি প্রাগ্রসর ছিল। ব্যাপক আথির্ক সঙ্গতির বলে এই ধনকুবের বণিকগোষ্ঠী নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময়ই অভিজাত অমাত্য ও ক্ষমতাবান ভূ-অভিজাতদের সমান্তরালে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নেয়। এই বণিকদের কর্ম তৎপরতা কেবল অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও তাদের সক্রিয় পদচারণা দেখা যায়। আর এভাবেই তারা সমকালীন বাংলায় অভিজাত শ্রেণীতে নিজেদের ঠাঁই নিশ্চিত করে নেয়। লক্ষণীয় যে, নিজেদের স্বার্থেই এই অভিজাত বণিকগণ নবাবী যুগের অমাত্য ও জমিদার ভূ-অভিজাতদের সহায়হক হিসেবে এবং আরো স্পষ্ট ও সুনিদৃষ্টভাবে বলতে গেলে তাদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করে।[২]

[২] সাধারণভাবে ভূ-অভিজাত বলতে শুধু ভূ-স্বামী জমিদারদেরই বুঝায়। ভূমি রাজস্ব থেকে সংগৃহীত বা কোনো না কোনো পন্থায় ভূমি থেকে উপার্জিত বিপুল অর্থবলে যাঁরা বলীয়ান এবং শৌর্য-বীর্যের অধিকার ছিলেন তাদেরও এক অর্থে ভূ-অভিজাত বলে গণ্য করা হয়। এ জন্যই নবাবী যুগের অমাত্যবর্গ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, নবাব সরকার যুগে পদস্থ অমাত্য, ভূ-স্বামী জমিদার ও বণিক-মহাজন- এ তিনটি উপাদান (component) সমন্বয়ে অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠেছিল। এই অভিজাত শ্রেণীর সংগঠন, বিকাশক্রম এবং চরিত্রের সার্বিক বিশ্লেষণে তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত পরিস্কারভাবে লক্ষ করা যায়ঃ

প্রথমতঃ এ নবাবী যুগের অভিজাত শ্রেণী কোনো একক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে গড়ে ওঠেনি, গড়ে ওঠেছিল বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সমন্বয়ে। ধর্মীয় দিক থেকে অভিজাত শ্রেণীতে হিন্দু-মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল; তবে এতে জৈন, শিখ ও খ্রিস্টানদের উপস্থিতিও চোখে পড়ে। তথ্য পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, মুঘল সুবাদারি যুগে বাংলার অভিজাত শ্রেণীতে নিরঙ্কুশ মুসলিম প্রধান্য ছিল। সে যুগে অভিজাত শ্রেণীতে বিশেষ করে অমাত্য আভিজাত পড়িমণ্ডলে হিন্দুদের উপস্থিতি ছিল একেবারেই নগণ্য সংখ্যক। কিন্তু নবাবী যুগে অভিজাত শ্রেণীতে হিন্দুদের শুধু অন্ত র্ভুক্তিই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্যও ছিল লক্ষণীয়। এর পেছনে বাংলার নবাবদের উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি যেমন কাজ করেছিল, তেমনি তাদের রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনাও বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে করার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ রয়েছে। তবে নবাব সরকার যুগে অভিজাত শ্রেণীতে হিন্দুদের অন্তর্ভুক্তি ঘটলেও এতে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপস্থিতি ছিল না।। হিন্দু অভিজাতরা ছিলেন মুখ্যত উচ্চবর্ণের। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নাটোরের রাণী ভবানী ও দিনাজপুরের জমিদার প্রমথনাথ প্রমুখ ছিলেন ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপুরের জমিদার গোপাল সিংহ ও চৈতন্য সিংহ ছিলেন ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোক, রাজা রাজবল্লভ ছিলেন হিন্দু বৈদ্য বংশীয় এবং রাজা জানকী রাম ও রাজা রায়দুর্লভ কায়স্থ বর্ণের। একই কথা মুসলমানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তত্ত্বগতভাবে অভিজাত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে জাত-পাতের কোনো বাধা না থাকলেও কোনো সাধারণ মুসলমানের অভিজাত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তি লাভ ছিল একেবারেই বিরল ঘটনা। বস্তুত বহিরাগত আশ্‌রাফ নামীয় উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরাই কেবল অভিজাত শ্রেণীতে ঠাঁই করে নিতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে শিয়া মতাবলম্বীদেরও উপস্থিতি বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো ছিল। অভিজাত শ্রেণীতে শিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতির কারণ সম্ভবত শিয়া ধর্মমত ছিল বাংলার নবাবদের ধর্ম। মুর্শিদকুলি খান ছাড়া বাংলার নবাবগণ সকলেই শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। আর একারণেই সম্ভবত শিয়ারা অভিজাত শ্রেণীতে বিশেষ প্রাধ্যান্য পেয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ বৈশিষ্টের দিক থেকে নবাবী যুগের অভিজাত শ্রেণী ছিল মিশ্রজাত উদ্ভুত। এ সময় অভিজাত শ্রেণীতে অন্ত র্ভুক্তির ক্ষেত্রে ভূ-রাজনৈতিক বা অঞ্চলগত বৈষ্যম্য ছিল না। ফলে এ যুগের অভিজাত শ্রেণীতে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার প্রতিনিধিত্ব পরিলক্ষিত হয়। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যমণি বলে খ্যাত জগৎশেঠরা ছিলেন রাজস্থানী, অন্যদিকে উমিচাঁদ ছিলেন পাঞ্জাবী। রাজা মোহনলাল ছিলেন কাশ্মিরি। মুঘল সুবাদারি যুগে অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে স্থানীয় বাঙ্গালিদের প্রবেশ ছিল দুরূহ ব্যাপার। এসময় অভিজাত শ্রেণী মূলত উত্তর ভারত থেকে আগত অভিবাসী সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছিল। কিন্তু নবাবী আমলে উত্তর ভারত তথা দিল্লির সাথে বাংলার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক যোগাযোগ এক রকমের বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে অমাত্যদের আগমন প্রবাহও একেবারেই কমে যায়। ফলে নবাবগণ অমাত্য শ্রেণীর উচ্চপদে

(সামরিক- বেসামরিক) জায়গির তথা ভূমিজাত বিত্তর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো বলে এদেরকেও ভূ-অভিজাত বলে কেউ কেউ গণ্য করেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় বাঙ্গালিদের নিয়োগ দিতে বাধ্য হয়। তবে স্থানীয় বাঙ্গালি অমাত্যদের মধ্যে হিন্দুদের উপস্থিতি ছিল প্রবল। এসময় অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে স্থানীয় বাঙ্গালি মুসলমানদের উপস্থিতি দেখাই যায় না। মুসলমান অভিজাতদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক উত্তর ভারতীয় ছিলেন বটে, তবে সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবে একে নগণ্যই বলতে হয়। বস্তুত মুঘল সুবাদারি যুগের মতো নবাবী যুগের মুসলমান অভিজাত অমাত্যদের মধ্যেও পারসিক ও আফগানদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় ছিল। সংখ্যায় কম হলেও মুসলমান অমাত্য অভিজাত শ্রেণীতে আরব বংশজাত লোকের উপস্থিতিই ও চোখে পড়ে।

তৃতীয়ত: নবাবী যুগের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বহির্মুখী প্রবণতা ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুঘল সুবাদারি যুগের অভিজাতদের মধ্যে উত্তর ভারতমুখী প্রবণতা ছিল স্পষ্ট। বস্তুত সে সময় একজন সুবাদার যখন নিয়োগ পেয়ে বাংলায় আসতেন তার সাথে একদল অমাত্য অভিজাতও থাকতেন। সুবাদারের দায়িত্ব পালন শেষে এ অভিজাতদেরও বেশিরভাগ বাংলা ছেড়ে চলে যেতেন। তাছাড়া ভৌগোলিক দুরত্ব এবং আবহাওয়া ও পরিবেশগত কারণে সুবাদারি যুগের অভিজাত আমলাদের বেশিরভাগের কাছেই বাংলা পছন্দের স্থান বলে গণ্য হতো না। এ কারণে তাদের মধ্যে সবসময় একটি উত্তর ভারতমুখী প্রবণতা কাজ করতো। দায়িত্ব পালন শেষে উত্তর ভারত বা স্বদেশে ফিরে যাওয়ার আকুলতা কাজ করতো বলেই তখনকার অভিজাতদের মধ্যে বাংলার মাটি-মানুষ ও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ বা মমত্ববোধের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। তাছাড়া অমাত্যদের মধ্যে এই অভিবাসী মনোবৃত্তি থাকায় বাংলা থেকে উত্তর ভারতে সম্পদ নিঃস্বরণের বিষয়টিও লক্ষ্য করার মতো। এক্ষেত্রে নবাবী যুগের অভিজাতরা ছিলেন ব্যতিক্রম। এ যুগের বহিরাগত অভিজাতদের মধ্যেও বহির্মুখী প্রবণতা ছিল না। আর একারণেই তাদের মধ্যে বাংলার ব্যাপারে একটি অধিবাসী মনোভাব দেখা যায়। তারা বাংলার মাটিতে প্রতিপালিত হওয়ায় নিজেদের আদি বাসভূমির মায়া ভুলে বাংলার স্থানীয় সমাজ ও রাজনীতিতে সামিল ও আত্মীভুত হয়ে যায়। পুরুষানুক্রমে বাংলায় বাস করার ফলে বাংলার মাটি-মানুষ, তাদের সংস্কৃতি ও জীবনধারার প্রতিও তাদের একরকমের অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। এ যুগের অভিজাতদের মধ্যে বর্হির্মুখী প্রবণতা না থাকার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে বাংলা থেকে উত্তর ভারতে ধন নিষ্ক্রমণ (wealth drainage) প্রক্রিয়াটিও বন্ধ হয়েছিল।[৩]

চতুর্থত: নবাবী যুগের স্বেচ্ছাচারী রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নবাবের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হলেও প্রশাসন পরিচালনায় নবাবকে অভিজাত শ্রেণীর উপর নির্ভর করতে হতো। বস্তুত প্রশাসন পরিচালনায় অভিজাত শ্রেণী ছিল নবাবের একান্ত সহযোগী। মুঘল ভারতে দরবারের সাথে সম্পর্কের নিরিখে সামরিক ও বেসামরিক অভিজাত অমাত্যদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়- (ক) তৈনাৎ-ই-রকব এবং (খ) তৈনাৎ-ই-সুবাজাৎ। প্রথমোক্ত অমাত্য হলেন তারা যারা প্রশাসনিক প্রয়োজনে দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং প্রদেশে নিযুক্ত অমাত্যগণ ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। এরূপ বিভাজন নবাবী বাংলার অভিজাত অমাত্যদের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রযোজ্য না হলেও এর সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। এ সময় অভিজাত

---

[৩] ইতোপূর্বে পদস্থ অমাত্যগণ দায়িত্ব পালন শেষে উত্তর ভারতে চলে যাওয়ার ফলে তারা বাংলায় তাদের কার্যকালে বৈধ-অবৈধ উপায়ে যে ধন সঞ্চয় করতেন তা উত্তর ভারতে নিয়ে যেতেন। এ সম্পর্কে অভিসন্দর্ভের অন্যত্র আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু নবাবী আমলে অমাত্য অভিজাতদের মধ্যে উত্তর ভারতমুখী প্রবণতা না থাকায় তাদের সঞ্চিত অর্থ বাংলায়ই থেকে যেতো এবং প্রকারান্তরে তা বাংলায়ই ব্যয়িত হতো।

অমাত্যদের মধ্যে দিউয়ান, বখশি, সদর কানুনগো, উপদেষ্টা ইত্যাদি কতিপয় কর্মকর্তা দরবারের সাথে সরাসরি সংশিষ্ট ছিলেন। অন্য দিকে নায়েব নাজিম, ফৌজদার প্রভৃতি কর্মকর্তাগণ দরবারের বাইরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিটে দায়িত্ব পালন করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নবাব সরকার যুগে উড়িষ্যা, বিহার ও জাহাঙ্গীরনগর ছিল তিনটি নিয়াবতী এলাকা। নায়েব নাজিম পদবির পদস্থ অমাত্য এই প্রশাসনিক ইউনিটের প্রধান ছিলেন। তাঁর অধীনে বখশি, দিউয়ান, ফৌজদার ইত্যাদি সামরিক-বেসামরিক পদস্থ কর্মকর্তাসহ সমরবাহিনীর সেনানায়করা কর্মরত থাকতেন। আর কেন্দ্র এবং নিয়াবতী এলাকায় কর্মরত এসব সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল অমাত্য অভিজাত শ্রেণী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবাবী আমলে সামরিক-বেসামরিক অমাত্যদের পৃথক পৃথক অধিক্ষেত্র ছিল। তবে কোনো কোনো অভিজাত অমাত্য সামরিক-বেসামরিক উভয় প্রকৃতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

পঞ্চমত: নবাবী যুগের ভূ-অভিজাত শ্রেণী তথা জমিদারবর্গের মধ্যে একটি আমলাতান্ত্রিক চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। এ সময় বণিক অভিজাতদেরও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, সম্রাট আকবর কর্তৃক মনসবদারি প্রথার আওতাভুক্তকরণের ফলে ভূ-অভিজাত জমিদারগণ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা পর্যায়েই পরিগণিত হন। নবাবী আমলে ভূ-অভিজাতদের সকলেই প্রশাসন কাঠামোর অঙ্গ বিশেষ ছিলেন না। তবে এ কথা অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে, ভূ-অভিজাতদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমলতন্ত্রের সুস্পষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। সরাসরি রাজকর্মচারি না হলেও সরকারের তরফে কৃষক-রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়, কৃষির উন্নয়ন, প্রয়োজনে নবাবকে সামরিক সহযোগিতা প্রদান, নিজস্ব জমিদারি এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নয়ন কাজ তদারকি ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে প্রকারান্তরে ভূ-স্বামী জমিদারগণ আমলাতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করতেন। তত্ত্বগতভাবে বণিক অভিজাতদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন না করারই কথা। তবে নবাবী যুগে ব্যতিক্রম দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত জগৎশেঠদের নাম উল্লেখ করা যায়। মুর্শিদকুলি খানের সময় জগৎশেঠ ফতেহচাঁদকে নবাব সরকারের রাজকীয় ট্রেজারীর কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়েছিল। নবাব সুজাউদ্দিন খানের শাসনামলে জগৎশেঠ নবাবের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হয়ে রীতিমতো প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণে ভূমিকা পালন করেছেন। নবাব সরফরাজ খানের সময়ও উপদেষ্টা কাউন্সিলে নিজের অবস্থান বহাল রেখে জগৎশেঠ তাঁর প্রশাসনিক অংশিদারিত্ব বজায় রেখেছিলেন। আলিবর্দী খানের সময়ও জগৎশেঠকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে সক্রিয় দেখা যায়। বণিক অভিজাত খোজা ওয়াজিদকে নবাব সরকারের পক্ষে কূটনীতিবিদের দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়।

ষষ্ঠত: নবাবী আমলে পদস্থ অমাত্য, ভূ-স্বামী জমিদার এবং বণিক মহাজনদের নিয়ে যে মিশ্র ধরণের অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠেছিল তাদের মধ্যে শ্রেণী চেতনা ছিল দুর্বল। তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রবল বাসনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রেণী স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তি স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়ায় তাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আলোচ্য গবেষণায় নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানে এও প্রমাণীত হয়েছে যে, নবাবের সঙ্গে অভিজাতদের সম্পর্ক সবসময়ই পারস্পরিক স্বার্থা-স্বার্থের উপর ভিত্তি করেই আবর্তিত হয়েছে। অভিজাতদের মধ্যে নবাব তথা রাষ্ট্রের প্রতি দায়বোধ ও কর্তব্যবোধ অপেক্ষা নিজস্ব হিত চিন্তার বিষয়টিই সবসময় প্রাধান্য পেয়েছে। দেখা যায় যে, প্রশাসনিক ও সামরিক সহায়তার বিনিময়ে নবাব ভূমি সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা দিলে সামরিক-বেসামরিক অমাত্যগণও নবাবকে সহায়তা

দিতেন। কিন্তু স্বার্থ বিপন্ন হলে তারা বিদ্রোহ করতে, নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেন এবং এমনকি নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করে স্বার্থানুকূল অন্য কাউকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার উদ্যোগ আয়োজন করতে তার মোটেই কুণ্ঠাবোধ করতেন না। নবাব সরকার যুগের প্রতিটি রাজনৈতিক পালাবদলের ঘটনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবাব ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যকার এ পারস্পরিক স্বার্থ চেতনা শুধু নবাবের ক্ষমতার স্থায়িত্ব বা তাঁর সফলতা ব্যর্থতার নিয়ামক হিসেবেই কাজ করতো না, বরং এটি অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতার হেরফের এমনকি তাদের উত্থান-পতনকেও প্রভাবিত করতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যুর পর থেকে নবাবী পদকে কেন্দ্র করে যে সব উত্তরাধিকার সংঘাত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে অভিজাত শ্রেণীর সুস্পষ্ট সম্পৃক্ততা ছিল। আরো খোলাসা করে বলতে গেলে মসনদ দখলের লড়াইয়ে নবাবী পদ লাভে আগ্রহীদের প্রত্যেক উত্তরাধিকার সংঘাতের সময়ই একদল অভিজাতের সহায়তা এবং অন্য একদলের বিরোধিতার মোকাবেলা করতে হয়েছে। এ অবস্থায় ক্ষমতার লড়াইয়ে বিজয়ী নবাব তাঁকে মসনদ লাভে সহায়তাকারী অভিজাতদের উদারভাবে পুরস্কৃত করায় তাদের পদ-পদবিতে উন্নতিসহ আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যদিকে যারা তাঁর বিরোধিতা করেছেন পদ বঞ্চনাসহ আর্থিক সুবিধাদি কেড়ে নিয়ে অধপতনের শেষ সীমায় ঠেলে দেয়া হয়েছে। এমনকি অনেক অভিজাতকে জীবন দিয়ে নবাবের সাথে স্বার্থ সংঘাতের মাশুল দিতে হয়েছে।

সপ্তমতঃ নবাবী আমলের অভিজাতদের প্রত্যেকটি শ্রেণীরই দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি নির্দিষ্ট ব্যাপ্তি বা সীমা (jurisdiction) ছিল। তবে এ সময় অভিজাতবর্গকে তাদের নিদৃষ্ট কর্তব্য সীমার বাইরেও বহুমাত্রিক কর্তব্য-কর্মে নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, বেসামরিক-সামরিক অমাত্য অভিজাতরা যেমন শুধু প্রশাসনিক ও সামরিক দায়িত্ব পালনেই নিজেদের ব্যাপৃত রাখেননি, তেমনি ভূস্বামী অভিজাত এবং বণিক অভিজাতরাও নিজস্ব কর্মগণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ সময় বণিক অভিজাতদেরও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। তদুপরি অভিজাতদের প্রতিটি অংশই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিল। নবাব মুর্শিদকুলি খানের কঠোর ও সংযমী শাসনাধীনে অভিজাতবর্গ তাদের গণ্ডি অতিক্রম এবং রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়া তেমন সুযোগ পায়নি। তবে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের সময় তারা সে সুযোগটি পেয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে নবাবদের প্রত্যক্ষ মদদেই তারা এ সুযোগ লাভ করে। স্মরণীয় যে, মুর্শিদকলি খান ছিলেন দিল্লীর কেন্দ্রীয় মুঘল সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার শেষ সুবাদার-নাজিম। এরপর কেন্দ্র থেকে বাংলা প্রশাসনের শীর্ষ নির্বাহী নাজিম পদে নিয়োগ দান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এ পদ দখলকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার রাজনীতি শুরু হয়। মসনদ দখল প্রক্রিয়ায় নবাবদের অভিজাতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নেয়ায় অভিজাতবর্গ ক্ষমতার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় কালক্রমে তারা নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের বাইরে রাজনীতিতেও নিয়ামক শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করে। নবাবদের মধ্যে অভিজাত নির্ভরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের ক্ষমতার আরো বিস্তৃতি ঘটে। এমনকি এ সময় কতিপয় অভিজাত ব্যক্তির মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের মতো উচ্চবিলাস জাগ্রত হয়। আর এ উচ্চবিলাস চরিতার্থকরণে তাদের নানামুখী তৎপরতা- অপতৎপরতায় নবাবী বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে। যার শেষ পরিণতি হলো পলাশি বিপ্লব।

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যায়ে আলোচ্য গবেষণায় প্রাপ্ত আরো কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা যায়। নবাবী আমলে অভিজাত শ্রেণী বিশেষ করে অমাত্য অভিজাতদের মধ্যে দরবার সম্পৃক্ত থাকার একটি সাধারণ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রাজনীতিতে সক্রিয়তার বিষয়েও তাদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ছিল। তবে রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে তাদের উদ্যোম ও বিশেষ আগ্রহের অভাব প্রতীয়মান হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, নবাবী যুগের অর্থনীতির সার্বিক উন্নতির প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির প্রধান দুটি খাত কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ছিল সময়ের দাবি। এ দুটি খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন বিশেষ করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল প্রত্যাশিত। ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি রাজস্ব খাত এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি সরঞ্জামের আধুনিকায়নসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নে নবাব সরকারের ভূমিকা আশাব্যঞ্জক ছিল না। সমকালীন ইউরোপে সামন্ত জমিদাররা কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। নবাবী বাংলায় কৃষি খাতের উন্নয়নে ভূ-স্বামী অভিজাতদের এক রকমের বাধ্যবাধকতাও ছিল। কিন্তু বাস্তবে তারা সে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। জায়গির তথা ভূমিজ উৎপাদন সুবিধাভোগী অমাত্য অভিজাতদেরও কৃষির উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি। ফলে এ দেশের অর্থনীতির প্রধান উৎস কৃষিখাত সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থার আবর্তেই ঘোর-পাক খেয়েছে। পর্যালোচনাধীন সময়ে শিল্প ছিল বাঙ্গালির দ্বিতীয় প্রধান উপজীবিকা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উৎস। নবাবী বাংলার শিল্প পণ্যের চাহিদা ছিল বিশ্বজোড়া। এরূপ বাস্তবতায় স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন একান্তভাবেই কাম্য ছিল। কিন্তু সে সময় বাংলায় শিল্পোৎপাদন প্রণালীর মৌলিক বা প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাধনে রাষ্ট্রযন্ত্র কোনো দায়িত্ব পালন করেনি। এ ক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকাও ছিল নেতীবাচক। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, কাঠামোগতভাবে নবাবী যুগের অভিজাত শ্রেণীর অমাত্য ও ভূ-স্বামীরা ছিল উৎপাদন থেকে বিছিন্ন। কাজেই তারা উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ও কারিগরি প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল বিকাশের ফলে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বাণিজ্যিক পুঁজিপতি শ্রেণী হিসেবে অভিজাত বণিকদের মহাদাপট দেখা যায়। রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়ন এবং পণ্য উৎপাদনে প্রযুক্তি ব্যবহারে অভিজাত বণিক শ্রেণীর বিশেষ ভূমিকা পালন একান্তভাবে কাম্য ছিল। কিন্তু বাস্তবে তারাও সে প্রত্যাশা পুরণ করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, পুঁজিপতি বণিক অভিজাতদের বিপুল অর্থ বাংলার পুঁজিবাদী উন্নয়নেও কোনো অবদান রাখেনি। অনেকেই মনে করেন যে, বাংলায় স্বউদ্যোগে বণিক সমাজের বিকাশ ঘটেনি, ফলে এরা ইউরোপীয় বণিক সমাজের ন্যায় প্রগতিশীল উৎপাদন শক্তির প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। নিজেদের বিপুল বাণিজ্য পুঁজিকে শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত করার কোনো মানসিকতা, প্রস্তুতি বা প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে ছিল না। ফলে বিপুল বণিক পুঁজির মালিক হলেও অভিজাত বণিকরা দেশের সামগ্রিক উৎপাদন প্রণালী, উৎপাদন সংগঠন বা বিপনন ব্যবস্থায় কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি। ফলে বাংলার কৃষি ও শিল্প খাতের উৎপাদন ও বিপনন ব্যবস্থা নিতান্তই সরল থেকে যায়। আর এরূপ সরল উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থারই সারকথা।

নবাবী শাসনামলে বাংলার সমাজ ও সস্কৃতির বিকাশে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সামাজিক জীবনাচারণে তারা মূলত নবাবদেরই অনুকরণ অনুসরণ করেছেন। এ জীবনধারা ছিল অনেকখানি আন্তর্জাতিক শহুরে

বিলাসী ও জমকালো সংস্কৃতি। এর ঝোঁকটি ছিল বহিরাগত পারস্য সংস্কৃতির দিকে। এরকম জীবনাচার শুধু মুসলিম অভিজাত আমির-ওমারদেরই ছিল না, হিন্দু ভূ-স্বামী রাজা জমিদাররাও এরকম জীবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

নবাবী যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে রাষ্ট্র কিছুটা ভূমিকা রেখেছে, তবে সার্বিক বিবেচনায় তা পর্যাপ্ত ছিল না। এক্ষেত্রে অমাত্য অভিজাতদের ভূমিকা মোটেই সন্তুষজনক নয়। বণিক অভিজাতদের কাছ থেকে সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশে অনেক বেশি ভূমিকা প্রত্যাশিত ছিল। সমকালীন বিশ্বে বিশেষ করে ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে ,সেখানকার বণিক সমাজ সামাজিক রূপান্তর ও সাংস্কৃতিক বিকাশে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু নবাবী যুগের অভিজাত বণিকরা এরূপ কোনো ভূমিকা পালন করেছিলেন, এমন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এক্ষেত্রে ভূ-অভিজাত জমিদারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রমাণ মেলে। ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ করে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নয়নে তারা অসামান্য অবদান রাখেন। সঙ্গীত, নৃত্যকলা, স্থাপত্য ও চারু-কারুশিল্পসহ বহুমাত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ সাধনেও ভূ-অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা প্রশংসনীয়।

নবাবী আমলে উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক অমাত্য, ভূ-স্বামী জমিদার ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর সমন্বয়ে যে অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠেছিল কেউ কেউ একে একটি শক্তিজোট (power block) হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে এ অভিজাত শ্রেণীর গঠন ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখলে একে একটি মজবুত ও সংঘবদ্ধ শক্তিজোট বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করার অবকাশ থাকে না। আগেই বলা হয়েছে যে, নবাবী যুগের অভিজাতদের মধ্যে শ্রেণী বা গোষ্ঠী চেতনা দুর্বল ছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেতনা তাড়িত অভিজাতদের সামনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মতো কোনো উচ্চ আদর্শিক প্রেরণাও ছিল না। সে সময়কার অভিজাতদের কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণ করে কাউকে কাউকে দেশপ্রেমিক আবার কাউকে কাউকে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক অভিধায় আখ্যায়িত করা হয় বটে, কিন্তু অভিজাতদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিচারে এদের দেশপ্রেমিক বা জাতীয়তাবাদী বলার খুব একটা সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। কেননা দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ বা জাতীয় স্বার্থচেতনার মতো উচ্চ আর্দশিক চেতনাবোধ নবাবী বাংলার অভিজাতদের মধ্যে তখনো গড়ে ওঠেছিল বলে প্রতীয়মান হয় না। অবশ্য এ অবস্থা যে কেবল নবাবী বাংলার অভিজাতদের ছিল তা নয়, আঠারো শতকের বিশ্ব ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ইউরোপের ইংল্যান্ডসহ গুটিকয়েক দেশ ছাড়া আর কোথাও দেশপ্রেম জাতীয়তস্বার্থ এবং রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়নি। এমতপরিস্থিতিতে বাংলার মতো একটি সামন্ত রাষ্ট্রের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে দেশপ্রেম বা রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ প্রত্যাশা করার বেশি সুযোগ নেই।

নবাবী যুগের অভিজাতদের স্বার্থসিদ্ধি বিশেষ করে ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধি পূরণের মূল উৎস ছিলেন স্বয়ং নবাব। আর এজন্য অভিজাতবর্গ সবসময় নবাব এবং দরবারের সুদৃষ্টির মধ্যে থাকতে চেষ্টা করতেন। আর এ নিয়ে তাদের নিজের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব এমনকি সংঘাতের ঘটনাও বিরল ছিল না। অভিজাতদের রাজনীতি সক্রিয়তার পেছনেও তাদের স্বার্থসিদ্ধির চেতনাই মূল কারণ ছিল। সমকালে বাংলার প্রতিটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পেছনে অভিজাতদের ব্যক্তিস্বার্থলিপ্সা ও উচ্চবিলাসের বহিপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয় । নবাবের প্রতি অভিজাতদের আনুগত্য ও আস্থার প্রশ্নটিও তাদের ব্যক্তিগত লাভা-লাভের উপর নির্ভরশীল ছিল। একজন নবাব যতক্ষণ তাঁর অধীনস্থ অভিজাতদের তাদের চাহিদা মোতাবেক পর্যাপ্ত রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারতেন, ততক্ষণ তাঁর প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাতদের প্রশ্নাতীত আনুগত্য বহাল থাকাতো। কিন্তু এর অন্যথা হলেই ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ এমনকি নবাবকে উৎখাত করে স্বার্থনুকূল আরেকজনকে নবাব পদে অধিষ্ঠানের চেষ্টা করা হতো। পলাশি বিপ্লবসহ নবাবী যুগের ক্ষমতার পট পরিবর্তনের প্রতিটি ঘটনাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপরে বর্ণিত স্বার্থস্বর্বস্বতা নবাবী যুগের অভিজাত শ্রেণীর জন্য কোনো সুফল বয়ে আনেনি। অভিজাতদের ব্যক্তিস্বার্থ এবং সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি উচ্চ পদলাভের সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিল। এজন্য উচ্চপদ লাভ ও ক্ষমতাবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে অশুভ প্রতিযোগিতা ও হানাহানির ঘটনা ঘটতো। নবাব আলিবর্দী খানের শাসনামলে দীর্ঘস্থায় মারাঠা আক্রমণ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সংকটের কারণে অভিজাতদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও প্রতিযোগিতা মারাত্মকরূপ পরিগ্রহ করে। এর ফলে বাংলার রাজনৈতিক আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দেয় এবং তাঁর উত্তরসূরি নবাব সিরাজ-উদ- দৌলাহর সময় বাংলা প্রবল রাজনৈতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ সময়কার মুর্শিদাবাদের দরবার পরিস্থিতি ও অভিজাতদের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ কর্মকর্তা উইলিয়াম ওয়াটস লিখেছেন, নবাবের দরবারে কোনো ঐক্য নেই, সবাই নবাবের বিপক্ষে। তবে বিপক্ষবাদীরাও নিজেরা কেউ কারো পক্ষে নয়, সবাই যার যার স্বার্থ ছাড়া কোনো কথা বলে না। তাঁরা কাজ করছেন নবাবের সেবার জন্য নয়, বরং বিরক্তি ও বিবাদ সৃষ্টির জন্য। তারা একে অপরকে বিশ্বাস করে না এবং মনের কথা একজন আরেকজনকে বলে না। সব ধ্বংস হলেও নিজে যেন ধ্বংস না হয় সে চিন্তায় তারা মশগুল। ওয়াটসের মতে, সে সময় দরবারে কেউ তার নিজের অবস্থান সম্পর্কে নিরাপদ ছিলেন না।[8] সমকালীন অন্যান্য তথ্য উৎসের বিবরণীতেও ব্যক্তি স্বার্থ তাড়িত অভিজাতদের মধ্যে এরূপ অনৈক্য ও বিভেদের প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অনৈক্য ও বিভেদের বিষময় ফল যে, নবাবী রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টের কারণ হয়েছিল তা নয়, পরিণামে তা অভিজাত শ্রেণীরও ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। বস্তুত অভিজাত শ্রেণী ছিল নবাবী বাংলার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি অংশ। এজন্য রাষ্ট্রের সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে তাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। শুরুর দিকে অভিজাত শ্রেণী যথাযথ ভূমিকা পালন করলেও পরবর্তীতে তারা তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। মারাঠাদের উপর্যুপরি আক্রমণ ও ইউরোপের অগ্রগামী শক্তি ইংরেজদের বাণিজ্য মৃগয়ার ছত্রচ্ছায়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে নবাবী রাষ্ট্র যখন চরম দুর্দশাগ্রাস্থ, তখন অভিজাত শ্রেণী তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রকে রক্ষাও শক্তিশালী করে তোলার পরিবর্তে নিজেরাই তাঁর অবলুপ্তির প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় এবং ইংরেজদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে পলাশি বিপ্লবের মাধ্যম শুধু নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর বিনাশ সাধন নয়, নবাব সরকারের পতনকেও তরান্বিত করে।

বাংলার ইতিহাসে পলাশি একটি কাল বিভাজক চিহ্ন। পলাশির অনিবার্য প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় কেবল যে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহরই পতন ঘটেছিল এমন নয়, এর মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাবী শাসনেরও পতন ঘটে এবং সূচীত হয় ইঙ্গ-মুঘল যৌথ শাসন। পলাশির মধ্য দিয়ে নবাবী যুগের অভিজাত শ্রেণীরও ক্রমঅবক্ষয় ও পতন নিশ্চিত হয়। অনেকে মনে করেন নবাবী যুগের অভিজাত শ্রেণীর এ পতন প্রক্রিয়ায় তাদের নিজেদের মধ্যকার স্বার্থপ্রসূত সংঘাত ও

---

[8] William Watts *Memoirs*, p p. 37-38

Dhaka University Institutional Repository

হানাহানির ফল। এ বিষয়ে দ্বিমত না করেও বলা যায় যে, অভিজাতদের মধ্যকার এ আত্মহানাহানির পেছনে ইংরেজদের কূরিৎকৌশলের (diplomacy) স্বার্থক প্রয়োগ ও হস্তক্ষেপের ঘটনা বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তথ্যসূত্র বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পলাশি বিপ্লবের প্রাক্কালে ইংরেজ এবং মুর্শিদাবাদের অভিজাত চক্রের একটি বড় অংশের মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়া হয়েছিল। এ বুঝাপড়ার পেছনে যে উভয়পক্ষের স্বার্থ চিন্তা মূখ্য ছিল তা বলা বাহুল্য। বস্তুত নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাহর সিংহাসনচ্যুতির মধ্যে তাদের স্বার্থচেতনার সাফল্য নির্ভরশীল ছিল বলেই তাঁকে উৎখাতের প্রশ্নে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পলাশি-উত্তরকালে তাদের মধ্যকার এ ঐক্য অটুট থাকেনি। অবশ্য কেবল স্বার্থ তাড়িত আদর্শ বিবর্জিত ঐক্য অটুট থাকারও কথা নয়। ইংরেজদের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। পলাশি পরবর্তী সময়ে বাংলার আর্দশহীন ব্যক্তিগত স্বার্থান্ধ অভিজাতবর্গ যখন নিজেদের চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্নে পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাতে লিপ্ত, তখন পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ইংরেজরা ক্রমান্বয়ে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। কৌশলী ইংরেজ শক্তি বাংলায় তাদের রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রাধান্য বৃদ্ধির ছত্রছায়ায় অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিও সুপ্রতিষ্ঠা করে। আর এর মধ্য দিয়েই নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণীর অবক্ষয় ও পরিশেষে পতন তরান্বিত হয়। ইংরেজ শাসনাধীনে বাংলার নতুন সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়া নবাবী যুগের অভিজাত শ্রেণীর ধবংসস্তুপের উপর একটি নব্য অভিজাততন্ত্র বিকাশ লাভ করে।

নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণী কী বুঝতে পেরেছিল যে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহকে সিংহাসনচ্যুত করার মাধ্যমে ইংরেজরা মূলত বাংলায় রাজ্য কায়েমেরই প্রস্তুতি নিচ্ছে? নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, ইংরেজদের সাথে আঁতাতকারী অভিজাতদের কারো মনেই এই আশঙ্কা জাগে নি। সম্ভবত তাদের ভাবনায় ছিল এটি পূর্ববর্তী রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মতোই একটি সাধারণ ঘটনা। তারা মনে করেছিল যে, ইংরেজ সহায়তায় মীর জাফরকে ক্ষমতায় বসিয়ে ক্ষমতা দখলের সহায়ক শক্তি হিসেবে নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করবে। কিন্তু তারা ভাবতে পারেনি যে, পূর্বের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানসমূহ এবং পলাশির মধ্যে বিস্তর ফারক ছিল। সমকালীন ইউরোপীয় ও বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে বাংলার অভিজাতদের নিদারুণ অজ্ঞতাই তাদের এ ব্যর্থতার এর প্রধান কারণ। বস্তুত এ অজ্ঞতার কারণেই সাত সমুদ্রের ওপার থেকে আগত ইউরোপের ছোট্র দেশ ইংল্যান্ডের একটি বণিক প্রতিষ্ঠান এদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল বা রাজ্য স্থাপন করতে পারে এ চিন্তা অভিজাবর্গের মাথায়ই আসেনি। ফলে ইংরেজদের কূটকৌশলের জালে ধরা দিয়ে তারা শুধু নবাব সিরাজ উদ-দৌলাহরই পতন ঘটালো না, তাদের অজ্ঞতা ও অপরিণামদর্শীতায় নবাব সরকারের পতন এবং পরিশেষে তাদের নিজেদেরও ধবংস নিশ্চিত হলো।

পরিশেষে বলা যায় যে, নবাবী আমল বাংলার ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র ও চিত্তাকর্ষক অধ্যায়। বস্তুত এ সময় কেন্দ্রীয় মুঘল শক্তির অবক্ষয় ও দুর্বলতার সুযোগে নবাবদের অধীনে বাংলা প্রশাসনে কার্যত স্বাধীনতা অর্জিত হয়। একই সঙ্গে নবাব সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতি-পদক্ষেপের ফলে কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে বাংলায় কতিপয় নতুন সামাজিক শক্তির উত্থান ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় সমাজের উচ্চকোটিতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শ্রেণী সমন্বয় সাধিত হওয়ায় অভিজাত শ্রেণীর সংগঠন, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। অভিজাত শ্রেণীতে ভূ-স্বামী জমিদারদের প্রতিপত্তি অর্জন, ধনকুবের বণিক ব্যবসায়ীদের অভিজাত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

এবং অমাত্য অভিজাত্যে স্থানীয় বাঙ্গালি বিশেষ করে হিন্দুদের শক্তিশালী অবস্থান নিঃসন্দেহে নতুনত্ব ও স্বাতন্ত্রের প্রমাণ। শেষোক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মুঘল সুবাদারি যুগে বাধাগ্রস্থ বঙ্গীয় জাতিসত্ত্বার বিকাশক্রমের পুনঃসূচিত হয়। উল্লেখ্য যে, স্বাধীন সুলতানি আমলে বাঙ্গালি জাতিসত্ত্বার যে বিকাশধারা সূচিত হয়েছিল বাংলায় মুঘল সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা ব্যহত হয়। কিন্তু বাংলায় নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠা, উত্তর ভারতের মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে নবাব সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্র বাংলায় স্থানান্তর এবং তদুপরি উচ্চপদস্থ অমাত্যসহ অভিজাত শ্রেণীতে স্থানীয় বাঙ্গালিদের অন্তর্ভুক্তির মধ্যদিয়ে বাঙ্গালি জাতিসত্ত্বার বিকাশ তরান্বিত হয়। এটি নবাব সরকারের একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট। তবে দুর্ভাগ্য এই যে, বাঙ্গালি জাতির বিকাশধারা সুসংহত ও শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহের পূর্বেই বাংলা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের শিকার হয়। ফলে বাঙ্গালি জাতিসত্ত্বার স্বাভাবিক বিকাশক্রম আবারো বাধাগ্রস্থ হয়। বাঙ্গালি জাতির এ দুর্ভাগ্যের জন্য নবাবী যুগের স্বার্থান্ধ ও অপরিণামদর্শী অভিজাতদের দায়-দায়িত্ব কম নয়। বস্তুত নবাবী বাংলার অভিজাতদের ব্যক্তিস্বার্থ চেতনাবোধ, তাদের স্বার্থানুসন্ধানী ও ঐশ্বর্য লিপ্সু মনোভাব শুধু নবাব সরকার ও নবাবী রাষ্ট্রের ঐক্য বা সংহতি বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি, এর ফলে বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি হয়। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে নবাব সরকার যুগের অভিজাত শ্রেণীরও পতন ঘটে। ব্রিটিশ শাসনাধীনে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলায় আর একটি ভিন্ন গঠন ও বৈশিষ্টের নতুন অভিজাত শ্রেণীর উত্থান ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১

১.১ নবাব সরকার শাসিত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মানচিত্র (১৭৭৯ সালে রেনেল-এর অঙ্কিত মানচিত্র অনুসারে)

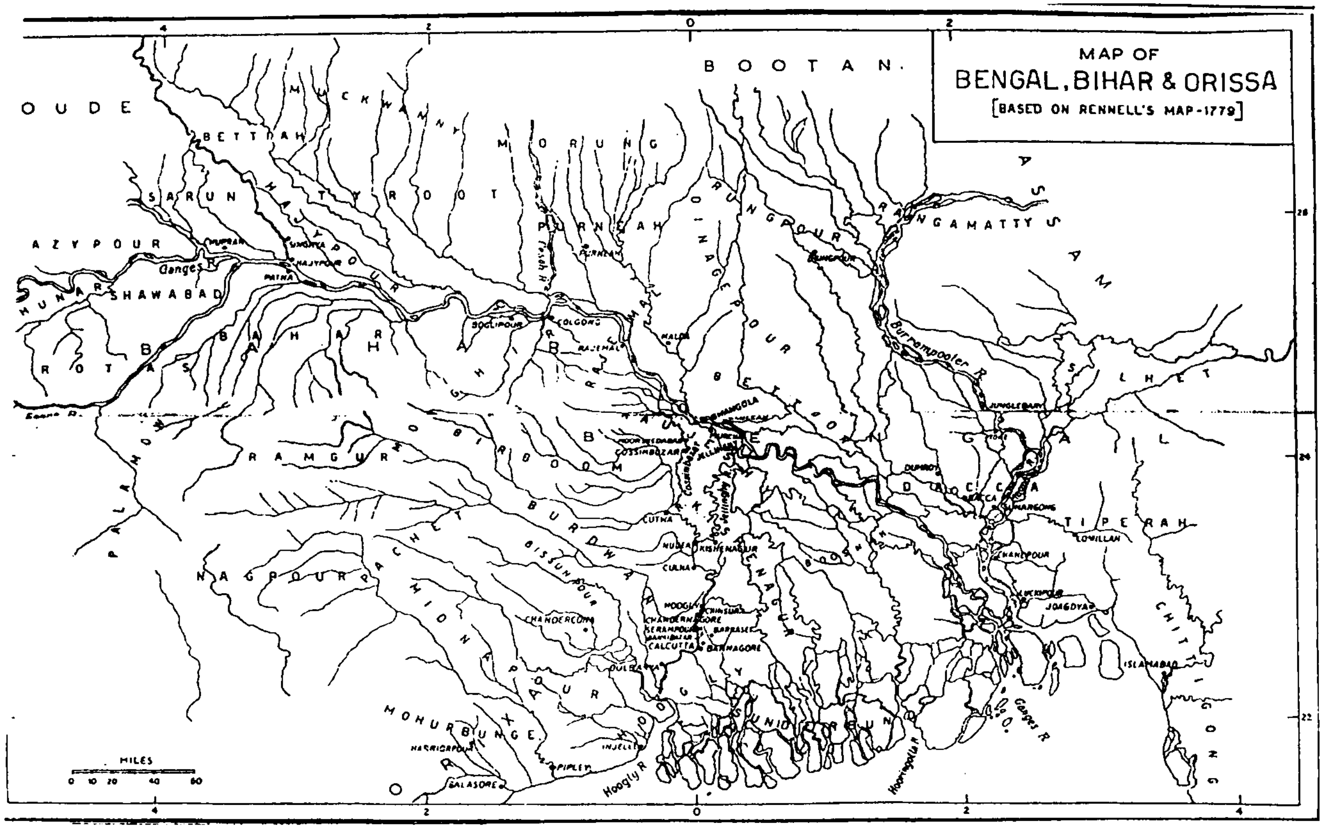

Source: Abdul Karim, *Murshikuli Khanand His Times*, Reprint, Jatiya Shahitya Prakash, Dhaka, 2011

১.২ নবাব সরকার যুগের মুর্শিদাবাদের মানচিত্র

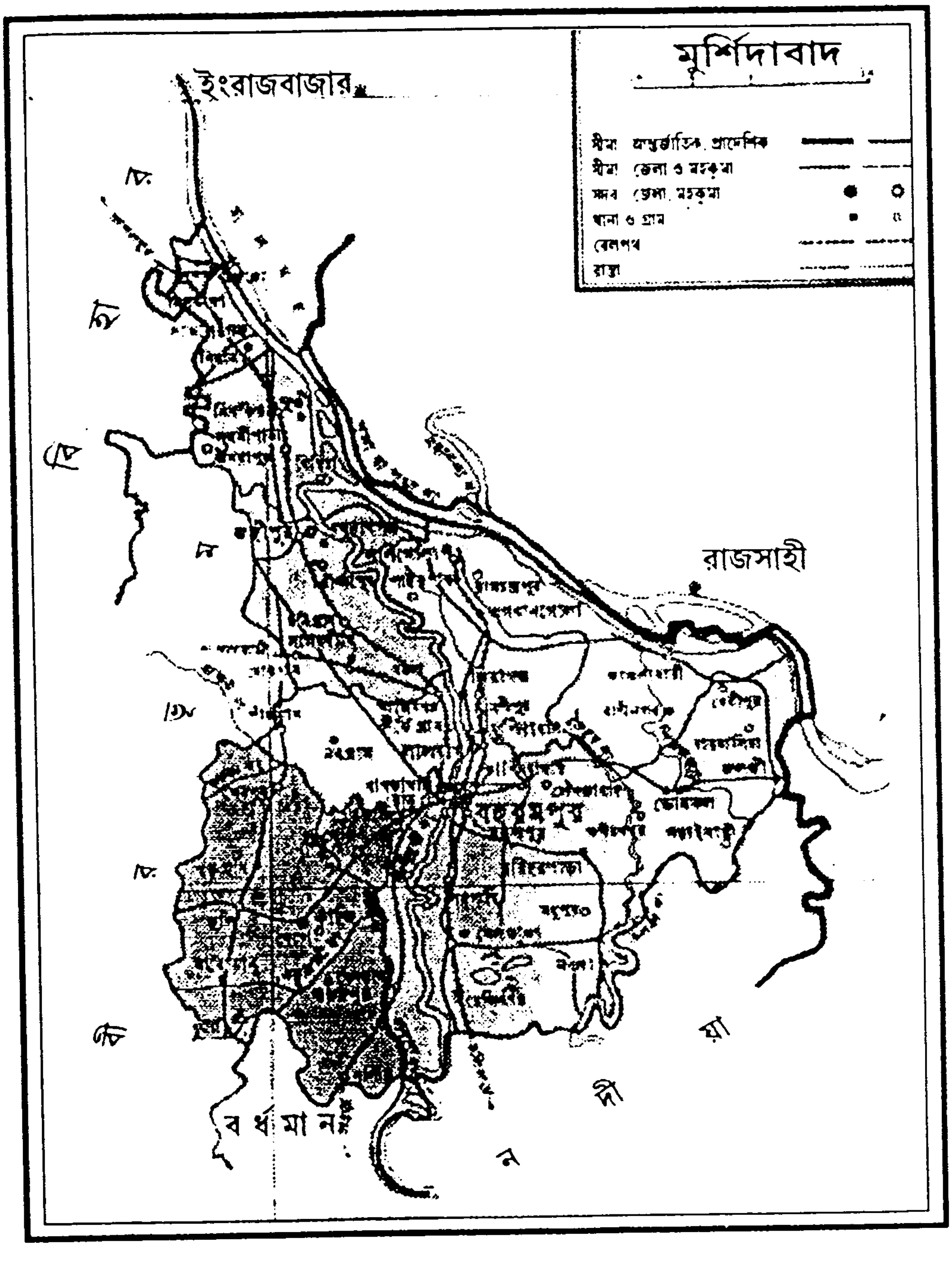

সূত্র: কমল চৌধুরী (সংকলন ও সম্পাদনা), *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, প্রথম পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৩

১.৩ কলকাতার মানচিত্র ১৭৫৬-১৭৫৭

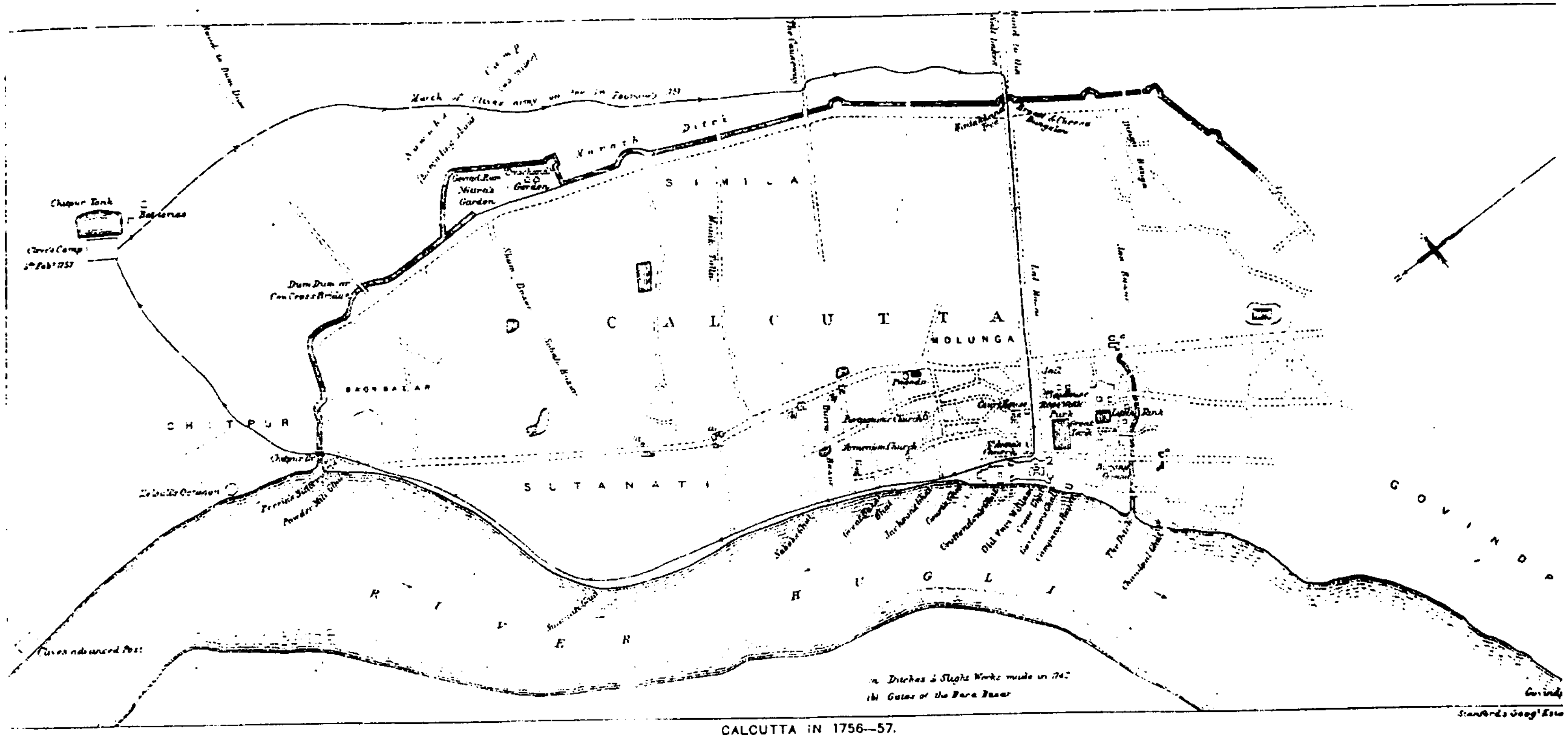

CALCUTTA IN 1756—57.

Source: Samuel Charles Hill (ed.), *Bengal in 1756-1757*, Vol. I, The University of California, USA, 1905

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ২

বাংলার নবাব ও কতিপয় অভিজাতের বংশ তালিকা

২.১ নবাব মুর্শিদকুলি খানের বংশ তালিকা

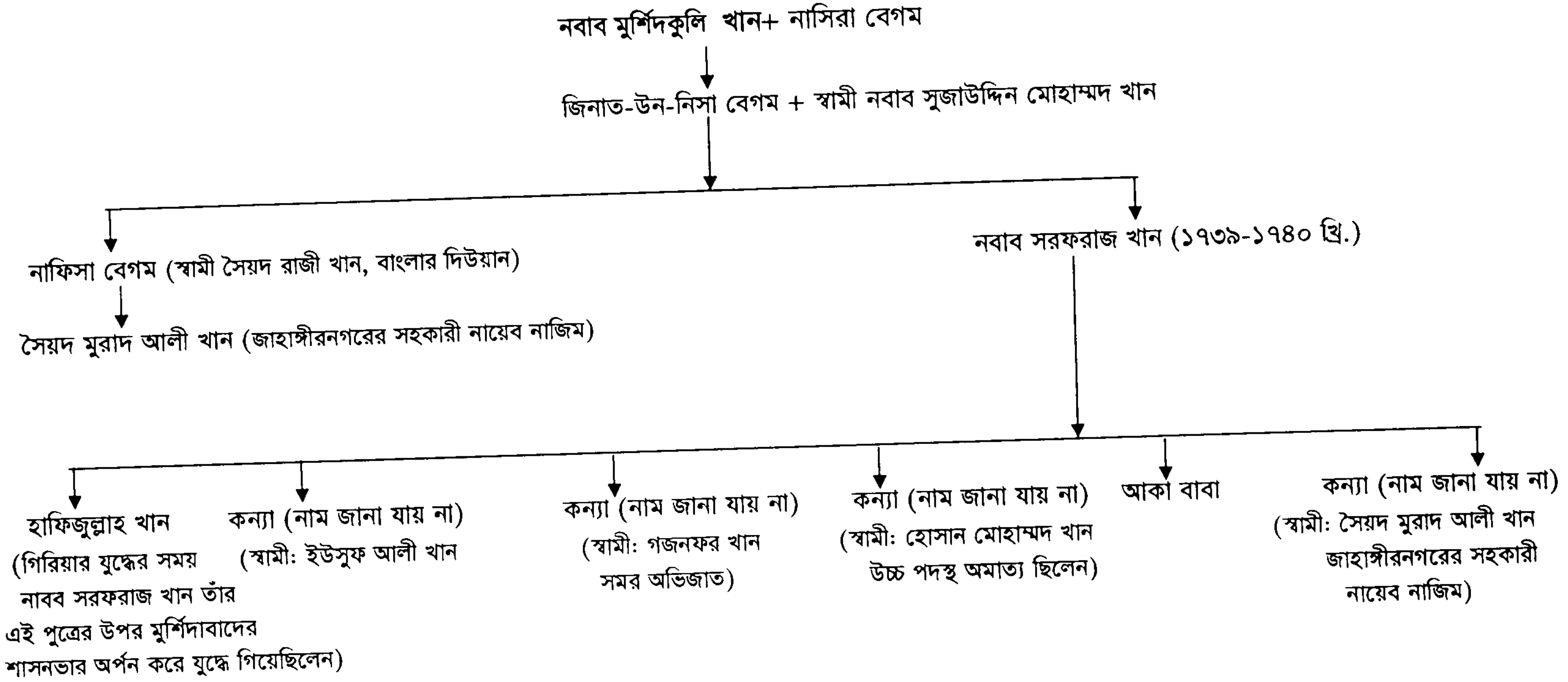

Dhaka University Institutional Repository

২.২ নবাব সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খানের (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.) বংশ তালিকা

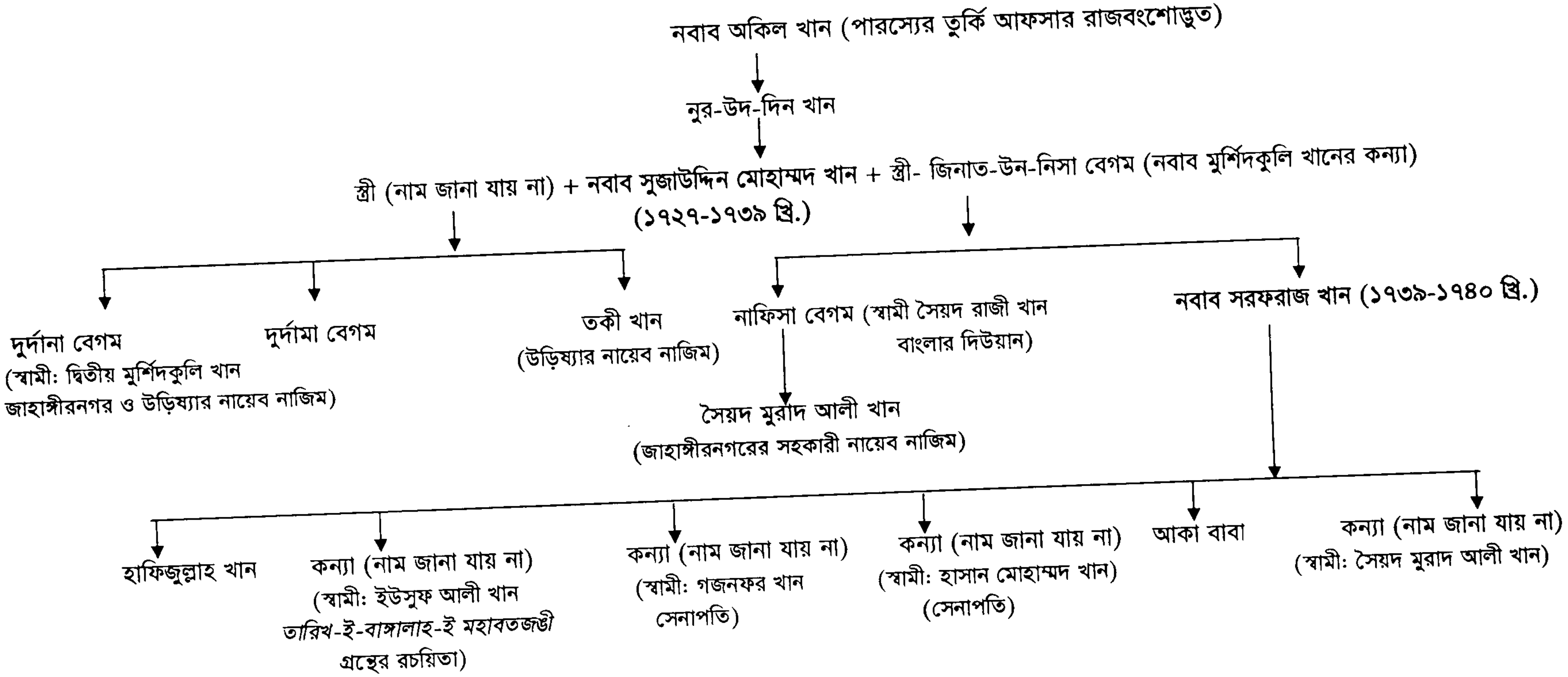

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ নবাব আলিবর্দী খানের বংশ তালিকা

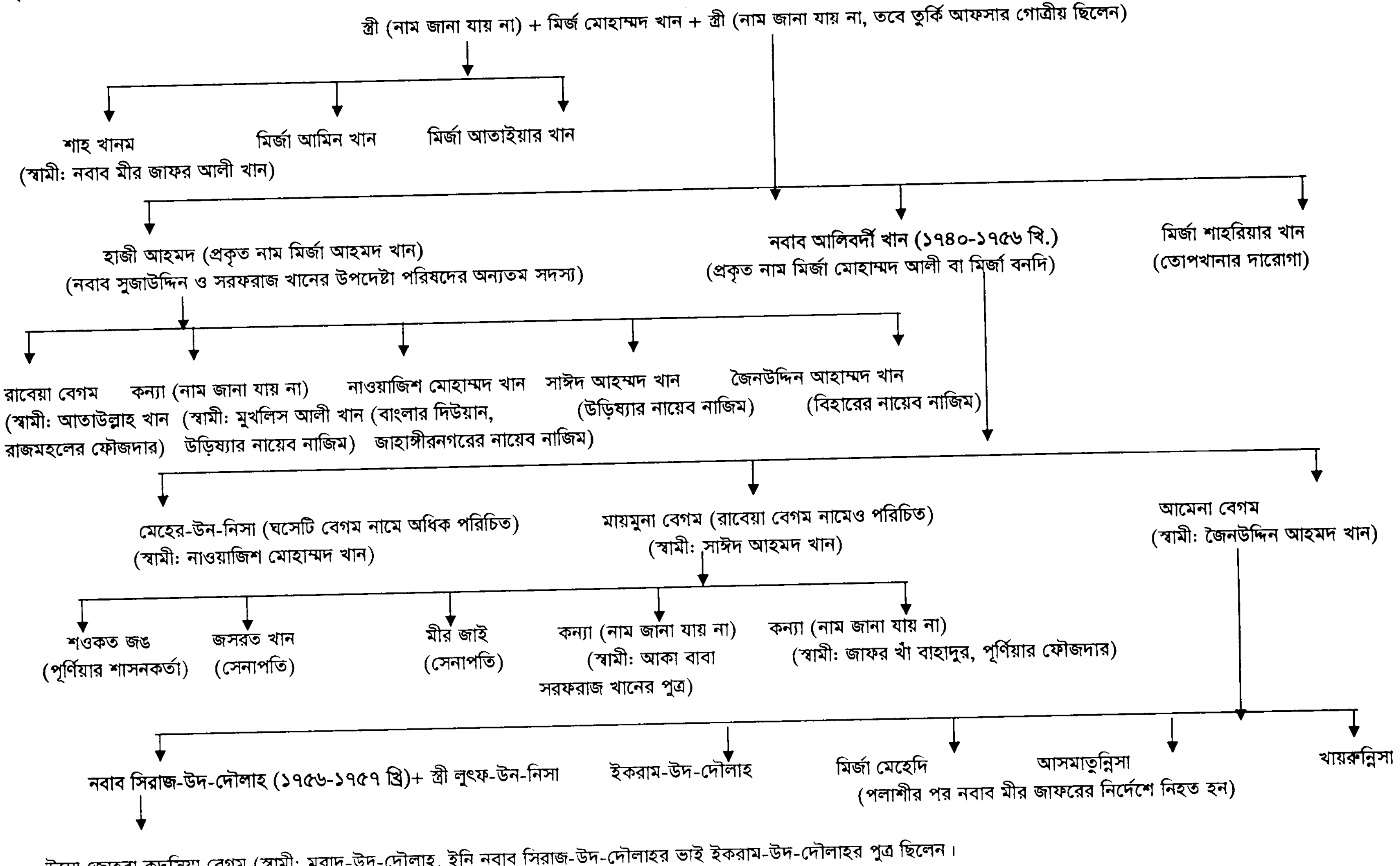

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ মীর জাফর আলী খানের (১৭৫৭- ১৭৬০, ১৭৬৩-১৭৬৫ খ্রি.) বংশ তালিকা

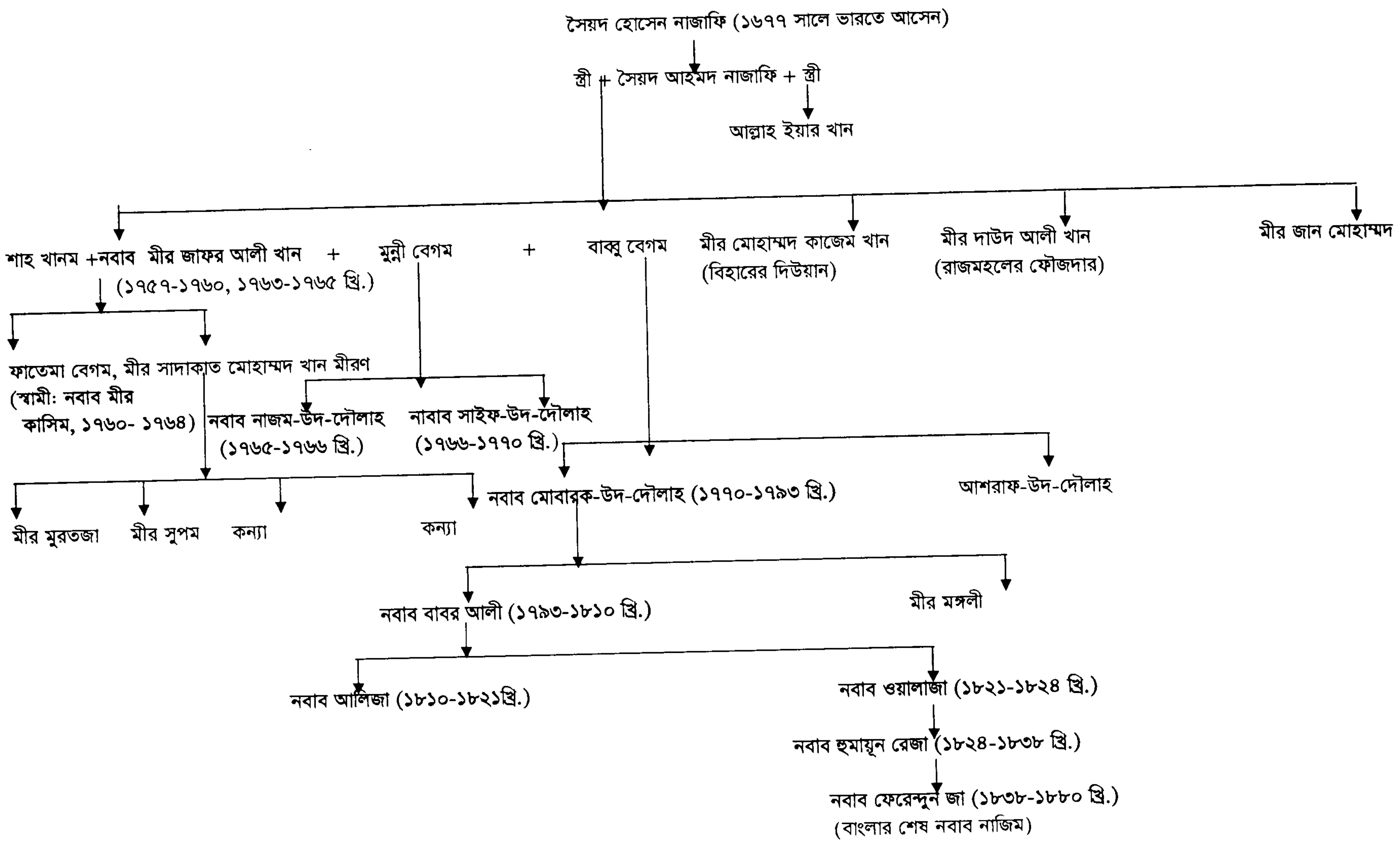

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৫

নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ টাকশালে অঙ্কিত দুটি মুদ্রার নমুনা। ধারণা করা হয় যে, এ মুদ্রা দুটি বণিক অভিজাত জগৎশেঠদের পরিচালনাধীন টাকশাল থেকে তৈরি করা হয়েছিল ।

সূত্র: এস এম রেজা আলী খান, *মুর্শিদাবাদ ও বাঙলার নাজিম*, পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮

পরিশিষ্ট ৩

মীর জাফর আলী খানের বংশ পরিচয় সংক্রান্ত একটি দলিল

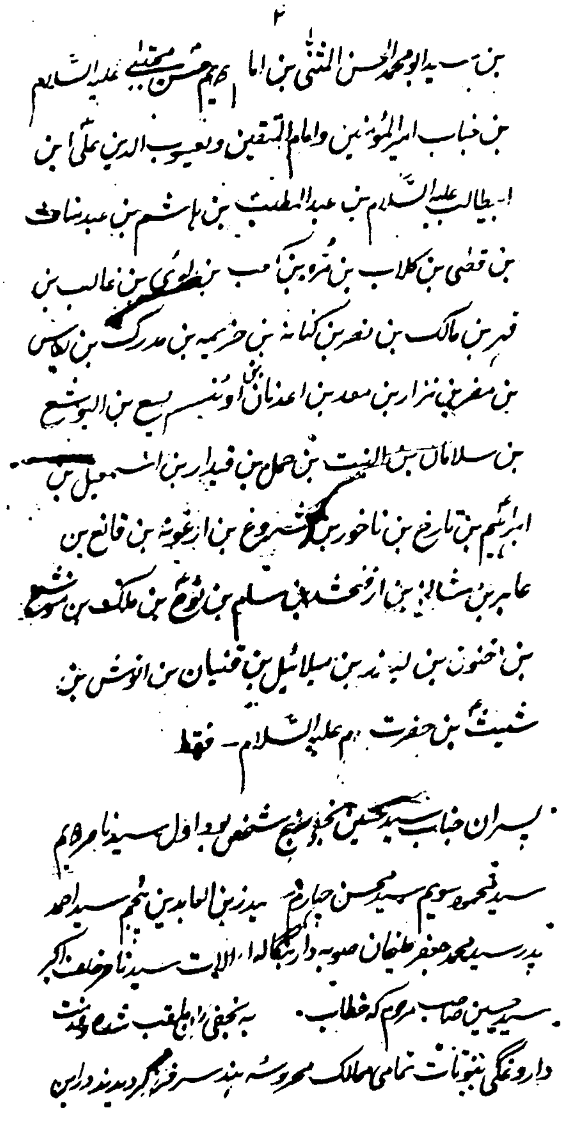
بن سید ابو محمد الحسن المثنی بن امام حسن مجتبی علیه السلام
بن جناب امیر المؤمنین و امام المتقین و یعسوب الدین علی بن
ابی طالب علیه السلام بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف
بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن
فهر بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس

মীরজাফরের বংশ পরিচিতির পরিচয় পত্র

সূত্র: এস এম রেজা আলী খান, *মুর্শিদাবাদ ও বাঙলার নাজিম*, পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮

পরিশিষ্ট ৪

বণিক অভিজাত ফতেহ্ চাঁদকে মুঘল সম্রাট মোহম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৯ খ্রি.) কর্তৃক প্রদত্ত বংশানুক্রমিক জগৎশেঠ উপাধির রাজকীয় দলিল

باسمه سبحانه و تعالی شانه

شاه محمد ناصر الدین
ابو الفتح بادشاه غازی

درین زمان نصرت قرین مسرت اقتران حکم جهان مطاع آفتاب
شعاع عز نفاذ می یابد که شیته فتح چند از پیشگاه خلافت ابد پیوند بعطا
خطاب جگت شیته و مرحمت خلعت فاخره و فیل و گوشواره مروارید
و آنند چند پسرش بخطاب شیته و موهبت خلعت و گوشواره مروارید
سرمایه اعتبار و افتخار اندوخته اند باید که حکام و عمال و متصدیان حال
و استقبال ممالک محروسه مشار الیه را جگت سیته فتح چند و پسرش
را شیته آنند چند می نوشته باشد درین باب از جناب حکمت مآب
تاکید دانند -

دوازدهم رجب سال چهارم از جلوس والا تحریر یافت -

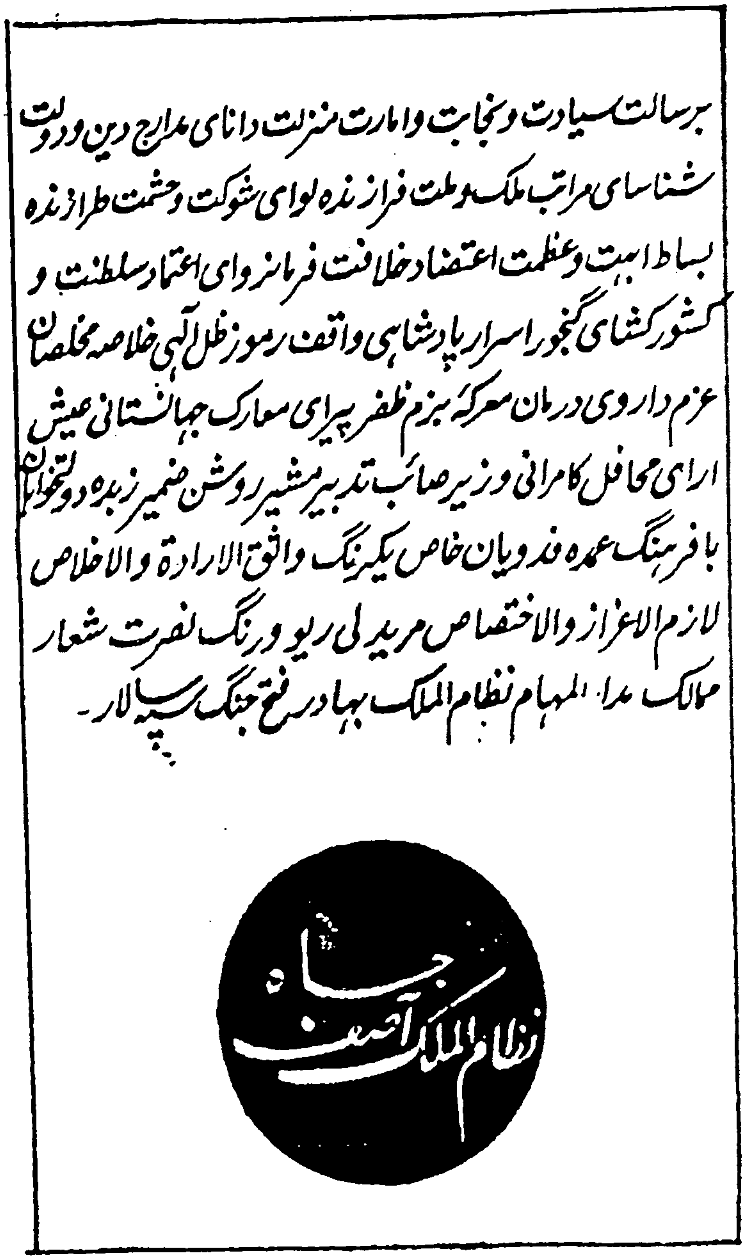
برسالت سیادت و نجابت و امارت منزلت دانای مدارج دین و دولت
شناسای مراتب ملک و ملت فرازنده لوای شوکت و حشمت طرازنده
بساط ابهت و عظمت اعتضاد خلافت فرمانروای اعتماد سلطنت و
کشورکشای گنجور اسرار پادشاهی واقف رموز ظل الهی خلاصه مخلصان
عزم داروی درمان معرکه بزم ظفر پیرای معارک جهانستانی عیش
آرای محافل کامرانی وزیر صائب تدبیر مشیر روشن ضمیر زبده دولتخواهان
با فرهنگ عمده فدویان خاص یکرنگ واثق الارادة والاخلاص
لازم الاعزاز والاختصاص مرید لی ریو ورنگ نصرت شعار
ممالک مدار المهام نظام الملک بهادر فتح جنگ سپه سالار۔

সূত্র: কমল চৌধুরী (সংকলন ও সম্পাদনা), *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, প্রথম পর্ব, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ.পৃ. ৬৭১-৬৭২

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৬

৬.০ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে স্বাক্ষরিত আলীনগরের সন্ধি। এই সন্ধিতে নবাব ছাড়াও ইংরেজদে দাবি মোতাবেক অমাত্য অভিজাত মীর জাফর আলী খান এবং রাজা রায়দুর্লভও স্বাক্ষর করেছিলেন। সাক্ষী ছিলেন অপর দুজন অমাত্য অভিজাত লক্ষ্মীনারয়ণ কানুনগো ও মহেন্দ্র নারয়ণ কানুনগো।

Treadty and Agreements with Serajah Dowla, dated Feb. 9, 1757. A.H. 1170.

Monsoor ul Mulck Serajah Dowla Shah Kuly Khan Behauder, Hybut Jung. Servant of King Aalum Geer the Invincible.

Article I.

That the Company be not molested upon account of such privileges as have been granted them by the King's Firmaund and Husbulhookums, and the Firmaund and Husbulhookums in full force.

That the thirty-eight Villages, which were given to the Company by the Firmaund, but datained from them by the Soubah, be likewise allowed them, nor let any impediment or restriction be put upon the Zemindars.

Article II.

That all goods belonging to the English Company, and having their Dustuck, do pass freely by land or water, in Bengal, Bahar, and Orissa. without paying any duties or fees of any kind whatsoever; and that the Zemindars, Chokeydars, Guzerbauns, &c. offer them no kind of molestation upon this account.

Article III.

That restitution be made the Company of their Factories and Settlements at Calcutta, Cossimbuzar, Dacca, &c. which have been taken from them.

That all money and effects, taken from the English Company, their factors and dependents, at the several Settlements and Aurungs, be restored in the same condition: that an equivalent, in money, be given for such goods as are damaged, plundered, or lost, which shall be left to the Nabob's justice to determine.

Article IV.

That the Company be allowed to fortify Calcutta, in such manner as they shall esteem proper for their defence, without any hindrance or obstruction.

Dhaka University Institutional Repository

Article V.

That siccas be coined at Allenagur (Culcutta) in the same manner as at Moorshedabad, and that the money, struck in Calcutta, be of equal weight and fineness with that of Moorshedabad. There shall be no demand made for a deduction of Batta.

Article VI.

That these proposals be ratified in the strongest manner, in the presence of God and his Prophet, and signed and sealed to by the Nabob, and some of his principal people.

Article VII.

And Admiral Charles Watson and Col. Clive promise, in behalf of the English Nation, and of the English company, that from henceforth all hostilities shall cease, in Bengal; and the English will always remain in peace and freindship with the Nabob, as long as these articles are kept in force, and remain unviolated.

Aaz ul Mulck Morad ul Dowla
Nowazish Ally Khan Behauder, Zahooar Jung,
a Servant of King Aalum Geer the Invincible.

Meer Jaffier Khan Behauder,
a Servant of King Aalum Geer
the Invincible.

Rajah Doolubram Behauder,
a Servant of King Aalum Geer
the Invincible.

Witness,
Lucki Narain Canongo

Witness,
Mohindra Narain Canongo

Source: Charles Stewart, *History of Bengal,* Council of education, Calcutta, 1847, Appendix III

পরিশিষ্ট ৭

৭.১ রাজকীয় উপাধিসহ্ বাংলার নবাবদের নামের তালিকা

Sl. No	Name	Title	Period
1.	Nawab Murshidkuli khan	*Mutamin-ul- Mulk, Alauddawla, Nasir Jang Nasiri*	1716-1727 A.D.
2.	Nawab Shujauddin Muhammad khan	*Mutamin-ul- Mulk, Sujauddawla, Asad Jang*	1727-1739 A.D.
3.	Nawab Sharfaraj khan	*Mutamin-ul- Mulk, Alauddawla Hayder jang*	1739-1740 A.D.
4.	Nawab Alvardi Khan	*Shuja-ul-Mulk, Hashemuddawla, Mahabat Jang*	1740-1756 A.D.
5.	Nawab Siraj-ud-Dawllah	*Mansur-ul-Mulk, Siraj-ud-Dawllah, Hybat Jang*	1756-1757 A.D.
6.	Nawab Meer Jafar Ali Khan	*Shuja-ul-Mulk, Hashemuddawla, Mahabat Jang*	17570-1760 & 1763-1765 A.D.
7.	Nawab Meer Kasem Ali khan	*Nasir-ul-Mulk, Emtazuddawla, Ali Jah, Nasrut Jang*	1760-1763 A.D.
8.	Nawab Najm-ud-Dawla	*Shuja-ul-Mulk, Najmuddawla, Mahabat Jang*	1765-1766 A.D.
9.	Nawab Syefuddawla	*Syefu-ul-Mulk, Sujauddawla, Shahmat Jang*	1766-1770 A.D.
10.	Nawab Mubarakuddawla	*Mutamin-ul- Mulk, Mubarakuddawla, Feroz Jang*	1770-1793 A. D.
11.	Nawab Babar ali	*Nasir-ul-Mulk, Azuddawla, Delar Jang*	1793-1810 A. D
12.	A Nawab Ali Jah	*Shuja-ul-Mulk, Mubarakuddawla, Ali Jah, Feroz Jang*	1810-1821 A.D.
13.	Nawab Wala Jah	*Barean-ul-Mulk, Ihtishamuddawla, Wal Jah, Mahabat Jang*	1821-1826 A.D.
14.	Nawab Humyun Jah	*Shuja-ul-Mulk, Ihtishamuddawla,Humyun Jah, Feroz Jang*	1824-1838 A.D.
15.	Nawab Feredun Jah	*Muntazim-ul-Mulk, Mohsenuddawla, Feredun Jah, Nasrut Jang*	1838-1884A. D.

৭.২ কয়েকজন অভিজাত ও তাদের রাজকীয় উপাধি

Sl. No	Name	Position	Title
1.	Nawazish Muhammad Khan	Naib Nazim	*Ihtishmuddawla, Shahmat Jang*
2.	Saieed ahmed Khan	Naib Nazim	*Mahmuddawl, Shawlat Jang*
3.	Zainuddin Ahmed Khan	Naib Nazim	*Ihtiramuddawl, Hybat Jang*
4.	Mirza Lutfullah	Naib Nazim	*Murshidkuli khan, Rustam Jang*
5.	Ikram -ud- Dawla		*Badshaquli Khan*
6.	Ataullah khan	Fawjdar	*IjajuddawlBahadur, Sabit jang*
7.	Alam Chand	Diwan	*Rai rian*
8.	Chin Roy	Diwan	*Rai rian*
9.	Biru Datta	Diwan	*Rai rian*
10.	Umid Roy	Diwan	*Rai rian*
11.	Janaki ram	Diwan	*Rai rian*
12.	Mir Sadakat Muhammad Miron	Naib Nazim	*Shahmat Jang*
13.	Manik Chand	Commercial elite	*Nagar Seth*
14.	Fathe Chand	Commercial elite	*Jagat Seth*
15.	Mahathab Chand	Commercial elite	*Jagat Seth*
16.	Shawrup chand	Commercial elite	*Maharaja*
17.	Kwaja Wazid	Commercial elite	*Fakr-ut-tizar*
18.	Krishna Chandra	Landed Aristocrat	*Maharaja, Dharmomongal*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৮

নবাবী যুগে বাংলার অভিজাতবর্গ

নবাবী যুগের অভিজাতবর্গের পূর্ণাঙ্গ তালিকা এ যাবত রচিত কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় পর্যালোচনাধীন গবেষণায় বিভিন্ন তথ্য-উৎস থেকে প্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন বিবরণীর আলোকে তদানীন্তন অভিজাতবর্গের একটি তালিকা প্রণয়ণ করা হলো। তবে এ তালিকাকে পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ বলে দাবি করা অবকাশ নেই।

১.১ অমাত্য অভিজাতবর্গ (সামরিক ও বেসামরিক)

নাম	পদবি, কর্মস্থল ও কর্মসময়
সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খান	সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খান (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.) ছিলেন বাংলার দ্বিতীয় নবাব। তবে নবাব হওয়ার আগে তিনি উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদসহ নবাব সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত ছিলেন।।
সরফরাজ খান	মীর্জা আসাদুল্লাহ সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০ খ্রি.) ছিলেন বাংলার তৃতীয় নবাব। এর পূর্বে তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খান ও নবাব সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খানের সময় বাংলার দিউয়ান এবং জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম পদসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন।
আলিবর্দী খান	বাংলার নবাবদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় রাজত্ব (১৭৪০১৭৫৬খ্রি.) করেছেন আলিবর্দী খান। আলিবর্দী খানের প্রকৃত নাম মির্জা মোহাম্মদ আলী বা মির্জা বন্দী। নবাবী প্রশাসনে নিম্ন পদস্থ একজন কর্মচারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে আলিবর্দী খান নবাব সুজাউদ্দিনের আমলে রাজমহলের ফৌজদার, বিহারের নায়েব নাজিমসহ বিভিন্ন প্রাশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৭৪০ সালে গিরিয়া যুদ্ধে নবাব সরফরাজ খানকে পরাজিত করে মসনদ দখল করেছিলেন।
হাজী আহমদ	নবাব আলিবর্দী খানের বড় ভাই ছিলেন হাজী আহমদ। উড়িষ্যা প্রশাসনে নিম্ন পদাধিকারী একজন কর্মচারী হিসেবে কাজ শুরু করে নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময় তিনি নবাবের তিন সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। সরফরাজ খানের আমলেও তিনি একই পদে বহাল ছিলেন। আলিবর্দী খান নবাব হওয়ার পর তাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।
নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান	নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান নবাব সুজাউদ্দিন খানের শাসনামলে অল্প সময় নবাব সরকারের বখশি পদ লাভ করেছিলেন। নবাব আলিবর্দী খান তাঁকে প্রথমে বাংলার দিউয়ান এবং পরে জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম পদে নিয়োগ দেন।
সাঈদ আহমদ খান	সাঈদ আহমদ খান নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময় হুগলি ও রংপুরের ফৌজদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নবাব আলিবর্দী খানের সময় তাঁকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে নিয়োগ করা হয়। পরে পুর্নিয়ার শাসনকর্তার পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।
জৈনউদ্দিন আহমদ খান	জৈনউদ্দিন আহমদ খান ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর পিতা। নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময় তিনি রাজমহলের ফৌজদার এবং নবাব আলিবর্দী খানের সময় বিহারের নায়েব নাজিম ছিলেন।
তকী খান	তকী খান নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় বালাশোরের ফৌজদার ছিলেন। নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময় তিনি উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হয়েছিলেন।
সিরাজ-উদ-দৌলাহ	বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হিসেবে খ্যাত। নবাব আলিবর্দী খানের সময় প্রথমে জাহাঙ্গীরনগরের নাওয়ারা বিভাগের প্রধান এবং পরে বিহারের নায়েব নাজিম নিয়োগ করা হয়। ১৭৫৬ সালে বাংলার নবাব হন এবং ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজত্বে অবসান ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান	প্রকৃত নাম মির্জা লুৎফুল্লাহ। নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় তিনি জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম ছিলেন এবং পরে নবাব সুজাউদ্দিন খান তাঁকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হিসেবে বদলি করেন। নবাব আলিবর্দী খানের সময় তাঁকে পদচ্যুত করা হয়।
মীর জাফর আলী খান	নবাব আলিবর্দী খানের সময় মীর জাফর আলী খান হিজলী ও মেদিনীপুরের ফৌজদারের পদসহ উড়িষ্যার নায়েব নাজিম এবং পরে পুরাতন সেনাবাহিনীর বখশি ছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময়ও তিনি শেষোক্ত পদে বহাল ছিলেন। পলাশী যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলাহর পতন ঘটিয়ে বাংলার মসনদ দখল করেন এবং ১৭৫৭-১৭৬০ এবং ১৭৬৩-১৭৬৫ সাল পর্যন্ত নবাব ছিলেন।
মওন্দী আলী খান	নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় মাওন্দী আলী খান জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম ছিলেন।
ইতিসাম খান	ইতিসাম খান নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম ছিলেন।
মোখলিস আলী খান	নবাব আলিবর্দী খানের সময়কার উড়িষ্যার নায়েব নাজিম।
শেখ মুহাম্মদ মাসুম খান	নবাব আলিবর্দী খান কর্তৃক নিযুক্ত উড়িষ্যার নায়েব নাজিম।
আবদুর রসুল খান	আবদুর রসুল খান ছিলেন আলিবর্দী খান কর্তৃক নিযুক্ত উড়িষ্যার নায়েব নাজিম।
রাজা দুর্লভরাম	রাজা দুর্লভরাম সাধারণ্যে রাজা রায়দুর্লভ নামেই অধিক পরিচিত। আলিবর্দী খানের সময় তিনি প্রথমে উড়িষ্যার নায়েব নাজিমের পেশকার ছিলেন। পরে তাঁকে রাজা উপাধিসহ সেখানকার নায়েব নাজিম করা হয়। তিনি বাংলার দিউয়ান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
শেখ আবদুস সোবহান	শেখ আবদুস সোবহান নবাব আলিবর্দী খানের সময় উড়িষ্যার নায়েব নাজিম ছিলেন।
মীর হাবিব	মীর হাবিব জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের সহকারী ছিলেন। পরে তিনি উড়িষ্যার নায়েব নাজিমের সহকারী এবং সেখানকার দিউয়ান পদে নিযুক্ত লাভ করেন। ১৭৫১-১৭৫২ সালে তিনি উড়িষ্যার নায়েব নাজিম ছিলেন।
মুসলেহ উদ্দিন মুহাম্মদ খান	মুসলেহ উদ্দিন মুহাম্মদ খান ছিলেন উড়িষ্যার নায়েব নাজিম।
রাজা জানকীরাম	রাজা জানকীরাম নবাব আলিবর্দী খানের সময় বিহারের দিউয়ান ও নায়েব নাজিম ছিলেন।
রাজা রামনারায়ণ	রাজা রামনারায়ণ ছিলেন বিহারের নায়েব নাজিম। নবাব আলিবর্দী খানের সময় তিনি এ পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং ১৭৫৯ সালে পদচ্যুত হন।।
সৈয়দ আকরাম খান	সৈয়দ আকরাম খান নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় বাংলার দিউয়ান ছিলেন।
সৈয়দ রাজী খান	সৈয়দ রাজী খান ছিলেন বাংলার দিউয়ান। ১৭১৭ সালে তিনি এ পদ লাভ করেছিলেন।
আলমচাঁদ	নবাব সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খানের সময় 'রায় রায়ন' উপাধিসহ নবাব সরকারের দিউয়ান পদে নিয়োগ লাভ করেন। নবাব সুজাউদ্দিন খান ও নবাব সরফরাজ খানের সময় তিনি নবাবের উপদেষ্টা কাউন্সিলেরও অন্যতম সদস্য ছিলেন।
রাজা মোহনলাল	নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহার সময় নবাব সরকারের দিউয়ান ছিলেন।
চিনরায়	চিনরায় প্রথমে বাংলার খালিসা রাজস্ব বিভাগের সহকারী দিউয়ান ছিলেন। আলিবর্দী খান তাঁকে দিউয়ান পদে নিয়োগ দানসহ 'রায় রায়ান' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।
বীরুদত্ত	নবাব আলিবর্দী খানের সময় তাঁকে রায় রায়ান উপাধিসহ দিউয়ান পদে নিযুক্ত করা হয়।
কিরাত চাঁদ	কিরাত চাঁদ প্রথমে বিহারের দিউয়ান এবং পরে আলিবর্দী খানের সময় নবাব সরকারের দিউয়ান পদ লাভ করেন।
উমিদ রায়	উমিদ রায় প্রথমে দিউয়ানি দপ্তরের পেশকার ছিলেন। নবাব আলিবর্দী খান তাঁকে দিউয়ানি পদে নিয়োগ দানসহ রায় রায়ান উপাধি প্রদান করেন।
জানকী রায়	জানকী রায় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় বাংলার দিউয়ান ছিলেন।
যশোবন্ত রায়	নবাব সুজাউদ্দিন খান যশোবন্ত রায়কে জাহাঙ্গীরনগরের দিউয়ান নিয়োগ করেছিলেন।
মীর মোহাম্মদ কাজিম খান	মীর মোহাম্মদ কাজিম খান নবাব আলিবর্দী খান কর্তৃক বিহারের দিউয়ান নিযুক্ত নবাব মীর জাফর আলী খানেরও সময়ও তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।
চিন্তামন দাস	নবাব আলিবর্দী খানের সময় চিন্তামন দাস বিহারের দিউয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মরদান আলী খান	মরদান আলী খান নবাব সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খানের সময় নবাব সরকারের বখশি ছিলেন।
কাবিজ আলী খান	আলিবর্দী খানের সময় কাবিজ আলী খান নবাব সরকারের কেন্দ্রীয় বখশি ছিলেন।
খাজা আবদুল হাদী খান	আলিবর্দী খান ও নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় কেন্দ্রীয় বখশি ছিলেন।
ফয়াজ আলী খান খোরাসানী	ফয়াজ আলী খান খোরাসানী নবাব আলিবর্দী খানের সময় কিছু সময় সরকারের কেন্দ্রীয় বখশি ছিলেন।
কাসেম আলী খান	আলিবর্দী খানের সময় রংপুরের ফৌজদার এবং পুরাতন সেনা বাহিনীর বখশি ছিলেন।
মীর মদন	নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময়কার বখশি ছিলেন।
দর্পনারায়ণ	মুর্শিদকুলি খানের সময় সদর কানুনগো ও খালিসার পেশকার ছিলেন।
জয়নারায়ণ	প্রথমে সদর কানুনগো দর্পনারায়ণের সহকারী ছিলেন এবং পরে তিনি সদর কানুনগো হন।
শিবনারায়ণ	শিবনারয়ণ নবাব মুর্শিদকুলি খানে সময় সদর কানুনগো ছিলেন।
লক্ষ্মীনারায়ণ	লক্ষ্মীনারায়ণ সদর কানুনগো ছিলেন।
মহেন্দ্রে নারায়ণ	মহেন্দ্রে নারায়ণ সদর কানুনগো ছিলেন।
রঘুনন্দ	রঘুনন্দ ছিলেন নাটোর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। নবাব সরকারের দিউয়ানি দপ্তরে সহকারী কানুনগো পদসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন শেষে টাকশালের দারোগার পদ লাভ করেছিলেন।
ভূপত রায়	নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় দিউয়ানি দপ্তরের খালিসা বিভাগের পেশকার ছিলেন
কৃষ্ণরায়	নবাব মুর্শিদকুলি খানের ব্যক্তিগত একান্ত সচিব ছিলেন।
মদুদ আলী খান	নবাব আলিবর্দী খানের সময় সেনা বাহিনীর প্রথম বখশি ছিলেন।
গালিব আলী খান	গালিব আলী খান নবাব সুজাউদ্দিনের সময় জাহাঙ্গীরনগরের সহকারী নায়েব নজিম ছিলেন।
মুরাদ আলী খান	মুরাদ আলী খান প্রথমে জাহাঙ্গীরনগরের নাওয়ারা বিভাগের প্রধান এবং পরে একই স্থানের নায়েব নাজিমের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
আগা বাকের ইস্পাহানী	আগা বাকের নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময় উড়িষ্যার সহকারী নায়েব নাজিম ছিলেন।
রাজা রাজবল্লভ	রাজা রাজবল্লভ জাহাঙ্গীরনগরের নাওয়ারা বিভাগের মুহুরি, পেশকার, সহকারী দিউয়ান ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি 'মহারাজা' খেতাবে ভূষিত হন এবং বুজুর্গ-উমেদপুরের জমিদারি স্বত্ব ধারণপূর্বক 'রাজনগর এস্টেট' প্রতিষ্ঠা করেন।
হাজি লুৎফে আলী	নবাব সরফরাজ আলী খানের প্রশাসনে উচ্চ অমাত্য। তবে তাঁর পদবি কী ছিল জানা যায় না।
আগা বাকের	আগা বাকের চট্টগ্রামের ফৌজদার ছিলেন। অনেকেই মনে করেন এই ব্যক্তি এবং বিখ্যাত বুজুর্গ উমেদপুরের জমিদার আগা বাকের একই ব্যক্তি ছিলেন।
আতাউল্লাহ খান	আতাউল্লাহ খান নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময় রাজমহলের এবং আলিবর্দী খানের শাসনামলে ভাগলপুরের ফৌজদার ছিলেন।
আবদুল করিম	আবদুল করিম নায়েব নাজিম আলিবর্দী খানের অধীনে বিহারের সেনাপধান ছিলেন।
মীর মুর্তজা	সরফরাজ খানের প্রিয়ভাজন উচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। সিয়ারের তথ্য মতে নবাব সরফরাজ খান তাঁকে বাংলার দিউয়ান পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন।।
মর্দান আলী খান	সরফরাজ খানের প্রিয়ভাজন উচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তবে তাঁর পদবি কী ছিল জানা যায় না।
সৈয়দ মুহাম্মদ হোসেন খান	সরফরাজ খানের সময়কার উচ্চ পদাধিকারী অমাত্য। তবে পদবি জানা যায় না।
গওস খান	সরফরাজ খানের অনুগত একজন বিশিষ্ট সমর অভিজাত। গিরিয়ার যুদ্ধে নিহত হন।
গজনফর হোসেন খান	নবাব সরফরাজ খানের জামাতা। তিনি নবাবী বাহিনীর একজন সেনাপতি ছিলেন।
সৈয়দ হেদায়েত আলী খান	সৈয়দ হেদায়েত আলী খান নবাব আলিবর্দী খানের অধীনে সেরস ও কুতুম্বা পরগণার প্রশাসক এবং পরে বিহারের সহকারী নায়েব নাজিম ও বখশির দায়িত্ব পালন করেন।
গোলাম আলী খান	একজন সমর অভিজাত। নবাব আলিবর্দী খানের সময় সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন।
হোসেনকুলি খান	হোসেনকুলি খান ছিলেন জাহাঙ্গীরনগরের সহকারী নায়েব নাজিম।
রায় গোকুলচন্দ্র	নবাব আলিবর্দী খানের সময় রায় গোকুলচন্দ্র ছিলেন জাহাঙ্গীর নগরের দিউয়ান।

নুরুল্লাহ বেগ খান	আলিবর্দী খানের সময় নুরুল্লাহ বেগ খান নতুন সেনাবাহিনীর বখশি ছিলেন।
মীর নজর আলী খান	তিনি হায়দর আলী খান নামেই অধিক পরিচিত মীর নজর আলী খান নবাব আলিবর্দী খানের সময় রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন।
মুস্তফা খান	মুস্তফা খান আফগান বংশোদ্ভুত একজন সামরিক অভিজাত। নবাব আলিবর্দী খানের সময় কাঙ্খিত উচ্চরাজ পদ না পেয়ে তিনি তাঁর অনুগত আফগান সেনাদের নিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।
ফকিরুল্লাহ বেগ	ফকিরুল্লাহ বেগ নবাব আলিবর্দী খানের সময় সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় বখশি ছিলেন।
গোলাম হেসেন খান	গোলাম হেসেন খান নবাব আলিবর্দী খানের প্রাসাদ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন।
কাসেম বেগ	কাসেম বেগ নবাব আলিবর্দী খানের সময় গোলন্দাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন।
গোজর খান	নবাব আলিবর্দী খানের সময় গোজর খান উড়িষ্যায় সেনাবহিনীর অধিনায়ক ছিলেন।
সমশের খান	আফগান সমর অভিজাত। সেনাপতি হিসেব নবাবী বাংলার ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন।
সরদার খান	সমর অভিজাত। সেনাপতি হিসেব নবাবী বাংলার ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন।
ওমর খান	আফগান সমর অভিজাত।সেনানায়ক হিসেবে নবাব আলিবর্দী খানের সময় মারাঠাদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন খ্যতি লাভ করেন।
মেহদি নিসার খান	নবাব আলিবর্দী খানের সময় মেহদি নিসার খান বিহারের বখশি ছিলেন।
মীর ইসমাঈল খান	মীর ইসমাঈল খান নবাব আলিবর্দী খানের সময় সরকারের নায়েব বখশি ছিলেন।
সুজন সিংহ	সুজন সিংহ হিজলীর ফৌজদার ছিলেন।
খাদিম হোসেন খান	পূর্ণিয়ার ফৌজদার এবং পরে বিহারের নায়েব নাজিম ছিলেন।
দোস্ত মোহাম্মদ খান	আলিবর্দী খান ও নবাবসিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় সেনাপতি ছিলেন।
মোহাম্মদ ইরাজ খান	একজন সমর অভিজাত এবং নবাব সিরাজ-উদ- দৌলাহর শ্বশুর ছিলেন।
আগা সাদিক	তিনি জাহাঙ্গীরনগরে নিযুক্ত নবাবী প্রশাসনের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন।
রাজারাম সিংহ	আলিবর্দী খানের সময় মেদিনীপুরের ফৌজদার নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি নবাব সরকারের হরকরা বা গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
নারায়ণ সিংহ	নারয়ণসিংহ নবাব সরকারের হরকরা বা গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি মেদিনীপুরের ফৌজদারও ছিলেন।
নকি আলী খান	নবাবী প্রশাসনে তিনি একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তা ছিলেন। পদবি জানা যায় না।
রওশন আলী খান	সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় দিওয়াখানার দারোগা এবং পরে ঘোড়াঘাটের ফৌজদার ছিলেন।
জসরত খান	শওকত জঙের ভাই এবং একজন সমর অভিজাত ছিলেন।
কারগুজার খান	কারগুজার খান সামরিক অভিজাত। পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকতজঙের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।
ইয়ার লতিফ খান	ইয়ার লতিফ খান দু'হাজারী মনসব পদাধিকারী একজন সেনাপতি। ইংরেজরা প্রথমে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর পরিবর্তে তাঁকে নবাব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।
ওয়াহাব আলী খান	ওয়াহাব আলী খান নবাব সরকারের একজন প্রভাবশালী অমাত্য ছিলেন। অবশ্য তাঁর প্রশাসনিক পদবি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না।
মীর কলন্দর	তিনি প্রথমে কটক বা উড়িষ্যা এবং পরে জাহাঙ্গীরনগরের ফৌজদার ছিলেন।
জিয়াউল্লা খান	নবাব আলিবর্দী খানের সময় গোলন্দাজ বাহিনীর সহঅধিনায়ক এবং দস্তী তোপখানার দারোগা ছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় তিনি হুগলির ফৌজদার পদে নিয়োগ পান।
আলিকুলি খান ইস্পাহানী	আলিকুলি খান ইস্পাহানী আলিবর্দী খানের সময় মেদিনীপুরের ফৌজদার ছিলেন।
সৈয়দ উল্লাহ খান	নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় তিনি গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ছিলেন।
হাসান আহমদ খান	হাসান আহমদ খান ছিলেন রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন।
মির্জা দাওয়ার কুলি খান	মির্জা দাওয়ার কুলি খান ছিলেন নবাব সরকারের জিনসী গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান।
বাহাদুর আলী খান	নবাব আলিবর্দী খানের সময় বাহাদুর আলী খান ছিলেন জিনসী গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান।

Dhaka University Institutional Repository

মীর মোহাম্মদ রেজা খান	মীর মোহাম্মদ রেজা খান ছিলেন কটোয়ার ফৌজদার।
সায়েফ খান	সায়েফ খান ছিলেন পূর্ণিয়ার ফৌজদার । নবাব মুর্শিদকলি খান তাঁকে জিলালগড় বন্দরের গভর্ণরও নিয়োগ করেছিলেন বলে জানা যায়।
জাফর খাঁ বাহাদুর	জাফর খাঁ বাহাদুর নবাব আলিবর্দী খানের সময় পূর্ণিয়ার ফৌজদার ছিলেন।
মীর ইব্রাহিম	মীর ইব্রাহিম নবাব মুর্শিদকুলি খানের শাসনামল হুগলির ফৌজদার ছিলেন।
জিয়াউদ্দিন খান	জিয়াউদ্দিন খান ছিলেন বালাসোর ও হুগলির ফৌজদার।
ওয়ালি বেগ	ওয়ালি বেগ হুগলির ফৌজদার ছিলেন।
মীর আবু তালিব	নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় মীর আবু তালিব হুগলির ফৌজদার ছিলেন।
মুহাম্মদ রিজা	মুহাম্মদ রিজা নবাব মুশিদকুলি খানের শাসনামল হুগলির ফৌজদার ছিলেন।
মুহাম্মদ জান	মুর্শিদকুলি খানের সময় মুহাম্মদ জান মুর্শিদাবাদের ফৌজদার ছিলেন।
বখশ আলী খান	নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় বখশ আলী খান ভূষণার ফৌজদার ছিলেন।
রহমতউল্লাহ খান	মুর্শিদকুলি খানের সময় রহমতউল্লাহ খান চট্রগ্রামের ফৌজদার ছিলেন।
বাশারাত খান	বাশারাত খান নামক এই কর্মকর্তা মুর্শিদকুলি খানের সময় চট্রগ্রামের ফৌজদার ছিলেন।
সরবুলন্দ খান	সরবুলন্দ খান ছিলেন চট্রগ্রামের ফৌজদার
সোহরাওয়ার্দি খান	মুর্শিদকুলি খানের সময় সোহরাওয়ার্দি খান চট্রগ্রামের ফৌজদার ছিলেন।
মীর হাদী	মীর হাদী নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় চট্রগ্রামের ফৌজদার ছিলেন।
ওয়ালী বেগ খান	ওয়ালী বেগ খান ছিলেন চট্রগ্রামের ফৌজদার।
মতিউল্লাহ খান	মুশিদকুলি খানের আমলে মতিউল্লাহ খান সিলেটের ফৌজদার ছিলেন।
মির্জা আহসান উল্লাহ	মির্জা আহসান উল্লাহ নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় হুগলির ফৌজদার ছিলেন।
রহমত খান	রহমত খান সিলেটের ফৌজদার ছিলেন।
তানিব আলী খান	তানিব আলী খান মুর্শিদকুলি খানের আমলে সিলেটের ফৌজদার ছিলেন।
কাকতালাবখান বিজাপুরী	কাকতালাব খান বিজাপুরীও সিলেটের ফৌজদার ছিলেন।
শুকুর উল্লাহ	শুকুর উল্লাহ মুশিদকুলি খানের আমলে ১৭২৪-১৭২৮ সাল পর্যন্ত সিলেটের ফৌজদার ছিলেন।
হরকিশান দাস	মুশিদকুলি খানের আমলে হরিকিশান দাস সিলেটের ফৌজদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
ইয়াসিন খান	নবাব সরফরাজ খানের সময় ইয়াসিন খান মুর্শিদাবাদের ফৌজদার ছিলেন।
সমশের খান কোরাইশী	সমশের খান কোরাইশী নবাব সরফরাজ খানের সময় সিলেটের ফৌজদার ছিলেন।
আগা বাকের	আগা বাকের ছিলেন চট্রগ্রামের ফৌজদার। আ কা মো. যাকারিয়ার মতে, এই ব্যক্তি এবং নবাবী আমলের বিখ্যাত বুজুর্গ উমেদপুরের জমিদার আগা বাকের একই ব্যক্তি। বরিশালের সাবেক নাম বাকেরগঞ্জ এই ব্যক্তির নামেই হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন।
মীর সরফউদ্দিন বখশি	নবাব সরফরাজ খানের সময় মীর সরফউদ্দিন বখশি রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন।
গওস খাঁ	সমর অভিজাত। গিরিয়া যুদ্ধে নবাব সরফরাজ খানের অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন।
মির্জা শাহরিয়ার	নবাব সরফরাজ খানের সময় তোপখানার দারোগা ছিলেন।
শেখ হেদায়েত উল্লাহ	শেখ হেদায়েত উল্লাহ নবাব আলিবর্দী খানের সময় কটকের ফৌজদার ছিলেন।
মুহাম্মদ ইয়ার খান	নবাব আলিবর্দী খানের সময় তাঁকে হুগলির ফৌজদার নিয়োগ করা হয়েছিল।
আবদুল আলী খান	আবদুল আলী খান নবাব আলিবর্দী খানের সময় ত্রিহুতের ফৌজদার ছিলেন।
করম আলী খান	*মুজাফ্ফরনামা*'র রচয়িতা ইতিহাসবিদ করম আলী খান নবাব আলিবর্দী খানের সময় ঘোড়াঘাট ও রাঙ্গামটির ফৌজদার ছিলেন।
রৌশন খান তেরাহী	রৌশন খান তেরাহী শাহবাদের ফৌজদার এবং ভোজপুর এলাকার শাসনকর্তা ছিলেন।
রায় রাসবিহারী	নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় রায় রাসবিহারী কুণ্ডুওয়া ও বীরনগরের ফৌজদার ছিলেন।
রাজা মানিক চাঁদ	রাজা মানিক চাঁদ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় কলকাতার ফৌজদার ছিলেন।
মীর দাউদ খান	মীর দাউদ খান আলিবর্দী খান ও সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময় রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াসিন খান	ইয়াসিন খান নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময় থেকে জাহাঙ্গীরনগরের ফৌজদার ছিলেন। নবাব আলিবর্দী খান তাঁকেই কিছু দিনের জন্য ঐখানকার নায়েব নাজিমের সহকারী পদে নিয়োগ দেন।
শেখ ওমরউল্লাহ	শেখ ওমরউল্লাহ হুগলির ফৌজদার ছিলেন।
আগা সাদেক	পাট পশারের জমিদার। তাঁকে ত্রিপুরার ফৌজদার নিয়োগ করা হয়েছিল।
মির্জা সালাহউদ্দিন	মির্জা সালাহউদ্দিন হুগলির ফৌজদার ছিলেন।
দ্বীপচাঁদ	দ্বীপচাঁদ বিহারের সোরা উৎপাদন কেন্দ্র সরকার সরণের ফৌজাদার ছিলেন।

১.২ ভূ-স্বামী জমিদার অভিজাত

নবাবী আমলে বাংলায় বেশ কিছু নতুন ও পুরাতন জমিদারি অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। এসব বংশানুক্রমিক জমিদারির অধিকর্তা ভূ-স্বামী অভিজাতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন:

নাম	জমিদারি এলাকা
মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায়	মহারাজা কীর্তিচন্দ্র (১৭০২-১৭৪০ খ্রি.) বাংলার বিখ্যাত বর্ধমান জমিদারির অধিকর্তা।
চিত্রসেন রায়	চিত্রসেন রায় ছিলেন বর্ধমানাধিপতি মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায়ের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বর্ধমানের জমিদারির অধিকারী হন।
রাজা তিলকচন্দ্র রায়	রাজা তিলকচন্দ্র রায় ছিলেন মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায়ের ভ্রাতুস্পুত্র। ১৭৪৪ সালে চিত্রসেন রায় অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে রাজা তিলকচন্দ্র রায়ের উপর বর্ধমানের জমিদারির দায়িত্ব বর্তায়।
রামজীবন	রামজীবন ছিলেন নবাবী বাংলার বিখ্যাত নাটোর জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা। ভাই অমাত্য অভিজাত রঘুনন্দের সহযোতিয় রামজীবন রাজশাহী ও ভূষণাসহ বেশ কিছু জমিদারি বন্দোবস্ত নিয়ে বিখ্যাত নাটোর জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন।
মহারাজা রামকান্ত	নাটোরের জমিদার রামজীবনের দত্তক পুত্র রামকান্ত। রামজীবনের মৃত্যুর পর রামকান্ত 'মহারাজা'উপাধি নিয়ে নাটোরের জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
রাণী ভবানী	সমকালীন বাংলার ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব রাণী ভবানী ছিলেন নাটোরে জমিদার। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল উমা। ১৭৫২ সালে স্বামী মহারাজা রামকান্তের মৃত্যুর রাণী ভবানী তাঁর নামে নাটোর জমিদারির বন্দোবস্ত নেন। রাণী ভবানীর পরিচালনায় নাটোর জমিদারির খ্যাতি এবং যশ পুর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমকালে রাণী ভাবনীর প্রভাব প্রতিপত্তি এমনই ছিল যে, সে সময় জমিদারি এলাকার লোকেরা দেশের সরকার বলতে রাণী ভবানীকেই বুঝতো।
রাজা প্রাণনাথ	দিনাজপুরের জমিদার। প্রাণনাথের (১৬৮২-১৭২৩ খ্রি.) পিতা শুকদেব ছিলেন দিনাজপুর জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা। নবাব মুর্শিদকুলি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাণনাথ আশপাশের জমিদারি দখল করে দিনাজপুরের জমিদারিকে একটি বিশাল রাজ্যে পরিণত করেন।
মহারাজা রামনাথ	মহারাজা রামনাথ ছিলেন রাজা প্রাণনাথের দত্তক পুত্র। ১৭২৩ সালে রাজা প্রাণনাথের মৃত্যুর পর 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি নিয়ে দিনাজপুর জমিদারি পরিচালনা শুরু করেন। ১৭৬০ সাে পুত্র বৈদ্যনাথের হাতে জমিদারি স্বত্ব রেখে রামনাথ দেহ ত্যাগ করেন।
রাজা রঘুরাম	রাজা রঘুরাম ছিলেন সমকালে বাংলার সুবিখ্যাত জমিদারি নদীয়ার জমিদার। পিতা রামজীবনের দেহান্তরের পর তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে নদীয়ার জমিদারি লাভ করেন এবং ১৭২৮ সাল পর্যন্ত দক্ষতার সাথে জমিদারি পরিচালনা করেন।
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র	মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন নদীয়াধিপতি। ১৭২৮ সালে পিতা রাজা রঘুরামের মৃত্যুর পর কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়া জমিদারির অধিকর্তা হন। শুধু একজন ভূ-স্বামী জমিদার অভিজাত হিসেবে নয়, বরং জনকল্যাণ ও সামাজিক বিবর্তনের প্রতিফলক হিসেবে ও গোটা আঠারো শতকে বাঙালি সমাজের জনমানসের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন। সমকালীন রাজনীতিতেও তাঁর সক্রিয় পদাচারনার কথা জানা যায়।
আসাদউল্লাহ খান	বীরভূম ছিল বাংলার মুসলমান জমিদারির মধ্যে সর্ববৃহৎ জমিদারি। পাঠান বংশোদ্ভূত

	আসাদউল্লাহ খান ছিলেন এই জমিদারির তৃতীয় জমিদার। তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খানের সমসাময়িক ছিলেন।
বদি-উজ-জামান খান	জমিদার আসাদউল্লাহ খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বদি-উজ-জামান খান ১৭১৮ সালে বীরভূম জমিদারির অধিকর্তা হন এবং ১৭৫১ সাল পর্যন্ত জমিদারি পরিচালনা করেন।
আসাদ-উজ-জামান খান	আসাদ-উজ-জামান খান ছিলেন বীরভূমের জমিদার বদি-উজ-জামান খানের তৃতীয় পুত্র। পিতার জীবদ্দশাতেই ১৭৫২ তিনি বীরভূমের জমিদারি সত্ব লাভ করেন। বীরভূম জমিদারদের মধ্যে আসাদ-উজ-জামান খানই প্রথম 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।
রাজা গোপাল সিংহ	বিষ্ণুপর ছিল বাংলার প্রাচীনতম জমিদারির অন্যতম। মল্ল বংশোদ্ভূত রাজা গোপাল সিংহ ছিলেন এই বিষ্ণুপুরের জমিদার। পিতা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের মৃত্যুর পর রাজা গোপাল সিংহ ১৭১২ সাল থেকে ১৭৪৮ সাল পর্যন্ত জমিদারি পরিচালনা করেন।
রাজা চৈতন্য সিংহ	রাজা চৈতন্য সিংহ ছিলেন বিষ্ণুপুরের শেষ জমিদার। ১৭৪৮ সালে পিতা রাজা গোপাল সিংহের মৃত্যুর পর তিনি জমিদারি সত্বের অধিকারী হন। তাঁর পরিচালনায় বিষ্ণুপুর জমিদারির গৌরব ক্রমশ নিস্প্রভ হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে ইংরেজদের সুর্যাস্ত আইনের আওতায় এর ধ্বংস সাধন করা হয়।
কৃষ্ণরাম রায়	কৃষ্ণরাম রায় ছিলেন উত্তর রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ। নবাব মুর্শিদকুলি খানের সনদ বলে তিনি ইউসুফপুর জমিদারির বন্দোবস্ত লাভ করেন। ১৭২৯ সাল পর্যন্ত জমিদারি পরিচালনা করে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।
শুকদেব রায়	শুকদেব ছিলেন ইউসুফপুরের জমিদার কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র। ১৭২৯ সালে পিতার মৃত্যুর পর শুকদেব রায় ইউসুফপুর জমিদারির অধিকর্তা হয়েছিলেন।
নীলকণ্ঠ রায়	ভূ-অভিজাত নীলকণ্ঠ রায় ছিলেন ইউসুফপুরের জমিদার। তিনি ১৭৪৫-১৭৬৪ সাল পর্যন্ত এ জমিদারি পরিচালনা করেন।
শ্যামসুন্দর রায়	শ্যামসুন্দর রায় ছিলেন ইউসুফপুরের জমিদার রামকৃষ্ণ রায়ের বৈমাত্রেয় ভাই। রামকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে শুকদেবের সময় ইউসুফপুর জমিদারি ভাগ হয়ে সৈয়দপুর জমিদারি নামে একটি নতুন জমিদারি তৈরি হয়েছিল। শ্রামসুন্দর ছিলেন এই সৈয়দপুরের জমিদার। তিনি ১৭৩১-১৭৫১ সাল পর্যন্ত এই জমিদারি পরিচালনা করেছিলেন।
রামগোপাল রায়	শ্যামসুন্দর রায়ের মৃত্যুর পর রামগোপাল রায় সৈয়দপুরের জমিদারি সত্ব লাভ করেছিলেন। ১৭৫৭ সালে অপুত্রক রামগোপাল রায়ের মৃত্যুর পর নবাব সরকার তাঁর বেওয়ারিশ জমিদারি হুগলির ফৌজদার মীর্জা সালাহউদ্দিনকে বন্দোবস্ত প্রধান করে। পরে এই সৈয়দপুর জমিদারি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রখ্যাত দানবীর হাজী মুহাম্মদ মহসীন প্রাপ্ত হয়েছিলেন।
জগদীশ্বর ভঞ্জ	ময়ূরভঞ্জের জমিদার ছিলেন। রাজা জগদ্বীশ্বর আলিবর্দী খানের বিরুদ্ধে মির্জা বাকেরকে সহয়তা করে নবাবের বিরাগভাজন হন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজা জগদ্বীশ্বরকে পরাজিত করে ল ময়ূরভঞ্জে নবাবী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।
আগা সাদেক	আগা সাদেক ছিলেন পাটপশারের জমিদার। তিনি ত্রিপুরা জয়ে জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। এর পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে ত্রিপুরার ফৌজদার নিয়োগ করা হয়েছিল।

১.৩ বণিক অভিজাত

নবাবী যুগে বৃহৎ বণিক-মহাজনরা বাংলার অভিজাত শ্রেণীর অন্যতম অঙ্গশক্তি ছিল। তবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণের অভাবে তাদেরও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত অভিজাত বণিকদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের পরিচিতি নিচে উল্লেখ করা হলো:

মানিকচাঁদ	মানিকচাঁদ ছিলেন জগৎশেঠ পরিবার নামীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। জৈন ধর্মালম্বী

	এ বণিক পরিবারটি আঠারো শতকের বাংলার অর্থনৈতিক জগতের মধ্যমণি হিসেবে পরিচিত। দিল্লীর মুঘল সম্রাট নিকচাঁদকে 'নগর শেঠ' (নগরের মহাজন) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে মানিকচাঁদ মারা যান।
ফতেহচাঁদ	ফতেহচাঁদ ছিলেন মানিকচাঁদের ভাগ্নে এবং দত্তক পুত্র। মানিকচাঁদের মৃত্যুর পর ফতেহচাঁদ পারিবারিবারিক ব্যবসায়ের দায়িত্ব নেন এবং তাঁর পরিচালনায় শেঠ পরিবার ও মহাজনী প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত খ্যাতি অর্জিত হয়। মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহ ১৭২৩ সালে ফতেহচাঁদকে 'জগৎশেঠ' (পৃথিবীর মহাজন) উপাধি দেন এবং পরবর্তীতে এটি তাঁদের পারিবারিক উপাধিতে পরিণত হয়। নবাব সুজাউদ্দিন খান প্রতিষ্ঠিত উপদেষ্টা কাউন্সিলে অন্যতম সদস্য হিসেবে রাজনীতি ও প্রশাসনে তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এ প্রভাব নবাব সরফরাজ খানের আমলেও অব্যাহত ছিল। আলিবর্দী খানকে মসনদ লাভে সক্রিয় সহায়তার পুরস্কার স্বরূপ তাঁর সময়ে রাজনীতিতে ফতেহচাঁদ-এর প্রভাব প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পায়। ১৭৪৩/৪৪ সালে ফতেহচাঁদ মারা যান।
মহাতাব চাঁদ	ফতেহচাঁদের মৃত্যুর পর শেঠ পরিবারের কর্তৃত্ব তাঁর পৌত্র মহাতাব চাঁদের উপর বর্তায়। তিনিও মুঘল সম্রাট আহমদ শাহের কাছ থেকে 'জগৎশেঠ' উপাধি লাভ করেছিলেন। মহাতাবচাঁদ শুধু শেঠ পরিবারের ব্যবসায়িক প্রধান্যই বৃদ্ধি করেননি, সমকালীন বাংলার রাজনীতিতেও তিনি নিজেকে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করেন। আধুনিক গবেষকগণ জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদকে পলাশী বিপ্লবে দেশীয় অভিজাতদের মধ্যমণি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
স্বরূপচাঁদ	শেঠ পরিবারের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য। জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদের ভাই। পিতামহ জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর ভাই জগৎশেঠ মহাতাব চাঁদের সাথে পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেন। মুঘল রাজদরবার থেকে তাঁকে 'মহারাজা' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল।
খোজা **ইসরাইল** সরহাদ	খোজা ইসরাইল সরহাদ ছিলেন আর্মেনিয় বণিক। তাঁর প্রধান বাণিজ্য ঘাঁটি ছিল মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে সাঈদাবাদে। ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও সমকালীন বাংলার রাজনীতিততেও তাঁর বেশ প্রতিপত্তি ছিল বলে জানা যায়
খোজা পেত্রাস আরাতুন	খোজা পেত্রাস আরাতুন ছিলেন একজন অভিজাত বণিক। রবার্ট ক্লাইভ তাঁকে কলকাতার সম্ভ্রান্ত আর্মেনীয় বণিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সমকালীন বাংলার রাজনীতিতেও তিনি যে বিশেষ সক্রিয় ছিলেন সে তথ্য সুত্রক্রমে জানা যায়।
ইব্রাহীম জ্যাকব	ইব্রাহীম জ্যাকব ছিলেন ইহুদি বণিক। তিনি বণিক অভিজাত খোজা পেত্রাস আরাতুনের বন্ধু ছিলেন। ব্যবসা সূত্রে ইংরেজদের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।
খোজা ওয়াজিদ	ধনসম্পদ, পদমর্যাদা ও নবাব দরবারের প্রভাব প্রতিপত্তিতে আর্মেনীয়দের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান বণিক ছিলেন খোজা ওয়াজিদ। ঐতিহাসিক রবার্ট ওর্মের বর্ণনায় তাঁকে 'The Principal Merchant of the Province' ও ইংরেজ কোম্পানির ওয়াটর্স, কলেট এবং ফরাসি কোম্পানির মশিয়ে জ্যাঁ ল এর বর্ণনায় সমকালীন বাংলার একজন বড় ব্যবসায়ী ও নবাব দরবারে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর সাথে প্রথম পর্যায়ে তাঁর সু সম্পর্ক থাকলেও পরে পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিজ স্বার্থেই তিনি পক্ষ ত্যাগ করেন এবং পলাশী বিপ্লবে সিরাজ বিরোধী দেশীয় অভিজাত চক্রের সাথে যুক্ত হন।
উমিচাঁদ	প্রকৃত নাম আমীরচাঁদ হলেও সমকালীন বাংলার ইতিহাসে তিনি উমিচাঁদ নামে সমাধিক পরিচিত। তাঁর আদি নিবাস পাঞ্জাবে এবং তিনি নানকপন্থি শিখ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। নবাবী যুগের বাংলার অন্যতম প্রধান সওদাগর উমিচাঁদ সমকালীন বাংলার রাজনীতিতেও বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।
শেখ আফজাল	কাশ্মীর মুসলমান বণিক। আর্মেনিয় বণিক অভিজাত খোজা ওয়াজিদের সাথে তাঁর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কোনো কোনো সূত্র অনুযায়ী শেখ আফজাল খোজা ওয়াজিদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎসসমূহ (Primary Sources)

(ক) ফারসি ভাষায় রচিত সমসাময়িক গ্রন্থসমূহ

Ali, Karam, *Muzaffarnamah,*(1772), English Trans. by Jadunath Sarkar, *The Bengal Nawabs,* The Asiatic Society, Calcutta, 1952, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

Fazal, Abul, *Ain-i-Akbari,* English Trans. by J S Jarrett, Calcutta, 1949

Husaini, Azad -al, *Nawbahar-i-Murshid Quli Khani,*(1729), English Trans. by Jadunath Sarkar, *The Bengal Nawabs,* The Asiatic Society, Calcutta, 1952, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

Khan, Shah Newaz, Haqq, Abdul, *Maathir-ul-Umara*, 3 vols. English Trans. by H Beveridge, Riprint, Asiatic Society of Kolkata, Kolkata, 2003

Khan, Yusuf Ali, *Tarikh-i-Bangala-i-Mahabatjangi,*(1764), Persian Text edited by Abdus Subhan, The Asiatic Society, Calcutta, 1969, English Trans. by Jadunath Sarkar, *The Bengal Nawabs,* The Asiatic Society, Calcutta, 1952, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭

---------- *Zamia-i-Tadhkira-i-Yusufi,* Persian Text edited by Abdus Subhan, The Asiatic Society, Calcutta, 1978

Qalandar, Munshi Shaikh Yar Muhammad (complied), *Dastur-ul-Insha,*

Salim, Gulam Husain, *Riyaz-us-Salatin,*(1780-1781), Eng. Trans. by Maulovi Abdus Salam, The Asiatic Society, Calcutta, 1952, বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা শ্রী রামপ্রাণ গুপ্ত, দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৫

Salimulla, *Tarikh-i-Bangla,* (1763), Prsian Text ed. by S M Imam uddin, The asiatic society of Bangladesh, Dacca, 1979, English Trans. by Francies Gladwin as *Narrative of the Transactions in Bengal,* Stuart and Cooper press, Calcutta, 1788

Singh, M Kalayyan,: *Kulasat-ut-Tawarikh,*(1812), English Trans. by by Khan Bahadur Sarfaraz Husain Khan, *Journal of Bihar and Orissa Research Society,* Vol. XXVI, 1940

Tabatabai, Gulam Husain Khan Seid, *Seir-ul-Mutaaqqirin* (1780), English Trans. by Hazi Mustafa R. Cambray & Co. Calcutta, 1902-1903, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, দিব্য প্রকাশ, ২০০৬

Vijayram, Munshi, *Dastur-ul- Insha,* (completed in 1769)

Wafa, Muhammad, *Waqai Fath Bangalah,*

Anonymous, *Tharikh-i- Mansuri,* Partially English Trans. by Henery Blochman in the tittle of "Notes on Sirajuddaulah and the Town Murshidabad, taken from a Persian Manuscript of the of *Tharikh-i- Mancuri*", *Journal of Asiatic society of Bengal,* Part I, no. II, 1867

(খ) ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দাপ্তরিক রেকর্ডস (অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত)

Home Public Proceedings 1717-1765, (Unpublished, National Archives, New Delhi)

Home Miscellaneous Records from Vol. III upto Vol. XXX, (Unpublished, New Delhi)

Letter (Public) to the Court 1707-1765, (Unpublished, National Archives, New Delhi)

Letter (Public) From the Court 1707-1765 (Unpublished, National Archives, New Delhi)

Published

Atichision, C. U., *A Collection of Treaties Engagement and Sanads,* vol. II, Govenment Printing, Calcutta, 1930

Datta, K. K., *Fort William- India House Correspondence* Vol. I (1748-1756), National Archives of India, Delhi, 1958

Sinha, N. K., *Fort William- India House Correspondence* Vol. II (1757-1759), National Archives of India, Delhi, 1959

Firminger, W. K., *The Fifth Report from the Select committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company,* 5 vols., R Cambary Co. Calcutta, 1917

Hill, Samuel Charles (ed.), *Bengal in 1756-157,* 3 vols., John Murry, London, 1905

---------- *An Abstract of early Records of the Foreign Department, Part.I, 1756-1762.* Imperial Record Department, Calcutta, 1901

Verelst, H., *Original Papers Relative to the Disturbance in Bengal, 1759-1764,* J Newberry, London, 1765

Wilson, C. R., *Early Annals of the English in Bengal,* 3 Vols. W. Thacker & Co. Calcutta, 1895-1917

---------- *Old Fort William in Bengal, (Indian Record Series)* 2 vols. John Murry, London, 1906

(গ) সমসাময়িক গ্রন্থসমূহ

Bolts,William, *Consideration on Indian Affairs,* J. Almon, London, 1772

Cailland, J., *A Narrative of what happened in Bengal in 1760,* London, 1764

Dow, Alexander, *The History of Hindostan,* Volume 1, English Trns. of Abul Qasim Muhammad Firishta, T. Becket and P.A. De Hondt, London, 1770

Debrit, *Transactions in India, from 1756-1783,* London, 1786

Grant, James, *An Enquiry into the nature of the Zamindary Tenures in the Landed Property of Bengal,* London, 1791

---------- *Historical and Comparative Analysis of the Finances of Bengal* published as

Appendix 4 in the *The Fifth Report*. Vol. II, ed. by W.K. Firminger, Calcutta, 1917

Holwell, John Zephaniah, *Interesting Historical events relative to Bengal and the Empire of Indostan*. Part I- III. T. Becket and P. A. De Hondet, London, 1765-1767

---------- *India Tracts*, London, 1774

Law, M. Jean, *Memoir of Jean Law*. ed. by Alfred Martineau, Edouard Champion, Paris, 1913

Orme, Robert, *Historical Fragments of the Mughal Empire*, London, 1805

---------- *History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan*. 2 vols., John Nourse, London, 1803

Rennell, James, *Description of Roads in Bengal and Bihar*, London, 1778

---------- *A Bengal Atlas*, London, 1780

---------- *Memoir of the Map of Hidustan*, London, 1788

Scrafton, Luke, Reflections *on the Government of Indostan*, A Millar, London, 1760

Vansittart, H., *A Narrative of the Transactions in Bengal from 1760-1764*, J Newberry, London, 1766

Verelst, H., *A View of the Rise, Progress and Present State of the English Government in Bengal*, J. Nourse, London, 1772

Watts, Williams, *Memoirs of the Revolution in Bengal in the Year 1757*, A Millar, London, 1760

গঙ্গারাম, *মহারাষ্ট্রপুরাণ*, হারাধন দত্ত (সম্পা.), কলিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

চক্রবর্তী, পঞ্চানন, (সম্পা.), *রামেশ্বর রচনাবলী*, কলিকাতা,

বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত ,(সম্পা.), *ভারতচন্দ্র রচনাবলী*, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

ভট্টাচার্য, রামেশ্বর, *শিবায়ন*, যুগীলাল হালদার (সম্পা.) , কলিকাতা, ১৯৫৭

সেন, জয়নারায়ণ, *হরিলীলা*, ডি.সি সেন এবং ভি. আর রায় (সম্পা.), কলিকাতা, ১৯২৮

সেন, রামপ্রসাদ, *বিদ্যাসুন্দর*, কলিকাতা, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Sources)

(ক) গ্রন্থাবলি

Ahmed, Imtiaz, *Social Stratification among the Muslims of India*, Monohar Pub. New Delhi, 1978

Akhtaruzzaman, Md, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic society of Bangladesh, Dhaka, 2009

Akhter, Shirin, *Role of the Zamindars in Bengal 1707-1772*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1982

Alam, Muzaffar, *The Crisis of Empire in Mughal North India, Awadh and the Punjab 1707-1748*, Oxford University Press, Delhi, 1986

Alam, Muzaffar & Subrahmanyam, S., (ed.), *The Mughal State, 1526-1750*, New Delhi, 2000

Ali, M. Athar, *The Mughal Nobility under Aurangzeb*, 2nd.revised ed., Oxford University Press, Delhi, 2001

Ali, Muhammad Mohar, *History of the Muslims of Bengal,* Vol. IA & IB, Riyad, KSA, 1985

---------- *The fall of Sirajuddaullah,* The Mehrub Publication, Chittagong, 1975

Ashraf, K.M., *Life and Conditions of the people of Hinustan*, Munshilal Monoharlal, New delhi, 1970

Aziz, Abdul, *The Mansabdari System and the Mughal Army* , Idarah-I Adabiyat-I Delli, Delhi, 1972

Bayley, H.V, *History of Midnapore,* Calcutta, 1902

Bayly, C.A., *Indian Society and the Making of the British Empire.* Cambridge, 1987

Bhattacharya, Sukumar, *The East India Company and the economy of Bengal from 1704 to 1740.* Luzac & Co., London, 1954

Bottomore, T. B. and Rubel, M. (ed.), *Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy,* Watts, 1956

Banerji, B.N., *Begums of Bengal,* Mitter & Co., Calcutta, 1915

Banerji, R. D., *History of Orissa,* vol. II, *Calcutta*, 1930

Baumer, Rachel Van M. (ed.), *Aspects of Bengali History and Society,* Vikash Pub. House Pvt. Ltd. New Delhi, 1976

Chandra, Satish, *Parties and Politics at the Mughal Court, 1707-1740,* People's Publishing House, New Delhi, 1972

Chatterjee, A., *Bengal in the reign of Aurangzeb,* Calcutta, 1967

Chatterjee, Kumkum, *Merchants, Politics, and Society in Early Modern India: Bihar, 1733-1820,* E J Brill, 1996

Chatterjee, Tapanmohan, *The Road to Plassey,* Orient Longmans, Bobay, 1960

Chatterji, Sunitikumar, *The Origin and Development of the Bengali Language,* 3 vols. University of Calcutta, Calcutta, 1926

Chaudhuri, K. N., *The Trading World of Asia and the English East India Company,* Cambridge University Press, 1978

Chaudhury, Sushil, *The Prelude To Empire: Plassey Revolution of 1757*, UPL, Dhaka, 2000

---------- *From Prosperity to Decline: Eighteenth Century Bengal,* Manohar Publishers and Distributors, Delhi, 1995

---------- *Trade and Commercial Organization in Bengal, 1650-1720,* Calcutta, 1975

Chaudhury, Sushil and Morineau, Michel (ed.), *Merchants, Companies and Trade: Europe and Asia in the Early Modern Era,* Cambridge University Press, 2007

Crawford, D. G., *A Brief History of the Hugli District,* Calcutta, 1903

Datta, K. K., *Alivardi Khan and His Time,* University of Calcutta, Calcutta, 1939

---------- *Studies in the History Bengal Subah*, Vol. I, Calcutta, 1936

---------- *Survey of India's Social and Economic Conditions in the Eighteenth Century,*

Calcutta, 1969

---------- *Siraj-ud-Daulah,* Calcutta, 1971

Dutt. N.K., *The Origin and Growth of castes in India,* 2 vols. Firma K.L.M Calcutta, 1965

Dutt. R. C., *Cultural Heritage of Bengal,* Puthi Pustak, Calcutta, 1962

Eaton, Richard M., *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760,* Oxford University Press, Delhi, 1984

Edwardes, Michael, *Plassey: The Founding of an Empire,* Hamish Hamilton, London, 1969

---------- *The Battle of Plassey and the conquest of Bengal.* B. T. Batsford, *London 1963*

Gould, Julius and L. Kolt , William (ed.), *A Dictionary of Social Science,* Tavistock Publication, London, 1964

Gretton R. H., *The English Middle Class,* G. Bell & Sons Ltd. London, 1917

Gupta, Brijen K., *Sirajuddaullah and the East India Company,* Lieden, 1966

Habib, Irfan, *The Agrarian System of Mughal India, (1556-1707),* Asia Publishing House, Bombey, 1963

---------- *Medieval India,* National Book Trust, New Delhi, 2008

Habibullah, A. B. M, *The foundation of Muslim Rule in India,* Allahabad, 1961

Hamilton, E. J., *The Trade Relations Between England and India, 1600-1896, Calcutta, 1919*

Hasan, Ibn, *The Central Structure of the Mughal Empir,* Oxpord University Press, 1976

Hill, Samuel Charles, *Three Frenchmen in Bengal - The Commercial Ruin of the French Settlements in 1757,* Longmans Green & Co. London, 1903

Hollingbery, R. H., *The Zamindary Settlement of Bengal.* Oxford University Press, London, 1879

Hunter, W W, *The Annals of Rural Bengal,* Smith Elder and Co. London. *1868*

---------- *A Statistical Account of Bengal,* 20 vols. Trubner & Co. London 1875- 1877

---------- *Bengal MS Records,* W. H. Allen & co., London, 1894

Huq, Mazaharul, *The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal (1698-1784).* Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1964

Irvine, W., *Later Mughals,* ed. by Jadunath Sarkar, 2 vols. Luzac, London, 1922

Karim, Abdul, *Murshidkuli Khan and His Time,* Jatiya Sahitya Prakash, Dhaka, 2011

---------- *Dacca: The Mughal Capital,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1964

---------- *History of Bengal, Mughal period,*2 vols, IBS, University of Rajshahi, 1992

---------- *Social History of the Muslims in Bengal (down to A. D. 1538),* Asiatic Society of Pakistan, 1959

Karim, A. K. M. Nazmul, *The Changing Society of India and Pakistan,* Ideal Publication. Dhaka. 1961

---------- *The Dynamics of Bangladesh Society,* Vikas Pub. House, New Delhi, 1980

Keene, H.G., *The Fall of the Mughal Empire of Hindustan,* Oxford University Press, London, 1887

Khan, Abdul Majed, *The Transition in Bengal,* The Cambridge University Press, London, 1969

Khan, Muhibbul Hassan, *History of Tipu Sultan,* Calcutta, 1951

Khosala, Ramprasad, *Mughal kingship and Nobility,* Allahabad, 1934

Majumdar, D. N. and Rao, C. R., *Races Elements in Bengal, Calcutta.* 1960

Majumdar, P. C., *The Musnad of Murshidabad (1704-1904),* Saroda Roy, Murshidabad, 1905

Majumdar, R. C., *Maharaja Rajballabha,* University of Calcutta, 1947

---------- *History of Medieval Bengal,* G Bharadwaj & Co. Calcutta, 1973

Malcom, J., *Life of Robert Clive,* 3 vols. J. Murray, London, 1836

Malleson, G. B., *The Decisive Battle of India from 1746 to 1849 inclusive.* Reeves & Turner, London, 1885

---------- *Lord Clive,* Macmillan & Co., London 1882

Mallick, A. P., *History of Bishnupura,* Calcutta, 1921

Marshall, P. J., *Bengal: the British Bridgehead: Eastern India, 1740-1828,* Cambridge University Press, London, 1988

---------- *East Indian Fortunes: The British in Bengal in the Eighteenth Century,* Clarendon Press, Oxford, 1976

Marshman, J. C., *An Outline of the History of Bengal,* Srirampur, 1844

Marx, Karl, *Pre-Capitalist Economic Formation,* Eng. Trns. by J Cohn, New York, 1969

Michell, George (ed.), *The Islamic Heritage of Bengal,* UNESCO, 1984

Misra, B.B., *The Indian Middle Class,* Oxford University Press, Delhi, 1961

Mohsin, K. M., *A Bengal District in Transition: Murshidabad,* Asiatic Society of Bangladesh, Dacca, 1973

Moreland, W. H., *India at the death of Akbar,* reprint, Delhi, 1962

Moosvi, Shireen, *The Economy of the Mughal Empire, c 1595: A Study,* Oxford University Press, Delhi, 1987

Muir, J Ramseay B., *The Making of British India, 1756-1858,* Victoria University, Mancheshter, 1915

Mukhopadhyay, Subhas Chandra, *The Career of Raja Durlabram Mahindra (Raidurlabh),* Jangabari,Varanasi, 1974

Owen, Sidney J., *The fall of the Mughal Empire,* John Murry, London, 1912

Prokash, Om, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal: 1630-1720.* Priceton University Press, Newjersy, USA, 1985

Rahim, M. A., *Social and Cultural History of Bengal,* Vol. I &II, Karachi, 1963

Ray, L.M., *Degradation of Bengal Zamindars,* Calcutta, 1893

Ray, Ratnalekha, *Change in Bengal Agrarian Society* (1700-1850), Monohar Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 1979

Richards, J. F., *Mughal Administration in Golconda, 1687-1727,* Oxford, 1975

Roy, Asim, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal,* Princeton University Press, Princeton, 1983

Roy, Atul Chandra, *The Career of Mir Jafar al Khan,* University of Calcutta, 1953

---------- *History of Bengal Mughal Period (1526-1765),* Calcutta, 1968

Roy, Niharranjan, *Medieval Bengali Culture*, Calcutta, 1945

Rubbee, khondkar Fazli, *The Origin of the Muslmans of Bengal,* Society for Pakistan Studies, Dacca, 1970

Sarkar, J. N. (ed.), *The History Bengal,* Vol. II, Fourth Impression, University of Dhaka, 2006

---------- *Fall of the Mughal Empire,* 4 vols., Orient Longman, New Delhi, 1992

---------- *Mughal Administration,* M.C. Sarkar & sons, Calcutta, 1924

Sarkar, Jagadis Narayan, *Hindu-Muslim Relations in Bengal (Medieval Period).* Idara-i-Adabiyat, Delhi, 1985

---------- *Islam in Bengal (13the 19th Centuries),* Ratna Prokashoni, Calcutta, 1972

Sen, Sukumar, *History of Bengali Literature,* New Delhi, 1960

Sharma, S.R., *The Religious Policy of the Mughal Empires,* Oxford University Press, 1940

Sinha, J.C., *Economic Annals of Bengal,* London, 1927

Sinha, Narendra Krishna, *The Economic History of Bengal,* Vol. II, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1968

Spear, T.G. P., *Twilight of the Mughals,* Oxford University Press, London, 1973

---------- *The Nabobs, (A Study of the Social Life of the English in Eighteenth Century India).* Oxford University Press, London, 1932

Stark, Werner, *The Ideal Foundations of Economic Thought: Three Essays on the Philosophy of Economics,* Trubner & Co. Ltd., USA, 1943

Stavorinous, *Voyage to the East Indies,* Vol. I, Translated into English by Wiilcock, London, 1973

Stewart, Charles, *History of Bengal,* Council of education, Calcutta, 1847

Tarafder, Mamtazur Rahman, *Husain Shahi Bengal,* second revised edition, University of Dhaka, 1999

Tripathi, R.P., *Rise And Fall of the Mughal Empire,* Central Book Depot, Allahabad, 1956

Walsh, Major, *A History of Murshidabad District,* London, 1902

Weber, Max, *Theory of the Social and Economic Organization,* ed. Tolcatt Persons, A Free Press, New York, 1966

Wise, James, *Notes on The Races, Castes and Trades of eastern Bengal.* London, 1883

আখতারুজ্জামান, মো., *মুসলিম ইতিহাসতত্ত্ব* , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮

আনিসুজ্জমান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৯৭১

---------- (সাম্পাঃ), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

আহমদ, ওয়াকিল, *মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, *চিশতিয়া* প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ১৯৬৮

আজাদ, লেলিন, *ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষি কাঠামো*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯

আনসারী, মুসা, *ইতিহাস: সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

আরেব, এস. জি. আব্বাস, *নবাব সিরাজউদদৌল: পরিবারের অজানা কথা*, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০১১

আলি, এম. আতহার, *ঔরঙ্গজেবের সময় মুঘল অভিজাত শ্রেণী*, (বাংলা অন. অরুণ কুমার), কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৭৮

আলীম, এ কে এম আবদুল, *ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস*, পুনমুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

আহমদ, সালাহউদ্দীন ও অন্যান্য (সম্পা.), *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১,

ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা*, প্রথম খণ্ড, মাওলা ব্রাদ্রার্স, ঢাকা, ২০০১

ইসলাম, মাযহারুল, *হেয়াত মাহমুদ*, রাজশাহী, ১৯৬১

ইসলাম, মোঃ নজরুল, *রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, পুথিঘর লিমিটেড, ১৯৮৭

ইসলাম, সিরাজুল, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, বাংলা একাডেমী, *ঢাকা*, ১৯৮৪

---------- (অনূদিত), *এশীয় বাণিজ্য: বেনেবাদী যুগে ইউরোপীয় সম্প্রসারণ*, বাংলা একাডেমী, *ঢাকা*, ১৯৯১

---------- (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১*, ৩ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩

---------- (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, ১০ খণ্ড, (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

উদ্দীন, মুহম্মদ মনসুর, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পুনর্মুদ্রণ, হাশি প্রকাশনালয়, ঢাকা, ২০০২

উলিয়ানভস্কি, র. আ., *ভারতের সামাজিক-আর্থনৈতিক বিকাশ*, বাং অনুবাদ, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, প্রগতী প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৬

কবীর, সারোয়ার, *দোষ-গুণের সিরাজ-উদ-দৌলা*, আকাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮

করিম, আবদুল, *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, বাংলা অনু. মোকাদ্দেসুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯

---------- *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত*), (বাংলায় অনু. মোকাদ্দেসুর রহমান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

---------- *বাংলার ইতিহাস: মোগল আমল*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫

---------- *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২

করিম, নাজমুল, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*, নবম প্রকাশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০১০

খান, এস এম রেজা আলী, *মুর্শিদাবাদ ও বাঙলার নায়েব নাজিম*, পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮

গণি, আনোয়ার ইবনে, *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনে নন্দকুমারের ভূমিকা*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭

গুপ্ত, শ্রী রসিকলাল, মহারাজা *রাজবল্লভ সেন*, সাথী প্রেস, কলিকাতা

ঘোষ, বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান লি., কলিকাতা, ১৯৭৯

Dhaka University Institutional Repository

---------- *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, বুক ক্লাব, ঢাকা, ২০০৩

ঘোষাল, মণি, *পলাশির যুদ্ধ*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৬

চক্রবর্তী, এম. এন., *বীরভূম রাজবংশ*, বীরভূম, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ

----------(সম্পা.), *বীরভূম বিবরণী*, বীরভূম, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

চক্রবর্তী, মৃণাল, *সিরাজ উদ দৌলা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮১

চন্দ, রামপ্রসাদ, *ইতিহাসে বাঙালি*, *কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানি*, কলিকাতা, ১৯৮৫

চন্দ্র, সতীশ, *মোগল দরবারে দল ও রাজনীতি ১৭০৭-১৭৪০*, বাংলা অনুবাদ, কে পি বাগচী কো., কলকাতা, ১৯৭৮

চট্টোপাধ্যায়, তপনমোহন, *পলাশির যুদ্ধ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *সীতারম*, বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ

চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সতীন্দ্রমোহন, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা* (১১০০-১৯০০)

চৌধুরী, কমল (সম্পা.), *মুর্শিদবাদের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮

চৌধুরী, মীর ফজলে আহমদ, *দলিলপত্রে পলাশীর যুদ্ধ*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১

চৌধুরী, সুশীল, *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪

---------- *পলাশির অজানা কাহিনী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪

জাফর, সিকান্দার আবু, *সিরাজ-উ-দ্দৌলা*, মাটিগন্ধা, ঢাকা, ২০১২

তরফদার, মমতাজুর রহমান, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

---------- *হোসেন শাহী আমলে বাংলা* (বাংলা অনু. মোকাদ্দেসুর রহমান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

তায়েশ, মুনশী রহমান আলী, *তাওয়ারিখে ঢাকা*, এ.এম. এম. শরফুদ্দীন অনূদি ও সম্পা., দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭

দাসগুপ্ত, কল্যাণকুমার, *ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, সচ্ছিদানন্দ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৭

দাস, বিনোদ শংকর, *মেদিনীপুরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিবরণ*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯১৯

পারাবত, শ্রী, *মুর্শিদকুলী খাঁ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮

ফারুকী, কাজল (সম্পা.), *ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে নবাব সিরাজ উদ দৌল্লা ও পলাশীর ট্রাজেডী*, ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৩

বন্দোপাধ্যায়, অনিলচন্দ্র, *মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী*, কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৯

বন্দোপাধ্যায়, কমল, *মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮০ বাংলা সন

বন্দোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, *নবাবী আমল*, প্রথম প্রকাশ, ১৯০১, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৩

---------- *মধ্য যুগে বঙ্গ*, কলিকাতা, ১৯৩০

বন্দোপধ্যায়, রাখালদাস, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

বন্দোপাধ্যায়, শেখর, *অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা*, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ১৯৯৪

বন্দোপধ্যায়, শ্রীকুমার, *সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে*, কলকাতা, ১৩৬৯

বসু, যোগেশ চন্দ্র, *মেদিনীপুরের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

বসু, শ্যামাপ্রসাদ, *মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বাংলা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪

বড়ুয়া, সুব্রত, *ইতিহাসের পলাশী*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪

বাছির, আবদুল, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২

বালা, অমৃতলাল ও সরকার, উষা রাণী, *শচীন্দ্রনাথ সেনের সিরাজদ্দৌলা*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০০৯

ভট্টাচার্য, অশোক, *বাংলার চিত্রকলা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০২

ভট্টাচার্য, যদুনাথ, *রাজা সীতারাম রায়*, কলিকাতা, ১৩১১, বঙ্গাব্দ

ভদ্র, গৌতম, *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ১৩৯৮

ভূঁইয়া, গোলাম কিবরিয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

মওদুদ, আবদুল, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯

মঞ্জুর, নূরুল ইসলাম, *বাঙালির ইতিহাস চর্চারধারা*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭

মল্লিক, কুমুদনাথ, *নদিয়া-কাহিনী*, পুস্তক বিপনী, কলিকাতা, ১৯৯৮

মিছের, কাজী মোহাম্মদ, *রাজশাহীর ইতিহাস*, আইডিয়েল প্রিন্টিং, ঢাকা, ১৯৬৫

মিত্র, প্রতিভারঞ্জন, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৯৭৯

মিত্র, সতীশচন্দ্র, *যশোর-খুলনার ইতিহাস*, ১ম ও ২য় খণ্ড, গুরুদাস এণ্ড সন্স লি., কলিকাতা, ১৯৯৬

মিত্র, সুধীরকুমার, *হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ*, মিত্রালী প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৬২

মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, *রাজনৈতিক সমাজ বিজ্ঞান*, (খান মোঃ লুৎফুর রহমান অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮

মুখোপাধ্যায়, আর.ডি., *বর্ধমান রাজবংশচরিত*, বর্ধমান, ১৯১৫

মুখোপাধ্যায়, রাখাল দাস, *বর্ধমান রাজবংশানুচরিত*, বর্ধমান, ১৩২১ বঙ্গাব্দ

মুখোপাধ্যায়, সুখময়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল*, কলিকাত, ভারতী বুক স্টল, ১৯৬৬

মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার, *প্রাক-পলাশী বাংলা (আর্থিক ও সামাজিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭ খ্রি.)* কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮২

---------- *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী)*, কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫

---------- *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তাঁর মানসলোক*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৮

---------- *মোগল সাম্রাজ্য থেকে ব্রিটিশরাজ (১৫৫৬-১৮১৮)*, কলকাতা, ২০০৫

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, *বাঙালীর ইতিহাস*, (নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙালীর ইতিহাস* গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ), মুক্তধারা, ঢাকা, ২০১০

মুখোপাধ্যায়, শ্রী শ্যামধন, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, বহরমপুর, ১৮৬৮

মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার, *সিরাজদ্দৌলা*, দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৩

---------- *রাণী ভবানী*, প্রথম দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৬

---------- *মীর কাসিম, দিব্য প্রকাশ সংস্করণ*, ঢাকা, ২০০৬

---------- *সীতারাম রায়*, কলিকাতা, ১৩০৫, বঙ্গাব্দ

মোহাম্মদ, ইসা, *এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের সামন্তবাদ সন্ধান ও বিচার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

রক্ষিত, হারাণচন্দ্র, *রাণী ভবানী*, কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ

রব্বানী, গোলাম, *উপনিবেশ পূর্ব বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১

রশীদ, মোহাম্মদ মামুনুর, *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলঃ সেকালের সমাজ ও রাজনীতি*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪১৭

রহমান, মাকসুদুর, *নাটোরের মহারাণী ভবানী*, রাজশাহী, ১৯৮৮

রহিম, এম. এ., *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম ও ২য় খণ্ড, (বাংলা অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি), প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬

রায়, অনিরুদ্ধ ও চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, *মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৯৯২

রায়, নিখিলনাথ, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, পুঁথিপত্র প্রকাশনী লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৬

---------- *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, মেট্‌কাফ্‌ প্রেস, কলিকাতা, ১৩০৯ বাংলা সন

---------- *জগৎশেঠ, কলিকাতা, ১৯১২*

রায়, রজতকান্ত, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪

রায়, সোমেন্দ্রলাল, *মুর্শিদাবাদের কথা ও কাহিনী*, কলিকাতা, ১৯৬০

রহমান, মোঃ হাবিবুর, *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩

লাহিড়ী, দুর্গাদাস, *রাণী ভবানী*, কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ

লোচন, রাজীব, *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত দুস্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী-২, কলকাতা, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ

শর্ম্মা, মৃত্যুঞ্জয়, *রাজাবলী*, কলিকাতা, ১৮৮৯

শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য*, বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮

শিকদার, আবদুল হাই, *সিরাজদৌলা মুর্শিদাবাদ*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০০৭

শ্রীবাস্তব, হরিশঙ্কর, *মোগল শাসন ব্যবস্থা*, বাংলা অনু., মুহাম্মদ জালালউদ্দিন বিশ্বাস, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৭

সান্যাল, দুর্গাচন্দ্র, *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস*, মডেল পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৪১০ বাংলা

সিদ্দিকী, নোমান আহমদ, *মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালন ব্যবস্থা (১৭০০-১৭৫০)*, পার্ল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৪

সিংহ, হরিশচন্দ্র, *বাংলার ব্যাংকিং*, কলিকাতা, ১৯৩৯

সেন, চণ্ডীচরণ, *মহারাজ নন্দকুমার চরিত*, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮৫

সেন, দীনেশচন্দ্র, *বৃহৎ বঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৫

সেন, রঙ্গলাল, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০

সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫

সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ, *সিরাজদ্দৌলা*, কলিকাতা, ১৯৪২

সুর, অতুল, *আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৮৫

---------- *বাংলার সামাজিক ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

হক, এনামুল হক, *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৫

হবিবুল্লাহ, এ বি এম, *সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪

হাবিব, ইরফান, *মুঘল ভারতে কৃষি-ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭)* বাংলা অনু., কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৫

---------- *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস: একটি সমীক্ষা*, (বাংলা অনু. সৌভিক বন্দোপাধ্যায়) পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলিকাতা, ২০০৪

---------- (সম্পাঃ), *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, বাংলা অনু., রাজা মূখার্জী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৮

---------- (সম্পাঃ) *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, বাংলা অনু., কাবেরী বসু, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাই. লিঃ, ২০০২

হালদার, গোপাল, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩

যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ, *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬

(খ) প্রবন্ধাবলি

Achary. P., "Mayurbhanj during Nawab Alibardi khan's expedition to Orissa", *Indian Historical Quarterly,* vol. VXIII, 1942

Ahmed, Zakiuddin, " Decline and fall of the Nawabs of Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Pkistan*, 1984

Akhtaruzzaman, Md, Process of urbanization in Early Muslim Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* vol. 46, no. I, 2001

---------- "The Sultant of Bengal and Its Political Culture", in Fakrul Alam & Firdous Azim (ed.) *Politics and Culture*, University of Dhaka, 2002

---------- "The Scope of Studying Social History of Bengal" *Perspective in Social Sciences*, vol. 5, University of Dhaka, 1998

---------- "History of Sufism in Bengal: An Introduction", *Philosophy and Progress,* vol.23, 2000

---------- "The Muslim Rulers and Their non Muslim Subjects in Thirteenth and Fourteenth Centuries Eastern India", in *Essays in memory of Professor M R Tarafdar,* ed. Parween Hassan and Mufakharul Islam, University of Dhaka, 1999

---------- "Stages of State Formation: Medieval Period", *State and Culture* ed. by, Emajuddin Ahmed & Harun- or-Rashid, Culturarl Survey of bangladesh series-3 ASB, 2007

Alam, Muzaffa, "The Zamindars and Mughal Power in Deccan, 1645-1712", *Indian Economic and Social History Review,* March, 1974

---------- "Aspects of Agrarian Uprisings in North India in The Early Eighteenth Century" in *The Mughal State, 1526-1750,* ed. by Muzaffar Alam & S. Subrahmanyam, New Delhi, 2000

Ali, M. Mohar, "The Backgroun of the Battle of Plassey,", *Journal of Asiatic Society of Pakistan.* vol. XI, no. III, 1966

Askari, Syed, H. K., "Raja Ramnarain", *Indian Historical Quarterly,* vol. XIV, & XV, 1939

---------- " Raja Ramnarain and the the Post Plassey Affairs", *Indian Historical Quarterly.* vol. XXIII, Part-I, 1944

Battasali, N.K., " Bengal Chiefs' Struggle for Independence in the reigns of Akbar and Jahangir", *Bengal Past and Present,* vols. 35, 36, 1928 & vol. 38, 1929

Chalkins, P.B., "The Formation of regionally Oriented Ruling Group in Bengal, 1700-1740", *Journal of Asian Studies*, vol. XXIX, no.4, 1970

Cathrine , B. Asher, "Inventory of Key Monoments- Murshidabad", in George Michell (ed.), *The Islamic Heritage of Bengal,* UNESCO, 1984

Chatterjee, Kumkum, "Trade and Durbar Politics In the Bengal Subah, 1733-1757", *Modern Asian Studies,* vol. 26, 1992

Chaudhuri, Tapan. K Ray, "A Household Affair of the Murshidabad Nawabs", *Bengal Past & Present,* 1949

Chaudhury, Sushil, "Merchants, Companies and Rulers: Bengal in the Eighteenth Century" *Journal of the economic and social History of the Orient* vol.31, No.1, 1988

---------- "Trading Networks in A Traditional Diaspora-- Armenians in India, C. 1600-1800", available at http://gpmsdbaweb.com/memoir2/_supportdocs/armenians%20in%20Bengal.pdf

---------- "European Companies and Pre-modern South Asian Commercial System- A Study of Bengal in the Eighteenth Century", *Calcutta Historical Journal, XI:* 1-2, 1986-1987

---------- "Khwaja Wazid in Bengal Trade and Politics", *Indian Historical Review,* vol. XVI, nos. 1-2, July, 1989- January 1990

---------- "The Asian merchants and companies in Bengal's export trade, circa mid-eighteenth Century", in *Merchants, Companies and Trade: Europe and Asia in the Early Modern Era,* edited by Sushil Chaudhury, Cambridge University Press, 1999

---------- "Sirajuddaullah, English Company and The Plassey Conspiracy- A Reappraisal", *Indian Historical Review,* Vol. XXIII, nos. 1-2, July, 1986, January 1987

---------- "General Economic Conditions in Nawabi Bengal", in *History of Bangladesh*, vol. 2, ed. by sirajul Islam, Dhaka, 1992

---------- "Continuity or Change in the eighteenth Century? Price Trends in Bengal, circa 1720-1757" *Calcutta Historical Journal,* vol. XV, nos.1-2, July 1990, January 1991

---------- "Merchants, Companies and Rulers: Bengal in the Eighteenth Century", *Journal of*

the Economic and Social History of the Orient, vol. XXXI, 1988

Dale, Yoder, "Current Definition of Revolution", *The American Journal of Sociology,* Vol. 32, No.3 (Nov., 1926), pp. 433-441, available in http://www.jstor.org/stable/2765544

Dani, Ahmad Hasan, "The Bengali Muslim Society: Its Evaluation", *Bangali Literary Review,* Vol. 2, 1956

Datta, K.K., "Durlabh Ram: A Prominent Bengal Officer of the Eighteenth Century Bengal", *Indian Historical Quarterly,* vol. XVI, 1940

---------- "Sirajuddaulah and the English before 1756, *Indian Historical Quarterly,* vol. XXII, 1946

---------- " The Marathas in Bengal after 1751" *Journal of Indian History,* vol. XV, PartI-III, 1937

Edward C. Dimmock, ÒHiduism and Islam in Medieval India", Rachel van M Baumer (ed.), *Aspects of Bengali History and Society,* Honolulu, 1975

Furber, Holden and Galman, Kristof, "Plassey: A New Account from the Denish Archives", *Journal of Asian Studies,* vol XIX, no. 2, 1960

Ganguly, N., "A Peep into the social Life of bengal in the eighteenth century", *Bengal Past & Present,* vol. LXIX,1950

Ghose, Benoy, "Some Old–Family founders in 18^{th} century Calcutta", *Bengal Past & Present.* vol. LXXIX , January- June, 1960

Habib, Irfan, "The Technology and Economy of Mughal India", *Journal of Indian History.* XXVII, vol. no. I, Jan-March, 1980

----------"Technology and Barriers to Technological Change in Mughal India", *Indian Economic and Social History Review,* Vol. V, (1-2), 1978, pp. 152-174

Karim, Abdul, "*Tawarikh-i-Banglah* on Shuja Al-Din Muhammad khan's Succession on the Subadari of Bengal", *Journal of Asiatic Society of Pakistan,* vol. X, No. I. 1965

Kevonian, k. and Aghassian, M., "The Armenian Marchant netwark: Overall Autonomy and local Integration", in *Merchants, Companies and Trade: Europe and Asia in the Early Modern Era.* edited by Sushil Chaudhury, Cambridge University Press, 1999

Little, J.H., "The House of Jagatseth", in *Bengal Past & Present,* vol. XX,1920 & vol. XXII, 1924

Mahmud, A.B.M., "The Zamindari of Rajshahi", *Bangladesh Historical Studies,* vol. XVIII, 2001

Marshall, P. J., "Private British investment in Eighteenth Century Bengal", *Bengal Past & Present,* vol. 86, 1967

---------- "Indian Official under the East India Company in eighteenth Century Bengal", *Bengal Past & Present,* 1965

Mitra, K.C.,"The Territorial Aristocracy of Bengal- The Rajas of Rajshahi," *The Calcutta Review*. vol. LVI., 1873

----------"The Territorial Aristocracy of Bengal- The Nadiya Raj,"*The Calcutta Review*,vol. LV., 1872

Monahan, E. J., "The black Hole Debate", *Bengal Past & Present*, vol. XII, 1916

Moosvi , Shireen, " The Silver influx, Money Supply, Prices and Revenue Extraction in Mughal India", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. XXX, 1987

Prakash, Om, "Asian Trade and European Impact: A Studyof the Trade from Bengal, 1630-1729", in Blair Kling and M N Pearson ed. *The Age of Partnership: Europeans in Asia before Domination*, Honolulu, 1979

---------- "Bullion for Goods: International Trade in the Economy of Early Eighteenth Century Bengal", *Indian Economy and Social Science Review*, vol. XII, 1976

Raghuvanshai, V.P.S., "Fall of Sirajuddaula, the Nawab of Bengal", *Journal of Indian History*

Rahim, M. A., "The Rise of Hindu Aristocracy under The Bengal Nawabs", *Journal of Asiatic Society of Pakistan*, vol. VI, 1961

Ray, Rajat and Ratna, "Zamindars and Jotedars: A Study of Rural Politics in Bengal", *Moden Asian Studies*, 9, no. I, 1975

Ray, Rajat Kanta, " Colonial Penetration and the initial Resistance: The Mughal Ruling Class, the English East India Company and the Struggle for Bengal 1756-1800", *Indian Historical Review*. vol. XII, nos. 1-2, July, 1985- January1986

Ray, Ratnalekha, "The Bengal Zamindars: Local Magnets and the State before the Permanent Settlement", *Indian Economic and Social History Review*, vol.12. No. 3, July 1975

Roy, Asim, "The Social Factors in the Making of Bangali Islam", *South Asia*, 3, August, 1973

Roy, Indrani, "Some Aspects of Frence Presence in Bengal", *Calcutta Historical Journal*, 1:1, 1976

---------- "Dupleix's Private Trade in Chandennagore", *Indian Historical Review*, 1974

Rubbee, khondkar Fazli, "Mir Jafar and Siraj-ud-Daulah", *Bengal Past and Present*. vol. XII, sn. 24, 1916

Sen, Anjali, "Murshid Quli Khans Relations with the European Merchants", *Indian Historical Quarterly*, vol. 5, 1959

Seth, M. J., "Khojah Petrus: The Armenian Merchant-Diplomat of Calcutta", *Bengal Past and Present*, Vol.XX,

---------- "Was the Black Hole a Myth", *The Muslim Review*, October-December, 1926

---------- "Armenians and the East India Company," *Bengal Past and Present*, 1926

Skelton, Robert, "Murshidabad Painting", *Marg*, Vol. X, no. I, December 1956

Dhaka University Institutional Repository

Striling, A, "The Territorial Aristocracy of Bengal- The Bardawn Raj", *The Calcutta Review*. vol. LVI., 1872

---------- "The Territorial Aristocracy of Bengal- The Nadia Raj", *The Calcutta Review*. vol. LV., 1872

---------- "The Territorial Aristocracy of Bengal- The Dinajpur Raj", *The Calcutta Review*. vol. LV., 1872

Wise, James, "The Muhammadans of eastern Bengal", *Journal of Asiatic Society of Bengal*, 1894

আখতার , শিরিন, "মুঘল আমলের জমিদারদের ইতিবৃত্ত" *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ১৮-১৯ সংখ্যা, ঢাকা ১৯৮৯

আখতারুজ্জামান, মো., "মধ্যযুগে বাংলা-আরকান আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক", *ইতিহাস*, পঁয়ত্রিশ বর্ষ সংখ্যা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

আনসারী , মুসা,"প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার আর্থ-সামাজিক বিকাশধারা" *ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৮

-------"ভারতীয় সামন্তযুগ নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সন্ধানে" *ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৮

আলী, এম আতহার," সাম্রাজ্যের অবসান: মুঘর প্রসঙ্গ", *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, ইরফান হাবিব (সম্পা.), (বাংলা অনু:) রাজা মুখার্জী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৮

ইসলাম, সিরাজুল,"রায়তের অধিকার", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা-১, নভেম্বর, ১৯৭৮

করিম, কে এম, "নবাবী আমলের সমাজ কাঠামো", *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৭০৪-১৯৪৭, দ্বিতীয় খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাঃ), বাংলা সংস্করণ, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩

ক্যায়সর, এ. জান, "মুঘল সাম্রাজ্যের অভিজাতদের মধ্যে রাজস্ব সম্পদেরবন্টন" *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, ইরফান হাবিব (সম্পা.), (বাংলা অনু:) রাজা মুখার্জী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৮

খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, "পলাশীর ষড়যন্ত্র ও তৎকালীন অভিজাত শ্রেণী", *ইতিহাস*, (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), সাঁইত্রিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ

চৌধুরী, সুশীল, "পলাশী যুদ্ধ ও সিরাজউদ্দৌলা", *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩

মোহাম্মদ, নূর, "পলাশি যুদ্ধের কারণ: ইতিহাসের পুনর্পাঠ", *নতুন দিগন্ত*, দশম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০১২ ও দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ২০১২

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর ও পারভীন, ফাতেমা রেজিনা, "প্রাক-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজে ভূমি-মালিকানা প্রসঙ্গ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, জুন ২০০২

রহমান, সাঈদ-উর, "মনসামঙ্গল কাব্য ও ইসলাম ধর্ম", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*,জুন, ১৯৮৫

রায়, অনিরুদ্ধ, "ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশে নগর বিন্যাস ও সামাজিক পরিবর্তন", সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পা.), *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

রায়, অসীম, "মুসলিম বাংলার ইতিহাসে সমন্বয়ধর্মী ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা", সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পা.), *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১

----------"বাংলায় সমন্বয়ধর্মী ইসলামী ঐতিহ্য" *উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

সরকার, যদুনাথ, "আওরঙজেব-মুর্শীদকুলী পত্রালাপ", *ইতিহাস*, সংখ্যা ২, নং ২, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

সেন, রঙ্গলাল, "বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো: ঐতিহাসিক পটভূমি", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, চতুর্দশ সংখ্যা

হাবিব, ইরফান, "প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে ভূ-সম্পত্তির সামাজিক বণ্টন: একটি ঐতিহাসিক নিরীক্ষা", ইরফান হাবিব সম্পাদিত *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, কলকাতা, ২০০২

হাসান, এস নুরুল, 'মুঘল সাম্রাজ্যে জমিন্দারের অবস্থান', *মধ্যকালীন ভারত*, প্রথম খণ্ড, ইরফান হাবিব (সম্পা.), (বাংলা অনু:) রাজা মুখার্জী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৮

হাসান,পারভীন, "স্থাপত্য ও চিত্রকলা", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ৩য় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩,, পৃ.পৃ. ৬১৮, ৬১৯

লেখক (অজ্ঞাতনামা), "মহারাজা নন্দকুমার", *বঙ্গদর্শন*, আষাঢ়, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ

---------- "জগৎশেঠ", *বঙ্গদর্শন*, আষাঢ়, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ

---------- "সিরাজউদ্দৌলা", *বঙ্গদর্শন*, আষাঢ়, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ

জার্নাল ও সাময়িকী

Bengal Past and Present
Calcutta Historical Journal
Indian Economic and Social History Review
Indian Historical Quarterly
Indian Historical Review
Journal of Asian Studies
Journal of the Asiatic Society of Bangladesh
Journal of Asiatic Society of Bengal
Journal of the Asiatic Society of Pkistan
Journal of the economic and social History of the Orient
Journal of Indian History
Modern Asian Studies
The Calcutta Review
ইতিহাস
ইতিহাস সমিতি পত্রিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়পত্রিকা
বঙ্গদর্শন
বাংলা একাডেমী পত্রিকা
সমাজ নিরীক্ষণ